জন-হিতৈষণা-বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

কলিকাতা ১৬৭-৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ভবনস্থ

"দাসাশ্রম" হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা
১৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে" শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দাসী

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

সত্যের সম্মাননা ও অসত্যের অবমাননাকে ধর্ম্ম কহে। সত্য উপলব্ধি দ্বারা লাভ করিতে হয়, এবং উপলব্ধি জ্ঞানমূলক। সকল মানুষের জ্ঞান সমপরিমাণবিশিষ্ট নহে, মানুষের শিক্ষাভেদে অর্জ্জিত জ্ঞানেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে, জ্ঞানের বিশিষ্টতা হেতু মানুষের উপলব্ধিরও বৈষম্য জন্মায়; একারণ জগতে লোকভেদে সত্যের নানা প্রকার বিকাশ ও তদনুযায়ী নানা-জাতীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সকলেই জ্ঞাত আছেন এক 'প্রেম' কথাটীকে নানা ভাবে বুঝিয়া লওয়াতে জগতে খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ, তাঁহাদের স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে প্রেমের বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হইতে বিভিন্ন প্রকার সত্যলাভ ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাই ঐ সকল ধর্ম্ম পরস্পর হইতে এত স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ঐ সকল ধর্ম্মের অনুচরগণ আরও বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হেতু পূর্ব্বার্জ্জিত সত্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন সত্যের প্রচারে যত্নবান হইতেছেন। জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতানুসারে নবার্জ্জিত সত্যেরও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটিতেছে এবং এই কারণে মহাজন-প্রচারিত ধর্ম্মেরও স্থলবিশেষে উন্নতি বা অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। খৃষ্ট প্রচারিত সত্য রোমান পোপ একভাবে উপলব্ধি করিলেন এবং মার্টিন লুথর অপরভাবে উপলব্ধি করিলেন; ইহা হইতেই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের অধঃপতন ও প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল। বুদ্ধদেব কীটহিংসা-পর্য্যন্ত নিবারণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া আপন প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান জৈন সম্প্রদায় বুদ্ধের দোহাই দিয়া কীটহিংসাতে বিরত থাকিলেও নরহিংসা তাহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হয়ত বুদ্ধদেব পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের হিংসাকে পাপ বলিয়া উল্লেখ করিতে গিয়া নরজাতির কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন;—হয়ত তিনি ইহা ভাবিয়াছিলেন যে কীট পতঙ্গের হিংসাকে যাহার পাপ বলিয়া ধারণা হইবে, তাহার পক্ষে

নরহিংসা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু বুদ্ধের মত প্রেমের উপলব্ধি লইয়া সকল লোক জন্মাইল না; এক্ষণকার জৈন সম্প্রদায় হয়ত মনে করে যে বুদ্ধ যখন নরহিংসার বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তখন তাহাতে পাপ না থাকাই সম্ভব! এইরূপে জ্ঞানের তারতম্যানুসারে উপলব্ধির বিশিষ্টতা হেতু ধর্ম্মের উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছে এবং নানাজাতীয় নবধর্ম্মেরও অভ্যুদয় হইতেছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে ধর্ম্মকে জ্ঞানাশ্রিত না করিয়া বিশ্বাসমূলক করিলেই সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হয়। বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়মূলক; অতএব যে সত্য আত্মপ্রত্যয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহা অনায়াসে গ্রাহ্য হইতে পারে। এস্থলে একটী বিবেচনার কথা আছে;—সকল বিশ্বাসই কি আত্ম-প্রত্যয়মূলক? বিশ্বাস কি জ্ঞানমূলক হইতে পারে না? কোন বিশ্বাস আত্ম-প্রত্যয়মূলক এবং কোনটী জ্ঞানমূলক তাহা কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? আত্মপ্রত্যয়মূলক বিশ্বাস মানুষের আদবেই জন্মায় কিনা? একটী বলিতে গিয়া, ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বিবেচনার কথা বলিয়া ফেলিলাম; কিন্তু আমার ধারণা হয় মানুষের অধিকাংশ বিশ্বাসই সংস্কারমূলক। মানুষ আত্ম-প্রত্যয় নাম দিয়া সংস্কারকে ভিত্তিরূপে খাড়া করিয়া, তাহার উপর সত্যের ঘর বাঁধেন ও তাহাতে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ ধর্ম্মের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী নহে। সংস্কার 'কু' ও 'সু' উভয়ই হইতে পারে; তদনুসারে ধর্ম্মের দুইটী বিভিন্ন প্রকার বিশিষ্টতা জন্মায়। চৈতন্যদেব ভক্তির স্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহারই শিক্ষা "ভক্তিতে মুক্তি" বঙ্গবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তিনি ভক্তিকে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এবং বিশ্বাস সংস্কারাশ্রিত। তাই সংস্কারের স্রোতে পড়িয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম 'সু' ও 'কু' উভয় ভাবাপন্ন হইয়াছে, এবং বঙ্গবাসীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মের চাকচিক্য আছে; তাহা অতি সরস, অতি মৃদু; তাহা যে কেবল নিজে কোমল তাহা নহে, যাহার সংস্পর্শে আসে তাহাকেও কোমল করে; অধিকন্তু তাহার আয়ত্তীকরণে আয়াস অধিক করিতে হয় না। এত গুণ থাকাতেই তাহা সহজে মানুষের মন হরণ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এত গুণ সত্বেও সংস্কার তাহার মূলে থাকিয়া কীটরূপে দংশন করিতেছে। বোধ হয় অতি মৃদুতাই ইহার জীবনের একটী অন্তরায়।

কাহারও বা মতে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" মতাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। মহাজন যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাতে চলিলে কোন বিপদাশঙ্কা নাই। কিন্তু তাহাতেও বিবেচনার কথা রহিয়াছে;—সকল মহাজন একরূপ কথা বলেন নাই, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব জ্ঞানানুযায়ী পথ দেখাইয়াছেন। তাহাও কেবল পথের নির্দ্দেশমাত্র বলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই নির্দ্দেশ মত পথটী নিজের দেখিয়া লইতে হইবে। পথ ভোলা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়, তাহা নিজের অপরিপক্ক জ্ঞানের ফলমাত্র। এইরূপে দেখা যায় যে ধর্ম্ম ও সত্যার্জ্জনে মানুষকে প্রতিপদে জ্ঞানের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতে হইতেছে। জ্ঞান ব্যতিরেকে সত্যলাভ ঘটে না এবং সত্যোপলব্ধি, তাহার সম্মাননা ও অসত্যের অবমাননাকেই ধর্ম্ম বলা যায়।

এস্থলে একটী গুরুতর প্রশ্ন এই উঠিতেছে যে জগতে কি এমন দুইটী লোক পাওয়া যায়, যাহাদের জ্ঞানের মাত্রা সর্ব্বতোভাবে এক? তাহা যদি না হয় তবেত এই সিদ্ধান্তে আসিয়া দাঁড়াইতে হয় যে, জগতে যত জন মনুষ্য আছে ততটী ধর্ম্মও আছে। কথাটী আপাততঃ সকলের নিকট অসম্ভব মনে হইলেও বাস্তবিক তাহা মিথ্যা নহে। জগতে প্রত্যেক মনুষ্যেরই এক একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিয়াছে; ঐ ব্যক্তিগত ধর্ম্মের বাহ্য প্রকটনের নামই মানব চরিত্র। যাহার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম সংস্কারমূলক, তাহার চরিত্র সংস্কারগত; এবং যাহার ব্যক্তিগতধর্ম্ম জ্ঞানমূলক, তাহার চরিত্র জ্ঞানগত। ইহাদের মধ্যে একটী অতি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে; জ্ঞানগত চরিত্র জ্ঞানের মাত্রার সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং তাহার উন্নতি ও অবনতি জ্ঞানের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সংস্কারগত চরিত্র সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না, কারণ মানুষের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইতে বহুকাল লাগে। প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্র সমালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, তাহার কতকাংশ জ্ঞানমূলক এবং অপরাংশ সংস্কারমূলক। যাহাদের চরিত্রে সংস্কারগত ভাব অধিক পরিস্ফুট তাহারা জ্ঞানের অভাব সত্বেও কেবলমাত্র সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া জগতে আদর্শ জীবনযাপন করিয়া যাইতেছে; আবার যাহাদের চরিত্রে সংস্কার হইতে জ্ঞানের প্রাধান্য অধিকতর পরিস্ফুট, তাহারা কোন সংস্কার ব্যতিরেকে কেবল মাত্র আপন কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হইয়া জীবনকে সুপথে চালিত করিতেছে। এই

উভয়বিধ চরিত্রেরই উপযোগিতা রহিয়াছে। সংস্কারমূলক চরিত্র কুসংস্কারের সংস্রবে আসিলে তাহাকে সুপথে রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। এস্থলে জ্ঞান-মূলক চরিত্র অনায়াসে সংস্কারের মূলচ্ছেদ করিয়া আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে সক্ষম হয়। আবার সংস্কারবিহীন চরিত্র জ্ঞানের অভাবে একান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পাপের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়। হিন্দুসমাজে সংস্কারপ্রধান চরিত্রের বহুদৃষ্টান্ত দেখা গিয়া থাকে, এবং সংস্কারবিহীন অজ্ঞানান্ধ চরিত্রেরও একান্ত অপ্রতুল নহে। যে সমাজ যত প্রাচীন তাহাতে সংস্কারের প্রাধান্য তত অধিক; এবং সমাজ না হইলে সংস্কার জন্মাইতেই পারে না। এক্ষণে সমাজ বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই এক একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিয়াছে; এ কারণ জগতে দুইটী মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে এক ধর্ম্মাবলম্বী দৃষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু আবার ইহাও দেখা যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্যের ব্যক্তিগত ধর্ম্মের একটী মুখ্যাঙ্গ ও একটী গৌণাঙ্গ রহিয়াছে। মুখ্যাঙ্গ কতকগুলি স্থূল সত্যের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়, এবং গৌণাঙ্গ ঐ সকল স্থূল সত্যের উপলক্ষণাদি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক;—মনে কর, 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস' একটী মুখ্য সত্য। ইহার অন্তরালে দুইটী গৌণ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; কাহারও মতে ঈশ্বর শক্তি-স্বরূপ, এবং কাহারও মতে ঈশ্বরের 'ব্যক্তিত্ব' রহিয়াছে (এ স্থলে ব্যক্তিত্ব দ্বারা 'মনুষ্যত্ব' বুঝাইতেছে না।) এই উভয় গৌণ মতের পার্থক্য সত্ত্বেও উক্ত মতদ্বয়ের উপলব্ধিকারীদিগকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এইরূপ গৌণ সত্য বাদ দিয়া কতকগুলি মুখ্য সত্যের সমষ্টি দ্বারা একটী ধর্ম্মমত খাড়া করা যাইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল মুখ্য সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উক্ত ধর্ম্মের অনুযায়ী বলা যাইবে এবং তাহাদিগের সমষ্টি ঐ ধর্ম্মানুযায়ী 'সমাজ' বলিয়া অভিহিত হইবে। এইরূপে 'সমাজ' শব্দের একটী অর্থ খাড়া করিয়া দিলে তদ্দ্বারা ইহা বুঝাইবে যে, কতকগুলি গৃহীত মতের সমষ্টিকে যে সকল লোক সত্য বলিয়া সম্মাননা করিতেছে এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধ মতের সমষ্টিকে অসত্য বলিয়া অবমাননা করিতেছে, তাহাদিগের একত্র দলবদ্ধ হওয়ার নামই 'সমাজ'। এ স্থলে কোন সমাজের গৃহীত সত্যকে ধ্রুব সত্য বলা হইতেছে না, অতএব

তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে না। যাহারা ঐ মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের নিকটই উহা তাহাদের ধর্ম্মমত বলিয়া গণ্য হইবে। অপরের নিকট তাহা অসত্য বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে; সে স্থলে ঐ মত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাই জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এক সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মতের বিশ্লেষণ ঘটাতে ঐ সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সমাজ একবার গঠিত হইয়া গেলেই তাহাতে সংস্কার জন্মাইতে আরম্ভ করে, ইহার জন্য কাহাকেও আয়াস করিতে হয় না। দশজন লোক একরূপ বিধি করিয়া তন্মতে চলিতে সঙ্কল্প করিলে তাহাদের পরপুরুষেরা ক্রমে ঐ সকল বিধিকে কর্ত্তব্যের বিধান বলিয়া গণ্য করিবে। কোন কোন সমাজে এই সকল বিধান লিপিবদ্ধ হইয়া পরপুরুষদিগের পথপ্রদর্শক হয়; ইহাই বেদ, পুরাণ, মনুসংহিতাদি হিন্দুশাস্ত্রীয় গ্রন্থ, এবং বাইবেল কোরাণাদি অপর ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ। এ স্থলে ইহা লক্ষিত হইবে যে, সকল সংস্কারেরই আরম্ভ জ্ঞানমূলক; কিন্তু তাহা একবার সংস্কারের পদবীতে আসিয়া দাঁড়াইলে সাধারণতঃ তাহা জ্ঞানাশ্রিত না থাকিয়া আপনাআপনি চলিতে থাকে। তখনই তাহার 'সু' ও 'কু' দুইটী পথ প্রসারিত হইয়া পড়ে। সমাজ গঠিত হইলেই সংস্কার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সংস্কার জ্ঞানের আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেই ঐ সমাজের অধঃপতনের পথ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে। তাই সামাজিক ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য যাহাতে সমাজবদ্ধ সংস্কার জ্ঞানের আশ্রয়ে জন্মাইতে এবং তদনুসারে চালিত হইতে পারে। সংস্কার ভিন্ন সামাজিক জীবন তিষ্ঠিতে পারে না, কারণ কোন সমাজে সকল ব্যক্তিকে সমজ্ঞানবিশিষ্ট পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব সংস্কার না থাকিলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের চরিত্রের সমতা রক্ষা হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজে অতিশয় পরিস্ফুট। ব্রাহ্মসমাজ নূতন সমাজ, তাই তাহাতে এখনও সংস্কার সম্যক জন্মাইতে সময় পায় নাই; এ কারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখনও প্রচুর পরিমাণে চরিত্রের অসমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রবন্ধে জ্ঞানাশ্রিত সংস্কার এবং জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম ও তদাশ্রিত সমাজের বিষয় আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র।

চন্দ্রশেখর—ঘটনাবৈচিত্র্যে, দৃশ্যবৈচিত্র্যে, বর্ণনবৈচিত্র্যে, চরিত্রবৈচিত্র্যে চন্দ্রশেখরের মত উপন্যাসের সংখ্যা বঙ্গ সাহিত্যে নিতান্ত অল্প। চন্দ্রশেখরে দুইটি উপন্যাসভাগ একত্র বিজড়িত। কোথায় রত্ন-মণি-মাণিক্য-মোহন, বিলাসতরঙ্গ-ভঙ্গ-প্লাবিত নবাবের অন্তঃপুর; আর কোথায় শাস্ত্রচর্চ্চারত স্থিরচরিত্র, ধীরবুদ্ধি, উদারস্বভাব চন্দ্রশেখরের কুটীর!! বড় ও ছোটর মিলনের পুণ্য প্রয়াগক্ষেত্র চন্দ্রশেখর। কিন্তু বড় কে? ধনে জনে নবাব বড়, কিন্তু মনুষ্যত্বে চন্দ্রশেখর কত বড়! আবার মুসলমান নবাবের বিলাস-পাপপঙ্কিল অন্তঃপুরে যে শতদল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহার তুলনা কোথায়? দলনী শৈবলিনী অপেক্ষা কত বড়। এই গ্রন্থান্তর্গত চরিত্রগুলির মধ্যে চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, রামানন্দস্বামী, শৈবলিনী ও দলনী এই কয়টিই প্রধান।

চন্দ্রশেখর আধ্যাত্মিক বীর। তাঁহার প্রবল জ্ঞানপিপাসা, অত্যুদার হৃদয়, দুর্ল্লভ মহত্ত্ব, এই সকল একাধারে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব না হইলেও সুলভ নহে। এই একত্রীকরণেই চরিত্রের পূর্ণতা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চন্দ্রশেখর মানব ভিন্ন আর কিছুই নহেন; মানবের দৌর্ব্বল্যও তাঁহাতে ছিল। এই দৌর্ব্বল্য ছিল বলিয়াই তাঁহার সহিত আমাদের সহানুভূতি মিশিতে পারে—আমাদিগের হৃদয়ের আবেগ, উচ্ছ্বাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়। জনসন একস্থানে বলিয়াছেন যে, যদি চরিত্রের কেবল উজ্জ্বল অংশই প্রদর্শিত হয়, তবে আমরা হতাশ হইয়া পড়ি এবং বিবেচনা করি কোন অংশে তাহার অনুকরণ করা আমাদের সাধ্যাতীত। কেবল জ্যোতির্ম্ময় মহিমা আমাদিগের অনুকরণাতীত। তাই চন্দ্রশেখরের চরিত্রে এই দুর্ব্বলতা। তাঁহাকে মানব করিবার জন্যই এই দুর্ব্বলতা। চন্দ্রশেখরের জ্ঞানতৃষ্ণা তীব্র—তাহার তীব্রতা স্রোতে তাঁহার অন্যান্য কর্ত্তব্য ভাসিয়া গিয়াছিল। প্রথমে আমরা দেখিতে পাই তাঁহার বিবাহের কারণ,—জ্ঞানান্বেষণের সুবিধা। তাহার পর জ্ঞানান্বেষণের ব্যস্ততায় তিনি তাঁহার পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাই তাঁহাকে কর্ত্তব্য অবহেলার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। শৈবলিনীর গৃহ-

ত্যাগ হইতে তাঁহার শান্তি আরম্ভ—সেই পুস্তকদাহে তাহার আরম্ভ; সেখানেই তাহার বিকাশ। তাঁহার প্রেম গভীর, গৃহপ্রত্যাগমন-পথে তাহা প্রমাণিত; পথে তাঁহার চিন্তাই তাহার পরিচায়ক। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কয়টি কথা বলা আবশ্যক। তিনি স্বীয় কার্য্যের তীব্র সমালোচক। তাঁহার প্রেম প্রস্তররুদ্ধমুখ প্রস্রবণের মত, তাই শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পর, তিনি তাহা বিশ্বপ্রেমে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা অসীম নহিলে তিনি ফষ্টরের হত্যা হইতে প্রতাপকে নিবারণ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার প্রেম যেমন তল-তীর-হীন সাগরের ন্যায় গভীর এবং গম্ভীর, তাঁহার উদরতাও সেইরূপ। তাঁহার মহত্বের দৃষ্টান্ত এক আধটি নহে। এখন তাঁহার দৌর্ব্বল্যের কথা বলিতে হইবে, তাহা শৈবলিনীর পরীক্ষা—এইস্থানে চন্দ্রশেখর মনুষ্য, তিনি সন্দেহাতীত দেবতা নহেন, তিনি জগতের মনুষ্যমাত্র।

প্রতাপ সংসারী, কিন্তু সংসারে থাকিয়া শত প্রলোভন ও সুবিধার মধ্যে থাকিয়া, ঐশ্বর্য্য, বল, সকলের অধীশ্বর হইয়াও কেমন করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করিতে হয়, প্রতাপ তাহাই দেখাইয়াছেন; তাহাই তাঁহার চরিত্রের নৈতিক উদ্দেশ্য। প্রতাপ বীর—প্রতাপ প্রকৃত বীর—ইন্দ্রিয় জয়ে প্রতাপ বীর, বাহুবলে প্রতাপ বীর, কৃতজ্ঞতায় প্রতাপ বীর, মহত্বে প্রতাপ বীর হইতেও বীর। বীরত্বে প্রতাপ অতুলনীয়। বাল্যে প্রতাপ প্রেমের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিল। শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতাপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন—সে বীরত্ব কেবল শারীরিক বীরত্ব নহে—তাহা নৈতিক বীরত্বও বটে। প্রদীপের আলোকোজ্জ্বল কক্ষ মধ্যে অমল শ্বেতশয্যায় শয়ানা শৈবলিনীকে যখন তিনি তিরস্কার করিলেন তখন প্রতাপের চরিত্র, ব্যবহার, বীরত্ব সকলই ব্যাখ্যাত হইল। প্রতাপ বলিলেন "ঈশ্বর জানেন আমি কোন দোষে দোষী নহি।" দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই। তাহার পরে সেই গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ—দৃশ্য হিসাবে অগাধ জলে সন্তরণের মত দৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোন পুস্তকে নাই (গ্রন্থকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন *) কিন্তু অন্য সৌন্দর্য্য হিসাবে দেখিতে গেলে তেমন সুন্দর দৃশ্য আর কোথায় আছে? সেইত প্রতাপের চিত্তসংযমের, নৈতিক বলের চরম উৎকর্ষ। সেই শপথ—তাহা কি কঠোর,

* তৃতীয়বর্ষের দ্বিতীয়ভাগ সাধনায় "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—লেখক।

কি ভীষণ! তাহা রূঢ় শুনায় বলিয়াই চন্দ্রশেখর যখন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সেস্থলে যাহা ছিল, পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পরিবর্জ্জিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ, শৈবলিনীকে ভাল বাসিয়াও রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাহা যদি তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানবিরোধী বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহার প্রধান কয়টি কারণও দৃষ্ট হয়—প্রথমতঃ তাঁহার বিবাহে শৈবলিনীর হৃদয় হইতে প্রতাপলাভাকাঙ্ক্ষা দূর হইবার সম্ভাবনা; দ্বিতীয়তঃ তাহাতে তাঁহার আপনার চিত্তবৃত্তিদমনের সুবিধার সম্ভাবনা—এই যে আপনার অসীম ক্ষমতায় অবিশ্বাস ইহাই প্রতাপের চরিত্রের মাধুরী,—তৃতীয়তঃ ইহাতে চন্দ্রশেখরের আজ্ঞা পালন করা হইল। কিন্তু ইহাতেও যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে সেই রণক্ষেত্রে অমূল্য জীবন দানেও কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? সেই রণক্ষেত্রেই প্রতাপের মহিমা পূর্ণরূপে বিকশিত। প্রতাপ যখন বুঝিলেন যে তিনি জীবিত থাকিলে শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের অসুখের সম্ভাবনা, তখন বীর প্রতাপ বীরের ন্যায় জীবনত্যাগ করিলেন। দধীচি প্রভৃতির জীবনদানেও বাসনা মিশ্রিত ছিল, আকাঙ্ক্ষা সেখানেও প্রবল। কিন্তু প্রতাপের জীবনত্যাগ স্বার্থমিশ্রিত ছিল না। এত বড় আদর্শ, এত বড় উপদেশ আর কোথায় আছে? যোগীবর রামানন্দস্বামীও তখন বলিয়াছেন "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী, আমরা ভণ্ডমাত্র।" তাহার পর সেই পরহিতব্রতধারী মহাপুরুষ প্রতাপের মহত্বের সম্মুখে অবনতমস্তক হইয়া হৃদয়ের হৃদয় হইতে প্রার্থনা করিলেন "প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।" কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "পরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।" প্রতাপ আদর্শ পুরুষ। সেই আদর্শে মানবকুল চিরদিন ধন্য হইক আর সেই মহান আদর্শ চরিত্র জয়যুক্ত হউক। প্রতাপ উপদেশ দিয়াছেন:—

"পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

রামানন্দস্বামী নরচিত্তজ্ঞ দার্শনিক এবং পরোপকার ব্রতধারী সন্ন্যাসী। তাঁহার জ্ঞান অসীম, তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের

সন্ন্যাসীগণের ন্যায় তিনিও কতকটা অসামান্য ক্ষমতাপন্ন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তিনি কেবল ক্রিয়া কর্ম্মকারী নহেন, পরোপকার ব্রতই তাঁহার জীবনের ব্রত। হৃদয়হীন হইয়া ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পাদনে কি পরোপকারের অপেক্ষা অধিক পুণ্য লাভ হয়? কপাল-কুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই নবকুমারের মুখদিয়া বলাইয়াছেন "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থ দর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।" লোক দেখান পুণ্যকর্ম্মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই-রূপ আন্তরিক ঘৃণা। রামানন্দস্বামী পরের হিতের জন্য সকল ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন—স্বার্থপরতার গরলশ্বাস তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি মহাত্মা পলের সেই মহাবাক্য "Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep" জীবনের মহাউদ্দেশ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বজীবন গ্রন্থকার ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছেন। তবে গ্রন্থশেষে মনে হয় যে, তিনিও একদিন প্রতাপের মত প্রেমে পড়িয়াছিলেন। প্রতাপের প্রেম সঙ্কীর্ণ থাকিয়াই মহত্বে উপনীত হইয়াছিল আর তাঁহার প্রেম প্রেমের উচ্চতম আদর্শে উপনীত হইয়াছিল; তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নারী-প্রেম হইতে তিনি বিশ্বপ্রেমে, ভগবৎপ্রেমে উপনীত হইয়াছিলেন; প্রেম মঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সে উচ্চসীমায় "Love is heaven and heaven is love." কেবল রামানন্দস্বামীর ক্ষমতার আতিশয্য সাধারণ পাঠককে বিস্ময়াবিষ্ট করে সন্দেহ নাই।

সত্য বটে "Love is the light and sunshine of life;" কিন্তু প্রয়োগ ফলে সকল দ্রব্যই বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। সংসারজ্ঞানাভিজ্ঞ বলেন, যে সকল দ্রব্যেরই দুইদিক আছে,—আলোক ও আঁধার। প্রেমেরও দুইদিক আছে। একে তাহা পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, অন্যে তাহা নিতান্ত পাপপঙ্কিল। প্রেমের এই দুই অবস্থা কেবল ব্যবহারের ফল। আত্মসংযম, জ্ঞান, ধীরতা এবং সদ্বিবেচনার অধীন হইলে প্রেম হইতে কখন কুফল উৎপন্ন হইতে পারে না —প্রতাপ তাহার দৃষ্টান্ত। আবার আত্মসংযমের অভাব হইলে, অধীরতা ও অদূরদর্শিতা প্রবল হইলে প্রেম হইতে কি ভীষণ কুফল উৎপন্ন হইতে পারে শৈবলিনীতে তাহা প্রকাশ। একজন স্থির, গম্ভীর, অগাধ সমুদ্রের মত— আপনাতে আপনি স্থির, নিমগ্ন—অল্প আহ্লাদে বিষাদে তাহার গাম্ভীর্য্য

বিচলিত হয় না—তবু সে আপনার বক্ষে আপনি বিশ্বাসবান নহে, ইহাই তাহার মাধুরী। আর একজন অগভীর, আপনার বেগ সম্বরণে অসমর্থ, অদূরদর্শী আপনার অল্প বলের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সে ছুটিয়া যায়—সে বেগ ক্ষণস্থায়ী ও ভীষণ—তাহাতে যাহা সম্মুখে পড়ে তাহাই ভাসিয়া যায়—কিন্তু বলিয়াছি সে বেগ ক্ষণস্থায়ী। সেই শৈশব হইতেই দেখিতে পাই প্রতাপ আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন—শৈবলিনী তাহা পারে না—পারিলে সে প্রথমেই গঙ্গায় ডুবিত। সংসারাবর্ত্তে আসিয়া ডুবিল শৈবলিনী, উঠিল প্রতাপ—তাহার পর আবার মহত্বে ডুবিল প্রতাপ, পাপে ডুবিল শৈবলিনী—ডুবিল উভয়েই; কিন্তু স্রোত আর এখন এক নহে। সেই কূলে কূলে ভরা নদীর তরঙ্গরঙ্গময় উরসে দুইজনে মরিল না—সংসারের কর্ম্মস্রোতে দুইজনে দুই দিকে গিয়া পড়িল—একজন আত্মসংযম অবলম্বন করিল, আর একজন তাহা পারিল না—সেই ডুবিল। এরূপ বিষম বিরোধবৈচিত্র্য বড় সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের বিবাহ হইলে বোধ হয় উভয়েই সুখী হইত; কিন্তু তাহা হইল না। যখন হইল না তখনও শৈবলিনী কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিতে পারিল না—এই কর্ত্তব্য অবহেলাই তাহার অধঃপতনের প্রধান কারণ। শৈবলিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও তেজস্বিনী রমণী। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় গ্রন্থে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়; তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ না হইলে, সে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য উন্মত্ত হৃদয়কে গৃহকর্ম্মের আবরণে আবৃত রাখিতে পারিত না। সে যখন ফষ্টরের সহিত চলিয়া গেল, তখন সে প্রেমোন্মাদঅবস্থাপন্ন, বুদ্ধি না থাকিলে সে প্রতাপের উদ্ধারসাধন ও আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না থাকিলে, সে নবাব সমক্ষে রূপসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিত না। তাহার তেজস্বিতা অসাধারণ—ফষ্টর, সমরক্ষেত্রে নির্ভীক, মরণে অকাতর ফষ্টরও বঙ্গরমণীর কমনীয় কোমল করে ছুরিকা দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, আর প্রতাপ তাহার কথা শুনিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। শৈবলিনী যখন বলিল "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার প্রস্ফুটোন্মুখ যৌবনকালে ওরূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? * * * * আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলামনা কেন? না

পাইলাম ত মরিলাম না কেন? * * * * * তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?" তখন সহজেই বুঝা যায় যে সে প্রতাপেরই উপযুক্ত গৃহিণী হইত। সে ধরণীর ধূলায় নির্ম্মিতা; চন্দ্রশেখরের প্রেম অনুভব করিতে হৃদয়ের যে উচ্চতা ও মহত্ব প্রয়োজন, সে তাহার প্রেমতাড়িত হৃদয়ে সে উচ্চতা, সে মহত্ব আনিতে পারিল না। তাহার অবস্থায়-সত্যই "who can gaze upon the sun in heaven?" অভাগিনী আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিল না; রমণীর পবিত্রতায় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া ভবিষ্যৎকালের শিক্ষার জন্য সে গৃহত্যাগ করিল। দুঃখ কোথায় অধিক—গৃহে না বাহিরে? চন্দ্রশেখরের—দরিদ্র চন্দ্রশেখরের—গৃহে যদি তাহার উন্মত্ত প্রেমপিপাসা পরিতৃপ্ত না হইত, তবুও সেথায়—

"Her modest looks the cottage might adorn,
Sweet as the primrose peeps beneath the thorn;"

আর এই অকূলে সে কোথায় যাইবে তাহার স্থির আছে কি? সেই বিরামবিহীন ফেনিল জলরাশির ক্রীড়ায় সে কোথায় ভাসিয়া চলিল—

"as a weed
Flung from the rock, on ocean's foam, to sail
Where'er the surge may sweep, the tempest's breath prevail."

শৈবলিনী ভবিষ্যতের শিক্ষার জন্য একটা দৃষ্টান্ত; তাই তাহার প্রায়শ্চিত্তে লেখক পাঠকের সম্মুখে পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রস্ফুট ছবি ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্তেই জাতীয় ভাবের পূর্ণ বিকাশ। অনেক সুন্দর ইংরাজী বা ফরাসী উপন্যাস আমাদের নিকট তেমন প্রাণস্পর্শী হয় না; তাহার কারণ হৃদয়ের নিভৃত কোণে একটি জাতীয় ভাব লুক্কায়িত থাকে—"সেটা ক্ষুদ্র, দৃষ্টির অগোচর তবু তীক্ষ্ণতম।" শ্রদ্ধেয় বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক স্থলে বলিয়াছেন "শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদা জাগ্রত, কর্ম্মশীল, অনুসন্ধান তৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্ম্মহীন স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট।" সত্য বটে "এই শ্যামা আর্য্য-প্রকৃতিতে হয়ত রাত্রির মত একটা গভীরতা, মাধুর্য্য, স্নিগ্ধকরুণা এবং সুনিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে;" কিন্তু আমাদিগের স্বপ্নকুহকাবিষ্ট হৃদয়, সহসা আপনার মধ্য

হইতে আপনাকে সচেতন করিয়া তুলিয়া শ্বেতজাতির হৃদয়ের মত কর্ম্ম-প্রবণ করিয়া তুলিতে পারে না। আমরা কঠোর কার্য্যের পরিবর্ত্তে সহজেই অসাধারণ গম্ভীর একটা কিছুর অবতারণা করিতে ভাল বাসি। কর্ম্মের কঠোর তপনতাপ অপেক্ষা, আমরা স্বপ্নকুহকের স্নিগ্ধতায় অধিক মুগ্ধ একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। সেই ভীমকায় মহীধর, সেই বিকট অন্ধকার, সেই দেহ ও মনের অবস্থা, সেই চিত্ত বৃত্তিরোধ, এ সকল হয়ত প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত উপকরণ, কিন্তু শ্বেতকায় এ দৃশ্য ভাল বাসিবে না। সে আপনার সমালোচনার অনুবীক্ষণের নিম্নে এই প্রাচ্যকল্পনাসৃষ্ট দৃশ্য স্থাপন করিয়া বলিবে যে, ইহা ঠিক কার্য্যগত নহে এবং প্রাচ্য প্রকৃতির প্রিয়তম কল্পনার উপর যথাসম্ভব বিদ্রূপরস সিঞ্চন করিয়া যখন সে তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবে, তখন আমরা আর তাহাকে চিনিতে পারিব না; তাহা যে সেই দ্রব্যেরই রূপান্তর তাহা আর বুঝিতে পারিব না। চন্দ্রশেখর কোন প্রতীচ্যদেশবাসীর রচনা হইলে এই দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইত, —এই প্রায়শ্চিত্ত অক্ষরে অক্ষরে জগতের কার্য্যের সঙ্গে মিশাইয়া যাইত; আমরা সে কার্য্যস্তূপের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিতাম। এইরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের পাশ্চাত্য আদর্শ East Lynne পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়।

শৈবলিনী প্রতাপ ভুলিল; তখন চন্দ্রশেখরের সেই অসীম প্রেম তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল "সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্ত ভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গ-ভঙ্গ ভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না।" এই পরিবর্ত্তনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটু দার্শনিক কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। "মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটী পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।" উপন্যাসে এইরূপ দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা উচিত কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয়—এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। একদল বলেন যে এইরূপে দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিলে তাহা লোকের নিকট রসহীন ও

বিরক্তিকর বোধ হয় না, কিন্তু শিক্ষা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপে উপন্যাসে দর্শন ধর্ম্ম ও ইতিহাস শিক্ষা দিয়াছেন; স্কট ও লিটনও এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আর একদল বলেন যে, এরূপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন যে উপন্যাসে কেবল বাস্তব চিত্র চিত্রিত হইলেই হইল,অন্ধকার ও আলোক উভয় দেখাইলেই গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য শেষ হইল। একের প্রাধান্য প্রদর্শন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে, তিনি কেবল নিপুণ চিত্রকরের মত ঠিকটি চিত্রিত করিবেন। য়ুরোপীয় লেখক ও পাঠকদিগের মধ্যে আজকাল এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি উইলিয়ম মরিসের মতের মর্ম্মার্থ এখানে প্রদান করিলাম। তিনি বলেন আজকাল লোকে নীতিপ্রবণ উপন্যাস লইয়া পাগল। এই যে নিত্য নূতন নীতির নেশা, তিনি ইহার পক্ষপাতী নহেন, এই যে নব নব নীতির নিয়ম তিনি বলেন এ সব কেন? এই সব Novels with a purpose কেন? তিনি এ সব ভাল বাসেন না; তিনি কেবল আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য উপন্যাস পাঠ করেন। তিনি বলেন যদি দর্শনাদির কথা বলিবে তবে স্পষ্ট করিয়া তাহাই বল; সে গুলি উপন্যাসের সঙ্গে মিশাইয়া চিনি মাখান ঔষধের বড়ির মত লোকের গলাধঃকরণ করাইবার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে; কোন মত ভ্রান্ত তাহা নির্ণয় করা দুরূহ,—দুরূহ কেন একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। বাস্তবিক সমস্ত জটিলতার মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে বোধ হয় শৈবলিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। সে প্রায়শ্চিত্ত পাপের ভীতি—পূণ্যের জয়।

দলনী প্রেমের পবিত্রতা ও মহত্বের আদর্শ বিকাশ। কিন্তু মুসলমান কন্যা দলনীর হৃদয়ে সেই বিকাশ দেখাইয়া গ্রন্থকার পবিত্রতার সার্ব্বজনিকতা এবং হৃদয়ের উদারতা দেখাইয়াছেন। পবিত্রতা সর্ব্বজনীন। আমাদিগের প্রিয় মাতৃভূমি সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষে পবিত্রতা বিকশিত হইলে তাহার গৌরব যেমন অসামান্য, আফ্রিকার জনশূন্য মরুপ্রান্তে বা সাগরচুম্বিত কর্ম্মবীর ইংরাজের মাতৃভূমিতে পবিত্রতা বিকশিত হইলেও তাহার গৌরব তেমনই অসামান্য—তাহা দেশ কাল বা পাত্রভেদেই অঙ্গহীন হয় না। আর লেখকের উদারতা যে তিনি জাতির

মধ্যে জাতির অবতারণা করেন নাই। জাতীয় হিসাবে মুসলমান দিগকে বাদ দিলে আমাদের চলে না; শত শত বৎসরের ঘটনাস্রোত হিন্দু ও মুসলমানদিগের ভাগ্য একত্র গ্রথিত করিয়াছে—আমরা একদেশবাসী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও একজাতি সন্দেহ নাই। বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গ যেমন মরণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আপনাকে অগ্নি মধ্যে পাতিত করে, দলনী তেমনই মরিবার জন্য, অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য নবাবের প্রেমে আপনার নিজত্ব হারাইয়া তন্ময় হইয়াছিল। গুর্‌গণখাঁ কেবল আপনার কার্য্য সিদ্ধির জন্য ভগিনীকে লোকবিশ্রুত বিলাসসাগর নবাবের অন্তঃপুরে রাখিয়াছিল; কিন্তু দলনী বুঝিল যে নবাব তাহার স্বামী—তাই সে দেবতা নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে ভক্তি করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, সত্যই দলনী নবাবকে বলিতে পারিত:—

> "বঁধু, কি আর বলিব আমি।
> মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হইও তুমি॥
> তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
> সব সমর্পিয়া; একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

প্রেম সুলভ না হইলেও নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে; কিন্তু প্রেমের সহিত এই বিনয় ও নম্রতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এই পতিপ্রেমে আপনার প্রেম মিশাইয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব বোধেই প্রেমের প্রকৃত পরিস্ফুটতা। যখন বিষপানাতুর অশ্রুকলুষিতনয়ন যুক্তকর দলনীকে গ্রন্থকার পাঠকের সম্মুখে আনিলেন, তখন মনে হইল, এই মূর্ত্তিতেই তাহার সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। সে মূর্ত্তির কথা মনে হইলেই মনে পড়ে:—

> The rose is fairest when 'tis budding new,
> And hope is brightest when it dawns from fears.
> The rose is sweetest washed with morning dew,
> And love is loveliest when embalmed in tears.

একদিকে যেমন এই কথা মনে পড়ে, অপরদিকে তেমনই মনে পড়ে প্রাচীন কবির সেই কথা:—

> "কে বলে পিরিতি ভাল।
> হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল॥"

গ্রন্থকার দলনীর চরিত্র কোনরূপ জটিলতায় সমাচ্ছন্ন রাখেন নাই; সেই

মহত্তম আদর্শ তিনি সরল ভাবেই আনয়ন করিয়াছেন। দলনী রমণীর কর্ত্তব্য পালনের, সংকল্পের দৃঢ়তার ও হৃদয়ের পবিত্রতার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

লরেন্স্ ফষ্টর এই গ্রন্থমধ্যে বিশেষরূপে জড়িত। গ্রন্থের প্রথমাংশেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন "যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।" ইহা ঐতিহাসিক সত্য; ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই ইহা অবগত আছেন। ক্ষমতাশালী না হইলে মুষ্টিমেয় বণিকসম্প্রদায় এই বিশাল বিপুল দেশের বক্ষে বুদ্ধিবলে বা বাহুবলে আপনাদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইত না। আর তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারিত্বের পরিচয় ভারতের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফষ্টর সেই সম্প্রদায়ের লোক। তাহার স্বেচ্ছাচার-প্রবৃত্তিই চন্দ্রশেখর গ্রন্থের ভিত্তি। শত পাপ অতিক্রমের পর নবাবের শিবিরে জানুসংলগ্ন ভূমি, যুক্তকর, উদ্ধনেত্র ফষ্টরের প্রতি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন ফষ্টরের হৃদয়ে পাপের জন্য যন্ত্রণা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই নরক। মানবের কল্পনাসৃষ্ট গন্ধকাগ্নির অন্ধকারময় আলোক ভীষণ, তরলগন্ধকসমুদ্রোর্ম্মিময় নরক বা তপ্ত তৈলময় নরক অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের এই অবস্থা ভীষণ। হৃদয়ের এই অবস্থা কি ব্যক্ত করা যায়? হতভাগ্য ফষ্টর যখন এইরূপ যাতনা-পীড়িত, তখন সে তাপদগ্ধ জীবন-মধ্যাহ্নের কথা স্মরণ করিয়া, সেই জীবন-সায়াহ্নে যুক্তকরে ঈশ্বরকে স্মরণ করিল। তখন সে যাহা বলিল, তাহা ভক্তযোগী নিউম্যানের ভাষায়:—

"I was not ever thus, nor prayed that Thou
Shouldst lead me on;
I loved to choose and see my path; but now
Lead Thou me on.
I loved the garish day, and spite of fears,
Pride ruled my will: remember not past years."

মীরকাসেম্—হতভাগ্য. মীরকাসেম্ যদি অত্যাচার বা অবিবেচনার কার্য্য করিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ ছিল না কি? ক্ষুব্ধসাগরের তরঙ্গ-রাশির মত, তাহার নিধনের জন্য ষড়যন্ত্র তাহাকে ঘিরিতেছিল। তাহার উপর ভৃত্যের সেই হীন ব্যবহার ও সর্ব্বোপরি সেই পতিপ্রেম-পরায়ণা

প্রাণপ্রিয় পত্নীর প্রতি সন্দেহ; এ সকলের কি একটা বিরক্তিকর, উন্মাদকর ক্ষমতা নাই? আপনার ক্ষণিক মূর্খতায় সেই হতভাগা অজেয়, অসীম, অতুলনীয় প্রেমরাজ্য, স্বর্গসম্ভবা পত্নী হারাইয়া অনুতপ্ত—তখন তাহার বুদ্ধির স্থৈর্য্য প্রত্যাশা করা যায় না "মুক্তা, প্রবাল, রজত, কাঞ্চন-শোভিত" উচ্চাসন তখন তাহার নিকট কণ্টকাকীর্ণ নারকীয় শয্যার মত বোধ হইতেছিল। "উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরক-রঞ্জিত" মুকুট তখন তাহার নিকট "ধরার ধূলার চেয়ে নীচ" বোধ হইতেছিল। এই ঐশ্বর্য্য, এই সম্মান, আর তাহাদের সহচর ষড়যন্ত্রের ভীষণতা ও দুশ্চিন্তা বিধৌত করিয়া যদি সে আবার সেই ক্ষুদ্র অবলার বিপুল প্রেম-রাজ্যে, আপনার শান্তিময় নিভৃত নিকেতন নির্ম্মাণের অবসর পাইত, তবে তুচ্ছ এই অসার ধনসম্পত্তি পদদলিত করিয়া সে যাইতে পারিত; কারণ সেখানে বিশ্বাস কখন শিথিল নহে, প্রেম কখন আবেগহীন বা স্বার্থ-পঙ্কিল নহে, সুখ কখন পরিমিত নহে; সেখানে জগৎ স্বর্গের রূপান্তর মাত্র। তখন তাহার

"জীবনের গ্রন্থি পড়িছে খসিয়া
হইয়া তরঙ্গাহত।"

তাই সেই হতভাগ্য বাঙ্গালার শেষ নবাবের প্রতি ক্রোধ অপেক্ষা, অধিক দয়া হয়।

গুরগন্‌খাঁর ক্রমাবনতি, দুরাশায় মানবের অবনতির পথ কিরূপে পরিষ্কৃত হয়, তাহা সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর পাঠ করিয়া মনে হয় গ্রন্থখানির বিশেষ নৈতিক উদ্দেশ্য আছে। যে অবস্থাতেই হউক সন্তুষ্ট থাকা, ঈশ্বরে নির্ভর করা এবং পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যপথ অবলম্বন করিয়া আপনার কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল ধরায় আপনার কর্ত্তব্য পালন করা, ইহাই চন্দ্রশেখরের মহান্ শিক্ষা। কর্ম্মবীর কর্ত্তব্যবোধী প্রতাপ বা পতিপ্রেম-পরায়ণা পবিত্রহৃদয়া দলনীর তুলনা কোথায়? পাপের প্রায়শ্চিত্ত শৈবলিনীতে পরিস্ফুট। চন্দ্রশেখর পত্নীর প্রতি মনোযোগ না দেখাইয়া, কর্ত্তব্য অবহেলার যে অপরাধ করিয়াছিলেন, গৃহত্যাগী ব্যথিতহৃদয় চন্দ্রশেখরকে তাহার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। কর্ত্তব্য অবহেলায় অবশ্যই পাপ আছে। আর যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। রামের বনগমনের পর দশরথ কৌশল্যাকে বলিতেছেন;—

"যদাচরতি কল্যাণি নরঃ কর্ম্ম শুভাশুভম্।
সোহবশ্যং ফলমাপ্নোতি তস্য কালক্রমাগতম্॥"

এখানে আর একটি বিষয় পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে নারীপ্রেম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানানুশীলন ফলে, ক্রমে ক্রমে স্বদেশ-প্রেমের, স্বজাতি-প্রেমের ও ভগবৎ-প্রেমের মনোমুগ্ধকর মহান নীতি গাহিয়া এই শত শত শতাব্দীর উৎসাহ উদ্দমহীন আলস্যপরবশ জাতির নিকট এক কর্ত্তব্য-পরায়ণ জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে "The thoughts of men are widened with the process of the suns." ইহারই প্রথম অঙ্কুর রামানন্দ স্বামীতে।

চন্দ্রশেখরের ভাষা, বর্ণনা ও দৃশ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। গ্রন্থান্তর্গত দৃশ্যগুলি অতীব সুন্দর। সেই বিপুল বারিময়-বক্ষ ভাগীরথী তাহার শত শত তরঙ্গে আলোক জ্বালাইয়া বহিয়া যাইতেছে, আর তাহারই মধ্যে প্রতাপ ও শৈবলিনী। সেই ভীষণ গিরিগহ্বর, যেখানে মার্ত্তণ্ডকরজালের প্রবেশাধিকার নাই। সেই বিকট অন্ধকারের মধ্যে, তাহার অপেক্ষাও বিকটতর অন্ধকারময় হৃদয় লইয়া শৈবলিনী। সেই দরিদ্র চন্দ্রশেখরের গৃহে—তাহাতে একখানি শান্তিময় কুটীরের ছবি নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে। আবার সেই ভীষণ রণক্ষেত্র। কিন্তু বর্ণনাকৌশলে সে সকল জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণনার উপযুক্ত ভাষা না থাকিলে তাহা হইত না। সে ভাষা কোথায় গম্ভীর হইতেও গম্ভীরতর, আবার কোথাও তাহা সরল মধুর হইতেও মধুরতর; আবার স্থানে স্থানে তাহা গম্ভীর বলিয়াই মধুর এবং মধুর বলিয়াই গম্ভীর।

যেখানে জড়-প্রকৃতির বিকট গম্ভীরতা বর্ণনা করিয়া স্বভাব-পূজক বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ের হৃদয় হইতে প্রকৃতির স্তব করিয়াছেন; সেখানে আশ্চর্য্য হইতে হয়—যে লেখক চিরদিন মানবচরিত্র ও মানবের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণে এত মনোযোগ দিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে এতখানি স্বভাব-পূজার ভাব, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনার মধ্যে আপনার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে! তখন মনে হয়, তিনিও বায়রণের মত বলিতে পারিতেন:—

"I love not Man the less, but Nature more.

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন যে, বিদেশীয় অনেক ভ্রমণকারী কেবল স্বভাবের

শোভা দর্শনার্থ ভ্রমণ করেন।. বঙ্গদেশে আসিয়া তাঁহারা এই সমতল ভাগে সৌন্দর্য্যাভাব বোধ করেন। এখানে পার্ব্বত্যপ্রদেশের শোভা না থাকিলেও সৌন্দর্য্যের অভাব কি? শস্যক্ষেত্র কি নয়নের সম্মুখে মনোরম শোভাময় চিত্র উপনীত করে না? যখন হরিৎক্ষেত্রে হরিদ্রাবর্ণ সর্ষপ-কুসুম বিরাহ বিহীন ভাবে ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলে, আর পবন হিল্লোলে সেই হরিদ্রাবর্ণ কুসুমচূড় হরিৎক্ষেত্রে দুলিতে থাকে, তখন কি বোধ হয় না যে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ বহিতেছে? একবার তিনি নদীপথে খুলনা জেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে নদীতীরে সুপারি বৃক্ষের যে কুঞ্জ দেখিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য্য ভুলিবার নহে। তাহার পর সীতারাম গ্রন্থে উড়িষ্যার বর্ণনায় তাঁহার সৌন্দর্য্য-পূজা ও শিল্প-সমালোচনা-প্রতিভা উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল শান্ত বর্ণনা হইতে একবার যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনার দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে মনে হয়, এ কি বৈষম্য! সেই ভীষণ নারকীয় দৃশ্য, তাহাও সেই রচনা-মাধুর্য্যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। আর সেই মৃত ও আহত স্তূপ মধ্যে প্রতাপ—তাঁহার সেই শেষ বাক্যাবলী। সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য হৃদয়-পটে চিরাঙ্কিত হইয়া যায়।

এই গ্রন্থখানি আরম্ভ করিলে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ জন্মে। এবং গ্রন্থ সমাপ্তির পর স্মৃতি সেই গ্রন্থকে সুধাভাণ্ডারের মত হৃদয়ে রাখিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার মাধুরী উপভোগের অবসর দান করে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

পলাশ বন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি বাল্যকালে পশ্চিম বঙ্গে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমার পিতৃঠাকুর মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোনও উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া বহুকাল এই অঞ্চলে অবস্থান করিয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের জলবায়ু স্বাস্থ্যজনক বলিয়া তিনি কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণপূর্ব্বক এই দেশেই বসবাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে তিনি দেবীপুর নামক

এক বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রামের সন্নিহিত একটী মনোরম পল্লীতে কিয়দ্দিন বাস করেন। আমার অগ্রজ ভ্রাতারা কলিকাতায় থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম বলিয়াই হউক, কিম্বা দেবীপুরে আমার বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট উপায় বিদ্যমান ছিল বলিয়াই হউক, কিম্বা আর যে কোনও কারণেই হউক, আমি পিতামাতারই নিকটে অবস্থান করিতাম। দেবীপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে আমি স্বদেশে আমাদের গ্রামস্থ বঙ্গবিদ্যালয়ে কিয়দ্দিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলাম।

আমাদের আবাসবাটী পল্লীর বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল। তাহার অনতিদূরেই একটী পর্ব্বত; কিন্তু তাহা বৃক্ষলতাচ্ছন্ন ছিল না; কতিপয় আরণ্য বৃক্ষমাত্র তাহার নগ্নকৃষ্ণদেহের শোভা বর্দ্ধন করিত। তত্রত্য অধিবাসীরা বলিত, পূর্ব্বে পর্ব্বতটি নিবিড় জঙ্গলে সমাবৃত ছিল; ক্রমে পল্লীর স্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই জঙ্গল এবং তদধিবাসী ব্যাঘ্রভল্লুকাদিও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। যাহা হউক, বৃক্ষলতা না থাকায় পর্ব্বতটি দূর হইতে ভীষণ দেখাইত। তাহাতে আবার লোকে তাহাকে নানা দেবতা ও উপদেবতার বিহার-স্থল কল্পনা করিয়া তাহার ভীষণতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। দেবতাদের উদ্দেশে পূজা ও বলি দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনও কারণে কেহ তাহার উপরে আরোহণ করিত না। কিন্তু আমি প্রায়শঃ এই নিয়মের লঙ্ঘন করিতাম। লঙ্ঘন করিয়া মধ্যে মধ্যে জননীর তিরস্কার ও পিতৃদেবের কঠোর তাড়না পর্য্যন্ত সহ্য করিতাম।

পর্ব্বতে আরোহণ করিবার প্রবৃত্তি আমাতে কিরূপ প্রবল ছিল, জনক জননী তাহা অবগত ছিলেন না। স্বদেশে বঙ্গবিদ্যালয়ে যখন পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, নদী নির্ঝরের কথা পাঠ করিতাম, তখন পর্ব্বত কখন নয়নগোচর না করিলেও আমি মানসপটে তাহার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইতাম; কল্পনার সাহায্যে বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরের বক্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কত মনোরম প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম যে দিন পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া সত্য সত্যই পাহাড় দেখিলাম, বাড়ীর অনতিদূরেই শালবনের হরিৎ রেখা দেখিতে পাইলাম, এবং পার্ব্বত্য নির্ঝরের উল্লাসময়ী ক্রীড়া দৃষ্টিগোচর করিলাম, সেইদিন হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলাম, জীবনে আর কখনও সেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি

বলিয়া মনে হয় না। গৃহে পদার্পণ করিয়াই ছুটিয়া আমি পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলাম; উল্লাসে, ভয়ে, কৌতূহলে কিয়দ্দূর উঠিয়া একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়াছিলাম এবং সেখান হইতে একবার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া লইয়াছিলাম। নিম্নোন্নত ভূমি, বৃহৎ অজগরের ন্যায় পার্ব্বত্য নদী, মেঘমালার ন্যায় দূরবর্ত্তিনী শৈলশ্রেণী, বনাচ্ছন্ন প্রদেশ, নির্জ্জন মনোরম প্রান্তর ও আম্রকাননের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সকল চিত্রিত দৃশ্যপটের ন্যায় আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। পর্ব্বতের ভীষণ গম্ভীর মূর্ত্তি, সেই স্থলের নির্জ্জনতা ও প্রকৃতির নীরবতা আমার বালক হৃদয়ে ভীতিমিশ্রিত এক অপূর্ব্ব আনন্দস্রোত ছুটাইয়া দিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে যেন যাদুমন্ত্রবলে আমার কল্পনাদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, চিত্তবৃত্তি যেন মার্জ্জিত ও বিকশিত হইয়াছিল এবং হৃদয়ও যেন প্রশস্ততা লাভ করিয়াছিল। সেই দিন আমার ক্ষুদ্র জীবনের একটী মহাদিন। সেই দিন হইতে আমি জীবনে এক অভিনব পরিবর্ত্তন অনুভব করি এবং এক দিব্য পবিত্র আনন্দের অধিকারী হইতে সমর্থ হই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই দিনের কথা আমার স্মৃতিপটে সমভাবে জাজ্বল্যমান থাকিবে।

দেবীপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে আমি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। স্বদেশে থাকিবার কালে আমি বিদ্যাশিক্ষায় তত মনোনিবেশ করি নাই; কিন্তু এই নূতন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আমার অনুরাগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বাল্যসুলভ চাঞ্চল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করিয়া আমি গম্ভীর স্বভাব ও সংযতচিত্ত হইলাম। বিদ্যালয়ের পাঠাদি প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেই আমি কখনও একাকী এবং কখনও বা কতিপয় বিশিষ্ট সহচরের সহিত পর্ব্বতের সন্নিকটে কিম্বা বনের ধারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম; অথবা কখন কখন নির্দ্দোষ ক্রীড়াতেও মত্ত হইয়া আনন্দলাভ করিতাম।

কিন্তু সহচরগণের সহিত অবস্থান বা ভ্রমণ অপেক্ষা আমি নির্জ্জনতারই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলাম। প্রায় প্রত্যহই দিবাবসান কালে আমি পর্ব্বতের উপর একাকী বসিয়া থাকিতাম। গ্রামের কোলাহল সেখানে পৌঁছিত না এবং সেই উচ্চ স্থানের বায়ু নির্ম্মল, শীতল ও সুখসেব্য বোধ হইত। সেই স্থানে উপবেশন করিয়া আমি প্রায়ই সূর্য্যদেবকে অস্তাচলে গমন করিতে দেখিতাম। তাঁহার কনক কিরণমালা বৃক্ষপত্রে, পর্ব্বতশিখরে,

হরিৎক্ষেত্রে ও দূরস্থিত গিরিগাত্রে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিত। ক্রমে সন্ধ্যার প্রগাঢ় ছায়া ধরাতলে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইত; পশুপক্ষী নীরব হইত; বৃক্ষলতা নিস্পন্দ হইত; কেবল মধ্যে মধ্যে গৃহমুখী রাখাল বালকের সঙ্গীত ও দলভ্রষ্ট দুই একটী গো মহিষের কণ্ঠবিলম্বিত ঘণ্টার নিক্কণ ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইত না। আমি সেই সময়ে সেই পর্ব্বত স্কন্ধে উপবেশন করিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবে নিমগ্ন হইতাম, হৃদয়ে কত অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতাম এবং তাহাদের অতৃপ্তির জন্য বিষণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিতাম। এইরূপে পশ্চিম বঙ্গে আমার জীবনের কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে সেই বিদ্যালয়ে আমার পাঠ কাল সমাপ্ত হইয়া আসিল। পরিশেষে কৈশোরের অন্তে ও যৌবনের প্রারম্ভে আমি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতা মহানগরীতে উপনীত হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আসিয়া এক অভিনব রাজ্যে পড়িলাম। কলিকাতা নগরীর শ্রী, ঐশ্বর্য্য, জনতা, কোলাহল কিয়দ্দিন আমার মনোরাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রহিল। ততদিন মনে আর কোন বিষয়ই স্থান পাইত না। ক্রমে কৌতূহল অনেকটা চরিতার্থ হইয়া আসিলে, অর্থাৎ কলিকাতানগরীর অভিনবত্ব তিরোহিত হইবার উপক্রম হইলে, জনকোলাহল আমার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহে আমোদ প্রমোদে দুই চারি দিবস অতিবাহিত করিবার পর, দরিদ্র ব্যক্তি আপনার শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের জন্য যেরূপ লালায়িত হয়, কলিকাতা নগরীর বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে কিয়দ্দিন থাকিতে থাকিতে, আমিও তৎপ্রতি বীতরাগ হইয়া, পশ্চিম বঙ্গের সেই আড়ম্বর শূন্য নৈসর্গিক শোভার জন্য তদ্রূপ ব্যাকুল হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিলাম; কলেজের বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আমার কোথাও যাইবার উপায় ছিল না। সুতরাং আমি উপায়াভাবে, অবসর কালে, একমাত্র কল্পনার আশ্রয় লইয়া কলিকাতানগরীর সেই কোলাহলপূর্ণ রাজপথেই ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত পর্ব্বতশৃঙ্গে, জনহীন আরণ্যপথে, প্রান্তরে ও কৃষক-

গ্রামে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতাম এবং মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিতাম। সুখময়ী কল্পনার প্রসাদে নগরীর কোলাহল আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না এবং জনতা আমার চক্ষুতে প্রতিভাত হইত না; যেন যাদুমন্ত্রবলে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কোলাহলময়ী নগরী প্রশান্ত বনাচ্ছন্ন প্রদেশে পরিণত হইয়া যাইত, এবং আমিও যেন দুই একটী আরণ্য কপোতের কূজন ও অজ্ঞাতনামা পক্ষীর মধুময় কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইতাম না! কলিকাতায় অবস্থান কালে আমি মধ্যে মধ্যে এইরূপ স্বপ্নের আবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতাম।

স্বপ্নশীল ছিলাম বলিয়া, আমি কাহারও সহিত মিলিতে মিশিতে বড় একটা ভাল বাসিতাম না। আমার সমবয়স্ক সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেরই অন্য প্রকার প্রকৃতি ছিল। তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া বা আলাপ করিয়া আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত না। তাহাদের ও আমার রুচি, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিতে আকাশ পাতালের প্রভেদ ছিল। সুতরাং আমি তাহাদের সহবাস হইতে দূরে থাকিতে পাইলেই যারপর নাই আনন্দিত হইতাম। প্রয়োজন ব্যতীত আমি কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিতাম না। এই কারণে, আমার সহপাঠীরাও আমার সহিত মিলিতে মিশিতে আদৌ ইচ্ছা প্রকাশ করিত না। তাহারা আমাকে অহঙ্কৃত, অসামাজিক ও পল্লীগ্রামবাসী বলিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করিত। অবশ্য আমার সাক্ষাতে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। সাক্ষাতে সম্মানেরই সহিত সকলে কথাবার্ত্তা কহিত; কিন্তু শুনিয়াছি, অসাক্ষাতে আমার অদ্ভুত প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহারা বিলক্ষণ আমোদ সম্ভোগ করিত। আমি তাহাদের সম্মান বা বিরাগে অবিচলিত থাকিতাম। আমি কেবল জ্ঞানসঞ্চয়েই নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতাম এবং অবসরকালে কল্পনাকে সঙ্গিনী করিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করিতাম।

কলেজে কিয়দ্দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে, একটী সহপাঠীর প্রতি আমার হৃদয় বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হয়। উদ্ধতস্বভাব চপলচিত্ত সহপাঠিবৃন্দের মধ্যে কেবল সেই যুবকটিকেই শান্ত শিষ্ট ও সরলপ্রকৃতি দেখিতে পাইতাম। তাহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রফুল্ল; দৃষ্টি সরল, স্নিগ্ধ, কোমল ও প্রসন্ন—যেন তদ্দ্বারা তাহার হৃদয়ের সদ্ভাবগুলি আপনা আপনিই প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে। সেই যুবকটিকে দেখিলেই তাহার সহিত বন্ধুত্ব

করিতে ইচ্ছা হইত; কিন্তু অনেকবার আলাপ করিব মনে করিয়াও তাহার সহিত আলাপ করিতে পারি নাই। একদিন কলেজের ছুটীর পর, আবাসে প্রত্যাগত হইবার কালে, ঘটনাক্রমে দুইজনে পথিমধ্যে একত্র হইলাম। দুই একটী কথা কহিয়াই যুবকটির হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। যুবকটিও সহপাঠীদের মধ্যে কাহারও সহিত পবিত্র বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই। আমি যেরূপ তাঁহার সহিত, তিনিও সেইরূপ আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু তিনি আমার গম্ভীর প্রকৃতি দেখিয়া এতাবৎকাল ঘনিষ্ঠতা করিতে সাহসী হন নাই। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিলাম; বলিলাম "এখন আর শঙ্কার কোনও কারণ নাই। বাহ্যপ্রকৃতি স্বভাবতঃই সুন্দর। কিন্তু আকাশে সূর্য্য না থাকিলে, সেই সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য ও বিষাদেরই ছায়া আসিয়া পড়ে। সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি কেমন প্রফুল্ল হয়; তাহার শত সৌন্দর্য্য চারিদিকে কেমন উছলিয়া পড়ে! আশা করি, আপনিও আমার তমোময় জীবনের সূর্য্যস্বরূপ হইবেন।" সেইদিন হইতে সত্যেন্দ্র ও আমি অভিন্নহৃদয় হইলাম।

সত্যেন্দ্রের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, জগতে তাহার তুলনা নাই। স্বর্গীয় সদ্ভাবকুসুমে তাহা উল্লসিত; তাহাদের দিব্য সৌরভে তাহা পরিপূরিত এবং এক স্নিগ্ধ, শুভ্র, অলৌকিক জ্যোতিঃতে তাহা উদ্ভাসিত। সত্যেন্দ্রের হৃদয় যে কি অপূর্ব্ব উপাদানে গঠিত, তাহা বলিতে পারি না। তাহাকে যতই জানিতে লাগিলাম, তাহার হৃদয়ের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সত্যেন্দ্রকে দেবকুমার বলিয়া মধ্যে মধ্যে আমার ভ্রম হইত। মানবসন্তানকে তো কখনও আমি এরূপ পবিত্র ও সুন্দর হইতে দেখি নাই। ঋষিকুমারেরা বুঝি এইরূপই ছিলেন। সত্যেন্দ্র বুঝি শাপভ্রষ্ট হইয়া মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! সত্যেন্দ্রের দেহ, মন, আত্মা সমস্তই বুঝি একই উপাদানে গঠিত! অহো, সত্যেন্দ্র আমার মনে যে আলোক আনিয়া দিল, তাহাতে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া গেলাম। সত্যেন্দ্র সত্য সত্যই আমার তমোময় জীবনের সূর্য্যস্বরূপ হইল।

কি শুভক্ষণেই আমি সত্যেন্দ্রের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম! মাহেন্দ্র ক্ষণ কাহাকে বলে জানি না। কিন্তু এই মহাক্ষণেই আমাদের বন্ধুতাসূত্র গ্রথিত হইয়া থাকিবে। এরূপ বন্ধু ও এরূপ মিলন জগতে অল্পই হইয়া থাকে।

সত্যেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া অবধি আমি আর একাকী ভ্রমণ করিতাম না। সমস্ত দিন মহোৎসাহে পাঠাভ্যাসে রত থাকিয়া আমরা উভয়ে বৈকালে ভ্রমণের সময় ব্যাকুলহৃদয়ে একত্র হইতাম। তখন আমরা উভয়ে একমন, একপ্রাণ, একহৃদয়। তখন আমাদের এক চিন্তা, এক আকাঙ্ক্ষা, এক চেষ্টা। তখন আমাদের উৎসাহের সীমা নাই, আনন্দের শেষ নাই। বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা আগ্রহান্বিত হইলাম, এবং সচ্চিন্তা, সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থপাঠে আমরা এক অপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। সহপাঠিবর্গ আমাদের স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কেহ কেহ আমাদের হিংসা করিতে লাগিল; কিন্তু অনেকেই আমাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। সত্যেন্দ্রের ও আমার পরীক্ষার ফল আশাতীতরূপে সন্তোষজনক হইতে লাগিল। অধ্যাপকেরা আমাদিগকে যারপর নাই স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং সত্যেন্দ্র আমার ও আমিও সত্যেন্দ্রের উন্নতিতে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সত্যেন্দ্রকে আমি আমার প্রাণের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য সমস্তই বলিতাম; সত্যেন্দ্রও আমাকে তাহার প্রাণের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য সমস্তই বলিত। সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর আমার অন্তর্ব্বাহ্য যেরূপ জানেন, সত্যও আমার অন্তবাহ্য সেইরূপ জানিত। তাহার নিকট আমার গুপ্ত বা গোপনীয় কিছুই ছিল না। তাহার নিকটে কিছু গোপন করাকে আমি পাপ মনে করিতাম। যদি কখনও কিছু গোপন করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে মনে কোন মতেই শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারিতাম না। সত্যেন্দ্রও তাহার প্রাণের সকল কথা আমাকে বলিত। এইরূপে আমরা উভয়ে পরস্পরকে জানিতাম। পরস্পরের শক্তি, গুণ, ও দৌর্ব্বল্য পরস্পরের অবিদিত ছিল না। এই পারস্পরিক জ্ঞানের জন্য আমরা নিয়তই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতাম। পরস্পরের যত্ন ও চেষ্টায় আমরা আমাদের স্বভাবগত দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুণের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

প্রাণের মিলন যাহাকে বলে, সত্যের ও আমার তাহা হইয়াছিল। আমি যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের একান্ত অনুরাগী, সত্য তাহা জানিত। ফলফুল লতা পাতা, বন জঙ্গল পাহাড় আমি যে অতিশয় ভাল বাসি, সত্যের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সত্য কখনও পাহাড় পর্ব্বত দেখে নাই, সুতরাং সে আমার নিকট তাহাদের বর্ণনা শুনিতে যারপর নাই কৌতূহল প্রকাশ করিত। গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশের সময় আমি পশ্চিম বঙ্গে জনক জননীর নিকট অবস্থান করিতাম। সত্যকে ছাড়িয়া সেই কতিপয় মাস অতিবাহিত করা আমার পক্ষে ক্লেশকর হইলেও কেবল একমাত্র স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের লালসাতেই আমি সেখানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। কিন্তু সেখানে যাইয়া পূর্ব্বের মত আর আনন্দলাভ করিতাম না। সেই পাহাড় সেই জঙ্গল, সেই নদী, সেই খাল সমস্তই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু আমার প্রাণের একটা স্থল যেন শূন্য পড়িয়া থাকিত; কিছুতেই আর তাহা পূর্ণ হইত না। তখন আমার বড় কষ্ট হইত; তখন ভাবিতাম, সত্য যদি নিকটে থাকিত, তাহা হইলে আজ প্রাণের মধ্যে এই অপূর্ণতা কখনই অনুভব করিতাম না। তখন বুঝিতে লাগিলাম, সত্যের সহিত কোন সৌন্দর্য্য উপভোগ না করিলে, তাহার আর মাধুর্য্য থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্য সত্যকে আমি অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্বেও, সত্য একবারও আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার এই অসামর্থ্যের কতিপয় কারণও বিদ্যমান ছিল। সত্য বাল্যকাল হইতেই জনকজননীহীন; সত্যের পিতার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল; তাহার যেরূপ আয় ছিল, তাহাতে একটী পরিবারের সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কলেজের ছুটী হইলেই, সত্য আপনার বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতে যাইত। প্রধানতঃ এই কারণেই, (অর্থাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিয়া কেবল একমাত্র ভ্রমণজনিত আনন্দ সম্ভোগের জন্য,) আমি তাহাকে পশ্চিমবঙ্গে যাইতে বড় একটা অনুরোধ করিতাম না। আর একটী কারণেও, সত্য কলেজের অবকাশের সময় অন্য কোথাও যাইতে পারিত না। সত্যেন্দ্রের এক পিতৃস্বসা ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। সত্যের মরুময় জীবনে করুণাময়ী পিতৃস্বসাই স্বর্গীয় স্নেহের একমাত্র নিস্যন্দিনী ছিলেন। তাঁহার পবিত্র স্নেহসিঞ্চনে সত্যের শোক-

সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইত। সুতরাং কলেজের অবকাশ হইলেই, সত্য পিতৃষসার নিকট উপস্থিত হইবার জন্ত ব্যাকুল হইত। এই কারণেও, আমি সত্যকে পশ্চিমবঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়া তাহার সুখের এই সামান্ত পরিমাণের আর হ্রাস করিতে চাহিতাম না। সত্য পৈত্রিক আবাসে বিষয়-কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিবৎসর গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে পিতৃষসার গৃহে গমন করিত। সেই গ্রামে তাহার পিতার জনৈক বন্ধুও বাস করিতেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নীও সত্যকে যার পর নাই স্নেহ করিতেন। একবার পূজাবকাশের সময়, আমি সত্যের ও তাহার পিতৃষসার সবিশেষ অনুরোধ-ক্রমে সত্যের সহিত সেখানে গমন করিয়াছিলাম। সত্যের পিতৃবন্ধু হরনাথ বাবুর সহিতও সেই উপলক্ষে আমি পরিচিত হই। তিনি অতিশয় মহাশয় ব্যক্তি। তিনি ধনশালী, শিক্ষিত ও উদারচরিত্র। তাঁহার একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর কোনও সন্তান ছিল না। কন্যাটির নাম সুরমা। তখন তাহার বয়ঃক্রম দশ বা একাদশ বর্ষ ছিল। কন্যার তখনও বিবাহ হয় নাই। হরনাথ বাবু এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কন্যার প্রতি অত্যধিক স্নেহই তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্পের প্রধান কারণ ছিল। বিবাহ হইলে, কন্যা পরের হইবে এবং পরগৃহে যাইবে, এই চিন্তায় হরনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী কন্যার বিবাহ আরও দুই এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কন্যার উপযুক্ত পাত্র স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন; সুতরাং কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহারা একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলেন। কন্যার এই নির্ব্বাচিত পাত্র আর কেহই নহেন—আমার বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ।

হরনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর এই সঙ্কল্পের কথা সত্য ও সত্যের পিতৃষসা ব্যতীত আর কেহ জানিতেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমি সত্যের নিকটে যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম, সুরমা তাহা জানিত না। পিতামাতা সুরমার বিবাহের কথা তাহার সমক্ষে কখনও উত্থাপিত করিতেন না। আর সুরমাকে যেরূপ সরলা ও পবিত্র স্বভাবা দেখিলাম, তাহাতে তাহার মনে বিবাহের চিন্তা কখনও যে উদিত হইয়াছে, তাহা বোধ হইল না। আমরা হরনাথ বাবুর বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে কেহ নাই। হরনাথ বাবু কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন, এই মনে করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম, বহির্ব্বাটীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে একটী সুন্দরী বালিকা এক শেফা-

লিকা বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া একমনে পুষ্পসংগ্রহ করিতেছে। সত্য তাহাকে দেখিবামাত্র ডাকিল "সুরমা"। সুরমা চকিতার ন্যায় একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া সত্যকে দেখিবামাত্র আনন্দধ্বনি করিতে করিতে তাহার দিকে বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমাকে দেখিয়া সহসা স্থির হইল এবং "সতু দাদা, যেও না; বাবাকে ডেকে আনি" এই বলিয়া ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই, হরনাথ বাবু বহির্বাটীতে আসিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হস্ত অবলম্বন করিয়া আনন্দ ও উল্লাসের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি সুরমাও আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য হরনাথ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে এবং তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছে, ইত্যবসরে সুরমা সত্যের হাত টানিয়া আব্দারের স্বরে বলিতে লাগিল "সতুদাদা, বাড়ীর ভেতর একবার এস না, মা তোমায় ডাক্‌চেন।" কন্যার আগ্রহ দেখিয়া হরনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন "সতু, সুরমার জিদ্ দেখ্‌ছ না, আগে তুমি বাড়ীর ভিতর থেকেই হ'য়ে এস; আমি ততক্ষণ দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই।" এই বলিয়া, তিনি আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন।

সুরমাকে এই প্রথম দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধে আমার মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি এই ঘটনাটি একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিলাম। সত্য সুরমার সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিল। সুরমা সত্যকে কখন কখন পত্রও লিখিত। সেই পত্রগুলিও আমি দেখিয়াছিলাম। বন্ধুর বর্ণনে ও সেই পত্রগুলিতে আমি সুরমার সরল পবিত্র-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং মনে মনে তাহার একটী চিত্রও আঁকিয়া লইয়াছিলাম। এক্ষণে স্বচক্ষে সুরমাকে দেখিয়া বুঝিলাম, আমার কাল্পনিক চিত্র জীবন্ত চিত্রেরই অনুরূপ বটে।

হরনাথ বাবুর সহিত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়ে সত্য সুরমার সহিত অন্তঃপুর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরনাথ বাবু সত্যকে দেখিয়া বলিলেন "সতু, তুমি সুরোকে যে বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তা ও কতদূর পড়েছে, দেখ্‌লে?" সুরমা পিতার কথা শুনিয়াই বলিয়া উঠিল "আমি বইখানি আগাগোড়া পড়েছি। মাকে আমি সীতা সাবিত্রীর কথা অনেকবার পড়ে শুনিয়েছি।" এই বলিয়া সুরমা তদ্দণ্ডেই অন্তঃপুর হইতে তাহার উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকখানি আনিয়া উপস্থিত

করিল। বালিকা আসিয়াই স্ফূর্ত্তির সহিত বলিতে লাগিল "এতগুলি গল্পের মধ্যে সীতা ও সাবিত্রীর গল্পই আমার বড় ভাল লেগেছে। মা বল্‌ছিলেন, যমকে কেউ বশীভূত কর্‌তে পারে না; কিন্তু সাবিত্রী খুব ভালমেয়ে ছিল্ বলেই, যম তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। হাঁ সতুদাদা, সাবিত্রী কি খুবই ভাল মেয়ে ছিল? আচ্ছা, ভাল মেয়ে কেমন ক'রে হ'তে হয়, কই বইয়ে তো তা লেখা নাই?" বালিকার আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা দেখিয়া সকলেই বড় আনন্দিত হইলাম। আমি ভাবিলাম, সুরমা যদি কখনও আমার বন্ধুর জীবনের সঙ্গিনী হয়, তাহা হইলে, তাহারা উভয়েই যথার্থতঃ সুখী হইবে। (ক্রমশঃ)

প্রতিবাদ।

দাসীর ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছেন। আমরা অতীব আগ্রহের সহিত এই প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম। কিন্তু উহাতে এমন কয়েকটী কথা দেখিলাম, যাহা আমাদিগের নিকট অত্যন্ত আপত্তিজনক বলিয়া বোধ হইল। আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও কার্য্যগত যে যে প্রভেদ আছে, তাহা অনেকেই জানেন। আদি সমাজ যে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে "হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণাকার" মনে করেন, তাঁহারা যে "সমাজ সংস্কার স্বেচ্ছাধীন" বলেন, আর "হিন্দুধর্ম্মের সকলই থাকিতে পারে, কেবল পরিমিত দেবতার পরিবর্ত্তে অপরিমিত দেবতা আসিবেন" এইরূপই যে তাঁহাদিগের মনোভাব, তাহাও আমরা অবগত আছি। সুতরাং সে সকল মতদ্বৈধ সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ করিয়া কোনও ফল দেখা যায় না। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে মাননীয় বসু মহাশয় এমন দুই চারিটী কথা বলিয়াছেন, যাহা কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। তজ্জন্যই আমরা নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে সেই কথাগুলির প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। বসু মহাশয় বয়সে আমাদিগের পিতৃতুল্য, জ্ঞানে গুরুতুল্য এবং ধর্ম্মে আচার্য্য তুল্য। তাঁহার কথার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে যাওয়া আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা ও অনধিকার চর্চ্চা সন্দেহ নাই। তথাপি যে কেন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে

সাহস করিতেছি, ভরসা করি, ভক্তিভাজন বসু মহাশয় এবং সহৃদয় পাঠক-মণ্ডলী তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

উক্ত প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত হইয়াছে, ' মহর্ষির মত এই যে, দেশী প্রথা যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া পৌত্তলিক আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি ব্রাহ্মদিগের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত; সামাজিক সংস্কার করা আর না করা তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। এই প্রকারে তিনি সমাজসংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারের পার্থক্য ব্রাহ্মসমাজে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আমার মতে এই প্রকার পার্থক্য রক্ষা করাই উচিত।" এ পর্য্যন্তও আমাদিগের বলিবার কিছু নাই। কেন না মহর্ষির মত কি, তাহা বসু মহাশয় যেমন জানেন, আমাদের ততদূর জানিবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু, তাঁহার নিজের মত সম্বন্ধেইবা আমাদিগের বলিবার কি আছে? কিন্তু ইহার পরের কথা অতি গুরুতর। তাহা এই "যে ব্রাহ্ম গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে কখনই ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না; কিন্তু যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া যিনি ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাকেও ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না। যেহেতু ব্রাহ্ম শব্দে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা পরব্রহ্মের উপাসক বুঝায়; অতএব যে ব্রাহ্ম হিন্দুভাব-সম্পন্ন নহেন, তাঁহাকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যায় না, তিনি Theist।"

বিচারের সুবিধার জন্য আমরা এই কথাগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইব।

(১) "যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ হিন্দু-ধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া যিনি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাকেও ব্রাহ্ম বলা যায় না।"

'ব্রাহ্ম' নামের এই সংকীর্ণ ও বিষম অর্থ আমরা এই প্রথম শুনিলাম। হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, যিনি তাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহেন, তিনি ব্রাহ্ম নহেন! লেখক মহাশয়ই তো অন্য স্থানে বলিয়াছেন, "যাহা সত্য, তাহা সকল স্থানে ও সকল সময়েই সত্য, সেই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বের ধর্ম্ম।" তবে কি বিশ্ববাসী ব্রাহ্ম মাত্রকেই "হিন্দুধর্ম্মের

যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে” তাহা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার করিতে হইবে? তৎপর, “হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে,” এই “যাহা কিছু” কাহাকে বলেন? এ বিষয়ে তো সর্ব্বদাই মতভেদ দেখা যাইতেছে। আপনি যাহা রক্ষা করা যাইতে পারে ভাবিতেছেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো তাহাই বর্জ্জনীয় মনে করিতেছেন। মহর্ষি বলেন, পৌত্তলিকতা ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মের সকলই থাকিতে পারে; অথচ সমুদ্র-গমন, যবনান্ন গ্রহণ, শূদ্রাদির বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের একান্ত বিরোধী আচরণগুলি তো তাঁহারই পরিবারে ও শিষ্যমণ্ডলীতে সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক; যিনি ঈশ্বর-বোধে কোন প্রকার পরিমিত পদার্থের উপাসনা করেন না; ঈশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই যাঁহার জীবনের ব্রত; সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় মানবের প্রতি যিনি উদার ভ্রাতৃভাবসম্পন্ন; যিনি যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের বিশুদ্ধ সাধনায় নিযুক্ত আছেন; তিনি যদি “হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারে” ইচ্ছুক নহেন, তবে তিনিও ব্রাহ্ম নহেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ তাঁহার একটী আধুনিক উপদেশে বলিয়াছেন, “আমরা আদি ব্রাহ্ম, সাধারণ ব্রাহ্ম, মন্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্ম বা অন্য কোনরূপ ব্রাহ্ম—এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিস্মৃত হইয়া আমরা ব্রাহ্ম, এক ঈশ্বরের উপাসক, এক পিতার পুত্র, মনুষ্য আমাদের ভ্রাতা, এই মহৎ ভাবটীর উপর আত্মার সমস্ত ঝোঁক সমর্পণ কর।” মহর্ষির এই উক্তিতে কেমন উদার ও বিশ্বজনীন ভাব প্রকাশ পাইতেছে! কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ বসু মহাশয় তাঁহার সংকীর্ণ হিন্দু-গণ্ডীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, তোমরা পৌত্তলিকতাদি পরিত্যাগ করিলেও, হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, যদি তাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক না হও, তবে তোমরা ব্রাহ্মই নহ। কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বসু মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও গুরুতর—

(২) “যেহেতু ব্রাহ্ম শব্দে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা, পর-ব্রহ্মের উপাসক বুঝায়। অতএব যে ব্রাহ্ম হিন্দুভাব সম্পন্ন নহেন, তাঁহাকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না, তিনি Theist.”

এ অতি ভয়ানক কথা! “হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা”র অর্থ কি?

আমরা তো উহার সহজ অর্থ এইরূপ বুঝি যে, হিন্দুজাতি যে বহু দেবতায় বিশ্বাসী, পরব্রহ্ম সেই সকল দেবতার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। অর্থাৎ হিন্দুদিগের ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা, কালী, দুর্গা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবতা, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতি গৃহ দেবতা, জরাসুরা, শীতলা প্রভৃতি গ্রাম্য-দেবতা এবং প্রেত পিশাচাদি অপদেবতা, এইরূপ যে তেত্রিশ কোটী দেবতা আছে, তন্মধ্যে "পরব্রহ্ম" নামে এক দেবতা আছেন, সেই দেবোপাসকদিগকেই ব্রাহ্ম বলে। তাঁহারা যখন হিন্দুর দেবতার উপাসক, তখন ত তাঁহারা "হিন্দুভাবসম্পন্ন" হইতে বাধ্য; অন্যথা তাঁহাদিগকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যাইবে না, তাঁহারা "Theist." এইক্ষণ আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই, হিন্দুরা যে তেত্রিশ কোটী দেবতা মানেন, ব্রাহ্মদিগের উপাস্য "পরব্রহ্ম" কি সেই সকল দেবতার "সর্ব্বপ্রধান দেবতা?" শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মগণও কি হিন্দুদিগের স্বীকৃত কোন একটী দেবতার (অবশ্য সর্ব্বপ্রধান দেবতার) উপাসক মাত্র? বৈষ্ণব প্রভৃতি যেমন নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকেই প্রধান বলেন, অথচ অন্যান্য দেবতাও মানেন, ব্রাহ্মগণও কি সেইরূপ ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রধান "হিন্দু-দেবতা" বলিয়া অন্যান্য দেবতাকে "অপ্রধান দেবতা" বলেন? তাঁহারাও কি কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ন্যায় একজন অগ্রগণ্য ব্রাহ্ম বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মদিগের উপাস্য পরব্রহ্ম কেবল হিন্দুদিগেরই সর্ব্বপ্রধান দেবতা; তিনি মুসলমান, খৃষ্টান বা ইহুদীর কেহ নহেন; কেননা যদি তিনি সকলেরই ঈশ্বর হয়েন, তবে তো আমাদিগকে সকল ধর্ম্মেরই যাহা কিছু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহাই রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার করিতে হইবে। তাহা কি সম্ভব?

হা! এতদিন পরে কি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত আমাদের মত লোকের ব্রহ্মতত্ত্ব লইয়া বিচার করিতে হইবে? সেই অনাদি অনন্ত জগন্নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর যে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা মাত্র নহেন, কিন্তু তিনিই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র দেবতা, এবং মনুষ্য মাত্রেরই "একমেবাদ্বিতীয়ং" উপাস্য, একথা কি আমরা তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট হইতেই শিক্ষা করি নাই? তবে আজি একথা কেন? রাজর্ষি রামমোহন, বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে যে "একমেবা-

দ্বিতীয়ং” সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই মানবের একমাত্র উপাস্য ; তিনি তো কোথাও এমন কথা বলেন নাই যে, হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতাই জগতের উপাস্য। মহর্ষি প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্মবীজেও তো এমন কথার কোনও আভাস পাওয়া যায় না। তদীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে ব্রহ্মের স্বরূপাদি যেরূপ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতেও তো আমরা পরম-ব্রহ্মকে হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমরা গভীর দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, “ব্রহ্মশব্দে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতা পরব্রহ্মের উপাসক বুঝায়” বসু মহাশয়ের এইকথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। এবং “যে ব্রাহ্ম হিন্দুভাব সম্পন্ন নহেন, তাঁহাকে প্রকৃত ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না,” তদীয় এই উক্তির প্রতিও আমরা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে না পারিয়া অতীব মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইলাম। অহিন্দুভাবাপন্ন ব্রাহ্মদিগকে তিনি ব্রাহ্ম না বলিয়া Theist বলিয়াছেন ; উক্ত শব্দের তিনি কি অর্থ করেন জানি না ; আমরা তো ঐ শব্দ ব্রাহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া থাকি।

উক্ত প্রবন্ধে বসু মহাশয় ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, অতঃপর আর তদ্বিষয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি আদি সমাজের সপ্তপদী গমন ও লাজবর্ষণ প্রভৃতি প্রথা সমন্বিত বিবাহকেই ব্রাহ্মবিবাহ বলেন ; ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত বিবাহকে বিবাহই বলেন না। এক সময়ে এই বিষয় লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এইক্ষণ আর তদ্বিষয়ে বাক্যব্যয় না করাই ভাল। আমরা মাননীয় বসু মহাশয়কে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন কায়স্থবংশীয় ব্রাহ্মের কন্যা কোনও ব্রহ্মনিষ্ঠ সুচরিত্র ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত পরিণীতা হইতে অভিলাষিণী হয়েন, উক্ত যুবকও যদি তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিতে অভিলাষ করেন, তবে কি বসু মহাশয় ধর্ম্মতঃ সেই বিবাহের বিরোধী হইতে পারেন ? যদি সেই বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত মনে হয়, তবে উহা (ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিবাহ) আদি সমাজের “ব্রাহ্ম বিবাহ” মতে সম্পন্ন হইলে “হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈধ বিবাহ” হইতে পারে কি ? আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হউন। তিনিতো ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশ্ববাসীর ধর্ম্মই বলিয়াছেন। মনে করুন্ একজন মুসলমান যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ; তাঁহার ইচ্ছা তিনি ভক্তি-ভাজন প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম

বীজে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দীক্ষিত হইবেন; বসু মহাশয় কি তাঁহাকে দীক্ষিত করিতে অসম্মত হইতে পারেন? কদাপি নহে। এখন এইরূপ কোন ব্রাহ্ম-যুবকের বিবাহসময়ে কি আদি সমাজের ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি চলিবে? উহাও কি "হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বৈধ বিবাহ" বলিয়া গণ্য হইবে? তিন আইন যে "ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন" নহে এবং উহার সাহায্য গ্রহণ করা যে সর্ব্বথা সুবিধাজনক নহে, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। তবে যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের জন্য স্বতন্ত্র রাজবিধি না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত পার্থিব বিষয়াদির জন্য উহার সহায়তা গ্রহণ করা হয়, এইমাত্র।

উপসংহারে আমরা পুনরায় ভক্তিভাজন বসু মহাশয়ের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। নিতান্ত কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা তাঁহার সহিত এরূপ অপ্রিয় বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছি। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কুত্রাপি যদি অজ্ঞাতসারেও কোন্ প্রকার অসম্মানসূচক কথা বলিয়া তাঁহার অন্তরে বেদনা দিয়া থাকি, তজ্জন্য যেন তিনি আমাদের অপরাধ গ্রহণ না করেন।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

পুষ্প।

Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here, root and all, in my hand,
Little flower—but *if* I could understand
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is.

—*Tennyson.*

স্নেহভাজনেষু।

তুমি আমাকে ফুলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিষম বিপদে ফেলিয়াছ। কিসে আপনাকে ব্যক্ত করিব ভাবিয়া পাইতেছি না; ফুল যে বুঝাইবার নহে, বুঝিবার—তাহাও সম্পূর্ণরূপে নহে। ক্ষুদ্র ফুল দেখিতে যত ক্ষুদ্র দেখায়, বুঝিতে গেলে তাহা অনন্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ক্ষুদ্র ফুল আয়ত্ত করা যাহা, এই বিশ্বজগতের অসীম রহস্যরাজ্য আয়ত্ত করাও যে তাহাই।

আমরা সচরাচর ফুলে যাহা দেখি, ফুল চিরকাল তদপেক্ষা অধিক দেখাইবার প্রয়াস করিতেছে। সামান্য অভিনিবেশেই তাহা অনুভূত হয়, বেশী দূর যাইতে হয় না, আমরা পদে পদে ফুলকে অসীম এবং অতলস্পর্শ বলিয়া অনুভব করি।

ফুল অসীম এবং অতলস্পর্শ বলিলাম, আরও বলিব—ফুল পৃথিবীতে অতুলনীয়। যদি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে চাও, তবে ফুল বুঝিতে পারিবে না। তুমি, বোধ করি, আধুনিক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাসের কবিতা পড়িয়াছ। এই কবির উলঙ্গ এবং উন্মাদময় কবিতার মধ্যে, আমি এক জায়গায় একটা অতি গভীর এবং হৃদয়ঙ্গম কথা পাইয়াছি। কবি তাঁহার হৃদয়-রাণী সারদার পূজা করিতে যাইতেছেন। কি দিয়া পূজা করিবেন? পৃথিবীতে দেবীর উপযুক্ত জিনিষ কি আছে? তিনি উদ্বোধনে গাহিতেছেন:—

সারদা হৃদয়রাণি প্রীতির প্রতিমা খানি
এস গো, পূজিব আজ প্রেম ও ফুলে!
তব যোগ্য উপহার জগতে নাহি যে আর,
পৃথিবীর স'বি মাখা মাটি ও ধূলে।

প্রেম ও ফুল! মানব-হৃদয়ের প্রেম, প্রকৃতি-হৃদয়ের ফুল, এ জগতে দেব-পূজার তদপেক্ষা আনন্দিত উপকরণ নাই, আর সমস্ত অপবিত্র, "মাখা মাটী ও ধূলে।" ফুলের সঙ্গে শুধু একটী জিনিষের তুলনা হয়, তাহা অদৃশ্য অস্পৃশ্য এবং রহস্যময়; তাহা এই প্রেম। প্রেমের তুলনীয় ফুল, ফুলের তুলনীয় প্রেম। ফুল সৌন্দর্য্য, প্রেম আকর্ষণ। সৌন্দর্য্যে প্রেম জন্মায়, আবার প্রেমেই সুন্দর করে; প্রেম ও ফুল প্রকারান্তরে অচ্ছেদ্য ভাবে অনুবদ্ধ হইয়া এই জগৎসৃষ্টির অন্তররহস্যে অবস্থান করিতেছে।

প্রাচীন হিন্দুরা ইষ্টদেবতার পূজা করিতেন—উপকরণ ছিল, হৃদয়ের প্রেম এবং অকিঞ্চন পুষ্প চন্দন। সচন্দন জবাপুষ্প এবং প্রীতি-বিচ্ছুরিত শোণিতরাগরক্ত হৃদয়, দুইটিই জগদম্বার প্রিয় এবং এই পৃথিবীর সার। তাঁহারা জানিতেন ফুল হইতে প্রেম পৃথক নহে, একজাতীয়; তাঁহারা দুইটিকে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারিতেন না। সকল দেশে এবং সকল কালেই এই ফুল আদরের, আনন্দের এবং উৎসবের চিহ্ন। প্রেমের অধি-দেবতা যিনি, তাঁহার বিজয়াস্ত্র ফুল; ফুলের বন্ধন জগতে চিরকাল প্রেমের বন্ধন। ফুলের অসীম শক্তি, মানবের যেই উদ্দাম বৈরগতি কঠিন লৌহ-

শৃঙ্খলেও নিয়ন্ত্রিত হয় না, পুষ্পশৃঙ্খল তাহাকে অনায়াসে বিজিত এবং অভিভূত করিয়া ফেলে। এমন অতুলনীয়, অননুভবনীয় ফুল, তুমি তাহারই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছ; সুতরাং বুঝিতে পার পদে পদে আমার দুর্ব্বলা ভাষা এবং চিন্তা ব্যর্থ এবং বিফল হইবার উপক্রম করিতেছে কি না।

ফুলে এক প্রকার মাদকতা আছে, একমাত্র হৃদয়ের দ্বারাই তাহার অনুভব হয়। ফুলকে বুঝিবার পথে ইহাই একমাত্র সহায়, অথবা অন্তরায়। আজ প্রভাতে পুষ্পোদ্যানে বসিয়াছিলাম, চারিদিকে জ্যোতিশ্ছায়ার মত শত শত ফুল ফুটিতেছিল, একমনে তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলাম। কোন ফুল শিশুর অধরে হাসির মত, কোন ফুল অশ্রুসজল দুঃখের মত, কোনটী ভয়ের মত, বিস্ময়ের মত, কোনটী বা রাঙ্গামুখী লজ্জার মত!—আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ব্বাক্ এবং স্পন্দহীন করিয়া ফেলিল। আমার চারিদিকে জাগ্রত প্রাণীসঙ্ঘের উচ্চ-কলরব, এবং পাখীর তীব্রসঙ্গীত; কিন্তু ফুলের বিকাশেও যেন একটা সঙ্গীত আছে; আমার কার্ণে সেই সঙ্গীত আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। তাহা স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্য আমি নিতান্ত কুতূহলের সহিত চিত্তকে অধিকতর সমাহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বোধ হইল বাহিরের কোলাহল ক্রমে ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে; সর্ব্বশেষ আমার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রপথ হইতে জগৎসংসার যেন ছায়ার মত সরিয়া পড়িল এবং এক অননুভূতপূর্ব্ব নিবিড় নিস্তব্ধতায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়পথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি যেন ডুবিতে ডুবিতে এই চির-কল্লোলময় জগৎসমুদ্রের তলভাগে নামিয়া পড়িয়াছি; জগতের এই মৃত্তিকা-ময় আচ্ছাদনটি যেন সহসা অপসৃত হইয়া গিয়াছে, আর আমি তাহার কেন্দ্রদেশে, তাহার হৃদয়মধ্যে চলিয়া আসিয়াছি। সেখানে মানুষের হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত রক্তপ্রবাহের মত একটা প্রবল আনন্দপ্রবাহ! জল-বুদ্বুদের মত প্রতি মুহূর্ত্তে তথা হইতে অসংখ্য ফুল ধরাপৃষ্ঠে ফুটিয়া উঠিতেছে। আমার হৃদয় বাতাসের ন্যায় ফুলের চারিদিকে নাচিতে লাগিল। মধুকরের ন্যায় ফুলের বুকে ঢলিতে লাগিল। গন্ধের ন্যায় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তবু একটী ফুলও ধরিতে পারিলাম না,—একটী ফুলও ভাল করিয়া আয়ত্তীকৃত করিতে পারিলাম না। আমার জ্ঞান ক্ষুদ্র, ফুল অনন্ত। সেই ফুলগুলি এখনো বাগানে ফুটিয়া আছে। আমার সমস্ত জ্ঞান-গরিমা এবং বিফল

গবেষণা যেন তাহাদের চিক্কণ দলগুলির অন্তরালে অন্তরিত করিয়া সুগভীর পরিহাসের সহিত চাহিয়া আছে!

তবু মনে হইতেছে, কি যেন কোথায় পাইয়াছি; তাহাই তোমাকে প্রত্যুত্তরে জানাইবার চেষ্টা করিলাম। কথাগুলি তোমাদের বৈজ্ঞানিক চক্ষে ছায়ার মত প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিও, একভাবে জগতের সমস্তই ছায়া। ধ্যানস্থের নিকট এই চলাচল ভূতগ্রাম বাষ্পের মত অদৃশ্য হইয়া যায়;—শুধু যাহা সনাতন, যাহা ইহার ধর্ম্ম অখণ্ড এবং অমৃত তাহাই ভাসিয়া উঠে। পুষ্পের ভিতরেও যদি কোন অখণ্ড এবং অমৃত ধর্ম্মের সর্ব্বাভিভাবক বন্ধনরজ্জু সঞ্চরিত হইয়া থাকে, তাহার অন্বেষণ করিব। আর ছায়ামাত্রেই যে মিথ্যামূলক ইহা কে বলিল? ছায়াই ত চিরকাল কায়ার অনুমাপক বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে!

পুষ্প সৃষ্টির গুপ্ত আনন্দ—উথলিয়া পড়িতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির এই রহস্যবসনের অন্তরালে যে একটা অতি প্রবল আনন্দপ্রবাহ ইহাকে চিরকাল সঞ্জীবিত এবং সংরক্ষিত করিতেছে, তাহা যেন সে আর লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই—ফুলগুলি হাস্য প্রফুল্ল অধর দলের মত বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই পুষ্প দেখিলেই মনে হয়, এই মৌনময়ী আবেগময়ী প্রকৃতির একটি মৌনময় এবং আবেগময় ইঙ্গিত যেন চিরকাল উদ্যুক্ত এবং উন্মুক্ত হইয়া আছে।

পুষ্প প্রকৃতির মুখ; কেননা পুষ্পেতেই ইহার হৃদয়ের অনবচ্ছিন্ন ছায়া প্রতিভাত হইয়াছে,—প্রকৃতি নিজের জন্য নহে, যেন আর কাহার জন্য বাঁচিয়া আছে। প্রকৃতি সুদূর ভবিষ্যতের অস্পষ্ট কুহেলিলীলায় কাহার সুমহৎ অস্তিত্ব এবং সম্পূর্ণ আদর্শবিম্ব উৎপ্রেক্ষা করিয়া ভূমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; দণ্ডে, দিনে, মাসে, বৎসরে শতাব্দীতে নিজকে সহস্ররূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারি অনুরূপ করিয়া গঠিবার চেষ্টা করিতেছে; নবঋতু সমাগমে নব নব বেশ ধারণ করিয়া হৃদয়গত এক প্রচণ্ড মহাদ্রাবকের তাড়নায়, উত্তেজনায় অনন্ত আকাশে শাঁ শাঁ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে! প্রকৃতির এই প্রবল আত্মনিষ্পেষক, আত্মনিঃসারক এবং আত্মবিনাশক ভাব, তবু প্রকৃতি কেমন শান্ত, স্থির, যেন কোথাও কিছু আয়াস নাই, যেন কোথাও কিছু হয় নাই। আবার, প্রকৃতি কেমন গোপনে অযাচিত ভাবে আসিয়া আমাদের উপকার করে—আমরা ত ক্ষেতে বীজ বপন করিয়া

আসি মাত্র; প্রকৃতি আপনা আপনি আসিয়া ধারাসারের উপর ধারাসার ঢালিয়া আমাদের সেই নিদাঘের শুষ্ক কঠোর ক্ষেত্রগুলিকে সরস করিয়া লীলাতরঙ্গিত হরিৎ সমুদ্রে পরিণত করে; এবং সেই চিরচঞ্চল হরিৎতরঙ্গ-গুলির উপর কালে রাশি রাশি স্বর্ণকণিকা ছড়াইয়া রাখিয়া যায়। প্রকৃতির এই যে সজীব মৌনভাব, এই যে অযাচিত আত্মদান এবং বিপুল আত্মবিস্মরণ ইহা ফুলের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিয়াছে।

ফুল কেন ফোটে, কাহার জন্য ফোটে, কে জানে? নিজকে বিকশিত করা ফুলের যত উদ্দেশ্য, নিজকে প্রকাশিত করা যেন ততটা নহে। ফুলের অসীম ধৈর্য্য। যেখানে লোক নাই, নয়ন নাই, হৃদয় নাই, ফুল সেখানেও ফোটে, জনহীন গহন বিপিনের আঁধার গুহাভ্যন্তরে পত্রান্তরালে লুকাইয়া লুকাইয়া ফুল হাসিতে থাকে। কে জানে ফুলের কেন এত আনন্দ, যে সমভূতি চায় না, প্রশংসা চায় না; শুধু নীরবে,নির্জ্জনে জোনাকির মত আপনার আনন্দালোকে আপনাকে নিমগ্ন এবং অভিভূত করিয়া রাখিতে চায়।

ফুলের ভিতর কত পরিবর্ত্তন! প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র আয়ুঃসীমায় ক্ষুদ্র ফুলের ভিতর কত ভাঙ্গা গড়ার ধূম! ইহারই ভিতর নিজের সবখানির সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে, ইহারই মধ্যে জড়িত কুঞ্চিত দলগুলিকে পূর্ণরূপে উন্মেষিত করিয়া রূপের হাট বসাইতে হইবে; অতিথি অভ্যাগতের যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিতে হইবে, এবং আত্মভাণ্ডারের সমস্ত মধু এবং গন্ধ পর্য্যবসিত করিয়া, শেষে নিজকে সহস্রধা বিভক্ত করিয়া দশদিকে অভিব্যাপ্ত হইতে হইবে, ক্ষুদ্র ফুলের অত কাজ, তাহার ভিতর অত ছুটাছুটি, প্রত্যেক পরমাণুর অত হাঁকাহাঁকি! তবু ফুল যেন নির্ব্বিকার শান্ত, যেন কোথাও কিছু হয় নাই!

আবার ফুলের কেমন মহান্ আত্মোৎসর্গ! ফুল কেন ফোটে? ফুলের ফুটিয়া কি সুখ? অমন গন্ধ, অমন সৌরভ-গৌরবে সজ্জিত হইয়া ফুলের লাভ কি? ফুলের গন্ধ পরের জন্য; ফুলের সৌরভ পরের জন্য, এক কথায় ফুলের সমস্তটা পরের জন্য; সুন্দর ফুল দেখিলে লোকে ছিঁড়িয়া লয়, সুগন্ধি ফুল লোকে নাকের কাছে আনিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাসে শুকাইয়া দেয়; তবু ফুল ফোটে; ফুলের হাসি কমে না। ফুলের অভিমান নাই, বিবাদ নাই। তাই ফুল প্রকৃতির মুখ; স্নেহময়ী, ধৈর্য্যময়ী, অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী প্রকৃতির হৃদয়বিম্ব আমাদিগের সম্মুখে আবিষ্কৃত করিয়াছে।

পুষ্পের সৃষ্টি কেন? মানুষ যাহাকে হিত (utility) বা প্রয়োজন বলে, পুষ্পের সৃষ্টি তেমন কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নহে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়—সাধারণ মনুষ্যের প্রিয়ভূত এই চতুর্ব্বিধ বস্তুবিভাগের কোনটিতেই ফুল বিশেষ গৌরবের সহিত দাঁড়াইতে পারে না। ফুলে মধু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ফুল না থাকিলেও তাহার কোন বিশেষ অভাব ঘটিত না। কারণ মধুকরেরা পত্র হইতেও মধু আহরণ করে। আবার সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভে পূর্ব্বাকাশের রক্তিমাচ্ছটার মত ফুল ফলের হিসাবেও নিষ্প্রয়োজন; অতি ক্ষীণ কোমল দলগুলির দ্বারা ফুলের গর্ভবীজের যে পরিমাণে সংরক্ষণ এবং পরিপোষণ হইয়া থাকে, কঠোর পত্রের দ্বারা তদপেক্ষা বেশী হইতে পারে, বিশেষতঃ ফুলের এই দলগুলির সৌন্দর্য্যে এবং সৌরভে আহূত হইয়া অনেক কীট আসিয়া ফুলে বাসা করিয়া থাকে, এবং তাহাতে ফুলের সমূহ অনিষ্টই হয়।

ফুলের সৃষ্টি শুধু সৌন্দর্য্যের হিসাবেই সার্থক। আবার সৌন্দর্য্যও এই হিতবাদের কাছে টিকিতে পারে না। সৌন্দর্য্য জগতের হিসাবে নিষ্প্রয়োজন; সৌন্দর্য্য শুধু অনন্তের হিসাবেই সার্থক। মানব জগৎকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত চর্ব্ব্যাদি লইয়া আর মানব স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না,—প্রভাতসূর্য্যের সুপ্রোথিত—তরল কিরণের ন্যায় মানবহৃদয় সমস্তের আদিকারণ জিজ্ঞাসায় উৎকলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানবের দৃষ্টি ক্ষীণ সীমাকাঙ্ক্ষী, তাহার দৃষ্টিই তাহার চারিদিকে অনন্ত আকাশের ঘননীলিমার মত একটা অন্ধকার আবরণ ঘনাইয়া তুলিয়াছে। মানব বার বার তাহার ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয়ের (প্রত্যক্ষ এবং তন্মূলক অনুমানের) উপর ভর দিয়া উঠিতেছে, আর হতাশ ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে "প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধি", বলিয়া বিরত হইতেছে। এই ভগ্নাশার এবং অশান্তির ঘোর দুর্দ্দিনে সৌন্দর্য্যই মানবের একমাত্র আশার এবং বিশ্বাসের অবলম্বন, সৌন্দর্য্য আপনার জগদতীত কৌলীন্য-মর্য্যাদায় মানব-হৃদয়ে-সুন্দরতার আশীর্ব্বাদ আনিয়াছে এবং এক মঙ্গলময় আদিকারণের উদার অমৃতমধুর অস্তিত্বাশ্বাসে মানবের কল্পনাপথ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং সৌন্দর্য্য প্রয়োজনের হিসাবে হীনপ্রভ হইলেও ভাবতঃ এই জগতের একান্ত সন্তর্পণ এবং আশ্রয়, সৌন্দর্য্যে বাস্তবিক প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ের ভাবই অধিক।

পুষ্পের সমস্তই সৌন্দর্য্য। প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য পুষ্পে সংক্ষেপিত

হইয়াছে, এবং এই সৌন্দর্য্যই ফুলের সার্থকতা, সুতরাং পুষ্পেও প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ের ভাগ অধিক। পুষ্প মানবের নয়নে সৌন্দর্য্য প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে, মানবের নিকট একটা অসীম সৌন্দর্য্যগৌরবের এবং পরম্পরার আভাস আনিয়াছে; এবং প্রভাতের শুকতারার মত চিরকাল এই ইহপারের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে পরপারের জ্যোতির্বার্ত্তায় আশ্বস্ত করিয়া রাখিতেছে।

পুষ্প-সৌন্দর্য্যের দুইটা দিক আছে,—সুগন্ধ ও বর্ণসৌষ্ঠব। ঐ দুয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ করা সুকঠিন। অতল সমুদ্র এবং অসীম আকাশের ন্যায় দুইটির ভিতরে এমন একটা ভাবময় অনন্তের আভাস বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাতে মানবের ধারণাশক্তি খানিক দূর উঠিয়াই আবার নিজের ক্ষুদ্র নীড়টির ভিতর ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। সাধারণ লোকেরা গন্ধহীন পুষ্পকে ভাল বাসে না। নির্গন্ধ কুসুমের সহিত গুণহীন লোকের উপমা দেয়; কেহ একটা গন্ধহীন ফুল হাতে লইলে তাহার উপর আক্রমণ করিতেও ছাড়ে না। আপনাপন রুচির উৎকর্ষ বিষয়ে ইহাদের যতই দৃঢ়বিশ্বাস থাকুক না কেন, উক্তরূপ ব্যবহার নিঃসন্দেহ রুচির স্বল্পায়তনতার পরিচায়ক। মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষীণ, বিবেকহীন এবং স্বল্পারাম: দৃষ্টি বিকলনপটু এবং অনন্তপ্রসারিণী। প্রকৃতি তাহার অপরিসীম সৌন্দর্য্য রাজ্য লইয়া চিরকাল ইহার সম্মুখে উদ্যত হইয়া আছে। তাই ইহার তৃষ্ণা সহজে মিটে না, ঘ্রাণে জড়োপকরণের আধিক্য, সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি শ্রেষ্ঠতর এবং অপেক্ষাকৃত স্বার্থাবেশশূন্য। কোনও ইতর প্রাণীর এই বর্ণোপভোগের ক্ষমতা আছে কিনা সন্দেহ, ইহা মানুষেরই একমাত্র সৌভাগ্যের এবং গৌরবের সম্পত্তি। এই স্বার্থহীন সৌন্দর্য্যলিপ্সা পৃথিবীতে স্বর্গের বাতাস আনিয়াছে এবং মানবকে মানবাতীত জগতের মধুর আশায় বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা অনেক পরিমাণে শিক্ষা ও অনুশীলনসাপেক্ষ এবং ঘ্রাণশক্তির মত ততটা সহজাত নহে। অতএব মানবের মধ্যেও এমন ভাগ্যবান অতি বিরল, যিনি আত্মদৃষ্টির সমস্ত সংস্কারদৈন্য এবং মৌলিক অপচ্ছায়া অপসারিত করিয়া এক উদার স্বভাব বিশদদৃষ্টি বিশ্বজগতের এই বর্ণসৌন্দর্য্যময়ী ছবিখানির উপর রাখিতে পারেন; এবং ইহার প্রত্যেক স্নায়ুতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নিজ হৃদয়কে বীণাতন্ত্রের মত তরল কম্পনে নর্ত্তিত করিয়া তুলিতে পারেন।

ফলতঃ, সৌরভপার্থক্যে পুষ্পের প্রতি সমাদরের তারতম্য হইবে কেন? বৈর্য্য বিবেচনা করিতে গেলেও ঘ্রাণ অপেক্ষা বর্ণ অনেক উচ্চ। ফুল সুন্দর; 'সুন্দর' কথাটী এমন সূক্ষ্ম এবং নিটোল ভাবে জগতের অন্য কোনও জিনিসের সম্পর্কে খাটে না। মানুষের রূপজ্ঞানে নাকি দেশভেদ এবং জাতিভেদ প্রথা একান্ত প্রবল, কোন জাতির লোক ক্ষুদ্র চোক, ক্ষুদ্র নাসিকা ভাল বাসে, কোন দেশের লোক কটা চুল পিঙ্গলাক্ষি ভাল বাসে; আবার, কোন দেশে গলগণ্ডও নাকি সৌন্দর্য্যের বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ আদৃত হয়। কিন্তু ফুল সর্ব্বত্র সুন্দর, সকলের নিকট সমাদৃত। ফুলে দেশকাল, পাত্র ভেদ নাই; রুচি অরুচি নাই; সুসভ্য ইউরোপবাসী হইতে অসভ্য অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সকলেই ফুল গলায় ধরে, মাথায় পরে। ফুলের-বিশ্বব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বতোষকতাও বর্ত্তমান। তাহার কারণ, ফুলের সঙ্গে মানব-হৃদয়ের মূলগত সহানুভূতি আছে; উভয়ের যেন একই উদ্দেশ্য, যেন একই লক্ষ্য, তাই মানব-সমাজ ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে ফুলকে চিনিয়া লইতে পারে।

পুষ্পসৌন্দর্য্যে একটা ভাবময় প্রবাহ আছে। এই প্রবাহ অসীম হইতে অসীমে ছুটিয়া যাইবার এবং আত্মহারা হইবার প্রয়াস। জড়পদার্থ পুষ্প অচেতন, নির্ব্বাক; তবু পুষ্পের দিকে চাহিয়া দেখ, যেন কথা কহিবার উদ্যমে আছে। সুখদুঃখ বিবেকশূন্য পুষ্প, তবু পুষ্পের দিকে চাহিয়া দেখ, যেন এক অবিশ্রাম হাসিতে এবং আনন্দে ডুবিয়া আছে! এক কথায় পুষ্পের ভিতর নিজের জড়ত্ব এবং অচৈতন্য ছাড়াইবার একটা প্রয়াস চৈতন্য চিরকাল বিদ্যমান। আবার, মানুষের অপেক্ষা পুষ্পের হৃদয়প্রবণতা অনেক বেশী: আকাশের সূর্য্যের সঙ্গে, চন্দ্রের সঙ্গে—সমস্ত জগৎ যন্ত্রের সঙ্গে পুষ্প পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ। পুষ্পে পদার্থের দূরাদূরাত্মক নিয়ম বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। পুষ্প আকাশের সুদূর প্রান্ত হইতে অন্ধকারের নিঃশব্দ পদসঞ্চার অনুভব করে, পুষ্প বালসূর্য্যের কোমল করস্পর্শেই আনন্দোচ্ছ্বাসে শিহরিয়া উঠে। পুষ্পের ভিতর দিয়া স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের স্নায়ু-রজ্জু চলিয়া গিয়াছে, পুষ্প স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের বিবাহ দিয়াছে।

পুষ্পের আর একটা বিশেষ গুণ অথবা দোষ এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাল জিনিষের মত পুষ্পের আয়ুষ্কাল অতি স্বল্প। পুষ্প গম্ভীর প্রকৃতি রমণীর মুখে ঈষদ্ স্মিত বিকাশের মত, যৌবন প্রবাহে লীলা এবং ভাবজাত

আবেশ তরঙ্গের মত, মানবহৃদয়ে সাধুচিন্তা এবং পরমার্থ ভাবোন্মেষের মত' ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই অস্থায়িত্বই পুষ্পের বিশেষত্ব এবং অমরতা সূচিত করে। পৃথিবীতে প্রত্যেক ভাল জিনিষের অস্ফুট জীবন এবং অচরিতার্থতা দেখিয়া যেমন আমাদের বিশ্বাস তাহার জন্য পরকালের অনন্তপরিসর রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ করে, পুষ্পের সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। আর এই জন্মমৃত্যুতেও ফুলের একটা রাগিনী, একটা ছন্দ আছে। আবহমানকাল ফুলের এই রাগিনীর এবং এই ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

ফুল ফোটে ঊষায় সন্ধ্যায়
সন্ধ্যায় ঊষায় ত্যজে প্রাণ,
আলো আঁধারের সম্মিলনে
জন্ম মৃত্যু দুইটি মহান!

পুষ্প জড়সৌন্দর্য্যের চরম অভিব্যক্তি। পুষ্প ছায়াতরল অর্থময় যৌন-সৌন্দর্য্যে চিরকাল লালায়িত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্তরঙ্গভাবে প্রাণি-জগতের দিকে অগ্রসর হইয়া আছে। আর এক পা অগ্রসর হইলেই যেন একটা অঘটন ঘটিয়া যায়,—পুষ্পগুলি স্ফুটবাঙ্ময় এবং আনন্দময় প্রাণ-হিল্লোলে মুখর হইয়া উঠে, এবং নিখিল সৃষ্টির প্রেমসৌন্দর্য্য একাধারে সঞ্চরিত এবং সঞ্চিত হইয়া পড়ে!!

শ্রীশঃ।

রামপ্রসাদ সেনের কথা।

বিগত শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখেন বিগত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দাসীতে আমি তাহার প্রতিবাদ করি। প্রবন্ধ-লেখক আমার প্রতিবাদটি পড়িয়া একান্ত কাতর হইয়া পড়েন, তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নিকট একজন সাধু বৈষ্ণবের ন্যায় দৈন্যসুরে পত্র লিখিয়া শরণা-পন্ন হন। কৈলাস বাবু তাঁহাকে সমর্থন করিতে দাঁড়ান নাই, সুতরাং প্রাণপণে লেখনী ধারণ করিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি সমস্তই আমরা পূর্ব্বপ্রতিবাদে ভগ্ন করিয়াছি,

তিনি সেই ভগ্নব্যূহ সাজাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতিবাদে একটিও নূতন যুক্তি দেখিলাম না, খণ্ডন করিব কি? আমাদের নিকট তীক্ষ্ণধার নানারূপ অস্ত্রই আছে, কিন্তু এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে নাতিসূক্ষ্ম একটি বংশদণ্ডই যথেষ্ট। তাঁহার প্রথম যুক্তি বৈদ্যজাতির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভিন্ন প্রাচীন কালে অন্য কোন কবির উদয় হয় নাই। আমরা তাঁহার প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের এই শোচনীয় অভাব লক্ষ্য করিয়া, চৈতন্যপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিজয়গুপ্ত, বৈষ্ণবপ্রভাব সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস, ত্রিলোচন দাস, কবিকর্ণপূর, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, প্রেমবিলাস-রচক নিত্যানন্দ দাস ও পরবর্ত্তী সময়ে লালা জয়-নারায়ণ সেন, রামগতি সেন, আনন্দময়ী গুপ্তা, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি বৈদ্যবংশীয় কবিগণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ইঁহাদিগের পরিচয় পাইয়াও বিনা বাক্য ব্যয়ে সেই অসার যুক্তি আবার উপস্থিত করিয়াছেন, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভিন্ন অন্য কোন বৈদ্য কবি যদি না থাকিতেন, তবেই বা রামপ্রসাদের বৈদ্য হইতে বাধা কি থাকিত, তাহা বুঝা যায় না। রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন "রাজ্য নিল চোরে।" ইহার অর্থ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অর্থশালী ছিলেন ("ধন হেতু মহাকুল" ইত্যাদি পদ দেখুন)। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বৈদ্যজাতি কখনও ধনী ছিলেন না—সুতরাং রাম-প্রসাদ বৈদ্য হইতে পারেন না। এই অসার কথার পৃষ্ঠে আমি রাম-প্রসাদের সমকালবর্ত্তী রাজা রাজবল্লভের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সে সময়ের বহুসংখক বৈদ্য জমীদারের কথা আমরা জানি, প্রয়োজন হইলে তাহা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি এতই সামান্য যে এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত গবেষণার কিছু মাত্র প্রয়োজন দেখিতে পাই না।

রামপ্রসাদ মধ্যে মধ্যে 'দাস' শব্দ ভণিতায় প্রয়োগ করিয়াছেন—ইহাই তাঁহাকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করার একমাত্র যুক্তিবল। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক আমার প্রতিবাদ পড়িয়া স্বীকার করিয়াছেন, "বৈষ্ণবের নিকট শাক্ত প্রসাদ ভক্তি বিনয়ে বড় বেশী ঋণী। ভাষাতেও কম নহে।" অপর স্থলে "রামপ্রসাদ 'দাস' শব্দ কুত্রাপি বিনয় প্রকাশার্থে" ও ব্যবহার করিয়াছেন। কুত্রাপি নহে সর্ব্বত্র। যতবার তাঁহার ভণিতায় 'দাস' শব্দ পাওয়া যায়

ততবার 'দীন হীন' 'দাস দাস' ও ততোধিক বার "দাসীপুত্র" দৃষ্ট হয়; ইহা বিনয় সূচক উক্তি মাত্র। লেখক বলেন "বৈষ্ণবের দাস শব্দ প্রায়শঃ নামের অন্তর্ভূত ছিল—স্বতন্ত্র দাস বলিয়া বৈষ্ণব-কাব্যে নাই বলিলেই হয়" তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রের পল্লব-গ্রাহী মাত্র, পরন্তু অল্প লইয়া বহুভাষী। নরহরি সরকার ঠাকুর, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্ত্তী, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতি বহুবিধ বৈষ্ণব লেখক 'দাস' স্বতন্ত্ররূপে নিজের নামের পশ্চাতে যোজনা করিয়াছেন; রামপ্রসাদও মধ্যে মধ্যে তাহাই করিয়াছেন; প্রবন্ধ লেখকের যাহা একমাত্র যুক্তি তাহা অনুসরণ করিলে তিনি অনায়াসে বহু সংখ্যক প্রাচীন কবির জাতি মারিতে পারেন। এই অসার যুক্তি বারংবার গুঞ্জরণ করিয়া তিনি কর্ণের বধিরতা সম্পাদন করিলেন; ইহা ছাড়া তাঁহার তহবিলে আর কিছু যুক্তিবল আছে কি? শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু "কবিরঞ্জন কাব্য-সংগ্রহ" নামক যে পুস্তক খানা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক বোধ হয় সেই পুস্তক খানা কক্ষতলে লইয়াই দিগ্বিজয় করিতে ইচ্ছা করেন; আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তকেরই দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম চারি পংক্তি দেখিতে অনুরোধ করি; সে স্থলটি এই;—

"রাম রাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদপদে
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া॥"

এখন রামরাম সেনের পুত্র যে রামপ্রসাদ সেন হইবে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কি কি আপত্তি আছে?

এতদ্ব্যতীত "ভিষক, প্রসাদ" ভণিতার পদ আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

বাঙ্গালা ১১৫৭।৫৮ সালে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন; ১২৫০।৫১ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ক্রমাগত দশবৎসর পর্য্যন্ত নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া করিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবন-চরিত সঙ্কলন করেন। এ সম্বন্ধে গুপ্তকবি নিজে এই লিখিয়াছেন, "এ বিষয়ে যতদূর যত্ন করিতে হয়, আমরা তাহার অন্যথা করি নাই বহুকাল পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশঃই যথাবিহিত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান করিয়াছি; কত স্থান ভ্রমণ করিয়া কত লোকের নিকট কতপ্রকার কাতরতা

প্রকাশ করিয়াছি। অধুনা দশ বৎসর পরে বাঞ্ছিত বিষয়ে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইলাম।" রামপ্রসাদের মৃত্যুর ৭০।৮০ বৎসর পরে এই সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হয়; তখন তাঁহার পৌত্র বর্ত্তমান ছিলেন। রামপ্রসাদ একটা অপরিচিত লোক ছিলেন না, দেশশুদ্ধ লোক সাধকপ্রবরের নাম জানিত; এই ৭০।৮০ বৎসর পরে যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় তাহার মধ্যে কায়স্থকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়ার ন্যায় একটা অতি স্থুল ভ্রম প্রচার করা ও তাহা প্রচলিত হওয়া কি স্বাভাবিক? এই সময় আজু গোঁসাইয়ের কতকগুলি প্রতিপক্ষ সূচক গানও সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে একটি যথা—

"এই সংসার রসের কুটি
খাই দাই বাজারে
বসে মজা লুটি,
ওহে সেন! নাহি জ্ঞান বুঝ
তুমি মোটামুটি
ওরে ভাই বন্ধু, দারা সুত
পীড়ে পেতে দেয় দুধের বাটী।"

এই গুলি কি গুপ্তকবির জাল রচনা? যে পর্য্যন্ত সদ্বিবেচক প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এই জালিয়াত প্রমাণ না করিতে পারেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার কাল্পনিক উক্তি গণ্য হইবে না। পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, রাম প্রসাদের মৃত্যু ও তাঁহার চরিতলেখক গুপ্তকবির জন্মের মধ্যে ব্যবধান ৫০ বৎসরের অধিক হইবে না, সুতরাং গুপ্ত কবির লিখিত স্থূল স্থূল কথাগুলি শুধু গ্রাহ্য নহে—প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার অদ্ভুত মত সমর্থন করিতে যাইয়া, তৎবিপক্ষে প্রমাণ গুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন—আজু গোঁসাই কল্পিত ব্যক্তি, গুপ্তকবি মিথ্যা কথার প্রচারক, 'দ্বিজ' শব্দ প্রক্ষিপ্ত, রাম প্রসাদের বংশধরগণ জাল, 'ভিষক' শব্দ প্রক্ষিপ্ত। তীব্রবেগে লেখনী চালাইয়া সব ঝুঁট বলিয়াছেন; কিন্তু যুক্তির রাজ্যে এবম্বিধ নবাবী কায়দা শোভা পায় না; এস্থলে তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। কল্পনার দ্বার অবারিত; লেখকের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করিলেই বা কি হইবে; তিনি তাঁহার বদ্ধ মুষ্টি শিথিল করিবেন না; রাম প্রসাদ নিজে তাঁহার পিতার নাম 'রাম রাম

সেন' বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, লেখক সে স্থল প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারেন।

রামপ্রসাদ ভগ্নী 'অম্বিকা' ভ্রাতা 'নিধিরাম' ও 'বিশ্বনাথ' পিতা 'রাম রাম সেন' প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণের নিকট এখনও সেই বংশাবলী আছে। রাম প্রসাদের প্রপৌত্র গোপাল কৃষ্ণ সেন এখনও বর্ত্তমান। গোপাল কৃষ্ণের পিতা হয়ত রামপ্রসাদকে দেখিয়া থাকিবেন। গোপাল কৃষ্ণ সেনের পুত্র কালীপদ সেন—উড়িষ্যার অন্তর্গত অঙ্গুল নামক স্থানে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহার চারিটী পুত্র ভাবী উন্নতির পরিচয় দিতেছেন। ইহাদের মধ্যে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী।

আমরা এইরূপ প্রবন্ধের ভবিষ্যতে আর কোন প্রতিবাদ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিব না। তরুণবয়স্ক লেখকের কল্পনা জল্পনা দ্বারা রাম প্রসাদ সেনের জাতিচ্যুত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নাই, সুতরাং তাঁহার বংশধরগণ আশ্বস্ত হইয়া নিদ্রা যাউন। প্রবন্ধ-লেখক বাঙ্গলার সুকৃতি সন্তান, যেহেতুক সাধক-প্রবরের টিকি ধরিয়া এরূপ টানা হেঁচড়া করিতে পারিতেছেন।*

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

ঘুঘুর স্বর।

বিশাল প্রান্তর জুড়ি দ্বিপ্রহর দিন!
নিদাঘ রবির ঝাঁঝে অনল খেলায়।
দূর পানে চেয়ে চেয়ে পদতল লীন
পড়ে আছি আধশুয়ে তরুর ছায়ায়।

লাগিতেছে কাণে আসি চারিদিকময়
ঘুঘুর গহনচ্ছন্ন গভীর সঙ্গীত;
কঠোর নিদাঘ শ্রান্ত—হেন মনে লয়
ধরার ধমনী যেন হতেছে স্পন্দিত।—

* এ সম্বন্ধে অতঃপর অপর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। সম্পাদক।

মনে পড়ে কত কথা বিশ বরষের—
এই ছায়া পৃথিবীর ছায়া সুখ দুখ!
একাকার হয়ে গেছে নাহি পাই টের
কুটিল ভ্রূকুটি আর আদর উন্মুখ।

শুধু সবখানি ঘিরে উঠেছে ভাসিয়া
একটী সংক্ষেপ অর্থ গভীর বিশাল—
বাঞ্ছা আর বাঞ্ছিতেরে দু'দিকে ভাগিয়া
একটী নিষ্ঠুর সিন্ধু আছে চিরকাল।

ভাবি আর মাঝে মাঝে শুনি আনমনে
চৌদিকের নিরন্তর সঙ্গীত বিতান;
ডাক আর সাড়া শুধু, না বুঝি কেমনে
হৃদয় যে কেঁপে উঠে, কি নাড়ীর টান?

জনহীন প্রান্তরের দূরান্তর ময়
তলহীন নির্জনতা হৃদয়েতে ভ'রে,
মনোভার শ্রান্ত দেহে, রহস্য নিলয়
এ গীত যে শুনিয়াছে সে বুঝিতে পারে!

সে বুঝে কেমনে এই সুর রশ্মি ধরি
কত জগতের গান পড়ে যে আসিয়া!
সমস্ত শরীর খানি অবসাদে ভরি—
শত যুগন্তের স্মৃতি উঠয় কাঁদিয়া!—

বিশ্বের সীমায় ব'সে দুরান্তরে দূরে
কে যেন করিছে শুধু আকুল আহ্বান
"কোথায় কোথায়" বলি সে রহস্য পুরে
চিরকাল খুঁজিতেছি অধীর পরাণ।

দুইটি ক্রন্দন শুধু, মাঝখানে তার
হইতেছে জড় কোটি শতাব্দীর রাশি,
বাড়িতেছে অশ্রুময় সাগর অপার
দিন দিন; অন্তরে দ্বীপান্তর বাসী—

বসি জনশূন্য মাঠে শুনিতে শুনিতে
প্রাণের আত্মীয় স্বর উদাস মধুর,
মানব জীবন খানি—পারিনু বুঝিতে
একটী অপরিস্ফুট রোদন ঘুঘুর!

এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা।

গতবৎসর এসিয়াটীক সোসাইটির পত্রিকার সাহিত্য এবং ইতিহাসাদি বিষয়ক বিভাগে যতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত শিলিংফোর্ড সাহেবের কুশী নদীর গতিপরিবর্ত্তন-বিষয়ক প্রবন্ধ, এবং পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "বাঙ্গালয় বৌদ্ধধর্ম্ম" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয় প্রবন্ধ সম্বন্ধেই কিছু কিছু বক্তব্য আছে।

(১) শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে দুইটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়াও আবার যখন শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থের কথা প্রসঙ্গে সেই কথারই বিবৃতি করিতেছেন, তখন মনে হয়, এ বিষয়ে তাঁহার যাহা যাহা লিখিবার আছে, এখনও তাহা শেষ হয় নাই*। না হওয়াই ভাল। কারণ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত সুপণ্ডিত এবং অনুসন্ধান-তৎপর ব্যক্তিদিগের নিকট আমাদের অনেক শিখিবার আছে। তিনি যখন সকল কথা বিস্তৃত ভাবে লিখিবেন, তখন হয়ত, এখন যাহা ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, অথবা যাহা অসঙ্গতি দোষপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা পরিস্ফুট এবং নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারিব। কাজেই সন্দেহযুক্ত স্থলের কোন উল্লেখ করা গেল না। তবে একটা অবান্তর বিষয় সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। শাস্ত্রী মহাশয় 'ধর্ম্ম' পূজার একটি মন্ত্র তুলিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূজ্য "ধর্ম্ম" নিশ্চয়ই "বুদ্ধ"। শ্লোকটি এই :—

যস্যান্তো নাদি মধ্যো নচ করচরণং নাস্তি কায়নিদানম্
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্মঝ যস্য (হ জস্য?)
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকল জনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
তত্বং তংচ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতুবঃ শূন্যমূর্ত্তি।

* Journal of the Asiatic Society of Bengal Part I. History, Literature &c. No. 1. 1895.

শ্লোকটি শুধু ব্যাকরণ দোষ-দুষ্ট তাহাই নয়, ইহাতে অনেক শব্দের পর্য্যন্ত অভাব; কারণ চেহারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যাকরণের হিসাবেই হউক আর ছন্দের হিসাবেই হউক, এটা একটা নির্দ্দোষ শ্লোকের ভগ্নাবশেষ মাত্র। যোগীন্দ্র শব্দটা যদি প্রথমা বিভক্তিতে না থাকার সম্ভাবনা দেখান যায় (পরে ঐ শব্দ ৩য়া বিভক্তি যুক্ত দেখান যাইবে), তাহা হইলেই যোগীন্দ্র শব্দের বুদ্ধ বলিয়া যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বজায় থাকে না। তৎপরে আবার শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই ব্যাখ্যা করিবার সময় "পাতুব" স্থলে "চিন্তয়েৎ" লিখিয়া সন্দেহ বাড়াইয়া দিয়াছেন। "চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং" টুকু স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া সাহস করিয়া অন্যত্র যেরূপ পাঠ দেখিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। শ্লোকটি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বে, ৪ঠা জানুয়ারীর এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল;

> যস্যান্তো নাদি মধ্যং নচ করচরণৌ নাস্তিকায়োন নাদঃ
> নাকারো নৈবরূপং নচ ভয় মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য
> যোগীন্দ্রৈর্ধ্যান গম্যং সকল জনময়ং সর্ব্বলোকৈক নাথং
> ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং।

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহিত এইটি মিলাইয়া পড়িলে এই শ্লোকটিকেই খাঁটি বলিয়া মনে হয়। এ পাঠ স্বীকার করিলে ত এ শ্লোক আর বুদ্ধের ধ্যান বলিয়া মনে হয় না। "শূন্য" কথাটা বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ প্রবল; তাহা মানি। কিন্তু স্বয়ং "বুদ্ধ" যে অতীন্দ্রিয় এবং নিরবয়ব, এরূপ তো কোথাও দেখি নাই। হয়ত থাকিতেও পারে; সে বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় যত জানেন, আমরা তাহা জানিতে পারি, সম্ভবপর নহে। দেখাইয়া দিলে শিক্ষালাভ করিয়া উপকৃত হইব। শাস্ত্রী মহাশয় আমার গুরুস্থানীয়; আমি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে বসি নাই। তবে এতৎ প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে সেটা বলিয়া ফেলি। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে "যিনি অশেষ, যাঁহার আদি মধ্য নাই, যাঁহার হস্ত নাই পদ নাই এবং দেহের বীজ পর্য্যন্তও নাই, যাঁহার কোন প্রকার আকৃতি বা রূপ নাই, এবং যিনি জন্মাদি শূন্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—তাঁহাকে আবার কি প্রকারে ধ্যান করা সম্ভব? প্রতিমা ধ্যান পরাভূত করিয়া, অতীন্দ্রিয় শক্তির ধ্যান প্রবর্ত্তন করিবার এই প্রকার চেষ্টা অতি বিড়ম্বনার বিষয়।" এটা যদি

বিড়ম্বনা হয়, তবে বিড়ম্বনার ভাগী এই শ্লোক-রচয়িতা একা নহেন ; উপনিষদের ঋষিগণও ইহার অংশীদার। অথবা সেই ঋষিগণই বিশেষরূপে, এই প্রকার নিরবয়ব অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মধ্যানের জন্য দায়ী। আমার কিন্তু মনে হয় যে নিরাকারের ধ্যান যত সুহজ, সাকার ধ্যান তত নহে। চক্ষু বুঁজিয়া বা চক্ষু চাহিয়া একটি মানুষ বা একটি বস্তু কতক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যানের বিষয়ীভূত রাখা যায় ? পারিপার্শ্বিক অন্য মনুষ্য বা অন্য পদার্থের প্রতি মনোযোগ না দিলে এ প্রকার চেষ্টায় মানসিক বিকার উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু অন্যদিকে আবার, মানুষ যখন গুণের কথা ভাবে, স্নেহ প্রেমের কথা চিন্তা করে, তখন তাহার চিন্তা বা ধ্যান বিশেষরূপে একনিষ্ঠ হইতে পারে। কবির কাব্য, প্রণয়ীর প্রেম পত্রিকা, প্রভৃতি ইহার সাক্ষী এবং উদাহরণ। চক্ষু বুঁজিয়া হউক বা চক্ষু চাহিয়া হউক মাতার শরীরাবয়ব কতক্ষণ চিন্তার বিষয়ীভূত রাখিতে পারা যায় ? আর যদি মাতারস্নেহ প্রেমের কথা আলোচনা করা যায়, তবে কত দীর্ঘ সময় যে সেই ধ্যানে কাটিয়া যায় তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে অধিক তর্ক করিবার আমার কিছুই নাই ; বিশেষ এটুকু শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের অবান্তর বিষয়। কথা এই উদ্ধৃত ধ্যানের উদ্দিষ্ট পুরুষ বুদ্ধ না হিন্দু জাতির প্রাচীন উপনিষদের সেই পুরাতন ব্রহ্ম ?

(২) প্রায় ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন C. S. (ইনি এক্ষণে পুরীর মাজিষ্ট্রেট্ কলেক্টর) একটি দীর্ঘ সরকারী রিপোর্টে গঙ্গানদীর গতি-পরিবর্ত্তনাদি অতি যোগ্যতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই রিপোর্টে যে সকল কথা পড়িয়াছিলাম শিলিংফোর্ড সাহেবের প্রবন্ধ পড়িয়া তাহার অনেক কথা বদ্ধমূল হইতে চলিল। প্রাচীনকালে, কুশী নাকি একবার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া সমৃদ্ধিশালী গৌড়নগরীকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া হতশ্রী করিয়াছিল ; এবারে আবার তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া দেশের আর একটা অমঙ্গল নাকি সাধন করিবে। গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের রাজধানী কলিকাতা নাকি উচ্ছন্ন যাইবে ; এত বড় বড় বাড়ী ঘর, এমারৎ, স্মৃতিস্তম্ভ, কীর্ত্তিস্তম্ভ সকলই নাকি হয়ত অতল জলে ডুবিবে ; আর না হয়ত গৌড়েরমত ব্যাধি মন্দিরে পরিণত হইয়া শবরাশি পরিব্যাপ্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইবে। একথার সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাক্তার সীমসন সাহেবের ভবিষ্যৎবাণীও স্মরণ করিয়া ভাবিতে বসিব

কি ? যে আমাদের এত সাধের, এত অহঙ্কারের সহর কলিকাতার ধ্বংসের আর বড় অধিক বিলম্ব নাই ? শিলিংফোর্ড বলেন যে, নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়া এবং নূতন পথে প্রবাহিত হওয়া বড় বহু সময়সাপেক্ষ নহে। প্রমাণ স্থলে তিনি ২০ বৎসরের মধ্যে দুই একটি নদীর ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটীয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালার মাটিতে সোণা ফলে; সে সোণা ফেলিয়া সুধু আঁচলে গ্রন্থি আঁটিয়া বাঙ্গালার লোক কোথা যাইবে ? ডেল্‌টা-ভূমি ও জলপ্রায় দেশ জলীয় বায়ু পরিপূর্ণ এবং রোগময়, তাহা বুঝি কিন্তু মেলেরিয়ার প্রকোপ যতই বাড়ুক নদীর অস্থিরতায় এবং দৌরাত্ম্যে দেশের সহর গ্রামাদি যতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক, এমন "মিঠে মাটি" কেহ ছাড়িতে পারিবে না। সহর ধ্বংস হইলেই বা আমাদের ভয় কি ? যদি বাঙ্গালার শস্যক্ষেত্রের প্রতি কমলার দৃষ্টি অচলা থাকে, তবে আমরা হাজার সহর ভাঙ্গিব হাজার সহর গড়িব। খেলা ধূলা লইয়াইত সংসার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

২১ নবেম্বর হইতে ৩০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

১ দামো, ২ বাবুরাম, ৩ রসিকচাঁদ, ৪ ছৈয়দুল্লা, ৫ দেবিয়া, ৬ দুর্গাতারিণী, ৭ স্বর্গ, ৮ নবদুর্গা ও ৯ ফুলমণি।

দামো—আর এ সংসারে নাই। নিত্য ভগবানের নাম যাহার কণ্ঠের আভরণ ছিল, ভগবানের নাম লইতে লইতেই তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইয়াছে। ভগবানের প্রসাদে তাহার আত্মা শান্তিলাভ করুক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দাসাশ্রমের রোগী সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়া পড়িয়াছে। দুটী একটী করিয়া অনেকেই মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করিল। এখন এই দূরদেশে রোগী সহজে আসিতে চায় না। আনিতে গেলেও এক একটী রোগীর জন্যে তাহার সঙ্গীলোকের যাতায়াতের ব্যয়সুদ্ধ প্রায় তিন-গুণ অধিক করিয়া পড়ে। এই সকল কারণে মৃতরোগীদিগের স্থান আর সহজে পূরণ হইতেছে না। এই জন্য দাসাশ্রমের সেবালয় আবার কলিকাতায় লইয়া যাইবার কল্পনা করা হইতেছে কিন্তু সেখানকার খরচ এত বেশী যে লইয়া যাইতে হইলে নিতান্ত দুঃসাহসের উপর ভর করিয়া যাইতে হয়—এই জন্য দাসাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষেরা নানাপ্রকারে ইতস্ততঃ করিতেছেন। ফল পরে জ্ঞাতব্য।

২১ নবেম্বর হইতে ৩০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১ মাস ১০ দিনের আয় ব্যয়।

আয়।

পূর্ব্বমাসের জের ৮৻২॥ মণিঅর্ডার ১৩০৲ মাং বৈকুণ্ঠ বাবু জিনিষপত্র খরিদ বাবত ৬৲ কাপড় বিক্রয় ।৶০ দান ও চাঁদা ২৴০ মোট=১৪৬৷৶২॥

ব্যয়।

সংসারখরচ ৩।৶৫ কর্ম্মচারী বেতন ৬৩।৶১২॥ বাঁকি বেতন শোধ ১৬৲ দাহ খরচ ১॥০ বাড়ী ভাড়া ১৮৲ জিনিষপত্র খরিদ ৬৲ পার্শেল মাস্থল ১৲ মোট=১৪২৸১৭॥

মোট জমা——১৪৬।৶২॥০, মোট খরচ——১৪২৸১৭॥০, হস্তেস্থিত ৩।/৫, গুপ্তদান ১/০, বাবু গোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু ১৲, বাবু বলাই চাঁদ দত্ত ১২ জোড়া বোম্বাই বিছানার চাদর।

কলিকাতা।

(২৫শে নবেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।)

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত দানগুলি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাগণের কল্যাণ করুন।

মাসিক চাঁদা।

বাবু অনাথনাথ দেব, অক্টোবর, নবেম্বর ২৲, বাবু দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, নবেঃ ॥০, বাবু যদুনাথ বরাট C. E. নবেঃ ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ অক্টোবর ও নবেঃ ১৲, নবাব আবদুল শোভান চৌধুরী অক্টোবর ১৲, বাবু নন্দলাল দত্ত জুলাই আগষ্ট সেপ্টেঃ ৩৲, বাবু রামচন্দ্র সরকার ছয়মাসের চাঁদা ১২৲, বাবু হরিধন চট্টোপাধ্যায় নবেঃ।০, এস্, সি, মুখোপাধ্যায় ডিসেঃ।০, এ, বি, চট্টোপাধ্যায় ত্রৈমাসিক ১৲, ৪০। ১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট নবে ॥০, ৬৩। ১ মেছুয়াবাজার রোড সেপ্টেঃ।০, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা অগ্রহায়ণ ॥০, ৪। ২ ছকুখানসামার লেন নবেঃ ॥০, বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ডিসেঃ।০, বাবু তেজচন্দ্র বসু নবেঃ ও ডিসেঃ ১৲, A Lady C/o Babu S. N. Das নবেঃ ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত নবেঃ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর নবেঃ ১৲, বাবু নন্দকুমার দত্ত নবেঃ ১৲, বাবু প্যারীমোহন ভড় নবেঃ।০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র নবেঃ ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস নবেঃ।০, বাবু নন্দলাল দত্ত অক্টোবর নবেঃ ডিসেঃ ৩৲, বাবু যদুনাথ বরাট C. E. ডিসেঃ ১৲, N. B. Bose Esqr. নবেঃ ১৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র নবেঃ।০, ১৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নবেঃ ॥০, নবাব সৈয়দ আবদুল শোভান চৌধুরী নবেঃ ১৲, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল সেপ্টেঃ ১৲ বাবু প্রমথনাথ দাস ডিসেঃ ২৲, বাবু মোহিনীমোহন রায় কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ ৩৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা পৌষ ॥০, বাবু নবীনচাঁদ বড়াল নবেঃ ১৲, বাবু রাধানাথ দেব নবেঃ॥০, বাবু প্রমথনাথ দাস নবেঃ ২৲। মোট ৪৭॥০

এককালীন দান।

বাবু চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মাগুরা ১৲, বাবু বসন্তকুমার বসু ঐ ২৲, বাবু হৃদকমল দাস গুপ্ত ঐ ১৲, বাবু ললিতমোহন পাল ঐ ২৲, মৌলবী আফছুর উদ্দিন খাঁ ঐ ১৲, বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ঐ ১৲, বাবু নৃপেন্দ্রনাথ পাল ঐ ১৲, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস ঐ ১৲, তৃতীয় মুন্সেফ ঐ

১৲ বাবু তারকনাথ মিত্র ঝিনাইদহ ১৲, Joint Magistrate ঐ ১৲, বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲, বাবু কেদারনাথ ঘোষ ঐ ॥০, একটী বন্ধু ঐ ॥০, বাবু গতিনাথ সরদার ঐ ।০, বাবু গতিনাথ মৈত্র ঐ ১৲, দুটি বন্ধু ঐ ৸০, কয়েকটি বন্ধু ঐ ২।০ মুন্সেফির আমলা-বর্গ ঐ ১৲, বাবু সর্ব্বেশ্বর মজুমদার ঐ ১৲, বাবু তারিণীচরণ মৌলীক ঐ ১৲, বাবু কেদার-নাথ বক্সী ঐ ১৲, বাবু পূর্ণচন্দ্র দে চৌধুরী রাণাঘাট ১৲ বাবু ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দে চৌধুরী ঐ বাবু কুঞ্জবিহারী সাহা শান্তিপুর ১৲, বাবু মনোহর পাল শাং ১৲, বাবু রামদুর্লভ খাঁ শাং ১৲, কয়েকটি ভদ্রলোক শাং ১৸৶০ বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র রায় শাং ১৲ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ শাং ১৲ বাবু শশীভূষণ রায় শাং ॥০, বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় শাং ১৲, বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় শাং ২৲, মুসলমান সম্প্রদায় শাং ৪৲, ক্ষুদ্র সংগ্রহ শাং ১৶৫, বাবু বিশ্বের দাস শাং ১৲, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র বিশ্বাস শাং ॥০, দুটি ভদ্রলোক শাং ১৲, মুন্সী মহম্মদ কাদের গোবিন্দপুর ১৲, ইংরাজী স্কুল শান্তিপুর ১৲, জনৈক বন্ধু ১৲, N. Chororia আজিমগঞ্জ ৩৲, বাবু যোগেন্দ্র-চন্দ্র গুহ খাসনবীশ ১৲, বাবু যোগেশচন্দ্র সেন ।০ বাবু রাধানাথ দেব ৶০, ডাক্তার অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত ১৲, বাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ৫৲, বাবু বলাইচাঁদ দত্ত, বি, এল ৫৲, বাবু নিমাইচরণ সেন ॥০, বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲, L. V. Mitra ৶০ বাবু মহেন্দ্র-নাথ শেঠ ১৲ বাবু ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ।০, ৮।১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন ৸৶১০ মুন্সী আবদুল রহিম, C. E. ১৲, ডাক্তার চুনীলাল বসু ১৲, ১২৬ ওল্ড বৈঠকখানা ।০, A friend of 50 Old Baithak Khana ।/০, জনৈক হিতৈষী ১৲, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৫৲, বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি বেড়া ১৲, বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেড়া ১৲, ইস্মাইল উদ্দিন মিঞা বেড়া ১৲, বাবু কেদারনাথ পোদ্দার বেড়া ।০, বাবু বনমালী সাহা বেড়া ।০, বাবু জলধর উপেন্দ্রনারায়ণ সাহা বেড়া ।০, বাবু জানকীনাথ সাহা বেড়া ।০, যুধিষ্ঠিরনারায়ণ সাহা বেড়া ।০, বাবু শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেড়া ১৲, বাবু গুরুচরণ কুণ্ডু বেড়া ।০, নজর হাজি বেড়া ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র দাস বেড়া ১৲, বাবু কেদারনাথ সাহা বেড়া ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র চন্দ বেড়া ।০, বাবু সূর্য্যমল বাবু বেড়া ॥০, বাবু বিশ্বম্ভর শিকদার বেড়া ১৲, বাবু রামচন্দ্র সাহা বেড়া ॥০, বাবু বনয়ারীলাল তরফদার বেড়া ।০, বাবু ষষ্ঠীচরণ সাহা বেড়া ৶০ বাবু ভুতনাথ পাল বেড়া ॥০, বাবু দেবলাল সাহা বেড়া ৶০, বাবু গোপীমোহন দত্ত বেড়া ৶০ বাবু তনু সরদার বেড়া ।০, বাবু জগচ্চন্দ্র দাস বেড়া ॥০, বাবু যদুলাল পাল বেড়া ১৲, দুটি ভদ্রলোক বেড়া ॥০, বাবু কাশিনাথ দত্ত মথুরা ১৲, বাবু শরদিন্দু চক্রবর্ত্তি ৶০ ৬৩ নং হ্যারি-সন্ রোড ।৵ ১০১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ১নং রঘুনাথ চাটুর্জির ষ্ট্রীট ।০, বাবু জানকীনাথ মজুমদার ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৲, ১০০।২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ।/০, ডাক্তার অমূল্যরতন বসাক ১৲, A Debtor ৶০, জনৈক হিতৈষী ২৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী ১৲, বাবু হরলাল রায় ১৲, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ।০, A friend of Dasasram ৫, বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ২৲, ৬৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট ৶০, বাবু রামবিহারী ঘোষ ৫৲, ২১।১ পটুয়াটোলা লেন ।০, ৫০ ওল্ড বৈঠকখানা ।/০, ১২৬ ওল্ড বৈঠকখানা ।০, রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ১০৲, ২৭।১ ঝামাপুকুর লেন ॥০, বাবু মুকুন্দলাল পাল চৌধুরী ১৲, বাবু হেমেন্দ্র

নাথ সিং ২৲, বাবু মহদানন্দ বড়ুয়া ॥০, বাবু দয়ালচন্দ্র ঘোষ ২৲, A sympathiser ৵০, বাবু জ্যোতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তির সংগৃহীত কুকুরিয়া গ্রাম ॥০, মোট ১২০৸৵০

বস্ত্রাদি ও অলঙ্কার বিক্রয়।

বস্ত্র বিক্রয় ৫।৵০,essence of chicken পুস্তক বিক্রয় ।/১৫,গহনা বিক্রয় ৯৸৵০। মোট ২০॥/১৫

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ৭৪॥০, এককালীন দান ১২০৸৵০, নানাবিধ বিক্রয় ২০॥/১৫, পূর্ব্ব মাসের স্থিত ২॥৵০। মোট ১৯১॥/১৫

ব্যয়।

গিরিডিতে পাঠান ব্যয় ১৩১॥০, পাথেয় ৬।১০, সুদ ১৲, আদায়কারীর খরচ ৩৯॥৶১৫, ডাকখরচ ॥৵০, ধারশোধ ৭৲, ঋণ দাসী ৩৲ মুটে ১৵১৫, অন্যান্য ৸৵১০। মোট ১৯১৶১০।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ১৯১॥/১০, মোট ব্যয় ১৯১৶১০। হস্তে স্থিত ।৵৫।

বস্ত্রাদি।

অনাথবন্ধুসমিতি মোটাচাদর ৬ খানা, শ্রীমতি প্রভাবতী দাসী প্যান্টালুন ৩, জ্যাকেট ১, ফ্লেনেলকোট ১, টুপী ৩, গলাবন্ধ ৩।

দাসাশ্রম উঠিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে।

নিম্নলিখিত কারণবশতঃ দাসাশ্রম পুনরায় গিরিডি হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে।

১। আমাদের যে দুইজন কার্য্যকারক গিরিডিতে থাকিয়া আতুরগণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা অনবরতঃ পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণাদি করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। এখানে যখন দাসাশ্রম ছিল তখন আমাদের অনেক সহায় ছিলেন। কতকগুলি যুবক পালা করিয়া রাত্রিজাগরণের সহায়তা করিতেন ও নানাভাবে আমাদের সহায়তা করিতেন। কিন্তু গিরিডিতে আমাদের আদৌ সহায় ছিল না। তজ্জন্য কর্ম্মকারক দুইজন একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছেন।

২। গিরিডিতে কয়েকমাস আদৌ মৎস্য পাওয়া যায় না। তজ্জন্য আতুরগণের এতই আহারের কষ্ট উপস্থিত হয় যে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা আমাদের একেবারে অসাধ্য হইয়া পড়ে।

৩। আশ্রম কলিকাতায় না থাকাতে আমরা দেখিতেছি যে সাধারণের সহানুভূতি ক্রমে অল্প হইয়া আসিতেছে।

৪। আতুরগণকে গিরিডিতে লইয়া যাইতে এত অধিক খরচ পড়ে যে এক এক সময়ে সে জন্য আমাদিগকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

৫। আতুরগণ কলিকাতা হইতে এত দূরদেশে যাইতে অনেক সময়ে অসম্মত হয়। তজ্জন্য আতুর সংখ্যা একেবারে এত অল্প হইয়া পড়িয়াছে যে আতুরগণের খরচের অপেক্ষা সরঞ্জামী খরচ বাড়িয়াছে।

এই সকল কারণে দাসাশ্রম আবার কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতায় আসাতে যদিচ খরচ কিছু বাড়িবে, কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি এখানে আশ্রমের কার্য্যকারিতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ভরসা করি দাসাশ্রমের বন্ধুগণ নূতন বৎসরে নূতন উৎসাহের সহিত আমাদের সহায়তা করিবেন। আশা করি সকলে আতুরগণকে উদ্যোগ করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমরা আবার আমাদের ক্ষমতা অনুসারে রোগীগণের পরিচর্য্যা ও চিকিৎসার সুবিধা করিতেছি। দানশীল মহোদয়গণের দয়ার উপরেই দাসাশ্রমের কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আশ্রম এখন নিম্নলিখিত ঠিকানায় আছে সুতরাং সকল পত্রাদি এই ঠিকানায় লিখিবেন।

৪৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট সিমলা বাজারের নিকট।

ভ্রমসংশোধন।

ডিসেম্বর সংখ্যার "দাসীর" সূচীতে "দুইটী পক্ষী" নামক প্রবন্ধের লেখক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় না হইয়া বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ হইবে।

(২)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫২	২৭	বিবাহ	ব্রাহ্মবিবাহ
৬৫৫	২২	আসিবে না।	আসিবেন।

দাসাশ্রম।

উদ্দেশ্য।—নানাপ্রকারে বিপদগ্রস্ত মানবগণের সাধ্যানুসারে হিত-সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ ইহা অনাথ আতুরদিগকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদিগের ভরণপোষণ ও সেবার বিধান করিয়া থাকে।

সাধারণ বিভাগ।—সেবালয়—ইহা ৪৮নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত।

"দাসী" বিভাগ।—জন-হিতৈষণা প্রবর্ত্তনা ও দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগ হইতে "দাসী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রচরিত হয়। বার্ষিক মূল্য ডাক-মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়।

ডিস্পেন্সারি বিভাগ।—দাসাশ্রমকে ঔষধ সাহায্য করিবার জন্য ও ইহার স্থায়ী এবং পাকা আয়ের সংস্থান করিবার জন্য ইহার এলো-প্যাথিক ডিস্পেন্সারি আছে। ঠিকানা ৮৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

কার্য্যপ্রণালী।—প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত। ভগবানের কৃপার উপর বিশিষ্টরূপে নির্ভরশীল এবং সকলে একমত ও একপ্রাণ হইয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা ও কার্য্যে সেইরূপ চেষ্টা করা হয়।

মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

১৮০৭ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৮০৮ মতিলাল ঘোষ ২৲, ১৭০৯৲, রাধিকাচরণ বন্দোপাধ্যায় ২৲, ১৮১০ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৮১১ শ্রীশকুমার রায় ২৲. ৮৬৬ জীবনধন বসু ২৲, ১৬৬৮ যতীন্দ্রমোহন সেন ২৲, ১৮১২ পূর্ণচন্দ্র সিংহ ১৲, ১৮১৩ নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ২৲, ১৮১৪ বঙ্কুবেহারী দে ১৲, ১৮১৫ ডাক্তার গঙ্গাগোবিন্দ সরকার ২৲, ১৮১৬ গোবিন্দচন্দ্র বসু ২৲, ১৮১৭ মহামায়া দেবী ২৲, ১৭৯৪ মতিলাল আশ (সাবেক) ১৲. ১৬১৪ বরদাকান্ত দত্ত ১৲, ১৮১৮ সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় ২৲, ১৮১৯ সুরগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায় ২৲, ১৮০৬ কালীকৃষ্ণ বাগ্‌চি ২৲, ১৪৭৩ বৈকুণ্ঠনাথ দাস ৪র্থ ২৲, ১৮২০ সুরিয়চন্দ্র বসু ২৲, ১৮২১ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১৮২২ মহেশ-চন্দ্র সেন ২৲, ১৮২৩ দেবেন্দ্রকুমার মিত্র ২৲, ১৮২৫ কুমারবলভদ্র দেব ২৲, ১৫৪৯ অতুলচন্দ্র দত্ত ১৲, ৮৭২ কৈলাশচন্দ্র মজুমদার ১৲, ৯৮৩ ত্রৈলোক্য-মোহন নিয়োগী ১৲, ৯৯৬ কালীমোহন বসু ১৲, ৯৮৪ প্রসন্নচন্দ্র লাহিড়ী ১৲, ৯৮৭ কুঞ্জলাল সাহা ২৲, ১৮২৬ কামিনীকুমার দাসগুপ্ত ২৲, ১৮২৭ রামলাল দাস ২৲, ১৮২৮ তারকনাথ মিত্র ২৲, ১৮২৯ আশুতোষ মল্লিক ২৲, ১৮৩০ গোপালচন্দ্র কর্ম্মকার ২৲, ১৮৩১ Secrytary Students Liberary Ranaghat ২৲, যোগেশচন্দ্র গুহ (সাবেক) ১৲; ১৮৩২ কবিরাজ হরিনাথ বিদ্যারত্ন ২৲, ১৮৩৩ নগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৲, ১৮৩৪ হরিনারায়ন মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৮৩৫ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ২৲, ১৮৩৬ উপেন্দ্রনারায়ণ দে ২৲, ১৮৩৭ চণ্ডীচরণ বসু ২৲, ১৮৩৮ মহিমচন্দ্র ঘোষ ২৲, ১৮৩৯ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ২৲, ১৮৪০ অবিনাশচন্দ্র মিত্র ২৲,

ক্রমশঃ

দাসী

আমাদের অবস্থা।

(১)

ইংরাজ-শাসনে আমাদের এই বঙ্গদেশের লোকের অবস্থার সাধারণতঃ উন্নতি হইয়াছে না অবনতি হইয়াছে? যদি উন্নতি হইয়া থাকে, তবে কাহাদের, ও যদি অবনতি হইয়া থাকে, তাহাই বা কাহাদের? যদি কাহাদের অবনতি হইয়া থাকে, তবে তাহার কোন প্রতিকার আছে কি না? এই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেকে (বিশেষতঃ ইংরাজ সম্পাদক ও ইংরাজ রাজপুরুষ) বলেন, যে দেশের অবস্থার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে। শুনিতে পাই, ভারতে অন্য কোন অধিকারে এরূপ শান্তি স্থাপিত হয় নাই। জীবন ও সম্পত্তি আজ কাল অনেকটা নিরাপদ। রাস্তা ঘাটের আজ কাল খুব সুবিধা। রেল খালে দেশ শীঘ্রই ছাইয়া যাইবে। অন্ততঃ বহির্বাণিজ্যের যে সব অন্তরায় ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের লোপ হইতেছে। জ্ঞানালোকে লোকের চক্ষু ফুটিতেছে। নিজের স্বার্থ তাহারা বুঝিতে পারিতেছে ও সেই সঙ্গে তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সব কথা যে নিতান্ত মিথ্যা নয় তাহা সকল বুদ্ধিমান লোকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ চিত্র কিছু অতিরঞ্জিত। ইহার আর এক দিক আছে; অধিকাংশ ইংরাজ সংবাদপত্র লেখক ও রাজপুরুষ তাহা কিন্তু দেখিতে পান না, কিম্বা দেখিয়াও দেখেন না। দেশে অন্নকষ্ট ত কোন না কোন স্থানে লাগিয়া আছেই। তাহার উপর দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের নানা স্থান অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান অধিকারের সময় এরূপ অন্নকষ্ট ও এরূপ দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর ছিল কি না সে কথা এখানে উঠিতে পারে না। তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যদি পূর্ব্বতন অধিকারের সময় ও ইংরাজ অধিকারের সময় দেশের অবস্থার কোন প্রভেদ না রহিল, তাহা হইলে আর

ইংরাজ রাজের কি গৌরবের কারণ থাকিতে পারে, তাহা সহজে বুঝা যায় না। যে রাজ্যে রাজার ও প্রজার সমান অনটন, যেখানে দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ লাগিয়াই আছে, সেখানে শাসন-প্রণালীতে যে কোন মূলগত দোষ নাই, একথা কোন অসমসাহসিক ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ বলিতে সাহস করেন না। যে রাজ্যে রাজার ও প্রজার অবস্থা এইরূপ সেখানে রাজার বিশেষ গৌরবের কারণ কি আছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শাসন-প্রণালীর কি কি দোষে দেশের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) আমাদের শাসন-প্রণালী বড় ব্যয়সাপেক্ষ। পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় বাঙ্গালার সিভিল কর্ম্মচারিবর্গের ত্রৈমাসিক তালিকা দেখিয়া থাকেন। আজ কাল সহিয়া গিয়াছে কিন্তু ছেলেবেলায় যখন প্রথম ঐ তালিকা দেখি, তখন সাহেব কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানায় বাহার দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিতে হইয়াছিল। হাজার টাকার উপরে কত পদ! ইহার অধিকাংশই সাহেবদের একরূপ একচেটিয়া। তাহাতে দেশীয় লোকের প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বাঙ্গালী ইংরাজের কথা তুলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের এই দরিদ্র দেশের কর্ম্মচারীদের কি পরিমাণে মাহিয়ানা যোগাইতে হয়, তাহার প্রতি পাঠকের মন আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। বাঙ্গালীই হউন আর ইংরেজই হউন এরূপ উচ্চহারে তাঁহাদিগকে মাহিয়ানা দেওয়া দেশের পক্ষে কি বিষম ব্যাপার! এরূপ দানসাগরী ব্যবস্থা এ দেশের পক্ষে নয়। যে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক আধপেটা আহার করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে ২০০০।২৫০০ হাজার টাকার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ৩০০০ হাজার টাকার কমিশনার ও সেক্রেটরি বড় গুরুপাক সামগ্রী। বাহুল্য ভয়ে আর এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা গেল না। (২) সামরিক ব্যয়। সিভিল তালিকা হইতে তাহার আভাস কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না, এবং বাঙ্গালাকে সামরিক ব্যয়ের হিসাবে ভারতগবর্ণমেণ্টকে কত দিতে হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। ভারতগবর্ণমেণ্টের আয়ের যে বৃহৎ অংশ সামরিক বিভাগে ব্যয় হয় তাহা সকলেই জানেন। যুদ্ধ বিগ্রহাদি ত লাগিয়া আছেই। মোটা মাহিয়ানার সেনানী ত রাশি রাশি। এক একজন গোরা সৈনিকের প্রতি খরচাই বা পড়ে কত! সিপাহীই বা কত! ভারত-গবর্ণমেণ্টের সুবৃহৎ সামরিক বিভাগের খরচ ত ভারতবর্ষকেই যোগাইতে হয়।

(৩) ভারতের হিসাবে ইংলণ্ডে খরচ। ভূতপূর্ব্ব সাহেব কর্ম্মচারীদিগের পেন্‌সন, সেক্রেটরি অব্ ষ্টেটের মাহিয়ানা ও আফিসের খরচ, বিলাতে ভারতের জন্য সৈন্য রাখিবার ও তৈয়ার করিবার খরচ, ভারতের জন্য নানা প্রকার আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় মাল পত্রাদি কিনিবার খরচ, প্রভৃতি নানা বাবদে বিলাতে যে বাৎসরিক কত কোটি টাকা পাঠাইতে হয় তাহা অনেকেই জানেন। এই টাকার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেকের অনুমান ক্রমে ক্রমে পাইতে থাকিবে। এই রাশি রাশি টাকার অধিকাংশের পরিবর্ত্তে কিছুই পাওয়া যায় না। যেমন সামরিক বিভাগের সমগ্র ব্যয়ভারের অংশ বঙ্গদেশকে বহন করিতে হয়, সেইরূপ বিলাতে খরচের হিসাবে দেয় টাকার অংশও ইহাকে দিতে হয়।

উপরে খরচের যে তিন বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল তাহার ঔচিত্যানুচিত্যের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই এবং বলিবারও বিশেষ আবশ্যক নাই। এইরূপ ব্যয়বাহুল্য অনেক পরিমাণে পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল। ইংরাজেরা অবশ্য খয়রাৎ করিতে এদেশে আসেন নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করিতে পারেন যে, যদি ভারত অধিকার করিয়া তাঁহাদের স্বজাতির কিছু লাভ না হইল তবে এরূপ অধিকারের আবশ্যকতা কি? তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করেন যে, দেশ শাসন করিতে হইলে অনেক ব্যয় দরকার ও বহুল পরিমাণে ইংরাজকর্ম্মচারী রাখা আবশ্যক। এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক, এবং ইহাতে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহাদের অবস্থায় পড়িলে আমরা যে অন্যরূপ করিতাম, এরূপ ভাবিবার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু ইংরাজ শাসনযন্ত্র নানা প্রকারে ব্যয়সাধ্য হওয়া যে দেশের দুরবস্থার এক প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সহৃদয় ইংরাজেরাও স্বীকার করেন। কোন কোন ইংরাজ রাজস্বতত্ত্ববিৎ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ড ও অন্যান্য সুসভ্যদেশের তুলনায় ভারতবাসীদিগের করভার এত লঘু যে এ সম্বন্ধে কোন অনুযোগ করিতে তাহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি একটী কথা ভুলিয়া যান। এক জন ইংরাজের গড়পড়তা আয়ের অপেক্ষা এক জন ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় যে কত কম তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। আর একটী কথা এখানে মনে রাখা উচিত। ঠিক আয়ের তারতম্য অনুসারে দেয় করের তারতম্য হইলে অল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে করভার অসহনীয় হইয়া উঠে। যে

ব্যক্তির মাসে ৫০৲ টাকা আয় ; মাসে ।৶০ আনা লবণ কর দেওয়া তাহার পক্ষে যেরূপ কষ্টকর, যাহার ৫ টাকা আয় ⁄০ আনা লবণকর দেওয়া তাহার পক্ষে অনেকগুণ অধিকতর কষ্টকর। অধিকাংশস্থলে কিন্তু এইরূপ অনুপাতও দেখা যায় না ; বরং ইহার বিপরীতই দেখা যায়। যাহার ৫০৲ টাকা আয়, সে হয়ত মাসে ১৲ টাকা কর দিতেছে ; আবার যাহার ২০৲ টাকা আয় সে হয়ত মাসে ॥০ আনার কমে কোনপ্রকারেই অব্যাহতি পাইতেছে না।

(২)

দেশের দুরবস্থার যে কয়েকটী কারণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল, তাহাদের প্রতিবিধান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়। উহাদের প্রতিবিধান করিতে কেবল একমাত্র গবর্ণমেণ্টই সক্ষম। এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। অন্য অনেক কথা আছে। দুরবস্থার এমন অনেকগুলি কারণ আছে যাহাদের প্রতিবিধান (নিদান অনেক পরিমাণে) আমাদের সাধ্য। তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশের প্রাচীন ধনী বংশ সমুদয় ক্রমে হীনাবস্থ হইয়া পড়িতেছেন। কতকটা তাহা হইবারই কথা। দেশের অধিকাংশ ধনী লোকের ধন জমীদারী লইয়া। কতকগুলি ধনী লোক আছেন বটে, যাঁহাদের ভূমির সঙ্গে প্রায় কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাদের কথা পরে বলিব। মোটের উপর দেখিতে গেলে জমীদারদের অবস্থার ক্রমিক অবনতি হইতেছে। বিষয়-বিভাগ ইহার এক প্রধান কারণ। ইংলণ্ডের অধিকাংশ জমীদার পুরাতনবংশীয়। তাহার দুইটি প্রধান কারণ আছে। (১) জ্যেষ্ঠাধিকার। অধিকাংশ স্থলে স্থাবরসম্পত্তি জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া আর কেহ পান না। কাজেই জমীদারী বিভক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব। (২) ভূ-সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার অভাব। উহাতে সকলেরই জীবন-স্বত্ব, কাহারও দানবিক্রয়ের ক্ষমতা নাই। আজকাল এই পদ্ধতির যদিও অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই। যদি সম্পত্তির বিভাগ না হইল এবং ইহার হস্তান্তর সহজ না হইল, তাহা হইলে প্রাচীন জমীদার বংশের অবস্থা হীন হওয়া অনেকটা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের দেশে এরূপ হইতে পারে না। তোমার যদি তিনটী পুত্র থাকে তোমার সমস্ত সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে সমান বিভক্ত হইবেক। জ্যেষ্ঠা-

ধিকার কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিবার অক্ষমতার স্বপক্ষে আমি যে কিছু বলিতেছি, এমন যেন কেহ মনে না করেন। প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ঐ দুই প্রকার চলন নাই। কিন্তু ঐ সব দেশের লোকদের উৎসাহ আছে, অধ্যবসায় আছে, শ্রমশীলতা আছে। যদিও ঐ সব দেশের অনেক পুরাতন ধনিবংশ ক্রমে গরীব হইয়া যায় কিন্তু তাহার স্থলে অনেক নূতন ধনিবংশের আবির্ভাব হয়। অনেকেই ধন উপার্জ্জনে তৎপর। অনেকেই বাণিজ্য কৃষিকর্ম্মাদিতে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে। দেশের উন্নতির জন্য মূলধনের আবশ্যক। ঐ সব দেশে আবশ্যকীয় মূলধনের বিশেষ অভাব হইতে পারে না। ইউরোপের উন্নত দেশ সমূহে জমীদারেরা সাধারণতঃ জমীদারীর উন্নতির প্রতি কত যত্নবান্! আমাদের দেশের কয়জন জমীদারকে ঐরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে দেখা যায়? উন্নতি অর্থসাপেক্ষ। অনেকের অর্থ নাই। উন্নতি জ্ঞানসাপেক্ষ। অনেকে অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন। উন্নতি পরিশ্রমসাপেক্ষ। অনেকেরই পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ও ইচ্ছা নাই। আমাদের দেশে যদি কোন জমীদার বা জমীদারসন্তান দেখিলেন যে গ্রাসাচ্ছাদন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে, তিনি অমনি "বাবু" হইয়া পড়িলেন। কোনরূপ কাজ করা, নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা পাওয়া, তিনি অতি হেয়জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার উপর আর এক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সাহেবি অনুকরণ আজকাল বড় প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বড়মানুষের পক্ষে এরূপ হওয়া কতকটা অনিবার্য্য। যে দেশ বহুকাল হইতে পরপদানত, সে দেশের লোকদের আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয় ভাব সহজেই লোপ পাইবে। বিজিতগণ বিজেতাদিগের অনুকরণ করিবেই করিবে। বড় মানুষদের মধ্যে এইরূপ অনুকরণ প্রথম আরম্ভ হয়। মুসলমান রাজত্বের সময় এইরূপ ঘটিয়াছিল; ইংরাজ রাজত্বের সময় উহা ঘটিতেছে। কিন্তু আমরা ইংরাজের কি অনুকরণ করিতে শিখিতেছি? চিরকালই দোষ অনুকরণ করা সহজ ও গুণ অনুকরণ করা কঠিন। আমরা মাত্রা চড়াইয়া অনুকরণ করিতেছি ইংরাজের পানস্পৃহা; ইংরাজের বিলাসিতা। অনেক ধনিসন্তান আজকাল ইংরাজের চাল চুল ইংরাজের পোষাক পরিচ্ছদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। ইহা যে তাঁহাদের উৎসন্ন যাইবার এক প্রধান সহায় হইয়াছে তাহা তাঁহারা বুঝেন না বা বুঝিতে চান না।

কোন কোন অর্থনীতিজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি বলিতে পারেন, "নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা উন্নতিপথের প্রধান কণ্টক। অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। যদি আমাদের বিশ্বাস হয় যে আমাদের অবস্থা খুব ভাল, ইহার অপেক্ষা ভাল অবস্থা হইতে পারে না, তাহা হইলে আমাদের অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতার তিরোধান হইবে। যাহার অভাব নাই তার আকাঙ্ক্ষা নাই এবং যার আকাঙ্ক্ষা নাই তার চেষ্টাও নাই। আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার অভাবেই আমাদের জাতীয় অধঃপতন সাধিত হইয়াছে। যদি আমাদের দেশের ধনিসন্তানেরা ইংরাজী চাল চুলের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া পড়েন তাহা একটা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। কারণ তাহা হইলেই বুঝা যাইবে তাঁহারা আর তাঁহাদের পূর্ব্বতন অবস্থায় সন্তুষ্ট নন। তাঁহাদের অভাব বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক এবং অভাব মোচনের জন্য তাঁহারা স্ব স্ব অবস্থোন্নতির চেষ্টা পাইবেন।" যদি এরূপ হয় তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে নিদান একবার মাদারবৃক্ষে আতা ফলিতেছে। কিন্তু ইংরাজী দোষ অনুকরণ ও ইংরাজী চাল চুলের খাতিরে জাতীয়ত্বের মস্তকে পদাঘাত যদি উন্নতির লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বুঝিব যে আজকালকার নূতন সভ্যতার জোরে উন্নতি শব্দের নূতনতর অর্থ হইয়াছে। আর এক কথা আছে। যদি স্বধু অভাবই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চিরাগত আলস্য ও চেষ্টাহীনত্বের কোন ব্যতিক্রম না ঘটে; তাহা হইলে অভাববৃদ্ধি ক্লেশ ও অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে নাকি? এবং আমাদের দেশে কি তাহাই ঘটে নাই? এই অভাববৃদ্ধির সহিত মোকদ্দমাপ্রিয়তা আসিয়া জুটিয়া অনেক জমীদার বংশকে উৎসন্ন দিতেছে না কি? অনেক জমীদারই হয় ঋণজালে জড়িত হইতেছেন, নয় প্রজাপীড়ক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ইংরাজ অধিকারে জমীদার "মা বাবা ও দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা" এ ভাব থাকিতে পারে না স্বীকার করি, কিন্তু জমীদার ও প্রজার মধ্যে সদ্‌ভাব ও পরস্পরমঙ্গলেচ্ছা কেন যে অন্তর্হিত হইল তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

বিলাসিতার প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার; তাহা অমিতব্যয়। ইহাকে বিলাসিতার অঙ্গ বলিলেও বলা যায়। অনেক জমীদার পুত্রের বিবাহ, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে অনেক সময় অবস্থার অধিক ব্যয় করিয়া বসেন। কেহ মনে করিলেন, ঋণ শোধ হইবেই—আজ না হয় দুই দিবস

পরে হইবে, কিন্তু পুত্রের বিবাহ বা পৌত্রের অন্নপ্রাশনের সুবিধাত সর্ব্বদা ঘটিবে না। কেহ ভাবিলেন অবস্থা আজ কাল ভাল নয় বটে কিন্তু আমার সমাজে যেরূপ মান সম্ভ্রম, পিতৃশ্রাদ্ধে ১০০০০ হাজার টাকা খরচ না করিলে কিছুতেই আমার শোভা পাইবে না। এ সকলের উপর অনেকের মধ্যে নেশা আসিয়া জুটিয়াছে। নেশা অবশ্য পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু পূর্ব্বে গাঁজা কিম্বা চরসে একজন বড়মানুষের যাহা খরচ হইত, বিলাতী সুরায় তাঁহার উত্তরাধিকারীর তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক খরচ হইতেছে। অমিতব্যয়ের নানা কারণ আছে। তাহাদের সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই। এখানে কন্যার বিবাহে অপরিমিত ব্যয়ের কথা কিছু বলা গেল না। সমাজের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে কন্যার বিবাহে যতই খরচ হউক না কেন, তাহা অপরিমিত ব্যয়ের সামিল ধরা যাইতে পারে না। জমীদার ছাড়া দেশে আরও কতকগুলি ধনী লোক আছেন। ইহাঁদের মধ্যে কতকগুলি বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত। ইহাঁরা যে দেশের প্রভূত উপকার করিতেছেন সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। এইরূপ লোক দ্বারাই দেশের ধনবৃদ্ধি হয়। ইউরোপের অনেক অংশে যেমন পুরাতন ধনীরা নির্ধন হইয়া পড়েন, এইরূপ লোকই তাঁহাদের স্থান অধিকার করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় এইরূপ ধনকুবেরদের সংখ্যা যে কত অধিক তাহা অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ লোক কয়জন আছেন? কলিকাতায় অনেক বড় বড় হাউসওয়ালা আছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী কয়জন? দার্জিলিং অঞ্চলে অনেক চা বাগান আছে, তাহাদের মধ্যে কয়খানা বাঙ্গালীর? দেশে খনিজধনের অভাব নাই; কিন্তু যে সব লোক পাথুরিয়া কয়লা তোলার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন এ দেশীয়? বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনবৃদ্ধির পথ আমাদের এক প্রকার বন্ধ। দেশে কোম্পানীর কাগজভক্ত আরও কতকগুলি ধনী লোক আছেন। ইহাঁদের সংখ্যাও খুব কম। ইহাঁদের দ্বারা দেশের যে কি উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ইহাঁদের সম্বন্ধে একটা কথা কিন্তু ঠিক। দেশের ঋণভার বৃদ্ধি করিতে ইহাঁরা বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। ইহাঁরা নিশ্চেষ্ট জীব এবং অল্পে সন্তুষ্ট। বিদেশ হইতে কাপড় আনিয়া আমাদিগকে পরিতে হইতেছে। দেয়াশেলাইটার জন্যও পরের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ইহাঁরা চেষ্টা করিলে এ অবস্থায় কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

কিন্তু সে চেষ্টা করা বড় কঠিন ব্যাপার। ব্যাঙ্ক বা ট্রেজরি হইতে সুদ লইয়া আসা ইহা অপেক্ষা কত সুখকর? সে দিন গবর্ণমেণ্ট সুদের হার ৪৲ টাকা হইতে ৩।৷৹ টাকা করিয়া দিলেন। শুনিতে পাই রাজস্বমন্ত্রীর নাকি একটু ভয় হইয়াছিল, পাছে অধিকসংখ্যক লোকে টাকা ফিরাইয়া লন। অনেক দিন হইতে চলিল ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও তাঁহারা আমাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। চিনিতে পারিলে সুরেন্দ্র বাবুর কারামোচনের সময় বাঁরাকপুরে ফৌজ দাঁড়াইত না, এবং সুদের হার কমাইবার সময় ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মনে ভয়ের উদ্রেক হইত না। গবর্ণমেণ্ট সুদের হার কমাইয়া দেওয়াতে আমাদের টাকা ফিরাইয়া লইবার ক্ষমতাই যদি থাকিবে, তাহা হইলে আর আমাদের এ দশা কেন? বলা বাহুল্য জমীদার ছাড়া অন্য ধনিগণের মধ্যেও বিলাসিতা ও সাহেবিয়ানা প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলা, অতএব দেশের ধনিগণের সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা গেল না।

(৩)

এখন দেখা যাউক মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা কিরূপ। পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে অনেকেই চাষ করিতেন। ব্যবসা করা অনেকের কাজ ছিল এবং অনেকে প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেন। তখন লোকের অভাব অল্প ছিল। দেশে বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। অনেকেরই মনে সন্তোষ ছিল। কাজেই মোটা ভাত, মোটা কাপড় এক রকমে চলিয়া যাইত, বিশেষ কষ্ট হইত না। এখন সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অনেকে চাষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনেক গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে কতকটা চাষের জমী ছিল, খানকয়েক লাঙ্গল ও জনকয়েক কৃষক চাকর ছিল। কিন্তু আজকাল সে সব কিছুই নাই। দূরপল্লীগ্রামে আজও এরূপ গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু যতই সহরের নিকটে আসা যায় ততই তাঁহাদের সংখ্যা বিরল হয়। যেরূপ গৃহস্থের কথা বলিতেছি, ইহারা কৃষক নহেন—মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। কিন্তু আজকাল কি দেখা যায়? ইহারা অনেকেই কৃষিকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন। পুরুষেরা অনেকেই ইংরাজীতে শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং চাকরী অবলম্বন করিয়াছেন, বা চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন; গৃহে আর সে সুখ সে সন্তোষ নাই, সে স্বচ্ছলতা নাই, সে সদ্ভাব নাই। পিতৃপিতামহের

যে সদ্‌গুণ ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। সে পরমার্থপরতা, সে আতিথেয়তা আজ কোথায়? তাহাদের স্থান যদি কোন নূতন গুণ অধিকার করিত তাহা হইলে বিশেষ ক্ষোভের কারণ থাকিত না। কিন্তু অনেক স্থলে নূতন গুণ বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ী লোক আছেন। ইহাঁদের অবস্থা যে মোটের উপর খারাপ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যাহা কিছু খারাপ হইয়াছে, তাহার কারণ সাধারণ, ইহাঁদের প্রতি প্রযোজ্য কোন বিশেষ কারণ নয়। কিন্তু ইহাঁদের অনেকের মধ্যে একটী বিশেষ দোষ ঢুকিয়াছে। আজ কাল কি এক ঢেউ উঠিয়াছে, সকলেরই "বাবু" হইবার সাধ। যাঁহারা নিজে "বাবু" হইতে পারিলেন না, তাঁহাদের ইচ্ছা অন্ততপক্ষে তাঁহাদের ছেলেরা "বাবু" হয়। বোধ হয় যেন ছেলের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা ভাবেন—

"আমার যে সব রৈল বাকী
তুমি পেলেই আমি পাব।"

ছেলেদিগকে বাবু করিবার ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই বোধ হয় তাঁহারা তাহাদিগকে ইংরাজী স্কুলে পাঠান। ইংরাজি শিক্ষার প্রতিকূলে কিছু বলা আমার মতলব নয়, এবং আমি উহার বিরোধীও নই। ইংরাজী শিক্ষা হইতে দেশের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন ব্যবসাদারের ছেলে ইংরাজী শিক্ষা করিল, তাহা হইলেই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বাবু শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা তাহার এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ব্যবসা করা একটি ঘৃণার কার্য্য বলিয়া তাহার ধারণা জন্মিল, এবং যেমন তেমন একটা চাকরির জন্য সে লালায়িত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ ভাব তাহার মনে উদয় হওয়ার জন্য দেশই অনেকটা দায়ী। দেশের এমন দুরবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আমার বাড়ীতে যদি একজন ২০৲ টাকা মাহিয়ানার আমলা ও একজন বড় দোকানদার আসে, আমি সেই আমলাকেই অধিক খাতির করিব। এ সম্বন্ধে একটী ঘটনা মনে পড়িল। আমার বাসার নিকটে একঘর আড়তদার আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয়। এক সময় আমার পরিচিত একজন হাকিম আমার বাসায় আসেন। তিনি আসিবার পরই আড়তদার একজন উপস্থিত হন। হাকিমটি তামাক

খাইতেছিলেন এবং খাইতেই রহিলেন। একটু পরে আড়তদারটী চলিয়া যাইলে বাবুটী বলিলেন—"ওর নিতান্ত ইচ্ছা যে এই হুঁকার তামাক খায়, সেই জন্য ও যতক্ষণ ছিল আমি হুঁকা ছাড়ি নাই।" আড়তদারটী অবশ্য ইংরাজী জানেন না ও ইংরাজীভাবে মার্জ্জিত নন। এ কথাও বলা উচিত যে হাকিমটী বড় ভদ্রলোক, এবং হুঁকা সম্বন্ধে জাতীয়ত্বের কোন গোল ছিল না। আড়তদার না হইয়া আমার প্রতিবাসী যদি একজন কেরাণী হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কোন অসুবিধা ঘটিত না। আমি হাকিম বাবুর কোন দোষ দেখি না। এ স্থলে তিনি দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাজ সমস্ত দেশের লোকের মনোভাব ব্যঞ্জক। যে কারণেই হউক না কেন ব্যবসাদারদের ছেলেদের বাবুভাবাপন্ন হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা একটা কুলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। বাবু হওয়া ও প্রকৃত শিক্ষা পাওয়া আমি অবশ্য এক ধরি না।

ব্যবসাদারের পর আছেন, নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতকারী শিল্পকর। অবস্থাভেদে ইঁহারা মধ্যবিত্ত বা তন্নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইতে পারেন। আপাততঃ যাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত আছেন বা ছিলেন তাঁহাদের কথা বলা যাইতেছে। দেশের অনেক প্রয়োজনীয় শিল্প আজ লুপ্তপ্রায়। ভাতের পরই কাপড়। ভাগ্যক্রমে আমরা আজও নিজেদের ভাত নিজেরা করিয়া খাইতেছি—কিন্তু নিজেদের কাপড় নিজের করিয়া লওয়ার ক্ষমতা একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। ইহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে? পূর্ব্বে যে সব লোক বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের বংশীয়েরা অনেকেই হয় সমাজের নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিম্বা ইংরাজী শিক্ষা করিয়া চাকরী ব্যবসায়ীর দল পুষ্ট করিতেছে।[১] বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অধিকাংশ শিল্পের প্রতি তাহা প্রযোজ্য। দুই চারিটা শিল্প আছে যাহাদের সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ অবনতি লক্ষিত হয় না, যথা—দরজীর কাজ, ছুতারের কাজ ইত্যাদি। ঐ সব শিল্প ব্যবসায়ীদের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সাধারণ কারণের ফল, তাহার বিশেষ কারণ নাই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিল্পের যে খুব মন্দ অবস্থা, সে বিষয়ে দ্বিমত হইবার সম্ভাবনা নাই।

মধ্যবিত্ত লোকদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কয়টী সাধারণ কারণ আছে। চাকরীই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে এবং চাকরীর বাজার বড়

খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় বৎসরে ৩।৪ হাজার শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোক তৈয়ারি হইতেছেন। ইহাঁদের অধিকাংশেরই ভরসা ও উদ্দেশ্য চাকরী। কিন্তু চাকরীর জন্য উমেদার যত, তাহার সিকি চাকরী বৎসরে খালি হয় কিনা সন্দেহ। যে সব লোকের কথা উপরে বলিলাম ইহাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। ইহারা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংস্পর্শে আসেন নাই এমন লোক যে কত আছেন তাহা বলা যায় না। ইহারা অনেকেই চাকরীর জন্য উমেদার, এবং চাকরী না পাইলে ইহাদের সংসার চলিবার কোন উপায় নাই। চাকরির সংখ্যা যে অপেক্ষাকৃত কত কম তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। যদি দেশের সমস্ত চাকরীই হিন্দু ও মুসলমান পাইতেন তাহা হইলেও অধিকাংশ উমেদারকে বিফল মনোরথ হইতে হইত। যে চাকরী আছে তাহার উপরে সাহেব ও উপসাহেবগণ বিশিষ্ট ভাগ বসাইয়াছেন। আমি বড় বড় চাকরীর কথা বলিতেছি না; তাহা ত সাহেবদের একরূপ একচেটিয়া। যে সব ছোট ছোট চাকরী আছে তাহারও অনেকগুলি সাহেব ও উপসাহেবরা অধিকার করিয়াছেন। পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ কলিকাতায় কোন একটী আফিসে একবার যান, তাহা হইলেই আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। মধ্যবিত্ত অধিকাংশ লোকের চাকরী ভিন্ন উপায়ান্তর না থাকা যে বড় শোচনীয় অবস্থা, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস করা অনাবশ্যক। আমাদের নিজেদের দোষেই হউক বা অন্য কোন অনিবার্য্য কারণ সমবায়েই হউক, অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথ আমাদের পক্ষে আজকাল রুদ্ধ। অনেককেই "হা চাকরি! যো চাকরী!" করিয়া বেড়াইতে হইতেছে। ইহাতে লোকের অবস্থা যে খারাপ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? অনেকে বলিতেছেন অধিকাংশ লোক সুকুমার বিদ্যাচর্চ্চা বা চর্চ্চার চেষ্টা ছাড়িয়া দিউক। অর্থকরী শিল্প শিক্ষা করুক ও ব্যবসায়ে মন দিউক. কথাটা বলা বড় সহজ। কাজটা তত সহজ নয়। প্রথমতঃ, অর্থকরী শিল্পবিদ্যা শিখিবার বিশেষ কোন উপায় দেশে আছে কি? দ্বিতীয়তঃ যদিও ঐরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিবার উপায় থাকে উহা কাজে লাগাইবার সুবিধা আছে কি? তৃতীয়তঃ ব্যবসা করা কি বলিলেই হয়? ইহাতে কি শিক্ষা ও অর্থের প্রয়োজন নাই? সে শিক্ষা কোথায় পাওয়া যাইবে, এবং সে অর্থই বা কোথা হইতে আসিবে? কেহ কেহ বলিবেন "সাধিলেই সিদ্ধি" চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। কিন্তু বস্তুতঃ

এরূপ কথার মূল্য অনেক সময় বড় বেশী নয়। কথা বলিলেই হয় না, উপায় দেখান দরকার। একদিকে লোকের যেমন অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি টাকার ক্রয়শক্তি কমিয়া গিয়াছে। টাকার ক্রয়শক্তি যে কি পরিমাণে কমিয়াছে পাঠক একজন বৃদ্ধ লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। বহুদিনের কথা নয়, চাউল টাকায় ১মণ, ঘি /২॥• সের তৈল /৮ সের ও দুধ ।৬ সের ছিল। আমার মার কাছে শুনিতে পাই আমার পিতামহ মহাশয় আমাদের দেশে পয়সায় ৪।৫টা হংসের ডিম্ব কিনিয়া আনিতেন, দুই আনার মাছ কিনিলে একটা বৃহৎ সংসারে যথেষ্ট হইত। তরিতরকারী ও ফল ফুলাদির কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। মোটের উপর বলিতে গেলে অল্প দিনের ভিতর টাকার ক্রয়শক্তি প্রায় তিন গুণ কমিয়া গিয়াছে। ক্রয়শক্তি যে পরিমাণে কমিয়াছে, সাধারণতঃ লোকের আয় সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। অনেক স্থলে ইহার বিপরীতই ঘটিয়াছে। ইহাতে অল্প আয়বিশিষ্ট লোকের যে কষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ইহার উপর আর এক রোগ আসিয়া জুটিয়াছে তাহা বিলাসিতা। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিলাসিতার ঢেউ চলিতেছে। পূর্ব্বে বিলাসিতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা হইয়াছে। তাহাদের অনেক গুলিই এই স্থানে প্রযুক্ত হইতে পারে। বিলাসিতা যদি অবস্থোন্নতির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে ইহাতে বিশেষ দোষ না থাকিতে পারে। বিলাসের বস্তু উপভোগের জন্য আমরা যদি অবস্থোন্নতির চেষ্টা করি তাহা হইলে ইহার বিপক্ষে কিছু বক্তব্য না থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকে যে বিলাস প্রিয় হইয়া দাঁড়াইছেন তাহা সাধারণতঃ অবস্থোন্নতির পরিচায়ক নয়, এবং অবস্থোন্নতির চেষ্টা তাহার কারণ নয়। বাহ্যিক আড়ম্বরের দিকে, পোষাকের পারিপাট্যের দিকে লোক অত্যন্ত ঝুঁকিয়াছে। আমার বাবার কাছে গল্প শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের সময়ে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা পূজার সময় একখানা নূতন কাপড় ও একখানা নূতন চাদর পাইয়া আনন্দে আটখানা হইয়া পাঁচ বাড়ী পূজা দেখিয়া বেড়াইত। তিনি তাঁর সময়ের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিলেন। এখন ঐ শ্রেণীর এমন একটী ছেলে কেহ দেখান দেখি যে ঐ ধুতি চাদরের দশ গুণ মূল্যের পোষাক পাইয়া সন্তুষ্ট হয়। ৬।৭ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই আজিকালিকার ছেলেরা

কোটের কাট, কামিজের কফ্ ও জুতার চেহারার সমালোচনা করিতে শিখে। আমার একটী প্রতিবাসী আছেন, তিনি কাছারিতে চাকরী করিয়া মাসে ২০।২৫ টাকা উপায় করেন। পোষ্যের মধ্যে বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, আপাততঃ এক পুত্র ও দুই কন্যা। মফঃস্বলে বাড়ী, কাজেই ৫৲ টাকা বাড়ীভাড়া দিয়া থাকিতে হয়। পুত্রটীর বয়স ৯ বৎসর। কিছুদিন হইল তাহার অত্যন্ত ব্যারাম হয়। আমি তাহাকে ঐ সময়ে মাঝে মাঝে দেখিতে যাইতাম। একদিন গিয়া দেখি ছেলেটী "ইংলিস" কোটের আলোচনা করিতেছে। আমি শুনিয়া অবাক। পাঠক যেন মনে না করেন যে তখন তার বিকারাবস্থা। বিকারাবস্থা হইলেও ঐ ব্যাপার হইতে তাহার সাধারণতঃ আলোচ্য বিষয়ের মোটামোটি কতকটা জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। উপরে যে দৃষ্টান্তটী দিলাম উহা যে বড় বিরল নয়, তাহা বলা বাহুল্য। আমি কেবল মাত্র ৫০৲ টাকা মাহিনা পাই ও আমার অনেকগুলি পোষ্য আছে বলিয়া কি হইল? পূজার পূর্ব্বে গৃহিণী বলিলেন "বৎসরকার একদিন পাঁচ বাড়ীর পাঁচ ছেলে মেয়ে ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া বাহির হইবে; আমার ছেলেরা যে দীন হীন বেশে তাহাদের সঙ্গে মিশিবে কিম্বা তাহাদের পোষাক দেখিয়া মুখ চুণপারা করিয়া থাকিবে, মা হইয়া ইহা আমি কি করিয়া সহ্য করিব?" ইহা বড় কঠিন সমস্যা। গৃহিণী তাঁর ছেলেদের মুখ চুণ পারা করিয়া থাকা দেখিতে পারেন না, এবং আমি তাঁর মুখভার দেখিতে পারি না। ফল সহজেই অনুমেয়। হয়তঃ ১০০০৲ টাকা মাহিনার সবজজের সঙ্গে বা ৮০০ শত টাকা মাহিনার ডেপুটীর সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রাণ আমাকে পাল্লা দিতে হইল। ইহার উপর গৃহিণী নিজে যদি একটু সৌখীন হইলেন তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা। তাঁর সেমিজ চাই, গর্ণেটের জ্যাকেট ও ফ্রেঞ্চ সাড়ী চাই, এবং একশিশি কুন্তলীনও চাই। এক সময় আমাদের সঙ্গে এক বি-এ-পাস যুবক কাজ করিতেন। তাঁর বেতন ছিল মাসিক ৩০৲ টাকা। একদিন শুনিলাম স্ত্রীর জন্য তিনি ৫৫৲ টাকার বারাণসী সাটী কিনিয়াছেন (অবশ্য ধারে)। আমি বলিলাম, এ রোগ কেন? যুবকটী উত্তর করিলেন, "কি জানেন, আমাদের ওদিকে এ সব না হইলে ইজ্জৎ বজায় রাখা যায় না।" দিনকতক পরে তাঁহাকে সাটীখানি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছিলাম। ঐরূপ যুবক আজকাল দেশে বিস্তর হইয়া পড়িয়াছে। এক দিকে যেমন বিলাসিতার স্রোত খর-

বেগে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং "ফোতো" বাবুয়িও খুব বাড়িয়াছে, অপরদিকে তেমনি ঝুঁটা মালও খুব তৈয়ারি হইতেছে। ঝুঁটা জরি, ঝুঁটা সাটিন, ঝুঁটা বারাণসী, ঝুঁটা কতকিতে দেশ প্লাবিত। যাহার অন্নের সংস্থান নাই, তাহার ঘরেও একটা ঝুটা মখ্‌মলের কোট্ ও ঝুটা সাটিনের জ্যাকেট এবং একখানা খেলো বোম্বাই সাটী দেখিতে পাইবে। যাঁহাদের ৪০।৫০ টাকা মাসিক আয়, আজকালকার বাজারে তাঁহাদের সংসার চলা একরূপ ভার হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর তাঁহাদের গৃহিণীরা পরী সাজিবার জন্য ও ছেলে মেয়েগুলিকে সাহেব বিবি সাজাইবার জন্য লালায়িত। ফল এই দাঁড়াইয়াছে—কষ্টের সংসার অশান্তির ও অধিকতর কষ্টের হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞান ও ইচ্ছা থাকিলেও বাবুর অনেক সময় গৃহলক্ষ্মীর অমতে চলিবার যো নাই। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্যিক আড়ম্বরের খাতিরে ছেলে গুলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। এই রোগের জন্মস্থান হইতেছে কলিকাতা মহানগরী। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালার মফঃস্বলের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জানেন যে,অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় বাবুয়ানা রোগও সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়িতেছে। রোগটা অবশ্য প্রাচীন। "বাহিরে কোঁচার পত্তন; ভিতরে ছুঁচার কীর্ত্তন" বাক্য তাহার প্রমাণ। কথাটা বোধ হয় নূতন তৈয়ারি নয়। কিন্তু আজকাল রোগটা প্রবল ও বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "ফোতো" বাবুয়ির বিপক্ষে দুই এক কথা বলিতেছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিরোধী। বাবুয়ানা ও পরিচ্ছন্নতা যে এক বস্তু নয় তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাওয়া অনাবশ্যক।—

বড় মানুষদের অপরিমিত ব্যয়ের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মধ্যবিত্ত লোকদের সম্বন্ধেও খাটে। তাঁহাদের দেখাদেখি ইহারাও পুত্রের বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে অসম্ভব ব্যয় করিয়া বসেন। বড়মানুষ বলিয়া গণ্য হইবার ইচ্ছা ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত বলবতী। এবং এমন লোকও দেখা গিয়াছে যিনি পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ধার করিয়া ইংরাজী বাজনা ও চার ঘোড়ার গাড়ীর খরচ যোগাইয়াছেন। পানদোষ ইহাদের মধ্যেও বিলক্ষণ প্রবেশ করিয়াছে, অবস্থার অবনতির আর এক কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থান বড় অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। জলপথ রোধ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ও পুষ্টিকর আহারের অভাব প্রভৃতি নানা কারণ

ঐ অস্বাস্থ্যকরতার হেতু। যে কারণেই হউক না কেন অনেক জেলার জল বায়ু যে খুব খারাপ হইয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নয়। অনেক পরিবারের মধ্যে ব্যারাম প্রায় বার মাসই লাগিয়া আছে। বর্ষার পরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক গ্রামের অধিকাংশ লোক পীড়িত। এমন বাড়ী দেখিয়াছি, যাহাতে রোগীর শুশ্রূষা হওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে একটু জল দিবার লোক থাকে না। কে কাহাকে দেখে? যে যে স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ, সে সকল স্থানের স্ত্রী পুরুষে ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। ছেলে পিলের দশা দেখিলে চক্ষে জল আসে। তাহারা অনেকে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই রুগ্ন। অনেকে শীঘ্র শীঘ্র মারা যায়। আর যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা অতি কষ্টের সহিত জীবনরূপ বোঝাটা কোন প্রকারে বহিয়া বেড়ায় মাত্র। দেশের এরূপ অবস্থা হওয়ায় আমাদের যে কত দূর দুর্গতি ও দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বৎসর সালিয়ানা যে কত জীবন অকালে নষ্ট হইতেছে, ও কত টাকার ঔষধ ভক্ষিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? আজকাল পেটেণ্ট ঔষধ ওয়ালা ও নানাবিধ ডাক্তারদের "পোহাবার"। কেহ হয়ত খতাইয়া দেখেন নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় অনেক গৃহস্থের আজকাল ভাত খরচের নীচেই ঔষধ খরচ। পূর্ব্বে লোক বলিত "ভাতকাপড়"। শীঘ্রই লোকে বলিবে "ভাত ঔষধ"। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে লোকে ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে। দেশের অস্বাস্থ্যকরতা যে আমাদের দুর্দ্দশার এক অন্যতম কারণ তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। আর একটী কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের এ অংশের উপসংহার করা যাইবে। অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ষষ্ঠীর অনুগ্রহ কিছু বেশী। অধিকাংশ দম্পতীর দেখিতে পাওয়া যায় ছেলে পিলের সংখ্যা ৫।৭টির কম নয়। ২০।২৫ টাকা আয়বিশিষ্ট লোকের পক্ষে এতগুলি সন্তান মানুষ করা—বিশেষতঃ আজি কালিকার দিনে কি দুরূহ ব্যাপার! সন্তান মানুষ করিবার দায়িত্ব বড় গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। শুধু খাওয়ান পরানই কত কঠিন! পিতামাতাই সন্তানকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। অনেক সময় বেচারী ভাল খাইতে পাইল না। হয় ত সেইজন্য তাহার অকালে মৃত্যু ঘটিল। যদি বা বাঁচিয়া রহিল চিরকালই তাহার জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। কখনও তাহার পূর্ণ বিকাশ হইল না। সন্তানকে রীতিমত খাওয়াইতে পরাইতে না

পারিলে পিতামাতার কি গভীর পরিতাপের বিষয় হয়, তাহার সম্বন্ধে বেশী বলার দরকার নাই। কিন্তু শুধু গ্রাসাচ্ছাদনও সামান্য ব্যাপার। সন্তানের চরিত্রের জন্য, তাহার শিক্ষার জন্য, অনেক পরিমাণে তাহার ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের জন্য, পিতামাতাই প্রধানতঃ দায়ী। চরিত্র এবং শিক্ষাই জীবন পথের প্রধান সম্বল। যাহার এই দুইটী নাই, তাহার মনুষ্য জন্ম বিফল, এবং সে সমাজের কণ্টক স্বরূপ। সে নিজের কোন উপকারে আসিল না, সমাজের ত নয়ই। তাহার ভরণপোষণের জন্য সমাজের যে ব্যয় হয়, তাহা সম্পূর্ণ লোকসান, কারণ তাহার পরিবর্ত্তে সমাজ কিছুই পায় না। পাওয়া দূরে থাকুক, তাহা দ্বারা সমাজের অপকারই সাধিত হয়। যে চরিত্র এবং যে শিক্ষার মূল্য এত অধিক, সন্তানের সেই চরিত্র এবং শিক্ষা প্রধানতঃ পিতামাতার চরিত্র ও শিক্ষা সাপেক্ষ। পিতামাতা চরিত্রবান ও শিক্ষিত হইলেই যে হইল তাহা নহে। অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তানের চরিত্র গঠন ও তাহার শিক্ষা প্রদান করিতে হয়; ইহাতে অনেক "কাঠ খড়ের" আবশ্যক। এখানে শিক্ষার অর্থ কেতাবি শিক্ষা নয়; যে শিক্ষার বলে মানুষ নিজের জীবনধারণোপায় অর্জ্জন করে এবং সমাজের উপকারে আসে সেই শিক্ষা। সন্তানের ভাবী সুখ দুঃখ তাহার চরিত্র ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। যদি সে দয়া, ধৈর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম প্রভৃতি শিক্ষা করে এবং কার্য্যকরী শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সে এবং তাহার পরিবারবর্গ পায়ের উপর পা দিয়া খাইতে না পাইতে পারে, কিন্তু কখনও তাহাদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ও যথার্থ সুখের অভাব হইবেক না।

কিন্তু যদি পিতামাতা সন্তানকে ভাল করিয়া লালন পালন না করিলেন এবং তাহাকে সৎশিক্ষা না দিলেন তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানের প্রতি এবং সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য হানি হইল না কি? কিন্তু এ কথা কয়জন ভাবিয়া দেখেন? যাহাকে পিতা মাতা পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন, জন্মাইবার পক্ষে যাহার কোন হাত ছিল না, জগতে যদি দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য বলিয়া কোন বস্তু থাকে, তাহা হইলে সেই সন্তানের সম্বন্ধে দায়িত্ব এবং তাহার প্রতি কর্ত্তব্যের অপেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য আর হইতে পারে না। সমাজের নিকট আমরা সকল বিষয়ে ঋণী। মানুষের মনুষ্যত্ব সমাজ হইতে। সেই সমাজের উপর নিজেদের জীর্ণ শীর্ণ অথবা দুশ্চরিত্র বিশিষ্ট এবং কুশিক্ষিত সন্তান নিক্ষেপ করিতে কাহারও অধিকার নাই।

এখন মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। আমাদের দেশের বিস্তর মধ্যবিত্ত লোকের অনেকগুলি সন্তান সন্ততি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেরই আয় অল্প বলিয়া ইহাতে যে খুব কষ্ট হয় তাহা বলা বাহুল্য। অনেক ভদ্র পরিবারে দেখিয়াছি গৃহস্বামীর চাকরী নাই বা অন্য কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। ছেলে বয়সে পিতামাতা বিবাহ দিয়াছিলেন। আয় না থাকিলে কি হয়, স্বভাবধর্ম্মে বৎসর দুই বৎসরে সন্তান সংখ্যা একটী করিয়া বাড়িতেছে। সংসারে কষ্টের পরিসীমা নাই। ছেলেগুলি দুইবেলা আহার পাইতেছে না। নির্ভর অনেক সময় আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশীদের দয়ার উপর। সংসার ইহাতে কিরূপে প্রতিপালন হইতে পারে, সহজেই বুঝা যায়। পরিবারের মধ্যে দুই একজন হয়ত না খাইতে পাইয়া মারাই গেল। ছেলেপিলেদের মধ্যে গুটিকতক হয়ত ম্যালেরিয়া জ্বর কিম্বা অন্য কোন ব্যারাম ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যে কয়টী রহিল তাহাদের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া থাকিল। কাহারও শরীরের বা মনের বিকাশ হইতে পাইল না। পুত্রগুলি গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিল। সকলের অবশ্য বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাগুলিকে, বিবাহাবস্থা উপস্থিত হইলে, হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে [illegible] আর [illegible]াপেক্ষা গুরুতর দায়। গরীব লোকের পক্ষে মেয়ে জলে ফেলা ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। এ রোগের কি কোন ঔষধ আছে? ইউরোপে অনেক বুদ্ধিমান লোকে অবস্থোন্নতি করিতে না পারিলে বিবাহ করেন না। নিজের অপেক্ষা নিজের সন্তান সন্ততির সামাজিক অবস্থা নিকৃষ্ট হইবে, ইহা তাঁহারা কিছুতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের দেশে ওরূপ হওয়া অসম্ভব। কন্যা অবিবাহিত রাখা যাঁহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাঁহাদের দেশে কখনই অবিবাহিত পুরুষ থাকিতে পারে না। লোক অবিবাহিত থাকিলে তাহাদের চরিত্র দূষিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কতক লোকের চরিত্র দূষিত হওয়া ভাল, কিম্বা দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া ভাল, এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার আমাদের দরকার নাই। অবিবাহিতাবস্থা যতটুকু চরিত্রদোষের কারণ, ততটুকু চরিত্র-দোষ আমাদের দেশে না হইবারই সম্ভাবনা। তবে কি আমাদের দেশে অত্যধিক বংশবৃদ্ধি বন্ধ করিবার কোন উপায় হইতে পারে না? আমার মতে ইহার একটি মাত্র উপায় আছে। সেটি কি? যদি প্রত্যেক বুদ্ধিমান দম্পতি এরূপ ভাবে

চলেন যে তাঁহাদের বেশী ছেলেপিলে না হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা অত্যধিক বংশবৃদ্ধি হইতে উদ্ভূত নানা প্রকার যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতে পারেন; তাহা হইলে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে দারিদ্র্যের হাত হইতে এড়াইতে পারেন। যাহাতে বেশী সন্তান না হইতে পারে স্ত্রী পুরুষের পক্ষে এরূপ ভাবে চলা যে অসম্ভব তাহা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইউরোপে কোন কোন দেশ আছে, যেখানে অনেক মধ্যবিত্ত দম্পতি এরূপ ভাবে চলিয়া থাকেন। যদি মনের বল থাকে, যদি দায়িত্ব-জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে অন্যে যাহা করিতে সক্ষম অপরে তাহা না পারিবে কেন? আমি যেরূপ ভাবে চলিতে পরামর্শ দিতেছি, অনেকে তাহা অস্বাভাবিক মনে করিতে পারেন। কিন্তু স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার কথা তুলিলে বিষয়টা অনেকদূর গড়াইয়া পড়ে। তাহা হইলে বলিব, সমস্ত সভ্যতাই অস্বাভাবিকতা। তুমি যে রাঁধিয়া খাও তাহা কি অস্বাভাবিক নয়? তুমি যে কাপড় পরিয়া বেড়াও তাহা কি অস্বাভাবিক নয়? সভ্যতার মানেই সর্ব্ব প্রকার স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করা। অতএব অনিয়ন্ত্রিত সন্তানোৎপত্তি বন্ধ কর[illegible]দি অস্বাভাবিক হয় তাহা "বোঝার উপর শাক আটীটা" মাত্র। কেহ কেহ বলিতে পারেন আম[illegible] কারে[illegible] অবশ্য হইবেক। ধর্ম্মের দোহাই বড় কঠিন দোহাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বহু সন্তানোৎপত্তি বন্ধ করিবার চেষ্টা যদি অধর্ম্ম হইল, সন্তানদিগকে লালন পালন করিতে না পারিলে কি কোন অধর্ম্ম নাই? যদি কেহ বলেন সন্তানোৎপাদন মানুষের এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—আমার কাজ আমি সংসাধন করি, সন্তানের সুখ দুঃখের কথা আমার ভাবিবার দরকার নাই, "জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি;" তাহা হইলে আমার এইমাত্র বক্তব্য আছে যে, এরূপ লোকের সঙ্গে তর্ক করা আমার সাধ্যাতীত। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন এ সকল বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনা সুরুচিবিরুদ্ধ। তাঁহাদের প্রতি আমার এইমাত্র বক্তব্য আছে যে, তাঁহাদের সুরুচি ও আমার সুরুচি এক বস্তু নয়। সমাজের উপকারার্থ অনেক বিষয়ের আলোচনা দরকার, এবং সে স্থলে রুচির প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। যে সব বিষয়ের সহিত সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সুখ দুঃখ বিশেষ ভাবে জড়িত, তাহাদের প্রকাশ্য আলোচনা না হইলে সমাজের অমঙ্গল হইবেক। অপরিমিত লোক বৃদ্ধি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সমাজের দারিদ্র্যের এক প্রধান কারণ। যেরূপ

সময় পড়িয়াছে, অধিক সন্তানোৎপত্তি স্ত্রী পুরুষের এক প্রধান অধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজেদের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য সকল সুবুদ্ধি স্ত্রী পুরুষের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে তাঁহাদের বেশী সন্তান না হয়। লোক সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে, জীবন-সংগ্রাম ততই কঠিন হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে—কিন্তু "পুঁথি বাড়িবার" ভয়ে তাহাদের আর উল্লেখ করা গেল না। (ক্রমশঃ)

পলাশ বন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সত্যকে একবারও পশ্চিম বঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলাম না। পূজাবকাশ ও সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশগুলি আমাকে একাকীই সেখানে কাটাইতে হইত। কিন্তু সত্য সাথী এই [illegible] আর [illegible]। সত্যকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই আমার হৃদয়ে এই অশান্তি ও অপূর্ণতার উৎপত্তি হয়। সত্যের একখানি চিঠির জন্য সমস্ত দিন উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে চিঠি না পাইলে, অস্থির হইতাম। মনের প্রসন্নতা কোথায় চলিয়া যাইত; আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, পাঠে, আলাপে কিছুতেই সুখ ও পরিতৃপ্তি পাইতাম না। মানুষের সহবাস আমি বিষবৎ পরিহার করিতাম। এইরূপ সময়ে আমি নির্জ্জনতাই অধিকতর ভাল বাসিতাম। প্রভাতে বনের ধারে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম; সন্ধ্যার প্রাক্কালে, পর্ব্বতের নিম্নদেশে একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতাম। সত্যেন্দ্রর অভাবে মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত। একখানি চিঠি পাইলেই, এই যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব হইতে পারিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই অভিলষিত চিঠিখানিও যথা সময়ে আসিত না। সত্যেন্দ্রর উপর এক একবার রাগ ও অভিমান করিতাম; কিন্তু আবার ভাবিতাম "সত্যেন্দ্রর যদি অসুখ হইয়া থাকে!" এই ভাবনা উপস্থিত হইলেই রাগ অভিমান কোথায় পলাইয়া যাইত। আমি তাড়াতাড়ি সত্যেন্দ্রকে চিঠি লিখিতে বসিতাম; চিঠিতে রাগ অভিমানের ছায়া

মাত্র থাকিত না ; সত্যেন্দ্র কেমন আছে, তাহাই জানিবার জন্য কেবল ব্যাকুলতামাত্র প্রকাশিত করিতাম।

এইরূপ সত্যের একখানি চিঠির অভাবে আমি কখন বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইতাম ; আবার অন্য সময়ে তাহার কায়িক ও মানসিক কুশল সংবাদ সম্বলিত একখানি পত্র পাইলেই যার পর নাই হৃষ্ট হইতাম। কিন্তু হর্ষের পর বিষাদ ও বিষাদের পর হর্ষের এই পর্য্যায় দেখিয়া সুখ জিনিষটার উপর ক্রমশঃ আমার শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতে লাগিল। সুখ জিনিষটা আমার নিকট একটা অস্থির, চঞ্চল, ও অস্থায়ী পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল ; দেখিলাম, ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কিন্তু প্রাণ সুখেরই জন্য লালায়িত। "কোথায় সুখ," "কোথায় সুখ" প্রাণের ভিতর হইতে নিয়ত কেবল এই এক ধ্বনিই উত্থিত হইতেছে। সংসারে যে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে আমি সন্দিহান্ হইতে লাগিলাম। আমি পিতামাতাকে কত শ্রদ্ধা ভক্তি করি, ভাল বাসি ; আমার উপর তাঁহাদের কত স্নেহ ও দয়া। কিন্তু হায়! ভাবিতেও প্রাণ [illegible] শিহরিয়া উঠে, হয়ত এই স্বর্গীয় স্নেহ [illegible] বঞ্চিত হইতে হইবে। সত্যকে কত ভাল বাসি ; সত্যকে ভাল বাসিয়া কত সুখ! কিন্তু হায়, দেখিলাম, এ সুখসাগরেও বিলক্ষণ জোয়ার ভাটা আছে। বিবাহের চিন্তাকে মনের মধ্যে বড় একটা স্থান দান করিতাম না ; কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধটা যে আমাদের পবিত্র বন্ধুত্বেরই ন্যায় একটা জিনিষ হইবে, তাহা অনুমান করিয়া লইতাম। সুতরাং সে সুখের উপরেও নির্ভর করিতে ইচ্ছা হইত না। পিতামাতাকে ও বন্ধুকে হারাইবার যেরূপ ভয়, স্ত্রীকে পুত্রকন্যাদিগকেও তো হারাইবার সেইরূপ ভয় আছে। তবে বিবাহ করিয়াই বা সুখ কি? অস্থির, ক্ষণিক সুখের প্রতি আমার কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল।

সত্য ও আমি এই সময়ে এম্-এ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম এই সময়ে প্রায় একবিংশ বৎসর হইয়াছিল, আমরা উভয়েই বিশিষ্ট সম্মান ও যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় সফলযত্ন হইয়াছিলাম। যতদিন পাঠে নিবিষ্ট ছিলাম, ততদিন সংসারকে বড়ই সুন্দর ও সুখময় স্থান মনে করিতাম। এ হেন সংসারে প্রবেশ করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি অনেকবার আনন্দে

উৎফুল্ল হইতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মোহাঞ্জন খসিবার উপক্রম হইতেছিল; সংসারের প্রকৃত ছবি অল্পে অল্পে আমার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। যাহা দেখিতেছিলাম, তাহাতে সংসার-প্রবেশের ইচ্ছা হওয়া দূরে থাকুক, দ্বার হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। সংসারে যদি প্রকৃত সুখ পাওয়া না যায়, সংসারে প্রবেশ করিয়া লাভ কি? যদি সংসারে প্রাণের পূর্ণতৃপ্তি না হয়, তবে সংসারে প্রয়োজন কি?

এই গভীর প্রশ্নে আমার মনঃপ্রাণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। লোকের সহবাসে থাকিয়া এই প্রশ্নের সন্তোষকর মীমাংসার সম্ভাবনা দেখিতাম না; তাই নির্জ্জনে অবস্থান করিতাম। মুখমণ্ডল বোধ হয় চিন্তাভারাক্রান্ত দেখাইত। নতুবা যে দেখিত, সেই আমাকে আমার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত কেন? পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছি, ইহাতে আমার আনন্দই হইবার কথা; আনন্দিত না হইয়া আমি সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণ থাকি কেন? কেহই আমার এই অপূর্ব্ব ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীরা অনেক আন্দোলন আলোচনার পর এ সম্বন্ধে একটা সুচারু-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে আমার পিতাঠাকুর মহাশয় ও জননী দেবী তাঁহাদের যথেষ্ট নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অনতিবিলম্বে আমার জন্য একটী সুযোগ্যা পাত্রীর অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন!

জননীদেবী অতিশয় সরলহৃদয়া। তিনি আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিয়তই আমার চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি পেট ভরিয়া খাই না কেন, উদাসীনের মত নির্জ্জনে একাকী ভ্রমণ করিয়া বেড়াই কেন, বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্দ্দোষ আলাপ বা আমোদে প্রবৃত্ত হই না কেন, দেবতা ও উপদেবতাদের বিহারস্থল পাহাড়পর্ব্বতে একাকী আরোহণ করি কেন, বনের ধারেই বা বেড়াইতে এত আগ্রহপ্রকাশ করি কেন,—এইরূপ তিরস্কার মিশ্রিত নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া তিনি আমার বিষাদের কারণ অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন। আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব, ঠিক্ করিতে পারিতাম না। অনেক দিন সতুর চিঠি পাই নাই, পাহাড়ে উঠিতে আমার বড় আনন্দ হয়, বয়স্যগণের সহিত আলাপ করিতে

আমার প্রবৃত্তি হয় না,—সময়ে সময়ে আমি তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দিতাম। কিন্তু তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম, আমার উত্তরগুলি তাঁহার নিকট যেন সন্তোষজনক বোধ হইত না। আমি যে বিবাহ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছি, অবশ্য সে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন নাই। বিবাহের নাম শুনিলে আমি যে অত্যন্ত বিরক্ত হই, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। এই কারণে আমার সাক্ষাতে বিবাহের কথা কখনও তুলিতেন না। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছিল যে, অতঃপর আমার বিবাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তাঁহার ভয় হইয়াছিল, আমাকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিতে না পারিলে হয়তঃ আমি উদাসীন হইয়া যাইব। বলা বাহুল্য প্রতিবাসিনী বর্ষীয়সীরা এই ধারণাটিকে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে বিলক্ষণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আমার বিবাহের প্রস্তাবের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত ও জীবনোপায় স্থিরীকৃত না করিয়া বিবাহ করিতে কখনই সম্মত হইব না, ইহা পিতৃদেব, জননী ও বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিতেন। পিতাঠাকুর মহাশয় এই কারণেই এতদিন আমার বিবাহের নিমিত্ত তাদৃশ উদ্যোগী ছিলেন না। এক্ষণে আমার বিবাহের চিন্তায় অপর দশজনের নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত ও শিরোবেদনা উপস্থিত হইলে, তিনি বাধ্য হইয়া লোকলজ্জার খাতিরে আমার জন্য একটী সুযোগ্যা পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বয়স্যগণের নিকট আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম। শুনিয়া আমার হৃদয়ে দুঃখ, অভিমান, বিরক্তি ও হাস্যরসের বিচিত্র সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব লীলা আরম্ভ হইল। কিন্তু হায়, আমার হৃদয়ের গভীর অশান্তির কারণ কেহই অবগত হইল না। কাহাকেও তাহা বলিলামও না। যাহাকে তাহাকে তাহা বলিয়াই বা কি ফল হইবে? কেই বা তাহা বুঝিবে? বুঝিলেই বা কে আমার সংশয়-জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে? একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ আমার অশান্তির কারণ জানিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বুঝিলাম, সেই মহাপুরুষ ভিন্ন এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। তাঁহারই উপরে ধীরে ধীরে নির্ভর করিতে লাগিলাম।

আমার বিষাদের এই প্রগাঢ় ছায়া সত্যের প্রসন্ন হৃদয়কেও আচ্ছন্ন

করিয়াছিল। সত্য স্বভাবতঃই আমাকে গম্ভীর বলিয়া জানিত; কিন্তু গম্ভীর হইলেও আমার যে আত্মপ্রসাদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। এইবার পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আমি হৃদয়ে যে গুরুতর প্রশ্নের আন্দোলন অনুভব করিলাম, তাহার দুই একটী তরঙ্গ তাহার হৃদয়কেও অভিঘাত করিয়াছিল। সত্য আমাকে বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রে সকল কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছিল। আমার হৃদয় প্রেম ও সৌন্দর্য্যের জন্য যে কিরূপ লালায়িত, তাহা তাহাকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে ইহাও জানাইয়াছিলাম যে, এই প্রেম ও সৌন্দর্য্যতৃষা জগতের কোন পদার্থেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না, হইবারও নহে। জগতের প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, জগতের সৌন্দর্য্যে অপূর্ণতা আছে। প্রাণ তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। তাই হৃদয়ের আবেগে তাহাকে লিখিয়াছিলাম "আমি এই জগতের কোনও পরিমিত রূপে বা সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইতে চাই না; তাহাতে ডুবিয়া আত্মহারা হইতে চাই না। আমি চাই ডুবিতে এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের সাগরে আমি চাই তন্মধ্যে আত্মহারা হইতে, তন্মধ্যে মিলিয়া যাইতে। সেই রূপসাগরে, সেই সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকরে না ডুবিতে পারিলে কি আমার তৃপ্তি জন্মিবে? জীবনে শান্তি পাইব? যেখানে সমস্ত সৌন্দর্য্য মিলিয়া গিয়াছে, যেখানে সমস্ত পবিত্রতা একত্রীভূত হইয়াছে, হায়, কবে আমি সেই স্থানে যাইব, কবে আমি তাহা দেখিয়া চরিতার্থ হইব? আহা, কি শান্তির নিলয় তাহা! কি অনন্ত প্রেমের ভাণ্ডার তাহা! সে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, সে আনন্দে শঙ্কা নাই, সে সম্ভোগে বিলাস নাই। জগদীশ, কবে আমায় সেই স্থানে লইয়া যাইবে?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পশ্চিমবঙ্গ আর ভাল লাগিল না। আমার বিষাদরোগের প্রতীকার করিতে সকলেই উদ্যুক্ত; কিন্তু অবিচক্ষণ বৈদ্যের ন্যায় কেহই আমার রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। চারিদিকেই বিবাহের কথা শুনিতে শুনিতে প্রাণে বিরক্তি জন্মিল। নির্জ্জন আরণ্য প্রদেশ, পর্ব্বত শৃঙ্গ, উপত্যকা, কোন স্থানেই আর সুখ পাইলাম না। গ্রীষ্মাবকাশের পর

কলেজ খুলিবার সময় উপস্থিত হইল। ব্যবহার শাস্ত্র পাঠ করিতে আমার কলিকাতায় যাইতে হইবে ; সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার জনাকীর্ণ পথে ভ্রমণ করিয়া বরং শান্তি ও নির্জ্জনতা অনুভব করিতে লাগিলাম। সত্য আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল ; সুতরাং সে আমার মনে শান্তি আনয়নের জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। আমি সত্যের সহবাসে অনেকটা আশ্বস্ত হইতাম বটে ; কিন্তু প্রাণের ভিতর অশান্তির ছায়া লুকায়িত থাকিত।

সত্য এম্ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটী কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইল। আমি আইন পড়িতে লাগিলাম। কেন আইন পড়িতেছি, আইন পড়িয়া কি করিব, তাহা ভাবিলাম না। আইন পড়িতে হয়, তাই পড়িতে লাগিলাম। প্রত্যহ কলেজে যাইতাম, কিন্তু সেখানে কি বিষয় পঠিত হইতেছে, তাহার একটা সংবাদ রাখিতাম না। অধ্যাপক আসিয়া যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন, তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। আইনের নীরস ব্যাখ্যাগুলি আমার কর্ণ-
যে [illegible] প্রবেশ করিত না। মন তখন কলেজ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায়
কুহরে প্রবেশ ক [illegible] মুহূর্ত্তমধ্যে নানা
পলায়ন করিত ; অলক্ষিতে তাহার অনুসরণ করিতে [illegible] মুহূর্ত্তমধ্যে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিতাম। অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, সহপাঠীরা কি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কোনদিকেই আমার লক্ষ্য থাকিত না। অধ্যাপক মহাশয় কখন কখন পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত কোনও অদ্ভুত প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিতেন ; সহপাঠীরা প্রায় সকলেই তাহাতে যোগদান করিত। তাহাদের উচ্চ হাস্যধ্বনিতে কখন কখন আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত ; আমি চকিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিতাম এবং হাস্যের কারণ বুঝিতে না পারিয়া, অপ্রতিভের ন্যায়, মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি সচরাচর পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন করিতাম। সহপাঠিবর্গের মধ্যে কেহই একটী দিনও আমাকে স্বস্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করে নাই, ইহা তাহাদের সবিশেষ উদারতারই পরিচয় সন্দেহ নাই।

দিনের মধ্যে কেবল এক ঘণ্টার জন্য আমাকে কলেজে যাইতে হইত। সেই ঘণ্টাটি অতিবাহিত করিয়া আমি প্রায় সমস্ত দিনই বাসায় থাকিতাম।

সত্যেন্দ্র বৈকালে কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইলে কিয়ৎক্ষণের জন্ত তাহার সহিত মিলিত হইতাম। অন্যান্য সময়ে বাসায় বসিয়া কেবল অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতাম। আমার পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে অবশ্য ব্যবহারশাস্ত্র ছিল না। তবে আমি কি কি বিষয় পাঠ করিতাম? সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে দুইটী ব্যক্তির রচনা আমার প্রাণস্পর্শ করিত। ইংরাজীতে কবিবর ওয়ার্ডস্বয়ার্থ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি। উভয়েরই মর্ম্মস্পর্শিনী রচনায় আমার ভাবসাগর উথলিয়া উঠিত। উভয়েরই নির্ম্মল পবিত্রজীবন, উভয়েরই ধর্ম্মভাব, উভয়েরই পূর্ণ আদর্শের জন্ত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং উভয়েরই বালসুলভ সরলতা আমার হৃদয় মন মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি বাল্মীকির সহিত ওয়ার্ডস্বয়ার্থের তুলনা করিতেছি না; বাল্মীকির সহিত ওয়ার্ডস্বয়ার্থ কেন, জগতের কোন কবিরই তুলনা হয় না। কিন্তু তুলনা না হইলেও, বাল্মীকি ও ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিয়া আমি উভয়কে একই লক্ষ্যস্থলের যাত্রী স্থির করিয়াছিলাম। উভয়েরই লক্ষ্য পূর্ণ আদর্শ, পূর্ণ সৌন্দর্য্য, পূর্ণ পবিত্রতা। তাই উভয়েরই একমাত্র [illegible]ধ্য ও আরাধ্য [illegible] ও অদ্বিতী[illegible]রুষ; তাই উভয়েরই নিকটে [illegible]করিয়া উঠি[illegible] আদর্শ কবি—সেই এক ও অদ্বিতীয় মহাকবি যাঁহার অপূর্ব্ব রচনা এই অপূর্ব্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—সামান্য বৃক্ষপত্রে, তৃণদলে, বালুকাকণায় যাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বসুধা সহস্রধারায় উছলিয়া উঠিতেছে,—যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র ধারণ করিতে গিয়া হৃদয় মন অভিভূত হইতেছে। তাই উভয়েই সেই মহাকবির অপূর্ব্ব রচনা পাঠ করিতে করিতে জীবনকে অতিবাহিত ও ধন্য করিয়াছেন, তাই উভয়েই নির্জ্জন অরণ্যে ও পর্ব্বতময় প্রদেশে শান্তিময় জীবন যাপন করিয়াছেন এবং দিব্য আনন্দের অধিকারী হইয়া সার্থকজন্মা হইয়াছেন। বাল্মীকি তো মহর্ষিই ছিলেন; ওয়ার্ডস্বয়ার্থও ঋষিজনোচিত জীবন যাপন করিয়া এই পাপ যুগে কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন। আমি উভয়েরই উপাসক হইলাম; উভয়েরই কাব্য পাঠ করিয়া হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার সংশয়জাল ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। এক দিব্য জ্যোতিঃতে হৃদয় মন পূর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, আমি এই মানবজীবন বৃথাকার্য্যে অতিবাহিত হইতে দিব না, যে কার্য্যে আত্মা আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, সে কার্য্য প্রাণান্তেও করিব না। সংসারের ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্য্য কোন-

কালেই আমার নিকট শ্রেষ্ঠ সামগ্রী হইবে না। সেই মহাজ্যোতিঃই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইবে। আত্মার আনন্দের জন্য সকলই পরিত্যাগ করিব। সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার একমাত্র আধার সেই মহান্ পরমেশ্বরের ধ্যান, চিন্তা ও সেবাতেই জীবনকে উৎসর্গ করিয়া দিব। আমার জীবনের লক্ষ্য এইরূপে স্থিরীকৃত হইলে, আমি কিয়ৎপরিমাণে শান্তি সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতিরেকে আত্মা যে পরিতৃপ্ত হয় না এবং তাঁহার কৃপা লাভ করাই যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। হৃদয়ঙ্গম হইল বটে, কিন্তু সংসারের কোলাহলে আমি মধ্যে মধ্যে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। লক্ষ্যহীন হইলেই, সাংসারিকতা ধীরে ধীরে আমার [illegible] অধিকার করিয়া বসিত। কিন্তু সংসারের আমোদপ্রমোদে আত্মা তৃপ্তি লাভ করিত না; সুতরাং আমিও প্রকৃত সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইতাম। এরূপ অবস্থায় [illegible] শয়নে, পাঠে, আলাপনে কিছুতেই সুখ পাইতাম না এবং সহস্র চেষ্টাতেও মনকে নির্ম্মল ও সাংসারিকতাকে দূরীভূত করিতে পারিতাম না। মোহ যেন আমাকে জড়াইয়া থাকিত। কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইলে কোন বস্তুই যেরূপ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না, মোহাচ্ছন্ন হইয়াও আমি তদ্রূপ কোন বস্তুরই স্বরূপ দেখিতে পাইতাম না। মনে তখন বড় যন্ত্রণা হইত। যন্ত্রণা সময়ে সময়ে অসহ্যও হইয়া পড়িত। তখন নির্জ্জনে বসিয়া কিম্বা উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতাম এবং কাতর হৃদয়ে পরমেশ্বরকে ডাকিতাম। কিয়ৎক্ষণ পরে হৃদয়ের দুঃখভার যেন লঘু হইত, কুয়াসা যেন কাটিয়া যাইত, এবং প্রাণ যেন শান্তিরসে সিক্ত হইত। মেঘ-বৃষ্টি-ঝটিকা-বজ্রময় দুর্দ্দিনের শেষে নির্ম্মল গগনে উজ্জ্বল প্রভাকরের প্রকাশে ধরণী যেরূপ হাস্যময়ী হয়, প্রার্থনার পর আমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হৃদয়-রাজ্যেরও সেইরূপ অবস্থা হইত। হৃদয়ের এই শান্ত, স্নিগ্ধ ও পবিত্র ভাবটির সংরক্ষার জন্য আমি নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতাম। কিন্তু কালক্রমে দেখিতে পাইলাম, প্রার্থনা বা ঈশ্বর চিন্তাই ইহার একমাত্র উপায়। তদবধি প্রার্থনার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম। যখনই হৃদয়ে অন্ধকার বা কুয়াসা

আসিবার উপক্রম হইত, তখনই পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিতে বসিতাম। পরমেশ্বরের কৃপাতে অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিত। প্রার্থনাই যে আত্মার একমাত্র জীবনীশক্তি, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

ইহার পর আমার মনের অবস্থাও কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা তেমনই প্রবল রহিল বটে, কিন্তু মন প্রসন্ন ও পবিত্র না থাকিলে কিছুই ভাল লাগিত না। শুধু স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কেন, এরূপ অবস্থায় বাল্মীকির রামায়ণ বা ওয়ার্ডস্বয়ার্থের মধুময়ী কবিতারও কিছুমাত্র মাধুর্য্য থাকিত না। ভগবদুপাসনা দ্বারা মন পবিত্র ও হৃদয় নির্ম্মল না হইলে তাহাতে দিব্য সৌন্দর্য্য কিছুতেই প্রতিভাত হইত না। পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য দেখিলেই তাহাতে মুগ্ধ হইতাম, কিন্তু এখন আর সে প্রকার অবস্থা রহিল না। এখন যে কোন অবস্থায় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত করা আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। আমি আবিলহৃদয়ে যখনই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি তখনই আমার প্রাণের মধ্যে একটা প্রলয় ও হাহাকার উঠিয়াছে। তখনই আমি কাহার জলদগম্ভীর রবে যেন স্তম্ভিত হইয়াছি। সেই রব শুনিলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, শরীর শিহরিয়া উঠিত, গণ্ডস্থল বহিয়া ঝর্ ঝর্ অশ্রু পড়িত ও সংসার যেন আমার চক্ষে অন্ধকারময় বোধ হইত। কিন্তু ভগবদুপাসনা দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইলে বাহ্যপ্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি সহজেই উপভোগ করিতে পারিতাম, পরমেশ্বরের মহিমা ও কৃপা জলে, স্থলে ও শূন্যদেশে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতাম: ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিত্বসুধা পান করিতে সমর্থ হইতাম; মহর্ষি বাল্মীকির সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে বিমুগ্ধ হইতাম; তাঁহার ব্রহ্মঘোষ-নিনাদিত দণ্ডকারণ্যের প্রাণস্পর্শিনী শোভা ও পবিত্রতার কথা চিন্তা করিয়া আনন্দরসে নিমগ্ন হইতাম এবং জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবী ভগবান্ রামচন্দ্র ও মহাত্মা লক্ষ্মণের অলৌকিক চরিত্রের আলোচনা করিতে করিতে মানসচক্ষে যেন স্বর্গরাজ্যের অস্পষ্ট ছায়া অবলোকন করিতাম। তখন হৃদয় প্রসারিত হইয়া যেন ব্রহ্মাণ্ডময় পরিব্যাপ্ত হইত; মোহমুগ্ধ মানবের অসার কোলাহলে প্রাণ ব্যথিত হইত; জগতের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত; রাগ, দ্বেষ, অভিমান কোথায় লুক্কায়িত হইত; শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকিত না; সকলকেই ভাই ভাই বলিয় আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইত এবং জীবের কষ্ট দেখিয়া আত্মা ক্রন্দন করিত

তখন মনে করিতাম, সকলের দ্বারে দ্বারে আনন্দ ও শান্তির সমাচার আনয়ন করিব ; সকলকে পবিত্র হইতে বলিব ; সকলকে মহান্ পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিব। এইরূপ মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া আমি মধ্যে মধ্যে স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যাইতাম, ক্ষুধাতৃষ্ণা অনুভব করিতাম না, হাতের পুস্তক হাতেই থাকিত এবং কেহ নিকটে আসিলেও তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না।

উপাসনা, সচ্চিন্তা, সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থপাঠই এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সাধু মহাত্মাদিগের গ্রন্থাদি পাঠে আমি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতাম। অস্মদ্দেশীয় মহর্ষিগণোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদ পাঠ করিয়া আমি যে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম, বাল্মীকির রামায়ণ বা ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিয়া আমি তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হই নাই। মনঃপ্রাণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের মহাভাবে যতক্ষণ নিমগ্ন থাকিত, ততক্ষণ আমার আর কিছুই ভাল লাগিত [illegible] নির্ম্মল গগনে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ হইলে, দীপ্তিময়ী তারকারাজী যেরূপ [illegible] করিতে সমর্থ হয় না, উপনিষদের মহাভাবে নিমগ্ন হইলে, আর চিত্তাকর্ষণ [illegible] বাল্মীকি বা ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতাও সেইরূপ আমার [illegible] পারিত না। কিন্তু অন্য সময়ে, অর্থাৎ আমি সংসারের কোলাহলময় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে, ইহারাই আমার জীবনাকাশে সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় সুশোভিত হইতেন।

যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় আমি আমার জীবনের গন্তব্য পথ দেখিতে পাইলাম। আমার লক্ষ্যও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। তদনুসারে আমি আমার কার্য্যাদি নিয়মিত করিতে প্রস্তুত হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরমেশ্বরই যখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইলেন, তখন জীবনের কার্য্যসকলও একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। আমি ব্যবহার শাস্ত্র পাঠ পরিত্যাগ করিলাম। ব্যবহারজীবী হইলে, অনেক সময় সত্যপথে চলিতে পারিব না, ইহাই আমার বিশ্বাস হইল। সত্যই পরমেশ্বর ; সুতরাং পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বসময়ে নির্ম্মল সত্যেরই

উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। স্বাধীনতা না থাকিলে, সত্যের উপাসনা করা যায় না। এই কারণে, স্বাধীনতা লাভের জন্যও ব্যাকুল হইলাম। স্বাধীনতা অর্থে, আমি মনের ও আত্মার স্বাধীনতার কথাই বলিতেছি। এই স্বাধীনতালাভের পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পরের দাসত্বকেই আমি প্রধান অন্তরায় মনে করিলাম। এই কারণে স্থির করিলাম, কাহারও বর্ত্তনভোগী হইব না। তবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিব? আমার সংসার অর্থে কেবল আমাকেই বুঝাইত। পিতামাতাকে আমার উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে হইত না। আমার অগ্রজ ভ্রাতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকেও কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। আমিও বিবাহ করি নাই এবং সংকল্প করিতেছিলাম, হয়ত বিবাহ করিবও না। সুতরাং আমার একমাত্র চিন্তা কেবল আমারই প্রতিপালনের জন্য। পরমেশ্বরের কৃপায় তাহারও একপ্রকার উপায় হইয়া গেল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটী পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া কতিপয় সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইলাম। পিতৃদেবকে অনুরোধ করায় তিনি আমার জন্য সেই মুদ্রায় কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিলেন। সে ভূসম্পত্তির উপসত্ব বার্ষিক ৬০০৲ টাকা মাত্র। ইহাই আমার আয় নির্দ্দিষ্ট হইল। এই আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমি সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল, পিতৃদেব, জননী ও আমার অগ্রজ ভ্রাতারা আমার সংকল্পের কথা শুনিয়া আমাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন: কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে আমাকে একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত মনে নিরস্ত হইলেন। অবশ্য তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিলে আমিও যারপর নাই আনন্দিত হইতাম; কিন্তু সঙ্কল্প সিদ্ধির অন্য কোনও উপায় না থাকাতে আমি অগত্যা নিজ ইচ্ছামতই কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলাম। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, পিতৃদেবকে আমি আমার অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা সমস্তই জানাইয়াছিলাম; তিনি যেরূপ বিজ্ঞ, শিক্ষিত ও উদারচিত্ত তৎসমুদয় অবগত হইয়া আমাকে আর কোনও বাধা দিলেন না। কেবল জননী দেবীকেই কোনপ্রকারে বুঝাইতে পারিলাম না। আমি এখন বিবাহ করিব না এবং অপর ভ্রাতৃগণের ন্যায় কোনও উচ্চপদে

আরোহণের চেষ্টা করিব না, ইহা অবগত হইয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে আশ্বস্ত করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিবাহ না করিলে আমি যে উদাসীন হইয়া যাইব, এই বিশ্বাসটি তাঁহার মন হইতে কোনপ্রকারেই অপসারিত করিতে পারিলাম না। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম "মা, আমি যে উদাসীন হইব না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এখন বিবাহের কোনও ইচ্ছা নাই। তুমি জোর করিয়া বিবাহ দিলে আমি চিরকালের জন্য অসুখী হইব। আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। এই পল্লীর অনতিদূরে আমি যে মৌজা ক্রয় করিয়াছি, সেই স্থানে আমি একটী ঘর প্রস্তুত করিব। সেই স্থানে নিয়ত থাকিলেও আমি প্রত্যহ তোমাদের চরণদর্শন করিতে আসিব ও সেবাশুশ্রূষা করিব। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের লোকেরা আশ্রমে কঠোরভাবে জীবনযাপন করিয়া কৃতার্থ হইয়া-[illegible]ছেন। সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি এই অপেক্ষাকৃত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে [illegible] নির্ব্বাহ করিতে না পারি তাহা হইলে কি লজ্জা ও পরিতাপের জীবনযাত্রা নির্বা[illegible] বিষয়।" এই বলিয়া আমি তাঁহার নিকট [illegible] ঋষিগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম, আর্য্যমহিলা গার্গী ও মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করিলাম এবং পরিশেষে আমার সঙ্কল্পটি অনুমোদন করিতে তাঁহাকে অনুনয় করিলাম। পুত্রবৎসলা জননীদেবী আমার অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি আমার বিবাহ দেখিলে যে সুখে ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে পারিবেন, সেই কথাটি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

সত্যকেও আমার সঙ্কল্পের কথা সমস্ত জানাইলাম। সত্যও আমাকে প্রথমে কিঞ্চিৎ বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে সেও আমার সঙ্কল্পটির অনুমোদন করিল। এইরূপে চারিদিকের পথ পরিষ্কৃত হইলে আমি পিতৃদেবের অনুমতিক্রমে আমার অভিলষিত মনোরম স্থানে একটী আবাসবাটী নির্ম্মাণ করাইলাম। স্থানটির নাম পলাশবন। কিন্তু নামটি পলাশবন না হইয়া শালবনই হওয়া উচিত ছিল। সেই স্থানের কিয়দ্দূরে কতিপয় পলাশ বৃক্ষ থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা এত অধিক ছিল না, যদ্দ্বারা সেই স্থানটি তাহাদের নামেই অভিহিত হইতে পারে। আবাস-বাটীর সন্নিকটেই শ্যামল শালবন শোভা পাইতেছিল। অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম।

এই গ্রামটিরও নাম পলাশবন। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই নিরীহ কৃষক; কিন্তু সেখানে কতিপয় ঘর ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতিও বাস করিত। গ্রামবাসী ব্যক্তিরা আমাকে তাহাদের প্রতিবাসী হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আমি একটী শুভদিনে বাস্তু শান্তি করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করিলাম।

——:০:——
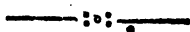
গীতোক্ত অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের দাসীতে বাবু প্রতুল চন্দ্র সোম মহাশয় তাঁহার "গীতোক্ত অবতার তত্ত্বের" শেষ ভাগে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, শ্রদ্ধাশীল ও ভগবৎ-পরায়ণ, সে তো প্রীতিপাত্র হইবেই; কিন্তু যে অধর্ম্মাচরণ করে, পাষণ্ড ও পাপাসক্ত, সে কি ভগবানের প্রীতির সীমার বাহিরে? তবে তো সে প্রেম অপূর্ণ। ইহাতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন হইতে পারে, কিন্তু পাপীর উদ্ধার সম্ভব নয়। এই হেতু গীতার যুগাবতার প্রেমাবতার নয়। ফল কথা সুস্থকে রাখিয়া অসুস্থের কল্যাণ চেষ্টা, পথারূঢ় নিরানব্বইটিকে ছাড়িয়া পথভ্রান্ত একটির অন্বেষণই যে ধর্ম্ম সংস্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়, তখনও এ ধারণা হয় নাই। মনস্বী ৺ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই গীতোক্ত ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির পরাকাষ্ঠা, চরম অভিব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের এ প্রয়াস বৃথা। গীতার ধর্ম্ম অতি মহান্ হইলেও ইহা হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতম অভিব্যক্তি নয়। গীতার অসম্পূর্ণ অবতারবাদের পূর্ণতা নিতাই চৈতন্যে। যুগাবতার এখানে সাধুর পরিত্রাণের জন্য নয়, পাপীর পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত। 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং' "নয়, মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিবনা" এই প্রেমাবতারের ভাবা। নিগ্রহের বিনিময়ে এখানে আলিঙ্গন। কিরূপে বলি, আলিঙ্গনের ধর্ম্ম বিনাশের ধর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর নহে? প্রেমাবতার অবতারের চরম। গীতার অবতার প্রেমাবতার নহে; সুতরাং গীতোক্ত অবতার অতি মনোহর ও বিশদ হইলেও অসম্পূর্ণ।" উপরোক্ত কথা সম্বন্ধে আমার দুই একটি বক্তব্য আছে।

প্রতুল বাবু কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্যকে বড় বলিতে চান কিনা জানি না

কিন্তু লেখার আভাসে মনে হয় যেন তাহাই বলা তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক এবিষয়টা তত মারাত্মক নহে; কারণ যদি কেহ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলে যে বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটা ভাল নহে কিন্তু বালিজুড়ি নিবাসী ৺ ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র লোক বেশ ভাল, তবে আমার বুঝা উচিত যে, আমি নিজে লোক মন্দ নহি, তবে আমার যাহা কিছু দোষ আছে তাহা আমার নামের দোষ। সেইরূপ কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্য বড় বলিলে ইহাই বুঝা উচিত যে কৃষ্ণ ছোট নয়, তবে তাঁহার নাম ছোট, কারণ আমি কখনও আমার অপেক্ষা বড় বা ছোট হইতে পারি না। যাহা হউক একথা লইয়া বেশী বাক্‌বিতণ্ডা করিবার আবশ্যক নাই।

প্রতুল বাবু কয়েকটী কথার সাধারণ অর্থ লইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিনাশ শব্দের সাধারণ অর্থ লয়প্রাপ্ত হওয়া, মারিয়া ফেলা। অর্জ্জুন যখন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে এই অর্থে মারিয়া ফেলিতে অস্বীকার হইয়া যুদ্ধ [illegible] প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন ভগবান যে সকল কথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রতুল বাবু পাঠ করেন নাই? ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন:—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব নাভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

* * *

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

আমি যে কখনও ছিলাম না এমন নয়, সেইরূপ তুমি ছিলে না এমন নয়; এই রাজাগণও ছিলেন না এমন নয়; ইহার পরে আমরা সকলে থাকিব না এমন নয়। দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার,

যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ। অতএব পণ্ডিত লোক তাহাতে মোহিত হন না।

* * * *

যিনি এই সকল দেহাদি ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না। নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই দেহ সকল নশ্বর বলিয়া কথিত হয়; অতএব হে ভারত, যুদ্ধ কর।

যে ব্যক্তি ইহাকে হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই জানে না; যেহেতু ইনি হত্যা করেন না এবং হতও হয়েন না।"

যদি গীতার ধর্ম্ম এরূপ হয় তবে দুষ্টের বিনাশ হইল কি প্রকারে? প্রতুল বাবু হয়ত দেহের নাশকে বিনাশ বলিতে চাহেন, কিন্তু গীতাতে দেহের নাশকে বিনাশ বলে না, তাহাকে আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি বলে।

প্রতুল বাবু হয়ত বলিবেন যে, এই দেহের নাশের আবশ্যক কি? চৈতন্য মহাপ্রভু অনেক দুষ্টের উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ত কখনও তাহাদের নাশ করেন নাই! গীতার কৃষ্ণ ধর্ম্মের এই মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, সেই জন্য দুষ্টের বিনাশ দ্বারা [illegible] উদ্ধারের উপদেশ দেন।

গীতার কৃষ্ণ চৈতন্যের ধর্ম্মে[illegible] তাহার মধ্যে [illegible]ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, সে [illegible] আমার বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা নাই; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি ধর্ম্মের এই মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেও যেরূপ অবস্থায় অর্জ্জুনকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, সেরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের উক্ত মহান্ ভাব ব্যক্ত করিলে তিনি কেবল হাস্যাস্পদ হইতেন। দেশ কাল এবং পাত্র এই তিনটির বিবেচনা করিয়া সকল সময়ে উপদেশ দিতে হয়। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মনে করুন এক জন ধর্ম্মযাজক ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে একজন পাষণ্ড আসিয়া তাঁহাকে কলসীর কানা দ্বারা আঘাত করিল। ধর্ম্মযাজক মহাশয় অনায়াসে বলিতে পারেন, "মেরেছ কলসীর কানা, তা' বলে কি প্রেম দিব না?" এরূপ বলিলে হয়ত সমাজের কোন অনিষ্ট হইবে না, বরং ইষ্ট হইবার সম্ভব। কিন্তু মনে কর, একজন মাজিষ্ট্রেট বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে পুলিস একজন পাকা বদমাইস ডাকাতকে

আনিয়া তথায় উপস্থিত করিল। মাজিষ্ট্রেট যদি উক্ত ডাকাতের উপযুক্ত বিচার না করিয়া "চুরি করেছ পরের সোনা, তা' বলে কি প্রেম দিব না?" বলিয়া ডাকাতের গলা ধরিয়া কান্দিতে আরম্ভ করেন, তবে প্রতুল বাবু উক্ত মাজিষ্ট্রেটকে কি বলিবেন? বাতুল বলিবেন নাকি? মাজিষ্ট্রেটের এরূপ কার্য্যে দেশের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের বেশী সম্ভব নয় কি?

চৈতন্য একজন গরীব ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে-ছেন। এরূপ অবস্থায় "মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।" না বলিলে তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। তিনি যদি আলিঙ্গন ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তবে হয়ত তাঁহাকে অনেক দিন পূর্ব্বেই মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইত; কারণ সে সময়ে মুসলমানদের রাজত্ব চলিতেছিল। চৈতন্য যেমন দায়ে পড়িয়া আলিঙ্গন-ধর্ম্মের প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ (আলিঙ্গনধর্ম্ম অবগত থাকিয়াও) দায়ে পড়িয়া "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ধর্ম্মের প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, যাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে-ছেন তিনিও একজন তদ্রূপ; উপদেশ দেওয়া হইতেছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে, যেখানে যুদ্ধের জন্য অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়-মান। এরূপ স্থলে "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া আলিঙ্গন-ধর্ম্মের উপদেশ দিলে দৃষ্টান্তোল্লিখিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ডাকাতের গলা ধরিয়া কান্নার মত হইত। এবং লোকে তাঁহাকে হয়ত ঘৃণা করিত। শ্রীকৃষ্ণ মানবচরিত্র ভাল বুঝিতেন তাই অর্জ্জুন যখন "যুদ্ধ করিব না" বলিয়া ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

"ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥"

"মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবেন; যাঁহাদের নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে এখন তাঁহাদের নিকট লাঘব প্রাপ্ত হইবে। তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্য নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য কথা বলিবে; তদপেক্ষা অধিক দুঃখকর আর কি আছে?" এই সকল নানা কারণে

শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে প্রেম ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। আলিঙ্গনধর্ম্ম বিনাশধর্ম্ম হইতে উচ্চ হইলেও সকল সময়ে এবং সকল স্থানে তাহা উচ্চ নহে বা উচ্চ হইতে পারে না। তবলার বাদ্যে নর্ত্তকীদের পা উঠিতে পারে, কিন্তু রণোন্মত্ত যোদ্ধাদের পা উঠাইবার জন্য ভেরীর বাদ্য আবশ্যক। অতএব গীতার ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ নহে; দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে।

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

গরিব-সেবক গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে (কুরিগ্রামে) ১২৫১ সনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম উমেশচন্দ্র ঘোষ। পিতা প্যারীমোহন ঘোষ অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া স্থানীয় জমীদারগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তার পর ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ করেন। ইংরেজী পড়িতে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া ১০ টাকা বৃত্তি পান। পঠদ্দশায় যে সমস্ত ছাত্রের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান নড়াইল জমীদারগণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বাল্যকালের ভালবাসা বয়োবৃদ্ধি সহকারে কখনও হ্রাস হয় নাই। সামান্য বৃত্তি পাইয়া তাঁহারই উৎসাহে এবং সাহায্যে গিরিশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। তথায় কিছুদিন পড়ার পর জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে প্রবেশ করেন।

পাঠাভ্যাসে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন প্রত্যহ সাংসারিক নানারূপ শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিয়া যে একটু সময় পাইতেন, তাহাই পাঠালোচনায় যাপন করিতেন। বৃথা আমোদে সময় কাটাইবার কখনও অবসর পান নাই। জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে অধ্যয়নের সময় বিখ্যাত ওগিল্‌বি সাহেবের সহিত আলাপ হয়। সাহেব তাঁহার ধর্ম্মভীরুতা এবং শিক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন দেখিয়া তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন এবং অনেক সদুপদেশ দান করিতেন। এই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া বাড়ী আসিতে হইল। তারপর চাকরীর জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই হাজরাহাটী মাইনর স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হয়েন। সে পদে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন; ছাত্রগণ তাঁহাকে এতদূর ভক্তি করিত ও ভালবাসিত যে, এখনও অনেকের মুখে তাঁহার ভালবাসার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার পর আরও ২।১টী স্কুলে মাষ্টারী করেন; সকল স্থানেই তিনি গ্রামবাসীর প্রশংসাভাজন এবং ছাত্রগণের বিশেষ ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। তৎপরে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া স্থানীয় জমীদারগণের ইংরেজী আফিসে প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে এ কার্য্য হইতে তিনি অবসৃত হয়েন। এই সময় তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইল; ইহার একদিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহাকে একাকী রাখিয়া, বৃদ্ধা মাতাকে কাঁদাইয়া, একমাত্র শিশুসন্তানসহ অল্পবয়স্কা ভার্য্যাকে চিরবৈধব্যানলে জ্বালাইয়া, ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। তিনি চারিদিক শূন্য দেখিলেন; মন অস্থির হইল। পরিশেষে মাতার উন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি আপনার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তখন আবার মনের বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব তখন তাঁহার সহায় হইল। মাতৃদেবীর সান্ত্বনায় অধিকাংশ সময়ই যাপন করিতে হইত। তাঁহাকে স্নান, আহার না করাইয়া তিনি কিছুই আহার করিতেন না। এখন পরিবারের সমস্ত ব্যয় তাঁহাকে বহন করিতে হইত। তিনি নড়ালের তদানীন্তন ডাক্তার এণ্ডার্শন (এখন ইনি কলিকাতার ধর্ম্মতলায় থাকেন) সাহেবের পুত্রকে পড়াইয়া মাসে মাসে যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারাই পরিবারের ব্যয় কোন ক্রমে নির্ব্বাহ করিতেন। কালক্রমে স্থানীয় মুন্‌সেফী আদালতে তিনি নাজীর নিযুক্ত হয়েন। এই তাঁহার প্রথম গবর্ণমেণ্ট আফিসে প্রবেশ। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি এরূপ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতেন যে, তখনকার মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং যাহাতে শীঘ্রই সমস্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মুন্‌সেফ বাবু বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অতুল বাবুর একমাত্র পুত্র যখন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েন, তখন তিনিও সেই পরিবারে মিশিয়া রাত্রিজাগরণ করিয়া রোগীকে ঔষধ পথ্যাদি খাওয়ান প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কর্ম্ম করিতেন।

এই গবর্ণমেণ্ট আফিসে কার্য্য করিবার সময়েই তাঁহার জীবনের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইল। তিনি দেখিলেন যে, নড়ালে এরূপ অনাথ দরিদ্র অনেক আছে, যাহারা রোগে আক্রান্ত হইয়া স্ব স্ব ভরণ পোষণের জন্য অন্যের দ্বারে উপস্থিত হইতেও সম্পূর্ণ অক্ষম; এরূপ নিরাশ্রয় আতুর অনেক আছে, যাহারা সাময়িক ঔষধ এবং আশ্রয় অভাবে অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয়; এরূপ চিররোগী অনেক আছে, যাহারা উপযুক্ত সেবার অভাবে, আস্তে আস্তে, মৃত্যু-মুখে অগ্রসর হইতেছে; এরূপ অসহায় ছাত্রও অনেক আছে, যাহারা স্কুলের মাহিয়ানা চালাইতে না পারিয়া অল্প বয়সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সংসারের এই সমস্ত বিচিত্র দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হইল। তিনি নিজে দরিদ্রতার অঙ্কে লালিত পালিত; শোকে তাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের দুর্দ্দশা তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন এবং তাহা দূর করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নিজের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়; সুতরাং সাহায্যের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হইল। "হিতৈষী" নামে এক "ফণ্ড" সৃষ্টি করিলেন। যাঁহাদের অবস্থা ভাল তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া চাঁদার দ্বারা অনাথ, আতুরগণের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনেকে সম্মত হইলেন। এই টাকা হইতে তিনি কয়েকটী স্কুলের ছাত্রকে মাহিয়ানা দিতে লাগিলেন; কয়েকটী নিরাশ্রয় ব্যক্তির কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং কয়েকটী নিরুপায় লোকের অন্ন যোগাইতে লাগিলেন। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ লইয়া নিজ হস্তে কয়েকটি রোগীকে খাওয়াইতেন। আফিসের কার্য্য করিয়া যতটুকু সময় অবসর পাইতেন, এই রূপে তাহা ব্যয়িত হইত। এই সময়ে বর্ত্তমান্ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্বনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নড়ালে ওয়ার্ডস্ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি অতিশয় সদাশয় লোক; দরিদ্রের সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার হস্ত উন্মুক্ত ছিল। তিনি গিরিশ বাবুকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। চরিত্রগুণে রাধাকান্ত বাবু আজও নড়ালে পূজিত; আজও তাঁহাকে কেহ ভুলিতে পারে নাই। "হিতৈষী ফণ্ড" যাহাতে বিশেষভাবে কার্য্য করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, মনে কষ্টও হয়, যে অনেকে নিয়মিতরূপে বা একেবারেই চাঁদা না দেওয়ায় "ফণ্ড" বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কিন্তু

তথাপি গিরিশ বাবু ক্ষান্ত হইলেন না। আয় অনেক কমিয়া গেল দিয়া তিনি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় বহু সংখ্যক লোকের সাহায্য করিতে পারিলেন না। এইরূপে, আস্তে আস্তে কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। তার পর, নড়ালে সুযোগ্য ডেপুটী শ্রীযুক্ত আবদুল খালেক্ মহোদয় আসিয়া গিরিশ বাবুর কার্য্যের বিষয় শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন, কিন্তু "ফণ্ডের" অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের যত্নে নড়াইলের অন্যতম জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী রায় মহাশয়ের সাহায্যে এক সভা আহূত হইল। ভদ্রমণ্ডলী অনেকেই চাঁদা দিবেন বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে অনেকেই কথা রাখিতে পারেন নাই। এই সব দেখিয়া গিরিশ বাবু এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, গৃহস্থেরা ফকীর কাঙ্গালকে ভিক্ষা দিয়া থাকে; সুতরাং যদি তিনি আতুর এবং দরিদ্রগণের হইয়া ভিক্ষা করিতে পারেন, তবে তাঁহার ইচ্ছা সফল হইতে পারে। এই মনে করিয়া তিনি প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে একটী একটী হাঁড়ী দিয়া আসিলেন এবং বলিলেন "আপনারা যেমন কাঙ্গাল, বৈষ্ণব ইত্যাদিকে প্রত্যহ ভিক্ষা দেন, সেইরূপ আমারও এই হাঁড়ীটীকে একটী কাঙ্গালের হাঁড়ী মনে করিয়া ইহাতে একমুষ্টি চাউল প্রত্যহ রাখিবেন।" এইরূপ করিয়া গৃহস্থের নিকট সাহায্য পাইতে লাগিলেন এবং অন্য অন্য লোকে দয়া করিয়া যে কিছু পয়সা দিতেন, তাও ফণ্ডে জমা হইতে লাগিল। ইহাতে "হিতৈষীর" কার্য্য চলিতে লাগিল। দুইটা আতুরকে তাঁহার নিজের বাড়ী আনিলেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার পরিবারের মধ্যে রাখিয়া নিজেই আহার ইত্যাদির ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। ইহাদের একটী বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত বৃদ্ধ, আর একটী পঙ্গু বৃদ্ধা। বৃদ্ধার পায়ে খুব বড় ঘা ছিল। নিজ হস্তে তাহার ঘা ধোয়াইয়া দিতেন। এবং আবশ্যকমত তাহাদের মলাদি পরিষ্কার করিতেন। ঔষধ পথ্য তিনি নিজ হস্তেই খাওয়াইতেন। কোন ঘটনোপলক্ষে তিনি তাঁহার আশ্রিত দরিদ্রমণ্ডলীকে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। তখন তাঁহার বাড়ীতে এক নূতন উৎসব হইত।

এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে তাঁহাকে স্থানান্তরে বদলী হইতে হইল। কিন্তু তিনি যখনই যেখানে গিয়াছেন, তখনই তথাকার দরিদ্র আতুরগণ তাঁহার স্নেহ, তাঁহার সেবা পাইয়াছে। কিন্তু নড়ালে নিজ বাসস্থানে থাকিয়া, তিনি যেরূপ ভাবে হাঁড়ীর ব্যবস্থা করিয়া-

ছিলেন, সেরূপ আর কোথায়ও করিতে পারেন নাই। তবে এই হাঁড়ীর প্রথা তাঁহার কোন পরিচিত ভদ্রলোক খুলনা জেলার সেনহাটীগ্রামে প্রচলিত করিয়া অন্য অন্য স্থানেও যাহাতে ইহার প্রচলন হয় এই উদ্দেশ্যে "সঞ্জীবনীর" স্তম্ভে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। বাগেরহাটে যাইয়া (শুনিয়াছি) তিনি গ্রামবাসীর নিকট এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের নিকট দরিদ্রের জন্য চাউল ভিক্ষা করিতেন। আফিস হইতে আসিয়া সন্ধ্যাবেলায় ঝোলা লইয়া একাকী বাসায় বাসায় ফিরিতেন। কিন্তু বাগেরহাটের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি সময় সময় অসুস্থ হইতে লাগিলেন। এই সময়ে (তাঁহার মুখে শুনিয়াছি) কয়েকটি ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে অতঃপর আর রোগী লইয়া তাঁহাকে একাকী রাত্রি জাগিতে হইবে না; সকলে সমভাগে রাত্রি বিভক্ত করিয়া কার্য্য করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাকেই একাকী রাত্রি জাগিতে হইত। এখানে এই ভাবে কিছুদিন কাটাইলেন। সুখের বিষয়, এক্ষণে তিনি আফিসের কার্য্যে উন্নতি লাভ করেন। এখানে অস্থায়ী সেরেস্তাদারীরূপে কিছুদিন কার্য্য করিয়া খুলনায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েন। খুলনায় আসিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইল। কিন্তু এখানেও তাঁহার কার্য্যের বিরাম ছিল না। এখানেই দাসাশ্রমের ২।৩ জন সেবকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। সেবকগণ দেখিলেন যে, তাঁহারা কলিকাতায় বৃহৎ ভাবে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেই কার্য্যই স্বল্প-ভাবে গিরিশ বাবু বহুপূর্ব্ব হইতে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। দাসাশ্রমের কার্য্যের সহিত [illegible]মূলক সহানুভূতি ছিল। তিনি খুলনা হইতে দাসা-শ্রমে রোগী পাঠাইতেন এবং ছুটির সময় যখন বাড়ী আসিতেন, তখন নড়ালে যে সমস্ত অনাথ চিররোগী দেখিতেন তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তথায় যাইতেন। সময়াভাবে দাসাশ্রমের অন্য কোন সাহায্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু নিজের অবস্থানুসারে আর্থিক সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

খুলনায় রোগীর সংখ্যা ক্রমে বেশী হইল; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের নিরাশ্রয় নিঃস্ব লোকও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইহা ব্যতীত রোগাক্রান্ত পথিকেরও অভাব ছিল না। আবার স্থানীয় হাঁসপাতালের আতুরগণের সাহায্যও তাঁহাকে সময় সময় করিতে হইত। অনেক সময়ে তাঁহাকে আফিসের কঠিন শ্রম করিয়া আসিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া অনিদ্রায়

রজনী কাটাইতে হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি রোগীর মৃত্যু হইত, তবে আর কষ্টের সীমা থাকিত না। কাষ্ঠ সংগ্রহ এবং শ্মশানে শব আনয়ন ইত্যাদি একাকী করা যায় না। এ সমস্ত বিষয়ে তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতেই হইত। কিন্তু তাহাও যাহাতে একাকী করিতে পারেন এরূপ বন্দোবস্তও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি কাষ্ঠ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জমা রাখিতেন এবং শব লইয়া যাইবার জন্য একাকী টানিয়া লইয়া যাইতে পারেন এরূপ এক প্রকার গাড়ী কলিকাতা হইতে আনাইয়াছিলেন। দরিদ্রের সেবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয় জাগ্রত ছিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একটু বৃদ্ধি হয়, সেই চিন্তাই অনেক সময়ে তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখিত। খুলনায় গবর্ণমেণ্টের যে হাঁসপাতাল আছে, তাহাতে অধিক লোকের স্থান সঙ্কুলন হয় না এবং ভৃত্যগণেরও তত্দূর কর্ত্তব্যজ্ঞান না থাকায় অনেক সময় দরিদ্র রোগীদিগের বড় কষ্ট হয়। এই সমস্ত দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, খুলনায় অন্য একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা উচিত। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের বাসস্থান স্বতন্ত্র করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি স্থানীয় সদাশয় ভদ্রমণ্ডলীর নিকট তাঁহার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। অনেকে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। খুলনার উদারচরিত সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত পি, আ[illegible] জগন্নাধম্ মহাশয় তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন, এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন—যাঁ[illegible]কতা এবং পরোপকারিতাগুণে খুলনাবাসিগণ চিরকাল মো[illegible]র সাহায্যে গিরিশ বাবুর দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—সেই হরিমোহন বাবুও তাঁহার সহিত এ কার্য্যে যোগদান করিলেন। চাঁদা সংগ্রহ হইতেছিল; তি[illegible] অদম্য উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিতেছিলেন; কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইল। আশা করি, খুলনাস্থ অন্যান্য পরদুঃখকাতর, হৃদয়বান্ সদাশয় মহোদয় তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দরিদ্র-আতুরগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে দরিদ্রগণ যে অভাব বোধ করিতেছে, আশা করি, সহৃদয় মহোদয়গণ তাহা পূরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

নিম্নে এই দয়াশীল মহাত্মার জীবনের কয়েকটি আখ্যায়িকা বিবৃত হইল।

দুঃখিজনের দুঃখ দূর করিবার জন্য যেমন তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ও প্রসারিত ছিল, তেমনি পারিবারিক অসচ্ছলতা অপনয়নের জন্য তিনি অনেক সময়ে যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু কখনই কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও কম ছিল না। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর কিছু দিন পরে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার গর্ভে চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও তাঁহার একমাত্র পুত্রও বর্ত্তমান। পুত্রগুলি সকলেই নাবালক। ইহাদের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যয় এবং অন্যান্য আবশ্যকমত ব্যয় সঙ্কুলন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এরূপ অবস্থাপন্ন হইলেও তিনি কখনও অবৈধরূপে টাকা লইতেন না। এবং এরূপ নিঃস্বভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও কোনদিন তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য, মনের শান্তি, হৃদয়ের প্রফুল্লতা নষ্ট হয় নাই। পারিবারিক নানাবিধ অশান্তির মধ্যে থাকিলেও তিনি কখনও ক্রোধের বশীভূত হন নাই। তিনি এতদূর ক্ষমাশীল ছিলেন যে অনেক সময়ে তাহা দোষে পরিণত হইত। প্রতিবেশী ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন। সকলের সহিতই সমভাবে তিনি মিশিতেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গ শোকসাগরে মগ্ন। তাঁহার আত্মীয়গণ, পরিচিত ভদ্রমণ্ডলী, স্নেহভাজন প্রতিবেশিগণ, সকলেই শোকাকুল। দরিদ্র, আতুর, নিরাশ্রয় অক্ষমগণ তাঁহার বিহনে হাহাকার করিতেছে।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে নড়ালে একটী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া পূর্ব্বকার ডিস্পেন্সারীর বারান্দায় পড়িয়া থাকে। রোগে তাহার অঙ্গুলি-গুলি খসিয়া পড়িতেছিল এবং ক্ষতস্থানে পোকা পড়িয়াছিল। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিয়া সরিয়া যাইত। অনেকে ডিস্পেন্সারীর ঘাটে যাওয়াও বন্ধ করিল। ২।১ জন সহৃদয় ভদ্রলোক তাহাকে কিছু কিছু আহার্য্য দিতেন; কিন্তু তাহাতে যদি তাহার উদর সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ না হইত, তবে বড়ই কটু কথা বলিয়া গালি দিত। এই সব নানা অসুবিধায় কয়েকজন ভদ্রলোক তাহাকে তাড়াইবার উপায় স্থির করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা গিরিশ বাবুকে খবর দিলেন। তিনি প্রাতঃকালে তাহার নিকট যাইয়া অম্লানবদনে তাহার ঘা ধোয়াইয়া দিলেন, পোকা যতদূর সম্ভব বাছিয়া

ফেলিলেন এবং ক্ষতস্থানে ঔষধ লেপন করিয়া দিলেন। তিনি নিজেই স্বহস্তে তাহাকে খাওইয়া দিলেন। এইরূপ ২।৩ দিন করিলে পর উক্ত ভদ্রমণ্ডলী তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তৎপরে লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যতদিন তাহার পাথেয় সংগ্রহ করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন তাহাকে বিশেষ যত্নসহকারে সেবা করিতে লাগিলেন। যাইবার পূর্ব্বে একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার কি খাইতে ইচ্ছা করে। পিষ্টক খাইতে ইচ্ছা আছে, ইহা প্রকাশ করিলে পর তিনি অতিকষ্টে তাহার জোগাড় করিলেন। এবং অতীব আনন্দ সহকারে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রমে পাঠাইবার পর, তিনি ২।১ বার তথায় যাইয়া তাহার সহিত দেখা করিতেন। বলা বাহুল্য রোগীটী তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁহার নিকট তখন প্রকাশ করিত।

নড়ালের পূর্ব্বকার ডিস্পেন্সারীর পাদদেশ ধৌত করিয়া চিত্রা নদী বহিয়া যাইতেছে। এই ডিস্পেন্সারীর দুইটী ঘর আছে। ডিস্পেন্সারী স্থানান্তরিত হওয়ায় ইহার একটী ঘরে বিদেশীয় অসহায় রোগিগণকে আশ্রয় দেওয়া হইত। এক সময়ে একটী বালক—বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে—জলোদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া কিরূপে যেন নড়ালে উপস্থিত হয়। বালকটীকে পথে দেখিয়া তিনি সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহার কেহ নাই। তিনি তাহাকে উক্ত স্থানে আনিলেন এবং তদানীন্তন ডাক্তার বাবুকে তাহার চিকিৎসার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বাবু সম্মত হইলেন। তাহাকে উপর্য্যুপরি দুইবার Tap করিবার পর বালকটী দুরারোগ্য রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইল। কিন্তু সে যতদিন সেখানে ছিল, ততদিন তিনি স্বহস্তে তাহার কাপড়, মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়াছিলেন। বাটী হইতে আহার্য্য লইয়া যাইয়া তাহাকে আহার করাইতেন। আর একটী এই রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোক এইখানে তাঁহার তত্বাবধানে ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সে ব্যারাম হইতে রক্ষা পায় নাই।

একটী ওলাউঠা রোগাক্রান্ত লোককেও তিনি এই স্থানে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহার ব্যারাম আরোগ্য করিতে পারিলেন না।

কলিকাতায় যাইয়া, তিনি প্রায়ই স্থানীয় জমীদার তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কাশীপুরস্থ ভবনে থাকিতেন। একবার তিনি তথায় কিছুদিন অবস্থান করিবার পর একদিন শুনিলেন যে, জমীদার বাবুর বাটীর অতি নিকটবর্ত্তী একটী বৃদ্ধা মেথরাণীর ওলাউঠা হইয়াছে। এই মেথরাণী জমীদার বাবুরই নিয়োজিত ভৃত্য। বাবুর কর্ম্মচারী সকলেই দূরে থাকিয়া ঔষধাদি ব্যবস্থা করিলেন; কেহই তাহার নিকটে যাইয়া ঔষধ পথ্যাদি খাওয়াইতে স্বীকৃত হইলেন না বা সাহসী হইলেন না। তিনি এ সংবাদ শুনিয়া তাহার ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া প্রাতঃকালে তাহাকে একটু সুস্থ করিলেন; এবং আরও ২।৩ দিন থাকিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করিলেন।

বাগেরহাট থাকিবার সময়, একদিন একটী রোগী পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে, তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে; কারণ সে তখন ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ একখানি ঘরে আশ্রয় দিলেন; এবং সেই সময় হইতেই ঔষধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। আফিসের পরিশ্রমের পর একাকী রাত্রিজাগরণ করা বড় কষ্ট হইবে বুঝিয়া, তাঁহার কয়েকটী পরিচিত ভদ্রলোককে ডাকিলেন; এই মহোদয়গণই তাঁহাকে সেবা সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যকালে কেহই অগ্রসর হইলেন না। সকলেই নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অকৃতকার্য্য হইলেও তিনি নিরুদ্যম হইলেন না। নিজেই একাকী রাত্রিজাগরণ করিবেন, কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমরা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াও তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। গভীর নিশীথে যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটু চিন্তিত হইলেন। তার পর যে কি করিলেন তাহা আমাদের ঠিক স্মরণ নাই।

খুলনার নিকটবর্ত্তী কোন একগ্রামে একটী লোকের সর্ব্বাঙ্গে ঘা হইয়া পোকা পড়িয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধু কেহই না থাকায় তাহার শুশ্রূষা নিয়মমত হইতেছিল না। গিরিশ বাবু এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন। এবং সেই অবধি প্রত্যহ বিকালে আফিস হইতে

আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার ঘা ধোয়ান, পোকা ছাড়ান, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া ঔষধ দিয়া আসিতেন। লোকটী তাহার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দেখিয়া মনে মনে কিছু সন্দিহান হইল। দুষ্ট লোকেও তাহার সে সন্দেহ-অগ্নিতে বাতাস দিতে ক্রটী করিল না। কলি কালে এরূপ লোক নাই যে, স্বার্থসাধন ব্যতীত পরোপকার করিতে যায়; এই বিশ্বাসে তাহারা তাহাকে (রোগীকে) বলিল যে, কলিকাতায় কোম্পানী বাহাদুরের মানুষের তেলের দরকার, তাই বাবু তোমাকে একটু সুস্থ হইলে কলিকাতায় পাঠাইবেন। এই কথায় তাহার এতদূর বিশ্বাস জন্মিল যে, একদিন বিকালে গিরিশ বাবু যখন তাহার ঘা ধোয়াইবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন সে ক্রোধকম্পিত স্বরে তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আমার এখানে আর আপনার আসিতে হইবে না; আপনি আমার গায় হাত দিবেন না। আমি আপনার কু অভিপ্রায় বুঝিয়াছি।" তিনিত ইহা শুনিয়াই অবাক্; অনেক বুঝাইয়াও তিনি তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি তথায় যাওয়া স্থগিত করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই রোগীটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি তাঁহার নিজের বাসায় একটী চলৎ-শক্তিহীন পঙ্গুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। পঙ্গুটীর মলমূত্র তিনি নিজেই পরিষ্কার করিতেন। এবং স্বহস্তেই তাহাকে খাওয়াইতেন। রোগী তাহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অনেকটা স্বচ্ছন্দে থাকিত। তাঁহার যে দিন মৃত্যু হইল, সে দিন রোগীর হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে সকলের চক্ষেই জল আসিয়াছিল।

রোগীটীকে তৎপরে তাহার কোন সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

পাঠক পাঠিকাগণ যাঁহার জীবন রোগীর সেবায় অতিবাহিত হইয়াছে, যাঁহাকে পরসেবার জন্যই প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে, তাঁহার সেবাসংবাদ দুই একটা লিখিলে কি হইবে? তিনি যে ডায়েরী লিখিতেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে কিছুই লেখা না থাকায়, আমরা তাহার সকল গুলি জানিও না। তথাপি মনের মধ্যে যে দুই একটী স্বতঃই উদিত হইল, এবং আত্মীয় বন্ধুগণের মনে যেগুলি বিশেষভাবে মুদ্রিত হইয়া আছে, তাহারই ২।১টা এখানে উল্লেখ করিলাম। ইহাতেই হয়ত বুঝিবেন, কি

ভাবে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন। এই লোকসেবা করিতে তাঁহাকে অনেক সময় অন্যের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে—ধনীর রোষকষায়িত নেত্র দেখিতে হইয়াছে। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইহার কোন দিকেই লক্ষ্য করেন নাই। লোকসেবাই যিনি জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সংসারের ভীতি প্রদর্শন কি? তিনি কল্য যেখানে তিরস্কৃত হইয়াছেন, আজ সেখানে পূজিত। স্বার্থপর বিষয়াসক্ত মানব তাঁহার উচ্চ লক্ষ্যের গরিমা বুঝিতে পারিত না। মহৎ লোকেই মহতের মহত্ত্ব বুঝে। এই জন্যই বরিশালের স্বনামখ্যাত পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় খুলনার প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর, দুই হস্তে গলা ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "গিরিশ বাবু, ধন্য আপনি; ধন্য আপনার জীবন; মানব-জীবনের মহদুদ্দেশ্য আপনিই সম্পন্ন করিতেছেন।" এই জন্যই কলিকাতায় দাসাশ্রমের সেবকগণ তাঁহার সহিত এত শীঘ্র সখ্যস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। নড়ালের নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। নড়ালে এমন অসহায় দরিদ্র বা রোগী খুব কমই ছিল, যে কোন দিন কোন রকমে তাহার সাহায্য না পাইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা অনেককেই তাঁহার মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। খুলনার সাধারণ লোকেও তাঁহাকে বিশেষরূপ জানিত।

শ্রীবিনোদবিহারী ঘোষ।

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

২

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আরম্ভেই জ্ঞানগত ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রথম প্রবন্ধে ইহা দর্শাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, জ্ঞান-মূলক ধর্ম্মই 'সত্যধর্ম্ম';—ধর্ম্মের অপর কোন মূল নাই। ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য যে কোন পথই অবলম্বন করা যাউক না কেন, অবশেষে মূল ধরিতে গিয়া জ্ঞানের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইতে হয়। জ্ঞানার্জ্জনই ধর্ম্মলাভের এক-মাত্র প্রশস্ত উপায়। এক্ষণে জ্ঞান কি উপায়ে অর্জ্জিত হইতে পারে, তদ্বি-ষয়ের আলোচনা করা যাউক।

বাল্যকালে 'বোধোদয়' গ্রন্থে ইহা পাঠ করিয়াছি যে "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ।" অর্থাৎ জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারাই মানুষের মানসক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। চক্ষু দর্শন করিতেছে, কর্ণ শ্রবণ করিতেছে, নাসিকা আঘ্রাণ করিতেছে, জিহ্বা আস্বাদন করিতেছে এবং ত্বক্‌ স্পর্শ করিতেছে। কিন্তু এই সমুদয়ে কি জ্ঞানলাভ করা হইল? আমরা ত অনেক সময় চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকি, অথচ কি দেখি কিছুই বুঝিতে বা বলিতে পারি না। লোকে দেখিলে কিম্বা শুনিলে বলে 'তোমার মন কোথায় ছিল?' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মনকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে নিয়োজিত না করিলে জ্ঞানলাভ ঘটিতে পারে না। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয় বাস্তবিক পক্ষে মনের দ্বার মাত্র, উহাকে 'জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ' বলিলে খাটি অর্থ প্রকাশ পায় না। মন স্বীয় অন্তপ্রর্কোষ্ঠ পরিহার করিয়া ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া, যখন জ্ঞানাহরণে প্রবৃত্ত হয় তখনই মানুষের জ্ঞানলাভ ঘটিয়া থাকে। অতএব এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে 'ইন্দ্রিয় মনের দ্বারস্বরূপ; যাহা দ্বারা মন বহির্জ্জগতে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানাহরণ করিতে সক্ষম হয়।' এই প্রকারে আহরিত জ্ঞানকে সাধারণতঃ 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান' বা 'বিজ্ঞান' বলা যায়। মানুষ ইন্দ্রিয় সাহায্যে বহির্জ্জগতে মনঃসংযোগ করিয়া তাহার ক্রিয়া কলাপ প্রত্যবধান করতঃ যে সমুদয় সত্য আহরণ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদিগের সমষ্টিকেই 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর এক উপায়ে মানুষের জ্ঞানাহরণ ঘটিয়া থাকে; ঐরূপে আহরিত জ্ঞানকে আমি এ স্থলে 'পরোক্ষ জ্ঞান' বলিব। জগতে 'প্রকৃতি' এবং 'পুরুষ' উভয়ই বিদ্যমান আছে; প্রকৃতির অভিব্যক্তিকে বহির্জ্জগত এবং পুরুষের অভিব্যক্তিকে অন্তর্জ্জগত বলা যায়। বহির্জ্জগত পর্য্যালোচনা দ্বারা যে জ্ঞান সমাহৃত হয় তাহাকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হইয়াছে। এবং অন্তর্জ্জগত পর্য্যালোচনা দ্বারা যে জ্ঞান সমাহৃত হয় তাহাকে সাধারণতঃ 'দর্শন' কহে, এ স্থলে তাহাকে 'পরোক্ষ' জ্ঞান বলা যাইতেছে। প্রত্যক্ষতই হউক কিম্বা পরোক্ষতঃই হউক, জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তিনটী প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হয়; যথা,—আহরণ, ধ্যান ও ধারণা। জ্ঞানকে প্রথমে শিক্ষা সাহায্যে আহরণ করিয়া লইতে হইবে, তৎপর তাহাকে ধ্যান দ্বারা মানসগোচর করিতে হইবে, তদনন্তর ধারণা দ্বারা তাহাকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে হইবে। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে সাধারণতঃ 'দর্শন'

নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে অনেকে সমাহৃত জ্ঞানের ধারণাকেই অন্তর্জগত পর্য্যালোচনা বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন ; এ কারণ দুইটী পরস্পর স্বতন্ত্র প্রক্রিয়াকে একই (অর্থাৎ 'দর্শন') নামে অভিহিত করা হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে, অন্তর্জগত পর্য্যালোচনার্থ মনকে আপন অন্তর্প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া বহির্জগতে প্রবেশ করিতে হয় না, অতএব পরোক্ষ জ্ঞান কেবলমাত্র ধ্যান ও ধারণার বিষয়ীভূত এবং তদনুধাবন দ্বারা আয়ত্তীকৃত করিতে হয় ; তাহাতে আহরণ প্রক্রিয়াটি আদবেই বিদ্যমান থাকে না। বাস্তবিক কি তাই ? এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অন্তর্জগত পুরুষের অভিব্যক্তি। প্রকৃতি যেরূপ ইন্দ্রিয়গোচর হয় পুরুষ সেরূপ হয় না। কিন্তু প্রকৃতিতে পুরুষের কার্য্য ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে ; ইহাকে সাধারণতঃ ভাষায় 'শক্তি' কহে। এই শক্তির জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে হইলে, প্রকৃতিতে তাহার কার্য্য পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কোন ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, এবং কেই বা আমাকে ঘৃণা করে, কাহার প্রাণে কোন্ চিত্তবৃত্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা ধারণা করিবার উপায় নাই। (আমি এস্থলে 'যোগ' প্রণালীকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় নিরোধকরণশীল একটী প্রক্রিয়া মাত্র মনে করিতেছি ; তাহা দ্বারা যে অনাহরিত জ্ঞান আয়ত্তীকৃত হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার বা সিদ্ধান্ত করিয়া লইতেছি না)। এইরূপ যাবদীয় অন্তর্জগতের কার্য্যই প্রকৃতিতে শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় ; অতএব জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, অন্তর্জগত এবং বহির্জগত উভয়তঃই জ্ঞানকে আহরণ করিয়া লইতে হয়। জ্ঞান আহরিত হইলে, মন তাহাকে অন্তর্প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া গোপনে তাহার অন্তর্বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুভূতি লব্ধ করিয়া লয় ; ইহারই নাম 'ধ্যান'। ধ্যান কাহারও নিকট নূতন জিনিস নহে ; বাল্যকালে পাঠ অভ্যাস করিবার সময় একটি কথাকে বারে বারে আওড়াইয়া মুখস্থ করিয়া লওয়া ধ্যানের প্রথম সোপানমাত্র। এইরূপে অনুভূত এবং অভ্যস্ত হইয়া গেলে, তখন জ্ঞান মানুষের চেতনার সহিত মিলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে ; ইহাকেই ধারণা 'বলা' হইয়াছে। মনে করা যাউক একটি লোক জ্যোতির্ব্বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে ; তাহার প্রথম কার্য্য গগনে জ্যোতিষ্কের চলাচল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ফলকে গণিত

যন্ত্রে পিষিয়া তাহা হইতে প্রকৃতিসম্ভূত জ্ঞান আহরণ করা ; তদনন্তর ঐ আহৃত জ্ঞানকে অন্তপ্র্কোষ্ঠে সমাবিষ্ট করিয়া তাহাকে অনুভূতির আয়ত্তাধীন করিতে হইবে। বারম্বার অনুভূতি বা ধ্যানের কবলে নিষ্পেষিত হইয়া তাহা ক্রমশঃ জীবনের সহিত এমন ওতঃপ্রোত হইয়া যায় যে, তখন আর তাহাকে আহৃত জ্ঞান বলিয়া উপলব্ধি না করিয়া আপন চেতনায় অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করা হয়। ইহাকেই জ্ঞানলাভ বলা যায়। গ্যালিলিও পৃথিবীর ঘূর্ণন মত প্রচার করণাপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি যখন কারামুক্ত হইলেন তখন কারাগারের বহিঃপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় সজোরে ভূতলে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে "এই ত পৃথিবী ঘুরিতেছে, আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি।" এবম্বিধ উপলব্ধিকেই জ্ঞানলাভ বা 'দর্শন' বলা যায়।

গতবারে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে তাহা এই উপলব্ধ জ্ঞান। মানুষ বহির্জগতই পর্য্যালোচনা করুন কিম্বা অন্তর্জগতই পর্য্যালোচনা করুন, উভয় স্থলেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানকে বহির্জগত হইতে আহরণ করিয়া লইয়া 'দর্শনের' আয়ত্ত করিতে হইবে, তাহা হইলেই উপলব্ধি ঘটিবে। এস্থলে জ্ঞানাহরণের অকুশলতা হেতু যে একটি শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হয় তাহা বলা আবশ্যক। মন যদি জ্ঞান আহরণার্থ বহির্জগতে প্রবেশ করিতে পরাঙ্মুখ হয়, অথচ ইন্দ্রিয়দ্বার অবারিত থাকাতে বাল্যকাল হইতে যে সকল জ্ঞান আপনা আপনি অন্তপ্র্কোষ্ঠে প্রবেশলাভ করে, তাহাদিগের ধ্যান ও ধারণাতে অভিনিবিষ্ট হয়, অথবা যদি কথঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণ করিয়া তদনন্তর অন্তপ্র্কোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্জ্জিত জ্ঞানেরই পৌনঃপুনিক ধ্যান ধারণাতে নিয়োজিত থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে কেবল উপলব্ধ জ্ঞানের মাত্রা হ্রস্ব হয়, তাহা নহে ; উহা দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রবল হইয়া উঠে। ইহাই অহঙ্কারের উৎপত্তির কারণ।

অতএব সচরাচর দেখা যাইবে যে, যে স্থলে জ্ঞানাহরণে শৈথিল্য কিম্বা বিরক্তি ঘটিয়াছে অথচ মন ধ্যান ও ধারণা হইতে নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থিতি করিতেছে না, সে স্থলেই অহঙ্কারের উৎপত্তি এবং বিভূতি ঘটিতেছে। মানুষ সর্ব্বক্ষণ কেবল নিজের দোষ দর্শনে উন্মুখ থাকিতে পারে না, আপনাকে আপনি পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেই দোষ এবং গুণ উভয়েতেই মনঃসংযোগ অতি স্বাভাবিক। একারণ আত্ম-চিন্তার একটি অবশ্যম্ভাবী ফল

'অহঙ্কার'! জগতে সক্রেতিস্ অতি অল্প, এ কারণ অহঙ্কার এত বেশী। পূর্ব্বে যে ভাষা ও সংজ্ঞা সকল ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সহজে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বহির্জগত হইতে জ্ঞানাহরণের নামই 'বিজ্ঞান'; (যদি তাহা প্রকৃতিবিষয়ক হয় তবে তাহাকে 'পদার্থ-বিজ্ঞান' বা 'প্রকৃতি-বিজ্ঞান' বলা যাইবে, এবং যদি তাহা পুরুষ বিষয়ক হয় তবে তাহাকে 'মনোবিজ্ঞান' নামে অভিহিত করা হইবে।) আহরিত জ্ঞানকে ধ্যান ও ধারণার আয়ত্তীকরণের নাম 'দর্শন'। যে স্থলে বিজ্ঞানহীন দর্শনের প্রাচুর্য্য তথায়ই অহঙ্কারের প্রাদুর্ভাব! ইহার দৃষ্টান্ত হিন্দু পণ্ডিতদিগের (বিশেষতঃ 'বৈদান্তিক' অর্থাৎ বিজ্ঞানবিহীন বেদান্তাধ্যায়ী) মধ্যে অতি সাধারণ। অপরদিকে দর্শনবিহীন বিজ্ঞানও যে একান্ত অসম্ভাবনীয় ব্যাপার তাহা নহে;—এমন লোক অপ্রতুল নহে যিনি সূর্য্যকে জড়পিণ্ডরূপে জ্ঞানায়ত্ত করিয়া গিয়া পরক্ষণেই তাহাকে আবার "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং" ইত্যাদি রবে সম্ভাষণ ও অভিবাদন করিতেছেন।

গতবারে আমরা ধর্ম্মকে জ্ঞানমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা জ্ঞানকে বিজ্ঞান ও দর্শন এই দুই অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছি এবং ইহাও দর্শাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বিজ্ঞান হইতে দর্শনে সমারূঢ় না হইলে জ্ঞানের উপলব্ধি ঘটে না। জ্ঞানের উপলব্ধি না ঘটিলে তাহা ধর্ম্মের মূল হইতে পারে না। ইহাও দেখিতে পাইয়াছি যে, বিজ্ঞানবিহীন দর্শন অন্ধের ন্যায় আপনাতেই আপনি নিমজ্জিত হইয়া অন্ধকারে বা অহঙ্কারে জীবন যাপন করে। আমি সোজাসুজি ধর্ম্মকে এক এক পা করিয়া পিছাইয়া আনিয়া বিজ্ঞানের স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া দিতেছি; কিন্তু বিজ্ঞানের যে ধর্ম্মবিরোধিতা বিষয়ে একটী অপবাদ রহিয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত ক্ষালন করিতে চেষ্টা করি নাই। আগামী বারে বিজ্ঞানকে ধর্ম্মবিরোধিতা দোষ হইতে বিমুক্ত করিয়া, তাহাকে ধর্ম্মের মূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিব এবং ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব যে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাই একমাত্র সত্য এবং স্থিতিশীল ধর্ম্ম হইবে।

গতবারে জ্ঞানাশ্রিত সংস্কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, সমাজবদ্ধ সংস্কার জ্ঞানের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইতে না পারিলে ঐ সমাজে কুসংস্কারের অভ্যুদয় হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান

প্রবন্ধে আমরা ইহা দেখিয়াছি যে, দর্শন বিহীন বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞানবিহীন দর্শন কিম্বা উভয়েরই বিহীনতা হইতেই মানুষের চিত্তবিভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে। এই সকল কারণ যে সমাজে বর্ত্তমান সেই সমাজে জ্ঞানের অধোগতি হেতু উপলব্ধির অভাব ঘটিতে আরম্ভ করে। যখন উপলব্ধি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ফল সংস্কারের উপর গিয়া প্রতিফলিত হয়। ইহাই সংস্কারের কুভাবাপন্ন হইবার একমাত্র কারণ। কুসংস্কার কোন সমাজে আপনি জন্মাইতে পারে না। জ্ঞানাশ্রয়ে সংস্কারের অভ্যুদয় হইলে তাহা যখন সামাজিক ব্যক্তিবর্গের উপলব্ধির সংস্পর্শে আনীত হয় তখন তাহাদিগের উপলব্ধির সঙ্কীর্ণতা ঘটিলেই তাহা কুভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ করে। উপলব্ধিকে সংস্কৃত রাখিবার একমাত্র উপায় 'দর্শন.' এবং দর্শনকে সঞ্জীবিত রাখিবার একমাত্র উপায় বিজ্ঞান। এইরূপে জ্ঞান ও সংস্কার উভয়কেই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উপস্থাপিত করিলে ধর্ম্মকে একান্তই বিজ্ঞানের স্কন্ধে আনিয়া ফেলিতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত।

দাসাশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক সভার কার্য্যবিবরণ।

১৮৯৬ সালের ২০শে জানুয়ারী সোমবার বেলা ৫টার সময় এলবার্ট হলে দাসাশ্রমের পঞ্চম বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। মৌলবী সিরাজ উল্ ইস্লাম খাঁ বাহাদুর হাইকোর্টের উকীল এবং ভূতপূর্ব্বইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে অনেক গণ্য মান্য ভদ্রলোক, জমিদার এবং ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। স্থানাভাবে অনেককে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে হয়। সভাপতির অনুমতি ক্রমে দাসাশ্রমের পূর্ব্ব বৎসরের সম্পাদক বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী গত চারি বৎসরের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। তাঁহার সার মর্ম্ম এখানে প্রদত্ত হইল।

১৮৯১ সালের ২৭এ জুন বসিরহাট সবডিবিজানের অন্তর্গত জালালপুর নামক গ্রামে দুটি নগণ্য যুবক এই দাসাশ্রম প্রথমতঃ স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে দুইটী যুবক কলিকাতায় আসিয়া স্কুলের বালকগণের "রিলিফ্ ফ্রেটারনিটী" নামক সভার সঙ্গে এক যোগে রোগীদের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, এমন অসহায় রোগী অনেক আসিয়া

পড়ে যে, নিজেদের একটা ঘর না হইলে এ সকল রোগীর সেবার বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। তদনুসারে ৮০২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট ভাড়া করা হয়। এই সময় হইতে দাসাশ্রমের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথম বৎসর কয়েক মাস মাত্র কার্য্য হয়, তাহাতেই এখানে ১১টি রোগী আশ্রয়-প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৮ জন রোগী আতুর অনাথ বালক বালিকা এবং পতিতা রমণী দাসাশ্রমের সেবালয়ে আশ্রয়প্রাপ্ত হয়। এই বৎসরে ৮টী দাতব্য চিকিৎসালয় মফঃস্বলের স্থানে স্থানে স্থাপিত হয় ও তাহাতে ১০৫৬ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ আয় ২২৩৭ টাকা ব্যয়—২২৩০৸৶০। এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে "দাসী" নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিক বাহির হইতে থাকে, ইহার লাভ দাসাশ্রমের খরচার্থ ব্যয়িত হয়। এই দাসী হইতে এবৎসরে ৪৭৮৷৶১০ সাহায্য পাওয়া যায়। তৃতীয় বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৭ জন রোগী ও আতুর এই সেবালয়ে আশ্রয়-প্রাপ্ত হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে ৩৩৬০ জন রোগী হয়। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ আয় ২৯৫৩৶৫, মোট ব্যয় ২৯৫৩/৫। দাসী এ বৎসর ৫০৩৸/১৫ সাহায্য করে। চতুর্থ বৎসরে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নানা গোলমাল হেতু উন্নতিতে কিছু বাধা পড়ে। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮ জন রোগী ও আতুর সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এবৎসরে খরচ অল্প হইবে বলিয়া সেবালয় গিরিডিতে উঠিয়া যায়। রোগী ও আতুরগণ এত দূরদেশে যাইতে সম্মত হইত না বলিয়াই এবার সংখ্যা এত অল্প হইয়াছিল। এই সকল কারণে সেবালয়ের কার্য্যকারকগণ আবার সেবালয় উঠাইয়া কলি-কাতায় আনিয়াছেন। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ আয় ২৪৮৯৸৶১০ এবং মোট ব্যয় ২৪৮০।৶৭॥। "দাসী" ২১৬৸৶৭॥ সাহায্য করেন। এই ত গেল দাসাশ্রমের কার্য্যবিবরণী। বর্ত্তমানে ইহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। ১ম গৃহহীন অনাথ আতুর-গণকে সেবালয়ে রাখিয়া ভরণপোষণ এবং সেবা শুশ্রূষা, ২য় অসহায় দরিদ্র রোগিগণের সেবার ও চিকিৎসার সাধ্যমত ব্যবস্থা।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে হাইকোর্টের উকীল বাবু কালি-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল এবং মিঃ এ, সি, রায় তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কালি বাবু সকলকে অনুরোধ করেন, যেন সকলেই এই সভাস্থল হইতে মনে করিয়া যান যেন কোনও বিশেষ সংখ্যক মুদ্রার জন্য তাঁহারা দাসাশ্রমের নিকট ঋণী রহিলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বার্ষিক সভার কার্য্যবিবরণী ২রা ফেব্রুয়ারীর বঙ্গনিবাসীতে, ১লা ফেব্রুয়ারীর সঞ্জীবনীতে বিশেষভাবে বাহির হইয়াছে। সেই সপ্তাহের মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র "মিহির ও সুধাকর" দাসাশ্রমের অন্যান্য বিবরণের পর বলিতেছেন "এই মহৎ সৎকার্য্যে সাহার্য্য করা প্রত্যেক ধর্ম্মভীরু বড়লোকের একান্ত কর্ত্তব্য।"

সঞ্জীবনী কার্য্য-বিবরণী মুদ্রিত করিয়া বলিতেছেন—"এই কার্য্য-বিবরণী হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য কেমন মহৎ। কিন্তু বঙ্গবাসিগণ এমন উন্নত কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন না, কালীচরণ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, আমি দাসাশ্রমের নিকট কোনও বিশেষ সংখ্যক টাকার জন্য ঋণী। এক দিনে পারি, এক বৎসরে পারি আর আমরণ পারি দাসাশ্রমের সেই ঋণ আমাদিগকে শোধ করিতেই হইবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর কালীচরণ বাবুর এই কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। নানা কারণে ৪র্থ বর্ষে দাসাশ্রমের ৮০০৲ টাকা দেনা হয়, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় এ দেনা এখনও শোধ হইতেছে না। দাসাশ্রম এক্ষণে [illegible]বাসীর নিকট ১৫০০০৲ টাকার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা হইলে দাসাশ্রমের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া, একটী গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারিবে; এবং দাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠিত এলোপ্যাথিক ঔষধালয় ঋণ মুক্ত হইয়া দাসাশ্রমকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে। ইহাঁরা আরও ২৫০৲ টাকা মাসিক চাঁদা জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই দাসাশ্রমের দ্বারা দেশের অন্ধ, অনাথ, আতুরগণের এবং গৃহহীন, আত্মীয়বিহীন রোগিগণের যে মহৎ উপকার সাধিত হইতেছে, তদ্বিষয় স্মরণ করিলে মাসে ২৫০৲ টাকা চাঁদা এবং এককালীন ১৫০০০৲ টাকা কিছুই নয় বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই কোটি কোটি ভারতবাসিগণের মধ্যে কি এমন ১৫০০০ লোক নাই যে, একেবারে একটি টাকা দাসাশ্রমের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দান করেন? কলিকতার অগণ্য বড় লোক অথবা গৃহস্থের মধ্যে কি এমন ২৫০ জন পাওয়া যাইবে না, যাঁহারা এই অনাথ অতুরগণের এবং শত শত রোগিগণের মুখের দিকে তাকাইয়া মাসে একটি করিয়া টাকা চাঁদা দিতে পারেন? আমরা আশা করি, দানশীল উদারচেতা মহোদয়গণ দাসাশ্রমের অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন।"

বঙ্গনিবাসীও কার্য্যবিবরণী পর্য্যালোচনার পর বলিতেছেন—"উদ্দেশ্য

ত্রুটি অতি মহৎ। কিন্তু দাসাশ্রমের কার্য্যকারকগণ ভগ্নাবস্থ, ঋণগ্রস্ত ও ক্লান্ত হইয়া ভারতবাসিগণের নিকটে কাতরে ভিক্ষা চাহিতেছেন, এমন কেহ কি নাই যে ইহাদের ভিক্ষায় কর্ণপাত করে? "পাঁচের লাঠি একের বোঝা।" দাসাশ্রম এ সত্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। দাসাশ্রম এক পয়সা হইতে আরম্ভ করিয়া মাণিকদহের জমিদার বাবু বিপিনচন্দ্র রায়ের ২৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দান সমান আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, তাই বার্ষিক সভায় মাননীয় হাইকোর্টের উকীল বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন ভারতবাসী সকলেই মনে কর দাসাশ্রমের নিকট তোমরা সকলে কিছু কিছু টাকার জন্য ঋণপাশে আবদ্ধ। ভারতবাসী সেই ঋণ শোধের উপায় কর। এই বার্ষিক সভার এলবার্টহলে ২০শে জানুয়ারি অধিবেশন হয়। হল লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মৌলবী সিরাজ উল্ ইস্লাম খাঁ বাহাদুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় এবং মিঃ এ, সি, রায় বক্তৃতা করেন। দাসাশ্রম এই খানে ১৫০০০৲ টাকা সাহায্য পাইবার জন্য আবেদন করেন। এই টাকা হইলেই দাসাশ্রমের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া একটী বাড়ী নির্ম্মিত হইতে পারিবে, এবং দাসাশ্রম মেডিকেলহল ও দাসাশ্রমকে সহায্য করিতে পারিবে। ইহারা ২৫০৲ টাকা মাসিক চাঁদার জন্যও আবেদন করিয়াছেন। আমরা দানশীল স্বদেশবাসিগণের নিকট ইহাদের আবেদন জানাইতেছি। বঙ্গনিবাসীর বহুসংখ্যক গ্রাহক, যদি একটী করিয়াও টাকা দাসাশ্রমকে দান করেন, তাহা হইলে দাসাশ্রম উপকৃত হয়। অসহায় রোগী ও আতুরগণকে সেবালয়ে পাঠাইয়া দিলেও দাসাশ্রম উপকৃত হইবে।"

আমাদের অভাবের কথা আর আমরা নূতন করিয়া কি বলিব। ভরষা করি নব বর্ষে আমাদের দাসাশ্রমের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ নূতন উৎসাহের সহিত দাসাশ্রমের কার্য্যে সাহায্য করিবেন।

দাসাশ্রমের নূতন বৎসরের কার্য্য-ব্যবস্থা।

এ বৎসর কার্য্য সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহার্থ পূর্ব্ব বৎসরের কমিটি আর ছয়জন নূতন ভদ্রলোককে কমিটিতে গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণ দাসাশ্রম কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইলেন।

বাবু নীলরতন সরকার এম, এ, এম, ডি। বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম, এ, এম, বি (সম্পাদক)। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ। বাবু যদুনাথ ঘোষ এম, এ। বাবু প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস-সি। বাবু ফকির চাঁদ সাধুখাঁ এল্, এম্, এস্। বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ। বাবু ইন্দুভূষণ রায় (সেবালয়ের অধ্যক্ষ), বাবু মৃগাঙ্কধর চৌধুরী (সহকারী সম্পাদক), এবং বাবু ক্ষিরোদচন্দ্র দাস।

নূতন বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই দাসাশ্রমের সেবালয় পুনরায় কলিকাতার ৪৮ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে। এখানে আসিবার পর হইতে রোগী ও আতুর সংখ্যা ক্রমে বাড়িতেছে। আমরা আবার অসহায় রোগী-দিগকে লইতেছি। তবে সুবিধা হইলেই আমরা রোগীদিগকে কলিকাতা কালেজ হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিব। কারণ সেখানে চিকিৎসার যেমন সুব্যবস্থা হইবে এমন আর কুত্রাপি হইবার আশা নাই। আমরা এখনও অনেকগুলি আতুরকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের বন্ধুগণ ভরসা করি অনাথ আতুর পাইলেই যত্ন করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবেন।

দাসাশ্রমের একটি গৃহ হইলেই দাসাশ্রম প্রকৃত প্রস্তাবে স্থায়ী হয় বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান কমিটি গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহারা উপযুক্ত ট্রষ্টি নিয়োগ পূর্ব্বক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। আমরা ভরসা করি, এ সময়ে "দাসীর" গ্রাহক, পাঠক, দাসাশ্রমের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী সকলে মিলিত হইয়া একবার সমবেৎ চেষ্টা করুন যাহাতে দাসাশ্রম স্থায়ী হইতে পারে।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

১। বাবুরাম ২। রসিক চাঁদ ৩। ছৈয়লুন্না ৪। দেবিয়া ৫। দুর্গাতারিণী ৬। স্বর্ণ ৭। নবদুর্গা ৮। কুলমণি ৯। হীরামণি ১০। গজেশ্বরী ১১। পার্ব্বতী।

হীরামণি। উড়ীষ্যাবাসিনী; দুতোলার ছাদের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত অঘাতিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল দেব তাহাকে ১৮ই জানুয়ারি তারিখে এখানে দিয়া যান। এখানে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় দিন দিন ভাল হইতেছে।

রাজেশ্বরী। পটলডাঙ্গা নিবাস; জাতিতে বৈষ্ণব। কেহ নাই, নিরাশ্রয়া প্রায় সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়াছে জ্বর আছে এই ভাবে এখানে ২২এ জানুয়ারি তারিখে কোন ভদ্রলোক কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। ভগবানের কৃপায় দিন দিন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আর ২। ৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারে।

পার্ব্বতী। দক্ষিণরাঢ়ি কায়স্থ কন্যা; নিবাস উড়িষ্যা। ২৪ পরগনার অন্তর্গত বশির হাটে কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে ছিল। গত চৈত্র মাস হইতে জ্বর পেটের ব্যায়রামে আক্রান্ত হয়। প্রায় ১১ মাস এইরূপ ব্যায়রামে ভুগিয়া ৯ই শে জানুয়ারি তারিখে এখানে প্রেরিত হয়। এখন ইচ্ছাময়ের কৃপায় কিঞ্চিৎ ভাল আছে।

আয় ব্যয়।

গিরিডি।

জমা

সাঃ বাবু ফকির চাঁদ সাধু খাঁ ৬০৲, মনি অর্ডার ২৫৲, দান ৩৲, চাঁদা ১৲, মোট ৮৯৲।

খরচ

কর্ম্মচারীর বেতন ১৩৸০, গোয়ালা ২৷৵০, বাটী ভাড়া ২২৲, ধোপা ১৲, গিরিডি হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত আসিবার খরচ ৩৬৲, মোট ৭২৷৵০, সংসার খরচ ১৬৷৷৵০।

কলিকাতা।

সাঃ বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী সংসার খরচ ৩১৲, দফে ১০৲, দফে ১৫৲, দফে ৩৲, দফে ১০৲, মোট ৩৮।

মোট জমা ৮৯৲ + ৩৮৲ = ১২৭৲।

মোট খরচ ৭২৷৵ + ১৬৷৷৵ + ৩১৲ = ১২০। হস্তেস্থিত ৭৲।

দান বাবু শক্তিকান্ত ভট্টাচার্য্য ২৲, বাবু হরিদাস দে একজন রোগীর দুগ্ধের দাম ১৲।

দানপ্রাপ্তি।

(১লা জানুয়ারি হইতে ৩১এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত)

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত দান গুলি বিগত মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাগণের কল্যাণ সাধন করুন।

মাসিক চাঁদা।

শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ২৲, A son, C/o Babu Girindra Nath Ghose অক্টোবর হইতে জানুয়ারী ১৲, বাবু হারাধন চট্টোপাধ্যায় ডিসেম্বর ।০, বাবু শ্রীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী জানুয়ারী ।০, বাবু কেদারনাথ দাস ডিসেম্বর ।০, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস নবেম্বর ও ডিসেম্বর ২৲, বাবু নবীনচন্দ্র বড়াল ডিসেম্বর ১৲, ১৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ছাত্রগণ ডিসেম্বর ৷৷০, বাবু প্রসন্নকুমার বসু সেপ্টেম্বর হইনে ডিসেম্বর ১৲, বাবু যদুনাথ বসাট জানুয়ারী ১৲, ৪।২ নং ছকু খানসামার গলির ছাত্রগণ ডিসেম্বর ৷৷০, A lady C/o Babu Sreenath Das ডিসেম্বর ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ডিসেম্বর ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ডিসেম্বর ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ডিসেম্বর ১৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র ডিসেম্বর ।০, বাবু অনাথনাথ দেব ডিসে ১৲, বাবু দিনেশচন্দ্র চৌধুরী ডিসে ৷৷০, বাবু বিপিনবেহারী রায় চৌধুরী ডিসে ।০, বাবু বিপিনবেহারী রায় চৌধুরী জানুয়ারী ১৲, বাবু শশীভূষণ ছাপপতি, জলপাইগুড়ি, নবেম্বর ও ডিসে ২৲, মোট মাসিক চাঁদা ১৮৲।

এককালীন দান।

বাবু সত্যব্রত সামশ্রমী ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র দাস পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২০৲, বাবু সত্যপ্রিয় দেবের পরলোকগতা মাতার বার্ষিক দান ৫৲, শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ ১৲, G. C. Bose Esqr. ১৲, শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী ৸৵০, 'কেহ' ভ্রাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, ডাক্তার জহিরুদ্দিন আহম্মদ ১৲. ২০ নং পটুয়াটোলার ছাত্রগণ ।৴০, বাবু আশুতোষ মিত্র G. E. ১৶, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৶, বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় ও বাবু হরিহর রায় ৵০, কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৲, বাবু পূর্ণচন্দ্র সিংহ ১৲, ৬৭নং বেচুচাটুর্জ্জি ষ্ট্রীটের ছাত্রগণ।০, বাবু পিয়ারীমোহন দত্ত ৶০, ৮।১ নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনের ছাত্রগণ ॥৶০, A fraind of Dasasram ১৲, ১১নং মুসলমান পাড়া লেনের ছাত্রগণ ।০, মুন্সি আবদুল আজিজ /০, ১০৭নং ওল্ড বৈঠকখানা রোডের ছাত্রগণ ৵০, ৬৭নং ঐ ঐ ছাত্রগণ।১০, ১০০।২ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট দাসাশ্রম সাহায্য ভাণ্ডার ।৵১১, বাবু শ্রীকৃষ্ণ বসু ১৲, ৬৩।১নং মেছুয়াবাজার রোড দাসাশ্রম সাহায্য ভাণ্ডার ৶১০, ৬৩।১নং মেছুয়াবাজার রোডের ছাত্রগণ।০, রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর ৫৲, বাবু অক্ষরনাথ রায় মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৩৲, একজন বন্ধু ৩৲, বাবু গৌরলাল রায় কাকিনিয়া, শীত বস্ত্রের জন্য ৪৲, শ্রীমতী নবশশী সেন গুপ্ত ॥০, বাবু শ্রীনাথ দাসের দ্বিতীয়া কন্যা ২৲, ১২০।১নং মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট দাসাশ্রম সাহায্য ভাণ্ডার।/১০, Mrs. A. M. Bose ১৫৲, বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৲. দাসাশ্রমের বন্ধু শ্রীঃ বসন্তকুমার লাহিড়ী ৫৲, বার্ষিক সভায় দানাধারে প্রাপ্ত ২৮২॥০, আবদুল আজিব ॥০, শ্রীমতী জগত্তারিণী মৈত্র ২৲, শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ১৲, বাবু রতিকান্ত মজুমদার ১৲, একজন বন্ধু ১৶, শ্রীমতী নিস্তারিণী চক্রবর্ত্তী ২৲, বাবু কালিনারায়ণ গুপ্ত ১৲, দানাধারে প্রাপ্ত ১॥০, বাবু চারুচন্দ্র রায় ১৲, বাবু ফকিরচাঁদ সাধু খাঁ ১৲, বাবু ভূপতিনাথ বসু ॥৶১৫, শ্রীমতী সরোজিনী মিত্র ১৶, শ্রীমতী নলিনী দাসী ১৲, বাবু শ্রীচরণ রায় ১৲, বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র ১৲, বাবু হেমচন্দ্র গুপ্ত ॥০, বাবু মোণিমোহন সেন ১৶, বাবু রাজচন্দ্র মজুমদার ২৲, বাবু রামগোপাল রায় ॥০, বাবু নবীনকৃষ্ণ সেন গুপ্ত ২৲, A friend ১৲, বাবু নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ৫৲, A friend বন্ধুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, বাবু অশ্বিনীকুমার দাস ৮৲. রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, কাকিনিয়া ৫০৲, মৃত বাবু অক্ষয়কুমার দাসের স্ত্রীস্বামীর আত্মার কল্যাণার্থ ১৲, অমরনাথের জননী, মৃত পুত্রের আত্মার কল্যাণার্থ ১৲, শ্রীমতী ক্ষেমদাসুন্দরী মিত্র ৪৲, শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ ২৲, J. T. Sunderland, London, ৫৲, রাজিবলোচন দাস ৻৫। মোট ১৮১।৵২।০।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ১৮৲, এককালীন দান ১৮১।৵২॥, পুস্তক বিক্রয়।৵০, পূর্ব্ব মাসের স্থিত ।৵৫, দাসীর সাহায্য ৮৪৲, মোট ২৮৪৵৭॥০।

মোট ব্যয়।

সেবালয় ১২৭৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩০৶, গাড়িভাড়া প্রভৃতি ২৵১৫, টিকিট ১৵০, কলিকাতার অগ্রিম বাটি ভাড়া গৃহ মেরামতি বাবৎ ১৫৲, আদায়কারীর খরচ ৯৵১০, বার্ষিক সভা ও উৎসবাদির খরচ ২৩৶০, মাল ভাড়া ৮৲, অন্যান্য ॥৵৭॥০, কার্য্যকারক আসার খরচ ১০৵০, মোট ২১৬।৵১২॥০।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ২৮৪৵৭॥০, মোট ব্যয় ২১৬।৵১২॥০, হস্তেস্থিত ৬৭॥৶১৫।

বস্ত্রাদি।

৺ দুর্গারাণী দাসীর স্মরণার্থ ৫ গজি বোম্বাই চাদর ৪ জোড়া, ৬ গজি বোম্বাই চাদর ১ জোড়া। বাবু শ্রীনাথ দাসের দ্বিতীয় কন্যা. নুতন বোম্বাই চাদর ১ জোড়া। বাবু রামচন্দ্র মজুমদার জ্যাকেট ২, প্যান্টুলেন ৩, চাপকান ১, কম্ফটার ১, পিরান ১, হাতকাটা ১।

গুপ্তপ্রেস্ হইতে একখানি নুতন বৎসরের পঞ্জিকা।

দাসী

সৌর জগতের গতি।

এই নানা বর্ণবিশিষ্ট, বহুবিধ রত্ন সন্নিভ, দীপ্তিমত্তী তারকাদি জ্যোতিষ্ক প্রত্যুপ্ত সুশোভন বাসব-সভা-বিতানের বিন্যাস-ভঙ্গী কি চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে? এবং উত্তরকালেও কি এই ভাব পরিলক্ষিত হইবে? নিশীথিনীর ললাম-ভূত শুভ্রকান্তি মৃগব্যাধ কি চিরকাল প্রশ্বনামা বিশ্বকর্ত্র সমভিব্যাহারে যন্তরূপ মৃগানুসারী হইয়া রহিয়াছে? ঐ কোহিনুর-বিনিন্দিত শ্বেতাভ-পরিপ্লুত অভিজিৎ কি সৃষ্ট্যবধি মরালক সমীপে শৃঙ্গাটকের মধ্যে অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছে? দিগ্‌দক্ষিণার কবরীকুন্দ, সূর্য্যসখা* শরৎসূচক অগস্ত্য কি পূর্ব্বাবধি পোতোপরি সমাহিত আছেন? পদ্মরাগ দ্যুতিমতী বৃষভাসনা রোহিণী কি কোন কালে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন না? নষ্টসপ্তমিকা,† ষণ্মুখী কুমার ধাত্রী কৃত্তিকা কি কোনরূপে বিচলিতা হন না? সাক্ষ্মতী বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষি কি শিশুমার পুচ্ছাধিষ্ঠিত ঔত্তানপাদ পরিতঃ সমভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন? হরিচরণ ধ্যানের ন্যায় একান্ত কেন্দ্রসেবাতৎপরতা প্রযুক্ত যিনি প্রথিম মহিম ধ্রুবনাম ধারণ করিয়াছেন তাঁহার কি আবহমান্ কাল ধ্রুবত্ব থাকে? ঐ গগনাঙ্গনার কল্‌হার রূপিনী, দ্বিবেণী, দুগ্ধফেণসম স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনী কূলে সিকতাস্থলে স্তূপীকৃতা হীরককণা কি পূর্ব্বাপর সমভাবে সজ্জীভূত রহিয়াছে?

আপাততঃ শ্রবণ মাত্রেই এবম্ভূত প্রশ্ন সকল নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ

---

* অভ্রভেদী বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করিতে সূর্য্যদেবের কষ্ট হয় তজ্জন্য তিনি বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্যকে অনুরোধ করেন, যে গিরিবরকে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইতে বলেন। অগস্ত্যকে দর্শন করিবার মাত্র বিন্ধ্য দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। মহর্ষি বলিলেন, যাবৎ না আমি দক্ষিণ দেশ হইতে আসি তাবৎ এই অবস্থায় থাক। অগস্ত্য আর আসিলেন না, বিন্ধ্যও গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন ভয়ে উঠিতে পারিতেছেন না।

† কৃত্তিকাতে পূর্ব্বে ৭ তারা ছিল; একের লোপ হইয়াছে।

হইবে। কারণ সামান্যতঃ সকলেই জানেন যে রবি, চন্দ্র, পঞ্চতারাগ্রহ, তদূর্দ্ধে বরুণ, ইন্দ্র, ইহাদিগের অনুচর উপগ্রহ সকল ভূমি ভৌমের অন্তর্গত খমেখলার রত্নীভূত নবাবিষ্কৃত বিশতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ, অসীম শ্যামসাগরে ভাসমান সকচ, বিকচ ধূমকেতুরূপী সৌরজগতের অপ্রতিম অতিথিগণ এবং অতত্ত্বদর্শীর নেত্রে ইন্দ্রালয়ের কৃতসংস্কার বর্ত্তিকার জ্বলন্ত দশান্তররূপে প্রতিভাত খধূপ, সেরম্মদ অশনি প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ আকাশপথে বিচরণ করিতেছে এবং তজ্জন্যই এ সমস্ত খেটপদ বাচ্য। কিন্তু তারাগণের গতি নাই, তজ্জন্য এ সকল জ্যোতিষ্কদিগকে স্থিরতারা বলে। অতএব কে না বলিবেন যে যেখানকার যে তারা সে সেইখানেই চিরকাল আছে? সত্য বটে শত বর্ষে সহস্র অযুত লক্ষ বর্ষেও তারাদিগের গতি চর্ম্মচক্ষে অনুভূত হয় না। গণেশ দৈবজ্ঞ নভোমণ্ডলে যে সকল তারা যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, বরাহ মিহিরও আকাশের তদবস্থা অবলোকন করিয়া থাকিবেন। আর্য্যভটের গগন ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ প্রণেতা গর্গের গগন প্রায় একভাবাপন্ন ছিল। অদ্য নভোমণ্ডলে তারানিচয় যে ভাবে অবস্থিত দেখা যাইতেছে, হিপ্পারকস্ বা তলমির আকাশের দৃশ্য প্রায় এইরূপ ছিল।

সত্য বটে বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং ভাস্করাদি আচার্য্যগণ কেবল নলিকাদি যন্ত্রাশ্রয়ে তারাগণের শত বার্ষিকী বা সহস্র বার্ষিকী গতি অনুভূত করিতে পারিতেন না; পরন্তু এক্ষণে ইউরোপীয় ও আমেরিকীয় বেধালয়স্থ অপূর্ব্ব, অনুপম, ও বিচিত্র কৌশলে বিরচিত দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, বর্ণবীক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যোপযোগী বিবিধ যন্ত্র সহকারে তারা সকলের বৎসরে বা দশবৎসর মধ্যে যে স্থানচ্যুতি ঘটে তাহা অতি সূক্ষ্মরূপে পরিমিত হইয়া থাকে।

এই প্রস্তাবে শত সহস্র বা অযুত বর্ষে নভোমণ্ডলের ভাব ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের পরিসীমা দেখিবার অভিপ্রায় নহে। দীর্ঘতর কালে ভসন্নিবেশে কি মহতী অনবস্থিতি ঘটে, তাহাই সমালোচিত হইবে। শৈলস্তর নিহিত প্রস্তরীভূত জীবাস্থি পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ অবধারিত করিয়াছেন যে, ভগবতী ভূতধাত্রী দশলক্ষ বৎসরাবধি জীবের বাসোপযোগিনী হইয়াছেন। এই নিযুত বর্ষপরিমিত সুদীর্ঘকালে নভস্তলে সম্ভাব্য বিপর্য্যয়ের তত্ত্বানুসন্ধান অতীব রহস্যের বিষয়। মৃণ্ময়ীর স্তরনির্ম্মাণকালমধ্যে খগোলে যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা অবলম্বিষ্যমান্ যুক্তি-সমূহ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে প্রমাণীকৃত হইবে। এই অখণ্ড দণ্ডায়মান কালবৎ প্রবল নিযুত বর্ষ দ্বারা

অবনীপৃষ্ঠের যদ্রূপ বিস্ময়াবহ রূপান্তর নিষ্পাদিত হইয়াছে, তারাসংস্থানেও তদ্রূপ নিদারুণ পরিবর্ত্তন সমাপন্ন হইয়াছে।

মনে কর কোন তারা বা অন্য কোন দিব্যবিগ্রহ অবিরত ভাবে প্রতি সেকণ্ডে বিংশতি মাইল পরিমাণে প্রধাবিত হয়। প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল তারা পক্ষে আদর্শ-গতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে; কারণ অনেক তারারই এতাবতী গতি; এবং অনেকের গতি ২০ মাইলেরও অধিক; পৃথিবীর গতি অবশ্য এত অধিক নহে। বহু তারার গতি ইহার দ্বিগুণও আছে। জ্যোতি-র্ব্বিদ্‌গণের সুপরিচিত গ্রুমব্রিজের ১৮৩০ সংখ্যক তারার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ মাইল! অতএব ২০ মাইলকে বক্ষ্যমান গণিতের ভিত্তি স্বরূপ ধরিলে অসঙ্গত অনুমান দোষে দূষিত হইতে হইবে না। এই মূল ধরিয়া তত্ত্বানু-সন্ধান করিলে পরিদৃশ্যমান নভোমণ্ডলে অতি দীর্ঘকালে কি পরিমাণে রূপান্তর ঘটে তাহার পর্য্যাপ্ত রূপ আসন্ন ফল লাভ হইতে পারে। এক সেকেণ্ডে ২০ মাইল, মিনিটে ১২০০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২,০০০ মাইল অহো-রাত্রে ১৭,২৮,০০০ মাইল এবং বর্ষে ৬৩০৭,২০,০০০ মাইল; অতএব স্বীকৃত গতি অনুসারে গণিত করিলে ১০ লক্ষ বর্ষে তারার গতি ষষ্ঠ সাগর সংখ্যক (৬০০০০০০০০০০০০০০) মাইল হয়।

অতি দীর্ঘ কালান্তর তারাগণের যথাযুক্তভাবে প্রত্যক্ষীভূত হওয়া সম্বন্ধে এরূপ গণিত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক প্রায় সমালোচনা হয় না। বিগত দশলক্ষ বর্ষ মধ্যে নভোমণ্ডল যে অত্যন্ত রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা উক্ত গণিতাগত অঙ্ক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যে যে তারার গতির সমালোচনা করা যায় সেই সেই তারা পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে তাহা জানিতে পারিলে উপস্থিত তত্ত্বের দূরতর-গূঢ়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। কিন্তু অনেক স্থলে এই অভিবাঞ্ছিত মৌলিক উপাদানটি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। যাহা হউক অন্ততঃ উদাহরণ জন্য একটী তারার দূরত্ব পাইলেও তদাশ্রয়ে বিষয়টি বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। যথাসাধ্য বেধসহকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে তারাগণের মধ্যে উত্তর খগোলের মরালকের ৬১ সংখ্যক তারা পৃথিবী সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট; যদিও এই তারার দূরত্ব বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদদিগের মধ্যে ঐক্যমত দৃষ্ট হয় না, তথাপি তারাটী যে সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকৃষ্ট তাহার সংশয় নাই। মরালকের ৬১র দূরত্ব পঞ্চ পদ্ম (৫০০০০০০০০০০০০০) পরিমিত মাইল ধরিলে অসঙ্গত বোধ হয় না। এতাবৎ দূরত্বের সঙ্গতি

স্বীকার পূর্ব্বক প্রস্তাব যুক্তি প্রয়োগ করা যাউক। এখন দেখুন যদি কোন তারার প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল গতি হয়, তবে দশলক্ষ বর্ষ মধ্যে সৌর-জগৎ হইতে মঙ্গলকের ৬১র যত দূরত্ব তারা তাহার দ্বাদশ গুণ দূরে গিয়া পড়িবে। এ স্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে তারার গতি নিরূপণ কালে সৌর-জগৎ গতিহীন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। সৌরজগতের গতি বস্তুতঃ যদি তারার গতির সমান ও সমান্তর হয়, এবং সৌরজগতের গতি জানা না থাকে, তবে তারার গতি নির্দ্ধারণ করা অসাধ্য। অতএব এ স্থলে সৌরজগৎকে স্থির কল্পনা করিয়া তারার সাপেক্ষিক গতিমান লইয়া বিচার করা যাইতেছে।

সূর্য্য হইতে তারা যতদূরে আছে, তথা হইতে যদি ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ গুণ অন্তরে চলিয়া যায়, তবে ঐ তারার দৃশ্যমান জ্যোতিতে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিবে। সূর্য্য হইতে তারা যদি অবক্র ভাবে অপসৃত হয় তবে জ্যোতিষ্ক-দ্বয়ের ব্যবধান ১৩ : ১ অনুপাত অনুসারে বৃদ্ধি পাইবে ; আর যদি বিপরীত দিকে অর্থাৎ সূর্য্যাভিমুখে আইসে, তবে পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব অপেক্ষা-কৃত ন্যূন হইবে এবং সৌরজগৎ হইতে উহার দূরত্ব ১১ : ১ অনুপাতী হইবে ; পক্ষান্তরে তারা যদি স্বস্থান হইতে সৌরজগতে লম্বরেখানুক্রমে পর্য্যটন করে, তবে তারা ও সূর্য্যের ব্যবধান পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বাদশগুণে অধিক হইবে।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তারা যে দিকে চলুক না কেন, দশ লক্ষ বর্ষান্তরে সৌরজগৎ হইতে উহার দূরত্ব যদিও ঠিক দ্বাদশ গুণে না হউক, প্রায় দ্বাদশ গুণে বর্দ্ধিত হইবে ; তবে পরিদৃশ্যমান নভোমণ্ডলের স্থায়িত্ব আর কি প্রকারে রক্ষা পাইবে? দৃষ্টিবিজ্ঞানের নিয়মই এই যে, আলোক দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী। আর অন্তর যদি দ্বিগুণ হয়, তবে উহার ঔজ্জ্বল্যের পাদ মাত্র দেখা যাইবে। তারা যদি তিন গুণ দূরে চলিয়া যায়, তবে দীপ্তির নবাংশের একাংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, তারা এক্ষণে যতদূরে আছে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট কালক্রমে বার গুণ দূরে গিয়া পড়ে, তবে উহার আদ্যালোকের একশত চোয়াল্লিষ ($\frac{1}{144}$) ভাগের এক ভাগ থাকিবে ; অর্থাৎ দেখা যাইবে।

এই যুক্তি সহকারে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে তারাকে এক্ষণে অন্ত-রীক্ষের কোন স্থানে দেখা যাইতেছে সে যদি প্রাগুক্ত কল্পিত বেগ অনুসারে অবিচ্ছেদে দশ লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত কোন দিকে অপসৃত হইতে থাকে, তবে তাহার আদ্যাদীপ্তি ১৪৪ অংশে অল্পীভূতা হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে,

উজ্জলতার এতাবতী অপচিতি নিবন্ধন বহু সংখ্যক তারা যে সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টি-গোচর হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অপিচ আলোকের এতাদৃশী ক্ষতি জন্য কেবল অসাধারণ দীপ্তিমতী তারাগণ আলোকবিন্দুমাত্রে পরিণত হইয়া যন্ত্রনেত্রে প্রতিভাত হইতে পারিবে।

এতাবতী বিচারণা দ্বারা কতিপয় অপূর্ব্বফল লাভ হইতেছে। তারাগণের স্বকীয়া গতির মধ্যম বেগমান মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং প্রমেয় অদোষদুষ্ট। এখন দেখুন, যদি কোন তারাদ্বয় যুগলরূপে প্রতিভাত হয়, অথচ সে দুইটী কোন প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তিতা প্রযুক্ত সংশ্লিষ্ট না হয় তবে এতাবৎ সুদীর্ঘকালে (১০ লক্ষ বর্ষে) তাহাদিগের প্রণয় পাশ অবশ্য ছিন্ন হইবে অর্থাৎ তাহাদের যুগল ভাব, সন্নিকর্ষতা কোনরূপে রক্ষা পাইবে না। ইহার একটি সুসঙ্গত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

অনেকগুলি জাহাজ স্ব স্ব বন্দরাভিমুখে গমন করিতেছে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক খানি জাহাজ অপর কয়েক খানি জাহাজকে দেখিতে পাইল; কিন্তু যখন কোন জাহাজই স্থির নাই সকলেই চলিতেছে তখন তাহাদের পরস্পরের অন্তর ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, এবং দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সে গুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িবে, এবং অচিরে আর কোন খানিই ক্ষিতিজের ঊর্দ্ধে দেখা যাইবে না, অথচ তৎকাল মধ্যে কতিপয় অপর পোত দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইবে।

ভূতত্ত্ববিৎ পৃথিবীর স্তর নির্ম্মাণরূপ দুর্বিজ্ঞেয় প্রাকৃতিক ব্যাপার সমূহ সম্পাদনার্থে যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহার যে পরিমাণের পরিচয় দেন, তাহা ধ্যানপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রয়োগ করিলে, প্রতিপন্ন হইবে যে, শূন্য সাগরে তারা তরি সমূহ নঙ্গর করা নহে,—তাহারা অনবরত চলিতেছে,—তাহাদের অপায়ী ভাব। যদিও তর্কের সৌকার্য্যার্থে সংখ্যা-বিশেষ পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং সময় বা অবস্থা বিশেষ স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি আগামী দশ লক্ষ বর্ষ মধ্যে যে তারাময় গগনাজিরে যে মহান্ বিপ-র্য্যয় ঘটিবে তাহা যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা সুনিশ্চিত হইতেছে। সদৃশী যুক্তি-আশ্রয়ে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে দশ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বের খচিত্র বর্ত্ত-মান খচিত্র অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। সেই সুদূর-অতিবাহিত কালে যখন অঙ্গারে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ফলপুষ্পভারাবনত সুবিশাল বৃক্ষময় অরণ্য সকল ভূপৃষ্ঠে বিরাজিত ছিল, যদি কল্পনা প্রভাবে সেই কালে কেহ

উপনীত হন, তবে তিনি এই সুনীল-গগন-রঞ্জনা তারা রত্নের মধ্যে কতিপয় মাত্র দেখিতে পান্ কি না সন্দেহ। অর্থাৎ অঙ্গার যখন জীবন্ত বৃক্ষরূপে বিদ্যমান ছিল, তখন যে কোন তারা লক্ষিত হইত না, তাহা নহে, বরং ইহাই সম্ভব্য যে এখন আকাশ যেমন বিবিধ তারারত্নে বিভূষিত তখনও তেমনই অলঙ্কৃত ছিল; কিন্তু এখনকার আকাশের যে ভাব ভঙ্গি তখনকার আকাশের সে ভাব ভঙ্গি ছিল না, এখন যে সকল তারা দেখা যাইতেছে, তখন সে সকল তারা দেখা যাইত না। ভূতত্ত্ববিশারদদিগের কালকলনা অনুসারে অঙ্গারারণ্যের অবস্থিতি কাল দশ লক্ষ বর্ষাপেক্ষা প্রাচীন-তর। দশ লক্ষ বর্ষেরও পূর্ব্বে অরণ্যানী যে অঙ্গারভূত হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, কারণ এ পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধে কোন তথ্য দৃষ্ট হয় না, কাল যতই পুরাতন হইবে, দৃশ্যমান দিব্যবিগ্রহে ততই রূপান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমরা এই মাত্র জানি যে অতি পুরাতন কালের তারাগণ বর্ত্তমান কালের তারাগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিসদৃশ; এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা নাই। অনেক দৌরবীক্ষণিক নীহারিকার ও তারাসংঘাতের দূরত্ব তারার মধ্যম দূরত্ব অপেক্ষা অত্যধিক; তজ্জন্য অনুমান হয় যে বহু লক্ষ বর্ষান্তরেও তাহাদিগের কান্তি, বিন্যাস ও আকারে এতাদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই যে তারা নিরীক্ষণে চতুর চক্ষে তাহাদিগের বিম্ব পতিত হইলে তাহার দর্শকের অনভিজ্ঞাত থাকিতে পারে। ভূবাসিদিগের সম্বন্ধে তারাগণের বাহ্য প্রকৃতি গত যে আত্যন্তিক অন্যথা ভাব ঘটে তাহার কোন সংশয় নাই। কিন্তু জীবলোকের পরম কল্যাণ নিধান সবিত্র মণ্ডলের কোন রূপ ব্যত্যয় উপলভ্য হয় না। বরং তদানীন্তন অঙ্গারাত্মক উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বাহুল্য দর্শনে প্রতীয়মান হইতেছে যে তেজোময় ভগবান্ মরীচিমালী চির-কাল সমভাবে তাপ ও আলোক বিতরণ করিতেছেন। বিলুপ্ত প্রাণীকুলের চক্ষুষ্মত্তাই এ তথ্যের বিচিত্র উদাহরণ।

বস্তুতঃ অতীত যুগের কতিপয় প্রস্তরীভূত জন্তুর দর্শনেন্দ্রিয়ের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ভূতত্ত্ব বিষয়ক কৌতুকাগারে প্রবিষ্ট হইয়া কিংকৃকলাশ * নামা পাষাণীভূত দ্ব্যাত্মিক জন্তুর বিষালাক্ষি নিরীক্ষণ করিলে

---

* কিংকৃকলাশ শব্দটী গড়া। ইহা কিংশুক কিন্নর ইত্যাদীয় জাতীয়।

অর্দ্ধ কৃকলাশ কি মৎস্য। ক্রোড়পত্রে ইহার ইউরোপীয় শব্দ পাইবেন।

অনির্ব্বচনীয় চিত্তবিনোদ অনুভূত হয়। এই অপূর্ব্ব দর্শনেন্দ্রিয়ে, একটি চমৎকার অস্থিময় যন্ত্র আছে। বোধ হয় নেত্রকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত অস্থিময় যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই অপূর্ব্ব ঝসোরগের অনুপম দর্শনেন্দ্রিয়ের আত্যন্তিকী শক্তি ও উপযোগিতার অবশ্যই কোন বিশিষ্ট কারণ থাকিবে; সে কারণ যে কি তাহা বলা অসাধ্য, সুতরাং তাহা কেবল কল্পনার বিষয়। অদ্ভুত দৃগ্‌যন্ত্র সম্পন্ন এই অপূর্ব্ব জীব সম্বন্ধে নভোমণ্ডল না জানি কি বিচিত্র ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই বিরূপাক্ষ যে দিব্য শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তদীয় পর্য্যালোচনায় বিরত থাকিত ইহা সম্ভাব্য বোধ হয় না; তাহার পক্ষে জীবিকান্বেষণরূপ যে গুরুতর ব্যাপার তাহাতেই অবশ্য ব্যাপৃত থাকিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের সফলতা লাভ করিত। অবকাশ অনুসারে কিংকৃকলাশ একবার উন্নেত্র হইলে আকাশের কি অনুপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিত!

প্রভাকর অধুনাতনী মেদিনীতে যে পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, কিংকৃকলাশের সেই পুরাতনী পৃথ্বীতে সেই পরিমাণেই অমোদকোপম জীবের ঐ উভয়বিধ উপজীব্য বিতরণ করিতেন। অবশ্য রবিমণ্ডল তৎকালে কিঞ্চিৎ বৃহত্তর ছিল, কিন্তু দীপ্তির আধিক্যের সম্ভাবনা ছিল না; স্থূলতঃ ভাস্কর এখন যেমন তেজস্বান তখনও তেমনি তেজস্বান্ ছিলেন; কিন্তু এখানকার মণ্ডলের মত তখনকার মণ্ডল দীপ্তিমান যন্ত্রে (Photometerএ) ঠিক সমান উজ্জ্বল দেখাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এস্থলে অযুক্তিভাস সত্ত্বে ইহা বিশ্বাসের অভূমি নহে যে চণ্ডরশ্মির তাপের ক্রমাপচিতি হইলেও তদীয় কিরণকলাপ কিঞ্চিৎ তীব্রভাবে বিস্ফুরিত হইয়া উজ্জ্বলতর এবং উষ্ণতর হইতেছে। ফলিতার্থ এই যে সৌরমণ্ডলের বাহ্যিক লক্ষণে কোন বিশিষ্ট ভেদ ছিল এরূপ মনে করিবার কিছুমাত্র কারণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আমরা যদ্রূপ দেখিতেছি কিংকৃকলাশও তদ্রূপ দেখিয়া থাকিবে।

সেই সুদূর অতিবাহিত যুগে চারুকান্তি কলানিধির কলা সকল প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যথাক্রমে দৃষ্টিগোচর হইত। পৃথিবীর এই চির সুহৃদ্ পূর্ব্বকালে যে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, এবং তন্নিবন্ধন চন্দ্রমণ্ডল কিঞ্চিৎ বৃহত্তর দেখাইত এবং চান্দ্রমাসের পরিমাণও কিঞ্চিন্ন্যূন ছিল। কিংকৃকলাশ যুগে অর্থাৎ ত্রেতার চতুর্থ পাদে চন্দ্রমণ্ডলের জ্বালামুখ পর্ব্বত সকলের বহ্ন্যুদ্গীরণী শক্তি নিঃশেষিতা হয় নাই। তত্রত্য

আগ্নেয়গিরি সকল এখন সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। জাজ্বল্যমান গিরিশোভিত দৌরবীক্ষণিক চান্দ্রচিত্র না জানি কতই অপরূপ দেখাইত!

তারাগ্রহ সম্বন্ধে অধুনাতন্ আর প্রাক্তন্ কালে কোন নির্দ্দেশই ভেদ ছিল না। লাবণ্যময়ী ঊষার প্রসাধনভূত শুভ্রকান্তি শুক্র এখন যেমন প্রত্যূষে পূর্ব্ব আকাশে উদিত হইয়া বিবিধরূপে রূপান্তর ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎ কালান্তর নিশামুখে পশ্চিম কপালে "দিক্ সুন্দরী বদন চন্দন বিন্দু" রূপে আবার আবির্ভূত হন, তখনও তাঁহার উদয় অস্ত ইত্যাদি ভাব এইরূপেই ঘটিত। এক্ষণে জ্যোতিষীর নেত্রে বার্হস্পত্য গগন যেরূপে প্রকটিত হয়, প্রাক্কালে সেইরূপেই প্রতিভাত হইত। সেই চন্দ্র চতুষ্টয়, সেই মেখলাবলী, সেই কক্ষা কোনটিতেই সাদৃশ্যের অভাব লক্ষিত হইত না। শনৈশ্চর জগতে সামান্য বিষয়ক ক্রমপরিবর্ত্তন সম্ভাব্য; তদীয় উষ্ণীষের ভিন্ন ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ত্রেতাবসানে অরুণাভ মঙ্গল কি অবস্থাপন্ন ছিলেন, তাহার ভাব মনোমধ্যে উদিত হয় না। বোধ হয় ভৌমবিশ্ব আমরা যেমন দেখিতেছি পূর্ব্বে তেমন ছিল না। তদীয় কক্ষায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিশু এবং শিশু-সৌন্দর্য্য।

শ্রীতিভাজনেষু।

তোমার উপর রাগ করিয়া এতদিন চিঠি লিখি নাই; তাহার কারণ ছিল। তোমার ছেলে জন্মিয়াছে, তুমি এতদিন তাহা আমাকে জানাও নাই; তুমি স্বার্থপর, তোমাদের কোলে যে আশীর্ব্বাদ-কুসুমটী পতিত হইয়াছে, তাহার উপর কি আমার কিঞ্চিন্মাত্রও দাবী ছিল না—তাই মনে করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে চিঠিপত্র বন্ধ করিব। কিন্তু, আর পারিতেছি না, এখন আপন মান আপনি ভাঙ্গিতে হইল। তোমাকে চাহিয়া নহে, ওই শিশুটিকে চাহিয়া! তোমাদের দুইটি হৃদয়ের মধ্যস্থলে অভিনব আনন্দবন্ধনের মত, স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে রহস্যময় ছায়াপথের মত, যে মায়া-কুসুমটি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বরূপ কল্পনা করিয়া আমার কুতূহল এমন বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, পরিশেষে আমার সমস্ত অভিমান-বুদ্ধি

তাহাতে ভাসিয়া গিয়াছে! তুমি শিশুকে কি ভাবে দেখ জানি না, শিশুর প্রতি আমার চিরদিন এক আশ্চর্য্যকর অনুরক্তি এবং ভক্তি আছে। শিশু সম্পর্কে তোমাকে আজ কিছু বলিব মনে করিয়াছি। তুমি যে জিনিষটি পাইয়াছ, তাহার দিকে তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য। আমরা প্রতিদিন 'সুখ' 'সুখ' করিয়া যাহাদিগকে পদদলিত করিয়া যাই, তাহাদের অধিকাংশই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে সুখ দিতে পারে—

প্রত্যহের পথে
চরণে দলিত যারা তারাই সুন্দর!*

তুমি সংসারে প্রবেশ করিয়াছ; সুখ চাও ত সুখ গৃহের ভিতরই রহিয়াছে, ইহার বাহিরে নাই।

ছেলেটির কি নাম রাখিয়াছ? এখন বেশ হাসিতে পারে ত? মানুষের ছেলের নিকট এক স্বর্গীয় জিনিষ আছে, তাহা ওই হাসিটি! যে স্থানে ইহ-পরকাল মিশিয়াছে, শিশু সেই রহস্যময় সন্ধিস্থলের অতি নিকটে দাঁড়াইয়া! তাই মনে হয়, শিশু বুঝি আমাদের অপেক্ষা জগতের রহস্য বেশী জানে; তাই সদ্যঃপ্রসূত শিশুর হাসি দেখিলে মনে হয় কোন জগদতীত আনন্দ প্রবাহের লহরী আসিয়া যেন ইহাকে স্পর্শ করিতেছে! সেই আনন্দ তর্কে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, জ্ঞানে তাহার আভাষও পাওয়া যায় না; শিশুর মত সরল কোমল হৃদয় হইলেই বুঝি সেই অতীন্দ্রিয় কিরণকম্পের অনুভূতি মাত্র আনন্দাহত হওয়া যায়! অনেক নবজাত শিশুর হাসিতে আমি ওই আনন্দ যেন অনুভব করিয়াছি; বিদ্যুতের মত হঠাৎ কি যেন একটা মনের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, তাহাকে ভালরূপে ধরিতে পারি না। ধরিতে পারি না বলিয়াই তাহা অপার্থিব বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভালবাসি।—

কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ আরও উর্দ্ধে উঠিয়া বিশ্বাস করিতেন। আমাদের মায়াবাদিরাও অবান্তরভাবে এই মতের পরিপোষণ করেন। "শিশু পরম জ্ঞানী; শিশু অভ্রান্তনেত্রে জগতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করে। তাহার আত্মা সবেমাত্র জগৎ-রহস্যের মহাসমুদ্রে ডুব দিয়া আসিয়াছে, জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে, আপনার সমস্ত মহত্ব, দেবত্ব বিমাতা ধরণীর ধূলি মৃত্তিকার সঙ্গে বিনিময় করিতে করিতে সে উহার পরিহীয়মান কল কল্লোল শ্রবণ করে। ক্রমে শ্রুতিশক্তি ক্ষীণ এবং স্থূল হইয়া আইসে, এবং পঙ্কিল-সংসার-কোলাহলের ভিতর স্বর্গসংগীত তেজোহীন এবং বিলীন হইয়া পড়ে।"*

তাই বুঝি মহাত্মা যীশু বলিতেন—"ওই শিশুকে আমার নিকট আসিতে দাও, শিশু পৃথিবীর নহে; শিশু পৃথিবীতে স্বর্গের অধিবাসী।"

শিশুর মুখে আর একটা অপার্থিব জিনিষ আছে, তাহা ওই মধুময় পিতৃ মাতৃ সম্বোধন। এ কোথা হইতে আসিল! কে ইহাকে শিখাইল! সকল দেশের সকল কালের শিশুর মুখেই ওই এক কথা। মানব শিশুর ইহাই প্রথমোচ্চারিত ভাষা। এই ভাষায় ইংলণ্ডের শিশুতে আর ভারতের শিশুতে দেশকালের বন্ধন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এক হইয়া যায়। এই ভাষা মানব জন্মাবচ্ছিন্নে ভুলে না, মানবশিশু বড় হয়, সংসারের ধূলিমৃত্তিকাকে প্রকৃত জিনিষ বলিয়া জড়াইয়া ধরে, শৈশবের সমস্ত কিছু হারাইয়া ফেলে; কিন্তু এই বিষয়ে সে চিরকালই শিশু। এই ভাষার দ্বারা মানব মানবের সহিত আশ্চর্য্য হৃদয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়; এই ভাষায় মানব স্বর্গের সহিতও এক অপূর্ব্ব স্নেহতন্তুর ঘনিষ্টতা বিস্তার করে। তাই আমি কাণ ভরিয়া মানবশিশুর এই ভাষা শুনি, আর ভাবি "এ কোথা হইতে আসিল!" তোমাকে বলিলাম—তুমি আমাপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিবে; কারণ এখন তোমাতে ও শিশুতে অনেক নিকট সম্পর্ক ঘটিয়াছে। "পতির্জ্জায়াং প্রবিশতি"; একভাবে তুমিই শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তাহার প্রত্যেক হাসিতে তুমি এক অননুভূতপূর্ব্ব হৃদয়স্পন্দন এবং আত্মীয়তা অনুভব করিতে পারিবে, তাহার প্রত্যেক সম্বোধনে তুমি আমাপেক্ষা সহস্রগুণ তন্ময়তা অনুভব করিবে।

শিশুর আর একটা সৌন্দর্য্য আছে, তাহা অনেক পরিমাণে আপেক্ষিক। শিশু একে সুন্দর, মাতৃক্রোড়ে শিশু ততোধিক সুন্দর; ইহাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য আমি জগতে কুত্রাপি দেখি নাই। ফুল সুন্দর, কিন্তু ফুল বুকে করিয়া ফুলের দিন দিন ম্রিয়মাণ দলগুলি ততোধিক সুন্দর। ফুলের হৃদয় নাই, আমরা আপন হৃদয়ের আলোকেই ইহাকে সুন্দর করি। কিন্তু মাতৃক্রোড়ারূঢ় শিশুর প্রতি একবার অবহিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিও, একদিকে শিশুর মুখে সেই স্বর্গীয় হাসি আর মধুমাখা "মা" সম্বোধন; অন্যদিকে দেব দেবের বরণীয়, জগৎসৃষ্টির ললামভূত, উচ্ছ্বাসতরঙ্গিত মাতৃহৃদয় এবং সেই কোমলতাময় সারল্যময় ত্রিতাপহারিণী স্নেহদৃষ্টি! দেখিও আর ভাবিও জগতে ইহাপেক্ষা সুন্দরদৃশ্য আর আছে কিনা।

সৃষ্টির পূজনীয় আত্মোৎসর্গ—রমণী এই আত্মোৎসর্গের প্রতিমূর্ত্তি! "রমণী

মায়ের জাতি—রমণী জননী” কথাটি যে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবে সে চিরকাল নারীজাতির প্রতি গভীর ভক্তি এবং বিস্ময়ে গদগদ হইয়া থাকিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ একসময়ে নারীমাত্রকে বিশ্বজননীর প্রতিরূপ বলিয়া জ্ঞান করিতেন,“স্ত্রিয়ঃসমস্তাঃ সকলা জগৎসু,” মহাপুরুষ একসময়ে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের হৃদয় এত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে যে এখন ইহার মর্ম্মার্থও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

যদি আত্মোৎসর্গের পূর্ণমূর্ত্তি দেখিতে চাও, সন্তানলাঞ্ছিতা প্রসূতির প্রতি অভিনিবেশ কর। জগতে খাদ্যখাদক ভাব আছে, সৃষ্টি ব্যাপিয়া এক নির্ম্মম হিংসানীতি প্রচলিত আছে, মঙ্গলময়ের রাজ্যে এক জীব আর একটিকে ভক্ষণ না করিলে চলে না কি ?—এই প্রশ্ন বহুকাল ধরিয়া জ্ঞানিগণের হৃদয় সমানভাবে আন্দোলিত করিয়া আসিতেছে কারণ এই হিংসানীতিই সৃষ্টির কলঙ্ক,জগতের সৌন্দর্য্য বোধ করি পূর্ণ হইয়া যায়, যদি এই হিংসা না থাকে। একদিকে দুর্ব্বল আত্মরক্ষা অন্যদিকে প্রবল জিঘাংসা—এই কুৎসিৎ ভীষণ যুদ্ধে এবং আত্ম-কোলাহলে জগতের দেবমন্দির পশুভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি জগৎ এত অসুন্দর হইত না যদি ইহাতে উদ্ভিদের মত, ফুলের মত, সূর্য্যকিরণের মত প্রাণিজগতে সেই নীরব অক্লিষ্ট এবং অযাচিত আত্মদান থাকিত, সর্ব্বশেষ, জগৎ বোধকরি নিরবচ্ছিন্ন সেই কল্পনাপুর স্বর্গে পরিণত হইত, যদি ইহাতে সর্ব্বত্র জননীর মত স্নেহময়, অকাতর, এবং উদার আত্মহত্যা থাকিত ?

এক সৌন্দর্য্য-সারময়ী নব যুবতী দেখিয়াছিলাম,অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত জ্যোৎস্না-প্রবাহের মত সেই দেহের উদ্দাম লাবণ্যোচ্ছ্বাস আমাকে যুগপৎ শান্ত, বিস্মিত, এবং মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। মনে মনে বলিলাম “দেবি! অমনই থাক ; ভগবান্ তোমাকে নিরাপদে রাখুন, এই উমার মূর্ত্তিতে এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে চিরকাল আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন কর।” বহুদিনের পর বিদেশ হইতে ফিরিয়া সেই আনন্দময়ীর বাড়ী গিয়াছি—তাঁহাকে দেখিয়া প্রথম চিনিলাম না। এই কি সেই! অতীতে ও বর্ত্তমানে এক বিষম বিদ্রোহ বাঁধিয়া গেল! সেই অপরিসীম সৌন্দর্য্যতরঙ্গ কোথায় ? সেই জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তিটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এবং চলনে ভঙ্গীতে, দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত শৈথিল্য আসিয়া পড়িয়াছে ; বিস্মিত হইয়া চাহিয়া আছি, এমন সময় নিতান্ত আলোকতরঙ্গের মত কে আসিল, দেখিলাম ;—দেখিয়া

গিয়াছিলাম উমামূর্ত্তি, আসিয়া দেখিলাম গণেশজননী! জননীর সমস্ত অবসাদ, সমস্ত শৈথিল্য কোথায় উড়িয়া গেছে; দু'নয়ন আলোক পূর্ণ করিয়া ভুজবল্লী সাগ্রহে প্রসারিত করিয়া তিনি ছেলেকে কোলে তুলিলেন;—তুলিয়া চিবুক উন্নমিত করিয়া বারম্বার একটী সুমধুর জিজ্ঞাসা সূচক ভঙ্গী পূর্ব্বক স্মিতমুখে চাহিতে লাগিলেন এবং শিশুটি নির্ঝর কলকলের মত সুতরল উচ্চহাস্যে এবং কোমল করযুগলের অবিরল প্রহারে তাঁহার হৃদয়কে আহত এবং প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। আমি বুঝিলাম কোন্ ইষ্টসাধনে ওই অপরূপ নন্দন বনের আহুতি হইয়াছে। এই জগৎপূজ্য পবিত্র আত্মহত্যা—জননী আপনার যথা-সর্ব্বস্ব সন্তানে অর্পণ করিয়া, দিন দিন আপনার হৃদয়শোণিত সন্তানের শরীরে প্রবাহিত করিয়া, সানন্দমনে শীতের পত্র-পুষ্পহীন লতার মত শুকাইয়া যাইতেছেন, কোন হৃদয়বান ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া ভক্তিতে গদগদ না হইয়া থাকিতে পারে! মাতৃক্রোড়ে শিশু—সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া লইও। কেন এত সুন্দর জানি না, সৌন্দর্য্যের স্বরূপ কে জানে—জানিলে হয়ত একজন মহাজ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইতাম। তবে এইটা জানিও যে সেই সৌন্দর্য্য শিশুরও নহে, মায়েরও নহে; উভয়ের সম্মিশ্রনে এই অপার্থিব মায়াকুহেলিকার সৃষ্টি হয়। জলবিন্দু সমূহে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া আমাদের সম্মুখে যেই অদ্ভুত দৃশ্য প্রতীয়মান করে, তাহা যেমন জলবিন্দুরও নহে সূর্য্যকিরণেরও নহে, তাহা একটা অপার্থিব শক্তির, তাহা ইন্দ্রিয়ের, সেইরূপ এই দৃশ্যটিও একটী অপার্থিব শক্তির অপরূপ ছায়াভাস বলিয়া মানিয়া লইও।

তোমাকে এত কথা কেন লিখিতেছি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—তুমি আমাপেক্ষা ভাল বুঝিবে। বুঝিলে তোমার সেই জ্ঞানের অংশ পাইব, তোমারও সংসার জীবন সুখের হইবে। পৃথিবীতে অনেক লোক বড় দুঃখী; কারণ তাহারা সুখও বুঝে না, জীবনও বুঝে না। জীবনে দুঃখের অপেক্ষা সুখের ভাগ অধিক, জীবনেচ্ছাই ইহার প্রমাণ, আবার, শক্তি এবং নৈপুণ্যগুণে দুঃখকেই সুখ বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়। তবু অনেক লোক এখন অসুখী যে তাহারা সুখকেও সুখ বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে এবং অনুভব উপভোগ করিতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রকৃত সুখকে আমরা আলস্যে, মূর্খতায় এবং ঔদাসীন্যে পদদলিত করিয়া যাই; আমরা সম্মুখের অগাধ সলিলা স্রোতোস্বায় বীতস্পৃহ হইয়া মৃগতৃষ্ণার

প্রণয়বান হই। আমরা সুখ ধরিয়া রাখিতে পারি না, সুখ চলিয়া যায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়। যখন সহস্র চেষ্টায়ও তাহা আবার প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার নহে, তখন আমরা তাহার মূল্য বুঝি, সংসা যেন তাহার অভাবটা প্রাণময় অনুভব করিয়া উঠি, এবং জীবনময় তাহার জন্য নিষ্ফল হাহাকার করিয়া বেড়াই। অনেক বৃদ্ধ বড় অসুখী, যুবকদের দ্বারা, শিশুদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকে বলিয়াই অসুখী; কারণ, তাহারা এক অতি কঠোর নির্ম্মম স্মৃতির ভিতরেই যেন জাগিয়া থাকে, যুবকদের প্রত্যেক চলনে ভঙ্গীতে তাহারা নিজেদের অপগত যৌবন, এবং অতর্কিতপ্রস্থিত সুবিধা ও সৌভাগ্য ভাবিয়া ভাবিয়া সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাসে কাল কাটাইয়া যায়। তোমার তেমন কিছু হইবে না; আমার বিশ্বাস; কারণ তোমার বুঝিবার শক্তিও আছে উপভোগ করিবার শক্তিও আছে। জীবনের সমুদায় নিভৃত প্রকোষ্ঠগুলিকে পর্য্যন্ত জ্ঞানে এবং চৈতন্যে উদ্ভাসিত করিয়া লও; দুঃখের কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গারগুলি পর্য্যন্ত হৃদয়াগ্নি সহযোগে জ্যোতিষ্মান্ হউক; জীবনের কোন অঙ্কে যেন অনুমাত্র দৈন্য অতৃপ্তি অথবা শূন্য না থাকিয়া যায়।

আমরা জীবনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি; শৈশবের মধুর স্মৃতি সুদূরাগত সমুদ্র কল্লোলের মত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তবু যখন আঙ্গিনায় শিশুগুলি চিন্তাহীন বিঘ্নহীন পরমানন্দে খেলা করিতেছে দেখি; প্রভাতে, সায়াহ্নে নিস্তব্ধ প্রান্তর কি নদীতীর হইতে পল্লীবালকের হৃদয় দ্রবকর তীব্র সঙ্গীত শুনি; অমনি এক মুহূর্ত্তে সেই শৈশব, সন্ধ্যাকাল, মায়ের হাস্যমুখ, ভাইবোনের গলাগলি সজাগ হইয়া উঠে, এবং মনের কোন লুক্কায়িত প্রকোষ্ঠ হইতে যেন একটা অজানা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া সমস্ত জগৎ পূর্ণ করিয়া ফেলে—তাহার কারণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। বুঝি, এই সঙ্কটময় সমরময় কর্ম্মজীবন অপেক্ষা শিশুর ওই বোধ কলুষ আমোদ ক্রীড়া, এবং হিন্দোলবর্দ্ধিত সুষুপ্তিই সমধিক আগ্রহনীয়! বুঝি জীবনের এই কঠোর জ্ঞানের এবং অজ্ঞানের বোঝা দূরে ফেলিয়া শিশুর মত একবার ওইরূপ সরল প্রাণে নৃত্য করিতে পারিলেই জীবনের অনেকটা শূন্য পূর্ণ হইয়া যাইত! যাহা গিয়াছে তাহা আর পাওয়া যাইবে না, তাহার উপর মানবের একটা অপরিতৃপ্তি থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান যদি গোলাপ-ফুলের মত মধুময় এবং আনন্দকর হয়, তবু তাহাতে কাঁটা আছে; কিন্তু যখন ইহা আমাদের মুষ্টিচ্যুত হইয়া ক্রমে দূরে অপসৃত হইতে থাকে, আমরা

কণ্টক দংশন ভুলিয়া যাই, তখন উহা নিষ্কণ্টক এবং নিরাময় হইয়া চিরকাল আমাদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। একটা কথা আছে সত্যযুগ কখনো বর্ত্তমান ছিল না, উহা চিরকাল অতীতের জিনিষ। মানবের তৃষ্ণাতুর দৃষ্টি চিরকাল এইরূপ মরীচিকার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। ইহা আমাদের স্বভাব; আমরা বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীতের বেশী আদর করি। বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট হইতে গেলে শক্তি এবং নৈপুণ্যের আবশ্যক; জ্ঞান চাই, সাধনা চাই। এখন তুমি যৌবনের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান, ওই জ্ঞান এবং ওই সাধনা তোমার হউক; জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়াইয়া যেন আবার এই মধ্যাহ্নের প্রতি ও হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে না হয়।

রঘুবংশ পড়িয়াছ,—বল দেখি কোন শ্লোকটি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে?—আমি বলিতাম সেইটি যেখানে মহাকবি বলিয়াছেন দিলীপ ও সুদক্ষিণার পরস্পরের প্রতি যে স্নেহ ছিল সন্তানটি মাঝে পড়িয়া তাহার ভাগ লইলেও কমিল না। বরং বাড়িয়া গেল। কালিদাসের কবিতা স্বভাবতঃ তরল। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত মহাকবির ন্যায় কালিদাসের ভিতরও একটা অনায়াসসিদ্ধ গাম্ভীর্য্য আছে। সেই গাম্ভীর্য্য উপরে ভাসিয়া বেড়ায় না। তাই সাধারণ লোক কালিদাস পড়িয়া যায় আর ভাবে যেন সব বুঝিয়া গেল। কিন্তু আমার মতে কালিদাসের কবিতাই সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; কারণ সংস্কৃত ভাষায় কোন কবিকে বুঝিতে আমার তত অভিনিবেশের দরকার হয় নাই, বরং সহস্র অভিনিবেশ সত্ত্বেও কালিদাস বুঝিবার অনেক বাকী আছে। উপরে যে কবিতার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার অপরিসীম ভাব গাম্ভীর্য্য চিরকাল আমাকে বিস্মিত করিয়া রাখিয়াছে, কালিদাস জানিতেন, দম্পতির প্রথম প্রেম চিরকালই সৌন্দর্য্যমোহে আকৃষ্ট হয়, স্ত্রী পুরুষের সৌন্দর্য্যে এবং পুরুষ স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে প্রথমতঃ মধুকর ও ফুলের মত আবদ্ধ হইয়া যায়। পুরুষের সৌন্দর্য্য স্ত্রীসৌন্দর্য্য অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী; কারণ সন্তান পালনরূপ মহাযজ্ঞে স্ত্রীলোককে আপনার সমস্ত রূপযৌবনের ডালি আহুতি প্রদান করিতে হয়। সুতরাং সৌন্দর্য্যে উপচীয়মান পুরুষ সৌন্দর্য্যে হীয়মানা রমণীকে যে পূর্ব্বাপেক্ষা বিতৃষ্ণার সহিত দেখিবে তাহা কিছু অস্বাভাবিক নহে; এবং রমণীও যে ক্রমে স্বামীর সোহাগ শৈথিল্য বুঝিয়া, এবং কথঞ্চিৎ হৃদয়ের টানে আকৃষ্ট হইয়া, নিজের বক্ষের ধনকে দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত আপনার করিতে চাহিবে, এবং স্বামীর

প্রতি ন্যূনাধিক শৈথিল্য দেখাইবে, তাহাও সম্পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ। কালিদাস বুঝিলেন সন্তান জন্মিয়া এই দম্পতির প্রেম স্থৈর্য্য এবং সংসার চলন বিষয়ে এক অভিনব অন্তরায় উপস্থিত করিল। কিন্তু কালিদাসকে আদর্শ দম্পতির সৃষ্টি করিতে হইবে। তাই তিনি লিখিলেন—তাঁহার সেই সিদ্ধ হস্তের অনায়াস গাম্ভীর্য্য এবং সুমধুর তারল্য মল্লিকাসুরভির মত হৃদয় অভিভূত করে—

"এই পরস্পরাশ্রয় অদ্ভুত ভাব-বন্ধনের মধ্যস্থলে একটা নূতন লোক আসিয়া দাঁড়াইল! সে আসিয়া জোর করিয়া উভয়ের থালা হইতে অমৃত বিভাগ করিয়া লইল; এবং এক অবিশ্রাম আমোদহাস্যে গৃহ পূর্ণ করিয়া আপন মনে তাহাই ভোগ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই অতর্কিত এবং অবিসংবাদিত লুণ্ঠনের পরেও উভয়ের ভাগে কিছুমাত্র কম পড়িল না, বরং বাড়িয়া গেল!"

এই শিশু তোমাদের দুই হৃদয়ের স্নেহতন্তু, আনন্দসেতু! এই শিশু তোমাদের প্রেমতরুর ফল। ফল হইলেই তরুর গৌরব বাড়ে। শরতের প্রারম্ভে শস্যক্ষেত্রের অপরূপ শ্যামশোভা নয়ন মন মুগ্ধ করে, হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে; তবু আমরা আশা করি না যে উহাই চিরকাল বর্ত্তমান থাকুক; আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলি এই লীলা, এই আবেশ, এই তরঙ্গ আশু পরিপক্ক এবং ঘনীভূত হইয়া স্বর্ণশীর্ষ ফলভারে আনমিত হউক; তবেই সমস্তের সার্থকতা হইল! দম্পতির প্রথম প্রেম অনেকটা সংসার ছাড়াইয়া উঠে; তাহাতে অনেকটা ছায়া অনেকটা অতৃপ্তি মত্ততা এবা জাগ্রত স্বপ্ন থাকে; দুইটী হৃদয় যেন আকাশ কুসুম লইয়া কাড়াকাড়ি করে; চিরবাঞ্ছিত অমৃত ধারা অধরের নিকট আসিয়াই নির্দ্দয়ের মত সরিয়া পড়িতেছে বোধ হয়। কালে ছায়া সরিয়া পড়ে; সমস্ত বিফল, দুর্দ্দমনীয় আবেগ কমিয়া আসিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত জীবনের মর্ম্মদেশ অধিকার করে। কবি ভবভূতির ভাষায়, তখন প্রেমের সমস্ত মোহ আবরণ অপগত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত এবং কল্যাণকর স্নেহনীরে পরিণত হয়; কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখনি স্বামী ধন্য হয়; কবি হেমচন্দ্রের ভাষায় তখনি স্ত্রী আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্য উৎসঙ্গে ধরিয়া দেবসৌন্দর্য্যে দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

শ্রী শঃ।

আমাদের অবস্থা।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

দেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদের সম্বন্ধে গুটিকতক স্থূল স্থূল কথা বলা গিয়াছে। কিন্তু দেশের অবশিষ্ট লোকের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। পোনের আনার উপর লোক কৃষক বা শ্রমজীবী। ইহাঁদের অবস্থা আজ কাল কিরূপ দেখা যাউক। প্রথম কৃষক ;—দুইটী কারণে কৃষকদিগের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। (১) দেশের বাণিজ্য বিস্তার,—কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের আজ কাল বিদেশে রপ্তানি খুব। বহু দিনের কথা নয়, অবস্থা এরূপ ছিল যে, অনেক কৃষক উচিত মূল্যে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বেচিতে পারিত না। ক্রেতার অভাব বিলক্ষণ ছিল। অনেক সময় এমনও হইত যে এক জেলায় অন্নকষ্ট উপস্থিত, নিকটবর্ত্তী আর এক জেলায় ফসল প্রচুর পরিমাণে হইযাছে। কিন্তু রাস্তা ঘাট প্রভৃতি না থাকায় শেষোক্ত জেলা হইতে চাউল লইয়া গিয়া পূর্ব্বোক্ত জেলায় অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে পারা যাইত না। এখন আর সে অবস্থা নাই। রাস্তা ঘাট রেল খাল অনেক হইয়াছে ; দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে যাইতেছে। অন্তর্বাণিজ্যের বিস্তার হেতু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং নগর হইতে নগরান্তরে কৃষিজাত দ্রব্য চালান হইতেছে। কৃষককে আর ফসল কোলে করিয়া কাঁদিতে হইতেছে না। সে তার ফসলের ও পরিশ্রমের উচিত মূল্য পাইতেছে। বাণিজ্য বিস্তারের নিমিত্ত সে অনেক সময় পুরাতন ফসল ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত নূতন লাভজনক ফসল উৎপাদন করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে বহুল পরিমাণে পাটের চাষ ইহার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ কৃষিজাত দ্রব্যের দাম যে কত বাড়িয়াছে তাহা সকলেরই জানা আছে। বাণিজ্য বিস্তার হেতু ফসলের মূল্য বৃদ্ধি ও মূল্যবান ফসলের চাষ কৃষকের অবস্থোন্নতির এক প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (২) প্রজাসত্ত্ব আইনের অবতারণা। গবর্ণমেণ্ট যখন দশশালা বন্দোবস্ত করেন তখন কেবল নিজের স্বার্থ ও তাহার অনুরোধে জমিদারদিগের স্বার্থের প্রতিই তাকাইয়া ছিলেন। ক্রমে গবর্ণমেণ্ট নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন, এবং জমিদার যাহাতে নিষ্ঠুররূপে প্রজা শোষণ করিতে না পারেন তাহার উপায় উদ্ভাবনে মন দিলেন। দশশালা বন্দোবস্তে জমীদারদের দেয় খাজনা নিরূপিত হইয়া-

ছিল, কিন্তু প্রজার উপর জমিদারের ক্ষমতা বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ বন্দোবস্তের পর অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর চলিয়া গেলে বুঝা গেল, যে প্রজার উপর জমীদারের অসীম ক্ষমতার কিছু খর্ব্বতা না হইলে আর প্রজার নিস্তার নাই। সেই সময় হইতেই অল্প অল্প চেষ্টা হইতে লাগিল, যাহাতে প্রজা যে জমী ভোগ করে তাহার উপর তাহার কিছু স্বত্ব জন্মায়। ঐ চেষ্টার শেষ ফল বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব আইন। ঐ আইনের অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য যে মহৎ এবং উহা দ্বারা প্রজার যে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবেক।

উপরে যে দুইটী কারণের উল্লেখ করা গেল তাহা হইতে বঙ্গদেশীয় কৃষকের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন কয়েকটা কারণ আছে যাহা ঐ উন্নতির পক্ষে বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অতি সংক্ষেপে তাহাদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে। (১) কৃষকদিগের নিরক্ষরতা—এই নিরক্ষরতা নিবন্ধন তাহারা অনেক সময় কিসে অবস্থার উন্নতি হইবে, কিসে ফসলের উন্নতি হইবে প্রভৃতি বিষয় বুঝিতে পারে না। ইহা ছাড়া, মূর্খ বলিয়া ইহারা পদে পদে প্রতারিত হয়, ও আপনাদের স্বত্ব বুঝিয়া লইতে পারে না। মূর্খ বলিয়াই ইহারা অনেক সময় দুর্ব্বল। (২) জমীদারের উৎপীড়ন—ইহাকেও এক প্রকার কৃষকের মূর্খতার ফল বলিলেও বলা যায়। সকল জমীদার যে উৎপীড়ক এ কথা আমি বলিতেছি না। ভাল জমীদার অনেক আছেন। কিন্তু প্রজাপীড়নে আনন্দ অনুভব করেন এরূপ জমীদার বড় বিরল নন্। প্রজার উন্নতি কল্পে আইন করিলে কি হয়! আইনের মর্ম্ম কয়জন প্রজা বুঝে, এবং বুঝিলেও কয়জন আইন সাহায্যে আপনাকে জমীদারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে ক্ষমতাবান্! জমীদারের চাপন অনেক স্থলে গাঁটকসার চাপনের চেয়ে অধিক। অনেক জমীদার আছেন যাঁহারা প্রজার নিকট হইতে শুষিয়া কর আদায় করিতে কৃপণতা করেন না, এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে হায়রান করেন। (৩) মোকদ্দমা প্রিয়তা—অনেক কৃষককে আজকাল বড় মোকদ্দমাপ্রিয় দেখা যায়। মোকদ্দমাপ্রিয়তা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। নিজের ন্যায্যগণ্ডা পাইবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য দোষের নহে, কিন্তু মোকদ্দমার জন্য মোকদ্দমা করা একটা কুৎসিত ও ব্যয়সাপেক্ষ নেশা বই আর কিছুই নয়। বাঙ্গালার অনেক স্থানের, বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলের

কৃষকদের যে মোকদ্দমাপ্রিয়তা সম্বন্ধে বড় অখ্যাতি আছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এইজন্য কত সময় ও অর্থ নষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অন্যায় জিদ বড় ভয়ানক দোষ। আমার মন আমাকে স্পষ্ট বলিতেছে যে, আমি যাহা করিতে চাহিতেছি তাহা ন্যায়-সঙ্গত নয়, কিন্তু বলিলে কি হয়, অমুককে জব্দ করিতে হইবেই, তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় সেও স্বীকার। আমার বোধ হয় দেশের বারআনা মোকদ্দমার মূলে জিদ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। (৪) অমিতব্যয়—ইহা কৃষকদের এক পুরাতন ব্যাধি।. উহাদের মধ্যে এমন লোক অনেক আছে যাহারা ধার করিয়া, শ্রাদ্ধাদি দূরে থাকুক পৌষ-পার্ব্বণে ঘটা করে। ভবিষ্যৎ ভাবনা অনেক সময় ইহাদের মনে স্থান পায় না। আজ কাল আবার ইহাদের পিতৃ পৈতামহিক অমিত-ব্যয়িতার উপর একটু বিলাসিতার আমেজ আসিয়া পড়িয়াছে। সহরে আসিলে অনেক চাষাকে ইংরাজী জুতা, বিলাতী ছাতা, ও ধোয়া জিনের কোট কিনিতে দেখা যায়। বিলাসিতা সম্বন্ধে বিস্তর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নূতন কিছু বলিবার আবশ্যক দেখি না। (৫) সন্তানোৎপাদন—মধ্যবিত্ত লোকেদের পক্ষে এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে কৃষকদের সম্বন্ধে তাহার অনেকটা প্রযোজ্য। অনেকে বিস্তর সন্তান সন্ততি লইয়া বড় কষ্ট পায়। তবে যেখানে কৃষিকার্য্যের সুবিধা আছে, সেখানে চাষার ছেলেরা বড় হইলে তাহাদের পিতামাতার ভার অনেকটা কমিয়া যায়। কিন্তু এ সুবিধা ক্রমে যে অন্তর্হিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন শিক্ষিত লোকদিগকে অধিক অপত্য উৎপাদন বন্ধ করার বিষয়ে পরামর্শ দিবার সময় আজিও আইসে নাই বলিয়া বোধ হয়, তখন কৃষকদিগকে সে সম্বন্ধে কিছু বলা "উলুবনে মুক্তা ছড়ান" মাত্র। (৬) ম্যালেরিয়া জ্বর—যে সব স্থানে ইহার প্রাদুর্ভাব সে সব স্থানে ইহা হইতে চাষার বিশেষ অনিষ্ট হয়। কোন একটা চাষা-গ্রামে প্রবেশ করিলেই প্রথমে কতকগুলি রুগ্ন ও বিষণ্ণ ছেলে মেয়ে দেখা যায়। যুবক যুবতীরাও ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত এড়াইতে সক্ষম নয়। ইহা হইতে কত ক্লেশ, অর্থনাশ ও জীবন নাশ ঘটে! যখন শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম জানিয়া এবং কিয়ৎপরিমাণে সেই নিয়ম প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিয়াও কালোপম ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে আপনাদিগকে ও আপনাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তখন নিরক্ষর কৃষকগণ

ইহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে? পূর্ব্বে যে প্রণালী অবলম্বন করিলে শরীর সুস্থ থাকিত, জোর তাহারা তাহার কতকটা অবলম্বন করিতে পারে। পূর্ব্বের অনেক নিয়ম কিন্তু আর দেশে খাটে না। এবং অনেক স্থলে চাষা লোকের আর দুরবস্থার সীমা নাই। (৭) নেশা—দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার নেশার প্রচলন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। আবকারি বিভাগের রিপোর্ট দেখিলে ইহা অনেকটা বুঝা যায়। সেকালে চাষাদের মধ্যে নেশার সামগ্রী ছিল গাঁজা,চরষ ও তাড়ী।—আজ কাল ইহাদের উপর কিয়ৎপরিমাণে দেশীয় মদ জুটিয়াছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের বিশ্বাস ছিল আবকারি আয় বৃদ্ধি দেশের লোকের অবস্থোন্নতির পরিচায়ক। আমরা বিবেচনা করি তাহা না হইয়া ইহা অবস্থার অবনতির অন্যতম কারণ। (৮) ঋণ—কৃষক শ্রেণীর উন্নতির যে সব বিঘ্ন উল্লিখিত হইয়াছে অল্প বিস্তর তাহারা সকলে মিলিয়া এই শেষ বিঘ্নটা উৎপন্ন করিয়াছে। অনেক কৃষক ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। যে একবার মহাজনের চক্রের ভিতর প্রবেশ করিল তাহার বহির্গমন অসম্ভব। আসল ও "সুদের সুদ তস্য সুদ" তার ঘাড়ে চাপিল। শুনিয়াছি নীলের দাদন কখনও শোধ যায় না। মহাজনের টাকা যে কখনও শোধ যায় তাহাও শুনি নাই। চাষার অবস্থার উন্নতির জন্য অনেকে মাথা ঘামাইতেছেন, কিন্তু কি করিয়া তাহাকে মহাজনের হস্ত হইতে রক্ষা করা যাইবে তাহার উপায় আবিষ্কার করিতে এ পর্য্যন্ত কেহ সক্ষম হন নাই। যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন চাষার অবস্থার উন্নতি বহু দূরে। আমি যে মহাজনের দোষ দিতেছি তাহা যেন কেহ মনে না করেন। বর্ত্তমান অবস্থায় মহাজন অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান মহাজনী প্রথা ভাল বলিতে প্রস্তুত নই।

৫

শ্রমজীবী সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। এখানে শ্রমজীবীর অর্থ সামান্য দোকানদার, ব্যবসাদার, শিল্পকর, ও মুটে মজুর চাকর ইত্যাদি। সামান্য দোকানদার ও ব্যবসাদারদের অবস্থা মোটের উপর মন্দ নয়। যদি তাহারা শ্রমশীল ও বুদ্ধিমান হয়, এবং বেশী লাভ করিবার আশায় অত্যধিক পরিমাণে ধারে বিক্রয় না করে, তাহা হইলে তাহারা একরূপ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

অধিকাংশ সহর ও গণ্ডগ্রামে দোকানী পসারীর অবস্থা সচ্ছল বলিয়া বোধ হয়। সামান্য মুদীর বা ময়রার দোকান করিয়া অনেককে দুই পয়সা সংস্থান করিতে দেখা গিয়াছে। সামান্য ব্যবসাদার ও কারিকরদিগের অবস্থাও মন্দ নয়। একজন ভাল কামার আজ কাল চেষ্টা করিলে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, এবং অনেক স্থলে করিয়াও থাকে। কুমার প্রভৃতির অবস্থাও সাধারণতঃ মন্দ কি? বড় বড় সহরে এমন অনেক ভাল নাপিত আছে, যাহারা মনে করিলে রোজ ১৲ টাকার উপর উপায় করিতে পারে। ছোট সহরেও এমন নাপিত অনেক আছে যাহারা প্রত্যহ ৫।৬ আনা রোজগার করে। ধোবা, ছুতার, দরজী, সেকরা প্রভৃতির দর খুব চড়া। তোমার বাড়ীতে যদি একটু সামান্য ছুতারের কাজ দরকার হয় দেখিবে দুনা দাম দিয়াও তুমি অনেক সময় লোক পাইবে না। ইহাতেই বুঝা যায়, ছুতারের কত কাজের ভিড়। দেশে বিলাসিতা ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে ধোবা ও দরজীর কাজেও দর বেশ পড়িয়া গিয়াছে। গৃহলক্ষ্মীদের অলঙ্কারপ্রিয়তা খুব বলবতী আছে, তাহার উপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফ্যাসনের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, সুতরাং সেক্‌রাদের আজ কাল "পাথরে পাঁচ কিল।" "পুঁথি বাড়াইবার" ইচ্ছা নাই, নহিলে অনেক কথা বলা যাইত। মোটের উপর ইহা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবেক না যে, দোকানদার ও কারিকরগণ আজ কাল বুদ্ধিমান ও নিপুণ হইলে অনায়াসে দুই পয়সা রোজগার করিতে পারে। একশ্রেণীর লোকের প্রতি কিন্তু এই কথা খাটে না—তাহারা তন্তুবায়। সৌখীন ধুতি ও সাটীর কথা বলিতেছি না, কিন্তু পূর্ব্বে যাহারা মোটা কাপড় প্রস্তুত করিত, বিলাতী প্রতিযোগিতায় তাহারা একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছে। অনেককেই ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যাহারা আজও পুরাতন ব্যবসা ছাড়িতে পারে নাই তাহারা জীবিত আছে মাত্র।

দেশে কিয়ৎপরিমাণে কলকারখানার অনুষ্ঠান হওয়াতে কতকগুলি কারিকর ও শিল্পিশ্রেণীর লোকের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে। যেখানে কাগজ বা পাটের কল হইয়াছে সেখানে কতকলোক বেশ কাজ পাইতেছে, এবং পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাদের জন্য অন্য অন্য ব্যবসায়েরও দর বাড়িয়াছে। কলিকাতা সহরে ও অন্য অন্য দুই এক স্থানে ময়দা ও তেলের কলেও কতকগুলি লোক প্রতিপালিত হইতেছে। রেলওয়ে প্রচলিত হওয়ায় অনেক

কারিকর ও শিল্পীর একরূপ অন্নের সংস্থান হইয়াছে। কিন্তু দেশে কল-কারখানা আজও এত কম যে, তাহাদের ফল দেশব্যাপী হইতে অনেক বিলম্ব আছে। কলকারখানায় যেমন কতকগুলি সুফল তেমনি কতকগুলি কুফলও আছে। কিন্তু এখানে তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার দরকার নাই।

যে শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হইতেছে, তাহাদের অবস্থার সাধারণতঃ কতকটা উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণ উন্নতির পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (১) কৃষিজাত দ্রব্য সমূহের মূল্য বৃদ্ধি—যে লোক এখন একটা কাজ করিয়া রোজ ॥০ আট আনা উপায় করিতেছে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তার পিতামহ হয় ত সেই কাজ করিয়া ৶০ আনার বেশী উপায় করিতে পারিত না; কিন্তু তখন যে চাউলের মণ ১।০ ছিল তাহার মণ যদি এখন ৩৲ টাকা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান আয় বৃদ্ধি কেবল নাম মাত্র। কার্য্যতঃ উহা কিছুই নয়। অনেকস্থলে যে ইহাই ঘটিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। (২) অত্যধিক প্রতিযোগিতা—প্রতিযোগিতা সভ্যতার একটী চিহ্ন, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় ইহা উপকারী নয়। অপরিমিত প্রতি-যোগিতা উপকার না করিয়া অপকারই করে। একটী ক্ষুদ্রগ্রামে আমার একখানি মুদীর দোকান আছে। হয় ত এক খানির বেশী সেখানে চলিতে পারে না। তুমি দেখিলে, তোমার অন্নের সংস্থান হইয়া উঠিতেছে না, আমি একপ্রকার সুখে আছি। অনেক চেষ্টায় তুমি কিছু মূলধন জুটাইয়া আমার দোকানের পার্শ্বে আর একখানি মুদীর দোকান খুলিলে; লাভের মধ্যে এই হইল, তোমার দুঃখ ঘুচিল না এবং আমার দুঃখ বাড়িল। এরূপ প্রতি-যোগিতা দুর্ণীয়। উদরান্নের সংস্থান যত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, এইরূপ প্রতিযোগিতা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশে দারিদ্র্য খুব। কাজে কাজেই লোকে অনন্যোপায় হইয়া অনেকস্থলে এইরূপ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইতেছে। (৩) অমিতব্যয় ও বিলাসিতা। (৪) ম্যালেরিয়া জ্বর। (৫) বহু সন্তানোৎপাদন। এই কয়টী বিষয়ের উপর ইতিপূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখানে আর বেশী কিছু না বলিলে চলে। যে শ্রেণীর কথা আলোচনা করা যাইতেছে তাহার অনেকেই অপরিণামদর্শী, অমিতব্যয়ী এবং অনেকেরই বাবুয়ানার দিকে ঝোঁক হইয়াছে। যেখানে ম্যালেরিয়া আছে তথায় ইহার হাতে প্রায় কাহারও নিস্তার নাই। বহু-সন্তানোৎপাদন আমাদের সকলেরই এক প্রধান কাজ। সন্তানোৎপাদনের

জন্যই বিবাহ এবং যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের সকলেরই বিবাহ হইয়া থাকে। (৩) নেশা—ইহার কথাও পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। যে শ্রেণী আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় আব্‌কারিকরের ইহারা আজ কাল এক প্রধান সহায়। পানদোষ কৃষকের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কারিকর ব্যবসাদার প্রভৃতির মধ্যে এই দোষ বিশেষ প্রবল। ইহার জন্য অনেকে রীতিমত পরিশ্রম করে না, এবং অনেকের অনন্যাশ্রয় পরিবারবর্গ অনাহারে অর্দ্ধেক সময় অতিবাহিত করে।

মুটে মজুর প্রভৃতি শ্রমিকদের অবস্থা সাধারণতঃ বড়ই হীন। অনেক স্থলে ইহারা দিন ৩। ৪ আনার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। যে সব স্থানে কলকারখানা আছে সেখানে ইহাদের উপায় কিছু বেশী হয় বটে, কিন্তু সেরূপ স্থান দেশে কত? যেখানে টাকায় ৩টা ঘরামি বা ৫টা জোগাড়ে সেখানে ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। এমন স্থান ঢের আছে যেখানে একজন ঘরামির পক্ষে ।/০ আনা, ও একজন জোগাড়ের পক্ষে ৶০ আনা রোজগারও অসম্ভব। শরীর সবল থাকিলে ৶০ আনার বেশী উপায় করিতে পারে না প্রতিগ্রামে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এবং আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া প্রসাদাৎ যে গ্রামে একজন মজুর বা অন্যরূপ শ্রমিককে মাসের মধ্যে ৫। ৭। ১০ দিন জ্বরে ভুগিতে হয় সেরূপ গ্রামের নিতান্ত অপ্রতুল নাই। আমার একজন পরিচিত ডাক্তার আছেন তাঁহার এক গরীব পল্লীর নিকট বাস, এবং অনেক গরীব ব্যক্তিকে তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে হয়। তিনি বলেন, "স্ত্রীপুত্র লইয়া ৫। ৭টী পোষ্য এবং নিজে রোগে ভুগিতেছে, এমন যে কত শ্রমিক দেখিতে পাই তাহা আর কি বলিব।" ইহারা প্রায় সকলেই রোজ ৶০ আনার বেশী কিছুতেই উপার্জ্জন করিতে পারে না, এবং যখন সুস্থ ও সবল থাকে তখন যে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারে ইহা অসম্ভব। স্ত্রীপুত্রাদিকে যে একবেলা পেট-পুরিয়া আহার দিতে অক্ষম সে যে কিছু সঞ্চয় করিবে বাতুল ভিন্ন অন্য কেহ তাহা ভাবিতে পারে না। যেরূপ দরিদ্রতার কথা উল্লেখ করা গেল, ইহা কি দেশে বড় বিরল? আহার্য্য দ্রব্যের আজ কাল কি দর তাহা সকলেরই জানা আছে? যাহার রোজ ৶০ আনা আয় ৫। ৬টী পোষ্যের শুধু ভাত যোগানই তার ক্ষমতার বাহিরে। তাহার উপর নিজের ও পরিবারবর্গের কাপড় আছে! ব্যারামও নিত্য বস্তুর মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে

প্রকার লোকের কথা বলা যাইতেছে, আমাদের দেশে ইহারা কেহই অবিবাহিত থাকে না। বংশবৃদ্ধি ইহাদের বেশ। যে সব সন্তান জন্মায় সকলেই যে বাঁচিয়া থাকে তাহা নয়। কতকগুলি শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা বলিয়া কষ্ট পাইবার ও কষ্ট দিবার লোকের অভাব হয় না। অধিকন্তু এই সব লোকের মধ্যে নেশাখোর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের অবস্থা এইরূপ তাহাদের নিকট আত্মসংযম আশা করা অন্যায়। যখন আত্মাভিমানী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মসংযমীর সংখ্যা বেশী বলিয়া বোধ হয় না, তখন নিরক্ষর দুঃখদগ্ধ মুটে মজুর যে সংযমী হইবে, তাহা হইতে পারে না। অনেক শ্রমজীবী আছে, যাহারা সন্ধ্যার সময় সমস্ত দিনের কষ্টলব্ধ উপার্জ্জনের অধিকাংশ এক তাড়ীওয়ালার কিম্বা দেশীয় মদবিক্রেতার দোকানে দিয়া টলিতে টলিতে নিরানন্দে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়।

গৃহস্থদের অত্যাবশ্যকীয় ঝী চাকরদের অবস্থা কি কেহ কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? তাহারা গৃহস্থের বাড়ী খায় পরে এবং ঝী হইলে জোর ২৲ টাকা ২৷৷৹ টাকা, এবং চাকর হইলে জোর ৩। ৪ টাকা মাহিয়ানা পায়। ঝীকে হয় ত বৃদ্ধা মা, নিজের বা মৃত ভাই কিম্বা ভগিনীর ২। ৩টী সন্তান প্রতিপালন করিতে হয়। চাকরটীর ত গৃহস্থালীর সমস্ত সামগ্রীই আছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাদের মাহিয়ানা কিছু বাড়িয়াছে বটে (অবশ্য যৎকিঞ্চিৎ) কিন্তু তাহাতে হইল কি? ২৲ টাকার স্থলে ২৷৷৹ টাকা কিম্বা ৩৲ টাকার স্থলে ৪৲ টাকা হওয়াতে ইহাদের যে বিশেষ উপকার হইয়াছে তাহা মনে করা এক বিষম ভ্রম। এই অবস্থার উপর আবার কতকটা অবস্থাপন্ন লোকের সংসর্গে থাকায় ইহাদের অনেক সময় চাল বিগড়াইয়া যায়। অনেক চাকরকে ইংরাজী জুতা ও কোট পরিতে, ও অনেক ঝীকে নিজের নববিবাহিতা পুত্রবধূর জন্য ৭। ৮ টাকা দামের বোম্বাই সাটী, ও রাঁধুনী ঠাকুরাণীকে ছেলে কিম্বা ভাইয়ের জন্য ৭। ৮ টাকা দামের র‍্যাফার কিনিতে দেখিয়াছি। কোন কোন স্থলে ঝী চাকরের একটু টান পড়িয়াছে বটে, তাহা একটা সুলক্ষণ বলিয়া বোধ হয়। ইহার অর্থ যাহাদের পূর্ব্বে ঝী বা চাকর হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না তাহারা বেশী পয়সা পাওয়া যায় এমন কাজ পাইতেছে। কিন্তু এরূপ স্থলের সংখ্যা বড় কম।

এই খানে প্রবন্ধ শেষ করা গেল। বাহুল্যভয়ে অনেক কথা বলা গেল না। অজ্ঞতানিবন্ধন অনেক কথা বলিতে পারিলাম না। পাঠক পাঠি-

কায় যদি "আমাদের অবস্থার" প্রতি মন আকর্ষিত হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট।

দ।

পলাশ বন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

কিরূপস্থলে বাটী নির্ম্মিত হইল, তাহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাউক। পিতৃদেব যে স্থানটী বসবাসের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটী বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে। এই ভূখণ্ডের উত্তর ভাগে কৃষ্ণপ্রস্তরের একটী অনুচ্চ শৈল। শৈলের উপরে দুই একটী পলাশ বৃক্ষ ও আরণ্যলতা ভিন্ন আর কোনও উদ্ভিদ্ নাই। বোধ হয়, বহুপূর্ব্বে শৈলটি একটী অখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর ছিল; কিন্তু তাহা কোনও নৈসর্গিক কারণে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। এই শৈলের পাদমূলে ও চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ কৃষ্ণপ্রস্তররাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে; দেখিয়া বোধ হয় যেন কোন সুনিপুণ শিল্পী স্থানটির শোভাবর্দ্ধনের জন্য অতিশয় যত্নসহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রস্তর-খণ্ড ও কৃষ্ণপ্রস্তর স্তূপ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া সেই স্থানের সৌন্দর্য্যে ভীষণতা আনয়ন করিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন, আরণ্য হস্তিযূথেরা যদৃচ্ছাক্রমে শয়ন ও উপবেশন করিয়া সেই স্থানে বিশ্রামসুখ-লাভ করিতেছে। সেই স্থানে পলাশবৃক্ষ ভিন্ন প্রায় অন্য জাতীয় বৃক্ষ নাই। একটী ক্ষুদ্র তটিনী কোন এক অজ্ঞাত নিভৃত স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই শৈলের পাদমূল প্রক্ষালন করিতে করিতে অদূরে শ্যামল অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলধারা উল্লাসে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে লম্ফপ্রদান করিতে করিতে এক মধুর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিতেছে। শৈলের পাদমূল হইতে ভূখণ্ডটি আনত হইয়া দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইয়াছে। এই ভূখণ্ড বনাচ্ছন্ন; কিন্তু বন নিবিড় নহে; এবং বৃক্ষাদির মধ্যে শালবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষও বিস্তর। অপেক্ষা-

কৃত পরিষ্কৃত স্থলে কতকগুলি শাখাপ্রসারী প্রগাঢ় ছায়া-সবলিত বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমগ্র ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় চারি শত বিঘা। ইহার উত্তরদিকে পূর্ব্বোক্ত শৈল ও পলাশবৃক্ষরাজি; পশ্চিমদিকে যমুনা তটিনী ও নিবিড় বন; দক্ষিণদিকে যমুনা ও গুল্মাচ্ছন্ন ভূমি; পূর্ব্বদিকে একটী গ্রাম্য রাজপথ; এই পথের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগেই পলাশবন গ্রাম, যাহার কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

গ্রাম্য রাজপথের পশ্চিম ভাগে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা ভূমি বনাচ্ছন্ন নহে। পূর্ব্বে অবশ্য এখানে বন ছিল; কিন্তু তাহা কর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি প্রয়োজনীয় সুন্দর বৃক্ষই যদৃচ্ছাক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই বৃক্ষগুলি কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া স্থানটিকে মনোরম করিয়াছে। আমি এই স্থানটিই মনোনীত করিয়া তন্মধ্যে আবাসবাটী প্রস্তুত করাইলাম। আবাসবাটীর বামভাগে অদূরে গ্রাম্য রাজপথ ও পলাশবন গ্রাম; দক্ষিণভাগে কতিপয় হস্ত দূরেই শালবন; সম্মুখে কিয়দ্দূরে যমুনাতটিনী ও গুল্মাবৃত ভূমি; তটিনীর পর পারে আবার শ্যামল বন। পশ্চাতে শালবন ও শৈল। বাটীর অব্যবহিত তিন দিকেই বৃহৎবৃক্ষ শোভিত পরিষ্কৃত ভূমি, কেবল পশ্চিম দিক্‌টিই শালবনের সহিত একেবারে সংলগ্ন।

বাটীটি ইষ্টক নির্ম্মিত হইল। একটী বৃহৎ পরিবার যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে পিতৃদেব তদুপযুক্ত গৃহ প্রস্তুত করাইলেন। আমি কিন্তু এত বড় গৃহের পক্ষপাতী ছিলাম না। দ্বিতলেও কতিপয় গৃহ নির্ম্মিত হইল। এরূপ উচ্চ ভূমিতে দ্বিতল গৃহেরও কোন আবশ্যক ছিল না; কিন্তু কেবল চতুর্দ্দিকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্যই ঈদৃশ গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা মনে করিয়াছিলাম। দ্বিতলের একটী গৃহ পাঠগৃহে পরিণত হইল। ইংরেজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তকাবলী সেখানে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিলাম। তিন দিকের গবাক্ষ উন্মোচন করিলে, সেই গৃহের মধ্যে বসিয়াই প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখিতে পাইতাম। কত অজ্ঞাতনামা সুকণ্ঠ আরণ্য পক্ষী বাটীসংলগ্ন বৃক্ষ-শাখায় উপবেশন করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অমৃতধারা বর্ষণ করিত। আরণ্য-কপোতের কূজনে সেই স্থান প্রায় সর্ব্বক্ষণই প্রতিধ্বনিত হইত। কখন একটি হরিণশিশু সহসা নয়নপথে পতিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া যাইত; কখনও বা শশকেরা নির্ভয়ে বিবর হইতে বহির্গত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষের সুকোমল পত্রগুলি চর্ব্বণ

করিত। দূরস্থিত নিবিড় অরণ্য হইতে কখন কখন ময়ূরের কেকারবও শুনিতে পাইতাম। বলা বাহুল্য, পলাশবন বা তাহার সন্নিহিত স্থান সমূহে হিংস্র জন্তুর তাদৃশ ভয় ছিল না। হিংস্র জন্তুরা অরণ্যে থাকিলেও লোকালয়ের সন্নিকটে প্রায় আসিত না। আমি বহুকাল মৃগের ন্যায় অরণ্যে বিচরণ করিয়াছি; কিন্তু কখনও কোনও হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়ি নাই।

আমার আবাসবাটীর কথা বলিলাম; এক্ষণে পলাশবন গ্রাম সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাউক। জনসমাজমধ্যে বাস করিবার প্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে এরূপ প্রবল যে, অতীব নির্জ্জনতাপ্রিয় হইলেও, আমরা লোকসমাজ হইতে দূরে থাকিতে ভাল বাসি না। মানবের মুখমণ্ডলে যে একটী অপূর্ব্ব আত্মীয়তা ও সমবেদনার ভাব অঙ্কিত আছে, তাহা জড়, উদ্ভিদ্ বা নিকৃষ্ট প্রাণিজগতে সহস্র চেষ্টা ও অন্বেষণ করিয়াও পাওয়া যায় না। নিকৃষ্ট জীবেরাও স্ব স্ব শ্রেণীতে দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভাল বাসে। আমি যেখানে আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিলাম, তাহার সন্নিধানে যদি গ্রাম না থাকিত, তাহা হইলে আমি ঐ স্থানে কখনও একাকী বাস করিবার সঙ্কল্প করিতাম কি না সন্দেহ স্থল। যাহা হউক, এই গ্রামের নিকটে বাস করিয়া আমি যার পর নাই সুখে কালযাপন করিতেছি ও নানাপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি। গ্রামের নিরীহ কৃষকদের সহবাসে আমি যে আনন্দ-ভোগ করিয়াছি, বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়, অনেক শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তির সহবাসেও তাহা ভোগ করিতে সমর্থ হই নাই। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাকে যেরূপ স্নেহ, দয়া ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য নহি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ই পলাশবনের প্রাণস্বরূপ। তাঁহার উদারচরিত্র, উন্নত ধর্ম্মজীবন ও গভীর জ্ঞানের যথোচিত তুলনা হয় না। তাঁহার গৃহিণী একটী আদর্শ গৃহিণী ও তাঁহার পুত্রকন্যারা আদর্শ পুত্রকন্যা। যথাসময়ে পাঠকবর্গ ইঁহাদের সহিত পরিচিত হইবেন। ইঁহারাই কৃষক ও অন্যান্য পরিবারবর্গের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সামান্য কুটীরে যে জ্ঞান, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার অস্পষ্ট ছায়াও যে কখন আমার গর্ব্বিতচূড় দ্বিতলগৃহে দেখিতে পাইব, তাহার আশা করিলাম না। এই অজ্ঞাতনামা পলাশবনে যে শেষে আমার বিদ্যাভিমান ও জ্ঞানগরিমা চূর্ণবিচূর্ণ হইবে, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। সকলই ভগবানের লীলা। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত

পরিচিত হইয়া অবধি, আমি কি জন্ত পলাশবনে আসিয়া বাস করিলাম, তাহা কাহাকেও পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতাম।

বঙ্কিমচন্দ্র।

রজনী—রজনী ক্ষুদ্র কিন্তু আদ্যোপান্ত সুন্দর। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা, প্রভূত উজ্জল চিন্তা, স্থিরীকৃত ধারণা এবং যৌবনাবেগ ও উৎসাহের অরুণরাগ সম্মিলিত হইয়াছে। এই পুস্তক রচনায় গ্রন্থকার একটু নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে উপন্তাসের অংশ-বিশেষ নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে যে সুবিধা হয় তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার আপনিই বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন। "এই প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়।" ইহাতে গ্রন্থের আকর্ষণীশক্তি ও মাধুরী আরও বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে পাঠকের সুবিধা, কিন্তু গ্রন্থকারের অসুবিধা, ইহাতে তাঁহার বিপুল ক্ষমতাপ্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ ইহাতে প্রত্যেক চরিত্রের চরিত্রগত বিভিন্নতার সহিত ভাষাগত বিভিন্নতাও রক্ষা করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বলিবার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হওয়া চাই; ইহা বড় সহজ নহে। উইন্‌কি কলিন্স বা বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষমতা সকলের থাকে না—তাই এই প্রণালীতে রচিত উপন্তাসের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এ বিষয়ে কলিন্‌সের ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষমতাকে পরাভূত করিয়াছে। "The Woman in white" ও "Moonstone" গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; যিনি দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে কুমারী ক্ল্যাকের বর্ণনাকৌশল আদ্যোপান্ত সমান রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা যে অসাধারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে প্রধান চরিত্র রজনী, লবঙ্গলতা, অমরনাথ ও শচীন্দ্র। চন্দ্রশেখরের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে গ্রন্থদ্বয়ান্তর্গত কয়টী চরিত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় একটু আছে। প্রতাপকে ভাল বাসিয়াও শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিল, আর অন্ধ রজনী সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়া "মাথার উপর দেবতা আছেন" এই ভরসা করিয়া গৃহত্যাগ করিল—শেষ অসহায় যুবতী প্রভাতবায়ু তাড়িত গঙ্গাজল-প্রবাহ

মধ্যে নিমগ্না হইল। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভাল বাসিয়াও আর একজনকে বিবাহ করিলেন, অমরনাথ পরোপকার বৃত্তির উত্তেজনায় পরের মঙ্গল কল্পে আপনার হৃদয় আপনি পদতলে নিষ্পেষিত করিলেন—হৃদয়ে অগ্নি জ্বালিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্য্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয়-জয়ী, কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনঃসংযম করিতে পারিয়াছিলেন।* প্রতাপের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে অমরনাথের কথা বলিব। শেষ তুলনা শৈবলিনীতে ও লবঙ্গলতায়।

রজনীর ভাষায় আদ্যোপান্ত একটা সংযম এবং স্থানে স্থানে মধুর হাস্যরসসিঞ্চন দৃষ্ট হয়। গ্রন্থের মধ্যে আদর্শ চরিত্র অমরনাথের মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি কথা বলাইয়াছেন—তাহা বিবেচ্য, তিনি রচিত গ্রন্থসকল মধ্যে প্রকারান্তরে বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির একরূপ অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন "জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি তত দূর আজিও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক।" সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে একথা কেন? বঙ্গ-দর্শনে রজনী ও সাম্য এক সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "ব্রাহ্মণাপবাদ'; আছে; তিনি সেই লোকবিশ্রুত জ্ঞানগরিমাময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মহেতু গর্ব্বিত একথাও প্রকারান্তরে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে পঠিত এক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মহাগ্রন্থ সাম্যে বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন বর্ণ বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। * * * * এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল।" এক লেখকের মুখে দুই কথা কেমন শুনায়; সেইজন্য বলিয়া রাখা ভাল যে, রজনীর বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন "এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে।" আবার মত পরিবর্ত্তন হেতু তিনি সাম্য পুনর্মুদ্রিত করেন নাই। বঙ্গদর্শনে প্রকাশকালে রজনীতে উদ্ধৃত অংশ বোধ হয় ছিল না।

* সাধনা—(তৃতীয়বর্ষ দ্বিতীয় ভাগ)।

এই জাতিভেদ, এই বর্ণগত বৈষম্য আজিও একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন এক দলের মত এই যে, এই বৈষম্য লোপ না করিলে সামাজিক উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইবে না এবং কবে ভবিষ্যতে মানবহৃদয় ইহার উপযোগিতা অনুভব করিবে তাহার জন্য অপেক্ষা করা অনুচিত। তাঁহারা বলেন :—

"Know ye not,
Themselves must strike the blow who would be free ?"

যেখানে মৃদুতায় চলে না, সেখানে মৃদুতা পরিহার করিতে হইবে; যেখানে বিপ্লব প্রয়োজন সেখানে বিপ্লব উৎপন্ন করিতে হইবে। আর একদল বলেন যে, ইহা হিন্দুসমাজের ভিত্তি; এই বৈষম্যের দৃঢ়গঠিত দুর্গের বাহিরে আনিলে হিন্দুসমাজ ছারখার হইয়া যাইবে। সকল সমাজেই ইহা প্রয়োজন। হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখ দার্শনিকগণ দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডে একপ্রকার ভেদ উৎপন্ন হইতেছে। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এক ব্যবসায় অবলম্বন করায় ইংলণ্ডেও একপ্রকার তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে। যে ইংলণ্ডের দোহাই দিয়া উদারনৈতিক দল কার্য্য করিতে চাহেন, সে ইংলণ্ডেও এই অবস্থা! আবার একদল মধ্যবাদী বলেন যে, প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে আমাদিগের সামাজিক আকাশে যে বাষ্প সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই কালে করাল-কাদম্বিনী-কলেবর-পরিগ্রহ করিয়া বিপ্লব-ঝটিকা আনয়ন করিবে। পরিবর্ত্তনের পবন এখনই বহিতেছে। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই—আপনিই পরিবর্ত্তন আসিবে। এই সকল মতের সত্যাসত্য, সারত্বাসারত্ব বিবেচনা করিবার স্থান এ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এখানে বলিলাম; তিনি প্রায় মধ্যমতাবলম্বী।

যখন ক্ষুদ্র মেঘাবরণাবৃত পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মত অন্ধ-রজনীকে গ্রন্থকার পাঠকের নিকট উপস্থিত করিলেন, তখন পাঠকের মনে পড়িল রজনীর সেই গীতের একটি চরণ ;—

"এত সাধের প্রভাতে ফুটলো নাকো কলি—"

এ কোরক ফুটিতে পাইল কই ? রজনীর হৃদয়ের দৃঢ়তা অপরিসীম, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, রূপ অসামান্য ; কিন্তু সে অন্ধ—"পরশমণি" তাহার নাই। তাহার মনশ্চক্ষুতে বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—বাহ্য চক্ষুতে তাহা নাই কেন ? চন্দ্র কি নিষ্কলঙ্ক হয় না ? পাঠকের হৃদয়ে রজনীর উপর অসহায়ের জন্য স্নেহোদ্রেক করাইয়া গ্রন্থ-

কার আরম্ভ করিলেন। অন্ধ যুবতী অন্নের জন্ত লবঙ্গলতার গৃহে ফুল যোগাইত —সেই প্রাচীন নবীনের মিলন-সুখ-সমুজ্জলগৃহে সে ফুল যোগাইত। কিন্তু—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে!"

কুসুমরাশির মধ্যে বসিয়া কুসুমকোমলা রজনী খেলা করিত; সে জানিত না যে জগতে সহসা "হৃদয় পড়ে আসি বাঁধনে!" একদিন তাহার হৃদয়ে যৌবনপ্রভাতে প্রেমের কুসুম ফুটিয়া উঠিল, প্রেমের সৌরভে যৌবন বসন্ত ভরিয়া গেল, এখন বাহিরের কুসুম অপেক্ষা অন্তরের কুসুম সুন্দর বোধ হইল। শচীন্দ্রকে পাইবার আশা সে কেমন করিয়া করিবে! তবুও সে ভাল বাসিল—

"রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী
আপনি টুটিয়া যায়
সুখ পায় তায় সে।
চির-কলিকা-জনম কে করে বহন
চির-শিশির রাতে!"

কবি গুরু সেক্‌স্‌পীয়ার বলিয়াছেন:—

"Love looks not with the eyes, but with the mind,
And therefore is wing'd Cupid painted blind."

তাই অন্ধ রজনীর হৃদয়ে তাহার অব্যর্থ কুসুমশর প্রবেশ করিল—আঁধার হৃদয় সহসা জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। সে শচীন্দ্রের অমৃতময় কণ্ঠস্বর শুনিল, তাহার পর শচীন্দ্রের স্পর্শ; তাহার মনে হইল যেন:—

"সহসা পুরিল সৌরভে,
দশ দিশ; পূর্ণচন্দ্র আভা জিনি আভা,
উজ্জলিল চারিদিক।"

সে ভাবিল—

"সহসা ফুটিল
নব কুমুদিনীসম এ পরাণ মম,
উল্লাসে—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে।"

তাহার পর রজনীর চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরিদর্শিত হইয়াছে। প্রথমে রজনী আপনার অবস্থা লইয়া সন্তুষ্ট ছিল; এমন কি গর্ব্বিতাও ছিল। তাহার চক্ষু ছিল না; কিন্তু সে বলিয়াছে "অনেক অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিনী, আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে 'আহা আমিও যদি কাণা হইতাম!'" যখন শচীন্দ্রের করস্পর্শে সেই অন্ধের হৃদয় সর্ব্বাঙ্গে কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন একবার সে কাঁদিয়া প্রকৃতির নিকট দৃষ্টি চাহিয়াছিল। উইল্‌কি কলিন্স কৃত Poor Miss Finch নামক উপন্যাসের নায়িকা অন্ধ লুসিলাও অস্কারকে দেখিবার জন্য এমনই ব্যগ্র হইয়া দৃষ্টি চাহিয়াছিলেন। সে আবার লবঙ্গলতাকে বলিয়াছে "ঠাকুরাণি. তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি?"

রজনীর হৃদয়ে প্রেম ও বল বর্ণনাতীত সুন্দরভাবে মিশ্রিত। সে শচীন্দ্রকে ভাল বাসে; তাই সে প্রেমের অপমান সহিতে সম্মত হইল না—হৃদয়কে বুঝাইল:—

"আমি　আমার অপমান সহিতে পারি
　　প্রেমের অপমান সহে শত অপমান
অমরাবতী ত্যেজে　　হৃদয়ে এসেছে যে
　　তোমারো চেয়ে সে যে মহীয়ান্।"

তাই সেই গভীর রজনীতে অন্ধযুবতী একাকিনী প্রেমের ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া গৃহত্যাগ করিল। পথে সে হীরালালের লাঠি ভাঙ্গিয়া লইল—সে তাহার মনের বলেরই পরিচায়ক। নানা দুঃখকষ্টে তাহার প্রেমের পরিপাক হইতে লাগিল। শেষকালে সে লবঙ্গলতাকে বলিয়াছিল "সেদিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম—ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই—আমার প্রাণ তাঁহার কাছে দেবতার কাছে ফুলের কণিমাত্র—শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক।"

রজনী বুদ্ধিমতী—জনহীনা রাত্রিতে গঙ্গার কলকল জলকল্লোল শুনিতে শুনিতে তাহার চিন্তা গভীর বুদ্ধির পরিচায়ক। তাহার পরও কতবার তাহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। তাহার কৃতজ্ঞতা অসাধারণ। অমরনাথের প্রতি [illegible] কৃতজ্ঞতা কি এই স্বার্থপরতাময় জগতে সহজপ্রাপ্য?

অমরনাথের যৌবনে কৃত পাপের কথা শুনিয়াও সে বলিয়াছিল "আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন—আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা।" কিন্তু এই কৃতজ্ঞতাধিক্যই তাহার দৌর্ব্বল্য—সেইজন্যই সে অমরনাথকে বিবাহ করিতে প্রথমে সম্মত হইয়াছিল। রজনী বঙ্গসাহিত্যে নূতন ও সুন্দর সৃষ্টি। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে লিটন সৃজিত নিদিয়া চরিত্র স্মরণে রজনী সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু লিটন সৃজিত চরিত্রবিশেষ বা কলিন্স সৃজিত চরিত্রবিশেষ * স্মরণে যদিও রজনী সূচিত হইয়া থাকে, তথাপি যে দর্পে মিল্টন পূর্ব্বে ত্রিদিবচ্যুতিসম্বন্ধীয় কয়খানি গ্রন্থ রচিত হইলেও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন সে সকল "Things unattempted yet in prose or rhyme", সেই দর্পে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারিতেন যে রজনীচরিত্র মৌলিক ;

রজনী নবীনা লবঙ্গলতা নবীনা ও প্রবীনার সঙ্গমস্থল ; রজনীর চাঞ্চল্য লবঙ্গলতায় নাই, রজনীর ব্যস্তভাব, লবঙ্গলতায় ধীরতা। রজনী সৌন্দর্য্যের একটা কাল্পনিক আদর্শ, লবঙ্গলতা সৌন্দর্য্যের একটা বাস্তব চিত্র, সৌন্দর্য্যের সাংসারিক সংস্করণ। রজনীর শোভায় আশ্চর্য্য হই, লবঙ্গলতার শোভায় মুগ্ধ হই। সংসারাতপতাপ রজনী ভোগ করে নাই, লবঙ্গলতার মাধুরী খাঁটি মাধুরী, অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মত তাহা সংসার সংঘর্ষে নির্ম্মলতার শেষসীমা পাইয়া টিকিয়া আছে। সেইজন্য রজনীর চরিত্র হইতেও লবঙ্গলতার চরিত্র চিত্তাকর্ষক। লবঙ্গলতার গুণ অপরিসীম ; তাঁহার প্রেম দৃঢ়, নহিলে বৃদ্ধ রামসদয় তাঁহার "ষোল আনা গৃহিণীর" প্রেমে জগতে স্বর্গসুখ ভোগ

* শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর কোন বঙ্গীয় লেখক এই কথা রটাইতেছেন যে উইল্‌কি কলিন্সকৃত Poor Miss Finch গ্রন্থের নায়িকার চরিত্র হইতে বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর চরিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের উৎসর্গে লিখিত আছে যে উহার পূর্ব্বে উপন্যাস ও নাটকে একাধিক অন্ধ বালিকার কথা বিবৃত হইয়াছে। লিটন রচিত Last Days of Pompeii গ্রন্থ উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিন্স সৃজিত চরিত্রের সহিত রজনীর বিশেষ সাদৃশ্য নাই। সামান্য সাদৃশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে আশ্চর্য্য নহে ! বিখ্যাত হোমরের কোন বিখ্যাত গ্রন্থের সহিত শুনিতেছি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত কোন চীনদেশীয় গ্রন্থের প্রভূত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। হোমর অবশ্য সে গ্রন্থ দেখেন নাই। এরূপ রটনায় বঙ্কিমচন্দ্রের যশের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে কেবল যাঁহারা রটনা করেন তাঁহাদিগের মনোভাব ব্যক্ত হয়। লেখক।

করিতে পারিতেন না। লবঙ্গলতার হৃদয়ে ভালবাসা প্রবল। কয়জন সপত্নীকে ভগিনীর মত ভালবাসিতে পারে? কয়জন সপত্নীপুত্রকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত মাতৃস্নেহের নিবিড়সুখতপ্ত পক্ষপুটে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে? কয়জন জগতকে আপনার করিয়া লইতে পারে? সকলকে এত ভাল বাসিতেন, এত আপনার ভাবিতেন বলিয়াই লবঙ্গ সকলকে অত গালি দিতেন। লবঙ্গলতা পাকা গৃহিণী। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; এই গৃহিণীপনা, এই সংসারজ্ঞানই তাঁহার চরিত্রে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। থ্যাকারে একস্থানে বলিয়াছেন "To be skilful in domestic duties was surely one of the most charming of woman's qualities." সংসার শিক্ষাই লবঙ্গলতার চরিত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লবঙ্গলতার হৃদয় কোমল, তিনি সকলের দুঃখে কষ্টে ব্যথিত। তাই অমরনাথের কলঙ্কের ছাপের জন্য তিনি দুঃখিত। আবার তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল; তিনি অমরনাথকে বলিয়াছিলেন, "যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।" লবঙ্গলতা কাঁদিলেন। লবঙ্গলতার এতগুলি গুণ দেখিলে তবে বুঝিতে পারা যায়, কেন তাঁহার প্রেমস্রোতে বৃদ্ধ রামসদয় নবীনত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যখন এতগুলি গুণের অবতার লবঙ্গলতার চিত্র মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বিভাসিত হইয়া উঠে, তখন টেনিসনের সেই সুন্দর চরণটি মনে পড়ে;—

"She stood, a sight to make an old man young."

লবঙ্গলতা গৃহিণীর ও পত্নীর উচ্চ আদর্শ। সেই সঙ্গে তাঁহার দয়ার উল্লেখ করিতে হয়। রজনীকে ডবল পয়সার সঙ্গে টাকা দেওয়া ভুল নহে—দয়ামাত্র।

আকাশে চন্দ্রের মত এই গ্রন্থমধ্যে অমরনাথ। কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা বলিয়াছেন, "প্রতাপ সংসারী, অমরনাথ ঋষি।" যেমন করিয়া ঈশ্বরের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া জেকব জয়ী হইয়াছিলেন, তেমনই করিয়া দ্বন্দ্ব করিয়া প্রতাপ বাসনা জয় করিয়াছিলেন। অমরনাথ রজনী গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে একবার অসংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন—তাহার পর তিনি সংযত।

সংসারে প্রতাপের আদর্শ বড় উচ্চ। নূতন সংসার-প্রবিষ্টদিগের শিক্ষার জন্য অমরনাথ আপনার জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।" অমরনাথের চরিত্রে একটিমাত্র দোষ দৃষ্ট হয়—সে দোষ সাধারণ নহে, তাই তাহার প্রায়শ্চিত্তও হইয়াছিল গুরুতর। কিন্তু বোধ হয় অত সদ্‌গুণের মধ্যে পতিত হইয়াছিল বলিয়াই উহা অত দৃষ্টিপথে পতিত হয়, কারণ "The smallest speck is seen on snow"। কবি বলিয়াছেন ;—

"সন্দেহ হইত কি না রাবণ ঘৃণিত,
রামের ছায়ায় যদি না হতো চিত্রিত।"

এ কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিকরূপে সত্য বটে। যৌবনের আকুলতায় অমরনাথ না বুঝিয়া দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন—তাঁহার পবিত্র চরিত্রে তাহা বড়ই কালিমাময় বোধ হয়। দেবেন্দ্র দত্তের শত পাপের মধ্যে এরূপ একটা পাপ তেমন দৃষ্টি-আকর্ষক হইত না। সেই দুষ্কার্য্যের জন্য অমরনাথ চিরদিন পরিতপ্ত ; শেষকালেও তিনি লবঙ্গলতাকে বলিয়াছিলেন, "উচিত দণ্ড করিয়াছিলে,—তোমার অপরাধ নাই।" গ্রন্থারম্ভকালে তাঁহার মনের অবস্থা তত ভাল নহে ; তখনও তাঁহার হৃদয় সেই দুষ্কার্য্যের জন্য বড়ই ব্যথিত, বড়ই লজ্জিত। "কালের শীতলপ্রলেপে সেই হৃদয় ক্ষত, ক্রমে পুরিয়া আসিতে লাগিল।" তাহার পর "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে"—অমরনাথের হৃদয়ে প্রেম জাগিল। শেষ অমরনাথ যখন বলিলেন, "এ ভবের হাট হইতে, আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লিখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখদুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।" তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নের সম্মুখে অমরনাথের মহামহিমামণ্ডিত দিব্যালোকবিভাসিত মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে।

শচীন্দ্র সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। তিনি ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গবাসী ; তাঁহার বিশ্লেষণ তাঁহার আপনার কথায়। মূর্ত্তি বড় সজীব। তাঁহার প্রেম—

"was like a lava-flood
That boils in Ætna's breast of flame"

এই গ্রন্থ মধ্যে আর একটি চরিত্র আছে। প্রথমে তাঁহাকে প্রধানভাবে পাই না; কিন্তু ঘটনাস্তূপ তাঁহাকে আপনার উপর স্থাপন করিয়া বড় ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে। তিনি পাকা দার্শনিক, বিজ্ঞানের রহস্যময় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক, জগতে মিশিয়া মানব-চরিত্র জ্ঞান-সম্পন্ন। ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। বরং জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মত দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয়; তিনি বলেন, "কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই।" কিন্তু আবার স্বপ্ন আসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় স্বপ্ন দাসের মত শচীন্দ্রকে যে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসে তাহাকে দেখাইল। গ্রন্থের সৌন্দর্য্যহানি হইল। উপন্যাসের কল্পনা-রাজ্যে এই সকল প্রহেলিকা সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন বুঝিতে পারি না। কিন্তু এখানেই সন্ন্যাসীর ক্ষমতার শেষ নহে, তিনি অন্ধ রজনীর চক্ষু ফুটাইলেন। গ্রন্থকার সেই কলিকাকে ফুটাইলেন, কিন্তু গ্রন্থখানি নিতান্ত আষাঢ়ে গল্পের মত শুনাইয়া আসিল। অমরনাথও বলিয়াছেন, "না দেখিলে আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না।" গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বেই সন্ন্যাসীকে দিয়া আমাদিগকে ভর্ৎসনা করাইয়াছেন—আমরা মনে করি, "যাহা ইংরেজে জানে না তাহা অসত্য।" আমরা এ সম্বন্ধে কতিপয় বিখ্যাত চিকিৎসকের মত লইয়াছি। চিকিৎসা-শাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় রজনীর ন্যায় অন্ধের চক্ষু ফুটান সম্ভব নহে। যদি কখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়া ইহা সম্ভব হয়, তখন লোকে সাহিত্যাবতার বঙ্কিমচন্দ্রকে ভবিষ্যৎ-বক্তা বলিয়া প্রশংসা করিবে; দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন আমরা গ্রন্থের শেষাংশ অসম্ভব ভিন্ন কিছু বলিতে পারি না। বোধ হয় সাহিত্যপ্রভাতে রচিত না হইয়া মধ্যাহ্নে রচিত হইলে এ গ্রন্থের এত আদর হইত না।

রজনীতে কতকগুলি সুন্দর সত্য প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ।

অন্তর বা দৈর্ঘ্য মাপিবার নিমিত্ত পূর্ব্বকালে হাত পা ব্যবহৃত হইত। হাত পা আঙ্গুল, আমাদের স্বভাবিক মানযন্ত্র। এখনও আমরা হাত পা দ্বারা অন্তর মাপিয়া থাকি।

দুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে, দুই দণ্ডের পথ, পাঁচ দিনের রাস্তা, দশ দিনে যাওয়া যায় ইত্যাদি সময়ে সময়ে বলিয়া থাকি। এক দিনে হাঁটিয়া দশক্রোশ পথ যাওয়া যায়। সুতরাং এক দিনের পথ বলাও যা, দশক্রোশ বলাও তা। কালক্রমে এখন ইঞ্চ গজ মাইল এ দেশে প্রচলিত হইতেছে।

কিন্তু এখন আর দুই দশ দিনের পথ, বা একশত দুইশত মাইল দূর, তত বেশী বোধ হয় না। এখন রেল গাড়ীর প্রভাবে পূর্ব্বকালের দূরবর্ত্তী স্থান সকল নিকটস্থ হইয়াছে। এখন দূরবর্ত্তী দুইটি স্থানের অন্তর বুঝাইতে হইলে আমরা রেলে এক ঘণ্টার বা এক দিনের পথ ইত্যাদি বলিয়া থাকি।

বহু পূর্ব্বকালে লোকে পৃথিবীটা মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে কৌশলে আর্য্যগণ পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন ঠাওরাইয়াছিলেন, সেই কৌশল সূক্ষ্মরূপে লাগাইয়া আজকাল আমরা পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল জানিতেছি।

তবেই পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া একটা সুড়ঙ্গ করিতে পারিলে তাহা ৮০০০ মাইল দীর্ঘ দেখা যাইবে। ঐ সুড়ঙ্গের দুই প্রান্তে দুইজন লোক দাঁড়াইলে তাঁহারা পরস্পর ৮০০০ মাইল দূরে থাকিবেন। পূর্ব্বকালে নাকি কেহ কেহ এইরূপ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পাতালে যাইতেন।

কিন্তু কলিকালে এরূপ সুড়ঙ্গের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পৃথিবীর উপর দিয়াই ঘুরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু উপর দিয়া মাপিয়া গেলেও পাতালে যাইতে ১২৫০০ মাইল পথ মাত্র যাইতে হইবে। আমরা যেখানেই থাকি, ইহা অপেক্ষা বেশী দূরে থাকিতে পারি না। তবেই দুইজন লোক যত দূরেই যান, ১২৫০০ মাইলের বেশী দূরে যাইতে পারেন না।

কিন্তু এটা আর তত বেশী পথ কি? আমাদের দেশেও ত রেলগাড়ী

ঘণ্টায় ৩০ মাইল পথ যায়। রেল পাতিয়া গাড়ীতে চড়িয়া গেলে ১৭।৮ দিনেই পাতালে যাইতে পারা যায়। আমেরিকায় রেলগাড়ী ঘণ্টায় ৬০ ৭০ মাইল বেগে যাইয়া থাকে। সুতরাং তথাকার লোকেরা ৮।৯ দিনের মধ্যেই পাতালে পঁহুছিতে পারেন।* পৃথিবীটা পূর্ব্বে কত বড় দেখাইতেছিল!

যাহা হউক, পৃথিবীতে অধিক দূরে যাইতে পারা যায় না। পৃথিবীর পরেই চন্দ্রলোক। আজকাল সেকালের তপঃপ্রভাব নাই, নতুবা চন্দ্রলোকটা কত দূরে একবার দেখিয়া আসা যাইত। কিন্তু সে কালের তপঃপ্রভাব না থাকিলেও আজকাল অন্য প্রকার তপঃপ্রভাবের অভাব নাই। জ্যোতির্ব্বিদেরা এখানে থাকিয়াই ব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখিতেছেন। এখান হইতে চন্দ্র কত দূরে, তাহা তাঁহারা মাপিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, এখান হইতে চন্দ্র প্রায় ২৪০০০০ মাইল দূরে।

কিন্তু এখানে একটা কথা উঠিতেছে। পৃথিবীতে থাকিয়া তাঁহারা কিরূপে চন্দ্রের দূরত্ব মাপিলেন? যে উপায়ে নদীর এ পারে থাকিয়া উহার বিস্তার মাপিতে পারা যায়, হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গের উপরে না উঠিয়াও উহার উচ্চতা মাপিতে পারা যায়, সেই উপায়েই চন্দ্রের দূরত্ব জানা গিয়াছে। ইহা আজকার কথা নহে, বহু পূর্ব্বকালেও লোকে এই প্রকারে চন্দ্রের দূরত্ব মাপিয়াছিলেন। কিন্তু সে উপায়টা কি?

যখন নৌকাযোগে নদী দিয়া যাওয়া যায়, কূলের গাছগুলাকে বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতে দেখি। ঐ যে বটগাছটা এখন আমাদের ঠিক দক্ষিণে দেখিতেছি, কিছুদূর সোজা নৌকা বাহিয়া গেলে তাহাকে আমাদের পশ্চাদ্দিকে দেখিব। অবশ্য গাছটা সরিয়া যায় না, কেবল ঐ দুই স্থান হইতে দেখিলে গাছটা অত অংশ কোণে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু বট গাছটার সোজা বহুদূরে যে অশ্বথ গাছটা ছিল, সেটাকেও বটগাছের মত বেশী সরিয়া যাইতে দেখা গেল না। দুই তিন ক্রোশ চলিয়া আসা গেল, কই অশ্বথ গাছটা ৫।৭ অংশের অধিক সরিয়া গেল না। যত অংশ বাঁকিয়া যাইতে দেখা গেল, তাহা এবং অতিক্রান্ত পথ বলিয়া দিলে গণিতজ্ঞগণ অবশ্য গাছটার দূরত্ব বলিয়া দিবেন। দূরবর্ত্তী দুইটি স্থান হইতে কোন বস্তু দেখিলে তাহাকে যত অংশ বাঁকিয়া যাইতে দেখা যায়, তাহাকে ইহারা লম্বন বলেন। তবেই আমাদের দৃষ্টান্তের অশ্বথ গাছটার লম্বন ৫।৭ অংশ।

এখন মনে করুন যেন কোন ব্যক্তি চাঁদকে ঠিক তাঁহার মস্তকের উপরে দেখিলেন। আর এক ব্যক্তি পৃথিবীর চতুর্থাংশ দূরে আছেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঠিক সেই সময়ে চাঁদকে ঠিক তাঁহার মস্তকের উপরে দেখিবেন না। প্রথম ব্যক্তি চাঁদকে যে দিকে দেখিবেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার ৫৭ কলা দূরে দেখিবেন। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করা যাউক।

যদি কোন ব্যক্তি পৃথিবীর কেন্দ্রে থাকিয়া সুড়ঙ্গ দিয়া চাঁদকে দেখেন, এবং অপর ব্যক্তি ঠিক তাঁহার দক্ষিণে পৃথিবীর উপরে থাকিয়া দেখেন, তাহা হইলে উভয়ের দৃষ্টি-পথের মধ্যে ৫৭ কলা পরিমিত কোণ দেখা যাইবে। অথবা ঐ দুই ব্যক্তি দুইগাছি সূত্র লইয়া চন্দ্র-বিম্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলে, সেই সূত্রদ্বয়ের মধ্যে ৫৭ কলা কোণ উৎপন্ন হইবে।

পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ জানা আছে, এখন ঐ ব্যাসার্দ্ধে চন্দ্রের লম্বনও জানা গেল। এখন ত্রিকোণমিতি লাগাইলে দেখা যাইবে যে পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ২৪০০০০ মাইল দূরে। পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল, সুতরাং চন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর সারি বসাইতে হইলে ৩০টা পৃথিবী আবশ্যক হইবে।

লম্বনের অর্থটা আর একটু স্পষ্ট করা যাউক। চন্দ্র হইতে কোন ব্যক্তি পৃথিবীটা দেখিলে আকাশে আমাদের নিকট চাঁদ যেমন দেখায়, তেমনই তাঁহার নিকট পৃথিবীটা বোধ হইবে। কিন্তু আমরা চাঁদকে যত বড় দেখি, চন্দ্রবাসী পৃথিবীটাকে তদপেক্ষা ৩.৪ গুণ বড় দেখিবেন। ৮০০০ মাইল ব্যাসযুক্ত পৃথিবীকে যখন চন্দ্র হইতে এত ছোট দেখাইতেছে, তখন চন্দ্র অনেক দূরে আছে, বলিতে হইবে। কিন্তু বেশী দূরে থাকিলেও ৩০টা পৃথিবী দিয়া চাঁদ পর্য্যন্ত রাস্তা করিতে পারা যায়। দ্রুতগামী রেলের গাড়ীতে চড়িয়া গেলে ৮।৯ মাসেই চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তবে চন্দ্র আর বেশী দূরে কি?

চন্দ্রের পরেই সূর্য্যের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সূর্য্য কত দূরে? ইহাও জ্যোতির্ব্বিদেরা নির্ণয় করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যের লম্বন দুই চারি কলা নয়, ৮।৯ বিকলা মাত্র। অর্থাৎ সূর্য্য হইতে দেখিলে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধটা ৮।৯ বিকলা এবং সমস্ত পৃথিবীটা ১৬।১৭ বিকলা মাত্র বড় দেখাইবে। তবে বাস্তবিকই পৃথিবী হইতে সূর্য্য বহু দূরে অবস্থিত। সূর্য্যের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও, আমাদের মধ্যে নয় কোটি ত্রিশ মাইল ব্যবধান। এই অন্তরটা বলা যত

সহজ, মনে করা তত সহজ নহে। এখান হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত পৃথিবীর সারি বসাইয়া গেলে কতগুলা পৃথিবী লাগিবে? পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। সুতরাং সহজেই দেখা যায় যে এ জন্য প্রায় ১১৬০০টা পৃথিবী আবশ্যক হইবে। চন্দ্র বহুদূরে অবস্থিত মনে হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর সারি বসাইতে হইলে মোটে ৩০টা পৃথিবীর প্রয়োজন হয়।

সূর্য্যমণ্ডল এখান হইতে কত দিনের পথ দেখা যাউক। এক দিনের পথ দশ ক্রোশ, এই হিসাবে এখান হইতে সূর্য্য ১২৭০০ বৎসরের পথ! লোকে বলে বেদও ৫।৬ হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। তবেই বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিয়া থাকিলে অদ্যাবধি অর্দ্ধেক পথও যাইতে পারেন নাই। অতএব হাঁটিয়া যাওয়া বৃথা। বোধ হয় রেলের গাড়ীতে গেলে তাঁহারা জীবদ্দশাতেই সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইতে পারিতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে গেলেও তাঁহাদিগের ৩৬০ বৎসর লাগিত! শব্দ নাকি খুব দ্রুত যায়? প্রতি সেকেণ্ডে উহা প্রায় ১১০০ ফুট বেগে ধাবমান হয়। কিন্তু শব্দে চড়িয়া গেলেও সূর্য্যে পঁহুছিতে ১৪।১৫ বৎসর লাগিয়া যাইবে। অর্থাৎ এখনই যদি সূর্য্যে একটা ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা আমরা ১৫ বৎসর পরে টের পাইব! তবে শব্দও বড় মৃদু গমন করে। আলোক অপেক্ষা দ্রুতগামী আর কিছুই নাই। প্রতি সেকেণ্ডে উহা ১৮৬০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। কিন্তু আলোকে চড়িয়া গেলেও সূর্য্যে পঁহুছিতে প্রায় ৫০০ সেকেণ্ড বা ৮ মিনিট সময় লাগিবে। মনে রাখিবেন, এক সেকেণ্ডে আলোক আমাদের পৃথিবীটা প্রায় চারিবার ঘুরিয়া আসিতে পারে। তবেই এখনই যদি সূর্য্যটা নিবিয়া যায়, আট মিনিট পরে আমরা অন্ধকার দেখিব! কি বিষম দূরে বিধাতা সূর্য্যকে বসাইয়াছেন! আবার অতদূরে থাকিয়াও সূর্য্য আমাদিগকে পোড়াইয়া মারেন।

কিন্তু অত দূরে থাকিলেও সূর্য্যবিম্বটা প্রায় ৩২ কলা বড় দেখায়। সূর্য্য দেহটা কত বড়? উহা এত বড় যে চন্দ্র সহিত পৃথিবীটা সূর্য্যের উদরে প্রবেশ করিলেও চন্দ্রের চারিদিকে প্রায় ৬০০০০০ মাইল পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদর বিস্তৃত থাকিবে। বাস্তবিক সূর্য্যদেহের প্রকৃত ব্যাস প্রায় ৮৬৬০০০ মাইল। বিধাতা সূর্য্যকে নিতান্ত বিশাল দেহ দিয়াছেন।

তবেই ১০৯টা পৃথিবী সূর্য্যের উদর মধ্যে থাকিতে পারে। কিন্তু তা

বলিয়া ১০৯টা পৃথিবী ভাঙ্গিয়া একটা সূর্য্য গড়িতে পারা যাইবে না। বাস্তবিক সূর্য্যের মত একটা গোলা প্রস্তুত করিতে হইলে তের লক্ষটা পৃথিবী ভাঙ্গিতে হইবে! ইহার তুলনায় চাঁদটা কত ছোট! পৃথিবীর ৫০ ভাগের এক ভাগ পাইলেই একটা চাঁদ গড়িতে পারা যায়। অথচ আকাশে চাঁদ যত বড় দেখায়, সূর্য্যও প্রায় তত বড় দেখায়। সূর্য্যের দেহটা নিতান্ত প্রকাণ্ড, নচেৎ অত দূরে অবস্থিত হইয়াও সূর্য্য চাঁদের মত বড় দেখাইবে কেন?

আমাদের পৃথিবীটা কি ক্ষুদ্র! কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও উহা বৎসরে যে পথটা ঘুরিয়া আসে, তাহা চিন্তা করুন। সূর্য্য হইতে পৃথিবী নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তবে আজ আমরা শূন্য আকাশে যেখানে আছি, ছয় মাস পরে সেখান হইতে নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলের দ্বিগুণ অর্থাৎ আঠার কোটী ষাটি লক্ষ মাইল দূরে যাইয়া পড়িব। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ৬৬০০০ মাইল করিয়া আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত পথই বেড়াইতেছি! কিন্তু এত দূরে চলিয়া যাইতেছি, কই কখনও ত কোন তারা বা গ্রহ বা অপর কোন জ্যোতিষ্কের পাশ দিয়াও গেলাম না। বিধাতা বড় ফাঁক ফাঁক করিয়া তাঁহার রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন।

তবে অন্ধকার রাত্রে অত তারা দেখা যায় কেন? মনে হয় বরং নদীর বালি গণিয়া দিতে পারি, তথাপি আকাশের তারা সংখ্যা করিতে পারি না। এত অসংখ্য তারায় আকাশ পরিপূর্ণ, তথাপি আঠার কোটি মাইল গেলেও তারাগুলাকে ক্ষুদ্র জ্যোতিঃকণা বই বড় দেখি না। হয় ত তারা-গুলা বহু বহু দূরে আছে কিম্বা তারাগুলার দেহ বাস্তবিক ক্ষুদ্র।

সূর্য্য হইতে দেখিলে পৃথিবীটাকে ১৬।১৭ বিকলা দেখায়। কিন্তু তারাগুলা হইতে দেখিলে উহা কত বড় দেখাইবে? কি ভয়ানক! তারা-গুলা হইতে দেখিলে পৃথিবীটা যে একবারে ০ হইয়া যায়! আট হাজার মাইল, অথচ বিষম দূরত্বের তুলনায় কিছুই হইল না। পৃথিবীর দুই মেরু হইতে দুইটা সূত্র কোন তারা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলে, সূত্রদ্বয় পৃথক্ না দেখাইয়া একটা হইয়া গেল! সূর্য্য বহু দূরে অবস্থিত বটে, তবুও ত তথা হইতে দেখিলে পৃথিবীটার কিছু না কিছু আকার থাকে। তারাগুলা কি এতই দূরে যে তথা হইতে আট হাজার মাইল ব্যাসযুক্ত পৃথিবীটা একবারে ০ হইয়া যায়?

কিন্তু পৃথিবীটা যেন নিতান্ত ক্ষুদ্র হইল। পৃথিবীর ভ্রমণ পথটা ত বড়! পৌষমাসে আমরা আকাশের যেখানে আছি, আষাঢ়মাসে সেখান হইতে আঠার কোটি মাইল দূরে যাইয়া পড়ি। মনে করুন যেন পৃথিবী ও সূর্য্য হইতে দুই গাছি সূত্র কোন তারার সহিত সংলগ্ন করা গেল। ঐ দুই সূত্রের মধ্যে কিছু না কিছু ফাঁক পড়িতে দেখা যাইবে। কেন না নয়কোটি মাইল ব্যবধানটা ত অল্প নহে।

কিন্তু কি ভয়ঙ্কর কথা! তারার দূরত্বের তুলনায় নয় কোটি মাইল ব্যবধান যে প্রায় শূন্য হইয়া গেল! দুই গাছি সূত্র যে এক দেখাইতে লাগিল! কোন তারাকে এখান হইতে দেখিলেও যে দিকে, নয় কোটি মাইল দূরে সূর্য্য হইতে দেখিলেও যে সেই দিকে দেখা গেল!

বোধ হয়, সূক্ষ্ম যন্ত্র অভাবে আমরা দুই সূত্রের মধ্যবর্ত্তী কোণ টা পরিমাণ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া বলি। আজ কাল এমন সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে যে এক অংশের ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক বিকলা পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা পরিমাণ করিতে পারা যায়। এইরূপ সূক্ষ্মযন্ত্র সাহায্যে জ্যোতির্ব্বিদেরা ঐ দুই সূত্রের মধ্যস্থ কোণ পরিমাণ করিতে নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ঐ কোণ এত সূক্ষ্ম যে কোনক্রমে পরিমাণ করিতে পারিতেছেন না।

তবে বিস্তর পরিশ্রম করিয়া নানা উপায়ে দুই চারিটা তারা পাইয়াছেন। তন্মধ্যে যে তারাটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, তথা হইতে পৃথিবী হইতে সূর্য্যের অন্তরটা এক বিকলাও দেখায় না। মনে করুন যেন উহা এক বিকলাও পাওয়া গেল। এই এক বিকলার কি অর্থ শুনিবেন? ইহার অর্থ এই যে, এখান হইতে সূর্য্য যতদূরে, তাহার দুই লক্ষ এগার হাজার গুণ দূরে সেই তারাটি অবস্থিত! পরিচিত মাইল হিসাবে শুনিতে চান? উহা কুড়ি লক্ষ কোটি মাইল দূরে! যদি অঙ্কে প্রকাশ করিতে চান, তবে দুই এর পরে তেরটা শূন্য বসাইয়া যান। মনে রাখিবেন এক এর পরে সাতটা শূন্য বসাইলেই এক কোটি হয়।

তবে যে তারাটি হইতে ভূরব্যন্তর এক বিকলাও দেখায়, তাহার দূরত্ব মাইল হিসাবে ব্যক্ত করা বৃথা। কেন না, দুই এর পর দশটা শূন্য বসাইলেও যা মনে হয়, তেরটা বসাইলেও তাই মনে হয়। পৃথিবীর মধ্যে এমন কি দীর্ঘ স্থান আছে যে, তাহাকে তারার দূরত্ব মাপিবার মাপকাঠি করিতে পারা

যাইবে? পৃথিবীটা নিজেই মোটে ৮০০০ মাইল। পৃথিবী ও সূর্য্যের অন্তরটাও ত মোটে নয় কোটি মাইল। সুতরাং ইহাকেও তারার দূরত্ব মাপিবার মাপকাঠি করা বৃথা।

এজন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা আলোকের একটা মাপ-কাঠি করিয়াছেন। কিন্তু আলোকের আবার মাপকাঠি কিরূপে হইবে? প্রতি সেকেণ্ডে আলোক এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যায়। অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে উহা পৃথিবীটার চারিদিক প্রায় চারিবার ঘুরিয়া আসিতে পারে। অর্থাৎ দশ দিনে শব্দ যত পথ যায়, এক সেকেণ্ডে আলোক তত পথ যায়। এমন দ্রুতগামী আলোক এক বৎসরে যত পথ যায়, তারাগুলার দূরত্ব মাপিবার মাপকাঠিটি তত বড়। এই অদ্ভুত মাপকাঠিটির নাম "আলোক বর্ষ" রাখা গিয়াছে।

এই মাপকাঠিটি কত বড় জানিতে চান? এত বড় যে তাহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হইলে দ্রুতগামী রেলের গাড়ীর এক কোটি বৎসরেরও অধিক সময় প্রয়োজন হইবে। এত বড় যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যত দূরে, তত দূরে দূরে তেষট্টি হাজারটা সূর্য্য বসাইয়া গেলে সেই মাপকাঠির একটার সমান হইবে।

অনেক তারার দূরত্ব মাপিবার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন পরি-মাণই ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। যে দুই চারিটা তারা আমাদের নিকটস্থ বলিয়া মনে হয়, তাহাদেরও অন্তর পরিমাণে অল্পাধিক ভুল আছে। কিন্তু ভুল থাকিলেও তাহাদের দূরত্ব মোটামুটি নিরূপণ করিতে বিঘ্ন নাই। যে তারাটিকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বলিয়া মনে হয়, তাহার দূরত্ব এই আলোক-বর্ষ মাপকাঠির তিন চারিটা। অর্থাৎ সেই তারা হইতে এখানে আলোক আসিতে ৩।৪ বৎসর লাগিয়া যায়! অথবা, যে আলোকে সেই তারাটি এই মাত্র দেখিলাম, তাহা ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে এদিকে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল!

কোন জিনিস কুড়ি ইঞ্চের বদলে একুশ ইঞ্চ লম্বা বলিলেই তাহা লইয়া আমরা কত ঝগড়া করিয়া থাকি! এখানে দুই চারি শত, দুই চারি কোটি মাইলকেও আমরা গণনার মধ্যে আনিতেছি না। নিকটস্থ তারার দূরত্ব তিন বা চারি আলোক বর্ষ বলিয়া কত কোটি মাইল অগ্রাহ্য করিতেছি! কি বিষম দূরত্বের কথাই হইতেছে!

আমাদের নিকটস্থ তারাটির নাম শুনিতে হয়ত অনেকের ইচ্ছা হইবে। উহার বিলাতি নাম "আল্‌কা সেন্‌টরি"; বাঙ্গালায় উহার নাম "কিন্নর" রাখা গিয়াছে। কিন্তু এ সকল নামে বস্তু পরিচয় ঘটে না। যাহা হউক, কিন্নর তারার পর যে তারাটি আমাদের নিকটস্থ বলিয়া জানা গিয়াছে; তাহার আলোক আসিতে ৭। ৮ বৎসর লাগিয়া যায়। আমাদের পরিচিত মাইল হিসাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, তাহা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কোটি মাইল দূরে। লুব্ধক তারাটি অনেকেই চিনেন। আজ কাল সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব আকাশে উহাকে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়। উহা কত দূরে শুনিবেন? এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে, তাহার আট লক্ষ গুণ দূরে। 'আলোক বর্ষ' মাপকাঠির ১২।১৩টা দূরে ঐ লুব্ধক অবস্থিত। উত্তর দিকস্থ ধ্রুবতারাটি এত দূরে যে, বোধ হয়, তাহার আলোক আসিতে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক সময় লাগে!

আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। যে তারাটি আমাদের নিকটস্থ বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই কিন্নর তারার কিন্নর সকল, না জানি, আমাদের সূর্য্যকে কত বড় দেখিতেছে। বাস্তবিক সূর্য্য হইতে কিন্নর তারাটা এত দূরে আছে যে, আমাদের বিশালদেহ সূর্য্যকে রাত্রিকালে কিন্নরগণ স্বাতী বা ধ্রুবতারার অপেক্ষা বড় দেখিবে না। লুব্ধক মানুষেরা উহাকে আরও ক্ষুদ্র দেখিবে।

তবে সূর্য্যের দেহটা আর বিশাল রহিল কই? নিকটস্থ তারারও মানুষেরা উহার বিম্ব পরিমাণ করিতে পারিবে না। যদি সূর্য্যের দেহ আরও বিশাল হইত, যদি সূর্য্য-দেহ পৃথিবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত, তাহা হইলেও আমরা নেপচুন গ্রহকে যত বড় দেখি, তাহারা সূর্য্যকে তদপেক্ষা কিছু বড় দেখিত মাত্র।

যদি নিকটস্থ তারাটিই এত দূরে, না জানি দূরস্থ তারা গুলা কত দূরে আছে! যে তারা গুলা প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও অস্পষ্ট দেখায়, না জানি সে গুলা কত দূরে? এই সকল বহু বহু দূরস্থিত তারাকে এখন যেমন দেখিতেছি, হয়ত তাহারা কত শত শত, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেইরূপ ছিল। হয়ত ইতিমধ্যে তাহাদের কত কি আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হয়ত কতগুলা নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

আর এক প্রকারে ঐ কথাটা বুঝা যাউক। কোন্ তারা কত উজ্জ্বল

দেখায়, তাহা পরিমিত হইয়াছে। ঔজ্জ্বল্যানুসারে আজকাল সমুদয় তারাকে আঠারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। লুব্ধক প্রভৃতি ১৮।১৯টা তারা উজ্জ্বলতম। ইহাদিগকে প্রথমপ্রভা তারা বলা যায়। ধ্রবতারা প্রভৃতি ৫০। ৬০টি দ্বিতীয়প্রভা তারা। এইরূপে খালিচক্ষে আমরা ষষ্ঠপ্রভা তারা পর্য্যন্ত দেখিতে পাই।

কিন্তু দ্বিতীয়প্রভা তারা অপেক্ষা প্রথমপ্রভা তারা ২৷৷০ গুণ অধিক উজ্জ্বল। এইরূপে দেখা যায় যে, ষষ্ঠপ্রভা তারা অপেক্ষা প্রথমপ্রভা তারা একশত গুণ অধিক উজ্জ্বল। অর্থাৎ ষষ্ঠপ্রভা একশতটি তারা একত্রিত করিলে একটি প্রথমপ্রভা তারার মত উজ্জ্বল হইল। এইরূপে, একাদশ-প্রভার দশ হাজার, ষোড়শপ্রভার দশ লক্ষ; একবিংশতিপ্রভার দশ কোটি তারা একত্রিত করিলে, একটা প্রথমপ্রভা তারার মত উজ্জ্বল দেখাইবে।

যদি সকল তারাই সমান বৃহৎ হইত, যদি সকল তারাই সমান পরিমাণে আলোক বিকীর্ণ করিত, তাহা হইলে যে তারা যত অস্পষ্ট বোধ হয়, সে তারা তত দূরে আছে বলিতে পারা যাইত। কিন্তু কে জানে কোন্ তারা কত বড়, কে জানে কোন তারা হইতে কি পরিমাণে আলোক বিকীর্ণ হইতেছে।

এ সকল কথা জানা যায় নাই বটে, তথাপি হাজার হাজার তারা লইলে বলিতে পারা যায় যে, পঞ্চমপ্রভা তারা অপেক্ষা দশমপ্রভা তারা বহু বহু দূরে অবস্থিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় তারা প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও দৃষ্ট হয় না। আজকাল যে প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অষ্টাদশ-প্রভা তারা পর্য্যন্ত দেখা যায়। যদি এই সকল তারার আকার প্রথম তারার আকারের সমান হয়, তাহা হইলে তাহাদের আলোক আসিতে প্রায় দুই হাজার বৎসর লাগিয়া থাকে।

কিন্তু কে জানে তারাগুলা কত বড়? প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণেও তাহাদের বিম্বের পরিমাণযোগ্য আকার দেখা যায় না। তবে ইহা জানা আছে যে, তারাগুলা সূর্য্যের ন্যায় স্ব স্ব তেজে দীপ্তিমান্। পূর্ণচাঁদ যত আলোক দেয়, আমাদের সূর্য্য তদপেক্ষা প্রায় সাড়ে চারিলক্ষ গুণ অধিক আলোক দেয়। আর লুব্ধক তারা যত আলোক দেয়, তদপেক্ষা পূর্ণচাঁদ তের হাজার গুণ অধিক আলোক দেয়। তবেই লুব্ধক অপেক্ষা আমাদের সূর্য্য প্রায় ছয় শত কোটি গুণ অধিক আলোক দেয়। কিন্তু মনে করুন যেন, লুব্ধক

তারাকে সূর্য্যের নিকটে আনা গেল। অবশ্য এইরূপ আট লক্ষ গুণ নিকটে আনিলে লুব্ধকের জ্যোতিঃ অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইবে। কেন না, যে তারা হইতে যত আলোক পাই তাহার দূরত্ব হ্রাসের বর্গানুসারে জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে জানা যায় যে, এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে, লুব্ধক তত দূরে থাকিলে উহা একশতটা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইত। বোধ হয়, অনেক তারাই লুব্ধকের সমান আলোক বিকীর্ণ করে। অতএব তৎসমুদয় অন্ততঃ আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বিশালদেহ হইবে। কেন না একথা অস্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, তৎসমুদয় সূর্য্যাপেক্ষা অধিক আলোক বিকীর্ণ করে। বিধাতা কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন!

তবে তারাগুলা এক একটা বিশালদেহ তেজোময় সূর্য্য। খালিচক্ষে আমরা আকাশে ৬।৭ হাজার তারার অধিক দেখিতে পাই না। কিন্তু একটা যৎসামান্য দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিলেই যেখানে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, সেখানে অনেক তারা দৃষ্টিগোচর হয়। যে দূরবীক্ষণে দ্বিগুণমাত্র বড় দেখায়, তাহার মধ্য দিয়া আকাশ দেখিলে তারা সংখ্যা লক্ষাধিক হইয়া পড়ে। 'লিক' মানমন্দিরে যে বৃহৎ দূরবীক্ষণটি আছে, বোধ হয় তদ্দ্বারা দশ কোটি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ড রসের প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণে, বোধ হয়, একশত কোটি তারা দেখা যাইতে পারে। আরও বড় দূরবীক্ষণ থাকিলে, আরও কত তারা দেখা যাইত। তবে বিধাতা ব্রহ্মাণ্ডটাকে নিতান্ত প্রকাণ্ড করিয়াছেন! কত অসংখ্য বিশালদেহ তেজোময় পদার্থ লইয়া তাঁহার খেলা হইতেছে! কত কোটি কোটি সূর্য্য অসীম ব্রহ্মাণ্ডে সমুদ্রতটের বালুকার ন্যায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে!

আমরা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঈষৎ আভাস পাইলাম। একবার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। দূরবীক্ষণ অসীম ব্রহ্মাণ্ডের নিকট প্রান্তে আনিয়া কত কত বৃহৎ রাজ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, অণুবীক্ষণ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিকটে আনিয়া তাহাদের রচনা কৌশল ভাবিতে বলে। এদিকে আর এক প্রকার জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রচলিত ইঞ্চ লইয়াই প্রথমে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় লওয়া যাক। যিনি একটা পয়সা দেখিয়াছেন, তাঁহারই নিকট ইঞ্চের পরিমাণটা জ্ঞাত হইয়াছে। কোন বস্তু খুব ছোট বলিতে হইলে, তাহা ইঞ্চের দশ ভাগের বা একশত

ভাগের এক ভাগ বলিয়া থাকি। চুলের ন্যায় সরু বলিলে যেন সূক্ষ্ম পরিমাণের চরম সীমায় আসা গেল। কিন্তু মাথার চুল কি এতই সরু? উহা ত এক ইঞ্চের তিন শত ভাগের এক ভাগের মত স্থূল। তবেই তিন শতটা চুল পাশে পাশে রাখিলে এক ইঞ্চ চৌড়া হইবে। তা ছাড়া, খালি চোখে চুল ত স্পষ্ট দেখা যায়।

আমাদের রক্ত দেখিতে ঘন লাল জলের মত বোধ হয়। কিন্তু সকলেই জানেন, উহাতে জল ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণার মত কত কোষাণু আছে। এই সকল অসংখ্য কোষাণু ঈষৎ লাল বলিয়া সমুদয় রক্ত রক্তবর্ণ দেখায়। খালি চোখে এই সকল কোষাণু দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু তা বলিয়া সে গুলা এত কি সূক্ষ্ম? উহারাও ত এক ইঞ্চের তিন হাজার ভাগের এক ভাগের মত স্থূল।

কি আমাদের শরীর, আর কি গাছের শরীর, সকল জীবশরীরই এই রূপ কোষাণু দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল কোষাণুর কোনটা বা মাংস, কোনটা বা স্নায়ু, কোনটা বা বল্কল, কোনটা বা অংশুতে পরিণত হয়। জীব-বিদ্‌গণকে শরীরের এই সকল স্থূল উপাদানের বিস্তার সর্ব্বদা পরিমাণ করিতে হয়। তাঁহারা এক ইঞ্চকে পুনঃ পুনঃ কত ভাগ করিবেন?

এজন্য তাঁহারা একটা নূতন মাপকাঠি গ্রহণ করিয়াছেন। ইঞ্চের হিসাবে, ইহা এক ইঞ্চের পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই মাপকাঠিকে তাঁহারা "মি" বলিয়া থাকেন। আমাদের মাথার চুল এই মাপকাঠির ৮০টার সমান মোটা, রক্তের কোষাণু ইহার ৮।৯টার সমান চৌড়া।

একটা সূচীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগে কতগুলি পরী এককালে নৃত্য করিতে পারে, পূর্ব্বকালে পশ্চিমদেশে এই প্রশ্ন লইয়া নাকি মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু পরীগণ ত যাকে তাকে দেখা দেন না। আজকাল অণুজীবগণের মধ্যে ঐ রূপ একটা প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া গোলমাল হইয়া থাকে। তাঁহারা সূচ্যগ্রে লম্বিত এক বিন্দু জলে কেবল জল দেখেন না, তাহাতে অসংখ্য অণুপ্রমাণ জীব বিচরণ করিতে দেখেন।

এই সকল অণুজীবের অনেকগুলা নাকি আমাদের নানাবিধ রোগের নিদান। এই জন্য অণুজীববিদ্‌গণ নির্ম্মল বায়ুতে নির্ম্মল জলে অণুজীব গণিয়া বেড়ান।

আমাদের নিকট পৃথিবীটা যত বড় বোধ হয়, এই সকল অণুজীবের পক্ষে এক বিন্দু জল তত বড় বোধ হয়। ইহারা আবার আহার করে, ভক্ষ্যদ্রব্য জীর্ণ করিয়া শরীরে শোষণ করে। ইহাদের শরীরেও আমাদের শরীরের রক্তের মত, কোন প্রকার রস ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়।

অনেক অণুজীবের শরীরটা উক্ত 'মি' মাপকাটির একটারও সমান নয়। লম্বাতেই একটার সমান হয় না, মোটার ত কথাই নাই। অনেকগুলার শরীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বটে, কিন্তু চোড়া দিকে 'মি' মাপকাঠিতেও পাওয়া যায় না। কতকগুলার শরীরে আবার লোম (cilia) আছে। কোনটার বা দুইটীমাত্র, কোনটার বা গোছা গোছা লোম, আবার কোনটার প্রায় সর্ব্বাঙ্গ লোমে আচ্ছন্ন।

এই সকল লোম বড় অণুবীক্ষণেও সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হয় না। শরীরের সঙ্গে এই সকল লোমের সংযোগ আছে। সংযোগ কেন, লোমগুলা লইয়াই তাহাদের দেহ। দেহের রক্ত এই সকল লোমকে পুষ্ট করিতেছে, লোমের মধ্যেও কোন প্রকার রক্ত যাতায়াত করিতেছে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের কারণও তন্মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহাদের ভিতরে সমুদয় জৈবনিক ক্রিয়া চলিতেছে।

এই সকল অণুপ্রমাণ জীবের বংশবৃদ্ধি আছে, ইহারাও সন্তান প্রসব করে। জনকের ধর্ম্ম সন্তানে বর্ত্তে, সুতরাং না জানি জনকের কি সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা সন্তানের শরীর গঠিত হয়! অণুপ্রমাণ জীবের মধ্যে না জানি কি জড়ময় অণু পরমাণুর বিন্যাস পরিবর্ত্তিত হইতেছে!

যে জলবিন্দুটিতে সহস্র অণুজীবের বিচরণ স্থান হইতেছে, সেই জলের অণুগুলা তবে আরও ক্ষুদ্র। বস্তুতঃ এক ফোঁটা জল আট হাজার মাইল ব্যাসবিশিষ্ট একটা পৃথিবীর মত বৃহৎ কল্পনা করিলে, জলের অণুগুলি এক একটা ছোট লেবু অপেক্ষাও বড় হইবে না। ইহাতেই ভাবুন, এক ফোঁটা জলে কত অণু আছে এবং একটা অণুই কত বড়।

বায়ু কত তরল পদার্থ। কিন্তু এক ঘন ইঞ্চ বায়ুতে নাকি ৩×১০^{২০} এতগুলি অর্থাৎ তিনের পর কুড়িটা শূন্য বসাইলে যত হয়, ততগুলি জড়ময় অণু বর্ত্তমান! আবার তাহাদের মধ্যেও ফাঁক আছে, সেই ফাঁকে অণুগুলি ইতস্ততঃ দোলিত হইবার স্থান পাইতেছে। ইঞ্চের হিসাবে অণুর পরিমাণ

শুনিতে চান? এক একটা নাকি এক ইঞ্চের ৪০।৫০ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র!

কিন্তু সেই ফাঁকা স্থানই কি বাস্তবিক ফাঁক? তাহাও যে আকাশ নামক পদার্থে পরিব্যাপ্ত। যেমন যাবতীয় জীবদেহস্থ অণুগুলি জলমধ্যে নিমগ্ন আছে, তেমনই এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থে অণুময় স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব চরাচর সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া রহিয়াছে। কোথায় আকাশের তারা, আর কোথায় আমরা! এই সূক্ষ্ম পদার্থ, তারাগণের সহিত আমাদের সংযোগ ঘটাইয়াছে। ইহাই, বোধ হয় মাধ্যাকর্ষণাদি যাবতীয় শক্তির আধার। ইহারই কম্পন বিশেষে আমাদের চক্ষে লালনীলাদি বর্ণের উৎপত্তি। ইহারই তরঙ্গাভিঘাতে বজ্রপাণির বজ্রের উৎপত্তি।

এই সূক্ষ্ম পদার্থের তরঙ্গের বিস্তার মাপিতে জড়বিদ্‌গণ একটা তদুপযুক্ত সূক্ষ্ম মাপকাঠি গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল পরিমাণ করিতে ইঞ্চ লইলে চলে না, এজন্য তাঁহারা এক ইঞ্চকে পঁচিশ কোটি ভাগে ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে মাপকাঠি করিয়াছেন। আকাশ পদার্থের এক প্রকার কম্পনে লালবর্ণ আলোক জ্ঞান হয়। কিন্তু এজন্য আকাশ পদার্থে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার বিস্তার এই নূতন মাপকাঠির ৬।৭ হাজার মাত্র। ইঞ্চ হিসাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, তাহার বিস্তার এক ইঞ্চের চল্লিশ সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এইরূপ, প্রতি শাস্ত্রেই শাস্ত্রোপযুক্ত মাপকাঠির প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু সকলেই অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। এক দিকে এত বৃহৎ যে কল্পনা করিতে মস্তক ঘূর্ণিত হয়, অন্য দিকে এত ক্ষুদ্র যে মনে হয় যেন তৎসমুদয় বস্তুতঃ নাই। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা ইঞ্চ গজ মাইল লইয়াই সন্তুষ্ট। সাংসারিক ব্যাপারই বা কতটুকু। ব্রহ্মাণ্ড অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র; এত বৃহৎ, এত ক্ষুদ্র, যে পরিমাণে দুই দশটা শূন্য বাড়াইয়া কমাইয়া দিলেও প্রভেদ বুঝিতে পারি না।

সূক্ষ্ম জগতে বিধাতার অণিমা এবং স্থূলজগতে তাঁহার মহিমা প্রকটিত রহিয়াছে। ঐ দুই শক্তির স্থূল আভাস পাওয়াও সাধ্য নহে। কে জানে কত সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, কে জানে কত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আছে? আমাদের যত কিছু নাড়াচাড়া বিদ্যাবুদ্ধি পাঁচটা স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। কে জানে মানুষ অপেক্ষা উন্নততর জীবের নিকট ব্রহ্মাণ্ড কিরূপ দেখায়, কে জানে

অপরিস্ফুটেন্দ্রিয় কীটের নিকট মুক্তাকণা কি প্রকার বোধ হয়? কে জানে আর দুই চারিটা ইন্দ্রিয় থাকিলে আরও কত রহস্য জানা যাইত? যে কয়টা ইন্দ্রিয় আছে, তাহাদেরই কি পূর্ণ-ক্রিয়া ঘটিয়াছে? কে জানিত জর্ম্মাণ পণ্ডিত রণটিজেন আবিষ্কৃত আকাশ পদার্থের বিচিত্র শক্তি ছিল; কে জানে মার্কিণ-কিলী সাহেব বর্ণিত আকাশময় ভ্রামকযন্ত্র বাস্তবিক সত্য নয়। প্রকৃতি চিরকালই রহস্যময়। জড় ও শক্তির পরিমাণ লইয়া আমরা ব্যস্ত। কিন্তু জড় ও শক্তি প্রকৃতির একাঙ্গ মাত্র। আর এক বিচিত্র অঙ্গ লইয়া পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি লোকে কত বিতণ্ডাই করিতেছে। হয়ত জড় ও শক্তি, এক বই দুই নয়, হয়ত জড় ও চিৎ একেরই দ্বিবিধ প্রকটন মাত্র। ক্ষুদ্র ও বৃহতের পরিমাণ জন্য আমরা নূতন নূতন মাপকাঠি করিতেছি, কিন্তু চিতের পরিমাণ জন্য কি প্রকার মাপকাঠি হইবে!

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—

প্রতিবাদের উত্তর।

জানুয়ারী মাসের "দাসী"তে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় মৎপ্রণীত শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীর এক স্থানের যেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ক্ষীণতা-প্রযুক্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার প্রতিবাদের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। তবে কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীনাথ বাবু যেন জানেন যে, তাঁহার প্রতিবাদ বিষয়ে এই আমার প্রথম ও শেষ লেখা। মহর্ষির সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইত না, যদ্যপি আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ বসু অনেক পূর্ব্বে কোন সাহেবকে ঐ বিষয়ে লিখিত এক দীর্ঘ পত্রের বাঙ্গা-লায় অনুবাদ না করিয়া দিতেন। আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থা এমন নহে যে, অত বড় প্রস্তাব আমি এক্ষণে লিখি।

ঈশ্বর চারি রকমে পূজিত হয়েন। প্রথমতঃ—তিনি আমার জীবনের মঙ্গলা-মঙ্গল ঘটনার নিয়ন্তারূপে। দ্বিতীয়তঃ—আমার যে স্বজাতির দ্বারা তিনি বিশেষ নামে পূজিত, সেই স্বজাতির মঙ্গলামঙ্গল ঘটনার নিয়ন্তারূপে। তৃতীয়তঃ—সমস্ত পৃথিবীর অধিদেবরূপে। চতুর্থতঃ—সমস্ত বিশ্বের অধি-দেবরূপে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে উল্লিখিত সকল প্রকারে

পূজা করেন, কেবল দ্বিতীয়রূপে অর্থাৎ স্বজাতির অধীশ্বররূপে পূজা করেন না। ইহা অন্যায়। ইহাতে তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক অঙ্গবৈকল্য প্রকাশ পাইতেছে। তবে যদি তাঁহারা এই কথা বলেন যে, পিতৃপিতামহ ও ভাই-বর্গের সহিত অর্থাৎ হিন্দুদিগের সহিত আমাদিগের কোন সম্পর্ক নাই, হাজার একটা জাতি, যাহা ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে; তাহাতে ব্রাহ্ম বলিয়া এক নূতন জাতি যে আমরা সংযোগ করিতেছি, সেই জাতির সহিত কেবল আমাদিগের সম্বন্ধ, তাহা হইল সে স্বতন্ত্র কথা।

ব্রহ্ম সকল পৃথিবীর দেবতা সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যেমন সমস্ত পৃথিবীর দেবতা, তেমনি ভারতবর্ষের দেবতা; তিনি যেমন অন্য জাতির দেবতা, তেমনি হিন্দুজাতির দেবতা। তিনি আমাদের পিতাপিতামহদিগের পূজিত দেবতা, এই ভাবে কেমন একটু মধুরতা আছে, বলা যায় না। ব্রহ্ম নামে তিনি সকল হিন্দু দ্বারা পূজিত হয়েন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, প্রত্যেকেই ব্রহ্মস্বরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—"সৃষ্টাদ্যয়ে হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা।" ব্রহ্ম সৃজন, পালন, ও সংহার কার্য্য জন্য হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। দুর্গা সেই ব্রহ্মের শক্তি মাত্র, এই জন্য তিনি ব্রহ্মময়ী বলিয়া উক্ত হয়েন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সকল হিন্দু শাস্ত্রই সেই এক মাত্র পরম ব্রহ্মকে কীর্ত্তন করিতেছে। সকল সাধারণ হিন্দু অবিশুদ্ধ সংস্কৃতে বলিয়া থাকে— "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" ব্রহ্মই সকল হিন্দুর উপাসিত দেবতা। ব্রহ্ম ভারতের চিরন্তন দেবতা। ব্রহ্ম শব্দ হইতে "ব্রাহ্ম" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেমন ব্রহ্মের উপাসক, এমন অন্য কোন হিন্দু নহে। ব্রাহ্মেরা কি এমন অপদার্থ হইয়া গিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম" শব্দ নিবন্ধন আমা-দিগের দেশীয় লোকের সঙ্গে, আমাদিগের পিতা পিতামহের সঙ্গে আমাদিগের যে একটু অপূর্ব্ব স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহা নির্দ্দয় কুঠারাঘাতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন? ব্রাহ্মেরা বিশ্বজনীনতা ও স্বদেশানুরাগ এই দুই গুণের অনায়াসে সমন্বয় করিতে পারেন; তবে সে বিষয় যত্নবান হয়েন না কেন? ব্রহ্ম যে কেবল ভারতবর্ষের ও হিন্দুদিগেরই প্রধান দেবতা, সমস্ত পৃথিবীর ও অন্যান্য দেশের দেবতা নহে, এমন কথা ত আমি কখন বলি নাই। শ্রীনাথ বাবু কি মৎ-প্রণীত "সারধর্ম্ম" ও "Religion of love" পাঠ করিয়াছেন? বোধ হয় করেন নাই। যদি করিতেন তাহা হইলে

কখনও হিন্দু গভীর কথা বলিতেন না। আমি বিশ্বজনীনতা বড় ভাল বাসি, কিন্তু যে বিশ্বজনীনতা আমাকে আমার স্বদেশকে ভুলাইয়া দেয় তাহা আমি অসুস্থ ভাবুকতা জ্ঞান করি। Lord Beaconsfield বলিয়াছেন যে—"The cosmopolitan loves every other country but his own" আমি cosmopolitan বটে, কিন্তু Lord Beaconsfield বর্ণিত cosmopolitan নহি।

ব্রহ্ম নাম ও হিন্দু ভাব, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম দুই একেবারে এমন জড়িত হইয়া গিয়াছে যে পৃথক করা কঠিন। সকল হিন্দুরা বলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিদেশীয় ধর্ম্ম নহে। উহা হিন্দুধর্ম্মের সার; তবে আমি স্বীকার করি যে অনেক ব্রাহ্ম এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের পার্থক্য সম্পাদন করিতে বিধিমতে যত্ন করিতেছেন বটে। ইঁহারা কালিদাসের ন্যায় যে শাখার উপরে উপবিষ্ট আছেন, তাহাই ছেদন করিতেছেন। ব্রহ্ম পিতৃপিতামহের উপাস্য দেবতা এই ভাবটি যে কেবল মধুর তাহা নহে; তাহা বিলক্ষণ উপকারী হইবার সম্ভাবনা। সেই পিতৃপিতামহ সেবিত ভারতের চিরন্তন দেবতার নামাঙ্কিত ধ্বজা উড্ডীন করিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ভারতের রাজনৈতিক উদ্ধার কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইব, এমত প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম নামে সকল হিন্দু জাগ্রত হইবে, এমন আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দেবতার ন্যায় দেবতা নহেন। তিনি সকল হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধারণ দেবতা। ঐ নাম দ্বারা সকল হিন্দুকে উত্তেজিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা ব্রহ্মযোগশূন্যতা এবং পরস্পর বিবাদ দ্বারা ব্রহ্ম নামের উপর যে কলঙ্ক আনিয়াছি, তাহাতে তাহাদের এক্ষণে ঐরূপ উত্তেজিত হইবার অল্প সম্ভাবনা দেখিতেছি। কিন্তু ইহার জন্য বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দায়ী নহেন; হত ভাগা আমরা দায়ী।*

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

* এবিষয়ে আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। সম্পাদক।

"নদী"।

নদী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ছয় আনা।

অনেকে মনে করেন, মানব-প্রকৃতিটা ভগবানের একটা মস্ত ভুল; বিশেষতঃ শিশু-প্রকৃতি। বাস্তবিক স্বর্গে যদি একটা টেক্সট্‌বুক কমিটি থাকিত, এবং ভগবান্ যদি তাহার, কিম্বা তথাকার গুরুমহাশয়দের পরামর্শ লইয়া, শিশু-প্রকৃতি গড়িতেন, তাহা হইলে শিশুরা এত খেলা ভাল বাসিত না, দুপর রোদে ঘরময় দাপাদাপি করিত না, ঠাকুরমার কাছে বসিয়া সন্ধ্যার আধ আলো আধ আঁধারে উপকথা শুনিতে চাহিত না, এবং এতটা স্বপ্নপ্রিয় ও কল্পনার দাস হইত না। ভগবানকেও কষ্ট পাইয়া বেত গাছের সৃষ্টি করিতে হইত না। কিন্তু যা হ'বার নয়, তার জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? শিশুগুলিকে ভগবান্ আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া দেখা গেল যে, ঠেঙ্গাইয়া শিশুদিগকে গোপালের মত সুশীল ও সুবোধ করা গেল না। তাহারা ক্রমাগত নামতা পড়িতে ত চায়ই না; এমন কি, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কবিগণ যে এমন চৌদ্দ অক্ষরের মিল্‌যুক্ত নীতিগর্ভ কবিতানিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে চায় না! টেক্সট্‌বুক কমিটির চেয়ে ত ছেলেদের বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান অধিক নয়। তাঁহারা এ সকল কবিতাকে অতি উপকারী বলিয়াছেন। তবু শিশুরা সেগুলি আপনা হইতে পড়ে না। এখন উপায় কি? আমাদের বরাবরই একটা সন্দেহ আছে; ভয়ে বলিতে পারি নাই। সন্দেহটা এই, যে আমরা অবশ্য খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ জীব; কিন্তু হয়ত ভগবান্ নিতান্ত কাঁচা কারীকর না হইতেও পারেন। শিশুদিগকে ঠেঙ্গাইয়া পিটিয়া আমাদের মনের মত করিয়া গড়িতে ত পারা গেল না। এখন ভগবানের উপর হাতিয়ার না চালাইয়া শিশুদিগকে তাহাদের প্রকৃতির গতি অনুসারে বাড়িতে দিলে মন্দ হয় না। তাহাদের জ্ঞানার্জ্জনের মধ্যেও ক্রীড়াশীলতা আসুক না; তাহাতে ক্ষতি কি? বিড়ালছানা গুলি লেজ নাড়িয়া লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করে; নীতি ও গাম্ভীর্য্য ভাল বলিয়া ভগবান্ তো তাহাদের লেজগুলি কাটিয়া সংসারে পাঠাইয়া দেন নাই? ক্রীড়াশীলতা বোধ হয় পাপ নয়। কল্পনাটাও বোধ হয় মন্দ জিনিস নয়। শিশুদের কল্পনা জাগাইয়া দেওয়া বরং ভাল বলিয়াই বোধ হয়। তুমি আমি হয়ত

জ্ঞানের শুষ্ক হাড় চিবাইতে পারি ; কিন্তু শিশুরা একটু রস চায় ; সকল জিনিসই সৌন্দর্য্যের পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিতে চায়। যিনি তাহাদের এই নির্দ্দোষ ক্রীড়ার সঙ্গী হইতে পারেন, তাহাদের কল্পনা সজাগ করিয়া তুলিতে পারেন, বিজ্ঞানকে তাহার সহচর সৌন্দর্য্যের সহিত একত্র করিয়া তাহাদের খেলার সাথী করিতে পারেন, তিনি তাহাদের পরম বন্ধু। আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শিশুদের বন্ধুত্ব-লিপ্সু দেখিয়া অতিশয় প্রীত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার "নদী"র সঙ্গে অনেক শিশু কল্পনার রথে চড়িয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিবে। শিশুরা পড়িয়া পড়িয়া ইহার সুন্দর কাগজ ও ছাপা শ্রীহীন করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব। ✓

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

যতই দিন যাইতেছে ততই আমরা একদিকে আপনাদিগের অসারতা ও অকর্ম্মণ্যতা, অপরদিকে সিদ্ধেশ্বর ভগবানের কৃপা বিশিষ্ট ভাবেই উপলব্ধি করিতেছি। যেখানেই আমরা 'আপনারা করিব' বলিয়া আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে চাহিয়াছি সেখানেই আমরা আপনাদিগকে দুর্ব্বল, অশক্ত, অসহায় এবং অকূল-পাথারে ভাসমান দেখিয়াছি। কিন্তু যখনই আমরা হা'ল ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র দুর্ব্বলের বল ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছি তখনই আমরা আপনাদিগকে ধনবল,জনবল এবং বুদ্ধিবলে বলীয়ান দেখিতে পাইয়াছি। দাসাশ্রমের ক্ষুদ্র ইতিবৃত্তে ভগবানের লীলা কাহিনী এই নূতন বা আকস্মিক নহে কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় অগণ্য এবং সুসম্বদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহা হইতে আমাদিগের আজিও স্থায়ী ঘনীভূত এবং প্রাণগত শিক্ষালাভ হইল না। বুঝিতেছি তাহাও ভগবানের কৃপা ব্যতীত হইবার নয়। তাই নিতান্ত অশরণ হইয়া করজোড়ে তাঁহারই নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি দাসাশ্রমের হিতৈষীগণ আমাদিগের প্রার্থনায় যোগ দান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বর্ত্তমান মাসের রোগী সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। রসিকচাঁদ, ৩। তারাপ্রসন্ন মজুমদার, ৪। ছৈয়দুন্নেসা, ৫। গোপালচন্দ্র নন্দী, ৬। আজিম মহম্মদ, ৭। দেবীয়া, ৮। স্বর্ণ, ৯। ফুলমণি, ১০। দুর্গামণি, ১১। নবদুর্গা, ১২। পার্ব্বতী, ১৩। হীরামণি, ১৪। রাজেশ্বরী, ১৫। পার্ব্বতী, (২য়) ১৬। ঘুণুমণি, ১৭। ভূতনাথের মা।

গোপালচন্দ্র নন্দী।—বাড়ী খুলনা জেলায়, বয়স ৩২ বৎসর। হাঁপানি কাসী, জ্বর, বাতশ্লেষ্মাদিতে অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইয়া একেবারে শয্যা-শায়ী হন। শেষে দাসাশ্রমে আসিবার জন্য প্রার্থী হন। এক সময়ে ইনি গিরিডিতে দাসাশ্রমের কর্ম্মচারী থাকিয়া বিপদকালে বিশেষ সাহায্য করেন সুতরাং দাসাশ্রমও তাঁহার বিপদকালে যথাশক্তি তাঁহার সেবা করিবার জন্য স্থান দান করিয়া কৃতার্থ হন। এখন তিনি অনেকটা ভাল আছেন।

হীরামণি। বাড়ী মেদিনীপুর জেলা কাঁথি সবডিবিশনে। বয়স ২৮।২৯; চাকরাণীর কার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। কাপড় তুলিতে গিয়া ছাদ হইতে পড়িয়া যায় এবং পদতলে ও পৃষ্ঠদেশে দারুণ আঘাত পাইয়া মৃতকল্প হয়। সেই অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে প্রেরিত হয়। তিন মাস চিকিৎসায় যখন অনেকটা আরাম হইয়া উঠে তখন সেখান হইতে বিদায় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তখনও শয্যাশায়ী, বসিতে বা দাঁড়াইতে কিছুই পারে না। কাজ কর্ম্ম করিবে কি! এই অবস্থায় দাসাশ্রমে আনীত হয়। এখন অনেকটা ভাল আছে এবং কিছু কিছু হাটিতেও পারে।

পার্ব্বতী (১ম)—বাড়ী উড়িষ্যা প্রদেশে বয়স প্রায় ৩৫।৩৬ চাকরাণীর কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গত চৈত্র মাস হইতে তাহার পেটের অভ্যন্তরে একটী ফোড়া হওয়ায় অত্যন্ত যাতনা পাইতেছে। ফোড়াটী পেটের মধ্যেই গলিয়া যায় ইহাতে ডাক্তারেরা আমরক্ত মনে করিয়া তাহা-রই চিকিৎসা করেন। প্রায় ১০ মাস পরে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া দাসা-শ্রমে আনীত হয়। তাহাকে এখন হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

ঘুণুমণি।—পিতার নাম উদ্ধব, জাতি কৈবর্ত্ত, বয়স ২১।২২ বৎসর, বাড়ী যশোহর জিলা। আড়কাটির প্রলোভনে পড়িয়া অজ্ঞাতসারে কুলী হইয়া আসামে যায়। যত দিন শক্তি ছিল, কাজ করিয়াছিল; যখন আসাম জ্বরে প্রপীড়িত হইয়া একেবারে মরণোন্মুখ হয় তখন তাহার কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাকে সেই অশরণাবস্থায় কলিকাতার রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া যায়। তদবস্থায় দাসাশ্রমে আসিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। এখন একটু ভাল হইয়াছে; জ্বরও ছাড়িয়াছে।

তারাপ্রসন্ন মজুমদার—বাড়ী ময়মনসিং জেলায়, বয়স ১৬ বৎসর। দেশে থাকিতে অনেক দিন ম্যালেরিয়া ভোগ করিয়া শেষে কয়েকটী বন্ধুর সাহায্যে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শেষে তাঁহারা চিকিৎসার বিশেষ

সুবিধা করিয়া না উঠিতে পারায় দাসাশ্রমে আসিতে পরামর্শ দেন। তাহাদের দেশের একজন মোক্তার বাবু একদিন তাহার সন্ধানে আসিয়া বলিলেন তোমার বাড়ীর সকলে যে তুমি মরিয়া গিয়াছ শুনিয়া ভারী ব্যাকুল হইয়াছেন। অতএব অবিলম্বে তুমি বাড়ী যাও। তারাপ্রসন্ন প্রায় একমাস ছিল এবং সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া গিয়াছে।

পার্ব্বতী (২য়) বাড়ী কলিকাতা জাতিতে ডোম বয়স প্রায় ৩২ বৎসর। যকৃৎ প্লীহা জরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল দেখিয়া পাড়ার একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে দিয়া যায়। আরাম হইয়া গিয়াছে।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা ও দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভগবান দাতাগণের কল্যাণ করুন।

এককালীন দান।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫।০,বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, গোয়ালপাড়া ১৩্, A friend ৫্, ৫০ নং ওলড্‌বৈঠকখানা মেস্।/০, ১২। ৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মেস্॥০, ১২৬ নং ওলড্‌বৈঠকখানা মেস্।০, ৪২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস্।০, A friedn of Hari Ghose's Street ১্, বাবু ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত॥০, ৪০ নং পঞ্চাননতলা মেস্।০, ৪০।১ নং পঞ্চাননতলা মেস্।০, বাবু ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১্, বাবু মন্মথনাথ দত্ত ১্, বাবু কিশোরীলাল সরকার ১্, D. N. Bose Eqr ॥০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেট ১্, ৭নং কাশিঘোষের লেন মেস।০, ৬৩।১ নং মেছুয়াবাজার রোড মেস।০, বাবু যতীন্দ্রনাথ মিত্র, ১্, বাবু রাখালদাস মল্লিক ॥০, ১০০।১নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট মেস্।০, বাবু যামিনীকুমার বসু।১০, জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ ৫্, ৬৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস্ ৵৫ ২৬নং কানাইলাল ধরস্ লেন মেস ৶০, বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ১্, ১১নং মুসলমানপাড়া লেন মেস।০, ৮।১নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন মেস॥০, ১০০।২না মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট মেস।/০, ২৪নং রামকান্ত মিস্ত্রির লেনের মেস।৶০, বাবু গিরীশচন্দ্র দে ১্, ১০৭ নং ওলড্‌বৈঠকখানা মেস ৶০, ৫০ নং ওলড্ বৈঠকখানা মেস।/০, ৪।১ নং ছকু খানসামার লেন মেস।১৫, বাবু চণ্ডীচরণ সেন ১্, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ৩্, ১২৬ নং ওলড্‌বৈঠকখানা মেস্।০, বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ ১্, A sympathiser, Bethune Collage ৫্, বাবু সারদাচরণ মিত্র ২্, শ্রীমতী প্রভাবতী দাস ১্, বাবু প্যারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২্, অনাথবন্ধু সমিতি ১্, হৃষীকেশ মজুমদার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২্, বাবু রামচন্দ্র কুণ্ডু গোবিন্দপুর ১্, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া ১্, বাবু জানকীনাথ সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া ॥০, বাবু জলধর সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া ॥০, বাবু বনমালী সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া ॥০, বাবু চন্দ্রমোহন সাহা কুষ্ঠিপাঁচুরিয়া॥০, বাবু রমেশচন্দ্র সেন ফরিদপুর ১্, বাবু অম্বিকাচরণ মজুম-

দার ফরিদপুর ২৲, বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ভোজনদক্ষিণাপ্রাপ্ত ৵১৫ বাবু অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৲, বাবু গোবর্দ্ধন ঘোষাল, হিন্দোল ৫৲, ৬৭ নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস্ ৵১০, ১৫নং মুসলমানপাড়া লেন মেস ॥০, বাবু শ্রীশচন্দ্র দত্ত ২৲, ১৩৪ নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস /১৫, ১২। ৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মেস ॥০, ২১। ১নং পটুয়াটোলা লেন মেস ॥০, বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ ১৲, A sympathiser ৬৲, বাবু ছত্রধর ঘোষ ১৲, ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি, এল ১৲, বাবু কালিদাস রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল ১৲, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু বিহারীলাল দাস ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়. জানুয়ারী ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র সান্ন্যাল ১৲, বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ১৲, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র সান্ন্যাল ১৲, বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার।০, বাবু বিহারীলাল সাহা।০, Mrs K. N. Ray ৩৲, দাসাশ্রমের বন্ধু ৷৵৫, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ ২॥৵৫ A friend of Dasasram ১৲, দেবী চৌধুরাণীর বিবাহ উপলক্ষে ৪৲, বাবু রতিকান্ত ঘোষ।০, ৬৩নং মেছুয়াবাজার রোড মেস।০, একজন বন্ধু স্ত্রীর স্বর্গার্থে ২৲, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেট্, জানুয়ারী ১৲, ২০ নং পটুয়াটোলা মেস।০, বাবু যোগেশচন্দ্র দে বি, এল ২৲, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ১৲, ৪নং পঞ্চাননতলালেন মেস।০, বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।০, বাবু প্রিয়নাথ বসু ১৲, বাবু শ্যামাদাস কবিভূষণ, ফেব্রুয়ারী ॥০, বাবু হরিপদ ঘোষাল, ফেব্রুয়ারী।০, বাবু ঈশানচন্দ্র দাস গোপালপুর জেলা ফরিদপুর বার্ষিক ১৲, বাবু শীতলচন্দ্র ঘোষাল উকীল উলুবেড়ে ১৲, বাবু রসিকলাল মুখার্জি বাগনান ১৲, বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ মেদিনীপুর ১৲, মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার মেদিনীপুর ১৲, বাবু দীনবন্ধু দত্ত পাহারীপুর।০, আবদুল রহমান ১৲, আজবালী ॥০, বাবু তারাপ্রসাদ মাইতি ॥০, বাবু নিবারণচন্দ্র মুখার্জি ॥০, বাবু সারদাচরণ বসু ॥০, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ ॥০, আবদুল রহিম।০, বাবু কৃষ্ণকিশোর আচার্য্য ১৲, বাবু জনার্দ্দন রাহুত ॥০, বাবু প্রিয়নাথ মুখার্জি ১৲, বাবু পরাণচন্দ্র দাস ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ মাইতি ॥০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ॥০, বাবু মধুসূদন রায় ৵০, বাবু গোলাম আলারখা ॥০, বাবু অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী মেদিনীপুর ॥০, বাবু সুশান্তনাথ সেন মেদিনীপুর ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ মেদিনীপুর।০, বাবু বিহারীলাল হালদার মেদিনীপুর ॥০, বাবু পূর্ণচন্দ্র মেদিনীপুর ৵০, মণিরুদ্দীন আহাম্মদ ॥০, বাবু শ্রীধরচন্দ্র বসু।০, বাবু রামশেখর নন্দী ১৲, বাবু রাসবিহারী বসু ॥০, বাবু অতুলচন্দ্র বানার্জি ১৲, বাবু মোক্ষদাচরণ বসু ॥০, বাবু নবীনচন্দ্র জানা।০, বাবু ক্ষেত্রমোহন পাল।০, মহম্মদ আজহর।০, বাবু খিরাজচন্দ্র হালদার।০, মুন্সী সফির উদ্দীন মহম্মদ।০, বাবু দুর্গাপ্রসাদ সিংহ।০, মুন্সী মবারক আলী ৵০, মুন্সী আমজেদ হোছেন।০, মুন্সী এ, করিম ৵০, বাবু রজনীকান্ত দত্ত ॥০, বাবু সতীকুমার গাঙ্গুলী ॥০, মুন্সী আবদার ওয়াক্ ॥০, বাবু কেদারনাথ সিংহ ॥০, বাবু অভিরাম দে ॥০, বাবু রামকুমার মাইতি ॥০, বাবু কুঞ্জবিহারী দাস ॥০, বাবু আর বসু ॥০, বাবু জীবনচন্দ্র দাস ॥০, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।০, বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।০, মুন্সী মহম্মদ বক্স ৵০, বাবু হরিপদ সিংহ ॥০ বাবু রসিকলাল ঘোষ ১৲, বাবু আবদুল লতিব ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র রায় ॥০, এ, কেও ॥০, শ্রীচন্দ্রনাথ ঘোষ ॥০, বাবু অবিনাশচন্দ্র গোঁই ॥০, বাবু কৈলাসচন্দ্র আড্ডি।০, বাবু

রজনীকান্ত মিত্র ॥০, মুন্সী মুরলহক ।০, এম্, সি, গাঙ্গুলী ॥০, বাবু কেদারনাথ রায় ॥০, বাবু নীলরতন রায় ১৲, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ॥০, বাবু গিরীন্দ্রনাথ মজুমদার ১৲, বাবু শ্রীধর চক্রবর্ত্তী ॥০, বাবু তিনকৌড়ি মাইতি ॥০, বাবু গোসাইদাস দাস ।০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥০, বাবু মাধবচন্দ্র দত্ত ॥০, বাবু শ্যামাপদ মিশ্র ॥০, বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।০, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১৲ রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র ২৲, বাবু রাধামাধব দত্ত ।৶০, বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৶০, বাবু রজনীকান্ত কোঙরা ৶০, বাবু রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ৶০, বাবু নেপাল ভট্টাচার্য্য ৶০, বাবু ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ।০, বাবু অবিনাশচন্দ্র দত্ত ১৲, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র পাত্র ।০, ত্রৈলোক্য বাবু ৵০, বাবু প্যারীলাল দত্ত ১৲, x—।০

বাবু ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট প্লীডার মেদিনীপুর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বার্ষিক ৬৲ টাকা হিসাবে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ আদায় ১৲, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মেদিনীপুর বার্ষিক ৩৲ টাকা জানুয়ারী ১৮৯৬ হইতে আরম্ভ জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ আদায় ১৲ ।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

দাসীর সাহায্য ২৲, জামা বিক্রয় ৶০, পুস্তকবিক্রয় ৭৷১০, বাক্সে প্রাপ্ত ।৫, মোট ৯৸৴১৫ ।

মাসিক চাঁদা ।

শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ২৲, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর, ডিসেম্বর ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ, ডিসেম্বর ১৲, ৪০ ।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট মেস ডিসেম্বর ৷০, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল, নবেম্বর ও ডিসেম্বর ২৲, বাবু প্যারিমোহন ভড় ডিসেম্বর ।০, N. K. Bose Esqr C. S. ডিসেম্বর ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা মাঘ ॥০, বাবু নন্দকুমার দত্ত ডিসেম্বর ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ জানুয়ারী ১৲, বাবু দিননাথ চট্টোপাধ্যায় জানুয়ারী ।০, বাবু প্রমথনাথ দাস জানুয়ারী ২৲, ১৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট মেস জানুয়ারী ॥০, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানুয়ারী ।০, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, জানুয়ারী ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু জানুয়ারী ॥০, বাবু দিনেশচন্দ্র চৌধুরী ফেব্রুয়ারী ॥০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর জানুয়ারী ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত জানুয়ারী ।০, ৪।২ নং ছকু খানসামার লেন মেস জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ৸০, বাবু শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী ।০, বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র জানুয়ারী ।০, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর জানুয়ারী ১৲, বাবু নন্দকুমার দত্ত, জানুয়ারী ১৲, বাবু প্যারিমোহন ভড়, জানুয়ারী ।০, বাবু রাধানাথ দেব, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী ১৲, A lady C/o বাবু শ্রীনাথ দাস জানুয়ারী ১৲, ৪০।১নং কলুটোলা মেস জানুয়ারী ॥০, বাবু যদুনাথ বরাট ফেব্রুয়ারী ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র বড়াল, জানুয়ারী ১৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী ফেব্রুয়ারী ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র ফেব্রুয়ারী ১৲, বাবু হরিধন চট্টোপাধ্যায় জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ১৲, বাবু দিনেশ চন্দ্র চৌধুরী ফেব্রুয়ারী ॥০, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা ফাল্গুন ॥০, মোট ২৮॥০ ।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ২৮॥০, দামপ্রাপ্তি ১৭০৸০, অন্যান্য প্রকারে আয় ১০৶১৫, বিগত মাসের স্থিত ৬৭॥৴১৫, মোট জমা ২৭৭৶১০ ।

ব্যয়।

কর্জ্জশোধ ২৫৲, আদায়কারী ৩৬৸৴০, গাড়ীভাড়া ৪॥১০, গচ্ছিতজমা ৭০, টাকার সুদ ১৲, কর্জ্জ দেওয়া যায় ১০৲, রাঁধুনী ৫৸৴০, চাকর ২৸৴১০, মেথর ৬৸৴১০, ধোপা ।০, কর্ম্মচারীর বেতন ৩৬।৶০, দুগ্ধ ২৲, আতুরগণের পাইখরচ ৪৮॥৫, দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত ৴১০, অন্যান্য ॥৴১৫ ; মোট খরচ ২৪৯৸৴০ ।

মোট আয় ব্যয়।

মোট জমা ২৭৭৶১০, মোট খরচ ২৪৯৸৴০, মোট হস্তে স্থিত ১৭৶৯০ ।

বস্ত্রাদি দান।

শ্রীমতী প্রভাবতি দাস এলপাকার চোগা ৬, কোট ১, টুপি ৩। Little sister of the Band of Mercy, নূতন কাপড় ১, পিতলের হাতা ১, লোহের কড়া ১, গামলা ২। বাবু বিমলানন্দ দাসগুপ্ত সাদাকোট ১। বাবু রমেশচন্দ্র গুপ্ত গরম কোট ১। বাবু অনাথবন্ধু গুপ্ত পড়িয়া পাওয়া দান, নূতন কাপড় ১ জোড়া, পুরাতন কাপড় ১, ছেঁড়া কাপড় ১, গামছা ১। বাবু ব্রহ্মানন্দ বক্রাকতি কোট ১, সার্ট ২, বিছানার চাদর ১। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ প্যাণ্টালুন ১, কোট, ৩ সার্ট ১, ধুতি ১, মোজা ২। বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গেশ্বর পুস্তক ৫। বাবু দিনেশচন্দ্র চৌধুরী মসারী ১।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। তাহা না হইলে কার্য্যকালে পরস্পরকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

১। দাসাশ্রম বিশেষভাবে অনাথ ও অশক্ত আতুরদিগেরই আশ্রয়-স্থান। যাহারা শক্ত, কোনপ্রকারে আপনাদের জীবিকা সংস্থান করিয়া লইতে পারে, কেহ যেন তাহাদিগকে দাসাশ্রমে লইয়া না আসেন। কিন্তু অশক্ত আতুর দেখিলেই এখানে পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। যদি আনিবার খরচ তাঁহারা দিয়া উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে অগত্যা দাসাশ্রমই সে ব্যয়ভার বহন করিবেন।

(ক) আতুর অর্থে অন্ধ, খঞ্জ, কোনপ্রকারে বিকলাঙ্গ অত্যন্ত জীর্ণ বৃদ্ধ এবং চিররুগ্ন ব্যক্তি বুঝিতে হইবে।

(খ) অনাথ অর্থে—যাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার কেহ নাই অথবা থাকিলেও এমন অস্বাভাবিক নির্ম্মম এবং হৃদয়হীন যে তাহার ভার লইতে চায় না।

২। (ক) রোগীদিগের জন্য সাধারণতঃ হাঁসপাতাল সকল মুক্ত রহিয়াছে। যাহাদের নিজের বাড়ী থাকিয়া চিকিৎসা চালাইবার সঙ্গতি নাই তাহারা হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। তবে অনেক সময় দেখা যায়, যে হাঁসপাতাল পরিপূর্ণ, স্থান খালি নাই; এরূপ অবস্থায় যত দিন হাঁসপাতালে স্থান খালি না পাওয়া যায়, ততদিন এখানে রাখিয়া তাহাদের চিকিৎসাদি করান যায়; কিন্তু তাহাদের ইহা জানা প্রয়োজন যে হাঁসপাতালে স্থানখালি হইলেই তাহাদিগকে সেখানে যাইতে হইবে।

(খ) অনেক সময় দেখা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইতেই রোগীরা হাঁসপাতাল হইতে বিদায়প্রাপ্ত হয় এবং নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় দাসাশ্রম তাহাদের আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত ভার লইতে প্রস্তুত আছেন।

(গ) গৃহস্থের ঘরের "চাকর চাকরাণী"দিগকে আমরা নিরাশ্রয় মনে করি না। সুতরাং এখন হইতে আর কেহ তাহাদিগকে এখানে আনিবেন না। আনিলেও দাসাশ্রম তাহাদিগকে রাখিতে বাধ্য নহেন।

দাসী

জগদ্রাম রায়।

আমি "দাসী"র ৪র্থ ভাগ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় জগদ্রাম সম্বন্ধে যে দুইটী প্রবন্ধ লিখি, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। আমি চিরকালই জগদ্রাম রায়ের গোঁড়া। আমাদের বাটীতে তাঁহার রচিত একখানি "দুর্গা পঞ্চরাত্রি" পুস্তক আছে;—উক্ত পুস্তক প্রতিবৎসর দুর্গাপূজার সময় পাঠ হইয়া থাকে। আমার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ অপরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উক্ত পুস্তক সুর ধরিয়া পাঠ করিতেন, তখন এমন কোন পাষাণ-হৃদয় লোক ছিল না যে উক্ত পাঠ শুনিয়া মুগ্ধ না হইত। বাল্যকালে যখন আমি পুস্তকের অর্থ পর্য্যন্ত বুঝিতাম না, তখনও মুগ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাশয়ের পাঠ শুনিতাম। বয়সের সহিত যখন সেই পুস্তকের অর্থ গ্রহণ করিতে ও কাব্যের রস আস্বাদন করিতে সক্ষম হইলাম, তখন উক্ত পুস্তক আরও মধুর হইতে মধুরতর বোধ হইতে লাগিল, এবং তদবধি জগদ্রামের কাব্যের রস সাধারণের নিকট জানাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল। আজ বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই রস আস্বাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া আমার এরূপ আনন্দ। ইণ্ডিয়ান মিরর ও পৌষ মাসের "সাহিত্য-সেবক" "দাসী"তে প্রকাশিত আমার উক্ত দুই প্রবন্ধের উল্লেখ করতঃ জগদ্রাম রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সাহিত্য-সেবকের সম্পাদক মহাশয় আমার উপর কয়েকটি গুরু ভার অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত গুরুভার কয়টী যথাসাধ্য আমি আনন্দের সহিত বহন করিবার চেষ্টা করিব।

আমি জগদ্রাম রায়ের জীবনী সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখি নাই বলিয়া সাহিত্য-সেবকের সম্পাদক মহাশয় আমার উপর অভিমান করিয়াছেন; কিন্তু আমার উক্ত দুই প্রবন্ধ লিখিবার মূল উদ্দেশ্য পাঠক মহাশয়গণকে জগদ্রামের কাব্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া। অজ্ঞাত কবির কাব্যের পরিচয় অগ্রে না দিয়া তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা

আমার মতে ঘোটকের অগ্রভাগে গাড়ি যোজনের ন্যায় বোধ হয়; এই কারণে জগদ্রামের জীবনী সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলি নাই। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় যথন তাঁহার জীবনী জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, বারান্তরে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার ইচ্ছা রহিল। অদ্য এই প্রবন্ধে তাঁহার সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিব।

মল্লিখিত জগদ্রাম রায় সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধে আমি কবির সময় নিরূপণ করিতে গিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। সাহিত্য-সেবকের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার উক্ত ভ্রম দেখাইয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। কেবল কবির "অদ্ভুত রামায়ণে"র রচনার সময় দেখিয়াই আমি উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। আমি যে সময় উক্ত প্রবন্ধ লিখি, তখন আমার নিকট দুর্গা পঞ্চরাত্রি পুস্তক ছিল না; থাকিলে এরূপ ভ্রম কখনই হইত না।

সাহিত্য সেবকের সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় "দুর্গাপঞ্চরাত্রি"র সময় নিরূপণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"দুর্গাপঞ্চরাত্রি কোন্ সময়ে রচিত হয়, তাহার নির্ণয় পক্ষে কিঞ্চিৎ অসুবিধা দেখা যায়। কাব্যের উপসংহার ভাগে স্পষ্টই লেখা আছে—

ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র শক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে শুক্লপক্ষ শুভদিনে॥
ষোড়শ দিবস প্রতিপদ গুরুবারে।
কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগ সৌভাগ্য সুন্দরে।
কাব্য দুর্গাপঞ্চরাত্রি গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল।
সভাজন শান্তমনে হরি হরি বল॥

এ স্থলে প্রথম গোলযোগ রন্ধ্র লইয়া। স্বর্গীয় শিবদাস বাবু এই রন্ধ্র অর্থে শূন্য (০) ধরিয়া ১৬০২ শকে এই কাব্যের রচনা কাল স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরাম বাবু কবির "অদ্ভুত রামায়ণে"র রচনা কাল নিরূপণার্থ পুঁথির শেষ পৃষ্ঠা উন্মোচন পূর্ব্বক দেখিতে পান—

সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশ যুক্ত তাথে।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
ঊনত্রিংশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি।
জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি॥
দ্বিজ জগদ্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ।
রাম ধ্বনি কর, পাপ তাপ হ'ক চূর্ণ॥

ইহাতে বুঝা যায় ১৭১২ শকাব্দে (১) "অদ্ভুত রামায়ণ" কাব্য সমাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা এই দুই গ্রন্থের রচনাকাল মধ্যে ১১০ বৎসরের ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব—পুত্রের রচিত গ্রন্থের ১১০ বৎসর পরে পিতা অপর গ্রন্থ রচনা করিলেন, এরূপ হইতেই পারে না। অতএব শিবদাস বাবুর গণনা নিশ্চয়ই ভ্রমপূর্ণ। অতঃপর "রন্ধ্র" অর্থে দ্বার (ছিদ্র) ধরিলে, সর্ব্বজন-বিদিত "নবদ্বার" মতে "রন্ধ্র" শব্দ দ্বারা ৯ বুঝাইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা ১৬৯২ শকে "দুর্গাপঞ্চরাত্রি"র সমাপ্তি কাল প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে ঐ দুই গ্রন্থের রচনা কাল মধ্যে মাত্র বিংশতি বর্ষের ব্যবধান থাকে; ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু এই গণনা পক্ষেও এক অন্তরায় দেখা যায়। রামপ্রসাদ নবমী পালারম্ভে লিখিয়াছেন—

> পিতা জগদ্রাম মোর রামপরায়ণ।
> যেঁহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ॥
> তা' পর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম।
> দুর্গা প্রীতে কাব্য কৈলা অতি অনুপাম॥

ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, "অদ্ভুত রামায়ণ" পরিসমাপ্তির পরে জগদ্রাম "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু উপরি লিখিত গণনা মতে দেখা গিয়াছে, দুর্গাপঞ্চরাত্রি সমাপনের বিংশতি বৎসর পরে অদ্ভুত রামায়ণ সম্পূর্ণ হয়। এখন কোন্ কথা সত্য, নির্ণয় করা দুরূহ। বলরাম বাবুর অধীনে কবির উভয় গ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তিনি গ্রন্থ দ্বয়ের রচনাকালঘটিত এই পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধানে বাক্য মাত্র ব্যয় করেন নাই কেন বুঝা সুকঠিন। ভরসা করি, পরবর্ত্তী প্রস্তাবে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া তিনি আমাদিগের এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের কৌতূহল দূর করিবেন। উপস্থিত ১৬৯২ শকেই দুর্গাপঞ্চরাত্রির রচনা কাল স্থির করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই।"

এখন দেখিতেছি, অদ্ভুতরামায়ণের "শতাব্দ"কে "শক" ধরিয়া আমি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, সাহিত্য-সেবকের সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ও সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল পরস্পর নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য "রন্ধ্র" শব্দের কষ্ট-কল্পনাপ্রসূত অর্থ (রন্ধ্র = ছিদ্র = নবদ্বার) করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অল্প মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে তত গোল নাই এবং শিবদাস বাবু রন্ধ্র শব্দের যাহা সহজ অর্থ করিয়াছেন তাহাই ঠিক। দুর্গাপঞ্চরাত্রি ১৬০২ শকেই রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে গ্রন্থের সমাপ্তির সময় লিখিতে হইলে গ্রন্থকারগণ কেবল দুইটী অব্দ ব্যবহার করিতেন—একটী "শক" ও অপরটী "সম্বৎ"। সনের কেহ উল্লেখ প্রায় করি-

(১) "শতাব্দী"র আধুনিক অর্থ ধরিলে ১৬১২ বুঝাও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। লেখক।

তেন না। রামপ্রসাদ দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে "শক" শব্দ স্পষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু জগদ্রাম তাঁহার অদ্ভুতরামায়ণে "শক" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "শতাব্দ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। জগদ্রাম নিজে যে শব্দ ব্যবহার করেন নাই সেই শব্দ আমরা ব্যবহার করিলে যে ভ্রমে পতিত হইব তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আমার মতে জগদ্রাম "শতাব্দ" শব্দ সম্বতের শতাব্দ অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। এরূপ ধরিলে গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ থাকে না। বর্ত্তমান সনে অর্থাৎ ১৩০২ সনে ১৮১৭ শকাব্দা ও ১৯৫২ সম্বৎ চলিতেছে। অতএব দেখা যায় সম্বতে ও শকে (১৯৫২—১৮১৭) ১৩৫ বৎসরের ব্যবধান; অর্থাৎ সম্বৎকে শকে পরিণত করিতে হইলে ১৩৫ বৎসর বাদ দিতে হয় এবং শককে সম্বতে আনিতে হইলে তাহাতে ১৩৫ বৎসর যোগ করিতে হয়। অদ্ভুতরামায়ণের রচনাকালকে (অর্থাৎ ১৭১২কে) সম্বৎ ধরিলে দেখা যায় ঐ সময় (১৭১২—১৩৫)=১৫৭৭ শক ছিল অর্থাৎ জগদ্রাম তাঁহার অদ্ভুতরামায়ণ ১৫৭৭ শকে রচনা করেন এবং তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ ২৫ বৎসর পরে তাঁহার পিতার আরব্ধ দুর্গাপঞ্চরাত্রি ১৬০২ শকে শেষ করেন। কারণ ১৫৭৭+২৫=১৬০২। এই মত ঠিক হইলে আমি পূর্ব্বে যে জগদ্রামকে দেড় শত বৎসরের কবি বলিয়াছি তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয় এবং শিবদাস বাবু যে তাঁহাকে আড়াই শত বৎসরের কবি বলিয়াছেন তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটুকু গোলযোগ আছে। জগদ্রাম রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রামনয়ান রায় মহাশয় জীবিত আছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০।৬৫ হইবে। তাঁহার পুত্রকেও একপুরুষ ধরিলে জগদ্রামের এখন ষষ্ঠ পুরুষ চলিতেছে। ইংরাজদের মতে * প্রতি পুরুষে গড়ে ২০

---

* লেখক মহোদয় ভ্রমে পড়িয়াছেন। ইংরাজেরা প্রতি পুরুষের স্থিতি গড়ে ২০ বৎসর ধরেন না; তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরেন। তথাহি:—

"Generation.—The ordinary period of time at which one rank follows another, or father is succeeded by child, usually assumed to be one third of a century." —*Webster.*

"In years three generations are accounted to make a century." —*Chambers's Encyclopædia.*

সুতরাং জগদ্রামকে ছয় পুরুষ পূর্ব্বের লোক ধরিলে ইংরাজী মতে তাঁহাকে দুইশত বৎসর পূর্ব্বের কবি অনায়াসেই বলা যায়। বরং ১৭১২ শকাব্দে তাঁহার রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছিল ধরিলে পুরুষ হিসাবে কিছু বিপদে পড়িতে হয়। ২০০ বৎসর ত পাওয়া গেল বাকী ৪০ বৎসরের একটা উপায় বোধ হয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা করিতে পারিবেন। সম্পাদক।

বৎসর করিয়া ধরিলে জগদ্রামের সময় ১২০ বৎসরের বেশী পূর্ব্বের হয় না। শকাব্দার হিসাবমতে তিনি ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন কিন্তু পুরুষের হিসাব ধরিলে তাঁহার জীবিতকাল ১২০ বৎসর অপেক্ষা পূর্ব্বের হয় না। এ পার্থক্যের সামঞ্জস্যের কোন উপায় দেখা যায় না। অবশ্য প্রতি পুরুষ গড়ে ৪০ বৎসর ধরিলে আর কোন গোলযোগ ঘটিতে পারে না, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাতে সম্মত হইবেন কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক, এ গোলযোগ মিটাইবার জগদ্রাম রায় মহাশয় নিজেই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ উভয়েই কেবল গ্রন্থসমাপ্তির বর্ষ দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; তাঁহারা মাস, তারিখ, বার নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত দিয়া গিয়াছেন। যে নিয়মে নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার হয় সেই নিয়মে উক্ত শকের উক্ত মাসের উক্ত দিনে বার, তিথি এবং নক্ষত্র প্রভৃতি মিলে কি না দেখিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায় এবং তাঁহাদের সময়-নির্দ্ধারণে আর কোন সন্দেহ থাকে না। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি নিজে জ্যোতির্ব্বিদ্ নহি, তবে আমার একটী জ্যোতির্ব্বিদ্ বন্ধু আছেন, তাঁহাকে শক, মাস এবং দিন বলিয়া দিলে, তিনি উক্ত দিবসের বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি বলিয়া দিতে পারেন। আমি তাঁহার দ্বারা বার, তিথি, নক্ষত্র মিলাইয়া জগদ্রাম রায়ের ঠিক সময় পাঠকগণকে জানাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি স্বদেশে গমন করার জন্য তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। তিনি স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেই তাঁহার দ্বারা গণনা করাইয়া * জগদ্রামের ঠিক সময় পাঠকগণকে জানাইব এবং যে পর্য্যন্ত তাহা না করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত স্বর্গীয় শিবদাস বাবুর সহিত আমিও জগদ্রামকে ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বের কবি বলিয়া ধরিব। বারান্তরে কবির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

* আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা জ্যোতিষ জানেন এবং এইরূপ গণনা করিতে পারেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কি ফল হয়, জানাইলে বাধিত হইব। সম্পাদক।

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

(৩)

এক্ষণে বিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। জগতের কার্য্যপরম্পরা দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিলে ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা কারণ রহিয়াছে। কারণানুসন্ধানের প্রয়াস পাওয়া মানব-মনের একটী প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম; এ কারণ মানুষ জগতে কার্য্য-পরম্পরা সন্দর্শন করিয়া তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, এবং ঐ আলোচনা স্বতঃই কারণানুসন্ধানের দিকে নীত হয়। যে প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক মানুষ কার্য্য দর্শন ও তদালোচন হইতে তাহার কারণ নির্দ্দেশের পথে পরিচালিত ও পরিশেষে ঐ কারণ নির্দ্দেশে সক্ষম হয় তাহাকেই 'বিজ্ঞান' কহে। ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, কার্য্যদৃষ্টে কারণানুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা দ্বারা কারণ নির্দ্দেশ করিবার যে প্রণালী তাহারই নাম বিজ্ঞান। গতবারে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বহির্জ্জগত হইতে জ্ঞানাহরণের নামই বিজ্ঞান। এই উভয় সংজ্ঞার সামঞ্জস্য করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে 'জ্ঞানাহরণ' দ্বারা কেবল কারণানুসন্ধানের প্রণালী মাত্র উপলব্ধ হইতেছে। কোন কার্য্য দর্শন করিলে যে পর্য্যন্ত তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি না জন্মাইবে এবং প্রবৃত্তি জন্মাইলে যে পর্য্যন্ত তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম না হওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত ইহা কখনই বলা যাইতে পারিবে না যে, উক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ ঘটিয়াছে। গতবারে ইহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, বিজ্ঞান জ্ঞানের সোপান মাত্র। অতএব এস্থলে আমরা জ্ঞান বলিতে 'কারণ নির্দ্দেশ,' এবং বিজ্ঞান বলিতে কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা কারণ নির্দ্দেশের পথে অগ্রসর হইবার যে প্রণালী তাহা বুঝিব। এ বিষয়ে একমত হইলে ইহা সহজেই আমাদের বোধগম্য হইবে যে, বিজ্ঞান যে ধর্ম্মলাভের কেবল সহায় তাহা নহে, তাহা ধর্ম্মলাভের এক মাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের অন্তরায় বলিতে গেলে তাহা যে কেবল অবৈজ্ঞানিকের মত কথা কহা হয় এমত নহে, তাহাতে অধার্ম্মিকত্বও প্রকাশ পায়। একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ হয়েন, তবে কারণানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহা প্রচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব; একদিন না একদিন তাঁহাকে কারণ খুঁজিতে খুঁজিতে গিয়া

'আদি কারণে' অবশ্যই পৌঁছাইতে হইবে। অতএব বিজ্ঞানের পথে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ যেরূপ ধ্রুব সত্য, এরূপ অপর কোন পন্থায় নহে।

তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধ কোথায়? ইহার একমাত্র উত্তর,—ঐ বিরোধ মানুষের স্বল্পদর্শিতাতে! উভয় দিক্ হইতে দেখিলে একই উত্তর পাওয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াশীল মন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছেন,—কার্য্য হইতে প্রথমে এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লইতেছেন,আবার দেখিতে পাইতেছেন যে, তাহারও অপর কারণ রহিয়াছে। অনেকগুলি আপাতঃ বিসদৃশ কার্য্যের যেমন এক কারণ নির্দ্দেশিত হইতেছে তেমনই অপর অনেকগুলি আপাতঃ বিশ্লিষ্ট কারণেরও এক মূল কারণ প্রতিভাত হইয়া পড়িতেছে; এইরূপে কারণ হইতে কারণান্তরে পরিক্রমণ করিতে করিতে বৈজ্ঞানিক যে একদিন আদি কারণে পৌঁছাইতে পারিবেন ইহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের যদি আদি কারণ একজন স্রষ্টা থাকেন, তবে আমাদের কারণানুসন্ধিৎসার চক্ষে তাঁহাকে কোন দিন প্রত্যক্ষগোচর হইতেই হইবে।

অপর দিকে ধার্ম্মিক বলিতেছেন,—তুমি বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানবলে ঈশ্বর প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছ!—ইহাও কি কখনও সম্ভব? অপূর্ণজ্ঞানশীল মানব, পূর্ণজ্ঞান আয়ত্ত করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ! কারণ খুঁজিতে গিয়া কেন অকারণে আত্মহারা হইবে? যাহা সহজ বিশ্বাস দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে তাহা অবহেলা করিয়া কেন মরুভূমে মরীচিকা অন্বেষণ করিতে যাইতেছ।

ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,—আমি কারণানুসন্ধান করিতেছি; অপূর্ণ জ্ঞান লইয়া জন্মাইলেও অপূর্ণতার মাত্রা হ্রাস করিবার বাসনা করিয়াছি। অপূর্ণতা হইতে ক্রমে জ্ঞানলাভ করিতে করিতে মানুষ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তবে আমি কেন কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া কালে আদিকারণে না পৌঁছাইতে পারিব? যদি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অদ্বিতীয় আদিকারণ থাকে, তাহা অবশ্যই আমার জ্ঞানলব্ধ হইবে। যদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া একাধিক আদিকারণ প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে কিম্বা জগৎ একটী অকারণসম্ভূত ক্রিয়ারূপে প্রতিপন্ন হয়, সে দোষ আমার নহে। যাহা হউক বিশ্বাস করিয়া মোহান্ধ থাকা অপেক্ষা অবিশ্বাসের পথে সত্যরাজ্যে প্রবেশ করা অধিকতর শ্রেয়স্কর। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক নিজকে

জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিপোষক মনে করেন। এমন তিনজন বৈজ্ঞানিকের কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় একত্রে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে "জগৎকে আমরা যে জ্ঞানধনে ধনী পাইয়াছি তাহাপেক্ষা জগতের জ্ঞানধন কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বৃদ্ধি না করিয়া কখনও এই জগৎ পরিত্যাগ করিব না"!* তাঁহারা যে স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

আবার ধার্ম্মিক' বলিতেছেন,—তুমি বৈজ্ঞানিক, আদিকারণ খুঁজিতে না গিয়া কেবল জগতে কারণবাহুল্য বিস্তার করিতেছ। জগতে যত জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে ততই নানা জাতীয় কার্য্যের নানা জাতীয় কারণ অভ্যুদিত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে কেবল মানবজীবনের ক্ষয় ভিন্ন জ্ঞান লাভের অপর কি পরিণাম হইতে পারে?

যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা বিশ্বাসের ভান করিয়া অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাসের মূল অবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রোথিত রহিয়াছে। তাঁহারা ভয় করেন যে, যদি আদিকারণ খুঁজিতে গিয়া তাহা না মিলে, তবে আমাদের বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসে পর্য্যবসিত হইবে। বৈজ্ঞানিক তাঁহাদিগকে আশ্বাসবাণী দিতেছেন,—মানুষ অপূর্ণ জ্ঞান লইয়া জন্মিয়াছে বটে কিন্তু তাহার উৎকর্ষ না করিয়া মরিতেছে না। ব্রহ্মজ্ঞান অনন্ত হইলেও মানবজীবনও অনন্ত; অনন্তজীবন দিয়া অনন্ত জ্ঞানলাভ করিতে প্রয়াস পাওয়া অলীক কল্পনা নহে। বিজ্ঞান কারণের বিশ্লেষণ এবং বাহুল্য ঘটাইলেও ক্রমে আবার তাহার সামঞ্জস্য করণেও সক্ষম হইতেছে। বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে যে, যে কারণে বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া ফল ভূতলে পতিত হইতেছে সেই কারণে চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া এবং পৃথিবীসম্বলিত গ্রহমালা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে; যে কারণে পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি বিক্ষোভিত হইয়া তাহাকে তরঙ্গায়িত করিতেছে সেই কারণে সৌরদেহে বুদ্বুদ্ ফুটিয়া উঠিতেছে; যে কারণে জননী-জঠরে সন্তান জন্মগ্রহণ করিতেছে, ঠিক সেই কারণে পুষ্পবৃন্তে ফলের অঙ্কুরোদ্গম হই-

* Sir John Herschel, Peacock and Babbage, three of the most distinguished 'Sons' of Cambridge, made an early compact, while at Cambridge, "to do their best to leave the world wiser than they found it." They graduated in 1813.

তেছে। বৈজ্ঞানিক কারণানুযায়ী বিধানবিভাগ এবং বিধানানুযায়ী জাতিবিভাগ করিতে গিয়া দেখিতে পাইতেছেন যে, বৃক্ষের ফল ও গগনের তারকা একবিধানানুযায়ী, অতএব একজাতীয়; পৃথিবীর চৌম্বকশক্তির তরঙ্গ ও সৌরদেহের বুদ্বুদ একবিধানানুযায়ী অতএব একজাতীয়; বৃক্ষের ফুল ও জীবের জননী একবিধানানুযায়ী অতএব একজাতীয়! এইরূপে নানাবিধানের সমীকরণ দ্বারা এক মহাবিধানে এবং নানা কারণের একীকরণ দ্বারা এক আদিকারণে উপনীত হওয়া বিজ্ঞানেরই পক্ষে সম্ভাবনীয়!

অপর একদল গোঁড়া ধার্ম্মিক আছেন, তাঁহারা মনে করেন "বিজ্ঞানটী সয়তানের সৃষ্টি!" তাঁহাদের মতে জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং বিশ্ব-বিধাতার কারুকার্য্য বিনষ্ট করিবার জন্যই সংসারে উদ্ভিদ্বিদ্যা ও ভূবিদ্যা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। (ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত Ruskin এই শ্রেণীর অগ্রবর্ত্তী: শুনিতে পাই Wordsworthও এই দলভুক্ত ছিলেন। বোধ হয় ইহা বলিলে মার্জ্জিত হইব যে, যাঁহারা 'নিষ্ঠুরতা' নাম দিয়া Vivisection কে অন্ধকূপে নিমজ্জিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা কতকপরিমাণে এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে পারেন।) তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে বিজ্ঞানের প্রতি বিধাতার কোপদৃষ্টি আছে; ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত্র-বিশ্লেষণপূর্ব্বক তাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদন করা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত! তাহা করিতে গেলেই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য নিষ্ঠুরতা, পাপা-চরণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইবে!! জগতের কার্য্যবিশ্লেষণপূর্ব্বক তাহার বিধানবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে যাওয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত,—একথা বলিতে গেলে ঈশ্বরকে একান্তই জিঘাংসাপরায়ণরূপে প্রতিপন্ন করিতে হয়। অথবা ইহাই মনে করিতে হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত নহে! ব্রহ্মজ্ঞান যদি লাভ করিতেই হয় তবে যাঁহারা ভ্রমান্ধকার বিদূরণ জন্য ঈশ্বরের কার্য্যদৃষ্টেই তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে প্রয়াস পায়, তাহাদের কার্য্যপ্রণালীকে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই বিশ্লেষণ অবশ্যকর্ত্তব্য; তদ্ভিন্ন জ্ঞানলাভ অসম্ভব। বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিককে যদি কথঞ্চিৎ নিষ্ঠুরাচরণও করিতে হয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দায়ে তাহাতে পরা-ঙ্মুখ হন না; কারণ তাঁহার নিকট, অজ্ঞানতা ও নিষ্ঠুরতা এতদুভয়ের মধ্যে

অজ্ঞানতাকে অধিকতর হেয়জ্ঞান হয়। বৈজ্ঞানিক অজ্ঞানতাকে পাপের চরম বলিয়া মনে করেন; অতএব ঐ মহাপাপ ক্ষালন জন্য যদি অপর কোন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাপও আচরণ করিতে হয়, তিনি তাহা অকর্ত্তব্য-বোধে পরিহার করেন না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কার্য্যদৃষ্টে কারণানুসন্ধানের প্রণালীর নাম বিজ্ঞান। অতএব বিজ্ঞানশিক্ষা মানুষকে নিয়ত বিধানের রাজ্যে প্রবিষ্ট করাইতেছে, এবং বিধান-পর্য্যালোচনাক্রমে তাহাকে বিধাতার দিকে অগ্রসর করিতেছে। তাহা হইলে আবার প্রশ্ন উঠিতেছে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে বিরোধ কেন? (এবার প্রশ্নটীকে হেতুবাচকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।) এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমতঃ বিজ্ঞাননির্দ্দেশিত কারণের স্বরূপ আলোচনা করিতে হয়। জগতের কার্য্যপরম্পরার দুই জাতীয় কারণ থাকিতে পারে ;—প্রথম, অহেতুক কারণ; দ্বিতীয়, হেতুগত কারণ। যে সকল কার্য্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে আপনা আপনি ঘটিয়া থাকে এবং কেবলমাত্র অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহাদের কারণকে অহেতুক কারণ বলা যায়। যথা, ফল শাখাচ্যুত হইলেই ভূতলে পতিত হয়; ইহাতে উদ্দেশ্যের কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হইতেছে না, সকল সময়ে সর্ব্বত্রই ফল তদবস্থ হইলে তাহার পতন ঘটিয়া থাকে। যদি অবস্থাবিশেষে ফলকে শাখাচ্যুত হইয়াও ভূতলে পতিত হইতে না দেখা যাইত, তবে তখন মনে করা যাইত যে ফলের পতনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে। বিজ্ঞান পর্য্যালোচনাকালে এইরূপ অহেতুক কারণ বৈজ্ঞানিকের চক্ষে এমত পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে, তখন অনেক সময় তাঁহাকে বিধানরাজ্যে বিধাতার অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দিগ্ধ করিয়া দেয়। এই সকল অহেতুক কারণই বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মিলন বিষয়ে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সহজে প্রতিপন্ন হইবে, হেতুগত কারণের অনুসন্ধান বিষয়ে অহেতুক কারণ অতি উপাদেয়। বৈজ্ঞানিক কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বপ্রথম এক শ্রেণীর অহেতুক কারণ তাঁহার পর্য্যালোচনার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। তিনি যদি সে সকলকে বিধিবদ্ধ করিয়া তাহাদের পুনঃ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ঐ সকল কারণের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তবে দেখিতে পাইবেন ক্রমশঃ তাঁহার পর্য্যালোচনা তাঁহাকে কোন এক মূল-কারণের দিকে অগ্রসর করিতেছে। ইহার একটী মহদ্দৃষ্টান্ত আগামী

বারের আলোচনার জন্য রাখিয়া বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের আপাততঃ বিরোধ বিষয়ে অপর এক কারণের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধের অপর এক কারণ বৈজ্ঞানিকদিগের অবিশ্বাসের ভান। বৈজ্ঞানিক যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন, তবে যাহা প্রত্যক্ষতঃ প্রমাণিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন অপর কিছুই স্বীকার্য্য মানিয়া লইতে প্রস্তুত হন না;—তিনি প্রমাণ ভিন্ন কিছুই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। অথচ তিনি সাংখ্যকারের মত ইহাও বলেন না যে ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ। তাঁহার উক্তি এই,—'আমি অনুসন্ধান করিতেছি, যখন প্রমাণ পাইব তখন বিশ্বাস করিব। ঈশ্বর যদি "সিদ্ধ" প্রমাণ হন, তবে তাহাই গ্রহণ করিব, এবং যদি "অসিদ্ধ" প্রমাণ হন তবে তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিব!" এইরূপ অবিশ্বাসের ভান করিতে গিয়া জগতের দুই জন মহামনীষী "নাস্তিক" নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছেন। পাঠকদিগের নিকট ঐ দুইটী নাম সুপরিচিত;—এবং উভয়ে "নাস্তিক" বলিয়াও সুপরিচিত। কিন্তু ইহা দৃষ্ট হইবে যে, ইহারাই জগতের কার্য্য-পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অহেতুক কারণ হইতে বিজ্ঞানকে ক্রমে হেতুগত কারণের দিকে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন। ইহারা ব্রহ্মাণ্ডের একজন বিধাতা স্বীকার্য্য না করিয়া,—তাঁহার অস্তিত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া,—কারণ হইতে কারণান্তর প্রত্যবধান পূর্ব্বক একজন বিধাতা সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা আগামী বারের আলোচ্য বিষয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

দেবী, মানবী ও দানবী।

বিজ্ঞান বলেন সকল বস্তুরই শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত আবশ্যকীয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পক্ষে ইহা এক প্রধান সহায়। আজকাল সভ্য জগতে বিজ্ঞানের প্রায় একাধিপত্য বলিলেও চলে। কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনার পদ্ধতি বিজ্ঞানানুমোদিত না হইলে আর রক্ষা নাই। কাজে কাজেই আমার এই সামান্য প্রস্তাবেও বিজ্ঞান প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে হইল। নারী জাতিকে অদ্য আমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম। (১) দেবী, (২) মানবী, (৩) দানবী।

(১) দেবী—যে সব স্ত্রীলোক আত্মহারা হইয়া পরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন; পরোপকার করিতে যাঁহারা এত ব্যস্ত যে আপনার কথা ভাবিবার আসলেই সময় পান না, এরূপ স্ত্রীলোক দেবীশ্রেণীভুক্ত। ইহাঁরা সংসারে থাকেন বটে কিন্তু বস্তুতঃ সংসারী নন। কবির কথায় বলিতে গেলে ইহাঁরা—

"ভূলোক মাঝে দ্যুলোক মেয়ে।"

(২) মানবী—ইহাঁরা পরোপকার করিতে ইচ্ছুক, এবং সুবিধা পাইলে করিয়াও থাকেন বটে কিন্তু আত্মহারা হইতে পারেন না। অনেক সময় আত্মপর ভেদ করেন; পরের ছেলেটীকে ঠিক আপনার মত দেখিতে পারেন না। অন্যের দুঃখে যথেষ্ট কাতর হন বটে কিন্তু অধিকাংশ সময় নিজের স্বামীপুত্র লইয়া ব্যস্ত থাকেন। মানব মনে যে সব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে তাহাদিগকে ইহাঁরা দমনে রাখেন বটে, কিন্তু একেবারে তাহাদের নির্যাতন সাধন করেন না; বা করিতে পারেন না।

(৩) দানবী—যে সব স্ত্রীলোকের মনে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি প্রবলা (যদিও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় নাই), যাঁহারা অনেক সময়েই প্রথমোক্ত প্রবৃত্তিগুলির বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করেন, যাঁহারা নিজে পাপসাগরের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন এবং লোককে সেই দিকে যাইতে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন সেই সব স্ত্রীলোকই এখানে দানবী বলিয়া উক্ত হইলেন।

২। এই মর-জগতে দেবী অবশ্য বড় দুর্ল্লভ। তাহা না হইলে ইহা এতদিন অমর জগত হইয়া যাইত। দুর্ল্লভ হইলেও এই দেবী মূর্ত্তি মনুষ্য-সমাজ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। পাঠকেরা সকলেই জানেন উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ-কলেবরের পুষ্টি সাধন করা রোগ আমার নাই বলি-লেই হয়, নহিলে গুটিকতক দেবী রমণীর উদাহরণ দিতাম। আদর্শ হিন্দু বিধবা এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। ব্রহ্মচর্য্যই তাঁর অবলম্বন, পরের জন্য দেহ-পাতই তাঁর ব্রত, পরোপকার সাধনে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। কিন্তু উপরে বলিয়াছি দেবী রমণী বড় বিরল। এই কথা শুনিয়া হয়ত অনেক স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। তাঁহারা বলেন "হিন্দু সমাজের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাজ আর নাই ও হইতে পারে না। হিন্দু রীতি নীতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রীতিনীতি অসম্ভব, এবং যে দিন পৃথি-

বীর অন্যান্য জাতি হিন্দুদিগের অনুকরণ করিতে শিখিবে সেইদিন পুনরায় সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে। হিন্দু সমাজপদ্ধতি ও রীতি নীতির এক সর্ব্বোত্তম ফল আদর্শ হিন্দু বিধবা ; এবং ঐ পদ্ধতির ও রীতি নীতির প্রধান গৌরব এই যে, উহা বহুল পরিমাণে আদর্শ বিধবা প্রস্তুত করণে বিশেষ সহায়তা করে।" দেশহিতৈষিতার খাতিরে কিন্তু সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ করা যায় না। হিন্দু বিধবার ঢের গুণ তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা দেখান তাহাকেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীর দোষই বলুন আর দুর্ভাগ্যই বলুন ইহাতে খুব ভাল জিনিষের সংখ্যা কম। মানবরূপ-ধারী দেবতা এখানে আছেন বটে, কিন্তু খুব বেশী নাই। আদর্শ হিন্দু বিধবা অবশ্য আছেন, কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু গৃহই যে তাঁহাদের দ্বারা আলোকিত তাহা নয়।

৩। মানবী রমণীই বেশী। সংসার করাই এ জগতে মানুষের প্রধান কাজ। সেই জন্য এথায় সংসারোপযোগী সামগ্রীই অধিক পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই সেই জন্য—

"এত ভাল কিম্বা এত সমুজ্জ্বল নন,
অপারগ প্রাত্যহিক ব্যভারে আসিতে।" *

মানব মনে এমন অনেক প্রবৃত্তি আছে সংসার করিতে যাহাদের সংযমের আবশ্যক, কিন্তু যাহাদের সম্পূর্ণ দমন সংসারের বিরোধী। যে সব লোক সেই সব প্রবৃত্তির নির্যাতন করিতে অক্ষম হইয়াছেন তাঁহারা সংসারাশ্রমের অনুপযুক্ত। সেই অনুপযুক্ততা যে দোষের চিহ্ন তাহা যেন কেহ মনে না করেন। অবস্থাভেদে খুব উৎকৃষ্ট বস্তুও অনাবশ্যক বা অপকারী হইতে পারে। কলিকাতায় বড়বাজারের রাতাবি অনেকেরই মতে খুব উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু একজন রোগীর পক্ষে উহা বিষতুল্য। একজন নিষ্কাম যোগরত ব্যক্তি মানব জাতির এক গৌরবের জিনিষ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া সংসার চলে না। সংসার করিতে হইলে মানবী রমণীই দরকার।

* Not too bright or good
For human nature's daily food'
Wordsworth.

৪। পৃথিবীতে দানবীরও অভাব নাই এবং মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় দানবী না থাকিলেও চলে না। তাহাদের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। স্বভাবের নিয়মই হইতেছে যে বস্তুর আবশ্যক নাই, তাহার ক্রমে লোপ হয়।

৫। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আদর্শ হিন্দুবিধবার সংখ্যা কম। সকল বিধবা দেবী হইয়া উঠিতে পারেন না, দেবী হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। নিজকে সম্পূর্ণরূপ স্বার্থশূন্য করিতে, হৃদয়ের সমস্ত বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে, পরের জন্য মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে যে চেষ্টা, যে একাগ্রতা যে শিক্ষা চাই তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতে পারে না। কাজে কাজেই অনেক হিন্দু বিধবাই মানবী থাকিয়া যান। যতদিন রক্তের জোর থাকে ততদিন বাসনা ও সুখেচ্ছা প্রবল থাকে। কেহ হয়ত বলিবেন চরিতার্থ না হইতে পারিলে উহাদের প্রাবল্য ক্রমে কমিয়া আসে। কমিয়া আসে অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু ঐ কমা যে কত সময় সাপেক্ষ ও কষ্টকর তাহা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন? শরীরধর্ম্ম এবং মনোধর্ম্ম বলিয়া যে দুইটা বস্তু আছে তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। আর একটু কথা আছে। হিন্দু সমাজে বৈধব্য ব্রত পালন করা বড় কঠিন বলিয়া কি কতকগুলি বিধবা দানবীতে পরিণত হন না? সমাজ-শাসনের কঠোরতা হেতু যদি কতকগুলি লোক পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়, তাহার জন্য কি সমাজ দায়ী নয়?

৬। কেহ যেন মনে না করেন আমি বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে এক প্রকাণ্ড প্রস্তাব লিখিতে বসিয়াছি। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অশাস্ত্রীয়তার বিষয় বিচার করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহাদের সহিত তুলনায় আমি কীটানুকীট এরূপ অনেক মহামান্য ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিয়া গিয়াছেন। সমাজের উপকারার্থে তাহার নেতৃবর্গকে দুই একটা কথা বলা, ও তাঁহাদিগকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্র আমার উদ্দেশ্য।

মনে করুন এক সময়ে ১০০ শতটী স্ত্রীলোক বিধবা হইলেন। ইহাঁদের মধ্যে ৫০ জনের বয়স ভাঁটিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার নাই। বাকী ৫০ জনের মধ্যে ধরুন ১০ জন দেবী হইয়া দাঁড়াইলেন, ২৫ জন মানবী রহিয়া গেলেন এবং ১৫ জন দানবী হইয়া পড়িলেন। যদি সমাজে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে হয়ত এরূপ দাঁড়া-

হইতে পারে যে, প্রথম ১০ জনের মধ্যে ৫ জন মাত্র আর বিবাহবন্ধনে বদ্ধ না হইয়া আপনাদিগকে দেবী করিয়া তুলিলেন। বাকী ৫ জন আবার সংসার ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া মানবী রহিয়া গেলেন। কিন্তু ইহাদিগকে আর "হৃদে পুরি বাসনা" মানবী থাকিতে হইল না। মানবীর সমস্ত অধিকারই ইহারা প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে যে ২৫ জন মানবী রহিয়া গিয়াছিলেন পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হওয়ার দরুণ ইহাদের মধ্যে ৫ জন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়া দানবীতে পরিণত হইলেন। বাকী ১০ জন বিবাহ করিতে যাইয়াই হউক বা না যাইয়াই হউক মানবীই রহিয়া গেলেন। অপর দিকে হয়ত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়ার দরুণ শেষোক্ত ১৫ জনের মধ্যে ১০ জনের কোন অবনতি হইল না, তাঁহারা মানবী থাকিতে পাইলেন। দেখা যাউক অনুমানটা কিরূপ দাঁড়াইল। পূর্ব্বে ছিলেন ১০ জন দেবী ২৫ জন মানবী ও ১৫ জন দানবী। এখন হইলেন ৫ জন দেবী, ৩৫ জন মানবী ও ১০ জন দানবী। বিধবাবিবাহ যদি হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয় তাহা হইলে অবস্থা কতকটা এইরূপ দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই দুই অবস্থার মধ্যে কোনটা ভাল ? সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমার বোধ হয় শেষোক্ত অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। দেবী ও মানবীতে যত প্রভেদ, মানবী ও দানবীতে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ ; সুতরাং ৫ জন দেবী কমাইয়া যদি ৫ জন দানবী কমান যায় তাহা হইলে সমাজ বেশী লাভবান হইল। সংসারে মানবীরই বেশী দরকার এবং তাঁহাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই সমাজের মঙ্গল। দানবী সংখ্যা কমাতে যদি কাহারও ভয় হয় তাঁহাকে আমরা অভয় দিতেছি। দানবী দল কমিয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহা উঠিয়া যাইবার এখনও ঢের দেরী। কলির কয়দিন আর সমাজের তেমন অবস্থা হইতেছে না।

৭। কিন্তু গুটিকতক কথা আছে। অনেক মান্যার্হ লোক আজ কাল বলিতেছেন "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। কথাটা খুব উচ্চ তার আর সংশয় নাই ! কিন্তু ইহার প্রয়োগের বিষয়ে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। যেরূপ দেখিতে পাই অনেকে গরীব বিধবাদের উপর ইহা প্রয়োগ করিয়াই যথেষ্ট হইল মনে করেন। বোধ হয়, শুধু নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কেন সকল প্রবৃত্তিরই আধিক্য দোষের। এমন যে দয়া তাহাও অপরিমিত হইয়া পড়িলে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক করে। সকল প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যই যথার্থ উন্নতি

এবং তাহাই মানুষের গৌরব। সভ্য ও অসভ্য মানুষের প্রধান প্রভেদই এই যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সংযমী ও দ্বিতীয় অসংযমী। শাস্ত্রকার যখন নিবৃত্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না যে সমস্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিগ্রহ করিতেই হইবেক। অনেকগুলি প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে সংসার উঠিয়া যাইবে। সংসার উঠিয়া গেলে সকল আপদ চুকিয়া যাইবেক বটে, কিন্তু পুরাকালে বোধ হয় মানুষের মনে একথা উদয় হয় নাই। যদি "নিবৃত্তির" অর্থ বিরতি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে হিন্দুবিধবা ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি এই বাক্য প্রয়োগে কি কিছু বাধা আছে? যখন ৪৫ বৎসরের এক প্রৌঢ় ব্যক্তি কিম্বা ৫৫ বৎসর বয়সের একজন বৃদ্ধ বিবাহের জন্য ক্ষেপিয়া উঠেন তখন এই বাক্য কোথায় থাকে? পুরুষেরাই সমাজের নিয়ন্তা। ঐ মহাবাক্যের উপকারিতা যদি তাঁহারা এতই উপলব্ধি করিয়া থাকেন নিজেরাই উহার অনুসারে কাজ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন? ৫৫ বৎসরের বৃদ্ধের সম্বন্ধে যে কথা আদৌ উঠে না, ১৫ বৎসরের বালবিধবা অথবা ২৫ বৎসরের যুবতী বিধবার সম্বন্ধে সে কথা উঠে কেন? ইহাতে কি একটু স্বার্থপরতার আমেজ নাই? স্বেচ্ছাচারী বাবুরা যখন বিধবাদিগকে নিবৃত্তির উপদেশ দিতে বসেন, আমার মনে হয়, "আহা! আপনার বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা।" একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কোন বিধবা যদি বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি যে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়াই সে ইচ্ছা করিতেছেন তাহা কি করিয়া স্থির হইতে পারে? নিত্যধামের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের এই অনিত্যধামে সংসার করা যে নরনারীর প্রধান কাজ তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সংসার করিতে না পাইলে অনেক সময় তাঁহাদের পূর্ণতা সাধন হয় না। মনের একটা ক্ষুধা, হৃদয়ের একটা আকাজ্ক্ষা থাকিয়া যায়। সমাজস্থ যত অধিক লোকের পূর্ণতা সাধিত হয় এবং ক্ষুধা ও আকাজ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় সমাজের ততই মঙ্গল। আর একটু কথা আছে। নিকৃষ্টবৃত্তিগুলাকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা কিছু নয়। উহাতে সমাজের অপকারই সাধিত হয়। পাপস্রোত বৃদ্ধি পায় মাত্র। যখন দেশে বহুলপরিমাণে শাস্ত্রালোচনা হেতু নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলা উঠিয়া যাইবে তখন আর উহাদের কথা ভাবিবার দরকার হইবে না; কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন উহাদের নিয়ন্ত্রিত চরিতার্থতার আবশ্যক।

৮। কেহ কেহ বলেন বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুন, তাঁহাদের আর সংসারের পাপহ্রদে ডুবিবার দরকার কি? ব্রহ্মচর্য্য কঠিন কিন্তু যত পালন করা যায় তত সহজ হয়। একজন বালবিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বলা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যিনি সংসারকে পাপ-হ্রদ বলিয়া বোধ করেন, তাঁর নিশ্চয় বিশ্বাস বিধবারা বড় ভাগ্যবতী, অতি সহজেই তাঁহারা হ্রদের অপরপারে গিয়া উঠিয়াছেন, এবং যিনি যত শীঘ্র বিধবা হইতে পারিয়াছেন তিনি তত অধিক ভাগ্যবতী। ভাবটা একটু নূতন বটে। ব্রহ্মচর্য্য-পক্ষপাতী ও পাপ-হ্রদবাদীদিগকে আমি একটা কথা বলিতে চাই—ভাই সকল, ব্রহ্মচর্য্য যখন এত উৎকৃষ্ট জিনিষ ও ক্রমে যখন সহজসাধ্য হইয়া পড়ে, এবং সংসার যখন পাপহ্রদ, আসুন আমরা বিবাহরূপ বীভৎস ব্যাপারটা তুলিয়া দিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে ও ডঙ্কা বাজাইয়া সংসার হ্রদের অপর পারে যাইতে বদ্ধপরিকর হই। আমরা সফল হইলে অনেক দুর্ব্বলহৃদয়া স্ত্রীলোক আমাদের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

৯। "বিধবা স্বার্থত্যাগ করিয়া পরের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করুন" কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন। হুকুমটী যত সহজ, তামিলটী তত সহজ বলিয়া বোধ হয় না। বয়োধিকা বিধবারা কিয়ৎ পরিমাণে আত্মীয় স্বজনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকল বিধবাই যে বয়োধিকা তাহা বোধ হয় না। অনেকে এমন বয়সে বিধবা হন যে, তাঁহাদের নিস্বার্থ ব্রত পালন করা দূরে থাকুক, তাহা বুঝিবারই ক্ষমতা হয় না। তাঁহাদের কি কিছু উপায় করা দরকার নয়? যাহারা পূর্ব্বোক্তরূপ পরামর্শ বা আজ্ঞা দেন, তাঁহারা যদি উহা পালন করিবার একটা উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। একজন লোককে একটা নূতন পথ দেখাইবার পূর্ব্বে সে পথে সে গমনক্ষম কি না, তাহা একবার দেখিতে পারিলে ভাল হয়। একজন বালবিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বলা যেমন নিষ্ঠুরতা, স্বার্থত্যাগ করিয়া পরের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে বলা তাহার অপেক্ষা কম নিষ্ঠুরতা নয়। স্বার্থত্যাগ যদি এতই ভাল ও সহজ হয় আমরা নিজে কেন তাহা একবার করিয়া দেখিনা? "পরোপকারায় হি সতাং জীবনং" এই মহাবাক্যের সার্থকতা করিতে অগ্রসর হওয়া কি দৃঢ়মনা পুরুষদের উচিত

নয়? কিম্বা তাঁহারা হয়ত মনে করেন, পরের হস্তদ্বারা ভাল্লুকের লাঙ্গুল ধরানই ভাল।

১০। শুনিতে পাই নাকি হিন্দুস্ত্রীর স্বামী "একমেবাদ্বিতীয়ং", এবং যতই ছোট হউন না কেন হিন্দু বিধবা কখন পতিকে ভুলিতে পারেন না। আমি অন্তর্যামী নই, সুতরাং এ সকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা আমার দ্বারা সম্ভবে না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, কার্য্যতঃ সকল বিধবা স্বামী সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না, এবং স্বামীর চিত্রপট যে তাঁহাদের মন হইতে অপনীত হইতে পারে না, তাহার বাহ্যিক চিহ্ন সব সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদীদের কথার হয়ত আমি কূট অর্থ করিতেছি। ইহার বোধ হয় প্রশস্ত অর্থ এই যে, হিন্দু স্বামী "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হওয়া উচিত এবং হিন্দু বিধবার মৃত স্বামীকে ভুলা উচিত নয়! এ স্থলে বক্তব্য এই যে, যদি কেহ এই অদ্বৈতবাদ স্বীকার না করেন এবং মৃত স্বামীকে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে কি হইবেক? তুষানল আজ কাল চলে না, এবং ঐরূপ স্ত্রীলোককে ঘোর পাপীয়সী বলিয়া ছাড়িয়া দিলেই সমাজের কার্য্য স্থির হইল না। পাপীয়সী বলিয়া ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে ইহাও দেখা উচিত, একজন ১৫ বৎসরের বালিকা ৫ বৎসর পূর্ব্বে মৃত প্রায় অজানিত স্বামীকে যদিও ভুলিয়া যায়, বস্তুতঃ তাহার কোন পাপ সঞ্চয় হয় কি না। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

"পুরুষ দুদিন পরে, আবার বিবাহ করে;
অবলা রমণী বলে এতই কি সয়রে।"

১১। কোন কোন মনীষী বলেন, বিবাহ আত্মায় আত্মায় এবং আত্মা অবিনশ্বর, অতএব একবার বিবাহ হইলে আর তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না। এই নিয়ম যদি স্ত্রীলোকের বেলায় খাটে, তবে পুরুষের বেলায় খাটেনা কেন? অথবা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই মূর্খতা। স্ত্রী-আত্মারই বহুবিবাহ নিষেধ, হিন্দু পুরুষের আত্মার পক্ষে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ বস্তু নয়, বরং অনেক স্থলে তাহা না করিলেই মহাপাপ। আত্মা লইয়া আমরা অনেক সময় এমন বিভোর হইয়া পড়ি যে, মানুষের যে শরীর আছে তাহা ভুলিয়া যাই, এবং শরীরধর্ম্ম অনেক সময় যে খুব প্রবল তাহা স্বীকার করি না। পোড়া শরীরটা না থাকিলে ভাল হইত বটে কিন্তু এখন আর উপায় কি? শরীরটা ফেলিয়া দেওয়া যায়, এরূপ কোন বন্দোবস্ত অদ্যাবধি হয় নাই। যতদিন

শরীরটা বাদ দিবার উপায় উদ্ভাবিত না হইতেছে, ততদিন যতই উর্দ্ধে উঠনা কেন সর্ব্বদাই আমাদিগকে মাটীতে আসিয়া পড়িতে হইবেক।

১২। শুনিতে পাই বিধবার বিবাহ দিলে হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকিবেনা। এ বড় গুরুতর কথা। যাহাতে লোকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন এমন কাজ করিতে কেহ তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে পারে না, এবং এরূপ অনুরোধ করা উচিতও নয়। আমার মনে এ সম্বন্ধে কিন্তু একটু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুয়ানি কাহাকে বলে? কেহ কি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন হিন্দুয়ানি কি? অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, হিন্দুয়ানির সংজ্ঞা কোথাও পাই নাই। আমি যাহাকে হিন্দুয়ানি বলি আর একজন তাহাকে হিন্দুয়ানি বলেন না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুয়ানি জ্ঞান পশ্চিম বঙ্গের জ্ঞানের সঙ্গে ঠিক মিলেনা। বিহারি হিন্দুয়ানি সকল সময় বঙ্গীয় হিন্দুয়ানি নয়। বঙ্গীয় হিন্দুয়ানি পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুয়ানি হইতে অনেক বিভিন্ন। আমার বিবেচনায় আমাদের দেশের ধুরন্ধরেরা যদি কি কি হিন্দুয়ানি ও কি কি হিন্দুয়ানি নয় (কিম্বা একটা করিলে অপরটা করা হইবে) তাহার একটা তালিকা করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশের যে কি প্রভূত উপকার সাধন করা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জিনিষটা এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, উহা বজায় রাখিতে হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে ঐরূপ একটা তালিকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কেহ হয়ত বলিবেন বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়। হিন্দুশাস্ত্রত সমুদ্রতীরস্থ বালুকা-কণার ন্যায় অসংখ্য। কোনগুলি মানিতে হইবেক, কোনগুলি মানা স্বেচ্ছাধীন, ও কোনগুলি না মানিলে চলিতে পারে তাহার মীমাংসা কে করিবে? প্রাণ খুলিয়া সরলভাবে সকল কথা বলিতেছি বলিয়া হয়ত কোন ধর্ম্ম-প্রাণ বীরপুরুষ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবেন,—অথবা আমার সে ভয় মিছা। আমার লেখা তাঁহাদের গোচরে আসিবারই সম্ভাবনা নাই। যদিই বা বিধবাবিবাহের হিন্দুয়ানি প্রতিবন্ধকতা ও সম্পূর্ণরূপ অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণীকৃত হয় তাহা হইলেও আমার দুইটী বক্তব্য আছে:—১। যখন আমরা শাস্ত্রের অধিকাংশ শাসন অমান্য করিয়া চলিতেছি, তখন দুই একটা অধিক অমান্য করিলে আর বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবেক না। তাহা বোঝার উপর শাক আটিটা হইবেক মাত্র। ২। যদি সমস্ত বিষয়েই

আমাদিগকে শাস্ত্রানুযায়ী চলিতে হইবেক, দেশ কাল পাত্র ভেদে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না, তাহা হইলে যুক্তি ও হিতাহিত জ্ঞানের আর আবশ্যক কি? উহারা কেবল ভার মাত্র; সুধু তাহা নয়, উহারা ধর্ম্মপথের কণ্টক ভিন্ন আর কিছুই নয়। মানব হৃদয় হইতে যত শীঘ্র উহারা উৎপাটিত হয়, ততই তাহাদের ও সমাজের মঙ্গল। এত দিনের পর বাইবেলোক্ত জ্ঞানবৃক্ষের অসারতার কথা পরিষ্কার রূপে বুঝা গেল। যুক্তি ও বিবেকের আদ্যকৃত্য সমাপন করিয়া মানুষ যদি ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারিত, তাহা হইলে সংসার আজ কি সুখের হইত? কোন ঝঞ্ঝাট থাকিত না। দ্বিধাশূন্য হইয়া নরনারী বৃন্দ শাস্ত্রশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজেদের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিত। বস্তুতঃ বিধবাবিবাহসংক্রান্ত দুই চারিটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার যুক্তির অযৌক্তিকত্ব ও বিবেকের অবিবেকত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইয়াছে। এত দিন জ্ঞানরূপ আলোকের কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু উহা যে অন্ধকার তাহা আমার এখন প্রতীতি হইয়াছে। পাঠক আজি হইতে জ্ঞানালোক না বলিয়া জ্ঞানান্ধকার বলিতে অভ্যাস করুন।

১৩। একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন, হিন্দু সাম্যবাদী নন। স্ত্রী পুরুষের সাম্য তিনি স্বীকার করেন না। স্ত্রী যদি পুরুষের সমান না হইল, তাহা হইলে পুরুষ যেরূপ ভাবে চলে স্ত্রীলোককে কখনও সেরূপ ভাবে চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য স্ত্রীলোকের তাহা কর্ত্তব্য হইতে পারে না। পুরুষকে যে স্বাধীনতা দেওয়া যায় স্ত্রীলোককে সে স্বাধীনতা দিলে আর পার্থক্য কি রহিল? মহাকবি মিল্‌টনের স্ত্রীজাতির প্রতি মনের ভাব সমালোচনা করিতে গিয়া বৃদ্ধ জন্‌সন্ বলিয়াছিলেন "মিল্-টনের বিশ্বাস ছিল স্ত্রীলোক কেবল বশ্যতার জন্য ও পুরুষ কেবল বিদ্রোহের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাসও ঐরূপ বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীলোক পুরুষের সমকক্ষ কি না সে জটিল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিবার আমাদের দরকার নাই। এই মাত্র বলিতে চাই যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী বলিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠতার ও ক্ষমতার কি এইরূপ ব্যবহার করা উচিত? স্ত্রীজাতি আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া তাহাদিগকে যে বিধিমতে নিগৃহীত করিতে হইবে ইহা রাজনীতি সম্মত হইতে পারে, কিন্তু নীতিসম্মত নয়। হিন্দু পুরুষ কি নিজের ক্ষমতা

অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই স্ত্রীলোকের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন? হইতে পারে, কারণ মানুষ স্বভাবতঃ ক্ষমতাপ্রিয়, এবং রমণী ব্যতীত হিন্দু পুরুষের ক্ষমতা প্রয়োগের আর লোকও নাই। কিন্তু আশ্রিতের উপর অত্যাচার করিয়া অধঃপতিত হিন্দু যে আরও অধঃপাতে যাইতেছেন, তাহা কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন না। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

"দেখ রে দুর্ম্মতি যত চিরম্লেচ্ছপদানত।
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে॥"

১৪। "হিন্দু কন্যার এক জনের সহিত বিবাহ নয়, এক পরিবারের সহিত বিবাহ। অতএব স্বামী মরিলেও কুলত্যাগ তাহার পক্ষে অসম্ভব, করিলেই অধর্ম্ম।" দেশের একজন প্রধান বিদ্বান লোককে এই যুক্তি অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। যুক্তিটার একটু নূতনত্ব আছে। কিন্তু ইহা হৃদয়-বিহীন এবং অর্থশূন্য। ইহা ন্যায়ের ফাঁকি, একটা গুরুতর সামাজিক প্রশ্নের উত্তর নয়। মানবহৃদয় ও মনবিশিষ্টা একজন বালবিধবাকে এই যুক্তি দ্বারা নিরস্ত করা যায় না। একজন সহৃদয় ব্যক্তির কাছে ইহার কোন মূল্য নাই। ইহা একটা পুরাতন প্রথা বজায় রাখিবার চেষ্টার ফাঁদ পাতা মাত্র। ধরিয়া লইলাম কুলত্যাগে হিন্দু কন্যার অধর্ম্ম হয়, কিন্তু একজন সমাজতত্ত্ববিদের জানা উচিত যে, অধর্ম্মের ক্রম আছে এবং একটা উচ্চতর অধর্ম্ম নিবারণ করিবার জন্য অনেক সময় একটা নিম্নতর অধর্ম্ম প্রচলিত করা সমাজতত্ত্বের অনুমোদিত।

১৫। হইতে পারে, আমরা যে সব কথা বলিলাম তাহা বস্তুতঃ অন্তঃসারবিহীন, এবং পুরাতন রীতি নীতির গোঁড়ারা যাহা বলেন তাহাই ঠিক। আমরাই নির্ব্বোধ, এবং তাঁহারাই বুদ্ধিমান। কিন্তু ইহার প্রমাণ দরকার। তাঁহারা বলেন যাহা পুরাতন তাহাই ভাল, এবং সমাজ রক্ষা করিতে হইলে রক্ষণশীল হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। আমরা বলি পুরাতন হইলেই যে ভাল হইবে তাহা নয়, পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম এবং কোন জিনিষকে সময়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহার অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন ও মেরামত আবশ্যক। সংস্কার ভিন্ন রক্ষণ অসম্ভব। কেহ যেন না মনে করেন আমরা সমাজ বিপ্লব সাধন করিতে উদ্যত। জোর করিয়া যে অন্তঃর্জ্জলীকৃত অশীতি-বর্ষীয়া বিধবা হইতে কুসুমকোমলা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালবিধবা পর্য্যন্ত

সকলেরই বিবাহ দিতে হইবে, তাহা আমরা বলি না। তবে আমরা জবরদস্তি বৈধব্যের পক্ষপাতী নই—

"বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারীবধ করে তুষ্ট করে দেশাচার।"

এরূপ প্রথার আমরা বিরোধী। কেহ যদি ভয় করেন একাদশী ও সাদা ধুতি দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে, তাঁহাকে আমরা অভয় দিতেছি। যে সব দেশে জবরদস্তি বৈধব্য প্রথা নাই, সে সব দেশেও অনেক বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহের কথা মনে আনা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও ভাবে না। আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে যে, ইহার উল্টা হইবেক তাহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। আর এক কথা; বিবাহে দুই পক্ষ চাই; বিধবা স্ত্রীলোক বহুল পরিমাণে রাজী হইলেও বিধবা বিবাহ করণেচ্ছু পুরুষ যে বহুল পরিমাণে মিলিবে তাহা কে বলিল? আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, জোর করিয়া বৈধব্য প্রথা প্রচলিত রাখিবার কোন দরকার নাই, ইহাতে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইতেছে।

১৬। এ প্রবন্ধে যে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা হইল তাহা নয়। তাহা করাও ইহার উদ্দেশ্য নয়। যে প্রশ্নের আলোচনায় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জীবনের কিয়দংশ ক্ষয় করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার, বীরেশ্বর পাঁড়ে* প্রভৃতির ন্যায় মহারথিগণ যে সম্বন্ধে তাঁহাদের ক্ষমতাশালী লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে মাদৃশ ব্যক্তির কিছু বলা না বলায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু আজ কালকার ভণ্ডামি ও "আর্য্যামি" অনেক সময় অসহ্য হইয়া উঠে; সেই জন্যই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া ফেলিলাম। যদি কিছু ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, সহৃদয় পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। দ।

---

* "সাবিত্রী" দেখুন।

পলাশ-বন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তি যে পলাশবনের ন্যায় একটী গ্রাম সমুজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহা আমি কেন, অনেক ব্যক্তিই জানিতেন না। ইহার একটী কারণও ছিল। গোস্বামী মহাশয় পলাশ-বনের আদিম নিবাসী নহেন; ইনি সবে দুই তিন বৎসর মাত্র পলাশবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে ইঁহার পৈত্রিক বাসস্থান ছিল। কিন্তু হুগলী জেলায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, রোগযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়, ইনি পলাশবনে আসিয়া সপরিবারে এক শিষ্যের বাটীতে কিয়দ্দিন বাস করেন। দরিদ্র শিষ্যের বাটীতে বহুদিন থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া ইনি এই গ্রামে একটী স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত করেন। পলাশবনে অবস্থানকালে ইঁহার উন্নত ধর্ম্মজীবন ও উদারচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া প্রায় গ্রামসুদ্ধ লোকই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং তাহাদেরই সবিশেষ অনুরোধ ক্রমে ইনি পলাশবনেই বসবাস করিবার সঙ্কল্প করেন। সঙ্কল্পানুসারে ইনি স্বদেশের বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে পলাশবনে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং তাহার উপসত্বেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মসেবায় নিযুক্ত হন।

আমার গৃহনির্ম্মাণ কালে তাহার পর্য্যবেক্ষণের জন্য, পিতৃদেব প্রায়ই পলাশবনে গমনাগমন করিতেন। এইরূপ দুই চারিবার গতায়াত করিতে করিতে তিনি গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন। আমি যে দিন পলাশবনে গৃহ দেখিতে প্রথম আসিলাম, সেই দিন পিতৃদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আমি যে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, তাহা পলাশবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শুনিয়াছিল, সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আমার আর নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন হইল না। আমরা সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত

হইয়া দেখিলাম, তাঁহার বহির্ব্বাটীর সংলগ্ন বৃহৎ আটচালাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্রামবাসিনী বর্ষীয়সীরাও সেখানে একত্র হইয়াছেন। খোল, করতাল ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্র সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই লোকারণ্যের মধ্যে একটী উচ্চ বেদী; বেদীটি নানাবিধ পুষ্পে সুসজ্জিত এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেরই গলদেশে এক একটী পুষ্পমালা লম্বিত। বেদীর উপর একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে একটী ধর্ম্মগ্রন্থ চন্দনচর্চ্চিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা সেই গৃহে প্রবেশ করিলে, পিতৃদেবকে দেখিবামাত্র সকলে প্রণাম করিল এবং ইঙ্গিতে আমার পরিচয় পাইয়া আমাকেও অভিবাদন করিল। আমি উপবিষ্ট হইলে, দেখিলাম সভাস্থ সকলেই কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। পিতা আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে 'গোস্বামী মহাশয় কোথায়' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ব্যক্তি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, গোস্বামী মহাশয় আটচালা গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল; পরে তিনি উপবিষ্ট হইলে, সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। গোস্বামী মহাশয় পিতৃদেবকে দেখিয়া প্রসন্নমুখে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং পরিচয় পাইয়া আমারও যথোচিত সমাদর করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের বিবরণ শুনিয়া ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার সৌম্য ও প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়া সহজেই সেই ভক্তির উদয় হইল। আমাকে দেখিয়া তিনি অতিশয় সুখী হইয়াছেন, আমি পলাশবনে বাস করিলে গ্রামবাসী সকলেই যার পর নাই আনন্দিত ও উপকৃত হইবে এবং আমার সঙ্কল্প যে সাধু এবং আজিকালিকার দিনে কিছু আশ্চর্য্যেরও বিষয়, এই সম্বন্ধে পিতৃদেবের সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া তিনি বেদীতে উপবেশপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাঠারম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইল। গয়ারাম ঘোষ নামক জনৈক প্রবীণ গ্রামবাসী গায়কদলের নেতা হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভক্তিরসের মধুর স্রোত ছুটাইলেন। আমি অনেক সুগায়কের মধুময় কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু গয়ারাম ঘোষের তানলয়হীন ভক্তিমিশ্রিত আড়ম্বরশূন্য সরল হরি-সঙ্কীর্ত্তনে আমার অন্তরাত্মা যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিল, এরূপ পরিতৃপ্তি আমি বহুকাল অনুভব করি নাই।

সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে পল্লীর বালকবালিকারা দলে দলে সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, গোস্বামী মহাশয়ের অন্তঃপুর হইতেও দুইটী বালিকা ও একটী বালক আসিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইল। বালকটি সর্ব্বকনিষ্ঠ। আকার প্রকারে বুঝিলাম, ইহারা গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যা। ইহাদের সকলেই শান্তমূর্ত্তি, সুশ্রী ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন। ইহাদের সকলেরই মুখমণ্ডলে মাধুর্য্য ও পবিত্রতাব্যঞ্জক কেমন একটী দিব্য লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছিল। সে লাবণ্যের এরূপ আকর্ষণী শক্তি যে, একবার তাহাতে চক্ষু পড়িলে, সহজে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। চক্ষু যেন সেই লাবণ্যসুধা অবিতৃপ্তরূপে পান করিতে থাকে। আমি প্রাণস্পর্শী মধুর হরি-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে দেবতার ন্যায় সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন সেই বালকবালিকাগুলিকে দেখিয়া মনোমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন পাপ-কোলাহলময় সংসারক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন্ এক দেবরাজ্যে আসিয়াছি। মুহূর্ত্তমধ্যে এই স্থূল জড়দেহ যেন পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল; অশরীরী লঘু আত্মা যেন বন্ধনমুক্ত হইয়া, নভোমণ্ডলে কোনও জ্যোতিষ্কের ন্যায় সেই সঙ্গীতোদ্দীপিত ভাবরাশির মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক কথায়, কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব মহাসঙ্গীতের সহিত আমার আত্মার গভীর সঙ্গীত যেন মিলিত হইয়া গেল এবং আমিও যেন স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কিয়ৎক্ষণপরে সঙ্গীত নিবৃত্ত এবং সভাস্থল নীরব হইল; কিন্তু আমার আত্মার মধ্যে যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার হইতেছিল, তাহার আর নিবৃত্তি হইল না; গোস্বামী মহাশয় যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না ও সেই সভাস্থ কোন ব্যক্তিই আমার চক্ষুতে প্রতিভাত হইল না। আমি এক অনির্ব্বচনীয় মহাভাবে নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলাম। কতক্ষণ এইভাবে নিমগ্ন ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। তবে তাহা যে বহুক্ষণ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গোস্বামী মহাশয় সে রাত্রির মত ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সকলে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পিতৃদেব আমার গাত্র-স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "দেবু, তোমার কি নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে? রাত্রি অধিক হইয়া থাকিবে; চল, অদ্যকার মত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট

বিদায় লইয়া গৃহে গমন করা যাউক।" এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন; আমিও তাঁহার কথায় সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সহসা দণ্ডায়মান হইলাম। তৎপরে উভয়ে গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। গ্রামস্থ ব্যক্তিরাও একে একে গৃহে গমন করিতেছিল; কেহ কেহ আমাদের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া আবার গৃহে প্রত্যাগত হইল। আমরা পিতা পুত্রে আরণ্যপথ বাহিয়া চলিতে লাগিলাম।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। জ্যোৎস্নালোকে আরণ্য রাজপথ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছিল। পথের উভয়পার্শ্ববর্ত্তী শালবনের মনোহারিণী শোভা নয়নযুগলের তৃপ্তি সাধন করিতেছিল। বৃক্ষরাজী নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান থাকায় বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা সুধাকরের সুধাংশুরাশি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পূর্ণ তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করিতেছে; যেন তাহাদেরও সরস হৃদয় মধ্যে এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের ঝঙ্কার হইতেছে। নীরব আরণ্য-পথে বনের এই বিচিত্র ভাব ও শোভা দেখিতে দেখিতে স্বপ্নাবিষ্টচিত্তে পিতৃদেবের সহিত চলিতে লাগিলাম। সহসা তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দেবু, গোস্বামী মহাশয়কে দেখিয়া তোমার মনে কি হইল?"

আমি বলিলাম—"গোস্বামী মহাশয়কে মহাত্মা ব্যক্তি বলিয়াই আমার মনে হইল। এরূপ ব্যক্তির নিকটে থাকিতে পাইব বলিয়া আমি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।"

পিতৃদেব বলিলেন—"গোস্বামী মহাশয় সম্বন্ধে আমারও ঐরূপ মত বটে। তুমি কি তাঁহার ছেলে মেয়েগুলিকে দেখিয়াছিলে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ ছেলে মেয়েগুলিকে? যা'রা তাঁ'র দক্ষিণ দিকে ব'সে ছিল, তারাই কি?"

পিতৃদেব বলিলেন—"হাঁ, তারাই বটে।"

আমি বলিলাম—"বেশ, ছেলেমেয়েগুলি।"

পিতৃদেব নীরব হইলেন; আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। আমিও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার ভয় হইতেছিল, ভাগবতের যে বিষয় অদ্য ব্যাখ্যাত হইতেছিল, পাছে তাহারই সম্বন্ধে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলেন। সে রাত্রিতে কি বিষয় পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা আমি আদৌ জানিতাম না। যাহা হউক, পিতৃদেব নীরব হইলে

আমার চিন্তাস্রোত কি জানি কেন গোস্বামী মহাশয়ের সেই ছেলেমেয়ে-গুলির দিকেই প্রধাবিত হইল। সেই সুন্দর মুখগুলি আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। তন্মধ্যে একখানি মুখ কেমন সুন্দর ও পবিত্র! যেন সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য; যেন পবিত্রতার মধ্যেও পবিত্রতা! কি জানি কেন আমার অজ্ঞাতসারে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে, একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পলাশবনে আসিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে গ্রামস্থ সকল ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলাম। আমার নূতন গৃহে প্রথম কতিপয় দিবস প্রায় প্রত্যহই বহু লোকের সমাগম হইত। কিন্তু সকলের সহিত পরিচয়কার্য্য সমাপ্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে লোকসংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল। গ্রামবাসী অধি-কাংশ ব্যক্তিকেই কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। আমার মত নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তি গ্রামে অত্যল্পই ছিল। সুতরাং আমার নিকটে আসিয়া সময় নষ্ট করিবার অবসর কাহারই ছিল না। কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিরা দিবসের অধিকাংশ ভাগ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত; কেবল সন্ধ্যার পর তাহাদের কিছু অবকাশ হইত। এই অবকাশ সময়টি তাহারা সাধারণ আটচালা গৃহে গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণে অতিবাহিত করিত। আমিও হরিসঙ্কীর্ত্তন ও তত্ত্বকথা শুনিবার আশায় প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হইতাম।

গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র কন্যাগুলিকে প্রতিদিন বেদীর দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতাম। জ্যেষ্ঠা কন্যাটির বয়ঃক্রম অনুমান ত্রয়োদশ বর্ষ হইবে। শুনিলাম কন্যাটির তখনও বিবাহ হয় নাই! কন্যার উপযুক্ত পাত্র স্থিরীকৃত হয় নাই বলিয়াই বিবাহ হয় নাই; নতুবা অনেকদিন বিবাহ হইয়া যাইত। গোস্বামী মহাশয় পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করায় যোগ্য পাত্র সন্ধানের পক্ষে কিছু বিলম্ব ও অসুবিধা ঘটিতেছিল। সহস্র চেষ্টাতেও পশ্চিম বঙ্গের আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে একটীও উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় নাই। অযোগ্য পাত্রে কন্যাদান করা অপেক্ষা কন্যার আরও দুই এক বৎসর অনূঢ়া থাকা ভাল, শুনিলাম গোস্বামী মহাশয়ের ইহাই মত। গয়া-

রাম ঘোষের মুখে গোস্বামী মহাশয়ের এই মত শুনিয়া আমি একটু বিস্মিত হইলাম। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যভাব বর্জ্জিত জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যে এরূপ মত হইতে পারে, ইহা আমার নিকট কিছু অভিনব ও বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল।

আমি যাহাতে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকি, তদ্বিষয়ে গ্রামবাসী ব্যক্তিরা যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিল। কেশব ঘোষ নামে একটী পিতৃমাতৃহীন কৃষক যুবা আমার একান্ত অনুগত হইল। তাহার ভূসম্পত্তি কিছুই না থাকায় সে দৈহিকপরিশ্রম-লব্ধ অর্থ দ্বারা কোনও প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। তাহার পবিত্র স্বভাবের জন্য গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাকে ভাল বাসিত। আমিও কেশবের দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ ও সরল সানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া বড় প্রীত হইতাম। তাহাকে আমার নিকটে রাখিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহার উপযুক্ত মাসিক বর্ত্তন স্থির করিয়া তাহাকে আমার গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।

আমার আবার গৃহকার্য্য কি, তাহা হয়ত পাঠকবর্গের জানিতে কৌতূহল হইয়া থাকিবে। গৃহকার্য্য আর কি? গৃহটিকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা, আমার পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্যগুলির যত্ন করা এবং আমার অনুপস্থিতিতে গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করা। কেশবের ইহাই গৃহকার্য্য ছিল। জননীর অনুরোধে আমি বাটীতেই আহার ও শয়ন করিতাম। আমি যে জঙ্গলের মধ্যে, গ্রামের বহির্ভাগে, একমাত্র লোকের সহবাসে ও এক জনশূন্য গৃহে বাস করিয়া থাকিব, এ প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার মনে অনর্থক কষ্ট দেওয়াও আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না। সুতরাং আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পলাশবনে আগমন করিতাম এবং কেশবের নিকট বিগত নিশার সংবাদাদি শুনিয়া ভ্রমণ জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইতাম। ভ্রমণের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দিক্ ছিল না। কিন্তু আমি সচরাচর সর্ব্বাগ্রে গৃহের উত্তরদিকস্থ সেই কৃষ্ণ শৈলের নিকট উপস্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিতাম এবং সেই উচ্চস্থান হইতে একবার চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিয়া লইতাম। নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে নয়ন মন কিয়ৎপরিমাণে পরিতৃপ্ত হইলে, আমি যমুনাতটিনীর বক্রগতি ধরিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্যের নানাস্থানে উপস্থিত হইতাম এবং প্রকৃতির ভীষণ ও মধুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইতাম।

প্রথমে যমুনায় অনুসরণ করিতে করিতে আমি আমার বাটীর পশ্চিম দিক্‌স্থ বনের মধ্যে প্রবেশ করিতাম, পরে গৃহের দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতাম। সেই দিকে যমুনাতটবর্ত্তী উর্ব্বর শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে উপনীত হইতাম। তৎপরে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গোস্বামী মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া নিজ কুটীরে উপনীত হইতাম। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নান ও কিছু ভক্ষণ করিয়া পাঠগৃহে প্রবেশ করিতাম। সেখানে ইচ্ছামত পাঠাদি সমাপন করিয়া বাটীতে আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতাম। অপরাহ্ন সময়ে আবার আমি পলাশবনে আসিয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতাম এবং সন্ধ্যার পর আটচালায় হরিসঙ্কীর্ত্তন ও গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আবার বাটীতে প্রত্যাগত হইতাম। গৃহ পর্য্যন্ত প্রায়ই কেহ সঙ্গে যাইত। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কোন লোকেরই প্রয়োজন হইত না; তবে অন্ধকার হইলে, একটা আলোকের আবশ্যকতা অনুভব করিতাম। সেই সময়ে জননী দেবী বাটীর ভৃত্যকে আলোকসহ পলাশবনে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু নিজের লোক কেহ সঙ্গে না থাকিলেও পথে লোকের বড় একটা অভাব হইত না। গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে ভক্তেরা প্রত্যহই পলাশবনে উপস্থিত হইত।

জননীদেবী একদিন পলাশবনে আসিয়া আমার গৃহ দেখিয়া গেলেন। গৃহ ও স্থানটি দেখিয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা আসিয়া জননীর সহিত পরিচিত হইল। গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী জননীর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। আমারও সেইদিন গোস্বামী মহাশয়ের গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ হইল। জননীদেবী সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। আমিও যথা-সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইলাম। জননীদেবী পলাশবনে সেই দিবস যাপন করিয়া যারপর নাই পুলকিত হইয়া থাকিবেন; যেহেতু তিনি পুনঃ পুনঃ সেই স্থানের গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের এবং সর্ব্বোপরি গোস্বামীপত্নী ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্তদের উল্লেখ করিয়া তিনি প্রতিবাসিনী বগলাপিশীকে বলিতে লাগিলেন,

"যেমন মা, তেমনি ছেলেমেয়েগুলি! যেমন মুখের গড়ন ও শ্রী, তেমনি স্বভাব,—আহা, কেমন শান্ত, শিষ্ট, সদানন্দ! দেখ্‌লে, চোখ

জুড়োয়। আমি যতক্ষণ ছিলুম, ছেলেটি আর মেয়ে দুটি এক দণ্ডের তরেও আমার কাছছাড়া হয় নি। বড় মেয়েটির নাম যোগমায়া। যোগমায়া তো যোগমায়াই বটে; যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। রূপ যেন উচ্‌ছলে পড়্‌ছে। মেয়েটির এখনও বিয়ে হয় নি। মেয়ের বাপ মা দেশ ছেড়ে এখানে আছে; আর এই বনজঙ্গলের দেশে ভাল পাত্রও পাওয়া যাচ্চে না, তাই বিয়ে হতে এত দেরী হচ্চে। মেয়ের মা এর জন্যে কত ভাবনা চিন্তে কর্‌ছিল। মেয়েটিকে দেখে আমার দেবুর কথা ভাব্‌ছিলুম; কিন্তু আমার কেমন দুরদেষ্ট, দেবু আমার যেন সন্নিসি হ'য়ে গেছে। এই দেখনা, সে কত লেখাপড়া শিখেছে, যেন বিদ্যের একটা জাহাজ। কিন্তু দেবু চাকরী বাক্‌রী কল্লে না; চাক্‌রী কল্লে সে আজ একটা মস্ত বড় চাকরে হ'তে পার্‌তো। আমার আর দুটি ছেলে তোমাদের আশীর্ব্বাদে বড় বড় চাক্‌রী কচ্চে, আর বৌ ছেলে নিয়ে সুখে আছে; কেবল দেবুই আমার কেমন একরকম হ'য়ে গেল! দেখ, তার কোন বিষয়ে সখ্ নেই, কারুর সঙ্গে আমোদ করা নেই, আহ্লাদ করা নেই, দুটো কথা বলা নেই, একটা ভাল কাপড় পরা নেই, যেমন তেমনেই সন্তুষ্ট—আর কি এক রোগ হ'য়েচে, দিন নেই রাত নেই পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াচ্চে, আর কেবল বই পড়্‌চে, আর একলা আচে, আর বিয়ের নাম কল্লে তেলেবেগুণে জ্বলে উঠ্‌চে! কেন যে দেবু এমনতর হ'ল তা তো আমি জানি না। আমার অদৃষ্টে যে কি আছে, তা ভগবানই জানেন। দিদি, আমার সব সুখ হ'য়েও কিছু হয় নি। দেবু আমার বড় আদরের সামিগ্রী - দেবুকে আমার সংসারীর মতন দেখে গেলে আমি সুখে মর্‌তে পার্‌তুম; কিন্তু সে সুখ আমার কপালে নেই!"

এই বলিয়া জননীদেবী নিরস্ত হইলেন। শেষোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। আমি যদিও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া নিশ্চিত দুই চারি বিন্দু অশ্রু পড়িয়াছিল; যেহেতু বগলাপিশী তৎক্ষণাৎ আমার আচরণের উপর কটাক্ষ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্ বৌ, তুই কাঁদিস্ নে। তোর কিসের কষ্ট যে, তুই চোখ থেকে জল ফেলিস্? বল্লে তুই রাগ কর্‌বি, তাই বলি নি; তা নইলে আসল কথা বল্‌তে গেলে, দেবুর তো আমি তত দোষ দিই না। তার আর দোষ কি? যত দোষ তার বাপের! এ কথা তোমার কাছে বল্‌চি, আর সকলের কাছেও বলব।

সত্যি কথা বল্‌ব, তার আর ভয় কি? আমরা যখন বিয়ে দিতে বল্লুম, তখন ছেলের বিয়ে দেওয়া হ'ল না। বাপ ছেলেকে নাই দিয়ে দিয়ে তালগাছে তুলে ফেল্‌লেন। এখন ছেলে ধিঙ্গী হ'য়ে বনের মাঝে একটা ঘর ক'রে ব'সেচে। আর ছেলেরই বা তোমার এ কি রীত গা? বাপ মা রইলেন এখানে, ছেলে রইলেন ওখানে; এ কোন্ দেশের কথা গা? ছেলে তোমার বিদ্যের জাহাজ, তা নেই মান্‌লুম; কিন্তু দেশে কি আর কারুর ছেলে লেখাপড়া জানে না? আর সকলের ছেলেই কি লেখাপড়া শিখে সন্নিসি হ'য়ে বেড়াচ্চে? এই ধর॰না তোমারই কথা। তোমার নৃপেন আর সুরেনও তো তোমার দেবনের চেয়ে কিছু কম লেখাপড়া জানে না; কই তারা কি বৌ ছেলে ফেলে কৌপীন প'রে উদাসীন হ'য়েচে? আমি তোমাকে সত্যি বল্‌চি, ছেলের বাপই ছেলেকে এমন ক'রেচে। কিন্তু যাক্ ও সব কথা—এখন একটা কথা আমার মনে হ'চ্চে। গোস্বামীর মেয়ে যোগবালা—না—কি নাম বল্লে?—ঐ মেয়েটি ডাগর আর প্রতিমার মত সুন্দরী বল্‌চ। আমার বেশ মনে ধর্‌চে, ঐ মেয়েই দেখো তোমার বৌ হ'বে। তুমি আজকালকার ছেলেগুলোকে তো চেনো না, ভাই। ওরা এক ধারার ছেলে; সোজা পথে তো কথনও যাবে না! স্পষ্ট ক'রে বল্লেই তো হ'তো যে, ঐ মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ে হয়, তবে বিয়ে কর্‌বো, তা নইলে ক'র্‌বো না। এত মার পেঁচে কাজ কি বাবা? হুঁঃ—;তোমার দেবন আগে ঐ মেয়েটাকে দেখে যদি পলাশবনে ঘর না ফাঁদিয়ে থাকে, তবে আমার নাম বগলা সুন্দরীই নয়। বনে জঙ্গলে বেড়ানো আমরা আবার বুঝি না? দেখো, ঐ যোগবালাই তোমার বৌ হ'বে, এ কথা আজ আমি ব'লে যাচ্চি, আর তুমিও মনে রেখো। যখন আমার কথা সত্যি হবে, তখন বোলো।" এই বলিয়া বগলাসুন্দরী গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিলেন; জননী দেবীও তাঁহাকে কি বলিতে বলিতে তাঁহার সহিত সদর দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলেন। বগলাসুন্দরী এবং জননী দেবীও হয়ত মনে করিয়াছিলেন, আমি নিদ্রামগ্ন হইয়াছি। কিন্তু আমি শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া বগলাসুন্দরীর এই অদ্ভুত বক্তৃতা গলাধঃকরণ করিতেছিলাম এবং তাঁহার অন্তর্যামিতা ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের বিচিত্র পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলাম। তদ্দণ্ডেই বগলাসুন্দরীর সম্বন্ধে জননীদেবীকে দুই একটী কথা বলিতে আমার একান্ত ইচ্ছা

হইল ; কিন্তু আমি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া সে রাত্রিতে আর কোন কথা উত্থাপন করিলাম না। বগলাসুন্দরী যে সমাজে আছেন, সে সমাজে বাস করা বা জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা কিরূপ সহজ ব্যাপার, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইল না। ক্রোধে ও অভিমানে হৃদয় বড়ই ক্ষুব্ধ হইল। চরিত্রের উপর অযথা দোষারোপ করিলে, সকলেরই হৃদয় এইরূপ ব্যথিত হইয়া থাকে। কিন্তু মনের কেমন স্থিতিস্থাপক গুণ, কিয়ৎক্ষণ পরে ক্ষুব্ধমনা বগলার উপর আমার আর কিছুমাত্র ক্রোধ রহিল না। নিরক্ষর, নির্ব্বুদ্ধি, প্রগল্‌ভা, বৃথাভিমানিনী বগলার যে এইরূপ স্বভাব হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? যোগমায়ার সহিত কোনও দিন আমার বিবাহ হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু এই কন্যা লাভের উদ্দেশ্যেই যে আমি পলাশবনে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বকধার্ম্মিকের ন্যায় বসিয়া আছি, এ কথা অতীব নীচ, ঘৃণিত ও অসত্য। কথা যখন অসত্য, তখন আমার ক্রোধের আর কারণ কি? আমার মনের যাহা প্রকৃত অবস্থা, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান জানেন ; তিনি জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। যেহেতু আমি আমার চিন্তা ও কার্য্যকলাপের জন্য একমাত্র তাঁহারই নিকটে দায়ী। বগলা যদি অন্যরূপ জানে, তাহাতে আমার তত ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সংসারের প্রতি আমার ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল এবং পরমেশ্বরকে ভুলিয়া লোকে অসত্যের কিরূপ সেবা করে, তাহাও মনে হইতে লাগিল। শেষে সাধু-চরিত্র মহাপুরুষগণের কথা মনে পড়িল। জগতের উপকার করিতে গিয়া কত মহাপুরুষকে যে কত গ্লানি, নিন্দা, অযথা দোষারোপ ও নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি তো কীটানুকীট, কোন্ ছার। পরার্থের কথা দূরে থাকুক, আমি তো স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি কখন নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

প্রভাতে উঠিয়া পলাশবনে যাইতে যাইতে আমার বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি বিবাহ করিলে, পিতা মাতা উভয়েই

সুখী হন। পিতামাতাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন, পিতামাতা পুত্রের উপর প্রীত হইলে, দেবতারাও তাহার উপর প্রীত হন। বিবাহের প্রতি আমার যে কোন বিদ্বেষ ছিল, তাহা নহে। কিন্তু ইহাও বলা উচিত, বিবাহের জন্য আমার তাদৃশ আগ্রহ বা আস্থা ছিল না। আমি স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয়। শান্তিতে কালযাপন করাই আমার একান্ত অভিপ্রেত। সচ্চিন্তা, সদ্গ্রন্থপাঠ, পরমেশ্বরের আরাধনা এবং সাধ্যমত লোকের উপকারসাধন,—এইগুলিই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাগুলির চরিতার্থতা সম্পাদনোদ্দেশে আমি দুইটী বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা স্থির করিয়াছিলাম ; প্রথমতঃ অবিবাহিত থাকা ; দ্বিতীয়তঃ উদরান্নের সংস্থান করা। এই কারণে আমি বিবাহ করিতে কোন মতেই সম্মত হই নাই এবং উদরান্নের সংস্থানের জন্যও এই পলাশবন মৌজা ক্রয় করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, আমার উপার্জ্জনের উপর কেহই নির্ভর করেন না ; সুতরাং আমার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা আয়কেই আমি প্রচুর এবং এমন কি অতিরিক্তও মনে করিয়াছিলাম। বিবাহ করিলে পাছে আমার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটে, ইহাই আমার প্রধান ভয় ছিল। স্ত্রী হয়ত বিভিন্ন রুচির ও বিভিন্নপ্রকৃতির হইবে। যাহা আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা হয়ত তাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইবে না। এইরূপ কারণ উপস্থিত হইলে, মনের মিলন না হওয়াই স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। স্বামী-স্ত্রীর যদি মনের মিল না হয়, তবে সে সংসারে আর শান্তি কোথায়? আমি ইচ্ছা করিয়া এই অশান্তি ও দুঃখ ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। ইচ্ছা করিয়া কয় জন ব্যক্তি স্বপদে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে? তাহার পর যদি মনের মিলনও হয়, তাহা হইলেও আমাদের অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইতে পারে। পরিবার বৃহৎ হইলে, এত অল্প আয়ে তাহাদের লালন পালন, সুশিক্ষা সাধন ও বিবাহাদি প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ অবস্থা ঘটিলে অন্ততঃ প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জ্জনের জন্যও আমায় চাকুরী হউক বা ব্যবসায় হউক কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। তাহা হইলে, আমার আর কি হইল? আমি তো আর নির্ব্বিবাদে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পাইব না? সর্ব্বোপরি সংসারের অনিত্যতা প্রিয়জনবিয়োগ এবং সংসারের পাপময় কোলাহল আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

আমাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এ জীবনে বিবাহ করিব না, ইহাই স্থির করিয়াছিলাম। বিবাহের চিন্তা হইতে আমি মনকে যথাসাধ্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাকে অন্যদিকে প্রধাবিত করিয়াছিলাম। সেই অবধি বিবাহের চিন্তা মনোমধ্যে বড় একটা উদিত হইত না। হইলে তৎক্ষণাৎ কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভগবৎ-পদে নিয়োজিত করিতাম। বলিতে লজ্জা কি, যোগমায়াকে দেখিয়া এই দুর্ব্বল হৃদয়ে একটী দিন ক্ষণেকের জন্য বিবাহের চিন্তা সমুদিত হইয়াছিল। কিন্তু সহসা তৎক্ষণাৎ কিজানি কাহার বজ্রগম্ভীর রবে আমি কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবনের মহাভাব ও মহালক্ষ্য আসিয়া আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়া সেই মহাভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, এবং সেই মহালক্ষ্যপথে অদম্যতেজে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত হৃদয়ে নববল ও নবোৎসাহ সঞ্চিত করিয়াছিলাম।

আজ আবার বিবাহের সেই সমস্ত প্রসুপ্ত চিন্তা জাগরিত হইয়া আমার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। একদিকে পিতামাতার সুখসম্পাদন, অপরদিকে আমার অবশ্যম্ভাবী পতন—এই দুইটী কঠোর সমস্যার মধ্যে মনের ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। ক্রমিক ঘাতপ্রতিঘাতে মন নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। আমি কোন সুচারু সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলাম না। পরিশেষে হতাশ হৃদয়ে ও ক্লান্ত মনে এক বৃক্ষের তলে অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় আমার অজ্ঞাতসারে নিমীলিত হইয়া আসিল এবং অনতিবিলম্বেই আমি প্রাভাতিক মারুত-হিল্লোলে, সেই সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

নবাবিষ্কৃত কিরণ।

সকলেরই ধারণা আছে যে, "ফটো" তুলিলে বাহ্যিক আকারের প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়। আমরা যাহাকে যেমনটি দেখি, ফটোতে ঠিক তাহার সেইরূপ ছবি উঠে। তাহার ভিতরে কি আছে, তাহা দেখা যায় না। সম্প্রতি জর্ম্মণিতে রঞ্জটন্ নামক একজন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এক প্রকার কিরণের (rays) আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে "ফটো" তুলিলে

বাহিরের চিত্র না পাইয়া ভিতরের ছবি পাওয়া যায়। এই নবাবিষ্কৃত কিরণের কি কি গুণ এবং এই নূতন রূপ "ফটো" তুলিবার প্রকরণাদি সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। তবে যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহার পরিচয় দিব। সুতরাং আলোক, কিরণ প্রভৃতি ইহার আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের স্থূল বিবরণ জানা আবশ্যক।

কতকগুলি রৌপ্য-লবণে (Silver Salts) সূর্য্যের আলোক লাগিলে তাহার গুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে*; এবং কতকগুলি দ্রব্যের এই গুণ আছে যে তাহারা সেই পরিবর্ত্তিত রৌপ্য-লবণকে অতি সূক্ষ্ম রৌপ্যচূর্ণে পরিণত করে। এই রৌপ্যচূর্ণের রঙ্ স্বভাবতঃ কাল। উক্ত দ্রব্যগুলি রৌপ্য-লবণের পূর্ব্বাবস্থায় কোনরূপ কার্য্য করিতে পারে না। এই প্রক্রিয়ার উপর "ফটোগ্রাফের" কার্য্য নির্ভর করে। "ফটো" তুলিতে হইলে কোন লালাযুক্ত দ্রব্যের সহিত রৌপ্য-লবণ (Salt) মিশ্রিত করিয়া কাচের ফলকের উপর মাখাইয়া দেওয়া হয়। এই ফলকের উপর কোন বস্তু রাখিয়া আলোকে ধরিলে ফলকের উপরিস্থ যে যে স্থান দিয়া আলো যাইতে পারে, সেই সেই স্থানের রৌপ্য-লবণ পরিবর্ত্তিত এবং যে যে স্থানে আলোক প্রবেশ করে না, সেই সেই স্থান পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায়। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি দ্বারা পরিবর্ত্তিত স্থান সকল কাল করিতে পারি এবং যে যে স্থান পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তথাকার রৌপ্য-লবণকে সোডা হাইপো-ফস্ফাইট্ দিয়া গলাইয়া ফলকের উপরিস্থ বস্তুর চিত্র তুলিতে পারি।

সূর্য্যকিরণ ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার কিরণের দ্বারাও এইরূপ ছবি তুলিতে পারা যায়। এক্ষণে ইহাদিগের কিছু পরিচয় আবশ্যক। একটী বস্তুর উপর আর একটী বস্তুর আঘাত করিলে উভয়ই কম্পিত হয়। কোন কোন স্থলে তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি, কোন কোন স্থলে পারি না। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎগণ অনেক বিচারের পর স্থির করিয়াছেন যে এইরূপ আঘাত, ঘর্ষণ বা অপর কোন উপায়ে বস্তু সকল কম্পিত হইয়া ঈথর নামক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অতি সূক্ষ্ম পদার্থে তরল উৎপাদন করে। সেই তরঙ্গই তাড়িত, আলোক এবং উত্তাপ প্রভৃতির কারণস্বরূপ। পণ্ডিতগণ ইহাও স্থির করেন যে, যখন সেই তরঙ্গমালা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার থাকে, তখন তাহা হইতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এবং তদপেক্ষা

* যেমন "কষ্টিকে" আলো লাগিলে তাহা কাল হইয়া যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ হইতে আলোক উৎপন্ন হয়। যে সকল কিরণ হইতে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আলোক-কিরণ বলা যাইতে পারে। আলোক-তরঙ্গ হইতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আছে। তাহারা সাধারণতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদের অস্তিত্ব আমরা দুই প্রকারে অনুভব করিতে পারি। সেই তরঙ্গাণু সকল (Quinine Sulphate) কুইনাইন প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে অন্ধকারে আপনা হইতে জ্যোতিঃ বিকিরণের শক্তি প্রদান করে। আমরা এই শক্তিকে জ্বালাময়ী শক্তি (Flamescence) বলিব। এবং এই তরঙ্গ-মালা সমুত্থিত কিরণ যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ এবং পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর সংমিশ্রন প্রভৃতি কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করে। অন্ধকার গৃহে কোন রন্ধ্র পথ দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে যদ্যপি সেই আলোকপথে ঝাড়ের কলমের ন্যায় একটী ত্রিপার্শ্ব কাচ (Prism) রাখা যায় তাহা হইলে সেই ত্রিপার্শ্ব কাচ ভেদ করিয়া আলোক-রেখা বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগ লোহিত, হরিদ্রা, সবুজ, নীল, প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা অনুভব করা যায়।

একখণ্ড সাদা কাগজের উপর এই প্রকারে বিভক্ত আলোক-রেখা ধরিলে প্রথমে লোহিত, পরে কমলালেবুর বর্ণ, তৎপরে হরিদ্রা, সবুজ, নীল, বেগুনে-নীল (Indigo) এবং পরিশেষে বেগুনে (violet) বর্ণ দেখা যায়। এই বেগুনে বর্ণের পর কাগজের উপর জলে বিগলিত কুই-নাইন রাখিলে তাহা গাঢ় উজ্জ্বল নীলবর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে বেগুনের পরে কোন অদৃশ্য কিরণ আছে, যাহার এবম্ভূত রাসায়নিক শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে এই সাত বর্ণের আলোকের মধ্যে লাল কিরণের তরঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বেগুনে কিরণের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ত্রিপার্শ্ব কাচের একটী গুণ আছে যে ইহার ভিতর দিয়া যত ক্ষুদ্র তরঙ্গোত্থিত কিরণ গমন করে, তাহার গতি ততই বক্র (refracted) হইয়া যায়। ইহা হইতে এবং উপরি উক্ত পরীক্ষা (experiment) হইতে আমরা সূর্য্যকিরণে পূর্ব্বলিখিত ইন্দ্রিয়ের অগোচর কিরণের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই। এই কিরণ বেগুনে কিরণের পরবর্ত্তী বলিয়া আমরা উহাকে "বেগুনে-পর" কিরণ (ultra-violet) বলিব। সূর্য্য-কিরণের রৌপ্য-লবণ পরিবর্ত্তিত করিবার যে ক্ষমতা আছে,

তাহা এই কিরণেও আছে। কিন্তু যে সকল দ্রব্যের ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সেই সকল বস্তুকে বেগুনেপর কিরণও ভেদ করিয়া যাইতে পারে না। অতএব এই কিরণের সাহায্যে আমরা কাষ্ঠ, চর্ম্ম ও কাগজ প্রভৃতি (আলোক সম্বন্ধে) অস্বচ্ছ বস্তু দ্বারা আবৃত কোন দ্রব্যের প্রতিরূপ (Photo) তুলিতে পারি না। কিন্তু অধ্যাপক রঙ্গটনের নবাবিষ্কৃত কিরণের সাহায্যে কতকগুলি অস্বচ্ছ দ্রব্যাবৃত বস্তুর প্রতিকৃতি লইতে পারা যায়।

কাচের উপর রেশম ঘষিলে কাচের আকর্ষণী শক্তি জন্মায়। যাহা হইতে কাচ এই শক্তি পায়, তাহার নাম তাড়িত। আবার গালাতে এইরূপ রেশম ঘর্ষণ করিলে গালাও ঐ গুণ প্রাপ্ত হয়। দেখা যায় যে দুইটী তাড়িতবিশিষ্ট কাচ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, কিন্তু তাড়িতযুক্ত কাচ ও গালা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সুতরাং কাচের ও গালার তাড়িত ভিন্ন প্রকার। আমরা এই দুই তাড়িতের প্রভেদার্থ কাচতাড়িত ও লাক্ষাতাড়িত শব্দ প্রয়োগ করিব। ইহাও দৃষ্ট হয় যে কাচে রেশম ঘর্ষণ করিলে কাচে যে তাড়িত জন্মে, রেশমে তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের তাড়িত উৎপন্ন হয়। এই মূলতত্ত্ব অনুসারে Holtz, Wimshurt প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহা হইতে উক্ত দুই প্রকার তাড়িত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই যন্ত্র চালিত করিলে ইহার লাক্ষাতাড়িত আশ্রয়-স্থলের শেষ সীমা অর্থাৎ বিয়োগ কেন্দ্র (Negative pole) হইতে কুঁচের আকারে একপ্রকার ছটাবিশিষ্ট আলোক নির্গত হয় এবং তথা হইতে আরও একপ্রকার কিরণ বহির্ভূত হয়, যাহার "বেগুনে-পর" কিরণের ন্যায় জ্বালাময়ী (বা জ্যোতির্ম্ময়ী) শক্তি আছে, যাহাকে গালাকিরণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই দুইটী কিরণের পার্থক্য এই যে গালা-কিরণ বেগুনে-পর কিরণের (ultra violet rays) অভেদ্য অনেকগুলি বস্তু ভেদ করিয়া যাইতে পারে। দুইটী ভিন্ন পোল অর্থাৎ তাড়িতকেন্দ্রকে পরস্পর সন্নিকট করিলে তাহার মধ্য হইতে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। কিন্তু ইহাদিগকে কোন বায়ুশূন্য স্থানে পরস্পর সন্নিকট রাখিলে দেখা যায় যে স্ফুলিঙ্গের পরিবর্ত্তে একটী অণ্ডাকার-জ্যোতিঃ তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনা (phenomena) পরীক্ষা করিবার জন্য

Esler, Lenard, Crookes আদি বৈজ্ঞানিকগণ কাচের নল বা কাচস্থালী (bulb) হইতে বায়ু নিষ্কাষিত করিয়া ও তাহার দুই প্রান্তে দুইটী তাড়িত-বাহক ধাতুর তার যোজিত করিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ক্রুক্‌স্ তাঁহার গোলকের দুই প্রান্তে প্লাটিনম্ নামক অতি কঠিন তাড়িতবাহক ধাতুর তার সংলগ্ন করিয়া সেই গোলকের ভিতর দিকে তার দুইটির শেষ ভাগে দুইটি প্লাটিনমের পাত যোজিত করিয়া দেন। এই গোলকের তারের সহিত তাড়িতকেন্দ্র দুইটী সংলগ্ন করিয়া যন্ত্র চালিত করিলে প্রচুর পরিমাণে গালাকিরণ পাওয়া যায় এবং এই গোলক হইতে আর এক প্রকার কিরণও নির্গত হইয়া থাকে; ইহাই রঙ্গটনের নবাবিস্কৃত কিরণ। ইহার কোন নাম না থাকায় আমরা ইহাকে নবকিরণ বলিব।

আমরা দেখিলাম যে [তাপ-কিরণ ব্যতীত] দৃষ্টির অগোচর তিন প্রকার কিরণ আছে, যথা—বেগুনে-পর, গালাকিরণ ও নবকিরণ। তন্মধ্যে বেগুনে-পর কিরণ হইতে আর দুটীর প্রভেদ সহজেই উপলব্ধ হয়। গালাকিরণ ও নবকিরণের বিভিন্নতা পরে দৃষ্ট হইবে।

এক্ষণে আমরা অধ্যাপক রঙ্গট্‌নের পরীক্ষা (experiment)র বিষয় বলিব। রুমকর্ফ এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যদ্দারা ব্যাটারি হইতে উৎপন্ন তাড়িতকে বহুগুণ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। অধ্যাপক রঙ্গটন এইরূপ একটী যন্ত্র দ্বারা ক্রুক্‌সের গোলোকের ভিতর তাড়িত প্রবাহিত করেন। গোলাকার একখানি গোলোকের চতুর্দ্দিক একখানি কাল কাগজে ভালরূপে মুড়িয়া দেন। তাহার পর একখানি Barium platino cyanide (এক প্রকার জ্যোতিষ্মান পদার্থ) মাখান একখণ্ড কাগজ লইয়া দেখিলেন যে উহা জ্বালাময়ী শক্তি প্রভাবে জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল (it lights up with brilliant phosphoreseence)। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন যে গোলোকের এবং কাগজের মধ্যে বেগুনে-পর কিরণের অভেদ্য অনেকগুলি বস্তু রাখিলেও কাগজের জ্বালাময়ত্ব থাকে এবং এই শক্তি গোলোক হইতে প্রায় চারিহস্ত দূরে অনুভূত হইয়া থাকে। অধ্যাপক রঙ্গটন স্বকীয় পরীক্ষার দ্বারা এবং লেনার্ডের পূর্ব্ব পরীক্ষার ফল হইতে স্থির করিয়াছেন যে নবকিরণ বায়ু ও অন্যান্য বস্তু সকলকে গালা-কিরণ অপেক্ষা সহজে ভেদ বরিতে পারে। তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা ইহার পোষকতা করিতেছে। কেননা গালাকিরণের জ্বালাময়ী শক্তি চারিহস্ত দূরে অনুভূত

হইতে পারে না। আরও দেখা যায় যে, গালাকিরণের নিকট চুম্বক আনিলে গালাকিরণের গতি পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু নবকিরণের উপর চুম্বকের কোন প্রভাব (influence) দেখা যায় না। অতএব নবকিরণ গালাকিরণ হইতে পৃথক ইহা জানা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আলোক ও বেগুনে-পর কিরণের গতি ত্রিপার্শ্ব-কাচ দ্বারা বাঁকাইয়া দেওয়া যায়। এক্ষণে দেখা যায় যে এই কারণেই বাহিরের বস্তুর প্রতিকৃতি camera দ্বারা সহজে লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রঙ্গটন সাহেব নবকিরণের গতি পরিবর্ত্তন করিতে বহু চেষ্টা পাইয়াও কোন বিশেষ ফল পান নাই। আমরা সাধারণতঃ যেরূপ ফটো তুলি নবকিরণ দ্বারা তাহা হইতে পারে না। ইহা যে সকল বস্তু ভেদ করিতে পারে না, কেবল তাহারই প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রঙ্গটন প্রভৃতি এরূপ অনেক বস্তুর ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে হাতের মাংসের ছবি না উঠিয়া হাড়ের চিত্র উঠিয়াছে দেখা যায়। রঙ্গটন সাহেবের প্রকরণে আমরা এলাহাবাদ মিওর কলেজে অনেকগুলি প্রতিকৃতি লইয়াছিলাম। তন্মধ্যে একটী ছবি নিম্নে প্রদত্ত হইল। রঙ্গটন সাহেব অনুমান করেন যে,
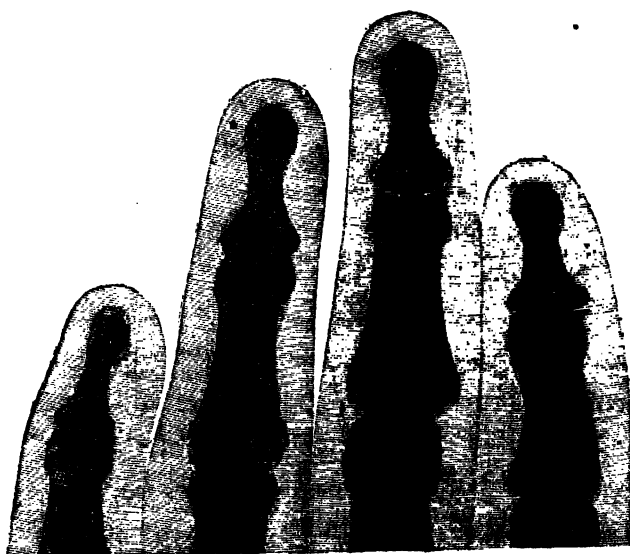
লাক্ষা বা বিয়োগকেন্দ্র হইতে গালাকিরণ নির্গত হইয়া গোলকের অপর দিকে যে স্থানে আঘাত করে সেই স্থানেই নবকিরণের উৎপত্তি। কাচের

গাত্রে উৎপন্ন হইয়া নবকিরণ চতুর্দ্দিকে সরল রেখায় ধাবিত হয়। তিনি বলেন চুম্বকের দ্বারা ঋণালোকিরণের গতি ফিরাইয়া দিলে নবকিরণেরও উৎপত্তি স্থান পরিবর্ত্তিত হয়। আলোক-কিরণ কোন জ্যোতিষ্মান (Luminous) বিন্দু হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে সরল রেখায় ধাবিত হয় বলিয়া আলো হইতে একটু দূরে কোন বস্তু রাখিলে তাহার দৈর্ঘ্য যত বড় হয়, সেই বস্তু তাহার দ্বিগুণ দূরে রাখিলে দৈর্ঘ্য পরিমাণ অর্দ্ধেক হয়। নবকিরণের ছায়ার ঐরূপ কোন গুণ আছে কি না দেখিবার জন্য আমরা একটী লোহার তারের ঝাঁঝরিকে প্রথমে গোলকের নিকটে ও তৎপরে পূর্ব্বাপেক্ষা দূরে রাখিয়া তাহার চিত্র লইয়াছিলাম। তাহাতে গণনা করিয়া দেখিলাম যে গোলকের গায়ের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানকে নবকিরণের উৎপত্তি স্থান ধরিলে নবকিরণের ব্যবহার আলোক-কিরণের মত বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থানটী লাক্ষাকেন্দ্রের অপর পারে এবং কাচকেন্দ্রের নিম্নভাগে স্থিত। এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান জন্য মিওর কলেজের রাসায়নিক অধ্যাপক হিল্‌সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে একটী কার্ডের উপর সমদূরবর্ত্তী কতকগুলি আল্‌পিন পুঁতিয়া তাহার ছবি লওয়া হয়। ইহা হইতে আমরা উপরিউক্ত ফল প্রাপ্ত হই। আমরা ক্রুক্‌সের গোলককে সমতল ভাবে রাখিয়া তাহার নীচে হাতের একটী ছবি লইয়াছি। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ইহা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ছবিতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি উৎপত্তি স্থানের ঠিক নিম্নে রাখা হয়, তাহাতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির স্বাভাবিক স্থূলত্ব ছবিতে উঠে। কিন্তু অপরগুলির ছবি ক্রমানুসারে মোটা হয়। সেই-রূপে বাক্সের ছবি তুলিলে বাক্সের দুইটী ধার সরু ও দুইটি মোটা হইতে দেখা গিয়াছে।

এই আশ্চর্য্য নবকিরণের এখনও কেহ স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক রণ্টন বৈজ্ঞানিক জগতের এবং বিশেষতঃ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তারদিগের উপকার করিয়া সকলের নিকটেই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বন্দুকের গুলি লাগিয়া বা অন্য কোন প্রকার আঘাতে শরীরমধ্যস্থ অস্থি ভগ্ন বা চূর্ণ হইলে এখন তাহা অনায়াসেই ধরা যাইবে। সুতরাং অস্ত্র চিকিৎসা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক নিরাপদ ও অল্প ক্লেশদায়ক হইবে।

শ্রীবেণীমাধব মুখোপাধ্যায়।

গীতোক্ত অবতার-তত্ত্ব।

(উত্তর)

গত ফেব্রুয়ারী মাসের দাসীতে বাবু বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত "গীতোক্ত অবতার তত্ত্ব" সম্বন্ধে দুই একটী কথা কহিয়াছেন। কথাগুলি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি এবং যথাসম্ভব ভাবিয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু কৈ, তাহাতে আমার মত পরিবর্ত্তন করিবার কোনও কারণ দেখিলাম না। তিনি যে দু একটী কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারে টিকিবে না।

তাঁহার প্রথম কথা—"প্রতুল বাবু কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্যকে বড় বলিতে চান কিনা জানি না; কিন্তু লেখার আভাসে মনে হয় যেন তাহাই বলা তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক এই বিষয়টা তত মারাত্মক নহে; কারণ যদি কেহ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলে যে বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লোকটা ভাল নহে, কিন্তু বালিজুড়ি নিবাসী ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র লোক বেশ ভাল, তবে আমার বুঝা উচিত যে, আমি লোক মন্দ নহি, তবে আমার যাহা কিছু দোষ আছে তাহা আমার নামের দোষ। সেইরূপ কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা চৈতন্য বড় বলিলে ইহাই বুঝা উচিত যে কৃষ্ণ ছোট নয়, তবে তাঁহার নাম ছোট, কারণ আমি কখনও আমা অপেক্ষা বড় বা ছোট হইতে পারি না।" বলরাম বাবু ভাবিয়াছেন যে বালিজুড়ি নিবাসী ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বলিলে যেমন তাঁহাকেই বুঝাইবে ইহা ধ্রুব সত্য, তেমনি কৃষ্ণ ও চৈতন্য উভয়কে ভগবানের অবতার বলিলে কৃষ্ণ ও চৈতন্যের সমতা স্বীকার অপরিহার্য্য। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে জ্যামিতির প্রথম স্বীকার্য্য লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে কার্য্যকর হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে অবতার এই সাধারণ কথাটী কৃষ্ণ ও চৈতন্য উভয়েতে প্রযুক্ত হইয়াই যে এই প্রমাদ ঘটাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রবন্ধটা একটু তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাইতেন আমি এই ভ্রমের পথ রাখি নাই। "বিশ্বের সর্ব্বত্রই কি তিনি সমান ভাবে প্রকাশিত?" এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তরে বলিয়াছি :—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
(১৮ শ্লোক, ৫ম অধ্যায়)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে ও কুকুরে জ্ঞানীগণ সমদর্শী।"

"পণ্ডিতেরা গরু, হাতী, কুকুর, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে সমদর্শী সত্য কিন্তু এই সমদৃষ্টি সকলই ভগবৎ প্রকাশ বলিয়া। গরু, হাতী, কুকুর বা চণ্ডালে নাই, ভগবান শুধু ব্রাহ্মণে আছেন, ইহা ভেদবুদ্ধি। এই ভেদবুদ্ধির অভাবই সমদৃষ্টির কারণ, প্রকাশের সমতা সমদৃষ্টির কারণ নহে।" আমি যে ভ্রম নিবারণ করিতে এত কথা বলিলাম, বলরাম বাবু ঠিক সেই ভ্রমই করিয়াছেন। ভগবান বলিয়াছেন তিনি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদের মধ্যে ব্যাস, কবিদের মধ্যে উষণা কবি। শুধু তাহাই নয়, তিনি বৃক্ষরাজির মধ্যে অশ্বথ, ঘোড়ার মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, হাতীর মধ্যে ঐরাবত। বাসুদেব, ধনঞ্জয়, ব্যাস, উষণা কবি, অশ্বথ, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত সকলই তাঁহার অবতার। এই সকল অবতারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভেদ নাই কি? বাসুদেব ও ব্যাসে, উষণা কবিতে ও অশ্বথে, ধনঞ্জয়ে ও উচ্চৈঃশ্রবায়, ব্যাসে ও ঐরাবতে কোন ইতরবিশেষ আছে কিনা? যদি বলেন আছে, তবে কৃষ্ণ ও চৈতন্যে থাকিতে দোষ কি? কৃষ্ণ ও চৈতন্যকে যদি পূর্ণাবতার বলিয়া পরে এক হইতে অন্যকে বড় করিতে যাইতাম তবে আমার কথা অযৌক্তিক হইত সন্দেহ নাই। তাহাত আমি কোথাও বলি নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত বা সংস্কারগত পূর্ণাবতার কৃষ্ণ ও চৈতন্য বিভিন্ননামধারী এক ব্যক্তি হইতে পারেন। পূর্ণাবতার নয় বলিয়া তাঁহারা আমার নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি। সুতরাং শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের অভিন্নতা স্থিরনিশ্চয় হইলেও বিভিন্ন দেশকালে প্রকাশিত কৃষ্ণ ও চৈতন্যের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে না।

"প্রতুল বাবু কয়েকটী কথার সাধারণ অর্থ লইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিনাশ শব্দের সাধারণ অর্থ লয় প্রাপ্ত হওয়া, মারিয়া ফেলা। অর্জ্জুন যখন ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে এই অর্থে মারিয়া ফেলিতে অস্বীকার হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন ভগবান যে সকল কথা

অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রতুল বাবু পাঠ করেন নাই ?” অনেক বার করিয়াছি। বলরাম বাবু তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের একে “দেহান্তর-প্রাপ্তি” অপরে “ইনি হত্যা করেন না ও হত হন না” দেখিতে পাইয়া ঠাওরাইয়াছেন, তবে বুঝি বিনাশের অর্থ “লয়প্রাপ্ত হওয়া” নয়, “দেহান্তর-প্রাপ্তি,” কারণ ইনি হত হন না; বিনাশের অর্থ মারিয়া ফেলা নয় “দেহান্তর-প্রাপ্তি করান,” কারণ ইনি হত্যা করেন না। যদি বিনষ্ট হওয়া ও বিনাশ করা ব্যাপারটাই সম্ভব না হইল, তবে ত দুষ্টের “বিনাশ” নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তে আসিয়াই ভাবিয়াছেন “বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং” ও “নায়ং হন্তি ন হন্যতে” এ দুয়ের বিরোধ ঘুচিল। কিন্তু এ বিরোধটা এত গভীর যে বিনাশে দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থ করিলেই যে ইহা মিটিবে তাহা নয়। আত্মার নিষ্ক্রিয়তা ও মায়া প্রভাব এই দুইয়ের ভেদাভেদ বুঝা আবশ্যক। বিষয়টা বড়ই দুরূহ, তাই এখানে ইহার অবতারণা করিব না। তবে বলিয়া রাখি দেহান্তর প্রাপ্তির আকর্ষী সেখানে পৌছায় না। আরও বলি দেহান্তর প্রাপ্তি কি বিনাশের একটা অসাধারণ অর্থ? এক ছাড়িয়া ত অপর গ্রহণ করিতে হয়? দেহান্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বে একদেহ ত্যাগ হইয়াছে বলিতে হইবে; এই দেহত্যাগই বিনাশ। এই দেহত্যাগকে লক্ষ্য করিয়াই গীতায় বিনাশ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ বলরাম বাবু বলেন গীতায় দেহনাশকে বিনাশ বলে না। বলরাম বাবু আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তির অন্তরালে দেহত্যাগ বা দেহনাশ রাখিয়া যদি বলিতে চান, ঐ দেখ বিনাশ নাই, আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি, শুধু আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি, তবে তাহা ভোজের বাজি। বালক বই আর কেহ তাহাতে ভুলিবে না।

বলরাম বাবুর তৃতীয় কথা “প্রতুল বাবু হয়ত বলিবেন যে, এই দেহের নাশের আবশ্যক কি? চৈতন্য মহাপ্রভু অনেক দুষ্টের উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ত কখনও তাহাদের নাশ করেন নাই! গীতার কৃষ্ণ ধর্ম্মের এই মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, সেই জন্য দুষ্টের বিনাশ দ্বারা তাহাদের উদ্ধারের উপদেশ দেন।”

“গীতার কৃষ্ণ চৈতন্যের ধর্ম্মের মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয় লইয়া আমার বাগবিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা নাই; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তিনি ধর্ম্মের এই মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম

করিতে সক্ষম হইলেও যেরূপ অবস্থায় অর্জ্জুনকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, সেরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের উক্ত মহান্ ভাব ব্যক্ত করিলে তিনি কেবল হাস্যাস্পদ হইতেন। দেশ, কালও পাত্র এই তিনটীর বিবেচনা করিয়া সকল সময়ে উপদেশ দিতে হয়।" ঠিক কথা কিন্তু আমি কি আমার প্রবন্ধে বলিয়াছি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়া কৃষ্ণ অন্যায় করিয়াছেন? তবে এ দেশ কাল পাত্র ভেদের কথা উত্থাপিত করিবার সার্থকতা কি? ভগবৎ বুদ্ধিতে স্বীয় অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কৃষ্ণ ধর্ম্মাবতার পর্য্যস্ত আসিয়াছেন, প্রেমাবতারে পঁহুছান নাই। প্রেমাবতারতত্ত্ব গীতায় উক্ত হয় নাই। গীতার কৃষ্ণ কোথাও কি বলিয়াছেন, "আমি পীড়িতের জন্য আসিয়াছি, সুস্থের জন্য আসি নাই"? কৈ একথা ত গীতায় কৃষ্ণের মুখে শুনি নাই? যদি আবার দেশ কাল পাত্র ভেদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, একথা তাঁহার মুখে সাজে না, কারণ তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনের জন্য আসিয়াছিলেন। বেশ কথা, যাহা তিনি করিয়াছেন তাহার জন্যে তিনি প্রশংসার্হ। কিন্তু তিনি যাহা করিয়া যান নাই, পরে অপরেরা তাহা করিয়াছে বলিতে দোষ কি? তাহা হইতে দুষ্টের দমন হইয়াছে, কিন্তু নিতাই চৈতন্য হইতে দুষ্টের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দমন অপেক্ষা হৃদয় পরিবর্ত্তন যদি উচ্চতর হয়, তবে গীতোক্ত অবতারতত্ত্ব অপেক্ষা নিতাই চৈতন্যে প্রকাশিত অবতারতত্ত্ব উচ্চতর বলিতে আপত্তি কি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিবেন "আলিঙ্গন ধর্ম্ম বিনাশ ধর্ম্ম হইতে উচ্চ হইলেও সকল সময়ে ও সকল স্থানে উচ্চ নহে বা উচ্চ হইতে পারে না।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে আলিঙ্গন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ফলপ্রদ নয়। তাই তিনি মাজিষ্ট্রেটের ডাকাতের গলা ধরিয়া কান্নার দৃষ্টান্ত আনিয়াছেন। আমিও একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। ক্ষত রোগে একজনের অঙ্গুলি পচিয়া যাইতেছে, আশঙ্কা সমস্ত শরীর পচিয়া যাইবে। দুজন চিকিৎসক আহুত হইলেন। একজন বলিলেন ক্ষতাক্রান্ত অঙ্গুলি ছেদন বই গত্যন্তর নাই। অপরে কহিলেন, ছেদনে ত সারিবেই, ঔষধ ব্যবহারেও সারিয়া যাইতে পারে। তিনি এমন অনেক আরোগ্য করিয়াছেন। শেষোক্ত চিকিৎসক যদি নির্দ্দিষ্ট স্থলে অকৃতকার্য্যও হন; তবু বলিতে হইবে তাঁহার প্রণালীই শ্রেষ্ঠতর; কারণ ইহা এখানে না হউক অপর দশ স্থলে অটুট রাখিয়াই আঙ্গুল সারাইয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি যেখানে আরোগ্য করিয়াছেন সেখানে আঙ্গুল কাটিয়া।

তাই বলি আলিঙ্গন ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ফলপ্রদ না হইলেও বিনাশের ধর্ম্ম অপেক্ষা ইহা উচ্চতর। গীতার অবতার হৃদয় পরিবর্ত্তনের সঙ্কেত অবগত ছিলেন এমন কোন নিদর্শন পাই না। সুতরাং বলিতে বাধ্য, গীতার অবতারতত্ত্ব অতি মনোহর ও বিশদ হইলেও অসম্পূর্ণ।

প্রতুলচন্দ্র সোম।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি।*

"মুসলমান বৈষ্ণব" কথাটি নূতন এবং এইরূপ সংমিশ্রন,—যবনের বৈষ্ণবত্ব আশ্চর্য্যজনকও বটে। এক সময় ইহা অসম্ভাবিত ছিল, কিন্তু নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের কৃপায় ইহা আর নূতন, আশ্চর্য্যজনক বা অসম্ভাবিত বিষয় নহে।

চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে এই হতভাগ্য বঙ্গভূমে যে প্রবল বন্যা বহিয়াছিল, যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে পাপী তাপী, অধম নীচ, চণ্ডাল যবন; সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল ;—ভেদ বিচার করে নাই।

হিন্দুদের শাস্ত্রে ছিল বটে যে, ভক্তিমান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই কুলীন, তিনিই ব্রাহ্মণ; কিন্তু এই আদেশ সমাজের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্ত বন্যার প্রখর তেজে জরাজীর্ণ সমাজগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, শাস্ত্রের এই উদার আদেশ তখন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

হরিদাসের কথা পাঠক অবগত আছেন। এই হরিদাস "যবন" হইলেও ব্রাহ্মণ ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিতেন, চৈতন্যচরিতামৃতে একথা লেখা আছে।

এই অদ্ভুত বন্যার মহিমায় মৃত তরু মঞ্জুরিত—ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল, বোবা সঙ্গীত ধরিয়াছিল, পঙ্গু সুরঙ্গে নৃত্য করিয়াছিল।

এ সব কথা কি অতিবর্ণনা? সুসাত্বিক ভারতীয় ব্রাহ্মণেরও সাধন সাপেক্ষ যে কৃষ্ণপ্রেম, সেই পবিত্র প্রেমে যদি যবনকে নৃত্য করিতে দেখি, গান গাইতে শুনি, তবে পঙ্গুর নৃত্য হইতে তাহা কম আশ্চর্য্যজনক নহে।

---

* মূল্য ৵৹ আনা মাত্র। কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে গুরুদাস বাবুর নিকট প্রাপ্তব্য।

এতাদৃশ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারও এই বঙ্গভূমে ঘটিয়াছিল ; "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" পাঠে আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

কাব্যরসিক শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় বঙ্গসাহিত্য সমাজকে তিনখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ উপহার দিলেন। তিনি বিশুদ্ধভাবে সটীক "চণ্ডীদাস" ও "জ্ঞানদাস" সুচারুরূপে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" তাঁহারই আর এক কীর্ত্তি। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণের রসময়ী কবিতাগুলি একত্রে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। পদকর্ত্তাগণের নাম,—আকবর সাহা, নশীর মামুদ, সৈয়দ মর্ত্তুজা, ফকির হবিব, সেখ ভিখন, সেখ লাল, সালবেগ, প্রভৃতি। পদকর্ত্তাদের পরিচয় ভূমিকাতে দেওয়া হইলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত সন্দেহ নাই। আশা আছে দ্বিতীয় সংস্করণে রমণী বাবু এ অভাব দূর করিবেন।

মুসলমান পদকর্ত্তাগণের সোচ্ছ্বাস ভাবময়ী পদগুলি সুকবি-সুলভ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিরহিত নহে। বৈষ্ণব কবি কুলের কোমলতা—প্রেম প্রফুল্লতা প্রতি ছত্রে সুচিত্রিত রহিয়াছে।

কোন কবি স্বীয় "পরাণের ধন" আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,— * * *

"মোরে কর দয়া, দেহ পদ ছায়া,
শুনহ পরাণ কানু।
কুলশীল সব, ভাসাইনু জলে,
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে, কানুর চরণে,
নিবেদন শুন হরি!
সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া পায়ে,
জীবন মরণ ভরি॥"

কি স্বাভাবিক সুস্ফুট ভাব!! মর্ত্তুজা সাহেব! "কুলশীল সব" যথার্থই তুমি কানুর জন্ত "জলে ভাসাইয়াছ।" এ কথা বলিবার যথার্থ অধিকারীই তুমি।

সে যা'ক, আমাদের অদ্যকার বিশেষ আলোচ্য, আকবর সাহার ভণিতাযুক্ত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদটি। এই পদটি স্বনাম খ্যাত মোগল সম্রাট বিরচিত কিনা, সম্পাদক স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন নাই। তবে "বিজ্ঞাপনে"

"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা" হইতে একটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"এক সময়, জাগ্রত বা স্বপ্নেই হউক, শ্রীমহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনলীলা চাক্ষুষে দর্শন করিয়া আকবর সাহ এই পদরত্ন রচনা করিয়াছিলেন।" এই কথাটিতে পাঠক সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন কিনা জানি না; কিন্তু ইহা যথার্থ যে, আরও কিছু প্রমাণের জন্য পাঠকের মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠে।

যে মোগল কুলমণি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন, তিনি দীনা ক্ষীণা ও নবীনা বঙ্গভাষার গলে এই মূল্যবান হার কি যথার্থই পরাইয়া দিয়াছিলেন? এ প্রশ্ন আমাদেরও মনে উত্থিত হইয়াছিল। আকবর বিরচিত পদটি এই:—

"জিউ জিউ মোর মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত মাতোয়ালিয়া॥
ঐ ছন পহুঁকে যাহু বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী॥"

যথার্থ বটে, আকবর সাহ অতি উদার হৃদয় ছিলেন, কোন ধর্ম্ম বিশেষের উপর তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। এই কারণে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা বলিয়াছেন; কোন ঐতিহাসিক অর্দ্ধখৃষ্টিয়ান বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই কারণে গোঁড়া মুসলমানগণের কাছে তিনি "বিধর্ম্মী" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই গুণগ্রাহী সম্রাট, তাঁহার সমসাময়িক মহামহিমাময় সদ্ধর্ম প্রচারক-প্রবরের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন, আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তিনি যে ঐ পদের রচয়িতা তাহার প্রমাণ কৈ? ভণিতায় যে "সাহ আকবর" নাম আছে, উনি ভিন্ন ব্যক্তি, না সেই স্বনামখ্যাত সম্রাট? এ প্রশ্ন সহজেই মনে হইতে পারে।

এই প্রশ্নের মীমাংসা ইতিহাস করেন নাই। ইতিহাসে এ সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও একবারে প্রমাণাভাব নহে। আমরা একখানি চিত্রের কথা বলিতেছি।

এই চিত্রখানি চারিশত বর্ষের প্রাচীন। এখন নিতান্ত জীর্ণ হইয়া

গিয়াছে, আর অধিককাল কালের সহিত বিবাদ করিয়া থাকিতে পারিবে না। চিত্রখানি যিনি ইচ্ছা দেখিতে পারেন। বৃন্দাবনে—রাধাকুণ্ডে, শ্রীজাহ্নবাজির কুঞ্জে তাহা অদ্যাপি আছে।

বিদিত আছে যে, শ্রীমহাপ্রভুর গুণগ্রাম শ্রবণে গুণগ্রাহী আকবর সাহা একদা তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ করেন। মহাপ্রভু তখন নীলাচলে। নীলাচলে তখন প্রতাপরুদ্র গজপতি স্বাধীন নৃপতি। মহাপ্রভুকে দিল্লী পাঠাইয়া দিতে, সম্রাট প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধ করেন। সম্রাটের আদেশ-লিপি পাইয়া গজপতি ভীত হইলেন। তিনি জানেন, শ্রীমহাপ্রভু রাজদর্শন করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। (স্বয়ং প্রতাপরুদ্র কত কষ্টে মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হন, চরিতামৃতের পাঠক তাহা জানেন)। সম্রাটের প্রস্তাব মহাপ্রভুকে বলিতেও তিনি সাহস করিলেন না; তবে সার্ব্বভৌমাদির পরামর্শ মতে প্রতাপরুদ্র শ্রীমহাপ্রভুর একখানি চিত্রপট, সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই চিত্র খানির কথাই আমি বলিতেছি, বৃন্দাবনে জাহ্নবাজির কুঞ্জে তাহাই বিরাজিত।

প্রতাপরুদ্র প্রেরিত এই চিত্রখানি পাইয়া সম্রাট বিমুগ্ধ হন, এবং পরম যত্নে তাহা স্বীয় প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে রক্ষা করেন। কালে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিল, কিন্তু চিত্রখানি প্রাসাদেই রহিল। অবশেষে ভরতপুরের রাজা বলদেব সিংহ দিল্লী লুণ্ঠন কালে চিত্রখানি প্রাপ্ত হন; অন্যান্য রত্নের সহিত এখানিও তিনি আনয়ন করেন, ও বৃন্দাবনের ভজনানন্দ সিদ্ধ কৃষ্ণ-দাস বাবাজিকে দান করেন। চিত্রখানি বাবাজির হৃদয়ের ধন ছিল, এখানি দেখিলেও তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের উৎস খুলিত। এইরূপে চিত্রখানি বৃন্দাবনে আইসে।

যদি কোন পাঠক বৃন্দাবনে যান, সে পুরাতন চিত্রখানি দেখিবেন। দেখিতে পাইবেন, তাহা একখানি সংকীর্ত্তনের আলেখ্য। স্থান, সমুদ্রতীর, বৃক্ষাদি কিছুই নাই, কেবল সাদা সাদা বালুকা। সেই বালুকা-প্রান্তরে ছয়জনে মিলিয়া কীর্ত্তন গাইতেছেন। মধ্যস্থলে যিনি,—সুদীর্ঘ সুন্দর অথচ জীর্ণশীর্ণ, তিনিই শ্রীমহাপ্রভু। মহাপ্রভু নৃত্যকারী, তিনজন ভক্ত করতাল ও দুইজন মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন। সকলেই মণ্ডলী বন্ধনে কীর্ত্তন করিতেছেন। চিত্রে এ কি দেখা যাইতেছে? তাঁহাদের পা কি বালুতে বসিয়া যাইতেছে? হাঁ, তাহাই বটে; তাহারই চিহ্ন দেখা যাইতেছে।

মহাপ্রভুর পরিধান কৌপীন—বহির্ব্বাস, মস্তক মুণ্ডিত। তাঁহার প্রতিভা প্রদীপ্ত দেহ হইতে যেন একটি অমানুষিক তেজ নির্গত হইতেছে।

এই সুচিত্রিত প্রকৃত চিত্রখানি দেখিয়া পাঠক,সাহ আকবরের ভণিতাযুক্ত পদটি স্মরণ করুণ, উভয় চিত্র,—কবিতা ও আলেখ্য, কি এক—অভেদ বলিয়া বোধ হয় না। ছবিতে দেখিতে পাইবেন, সেই "মনচোরা গোরা, আপহি নাচত আপন রসে ভোরা," চিত্রিত। দেখিতে পাইবেন "খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া, আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া," এ চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে। তবে কি কবিতাটি যথার্থ আকবর বিরচিত, চিত্র দর্শনে বিমুগ্ধ সম্রাট চিত্তে যথার্থই কি কবিতার পবিত্র উৎস উচ্ছ্বাসিত হইয়াছিল ? সুধীগণ এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিবেন।

বাঙ্গালী কবিগণ ব্রজ-নায়ক শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনে যেমন ব্রজ ভাষাকে ভুলেন নাই, বঙ্গ-নায়ক শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণনে তদ্রূপই যত্নতঃ বঙ্গভাষায় পদটি বিরচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে যদি কেহ বলেন যে, আকবরের আদেশে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ কোন কবি কর্ত্তৃক এই পদ বিরচিত হইয়াছে, তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে,কবিতাটি সম্রাটের মনভাবোদ্গত ; সুতরাং ইহা সম্রাট বিরচিত বলিতে আপত্তি কি ? সে যা'ক, ভরসা করি, রমণী বাবু এ সকল কথার আলোচনা করিয়া পাঠকের কৌতুহল তৃপ্তি করিবেন।

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

নানা অভাব ও গোলমালের মধ্য দিয়া দাসাশ্রম ভগবানের কৃপাবলে আর এক মাস কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই দাসাশ্রমের গুরুত্ব বাড়িতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের লোকবল বাড়িত তাহা হইলে আমরা এই কার্য্যে আরও উৎসাহিত হইতাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এখনও আমরা এই সুবৃহৎ কার্য্যের উপযুক্ত লোক পাইতেছি না। আমাদের আশ্রমে কতকগুলি রোগী ও আতুরের বিছানা খালি হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে আমাদের দেশে অনাথ আতুর নাই। কখনই নহে। আমরা জানি প্রত্যেক গ্রামেই দুই একজন করিয়া অনাথ আতুর কত কষ্টে জীবনাতিপাত করিতেছে। অনাথ আতুর নাই ইহা সত্য নহে, পরন্ত উহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া উদ্যোগ করিয়া দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দিবার লোক নাই ইহাই সত্য। আমাদের প্রার্থনা আমাদের প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা এইটি পড়িবার সময়ে একবার ভাবিয়া

দেখিবেন তাঁহাদের গ্রামে অথবা সহরে কোন্ অনাথ আতুর কষ্ট পাইতেছে। চিন্তা মাত্রেই তাহার নিকট গিয়া দাসাশ্রমের কথা বুঝাইয়া দিবেন। এই সকল অজলোক ভয়ে সারা হয়। তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া আমাদিগকে তাহাদের অবস্থা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমরা পত্র পাঠ তাহাদিগকে আনাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিব। অবশ্য প্রত্যেকেই দাসাশ্রমের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে লিখিবেন।

বর্ত্তমান মাসের রোগী সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। রসিকচাঁদ, ৩। ছৈয়লুল্লা, ৪। গোপালচন্দ্র নন্দী, ৫। দেবীরা, ৬। স্বর্ণ, ৭। ফুলমণি, ৮। দুর্গামণি, ৯। নবদুর্গা, ১০। হীরামণি, ১১। রাজেশ্বরী ১২। ঘুনুমনি, ১৩। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১৪। মুক্ত, ১৫। অটল, ১৬। ঈশ্বরী, ১৭। শ্যাম দাস, ১৮। রামবরণ, ১৯। রঘু মিত্র।

রসিক চাঁদ। আমাদের পুরাতন রসিকচাঁদ এ সংসারে আর নাই। গত ৩০ বৎসর কাল ক্রমাগত কষ্ট যন্ত্রনা ভোগ করিয়া এত দিনে সকল কষ্ট যন্ত্রনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। যিনিই দাসাশ্রম দেখিতে আসিতেন তিনিই অবাক হইয়া ইহার যন্ত্রনা প্রত্যক্ষ করিতেন। পাশ ফিরাইয়া না দিলে পাশ ফিরিতে পারিত না। ইদানিং ইহার পক্ষে সকল কার্য্যই যেন কষ্ট সাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন হইতে রসিক দিন দিন আরও শুখাইয়া যাইতে লাগিল। মৃত্যুর ৪।৫ দিন পূর্ব্ব হইতে একেবারে আহার ত্যাগ করিল। ভাতের জল নেবুর রস দিয়া খাইয়া বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিত। আমাদের অন্ধ বালক বাবুরাম রসিকের বড়ই সেবা করিত। তাই রসিক বাবুরামকে মামা বলিয়া ডাকিত। কি জানি কি কারণে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে বাবুরাম রসিকের নিকট বড় যাইতে চাহিত না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রসিক বলিল "বাবুরাম মামা আমার কাছে আসে না কেন? আমি তাহাকে একবার দেখিব।" হায়রে ভালবাসা, জগতে তোরই জয় সর্ব্বত্র। বাবুরাম সেই হইতে রসিকের পার্শ্ব আশ্রয় করিল। মৃত্যুর দিবস প্রাতে বাবুরাম আসিয়া বলিল "রসিক পেঁপে খেতে চাচ্ছে।" পেঁপে আনা হইল, কিন্তু খাইতে পারিল না। গলাধঃ হইল না। ৩১শে মার্চ্চ বৈকালে আস্তে আস্তে অতি ধীর ও শান্তভাবে রসিক ইহলোক ছাড়িয়া পরম শান্তিময়ীর ক্রোড় আশ্রয় করিল। ভগবান তাহার আত্মার কল্যান সাধন করুন।

ছৈলুল্লা। এই হতভাগ্য পক্ষাঘাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মেডিকেল কলেজে ছিল, আরোগ্য লাভ করিতে না পারাতে বিদায় প্রাপ্ত হয় এবং দাসাশ্রমে গিরিধীতে প্রেরিত হয়। এদিকে তাহার সহোদর ভ্রাতা তাহাকে কলিকাতায় আসিয়া খুঁজিয়া না পাওয়ায় পুনরায় খুঁজিতে খুঁজিতে বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে যায়। তাহার পরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ছৈলুল্লা ইদানিং একটু একটু দেখিতে পাইত। যখন তাহার ভাই আসিল তখন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ভ্রাতায় ভ্রাতায় এই সম্মিলন অতি অপূর্ব্ব। ছৈলুল্লার প্রকৃতি, তাহার হাস্য আমাদিগকে বড়ই আনন্দ দিত।

কিন্তু তাহার এই ভ্রাতার সহিত হতাশ-জীবনের আশ্চর্য্য সম্মিলন আমাদিগকে আরও আনন্দিত করিয়াছে। তাহার ভ্রাতা তাহাকে পরমাদরে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে।

রাজেশ্বরী] আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। কিন্তু তাহার যে প্রকার লোভ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ভয় হয় পাছে অত্যাচার করিয়া আবার রোগাক্রান্তা হয়।

ঘুণুমণি। বেশ আরোগ্য হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কি জানি কেন হটাৎ একদিন সন্ধ্যা হইতে ঘুণুমণির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িল। যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ঘন ঘন মুর্চ্ছিত হইতে লাগিল। সে কি যন্ত্রনা, সে কি ছট্‌ফটানি। কোন গতিকে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহাকে রাখা গেল। ক্রমে ইহার অবস্থা শোচনীয় হইতেছে দেখিয়া ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। বয়স প্রায় ৫০ বৎসর। নিবাস গুড়বৈঠকখানা। শ্রীষ্টিয়ান বাবু গোপাল চন্দ্র নাহার সাহায্যে এখানে আসেন। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে জলে ডুবিয়া যান ও কতকগুলি রাস্তার লোক তাঁহাকে উঠান। সেই অবধি যেন কেমন অজ্ঞানভাব হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে না খাইয়া এমনই দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় যে একেবারে শয্যাগত হয়। সেই অবস্থায় এখানে আনীত হইয়াছে। এখন বেশ আরাম হইয়াছে। দিন দিন বল প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু ভ্রমের ভাব কিছুতেই চাইতেছে না। সমস্ত বাটিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অথচ বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করে। তাহার বিশ্বাস যে সে একজন মহাপুরুষ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল "মহাপুরুষেরা কি বিছানা নষ্ট করে ?" সে বলিল "তা যদি না হবে তাহা হইলে আমি করি কেন ?" এ উত্তম যুক্তি বটে। যাহা হউক এখন ইহার ভ্রমগুলি গেলেই আমরা বাঁচি।

মুক্ত। বাপের নাম রামধন গোয়ালা। বাটি নদিয়া, শান্তিপুর। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। চক্ষু কর্ণের শক্তি প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চলিবার শক্তি একেবারে নাই উদরাময় রোগে একেবারে শয্যাগত। পূর্ব্বে ভিক্ষা করিয়া কোনও গতিকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু প্রায় দুই মাস কাল একেবারে চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়ে। হামা দিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়া থাকিত আর যে যাহা দিত তাহা দিয়া কোনও গতিকে জীবন ধারণ করিত। দাসাশ্রমের একজন সহায় ইহার দুরবস্থা দেখিয়া ইহাকে আশ্রমে আনয়ন করেন। যখন আসিল তখন কর্ম্মচারীগণ ব্যাস্ত হইয়া ইহার পা ধুইয়া পরিস্কার করিয়া দিতে গেলে বৃদ্ধা কিছুতেই পা ছুঁইতে দিবে না। সে কাতর হইয়া বলিল "না—না, না জানি পূর্ব্বজন্মের কত পাপের ভোগে এ জন্মে এত কষ্ট পাইলাম। আবার তোমরা পায়ে হাত দিয়া আমার পাপের বোঝা বাড়াও আর আমি আর জন্মে এর চাইতে আরও কষ্ট পাই।" বৃদ্ধার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে, না জানি কোন দিন হতভাগিনী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

অটল। নিবাস পুরুলিয়া, বয়স প্রায় ৪০ বৎসর, জাতিতে চণ্ডাল। বুকে ঘা হইয়া মেডিকেল কলেজে আসে। সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইতেই বিদায় প্রাপ্ত হয়। কোথাও

দাঁড়াইবার স্থান থাকাতে দাসাশ্রমে আসে। তাহাকে পুনরায় অন্য হাঁসপাতালে দেওয়া হইয়াছে।

ঈশ্বরী। নিবাস কলিকাতা। বয়স ৭২ বৎসর। জাতি সুবর্ণবণিক। স্বামীর নাম পরমানন্দ দত্ত। তিনি জীবিত কিন্তু অথর্ব্ব অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ভিক্ষাবৃত্তি জীবিকা। স্ত্রী উদরী রোগে শয্যাগত হওয়াতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় এখানে আনয়ন করেন। ঈশ্বরী দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতেছে। জল প্রায় শুখাইয়া গিয়াছে।

শ্যাম দাস। নিবাস কটক। বয়স ৪৪।৪৫ একজনের গৃহে চাকর ছিল। জ্বর ও বাত শ্লেষ্মা রোগে শয্যাগত অবস্থায় একজন আমাদের সহায় কর্ত্তৃক এখানে আনীত হয়। পরদিন সকালে পায়খানা গেল। কিন্তু তৎপর মুহূর্ত্তে দেখা গেল শ্যাম দাস মৃত্যুমুখে পতিত। এমন আশ্চর্য্য মৃত্যু আমরা কখনও দেখি নাই। হতভাগ্য নিজেও বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবে নাই তাহার মৃত্যু এমন হটাৎ হইবে। আমাদের দুঃখ এই যে, আমরা তাহার যথেষ্ট চিকিৎসা ও সেবার অবকাশ পাই নাই।

রামবরণ। বয়স প্রায় ৫০ নিবাস গোরখপুর জেলা, জাতি কনৌজিয়া, ব্যবসা ধোপার। রাস্তারধারে পড়িয়াছিল। একজন খ্যাতনামা ডাক্তার দয়া পরবশ হইয়া গাড়িতে করিয়া দাসাশ্রমে দিয়া যান। রোগ পুরাতন জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ। মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিতে অনেক চেষ্টা করে কিন্তু পারে নাই। ইহার অবস্থা একটু একটু ভাল হইতেছে।

রঘুমিশ্র। বাড়ী গয়া জেলা। অন্ধ, বয়স ২০।২১ সে বলে একজন দুষ্ট লোক তাহার ৫৲ ঠকাইয়া লইয়া রাস্তায় ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে। মিশ্র মহাশয় বোধ হয় তাহার শোধ তুলিবার জন্যই একদিন থাকিয়া তাহার পরদিন সন্ধ্যার পর থালা গেলাস কম্বলাদি পোঁটলা বাঁধিয়া কোথায় চম্পট দিয়াছেন, আর ধরিতে পারা গেল না। ইহাকে বাবু রাজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও বাবু রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য আশ্রমে আনয়ন করেন।

দানপ্রাপ্তি।

মাসিক চাঁদা।

১৮ নং আমহার্ষ্টষ্ট্রীটের ছাত্রগণ ফেব্রুয়ারী মাস ৷৷০, যদুনাথ সেন মার্চ্চ ১৲, তেজচন্দ্র শীবু ফেব্রুয়ারী ৷৷০, কালী শঙ্কর শুকুল জানুয়ারী ১৲, নন্দকুমার দত্ত ফেব্রুয়ারী ১৲, ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ফেব্রুয়ারী ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ফেব্রুয়ারী ১৲, Lady C/o Babu Srinath Das ফেব্রুয়ারী ১৲, কেদারনাথ দাস জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ৷৷০, অনাথনাথ দেব জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ২৲ N. D. BoseEsqr জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ ৩৲, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ফেব্রুয়ারী ।০, বিপিন বিহারী রায় চৌধুরী মার্চ্চ ১৲; ৪০।১ কলুটোলা ষ্ট্রীটের ছাত্রগণ ফেব্রুয়ারী ৷৷০, অনারেবল মোহিনী মোহন রায় মাঘ হইতে চৈত্র ৩৲ মহেন্দ্র লাল দাস জানুয়ারী ১৲ রামচন্দ্র মিত্র মার্চ্চ ১৲ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মার্চ্চ ।০ A. B. Chatterjee মার্চ্চ হইতে মে ১৲বঙ্কুবিহারী মিত্র ফেব্রুয়ারী ।০ রায় পশুপতি নাথ বসু বাহাদুর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ২৲ গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ফেব্রুয়ারী ১৲ প্যারী মোহন ভড় ফেব্রুয়ারী মাসের ।০ কালী

শঙ্কর মুকুল ফেব্রুয়ারী ১৲ প্রমথনাথ দাস ফেব্রুয়ারী ২৲ নবাব সৈয়দ আব্দুল শোভান চৌধুরী জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ২৲ নবীনচন্দ্র বড়াল ফেব্রুয়ারী ১৲ শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন ৪৲ অভয় চরণ মল্লিক মার্চ্চ ॥০ ছকুখানসামার লেনের ছাত্রগণ মার্চ্চ ॥০ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মার্চ্চ ।০ শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী দেবী মার্চ্চ ১৲ গৌরীশঙ্কর দে ফেব্রুয়ারী ॥০ মোট ৩৬৲

বার্ষিক চাঁদা।

ঈশ্বরচন্দ্র দিণ্ডা চণ্ডিভেটী ১৮৯৪।৯৫ সালের ২৲ ক্ষেত্রমোহন মাইতী বালিয়া ১৩০১ সাল ৩৲ রাধাচরণ বরদহগোড়া ১৩০২ ৩৲ রাধাকৃষ্ণ মাইতি দহগোড়া ১৩০২ সনের ১২৲ মধ্যে ৫৲ কাশীনাথ শাসমাল চণ্ডিভেটী ৫৲ বিপিন বিহারী শাসমাল কাঁথী ৪৲ মোট ২২৲

এককালীন দান।

রাজনারায়ণ বসু ১৲ কুন্দ নন্দিনী গুপ্তা ২৲ আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় ১৲ সোনাতন দাস ১৲ নকুলেশ্বর গুহ ১৲ অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲ ভোলানাথ দাস ১৲ কালী চরণ বন্দোপাধ্যায় ১৲ অক্ষয়কুমার মিত্র ২৲ মুন্সী সেখ হামিদার রহমান ২৲ শ্রীমতী শশিমুখী দেবী ১৲ গিরিবালা ঘোষ দ্বিতীয় পুত্রের জন্মোপলক্ষে ॥০ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ১০ কাজি এবদুল্যা ॥০ শ্রীমতী জ্ঞানদা সুন্দরী দেবী ১৲ শ্রীমতী বসন্ত কুমারী সিংহ ১৲ চারুচন্দ্র গোস্বামী স্ত্রীর আরোগ্য উপলক্ষে ১৲ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৲ অনাথ বন্ধু সমিতি ১৲ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ২৲ রমেশচন্দ্র সেন ২৲ শ্যামাচরণ মিত্র ১০৲ ৫০নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ।/০ নং ৬৩ হ্যারিসন রোড মেস ⅟১৫ নং ২৪ রামকান্ত মিস্ত্রির লেন মেস ১৲ ১২৬নং ওলড বৈঠকখানা মেস ॥০ নং ৮।১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন মেস্ ॥০ ১৬নং মুসলমান পাড়া লেন মেস্ ।/০ বিপিন বিহারী নন্দী /০ বিপিন কৃষ্ণ বসু নাগপুর ৫৲ দামোদর দত্ত ২৲ শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী ॥/০ দিননাথ গাঙ্গুলী ২৲ রাজেন্দ্রলাল সিংহ ১৲ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ॥০ গঙ্গা নারায়ণ মিত্র ১৲ প্রাণ কুমার ঘোষ ২৲ হরিদাস পাল Esq ১৲ শ্রীনারায়ণ তেওয়ারী ॥০ শ্রীমোহন সিংহ ১৲ কামিনীকান্ত গুপ্ত ২৲ বিপিন বিহারী রায় ৫৲ কুঞ্জ বিহারী সেন পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ১৲ তারকনাথ মিত্র পুত্রের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে ২৲ হিরালাল মিত্র ১৲ বরদাকান্ত রায় ১৲ Deabating club First-year Finstitution ২৲ কুমুদিনী কান্ত বন্দোপাধ্যায় ২৲ কুমার বলভদ্র দেব ১৲ শ্রীমতী সুমতীবালা দেবী কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে ২৲ কুমারী মৃণালিনী কর ২৲ শ্রীমতী হেমন্তবালা গুহ ১৲ শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দত্ত ।০ সত্য প্রসাদ দত্ত /০ গুপ্তদান ১৲ নিলমণী দে /০ প্রসন্ন কমল সিংহ ২৲ কৈলাস চন্দ্র প্রধান ১৲ একজন ভদ্রলোক রামচরণের খরচের জন্য ২৲ নং৬৭ ওলড্বৈঠকখানা মেস্ ১৫ নং২।১।১ পটুয়াটোলা লেন ।০ ১৩৪ ওলড্ বৈঠকখানা মেস /০ প্রবোধচন্দ্র দত্ত ।০ সার রমেশচন্দ্র মিত্র ৪৲ A sympathiser ।০ রাধাকান্ত দত্ত ।০ a Friend of Dasasram ১৲ সতীশচন্দ্র সাহা ॥০ একজন বন্ধু খাওয়াইবার জন্য ১৲ আশুতোষ মল্লিকের ভিক্ষা প্রাপ্ত ১৲ ঐ পড়িয়া পাওয়া ।০ বসন্ত বাবদ ফেরত গাড়ী ভাড়া মাঃ রামচন্দ্র মিত্র ২৲ A friend ১৲ শ্রীমতী চিন্তামনী দাসী চণ্ডিভেটী ৩৲ সুরেন্দ্রনাথ শাসমাল

চণ্ডিভেটী ২৲অভয় চরণ নাইতীর স্ত্রী ২৲ মাখনলাল মোদক ।॰ অঘোরচাঁদ বন্দোপাধ্যায় ১৲ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ ১৶১॰ রাজিব লোচন দাস ।॰ দুধের জন্য ।॰ ক্ষুদ্র দান শিলং ১৲ জনৈক ব্রাহ্মণ ৸৵৫ বাক্সে প্রাপ্ত ১।১৭॥ ব্রজগোপাল বসু ।॰ মোট ১১॰৴২।॰

বস্ত্রাদিদান।

বাবু বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী ধুতি ৩, মিরজাই ১, মোটা জামা ১, বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন পঞ্জীকা ১, কম্বল ১, শিবপুর এন্‌জিনিয়ারিং কলেজ আলোয়ান ১, সাট ৫, কোট ১, ধুতি ১।

জমা।

মাসিক চাঁদা ৩৬৲ বার্ষিক চাঁদা ২২৲ এককালীন দান ১১॰৴২।॰ দাসীর সাহায্য ২৬৲ ঘর ভাড়া আদায় ৪৲ প্রাপ্ত গচ্ছিত ২৫৲, পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ৩৶॰ কাগজ বিক্রয় ১৸৴॰ শিশি বিক্রয় ৸৴॰ পুস্তক বিক্রয় ১৶॰ পূর্ব্ব মাসের স্থিত ২৭৴১॰, নিত্য খরচের স্থিত ২৶১॰ বাজে জমা ১৲। মোট ২৬॰৸২॥

খরচ।

সংসার খরচ ৪৯।৶৭।॰, গিরিডি হইতে আসার বাকি শোধ ২৲, বিছানা খরিদ ৴॰ ধোপা ১।॰ দাহখরচ ১২।॰, গাড়ী ভাড়া ৩৲১॰, চাকর ৪৲, রাঁধুনী ১।৴॰ মেথর ৬।৴১৫, দুগ্ধ ৮৴॰, বাটী ভাড়া ৫৩৸৴১৫ কর্ম্মচারী ৫১৸॰ খাট খরিদ ২১৲ টাকার সুদ ১৲ খুচরা খরচের বাকী ১৴৫। মোট ২৪৫৸২।॰

জমা খরচ।

মোট জমা ২৬॰৸২।॰, মোট খরচ ২৪৫৸২॥॰ মোট হস্তেস্থিত ১৫৲

জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ এই তিন মাসে দাসাশ্রম মেডিকেল হল দাসাশ্রমকে ১১২৶॰ ঔষধ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

ভ্রমসংশোধন।

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মেদিনীপুর না হইয়া শরৎচন্দ্র ঘোষ হইবে।

দাসী

মহাত্মা রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল।

(প্রতিবাদ।)

বিগত ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যক "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের লিখিত "রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত গ্রন্থে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ হাজার লোক লইয়া এক প্রধান দলপতি হয়। রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন বলিয়া সে ব্যক্তি তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বটব্যালের লোক সকল অতি প্রত্যূষে আসিয়া রামমোহন রায়ের বাটীর নিকট ক্রমাগত কুক্কুটধ্বনি করিত এবং সন্ধ্যার পর তাঁহার অন্তঃপুরে গোহাড় প্রভৃতি পদার্থ নিক্ষেপ করিত" ইত্যাদি।

উমেশ বাবু সমালোচ্য প্রবন্ধে এই কথার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া উপরি উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহাতে উল্লিখিত চিত্রটি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হয়। রায় বংশের সহিত বটব্যাল বংশের দলাদলির অনেক কথা * * *। রাজা রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় বর্দ্ধমান রাজসংসারে ইজারা ইত্যাদিতে অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েন। রামজয় বটব্যাল তৎকালে রাজসংসারে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকায় ঐ টাকা আদায়ের তদ্বিরের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। ঐ টাকা আদায়ের যত্ন করায়, এবং ইজারা হইতে অপসৃত করায়, রামজয়ের প্রতি রায় বংশের ক্রোধ জন্মে। এই সময়েই প্রথমে রায় ও বটব্যাল বংশের মধ্যে শত্রুতার

সূত্রপাত হয়। বৃদ্ধগণের মুখে ইহাই প্রকৃত কথা বলিয়া শুনা যায়। রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন বলিয়া দলাদলির সূত্রপাত হয় নাই।"

বটব্যাল মহাশয় "বৃদ্ধগণের মুখে" যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই "প্রকৃত" আর নগেন্দ্র বাবু সবিশেষ অনুসন্ধানে যাহা জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাই "নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক", ইহা অতি অপূর্ব্ব মীমাংসা সন্দেহ নাই। বটব্যাল মহাশয়ের লিখিত দলাদলির সূত্রপাতের কথা—অর্থাৎ রামকান্ত রায়ের সহিত রামজয় বটব্যালের বিবাদের কথা সত্য বলিয়া অবধারণ করিলেও, রামজয় বটব্যাল যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উপলক্ষে রামমোহনের প্রতি কথিত প্রকার অত্যাচার করেন নাই, একথা সপ্রমাণ হয় না। অপিচ এই উপলক্ষে রামমোহন রায়ের প্রতি উৎপীড়ন করিয়া রামজয় বটব্যাল যে রামকান্ত রায়ের সহিত শত্রুতার প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, একথাও বলা যাইতে পারে। কিন্তু উমেশ বাবু পুনশ্চ বলিতেছেন,—

"রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যালের মধ্যে কে কাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, হুগলীর বিচারাদালত সমূহের নথি অনুসন্ধান করিলে তাহার কতক কতক নিদর্শন আজিও পাওয়া যাইবে।"

অনন্তর উমেশ বাবু স্বমত পরিপোষণের জন্য একখানি ফয়শলার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রামমোহন রায় এক শতের অধিক লাঠিয়াল লইয়া রামজয় বটব্যালের আবাদী ধান্য ফসল আম্র ও বৃক্ষাদি লুটতরাজ করিয়া তাঁহাকে জমি হইতে বেদখল করিয়াছিলেন। এই ঘটনা সত্য বলিয়া পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য লেখক বলিতেছেন, "এই মোকদ্দমায় জজ্ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রী পাইয়াছিলেন।"

রামমোহন রায় জমিদার ছিলেন। হইতে পারে রামজয় বটব্যালের সঙ্গে তাঁহার বৈষয়িক বিবাদ ছিল। এই বিবাদ নিবন্ধন রামজয় বটব্যাল মিথ্যা মোকদ্দমাও উপস্থিত করিতে পারেন। পরন্তু রামজয় ডিক্রী পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার আরজীর বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। বরং তদ্বির ও মিথ্যা সাক্ষীর জোরে আদালতে অধিক সময় সত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যা সত্য হইয়া যায়। উমেশ বাবু নিজে বিচারক হইয়া

একথা বিলক্ষণ বুঝেন। রাজা রামমোহন রায় এই সময়ে বিষয় ব্যাপার হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনি এই মোকদ্দমার বিষয়ে মনোযোগ না করায় কর্ম্মচারিগণের তদ্বিরের ত্রুটিতেই বোধ হয় এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারেন নাই। রামজয় বটব্যাল লুটতরাজ প্রভৃতি গুরুতর ফৌজদারী অপরাধে রামমোহন রায়কে অভিযুক্ত করিয়া কেবল ২০৯২৲ টাকার খেসারত পাইবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালীশ করিয়াছিলেন। তিনি ডিক্রী পাইয়া থাকিলে টাকারই ডিক্রী পাইয়াছিলেন। সুতরাং এতদ্দারা লুটতরাজ সপ্রমাণ হয় না। আর রামমোহন রায় এই মোকদ্দমায় কি জবাব দিয়াছিলেন, লেখক মহাশয়ের তাহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল।

আর এক কথা, উমেশ বাবু যে ফয়শলার নকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। এই সময়ে আদালতে পারসী ভাষা প্রচলিত ছিল। আদালত সমূহে পারসী ভাষার প্রচলন থাকায় বাদী প্রতিবাদী, সাক্ষী ও বিচারক সকলেরই অতিশয় অসুবিধা ঘটিত; এজন্য রামমোহন রায় ইংলণ্ড গমন করিয়া ১৮৩১ সালে বিলাতের পার্লেমেণ্টের সিলেক্ট্ কমিটীতে সাক্ষ্য প্রদান কালে আদালত সমূহে পারস্যের পরিবর্ত্তে ইংরাজি ভাষা প্রচলন করিতে কমিটীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমরা এ স্থলে সেই প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিতেছি;—

"8. *Q.* In what language are the proceedings of the courts conducted?

A. They are generally conducted in Persian, in imitation of the former Mohammedan rulers, of which this was the court language.

9. *Q.* Are the judges, the parties, and the witnesses sufficiently well acquainted with that language to understand the proceedings readily?

A. I have already observed that it is foreign to all those parties. Some of the judges, and a very few among the parties, however, are conversant with that languages.*

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। উমেশবাবুর বাঙ্গালা

* Vide English works of Raja Rammohun Roy: Vol. II. P. 525. Exposition of the Judicial and Revenue systems of India.

কয়শলা প্রমাণস্থলে গণ্য হইতে পারে না। পারসী কয়শলা দেখাইতে না পারিলে এ বিষয় তর্কস্থলে উপস্থিত হইতে পারে না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উমেশ বাবু ইতঃপূর্ব্বে মহাত্মা রূপসনাতনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী জুয়াচোররূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে সাহিত্য পত্রিকায় আর একটী প্রবন্ধাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কেও দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, মহাপুরুষগণকে অযথা আক্রমণ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন। রামজয় বটব্যাল মহাশয়ও একজন "বটব্যাল" এবং উমেশ বাবুও একজন "বটব্যাল" এই জন্যই কি তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ?

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র।

কৃষ্ণকান্তের উইল—আমরা কৃষ্ণকান্তের উইলকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস বলিয়া বিবেচনা করি। ইহাতে লেখকের পরিণত প্রতিভা পরিস্ফুট। "বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ" নামক প্রবন্ধে বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন "স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর নিজের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর, কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক।" যে গুণের জন্য থ্যাকারের Vanity Fair গ্রন্থের এত আদর সে গুণ কৃষ্ণকান্তের উইলে দৃষ্ট হয়—ইহার সকল চরিত্রগুলি সজীব। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত হইতে রূপো চাকর পর্য্যন্ত সকলেই সজীব। আজিও অশ্বথ, কদম্ব, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ শোভিত সুগ্রাম তটের মধ্য দিয়া উরগের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চিত্রা বহিতেছে, আজিও রূপজমোহে কত যুবক গুণ ছাড়িয়া রূপের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া কণ্টকবিদ্ধ ভাঙ্গ ভৃঙ্গের মত যাতনা ভোগ করিতেছে, আজিও পাপ প্রণয়ের ভীষণ ফল ফলিতেছে, আর আজিও কত গুণবতী ভার্য্যা পতির দুর্ব্যবহারে অকাল জলদোদয়ে সদ্যবিকশিত নলিনী যেমন শুকাইয়া যায় তেমনই শুকাইয়া যাইতেছেন। কৃষ্ণকান্তের উইল সম্ভবের রাজত্বে সংস্থাপিত।

গ্রন্থে তিনটি চরিত্র প্রধান—গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী।

গ্রন্থারম্ভে গোবিন্দলাল কর্ত্তব্যবোধী। তখন তাহার দাম্পত্যজীবন অসুখের নহে, কিন্তু সে কি কখন ভ্রমরকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিল? সাধারণ স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা,—কাহারও সংসারের ভাবনার জ্বালা নাই; প্রথমে মনে হয় গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বড় ভাল বাসিত। কিন্তু সেই প্রেম-বন্ধন জানি না কোথায় একটু শিথিল; একটু শিথিল না হইলে রোহিণী আসিতে পাইত না। "যে কখন ভাল বাসিয়াছে, তাহার ভালবাসার সামগ্রী তাহার নিকট হইতে দূরে যাইতে পারে না। জাগ্রতাবস্থায়ও যেমন, স্বপ্নেও তেমনই, সম্মুখে যেমন অন্তরালেও তেমনই, সে হৃদয় পূর্ণ করিয়া বর্ত্তমান থাকে;—অন্তরে বাহিরে যে প্রাণময় তাহাকে হারাইবার সম্ভাবনা কোথায়! সকলই পরিপূর্ণ করিয়া যেন সে বিরাজিত।" এই ভালবাসা যদি গোবিন্দলালের থাকিত তবে "প্রথম বর্ষার মেঘ দর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া" উঠিত না। ভ্রমর বলিয়াছে "যে যাকে ভালবাসে সে তাকেই ভাবে।" গোবিন্দলাল যদি সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভাল বাসিত তবে রোহিণী তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। যখন্ গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইল তখন বোধ হইল:—

তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুতূরারে
যাবত্ ফুল মালতী নাহি ফুটে।"

যেদিন কুসুমিত উপবনে বিহগকুলতান মুখরিত সায়াহ্নে অস্তমান রবির মত রোহিণীর বিষাদক্লিষ্ট মুখচ্ছবি গোবিন্দলাল দেখিল, সেই দিন তাহার অদৃষ্টাকাশে মেঘ সমাগম আরম্ভ হইল। সে দিন সে রোহিণীকে দয়া করিল—বিষাদ ভারাক্রান্তার উপর এই জটিল দয়া অনেক সময় রূপজমোহের এবং সময় সময় প্রেমেরও পূর্ব্বলক্ষণ; কারণ "Pity melts the mind to love." জগতলশায়িতা রোহিণীর মৃত-প্রায় দেহে প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া গোবিন্দলাল যখন হর্ম্ম্যতলে লুণ্ঠিত হইয়া জগতাতীত কোথাও হইতে বল প্রার্থনা করিল তখনই বুঝা গেল যে তাহার হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আসিয়াছে। এখন একবার গোবিন্দলাল ভাবিল "মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রম-রের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না।" ডুবিবার পূর্ব্বে মগ্নপ্রায় ব্যক্তি যেমন তীরের দিকে চাহে, গোবিন্দলাল তেমনই কর্ত্তব্যের দিকে চাহিল; সে বিদেশে গেল। কিন্তু মন যে সঙ্গে সঙ্গে যায়। যদি সে রোহিণীর সকল

কথা, সেই রজনীর কথা সকল ভ্রমরকে বলিত ; তবে ভ্রমর কখনই রোহিণীকে বিশ্বাস করিত না, গোবিন্দলাল প্রথমে রোহিণীর ভালবাসার কথা ভ্রমরকে বলিয়াছিল—এবার সে তাহা বলিতে পারিল না ; গোবিন্দলালের এই দুর্ব্বলতার কারণ রোহিণীর রূপজমোহ। তাহারপর বিদেশে গোবিন্দলাল ভ্রমরের পত্র পাইল—অগ্নি জ্বলিল। গৃহে ফিরিয়া গোবিন্দলাল দেখিল, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে—সে একবারও ভাবিল না যে হয় ত ভ্রমরের দোষ নাই—অবস্থা বিশেষে পড়িয়া সে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। বুঝিল না যে অবস্থার পরিবর্ত্তনে ;—

"The hottest horse will oft be cool
The dullest will show fire ;
The friar will often play the fool
The fool will play the friar."

তাহার পর সে একবারও ভ্রমরের নিকট সকল কথা শুনিল না, আত্মসমর্থন করিল না। ভ্রমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সব শুনিলেই সে বুঝিত যে ভ্রমর ভুল বুঝিয়াছে ; পত্নী ভুল বুঝিলে পতি ভিন্ন আর কে তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিবে ? সকল শুনিলে সে বুঝিত যে ভ্রমরের রাগ অভিমান নহে ; তাহা তাহার আদর্শবিকৃতিজনিত যাতনার আর্ত্তনাদ। স্বামীর উপর ইহা তাহার অভিমান নহে। ভ্রমর আপনার হৃদয়ে পুণ্য মহিমামুকুট মণ্ডিত গোবিন্দলালের যে মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিল গোবিন্দলালের কলঙ্ককাহিনী যখন সেই মূর্ত্তিকে পদাঘাতে স্থানচ্যুত করিয়া গেল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার রাগ অভিমান নহে, যাতনা *। গোবিন্দলাল রোহিণীর তীব্র রূপ সাগরের ফেনিল উচ্ছ্বাসে সকল ভাবনা, যাতনা ডুবাইতে চাহিল ; হৃদয়-মন্দিরে ভ্রমরের স্থানে রোহিণীকে বসাইল—তখন

"When the cat is away
The mise will play"

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর স্ত্রীর মাসহারা খাইব না বলিয়া যে অভিমান, সেটা ছুতা মাত্র। পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা বনিতার প্রতি তাহার দয়া হইল না, সে ভাবিতেছিল "এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি,

---

* ভারতীতে "ত্রিধারা" সমালোচনায় বাবু যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও কথাটী এইভাবে বুঝাইয়াছেন।—লেখক।

এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।” সে ভাবিল “Who will not change a raven for a dove ?” তাহার পর পাপের উপর পাপ বাড়িতে লাগিল, রূপজমোহ বিরক্তিকর হইয়া আসিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া সুখে থাকিবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিল,—

“পিয়াস লাগিয়া   জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।”

এই সময় চিত্রাতীরে নিশাচরের সহিত রোহিণী সাক্ষাৎ করিল। রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের যে সম্বন্ধ তাহাতে সদাই অবিশ্বাস, সদাই আশঙ্কা; গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা শুনিল, ভাবিল—“So young, so fair, so fawning and so false !” গোবিন্দলালের হৃদয়ে নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, আর “বালনখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ” রোহিণীর গত-প্রাণ দেহ ভূমিতলে লুটাইল। হৃদয়ে এই নরকাগ্নি জ্বলিলে হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তখন গুণের কথা মনে পড়িল, “জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত যে ভ্রমর” তাহাকে মনে পড়িল। কিন্তু সে কেবল অতীতের সুখস্মৃতি। এখন যাতনা ভুলিবার কিছু রহিল না; গোবিন্দলাল পুড়িতে লাগিল কিন্তু বাঁচিতে চাহিল। অন্নাভাবে কৃষ্ণকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ছয় বৎসর পরে পত্নীকে পত্র লিখিল;—একদিন সে ভ্রমরের সম্পত্তি ও তাহার সম্পত্তি ভিন্ন ভাবিয়াছিল—আজিও সে তাহাই ভাবিল,—ভাবিয়া হরিদ্রাগ্রামে ভ্রমরের গৃহে স্থান চাহিল। ভ্রমর যখন বুঝিয়াছিল যে স্বামী তাহার সম্পত্তি ও আপনার সম্পত্তি ভিন্ন ভাবিতেছে, সেই দিন সে তাহার সকল সম্পত্তি স্বামীকে দিয়াছিল। যে দুর্দ্দিনে গোবিন্দলাল স্বামীস্ত্রীর সম্পত্তি ভিন্ন ভাবিয়াছিল, সেই দুর্দ্দিনে আপনার সর্ব্বস্ব আপনাকে ও স্বামীকে সমর্পণ করিয়া আবার ভ্রমর লৌকিক ভাবে তাহার সম্পত্তি গোবিন্দলালকে দিয়াছিল। তখন অহঙ্কারী গোবিন্দলাল তাহা লয় নাই—আজিও সে পত্নীর পত্র পাইয়া হরিদ্রা গ্রামে যাইতে চাহিল না। পত্রে সে স্পষ্ট করিয়া ক্ষমা চাহিতে পারে নাই, এখনও সে ক্ষমার কথা ভাবিতে পারিল না!! কিন্তু এইবার গোবিন্দলাল যাতনা অনুভব করিল, সে হৃদয়ে শতবৃশ্চিক-দংশন-যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। এইবার সে বুঝিল যে, সে আপনার দোষে সকল হারাইয়াছে। তাহার পর বিষাদক্লিষ্টা পত্নীর মৃত্যুশয্যার প্রান্তে গোবিন্দলাল—রোহিণীর মরণের হেতু গোবিন্দলাল ভ্রমরেরও

মরণের হেতু গোবিন্দলাল। গোবিন্দলাল দাঁড়াইয়া দেখিল মধ্যাহ্ন তপন-তাপতপ্ত মরুময় সংসারে যে তাহার পক্ষে—"ধন্বন্তরি ভাণ্ডনিঃসৃতসুধা" সেই ভ্রমর তাহারই দুর্ব্ব্যবহারে তাহার পদধূলি মস্তকে লইয়া অকালে মরিল—ফুটিতে ফুটিতে কোমলা অপরাজিতা শুকাইয়া গেল। এইবার গোবিন্দলালের ভীষণ অনুতাপানল জ্বলিল। নগেন্দ্র দত্ত ও গোবিন্দলাল উভয়েই সংসারে সুখ বই দুঃখ জানিত না; সংসারের খেয়ায় তুফান দূরে থাকুক, তাহারা কখনও উজান বাতাসও ভোগ করে নাই, তাই প্রথম ঝড়েই নৌকা ডুবি হইয়াছে। তাহারা প্রথম প্রলোভন জয় করিতে পারে নাই। যদি তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দৃঢ় করিত, তবে আত্মসংযম তাহাদিগের পক্ষে কঠিন হইত না।

বঙ্গদর্শনে কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশিত হইবার কয় মাস পূর্ব্বে, বঙ্কিম-চন্দ্র দ্রৌপদী চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়া-ছিলেন, "কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমল প্রকৃতি সম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শ স্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধবাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনক দুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্যনায়িকা (!) সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে, যদি বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও নায়িকাকে দ্রৌপদীর তেজগর্ব্বে ভূষিতা করিয়া থাকেন, তবে সে ভ্রমরে। স্থান দোষে, সম্বন্ধ দোষে, ক্ষমতার অপ্রাচুর্য্যে বিমলায় সে চেষ্টা সফল নহে। সীতা বা সূর্য্যমুখীর অপেক্ষা দ্রৌপদী বা ভ্রমরের পতিপ্রেম অল্প নহে। সীতা বা সূর্য্যমুখীর আপনার সতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, দ্রৌপদী বা ভ্রমরের তাহা আছে—এইখানেই প্রভেদ, এইখানেই মাধুরী। সূর্য্যমুখী স্বামীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে চাহিতেন না, ভ্রমর জানিত স্বামীর কার্য্য সমালোচনায় স্ত্রীর অধিকার আছে; স্বামীকে পাপপথ হইতে ফিরাইতে, পুণ্যপথে লইতে স্ত্রীর মত অধিকার আর কাহারও নাই। গ্রন্থারম্ভে ভ্রমর হাস্যময়ী, প্রেমময়ী, তাহার যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য হইতে আনন্দালোক কিরণ বিস্ফুরিত হইয়া গৃহ আলো করিতেছে। যখন গোবিন্দলাল ভাবিল রোহিণী উইল চুরি করিতে আসে নাই, তখন ভ্রমরও তাহাই ভাবিল; "গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।" ভ্রমরের বিশ্বাসে—প্রেমে কোথাও মালিন্য নাই।

ভ্রমরে দাম্পত্যসুখের আদর্শ। তাহার পর অন্ধকার আসিল—উজ্জ্বল আলোক ম্লান হইয়া আসিল। ভ্রমর স্বামীকে লিখিল, "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস।" একথা সূর্য্যমুখী লিখিতে পারিতেন না, ইহা ভ্রমরেরই উপযুক্ত কথা। এই পত্র লইয়া কোন কোন সমালোচক ভ্রমরের নিন্দা করিয়াছেন—ইহা "হিন্দু পত্নীর" উপযুক্ত নহে। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন নাই যে, যে অবস্থায় পড়িয়া ভ্রমর রোহিণীর কথা বিশ্বাস করিয়াছিল, সে অবস্থায় বিশ্বাস করা অসম্ভব নহে; এদেশের অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীগণ বহির্জগতের কিছুই জানেন না, কাজেই সহজে কোন কথা বিশ্বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আর গোবিন্দলাল প্রথমে কথা গোপন করিয়াই সন্দেহ আনিয়াছিল, দোষ ভ্রমরের নহে। রোহিণী আসিবার পূর্ব্বেও ভ্রমর ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, "তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না।" প্রেম ও ভক্তি সতন্ত্র দ্রব্য—ভক্তি সকলের প্রাপ্য নহে, কিন্তু ভ্রমর কি কখন স্বামীকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিয়াছে? ভ্রমর গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিয়াছেন "কেন না রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া" সত্যই

"ধাতার করুণা মর্ত্তে নারী অবতার
নরহৃদি বেদনা বারিতে।"

এখন একবার গোবিন্দলালের "আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতাকে" মনে করিলে বুঝা যাইবে ভ্রমর কি অসীম আবেগের সহিত স্বামীকে ভাল বাসিত। তবুও গোবিন্দলাল ফিরিয়া চাহিল না। ভ্রমর বলিল, "আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুতুল।" গোবিন্দলাল বুঝিলনা পত্নী পতির,

"গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথ
প্রিয়শিষ্যা ললিতেকলাবিধৌ।"

তাহার পর বিদায় কালে ভ্রমর বলিল, "আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন?" কিন্তু গোবিন্দলাল পাষাণে বুক বাঁধিয়াছিল! শেষ "অবিকম্পিত

কষ্টে" ভ্রমর বলিল "তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও এক দিন তুমি খুঁজিবে এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়। * * * তুমি আমারই, রোহিণীর নও।" বড় দুঃখে বড় কষ্টে ভ্রমর এত কথা বলিল। কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-স্ফুরিতাধরা ভ্রমর কর্ত্তব্য সাধন করিল। এ সকল কথা ভ্রমরেরই উপযুক্ত। তাহার অন্তরের তীব্র যাতনায় ভ্রমর প্রপীড়িতা হইতে লাগিল, "অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।" অসুস্থ শরীরে ভ্রমর পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে আসিল, "যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।" তাহার পর মোকদ্দমার কথা শুনিয়া সে পিতাকে বলিল, "দেখিও আমি আত্মহত্যা না করি।" এখন ভ্রমরের পতিপ্রেম এতটুকু মলিন নহে। গোবিন্দলালের উপর তাহার রাগ যে অভিমান নহে—যাতনা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ষষ্ঠ বৎসরে অন্ন কষ্টে পড়িয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে লিখিল "পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?" ভ্রমর যদি অতীত ভুলিয়া আজি স্বামীকে পূর্ব্বের মত আসিতে বলিত, তবে বুঝিতাম বৃথা ভ্রমর এতদিন একটা উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে—সে তাহার ভণ্ডামি মাত্র। ভ্রমর লিখিল,—"আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।" ভ্রমর জানিত এখন সে আর গোবিন্দলালকে ভক্তি করিতে পারিবে না, এখন দুইজনে একত্র বাস না করিলেই উভয়ের মঙ্গল। এইখানে ভ্রমরের যে মাধুরী প্রকাশিত হইল—তাহার যে নৈতিক তেজ বিকশিত হইল তাহা অসামান্য। যে কর্ত্তব্যজ্ঞান ভ্রমরের মেরুদণ্ড তাহা দৃষ্ট হইল—এ অগ্নিপরীক্ষা হইতে ভ্রমর অক্ষুণ্ণ গৌরবান্বিতা হইয়া আসিল। নগেন্দ্র দত্ত ও গোবিন্দলালের পক্ষে প্রথম জীবনে "all went merry as a marriage bell" তাই তাহারা পাপ প্রলোভনে পতিত হইয়াছিল, আর ভ্রমর রমণী হইয়াও কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বামী সন্দর্শনের প্রবল বাসনা রোধ করিল। ভ্রমর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান এমনই প্রবল করিয়াছিল। যাহাতে নগেন্দ্র দত্ত বা গোবিন্দলাল কর্ত্তব্য ভুলিল, সে কেবল হৃদয়ের দৃঢ়তার অসীম অভাব। তাহার পর মৃত্যু শয্যায় ভ্রমর—বাসন্তী জ্যোৎস্নালোক কক্ষ প্লাবিত করিয়াছে, আজি মরিবার সময় পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া ভ্রমর শয্যার উপর বিকচ কুসুম রাশি ছড়াইয়া কুসুমশয়ন রচনা করিয়া তাহাতে

শয়ন করিয়াছে। আজ তাহার শুষ্ক অশ্রুর উৎস হইতে অশ্রু বহিল—তাহার হৃদয়ে পতি-সন্দর্শন-লালসা প্রবল হইয়া উঠিল। ভ্রমর ভগিনীকে বলিল, "আজিকার দিনে—মরিবার দিনে, দিদি, যদি একবার দেখিতে পাইতাম্! একদিনে, দিদি, সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।" ভ্রমরের ভালবাসা কি গভীর!! আজ মরণের কূলে তাহার বাসনা-সাগরে উচ্ছ্বাস উঠিল—নিবিবার পূর্ব্বে প্রদীপ জ্বলিল। গোবিন্দলাল কক্ষে প্রবেশ করিল। শীর্ণ হস্ত বাড়াইয়া ভ্রমর স্বামীর চরণযুগল স্পর্শ করিল, পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। আর বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" বড় ব্যথা বহিয়া অক্ষুণ্ণ সৌরভে কুসুমকলিকা শুকাইয়া গেল। যাও ভ্রমর তোমাকে

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে॥"

ভ্রমরে পত্নীত্বের আদর্শ বিকাশ। ভ্রমর বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজিত নারী-চরিত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, "বঙ্কিম বাবুর সূর্য্যমুখী আদর্শ অনুযায়ী হিন্দু পত্নী এবং তাঁহার ভ্রমর ঠিক আদর্শানুরূপ না হইলেও খাঁটি হিন্দুপত্নী বটে।" ভ্রমর আদর্শ হিন্দুপত্নী কিনা সে বিষয় লইয়া শ্রদ্ধেয় লেখকের সহিত মতভেদ প্রকাশ করা বৃথা; কারণ লোকের রুচির সহিত আদর্শ প্রভেদ হইয়া থাকে; একজন আদর্শ হিন্দুপত্নী বলিলে যাহা বুঝিবেন, আর একজনের তাহা না বুঝা আশ্চর্য্য নহে। আমাদিগের মতে আদর্শ পত্নী হিসাবে সূর্য্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমরের স্থান অনেক উচ্চে। ভ্রমর নারীচরিত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। ভ্রমরের চরিত্রে যে সার্ব্বজনীন আদর্শোপযোগিতা আছে, তাহাকে কোন সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া তাহার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিলে কবির কল্পিত আদর্শ মহিলা-চরিত্রের উপর পাশব অত্যাচার করা হয়। হায় এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আজিও কি শুনিতে হইবে যে পতির কোনও কার্য্যে পত্নীর অধিকার নাই:" তপনতাপে ছত্রে, কর্দ্দমে পাদুকায় বা স্বামীর ইষ্টানিষ্ঠ দর্শনে রমণীর কি কোনই অধিকার নাই!!! যে জাতি রমণীদিগকে নিতান্ত হীন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে বরং তাঁহাদিগের অধীনতা, অজ্ঞানতা এবং যাতনার বন্ধন দৃঢ় করিতে চাহে, যে জাতি রমণীর প্রতি সম্মান দেখাইতে জানে না, সে জাতির উন্নতির আশা কোথায়?

যখন "তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী, প্রভাত শুক্রতারারূপিণী রূপতরঙ্গিনী, চঞ্চলা রোহিণী" প্রথম পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তাহার উদ্বেলিত হৃদয় লালসায় তরঙ্গসঙ্কুল। তখন তাহার ভরা যৌবন, অসামান্য রূপ, সে

"যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥"

সে বালবিধবা, কিন্তু সে চিত্তবৃত্তি দমন করিতে শিখে নাই, ইহাই তাহার অধঃপতনের হেতু ('বিষবৃক্ষে হীরারও অধঃপতনের কারণ আত্মসংযমাভাব) হরলাল তাহার স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে তাহাকে মিথ্যা আশা দিল, রোহিণী, মুগ্ধা রোহিণী সহজেই তাহার কথায় বিশ্বাস করিল। হরলাল তাহার নব মুকুলিত আশা পদদলিত করিয়া গেল—রোহিণী জ্বলিতে লাগিল। তখন ঢালুদিকে জলের মত, তাহার প্রেম প্রথম অবলম্বন গ্রহণ করিল। সে জল আনিতে বারুণী পুষ্করিণীতে গেল। সেই বিচিত্র বর্ণবৈচিত্রবহুল বিকচ কুসুম, শোভাময় উদ্যান, সেই মৃদু মধুগন্ধ, সেই গগনতলপ্লাবী বসন্ত পবন-বাহিত কোকিলের কুহু তান, সেই বারুণীর কাল জলে রবিকরের খেলা, আর সেই মূর্ত্তিমান স্কন্দবীরের ন্যায় গোবিন্দলাল—রোহিণীর হৃদয়ে বসন্তের সাড়া পড়িল, হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জ নিকেতনে কোকিলের স্বর শ্রুত হইল, রাশি রাশি কুসুম বিকশিত হইল, রোহিণী মজিল, সে ভাবিল!—

"পত্রপুষ্প-গ্রহ-তারাভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে,
কি ললাট, কি নয়ন, কি শান্ত অধর!"

"গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়-পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল।" সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা হইয়া উইল বদলাইতে গেল, ধরা পড়িল। সেই সময় "কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ হইল।" কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল বলিল, "রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয়, তোমার ভাল।" রোহিণীর বড় আশায় ছাই পড়িল। ভ্রমরের কথা মত সে বারুণীর জলে ডুবিল। গোবিন্দলাল যাইয়া দেখিল "স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে

শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।" রোহিণী প্রাণে বাঁচিল। একদিন সে "আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না ?" এই ভাবিয়া কলঙ্ক বহিয়াও সে হরিদ্রা গ্রাম ছাড়িতে চাহে নাই, আর আজ সে বাঁচিয়া বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন।" স্পষ্টই বলিল, "চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।" রোহিণীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়াছে—হৃদয় দগ্ধ হইতেছে! গোবিন্দলাল জমীদারী দেখিতে গেল, রোহিণীর হৃদয়ে গোবিন্দলাল-লাভলালসা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। এই সময় গ্রামে তাহার কলঙ্কের কথা রটিল, আর রোহিণীর পাপপুণ্য জ্ঞান রহিল না, তাহার হৃদয়ে ভীষণতম সঙ্কল্প স্থির হইল। এইবার সে ভাবিল, ঐ যে ভ্রমর আমার সুখের পথে কণ্টক, আমার আনন্দের অন্তরায়, ঐ কুরূপা আপনার কালোরূপে আমার রূপশিখা ঢাকিয়াছে, নহিলে এতদিনে গোবিন্দলাল পতঙ্গ তাহাতে পড়িত, আমার যে কলঙ্ক হইবার তাহা ত হইয়াছে, এখন উহাকে আমার পথ হইতে অপসৃত করি। সে ভ্রমরকে বুঝাইয়া গেল যে, সত্যই তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে; ভ্রমর তাহাই বুঝিল। কয় বৎসর পরে যে দিন আত্মীয়স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে কলনাদিনী নিম্নগাতীরে প্রসাদপুরের "অশোক বকুল কুটজ কুরুবককুঞ্জ" মধ্যস্থিত প্রাসাদতুল্য ভবনে হর্ম্ম্যতলে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে গতপ্রাণা রোহিণী "বালকনখর বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ" লুটাইবে, আজ সেইদিন বর্ষণ জন্য রোহিণীর অদৃষ্টাকাশে করালকাদম্বিনীকুল সমাগত হইতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল ও রোহিণী পাপসুখরত তখন নিশাকর সেখানে গমন করিলেন। রোহিণী দেখিল, "মনুষ্য মধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান।" রোহিণীর অদৃষ্টাকাশে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল; কিন্তু তখনও তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প, "গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না।" স্বচ্ছান্ধকারময় চিত্রাতীরে দাঁড়াইয়া রোহিণী নিশাকরকে বলিল,—"একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।" এই স্থানে রোহিণীর চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। যে রোহিণী অল্প আশায় হরলালকে হৃদয়দানের ইচ্ছা করিয়া আবার সে চলিয়া গেলেই তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছিল, ইহা সেই রোহিণীর উপযুক্ত কথা; কিন্তু যে রোহিণী গোবিন্দলালকে দেখিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিতা

হইয়া উইল বদলাইতে গিয়াছিল, যে রোহিণী গোবিন্দলালের দর্শন লাভাশায় কলঙ্ক বহিয়াও হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিতে সম্মতা হয় নাই, যে রোহিণী গোবিন্দলালের প্রেম প্রতিদানের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বারুণীর জলে ডুবিতে পারিয়াছিল, যে রোহিণী গোবিন্দলালকে বলিতে পারিল ;—

"এস তবে প্রাণ সখে ; দিনু জলাঞ্জলি
কুল মানে তব জন্যে, ধর্ম্ম, লজ্জা ভয়ে ;
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন পথে ধর আসি তীরে।"

যে রোহিণী এখনও গোবিন্দলালের নিকট বিশ্বাসহন্ত্রী হইবে না স্থির করিল, যে রোহিণী মরিবার পূর্ব্বেও ভাবিল "ইহাকে (গোবিন্দলালকে) যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন ?" ইহা সে রোহিণীর উপযুক্ত নহে। যে রোহিণীর হৃদয়পটে গোবিন্দলালের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, সে রোহিণী কেমন করিয়া ভাবিল "নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে ?" যে রোহিণী গোবিন্দলালের জন্য এত করিল, সে রোহিণী কেমন করিয়া ভাবিল "স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য।"! রোহিণী পাপ করিয়াছিল—সে ধর্ম্ম ও নীতির, সমাজের পবিত্রতার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল, সে গোবিন্দলালকে পাপে ডুবাইয়াছিল, সে ভ্রমরের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, সে সুখ শান্তিময় একটা সংসার ছারখার করিয়াছিল ; কিন্তু তাহার শাস্তির জন্য এত সত্বর তাহার মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে যে তাহার পূর্ব্ব চরিত্রের সহিত তাহা মিশ খায় না। রোহিণী-চরিত্রে এই সামান্য অসামঞ্জস্য, এই সামান্য দোষ।

মাধবীনাথ ও নিশাকর সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই—দুই বন্ধুই বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন, চতুর। কিন্তু "নক্ষত্রচ্ছায়া প্রদীপ্ত চিত্রাবারি" তীরে নিশাকরের চিন্তা সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। বন্ধুর উপকারের জন্য রোহিণীর সর্ব্বনাশ সাধন পর তিনি বাঁকা পথ লইয়াছেন বুঝিয়াছেন। যদি তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ হয় তবুও এ স্থানে

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

বলিয়া আত্মপ্রবোধ বড়ই কেমন। ইহা বলিয়া ত সকলেই আপনাপন কার্য্য সমর্থন করিতে পারে!!! সামান্য বেতনে দারিদ্রের কশাঘাৎ প্রপীড়িত হইয়া অনেক সময় লোকে কিরূপে প্রলোভনে পড়ে, পোষ্ট মাষ্টারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সংসারের অদ্ভুত বা অসাধারণ কিছু লইয়া ডিকেন্স প্রভৃতির মত পুস্তকে সন্নিবেশিত করেন নাই, তাই "মল পায়ে" চাকরাণীর চিত্র আশ্চর্য্য নূতন বোধ হয়।

কি চরিত্র সৃজনে, কি ঘটনা সন্নিবেশে দেখিতে গেলে কৃষ্ণকান্তের উইল নিশ্চয় বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভ্রমরের মৃত্যুর পরেই প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ শেষ হইল—তাহার পরবর্ত্তী উপসংহারের বিশেষ উপযোগীতা নাই। যাঁহারা প্রসিদ্ধ লেখক কিংস্লির Yeast নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থ শেষ হইলে গ্রন্থের তৎপরস্থ অংশ পাঠ করা কষ্টকর কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় গুণে কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষ অংশও সুন্দর। কৃষ্ণকান্তের উইল ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, ইহা কেবল লেখকের নহে পাঠকেরও সৌভাগ্য বলিতে হইবে। অনুবাদে শ্রীমতী নাইট অনেকগুলি ভীষণ ভ্রম করিয়াছেন; একে ত অ্যাণ্ডুল্যাং সত্যই বলিয়াছেন "The art of translation has never been discovered." তাহাতে আবার লেখিকা অনেক স্থলে ভাব বুঝিতে পারেন নাই। তাহা সত্ত্বেও ইংরাজী পাঠক যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মহিলা-চরিত্র (ভ্রমর) দেখিয়া আনন্দিত হইবেন আমাদের এ বিশ্বাস আছে।

জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত অসীম অম্বরতলে ম্লান তটচ্ছায়া বুকে ধরিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া, মৃদুকলনাদে চিত্রাবারি যেমন বহিয়া যায়, কৃষ্ণকান্তের উইলে ঘটনাস্রোত তেমনই বহিয়া গিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে আলোক জাগাইয়া, কলগীতিতে শ্রবণ বিমোহিত করিয়া সে স্রোত বহিতেছে; তীরে দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখিলে, সেই কলকল গদগদ নাদ শ্রবণ করিলে এক অলস মাধুরীর স্বপ্ন হৃদয় ছাইয়া ফেলে—যেন গগনতলপ্লাবিত করিয়া, শ্রবণে অমিয় ঢালিয়া দূরাগত ললিত-মধুর গীতস্বর মন মোহিত করিতেছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

অতিথি।

(অনুবাদ)

নীরব দুঃখ আমার সঙ্গে
বসিয়া ছিল।
নিবেছে প্রদীপ, কক্ষ আঁধার ;
বৃষ্টি ভাঙ্গিছে শাসি জানালার,
ঘোর দুর্য্যোগ ;—দুয়ারে কে আসি
আঘাত দিল।
মধুর স্বরে
কহিল, এসেছি অতিথি হইতে
তোমার ঘরে।

কহিলাম আমি—ত্বরায়, দুঃখ,
জ্বালিয়া বাতি,
বস প্রফুল্ল করি' মুখ খানি ;
আমি তবে যাই, অতিথিরে আনি,
তুমি রাখ তার বসিবার তরে
আসন পাতি।
ছুটিয়া দ্বারে
"স্বাগত পথিক, অতিথি দেবতা"
কহিনু তারে।

আসিল পথিক, তখনো আঁধার,
দেখিনি তায়।
বসিল আসনে, জানিনি কে লোক ;
ক্ষণ পরে যাই জ্বলিল আলোক,
দেখিনু আমার জীবন ধন্য
সে দিন, হায় ;
প্রভু আমার
আসিয়াছিলেন, বর্ষিতে হৃদে
অমৃত-ধার'।

চিত্রা।*

প্রথম হইতেই বলিয়া রাখি, আমার এই প্রবন্ধটি সমালোচনা নহে। একখানি নূতন উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, সেইখানি পড়িয়া যাহা মনে হইতেছে, তাহাই লিখিব। ছয় রিপুর উপর সপ্তম রিপু—অর্থাৎ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন, তাহার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া হয়ত চিত্রার এক চতুর্থাংশ এইখানেই উঠাইয়া ফেলিব—কিছুমাত্র সংযমের চেষ্টা করিব না। তাহাতে পাঠকের লাভ আছে, বিনামূল্যে চিত্রার অনেকটা পড়িয়া লইবেন; আমার লাভ আছে, আমার এই কুলিশ-কঠোর গদ্য টুকরা টুকরা হইয়া থাকিবে, এবং পরতে পরতে কাব্যরসে ভিজিয়া নিতান্ত বৃদ্ধ ছাড়া আর সকলেরই দণ্ডে উত্তমরূপে চূর্ণ হইতে পারিবে। হয়ত এমন কথা বলিব, যাহা স্বয়ং কবিই কখনও ভাবেন নাই; এমন স্থানে সংশয় করিব যাহা নিতান্তই সরল, এমন স্থানে অভিভূত হইয়া পড়িব যেখানে অন্যে ছন্দ ও মিল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না, এবং এমন স্থান ছাড়িয়া দিয়া যাইব যাহার প্রশংসা করিবার জন্য ভাষায় অনটন পড়িয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এখন বঙ্গের একমাত্র জীবিত ও যুবক কবি। উকীল হেমচন্দ্র মাথায় শাম্‌লা বাঁধিয়া দিব্য ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু কবি হেমচন্দ্রের বহুদিন যাবৎ ৺ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিলেও গীতা গীতা করিয়া আপনার বার্দ্ধক্য ঘনাইয়া তুলিতেছেন। বর্ত্তমান কালে ফুলের গন্ধ, মলয় বাতাস, প্রেমসঙ্গীত, প্রিয়ার চাহনি, উচ্চ-মিষ্টহাস্য কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই পাওয়া যায়। আরও দুই একখানা গ্রন্থে এবং মাসিক পত্রের দুই এক সংখ্যায় একটু আধটু পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা এমন খাঁটি নহে, এমন প্রাণভরাও নহে।

রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন রচনার সঙ্গে পূর্ব্বের রচনাগুলি তুলনা করিলে দেখা যায়, মূলতঃ এক থাকিলেও অন্তরংশে ও বহিরংশে দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বের কবিতা লঘু গোলাপের মত ছিল, এখন সুবিকসিত পদ্মটীর মত হইয়াছে; কিশোরী বালিকার মত ছিল, এখন জিম্‌ন্যাষ্টিকের পূর্ণাবয়ব যুবকের মত হইয়াছে।

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র হইতে শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৸০

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। একদল রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে, একদল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি নব্য যুবক ;—ইঁহারা সকলেই প্রায় এক প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—মনুষ্যের চিড়িয়াখানা। (ক) বৃদ্ধ—তাঁহাদের কাণে দাশুরায়ের অনুপ্রাস, ভারতচন্দ্রের শব্দ পারিপাট্য এমনি লাগিয়া আছে, যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কেহ কেহ মাইকেল অবধি নামেন, আর নহে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহাদোষে দোষী—তিনি অল্পবয়স্ক। যাহাকে এখন উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখিতেছি, আমি বৃদ্ধ হইলে এবং সে যুবক হইলে যদি কেহ আসিয়া আমাকে বলে—দেখুন অমুক এমন হইয়াছে ; হয়ত আমি বলিব,—কে অমুক ? আরে না না ; ও সব বাজে কথা। বৃদ্ধের কাছে যাহা পুরাতন তাহাই প্রাণপ্রিয় মনে হয়, নূতন (তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন) কিছুই ভাল লাগে না। সুতরাং নব্যকবির রচনা কেমন করিয়া ভাল লাগিবে ? তাহা আশা করাই অন্যায়। মানুষের যৌবনের স্মৃতি সঙ্গীতের মত মৃত্যুক্ষণ অবধি মনে জাগিয়া থাকিয়া তাহাকে মোহিত করিয়া রাখে। তখন সে দিনগুলি যত না মিষ্ট, যত না সুন্দর ছিল, এখন দূর হইতে সেইগুলিই শতগুণ মিষ্ট ও সুন্দর মনে হয়। তখন যে দেশকে, যে দৃশ্যকে, যে রাগিণীকে, যে কবিকে সে বলিয়াছে "আহা" সেই দেশ, সেই দৃশ্য, সেই রাগিণী এবং সেই কবিই মৃত্যুদিন অবধি তাহার আহা থাকিবে। এইটি মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে একটি অব্যর্থ নিয়ম। (খ) প্রৌঢ়—এখনকার প্রৌঢ়েরা একদিন কাব্যে, সাহিত্যে ভারি মাতিয়াছিলেন—সেই বঙ্গদর্শনের সময়। ইঁহারা অনেকে হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" আবৃত্তি করিয়া বয়সকালে অনেক হা হুতাশ করিয়াছিলেন, যদিও এখন তাহা কোন ক্রমেই স্বীকার করেন না। ইঁহারা এখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাহার কারণ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইঁহাদের হৃদয়বীণার যে তন্ত্রীগুলিতে আঘাত করিয়া টুংটাং শব্দ বাহির করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রীগুলিই এখন এমন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের [illegible]তে ছড়্ ছড়্ শব্দমাত্র করিয়া থামিয়া যায়। (গ) যুবকের মধ্যে যাঁ[illegible]র বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। একটি ইং[illegible]র্থকাম গ্রন্থকারেরা সমা-

লেন, বা[illegible]

অমৃত-ধার'।

লোচক (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক) হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগীতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি, আক্রোশ ও ঘৃণা হইয়া থাকে,—এটা নিতান্ত স্বাভাবিক। ইহারা অনেকে বিদ্বান, কৃতী, সম্ভ্রান্তশ্রেণীর; ইহাদের আবার যাহারা ধামাধরা আছে তাহারা শুনিয়া শুনিয়া বলিয়া থাকে, রবিঠাকুর আবার কবি! সত্য সত্য আমি এমন লোকের মুখে এ কথা শুনিয়াছি, যে কস্মিন্‌কালে রবীন্দ্রনাথের একখানি গ্রন্থ, এমন কি একটিও কবিতা পাঠ করে নাই।—আমাদের কলেজের কতকগুলি যুবক অকালে নিতান্ত জেঠা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে। এই সকল যুবককে চিনিবার জন্য কতকগুলি লক্ষণ এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। (১) তাহারা অশ্লীল কথা কহিয়া মনে করে ভারি রসিকতা করিলাম। (২) পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েছেলে দেখিলে আপনা আপনির মধ্যে কুৎসিৎ হাসি তামাসা করে। (৩) কোনও নূতন ভাল বিষয়ে কাহারও চেষ্টা দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করে। (৪) কোনও বিষয় পুরাতন হইলে, যদি নিতান্ত মন্দও হয়, তথাপি তাহার জন্য খুব লড়িয়া থাকে—ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দলের লোক সংখ্যা অধিক। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা রবি-ভক্তের দল এখন অনেক বাড়িয়াছে—এ বৃদ্ধি "রাজা ও রাণী" প্রকাশিত হইবার পর হইতে। তাঁহার চমৎকার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতেও শত্রুপক্ষের অনেকে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

এটা আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যাহারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, তাহারা ভারি গোঁড়া। কেহ যদি রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে একটি কথা বলিল, অমনি রণংদেহি রণংদেহি বলিয়া তাহারা গর্জ্জন করিয়া উঠে। বোধ হয় এই কারণেই, যাহারা বিপক্ষে, তাহারাও ঘোরতর বিপক্ষে। অনেক ছাত্রাবাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া শেষকালে শত্রুপক্ষে মিত্রপক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে শুনিয়াছি। অনেকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যুদ্ধ করিতে এতই প্রস্তুত, যে সহসা মনে হয়, লোকটা এই ম্যানিয়াগ্রস্ত। ইহার কারণ কি? বঙ্গের আর কোনও লেখকের ত এরূপ দৃঢ়বিভক্ত শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষ নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যদি কাহারও হৃদয়বাঁধে

একটু ছিদ্র থাকে, সেই পথ দিয়া অল্পে অল্পে জলপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড় আরও বড় আরও বড় হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়টা জলপ্লাবিত হইয়া যায়। আর, যাহার হৃদয়বাঁধে ছিদ্রই নাই, তাহার কোনও ল্যাঠাই নাই ; তাহার ভিতরে এক ফোঁটা জলও প্রবেশ করিতে পায় না ; এমন লোক তর্ক করিয়া সেই সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা ত করিবেই !

এইবার গৌরচন্দ্রিকা ছাড়িয়া বহিখানাতে হাত দিই। চিত্রা দেখিতে বেশ, কিন্তু প্রথম সংস্করণ সোনার তরীর মত হয় নাই। যাহারা রবীন্দ্র-নাথের ভক্ত, তাহারা প্রায়ই বাছা বাছা ; তাহারা অনায়াসেই দেড় টাকার স্থলে দুই টাকা দিয়া চিত্রা কিনিতে প্রস্তুত ছিল, যদি চিত্রা দেখিতে আরও ভাল হইত। কেহ কেহ বলেন, ভাল পুস্তকের খুব ভাল কাগজ, ভাল বাঁধাই, ভাল মলাট না-ই হইল। আমরা বলি—তা' ত বটেই, তবে কি জান ?—ইত্যাদি। অর্থাৎ বেশ সন্তোষজনক একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারি না, তথাপি ইচ্ছা করি বহিখানি দেখিতে খুবই সুন্দর হয়। চিত্রার কবিতা-গুলি একটি ছাড়া সবই সোনার তরীর পরে লেখা। শেষ কবিতাটির তারিখ ২০ ফাল্গুন,১৩০২। কবিতাগুলির তারিখ দেখিয়া দেখিয়া একটা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি,—"সাধনা" থাকিতে রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পই লিখিয়া-ছেন। চিত্রার সমস্ত কবিতাগুলি দুই বৎসরে লেখা, কিন্তু অর্দ্ধাংশের কিছু কম, সাধনা বন্ধ হইবার পর এই তিন মাসে রচিত। রবীন্দ্রনাথের লেখনীর ক্ষিপ্রগতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই তিন মাসে রচিত অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাগুলির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। অতএব পাঠকগণ এখন চিত্রা পাইয়া সাধনার মৃত্যুশোক বিস্মৃত হউন। এই প্রসঙ্গে এখানে একটা সংবাদ দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় নাটক "রাজা ও রাণী" রচনা করিতে, সংশোধন করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে রবীন্দ্রনাথের এক মাসের অধিক লাগে নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি যত ক্ষিপ্র রচনা করেন, লেখা ততই ভাল হয়। এটা সামান্য প্রহেলিকা নহে।

প্রথম কবিতা—"চিত্রা"। আরম্ভ হইয়াছে

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্র রূপিণী !

এই "তুমি"টি যে কে, তাহা কবিতাটি পড়িয়া ধরিবার যো নাই। হয়ত অভিধানে সে নাম নাই। হয়ত ইনি সোনার তরীর "মানস সুন্দরী," কবির হৃদয়ের জাগ্রত দেবতা। কবি তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয় বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম হৃদয়-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

তাহার পর "সুখ"—রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরণের পয়ারে লিখিত। ইহার পর হইতে দ্বাদশটি কবিতা সাধনায় ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু "প্রেমের অভিষেক" নামক কবিতাটির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হয়ত অনেকে মর্ম্মাহত হইবেন। সাধনার কবিতায় সমস্ত উক্তিটি একটি ক্ষুব্ধ লাঞ্ছিত দরিদ্র কেরাণীর মুখে দেওয়া হইয়াছিল, চিত্রায় সে কেরাণীটিকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে একটি শাদাসিধে মানুষকে বসান হইয়াছে। বলা বাহুল্য সেই সঙ্গে তাহার "অপোগণ্ড সাহেব শাবক" মনিবটিকেও অন্তর্ধ্যান হইতে হইয়াছে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কেহ কেহ সাধনার সেই কবিতা পাঠ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন—"আফিসের কেরাণীর সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণ ভাবে আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিলে, প্রেমের মহিমা অধিক সরল, উদার, উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধভাবে দেখান হয়।" সাহেবের দ্বারা অপমানিত, অভিমান-ক্ষুণ্ণ, নিরুপায় কেরাণীর মুখে এ কথা শুলা যেন অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায়।—আমি কিন্তু এ যুক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আস্ফালন নহে ত কি? আস্ফালনই বটে। যে অপমানিত, ক্ষুধিত, সর্ব্বজনের উপেক্ষিত, সে যখন বলিবে—আমার কিছু নাই, কেবল প্রেম তুমি আছ—তাহাতেই আমি রাজার অপেক্ষা অধিক সুখী;—সেই প্রেমের যথার্থ মূল্যবান সার্টিফিকেট। আর যাহার কোনও কষ্ট নাই, চাকরি করিবার প্রয়োজন নাই, দিব্য আহার করিয়া নাদুস্ নুদুস্ চেহারাটি, তাহার মুখে "তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট" তেমন শুনায় কি? প্রেমের মহিমায় মহীয়ান্ ছবিটির পাশের ছবিটি যত ম্লান হইবে, প্রথমটি সেই পরিমাণে উজ্জ্বল দেখাইবে। এই Law of Contrastএর জন্য চিত্রার ছবিটির উজ্জ্বলতা অনেক হ্রাস হইয়াছে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনাগুলি ছাঁটিয়া ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের "কড়ি ও কোমলে" শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রগুলি নাই। কিন্তু সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে এই পত্র-গুলির তুলনা নাই। শ্রদ্ধাস্পদ নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় প্রথম সংস্করণ "কড়ি ও কোমল" সমালোচনা কালে এই পত্রগুলি প্রকাশ করাতে দোষ দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এ গুলি "কড়ি ও কোমলে" না দিয়া এইরূপ কবিতার অন্য একখানি বহি করিলেই হইত। বোধ হয় এই সকল আলোচনাদি শ্রবণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ নূতন সংস্করণে পত্রগুলি বাদ দিয়াছেন। নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয়ের মতে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলেও এটি আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই—অনেকেই পারেন নাই। যে পুস্তকে গম্ভীর বিষয়ের সমাবেশ থাকিবে, তাহাতে লঘু বিষয়, হাসির বিষয় থাকিতে পাইবে না, এ নিয়মটা বড় ভাল বোধ হয় না। এ কেমন, না কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন আগাগোড়া পোলাও খাওয়ান, অন্য দিন আগাগোড়া চাটনি খাইতে দেওয়া। দ্বিতীয় সংস্করণ "রাজা ও রাণী"তেও অনেক পরিবর্ত্তন ও ব্যবকলন হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—

বলেছি যে কথা, করেছি যে কাজ,
আমার সে নয়, সবার সে আজ ;

সুতরাং প্রকাশিত কবিতাগুলিতে তাঁহার আর অধিকার নাই। তবে তিনি কি হিসাবে প্রকৃত অধিকারীর বিনা অনুমতিতে সে গুলিতে কাঁচি চালান? এ অপরাধটা আইনের ভিতর আনিতে পারিলে তাঁহার নামে নালিশ চলিত, কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন আমরা (অগত্যা) বিনীতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, যেন তৃতীয় সংস্করণে "কড়ি ও কোমল," "রাজা ও রাণী" অবিকল প্রথম সংস্করণের মত করিয়া মুদ্রিত হয়; দ্বিতীয় সংস্করণ চিত্রায় যেন "প্রেমের অভিষেক" কবিতাটি সাধনায় প্রকাশিত কবিতার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে।

"অন্তর্য্যামী" কবিতাটি বড় কৌতূহলের বিষয়। যাত্রা শুনিতে শুনিতে একবার সাজঘরে উঁকি মারিবার জন্য বাল্যকালে বড় আগ্রহ হইত। এই যে রাম, এই যে রাবণ, হনুমান, বিভীষণ, এত যুদ্ধ করিতেছে, বক্তৃতা করিতেছে, ইহারাই সাজঘরে ঢুকিয়া হাসে, গল্প করে, রাবণের হাত হইতে

হুঁকাটি লইয়া রাম তামাক খায়, দেখিয়া বড়ই বিস্ময় ও আমোদ জন্মিত। "অন্তর্য্যামী" কবিতাটির ভিতর দিয়া, একবার কবির সাজঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, রাণীর মত সজ্জিত একটি মহিমাময়ী নারী-মূর্ত্তি স্বর্ণের সিংহাসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে আমাদের কবিটি নতজানু হইয়া বলিতেছেন—"তুমি কে আমায় বলিয়া দাও। আর আমায় অন্ধকারে ঘুরাইয়া মারিও না। তুমি যে বাঁশী দিয়াছ, আমি তাহাতে কেবল ফুঁ দিই;—কি কল করিয়া রাখিয়াছ, তাহা হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। লোকে ভাবে আমি বাজাই, কখনো কখনো আমারই ভ্রম হয়, বুঝি আমিই বাজাই, কিন্তু আমি ফুৎকার দিই মাত্র। আমি যে কথা কখনও ভাবি নাই, সেই কথা কেমন করিয়া বাঁশী দিয়া বাহির হয়? যে ব্যথা বুঝি না, সে ব্যথা কেমন করিয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠে? আমার ভিতরে কি জন্য তুমি অসীম বিরহ, অপার বাসনা গোপনে বসিয়া রচনা করিতেছ? তোমার লীলা যখন অবসান হইবে, তখন কি আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া, আমার বাঁশীটি ফিরিয়া লইয়া, তোমার রহস্যপুরীতে লুক্কায়িত হইবে? যে দিন আমার মৃত্যু হইবে, সেই দিন কি বুঝিতে পারিব এই সকলের উদ্দেশ্য কি, তাৎপর্য্য কি?" আমরা ত শুনিয়া অবাক্। আমরা মনে করিতাম, কবি গাহেন আমরা শুনি, কিন্তু ইহার ভিতর যে এত রহস্য আছে তাহা কে জানিত? এই কবিতাটি এমন চমৎকার প্রণালীতে রচিত এবং স্থানে স্থানে ভাষা এত মনোহর, যে পড়িলে মনে হয়, ভাগ্যে আমি বাঙ্গালা জানিতাম!

"সাধনা" কবিতাটি দেবী বীণাপাণির প্রতি কবির আত্ম নিবেদন। কবি বলিতেছেন,

দেবি, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্ন তন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দান বীণা খানি।

জগতের সমগ্র যন্ত্রীর সঙ্গীতের মধ্যে এ গানগুলির কোথায় স্থান হইতে পারে বলিতে পারি না, কিন্তু বাঙ্গালার এ ক্ষুদ্র আসরে ত ইতিপূর্ব্বে কখনও এমন শুনা যায় নাই। "পুরাতন ভৃত্য"—হাস্যরসের সহিত করুণরসের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। এই কবিতাটী যাঁহাদের অপঠিত, তাঁহারা বোধ হয় সহজে ধারণা

করিতে পারিবেন না, এই দুইটি বিপরীত প্রকৃতির রস কেমন করিয়া একত্র করা যাইতে পারে ;—বাস্তবিক, বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও এমন নাই। "দুই বিঘা জমি" কবিতাটিও এই ধরণের। ইহার গল্পাংশ নিতান্তই সাধারণ। ইহা যে কবিতায় রচিত হইতে পারে, এ সম্ভাবনাও অন্যের মস্তকে উদয় হওয়া কঠিন হইত। উপেনের দেশে ফিরিবার সময় জন্মভূমির যে স্তোত্রটি কবি তাহার মুখে বসাইয়াছেন তাহা বড় সুন্দর—

নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি !
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্রকানন, রাখালের খেলা গেহ।
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল নিশীথ-শীতল স্নেহ।

আবার আমতলায় বসিয়া তাহার পূর্ব্বস্মৃতি কেমন মধুর, স্বপ্নময় !

সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ-দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন !

সাহিত্যক্ষেত্রে প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌-সম্প্রদায় সর্ব্বদা কবিদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, কবি "শীতে ও বসন্তে" কবিতায় প্র্যাক্টিক্যালগণকে খুব এক হাত লইয়াছেন। যাহার মনোদেশটা শীত-প্রধান, সে বলে ইতিহাসের কাঠ কাটি, বিজ্ঞানের পাথর ভাঙ্গি, সমালোচনার কামান গড়ি। আবার যাহার মনোদেশে বসন্ত ঋতুটা প্রবল, সে বলে নাটকের ফুলগাছ তৈয়ারি করি, কবিতা-ফুলের মালা গাঁথি। সুবিধা পাইলেই পরস্পর পরস্পরকে গালি দেয়। "নগর-সঙ্গীত" কবিতা খানা যেন এক খণ্ড জ্বলন্ত লৌহ, তাহার চারিদিক হইতে যুক্তাক্ষরের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়া বাহির হইয়াছে।

"পূর্ণিমা"—কবি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন ; সেখানি পণ্ডিতের লেখা।

সমালোচনার তত্ত্ব ; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য্য কাহারে বলে—আছে কি কি বীজ
কবিত্ব-কলায় ; *

* এক প্রকার কলা হয় তাহা বীজে ভরা। মানুষ তাহা খাইতে পারে না ; কিন্তু আশা করি বানরসম্প্রদায়ের কোনও প্রকার অসুবিধা হয় না।—ইতি লেখক।

পড়িতে পড়িতে কবির হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিল; মনে হইল, কবিত্ব, কল্পনা, সৌন্দর্য্য, সুরুচি, রস সব মিথ্যা—সমস্ত কেবল "শব্দ মরীচিকা-জাল।" অনেক রাত্রে বিক্ হইয়া বই ফেলিয়া যাই তিনি আলো নিবাইয়া দিলেন, অমনি।

উচ্ছ্বসিত স্রোতে,
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হতে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।

—অর্থাৎ অনন্ত আকাশভরা পূর্ণিমা তাঁহার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দে সকৌতুকে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। যেন বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী মূর্ত্তি-মতী হইয়া কবিকে আসিয়া বলিলেন—বাতি জ্বালাইয়া, বহির পাতা উল্টা-ইতে উল্টাইতে কোথায় তুমি আমার অন্বেষণ করিতেছিলে! আমি যে তোমারি দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বাস্তবিক, আকাশের চন্দ্র নক্ষত্রের নীলিমায়, ধরণীর পুষ্পে পল্লবে, পর্ব্বতে সমুদ্রে এত সৌন্দর্য্য, তাহা আপনার চক্ষু দিয়া যে দেখিতে পায়, তাহার পক্ষে ডাইডেন বা রস্কিন্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্ব উদ্ধার করিবার দুশ্চেষ্টা অতি হাস্যকর বটে। কিন্তু সকলের চক্ষের জ্যোতি ত সমান প্রবল নহে; যাহাদের দৃষ্টি নিস্তেজ তাহারা এইরূপ পুস্তকের ভিতর দিয়া অনুবীক্ষণ না করিয়া আর করে কি?

"উর্ব্বশী"—পৌরাণিক উর্ব্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া কবি যাঁহাকে স্তব করিয়াছেন, তাঁহাকে অনেক কবি অনেক দিন হইতেই স্তব করিয়া আসিতেছেন। গেটে যাঁহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewige weibliche, উর্ব্বশীমূর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি তাঁহাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। আদর্শরমণীকে দুই ভাগ করিলে, একভাগে The Beautiful আর একভাগে The Good পড়ে। উর্ব্বশী কবিতায় প্রথমোক্তার স্তব-গান। ইহার পরের কবিতা, "স্বর্গ হইতে বিদায়" তাহার একস্থানে দ্বিতীয়ার একটি চমৎকার ফোটো আছে, তাহা ক্রমে উদ্ধৃত করিব। একব্যক্তি "বর্ষ লক্ষশত" স্বর্গে বাস করিয়াছে, আজ তাহার পুণ্যবল শেষ হইল, তাহাকে স্বর্গ হইতে বিদায় লইতে হইবে। সে আশা করিয়াছিল, যাইবার দিন স্বর্গের দেবতারা তাহার জন্য দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিবেনই।

কিন্তু এখন দেখিতেছে, তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপও নাই। যে ব্যক্তিটা তাহাদের মধ্যে লক্ষশত বর্ষ বাস করিল, সে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে কাহারও প্রাণে বিষাদের লেশমাত্র নাই! কেমন করিয়া থাকিবে? স্বর্গে ত শোক নাই, অশ্রু নাই; সুতরাং হৃদয় নামক একটা ব্যাপারের অস্তিত্বই নাই। তাই সে যাইবার দিন আক্ষেপ করিতেছে—

অশ্বথ শাখার

প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মত
মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যু স্রোতে।

অনাথিনী বিধবার বালক পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া, লেখা পড়া শিখিবার জন্য কোনও ধনী আত্মীয়ের প্রাসাদে অবস্থানকালীন, সেখানে যদি স্নেহ না পায়, তবে তাহার মনের ভাবটা ঠিক এইরূপ হয়। মায় ঘরে সেই সব ছিল, এখানে লোকজন দাসদাসীপূর্ণ পরিবারের মধ্যে সে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এখানে সে উত্তম আহার পায়, উত্তম শয্যা পায়, হর্ম্ম্যশিখরে বাস করে, গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে পায়, সকলই সুখ, সকলই সুবিধা, কেবল একটি জিনিষের অভাব। সেই একটি জিনিষের অভাবে লবণহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় এত আয়োজন সব ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। যাইবার দিন স্বর্গহারা নর তাই অভিমান করিয়া বলিতেছে—

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে!
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপী তাপী, মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—

ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তবে বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি!

তাহার পর স্বর্গের অপ্সরীগণকে বলিতেছে—তোমরা সুখে থাক, আমি ত চলিলাম। কিন্তু যেখানে আমি যাইতেছি সে দেশ এমন হৃদয়-হীনতার রাজ্য নহে; সেখানে

দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থ ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমার লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপ খানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণ কঙ্কন করে
সীমন্ত সীমায় মঙ্গল-সিন্দূর বিন্দু
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে!

কি সুন্দর! এই বর্ণনার কেমন করিয়া প্রশংসা করিব! ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু পড়িয়াছি কি?—রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়া অনেক স্থানে এই কথাই বলিতে হইয়াছে। এ যেন আর্য্য-ঋষির প্রণীত দেবদেবীর

স্তবের মত হইল। যখন যে দেবতার স্তব হইতেছে, তখন তাঁহাকেই বলা হইতেছে—তুমিই গতি, তুমিই মুক্তি, তুমিই সর্ব্বসারভূত। আর একটা নীচু দরের উপমা দিই ;—এক ব্যক্তি বলে, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ ভাল কি মিহিদানা ভাল, কখনও স্থির করিতে পারিলাম না। যখন যেটা খাই, তখন সেইটাই সেরা মনে হয়।

"সান্ত্বনা"—রবীন্দ্রনাথের সকল বিশেষত্বই ইহাতে বর্ত্তমান। এটি স্ত্রী-উক্তি,—চমৎকার রচনা। বিজয়িনী চিত্রার মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা ; গল্পাংশ তিন কথার অধিক নয়। অচ্ছোদ সরোবরে রূপসী স্নান করিতেছেন ; তীরে শ্বেত প্রস্তর গঠিত সোপানে তাঁহার ত্যক্ত বস্ত্রালঙ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। মদন ধনুঃশর লইয়া এক বকুলগাছের আড়ালে মোতায়েন আছেন, যুবতী উঠিলেই তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিবেন। রমণী স্নানান্তে তীরে উঠিলেন, অমনি অনঙ্গদেব তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বাণ ত্যাগ করা হইল না ;

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখ পানে
চাহিল নিমেষ হীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি' বসি, নির্ব্বাক্ বিস্ময় ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণশূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

এই কবিতাটি আগাগোড়া বর্ণনার বিচিত্র ফুলে খচিত। একটা অংশ এখানে তুলিয়া দিই। রমণীর স্নানের সময়

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিনী
জলে স্থলে নভস্থলে ; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া রৌদ্র করে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে
বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে

চমকে ঝলকে। যেন আকাশ বীণার
রবি-রশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুর বালিকার
চম্পক অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া।

"গৃহশত্রু"—চারিটি শ্লোকের একটি কবিতা। একটু তুলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন খানটা তুলিব স্থির করিতে না পারিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। "উৎসব"—এটি তেমন হয় নাই;—রবীন্দ্রনাথের অন্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়াই বলিতেছি, তেমন হয় নাই। নতুবা বঙ্গসাহিত্যের শত শত কবিতার মধ্যে ফেলিলে এটিরও মৃত হস্তীর ন্যায় লক্ষ টাকা মূল্য হইবে। বাল্যগ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় পুস্তক "নদী"র উৎসর্গ পত্র পড়িলে জানা যায়, "উৎসব" রচনার দিন কবির বাড়ীতে একটি বিবাহ ছিল। সেই উপলক্ষে রচিত বলিয়াই কি ইহা এমন প্রাণহীন হইয়াছে? অবশ্য কবিতায় গার্হস্থ ঘটনার উল্লেখ মাত্র নাই, কিন্তু তবুও দুই স্থানে ফাঁক বহিতেছে—

তুমি কি বয়েছ আজি
নটবর বেশে সাজি?

অপিচ

তোমারি কি পট্টবাস
উড়িছে সমীরে?

"জীবন দেবতা"—কবির মনে যাহাই থাকুক, এটি সাধারণে একটি স্ত্রী উক্তির কবিতা বলিয়াই গ্রহণ করিবে। "রাত্রে ও প্রভাতে"—ইহাতে একটি বড় পুরাতন কথা লিখিত হইয়াছে। যে দিন জগতে প্রথম নর নারীর মধ্যে প্রণয় ঘটিয়াছিল, সেই দিন হইতেই পুরুষ একটা বিষয় লক্ষ্য করিতেছে—কিন্তু সে কথা, এই বোধ হয়, কবিতায় প্রথম ব্যক্ত হইল। টকটকে খোপার নূতন অলঙ্কারের রঙ, প্রভাতে দেখিবে এক রকম, মধ্যাহ্নে অন্য রকম, সন্ধ্যা বেলায় আবার তৃতীয় প্রকারের। প্রেমিক প্রেয়সীর দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পান। রাত্রে একরূপ, দিবসে অন্যরূপ। এই কবিতা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া চিত্র দুইটি স্পষ্ট করি;—

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জ কাননে সুখে

ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা
ধরেছি তোমার মুখে।

* * *

আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্র-বসনা
চলিয়াছে ধীরে ধীরে!

* * *

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
প্রাতে কখন্ দেবীর বেশে
তুমি সম্মুখে উদিলে হেসে!

"১৪০০ সাল" শত বর্ষ পরের কল্পিত পাঠককে সম্বোধন করিয়া লিখিত। এক স্থলে আছে

আজি হতে শতবর্ষ পরে
এখন্ করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।

"সিন্ধু পারে" এইটি শেষ কবিতা। মৃত্যু সিন্ধুর পারে, প্রেমিকের সহিত তাহার প্রিয়ার নূতন করিয়া বিবাহ হইল। মৃত্যু রজনীতে অবগুণ্ঠিত মুখী অশ্বারোহিণী এক রমণী আসিয়া পুরুষকে ডাকিল। সঙ্গের দ্বিতীয় অশ্বে তাহাকে বসাইয়া সিন্ধু পারে লইয়া গেল। রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরুষ একটি গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। ভিতরে অপূর্ব্ব খোদিত বহুকক্ষযুক্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। রমণী এক পালঙ্কে বসিয়া পুরুষকে পার্শ্বে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিল। দশ দিকে বীণা বেণু বাজিতে লাগিল—ক্রমে বিবাহ হইল। বিবাহের বর্ণনাটি বড় চমৎকার।

বাজিয়া উঠিল শতেক্ শঙ্খ হুলু কলরব সাথে,
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্ত দুর্ব্বা হাতে।
পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সার কিরাত নারীর দল

কেহ বহে মালা কেহ বা চামর কেহ বা তীর্থজল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল,—বৃদ্ধ আসনে বসি
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কসি'।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন কাল।"
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্র-চালিত মত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার মাথে ফুল দল সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিষ করিয়া দোঁহে,—
কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল—শিহরিয়া কলেবর—
হিমের মতন মোর করে, তার তপ্ত কোমল কর।

পুরুষ, মন্ত্র চালিতের মত বিবাহ করিয়া গেল, কিন্তু তখনও জানে না, রমণী কে? পরে কাকুতি মিনতি করিয়া যখন মুখ দেখিতে পাইল, দেখিল সেই! তখন প্রেমিক প্রেয়সীর "অমল-কোমল-চরণ-কমলে" চুম্বন করিল। ব্যাকুল-অশ্রু বাধা না মানিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; এবং

অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

(৪)

গত বারে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে সকল কার্য্যেরই একটা কারণ অনুমিত হইলেও ঐ সকল কারণ স্থল বিশেষে কুত্রাপি হেতুগত এবং অপরত্র অহেতুক হইতে পারে। দুইটী পদার্থ খণ্ডকে পরস্পর সন্নিহিত করিলে তাহাদের মধ্যে আকর্ষণের আবির্ভাব লক্ষিত হইবে। কোন হেতু কিম্বা উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সচরাচর ইহা ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অহেতুক কার্য্যকে সাধারণতঃ স্বভাবজ বলা যাইতে পারে। জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে, যে সকল কার্য্য স্বভবজ তাহা উদ্দেশ্যবিরহিত।

একারণ তাহাদের বিধান দৃষ্টে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে তাহাদের এক-জন বিধাতা রহিয়াছেন। যেমন নিদ্রা জীবের স্বভাব, তাই কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেবল নিদ্রা আসে বলিয়াই সাধারণতঃ জীব সকল নিদ্রা যায়। ইহাকে শারীরিক গ্লানির একটী অবশ্যম্ভাবী ফল বলা যাইতে পারে; তাহার জন্য একজন বিধাতা মানিয়া লইতে হয় না। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা মানুষের স্বভাব নহে; কোন প্রকার মানবিকতাই জীবকে উদ্দেশ্য ব্যতি-রেকে আপনা আপনি বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করে না। বিদ্যাশিক্ষা উদ্দেশ্যগত কার্য্য; ইহার উদ্দেষ্টা স্বয়ং শিক্ষাকর্ত্তা। একারণ উদ্দেশ্যের মাত্রানুসারে শিক্ষাকার্য্যের উৎকর্ষাপকর্ষতা ঘটিয়া থাকে।

এই যুক্তি সাধারণভাবে বোধগম্য হইলে আমরা জগৎকার্য্য পর্য্যা-লোচনাতে অনায়াসে ইহা প্রয়োগ করিতে সক্ষম হই। জগতের সৃষ্টিকার্য্যে অশেষবিধ কৌশলের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সকল কৌশল জড়জগতের স্বভাবজ অর্থাৎ উদ্দেশ্য-বিরহিত কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক,—গণনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমাদের রাত্রিমান যদি দ্বাদশ ঘটিকার পরিবর্ত্তে ৪৮ ঘটিকা পরিমিত হয়, তবে এক রাত্রিতে সমগ্র পৃথিবী এত শীতল হইয়া যাইবে যে, তাহার কুত্রাপি জীব কিম্বা উদ্ভিদ জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। ইহাতে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ-বিধানকে বিশ্বরচনার একটী আশ্চর্য্য কৌশল বলা যাইতে পারে এবং জীব-প্রবাহ সংরক্ষণকে ইহার উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে ইহা দেখা যাইবে যে সূর্য্য ও পৃথিবী এক্ষণে যে অবস্থায় অবস্থাপিত আছে, এবম্বিধ যে কোন দুইটী গোলককে এমতাবস্থায় স্থাপিত করিলে তাহাদের মধ্যে দিবারাত্রির পরিমাণ ঠিক বর্ত্তমানের অনুরূপ হইবে। পৃথিবীতে দিবারাত্রির পরিমাণ, তাহার ঘূর্ণন-বেগের উপর নির্ভর করে; এবং ঐ ঘূর্ণনবেগ পৃথিবী ও সূর্য্যের পরস্পর আকর্ষণজনিত এবং আকর্ষণ জড়পদার্থের স্বভাব। অতএব ইহা সপ্রমাণিত হয় যে পৃথিবী ও সূর্য্য জড়পিণ্ড বলিয়াই তাহাদের আকর্ষণ বলে ধরাপৃষ্ঠে দিবারাত্রির পরিমাণ বিধান ঘটিতেছে! গণনা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে, পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া দিবারাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যাইতেছে; কালে রাত্রিমান ৪৮ ঘণ্টা হইতেও অধিক হইয়া পড়িবে। ইহা হইতে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পৃথিবীতে দিবা-

রাত্রির পরিমাণ বিধান সূর্য্য ও পৃথিবী এবং অপর সকল গ্রহের স্বভাবজ,—জীবপ্রবাহ সংরক্ষণ তাহার উদ্দেশ্য নহে! এইরূপে লক্ষিত হয় যে, সাধারণের নিকট যাহা প্রত্যক্ষতঃ হেতুগত কার্য্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে তাহার অনেকস্থলে বৈজ্ঞানিকের নিকট ঐ সকল কার্য্য অহেতুক বা স্বভাবজ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহাই বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মের বিরোধের একটী প্রধান কারণ। ধর্ম্মবিশ্বাসী যখন এবম্বিধ একটী কার্য্যকে হেতুগত ভাবিয়া তাহার হেতুভূত বিধানের অনুষ্ঠাতা বা বিধাতাকে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যদি বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, ঐ কার্য্য বস্তুতঃ একটী অহেতুক কারণসম্ভূত, তখন তিনি উক্ত বৈজ্ঞানিককে নাস্তিক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

জ্যোতির্ব্বিদাগ্রগণ্য লাপ্লাশ যখন জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিয়া গ্রহমণ্ডলীর গতিবিধি আবিষ্কার ও জগতে প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ন ফরাসি দেশের সম্রাটপদে বরিত হইয়া সিংহাসনারোহণ করেন। একদা রাজসভাতে সম্রাট নেপোলিয়ন লাপ্লাশকে উপলক্ষ করিয়া উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে "শুনিতে পাই, তুমি বিমানবিহারী জ্যোতিষ্কবর্গের গতিবিধি আবিষ্কার করিয়া তদ্বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছ কিন্তু সেই গ্রন্থের কুত্রাপি বিমানেশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তার নামোল্লেখ মাত্র কর নাই?" লাপ্লাশ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে "আমি একজন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার্য্য বা স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া বিমানরাজ্যের কার্য্য পর্য্যালোচনা করি নাই; পরন্তু কার্য্যদৃষ্টে কারণানুসন্ধানে তৎপর রহিয়াছি। গণনা দ্বারা যদি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রতিপাদিত না হন তবে আমি তজ্জন্য নিজকে দায়ী মনে করিব না!" লাপ্লাশের এই উত্তর কয়েক জন ফরাসি বৈজ্ঞানিকের নিকট বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিচায়ক হইলেও জগতের সমক্ষে তিনি নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইলেন। আমরা তাঁহার সম্পাদিত কয়েকটী গণনফল সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; তাহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, লাপ্লাশের উপরোক্ত উত্তরের তাৎপর্য্য কি?

সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া গ্রহগণ স্ব স্ব অবক্ষেত্রাকার (Elliptical) কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ তাহাদিগকে ঐ কক্ষ হইতে "ভ্রষ্ট" করিয়া নিয়ত বিপথে পরিচালিত করিতেছে। এইরূপে গ্রহদিগের কক্ষ স্থূলতঃ অবক্ষেত্রাকার হইলেও তাহার ক্ষেত্র-পরিমাণেতে

ধারাবাহিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইতেছে; এবং কালে সৌরজগতের এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে যে ক্ষেত্র ও গতিপর্য্যায়ের সমতা ভঙ্গ হইয়া এক কিম্বা ততোধিক গ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া 'ধ্বংস' দশাপন্ন হইবে। এই সকল গণনা অতিশয় ভীতিপ্রদ; কারণ ইহাদ্বারা বিধাতার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রচুর অমঙ্গলের কারণ লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রহ-কক্ষ অবক্ষেত্রাকার; ঐ সকল ক্ষেত্রের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিকার (Eccentricity) আছে; তাহাদের স্ব স্ব "দণ্ড" (axis) পরিমাণ আছে; প্রত্যেক কক্ষই কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সমতলের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বক্রতাতে অবস্থিত: প্রত্যেক গ্রহের স্ব স্ব কক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আবর্ত্তনকাল আছে। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় পরিমাণ সমূহের পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে বিপর্য্যয় সংঘটিত হওয়াতে গ্রহজগতের আশু ধ্বংসপ্রাপ্তি সূচিত হইতেছে। সৌরজগতের যদি একজন সৃষ্টিকর্ত্তা বিদ্যমান থাকেন, তবে এইরূপ ধ্বংসশীল জগৎ সৃষ্টি করাতে তাঁহাকে মঙ্গলময় বিধাতা বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু সংরক্ষণই বিধানের ধর্ম্ম, অতএব ধ্বংস-শীলতার জন্য বিধাতা মানিতে হয় না। কিন্তু লাপ্লাশের মহাগ্রন্থ ইহা ব্যক্ত করিতেছে যে, সৌরজগতের ধ্বংসশীলতা নিরোধ করণার্থ যথেষ্ট কৌশল বর্ত্তমান আছে। তিনি প্রত্যক্ষ গণনা দ্বারা ইহা দেখাইয়াছেন যে, গ্রহ-কক্ষের বিকার বিপর্য্যস্ত হইলেও তাহার "গুরু (বা মূল) দণ্ড" (Major axis) সর্ব্বদা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। ইহা সৌরজগতের ধ্বংসাবসানের একটী অন্তরায় হইলেও তাহা যথেষ্ট নহে; কারণ গ্রহ-কক্ষের বিকার হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে অবক্ষেত্র বৃত্তক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে গ্রহের অবস্থা বিষম সঙ্কটাপন্ন হইবে। এস্থলে লাপ্লাশ আবার খড়ি পাতিয়া সৌরজগতের অদৃষ্ট গণনা করিতে বসিয়াছেন—তিনি বলিতেছেন, "প্রত্যেক গ্রহের জড়মানকে (Mass) যথাক্রমে তাহার কক্ষের গুরু ব্যাসের বর্গমূল এবং কক্ষবিকারের বর্গফল দ্বারা গুণ করিয়া সমস্ত গ্রহমণ্ডলীর উক্ত গুণফল একত্রে যোগ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিয়ত অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।" এস্থলে কক্ষবিকারকে একটী বন্ধনীর অভ্যন্তরে ফেলিয়া দেওয়াতে তাহার স্বেচ্ছানুক্রমিক বিপর্য্যয়ের অধিকার লোপ করা হইয়াছে। এই বিধান বলে বিকারকে কোন দুই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যবর্ত্তী থাকিতে হইবে, অতএব এতদ্দ্বারা গ্রহকক্ষের আকৃতি কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহার প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ের কোন সম্ভাবনা থাকিতেছে না।

-ইহাতে এক দিক রক্ষা হইল বটে কিন্তু অপর দিকে নির্ভর হওয়া যাইতেছে না। কক্ষসমূহের পরস্পর বক্রতা পরিমাণ বিপর্য্যস্ত হইতেছে; একারণ তাহাদের অবস্থিতির তারতম্যানুক্রমে আকর্ষণের মাত্রাভেদ ঘটিবে। ইহাতে এরূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে যে, কোন সময়ে সকল গ্রহ এক সমতলেতে বিরাজ করিবে; তখন পরস্পরের আকর্ষণের ব্যত্যয়ে প্রত্যেক গ্রহের স্থিতি ব্যত্যয় এত অধিক হইয়া পড়িবে যে, তাহাতে প্রলয় সংঘটনের সম্ভাবনা থাকিবে। লাপ্লাশের গণনাতে আবার অপর এক অঙ্ক ফুটিয়া উঠিল তাহার ফলে কক্ষসমূহের বক্রতা-বিপর্য্যয় স্বেচ্ছানুক্রমিক না হইয়া কোন দুই নির্দ্দিষ্ট সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিবে। এই সকল ফল পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, গ্রহগণ কদাপি কক্ষচ্যুত হইয়া শূন্যে অপগমন করিবে না। কিন্তু ইহাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। গ্রহের গতিবেগ মন্দ হইতে থাকিলে তাহার ক্ষেত্রফল পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে; ইহাতে কালে গ্রহের সৌরদেহে সম্পাতের সম্ভাবনা থাকিবে। তাই লাপ্লাশ আবার গণনা করিয়া বলিতেছেন যে, গ্রহদিগের কক্ষাবর্ত্তন কাল অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহা গড়ে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

এই চারিটী ফল সৌরজগতের স্থিতি-শীলতার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে। সৌরজগৎ সংরক্ষণ বিষয়ে এই চারিটী বিধান প্রয়োজনীয় এবং শুভঙ্কর। কিন্তু ইহারা হেতুগত কিম্বা স্বভাবজ তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। লাপ্লাশ আবার গণনা করিতেছেন; তিনি দেখাইয়াছেন যে, যে কোন পদার্থমালাকে সৌরজগতের অবস্থাপন্ন করিয়া স্থাপিত করিলেই তাহাদিগের মধ্যে উক্ত বিধান চতুষ্টয় প্রকটিত হইবে না। লাপ্লাশ আরও গণনা করিয়াছেন যে, ইহার কোন এক বিধান হইতে অপর সকল কিম্বা কোন একটী বিধানও সফলিত হইতে পারে না; অর্থাৎ ইহারা পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ স্বতন্ত্র বিধান। কাজেই ইহাদের কোন একটী বিধান কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থমালাতে ঘটনাক্রমে প্রকটিত হইলেই অপর কোন একটী বিধান আপনা আপনি তাহাতে প্রকাশ পাইবে না! অতঃপর লাপ্লাশ নীরব! ইহাই লাপ্লাশের নাস্তিকতা!! আমরা এ স্থলে লাপ্লাশের গণনা সমন্বয় করিয়া দেখিব কি ফল লাভ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে,যে সকল বিধান স্বভাবজ নহে; তাহাদিগকে হেতুগত বিধান বলা যাইবে। কোন বিধানের উদ্দেশ্য আয়ত্ত হইলেই

তাহার একজন উদ্দেষ্টা স্বীকার করা যায়। যদি কোন এক বিধান হইতে অপর সকল বিধানের সমুদ্ভবের সম্ভাবনা প্রতিপন্ন হইত, তবে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারিত যে, কোন একটী বিধান ঘটনাক্রমে বা অহেতুক সমুৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে অপর সকল বিধান স্বভাবজ প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু যখন পরস্পর স্বতন্ত্র চারিটী বিধান একই উদ্দেশ্যে পরস্পর হইতে স্বতন্ত্রভাবে প্রকটিত হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট মাঙ্গল্যের দিকে পরিচালিত হইতেছে তখন তাহাতে এক মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত ভিন্ন অপর কিছুই উপলব্ধ হয় না।

পাঠকগণ এক্ষণে দেখিতে পাইতেছেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক; যদি বাস্তবিক কোন বিরোধ থাকে তাহা কেবল অপূর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং অন্ধবিশ্বাসী ধার্ম্মিক-দিগের স্থূলদর্শিতার ফলমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মই বিজ্ঞানের চরম এবং বিজ্ঞান ধর্ম্মের মূল। এবম্বিধ ধর্ম্মকে কিরূপে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহা আগামী বারে আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

পলাশ বন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রিতাবস্থায় একটী ভীষণ স্বপ্ন দেখিলাম। আমার মনে হইল, আমি যেন গৃহে জননীর সন্নিধানে বসিয়া আছি। কিন্তু জননীদেবী রুগ্না ও রোগশয্যায় শায়িতা। তাঁহার দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ; মুখমণ্ডল মলিন ও নিষ্প্রভ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কালিমাময়। রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁহার এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন। তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া অগ্রজ ভ্রাতারা গৃহে আগমন করিয়া-ছেন; জননীদেবী আমাদের সকলকেই তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া কঠোর রোগযন্ত্রণার মধ্যেও যেন সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতেছেন। কখনও তাঁহার শুষ্ক গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আবার কখনও বা তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায় হইতেছে। জননীর

আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া আমি যারপরনাই কাতর হইলাম। হৃদয় শোকে অবসন্ন হইলে চক্ষু বাষ্পপূর্ণ ও কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল এবং চতুর্দ্দিকে যেন ঘোর অমঙ্গলজনক উৎপাত সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল যেন কালরজনী মুখ ব্যাদন করিয়া আমাদের সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাহারও মুখে একটীও বাক্য নাই; সকলেই বিষণ্ণ, নীরব ও শোকপীড়িত। সকলেরই মুখমণ্ডলে নৈরাশ্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত এবং সকলেই অসহায়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট। কাল-বৈশাখী অপরাহ্নে ভীম ঝঞ্ঝাবাত বহিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির যেরূপ অবস্থা ঘটে, আমাদের গৃহেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। শোকমেঘে গৃহ অন্ধকার-ময় হইল; ঘোর বিপদাশঙ্কারূপ তড়িৎপ্রকাশে আমরা ক্ষণে ক্ষণে চমকিত ও শিহরিত হইতে লাগিলাম এবং করালকালের ভীষণ হুঙ্কাররূপ গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে সকলে স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম। জননীর শেষাবস্থা দেখিয়া আমি শোকাবেগ আর সংযত করিতে পারিলাম না; সকলের নিবারণ সত্ত্বেও ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহান্তরে গমন করিলাম।

সহসা আমি আহূত হইলাম। আহ্বান শুনিবামাত্র আমি জননীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। সকলে আমাকে জননীর সমীপে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কাতরস্বরে ডাকি-লাম "মা"। মা চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং আমাকে আরও নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিয়া সাশ্রুলোচনে ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "বাবা—আমার—উদ্—দাসীন—হইও না—আম্—মি—তোর মুখ্ দেখ—লাম—না আম্—মি তোর বিয়ে—এই পর্য্যন্ত বলিয়া কণ্ঠরুদ্ধ হইল। হতভাগ্য আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম এবং ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে হইতে অচেতন হইয়া পড়িলাম।

সহসা বোধ হইল, কে যেন আমায় তুলিয়া ধরিল এবং "জল, জল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি যেন ঈষৎ সংজ্ঞা লাভ করিলাম এবং একবার চক্ষুও উন্মীলিত করিলাম; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার মস্তক যেন বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং আমি যেন পুনর্ব্বার সংজ্ঞা-হীন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলাম। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না; কিন্তু ধীরে ধীরে চেতনা সঞ্চার হইবার উপক্রম হইলে, আমি যেন কাহার ভয়সূচক কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। একটী কোমল বালিকা কণ্ঠও

উৎকণ্ঠাসূচক স্বরে যেন বলিয়া উঠিল "দিদি, ভাল ক'রে বাতাস দে, বাতাস দে।" তৎপরেই আমি যেন মুখমণ্ডলে অঞ্চল-বিধূলিত মৃদুমন্দ বায়ু সঞ্চালন অনুভব করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই চক্ষু খুলিলাম; খুলিয়াই দেখিলাম—কেশব ও উপরিভাগে নিবিড় ছরিৎপত্র রাজি। কেশবের উরু-দেশে আমার মস্তক রক্ষিত রহিয়াছে, এবং আমার মস্তক ও কপোল বহিয়া জলবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। ভাবিলাম এ কি? আমি কোথায়? এখানে আমায় কে আনিল? জননীর সদ্য মৃত্যুচ্ছবি তখনও আমার মানস-চক্ষুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান; তখনও শোকোত্থিত উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার নাসারন্ধ্র ও ওষ্ঠপুটে স্ফুরিত হইতেছিল। তাই সহসা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কেশব আমায় বাধা দিয়া বলিল, "আপুনি একটু স্থির থাক, ওরূপ ব্যস্ত হবেন না। এমন ক'রে একলা এখানে শুয়ে থাক্‌তে হয়?" স্বপ্নের ঘোর এখনও আমায় সম্পূর্ণরূপে পরি-ত্যাগ করে নাই; সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার বুঝিবার জন্য আমি কেশবের কথা অতিক্রম পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলাম। বসিয়াই দেখিলাম, আমি পলাশ-বনে আমার গৃহের অনতিদূরে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট এবং আমার সম্মুখে যোগমায়া, সুশীলা ও ভূদেব—অর্থাৎ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র কন্যারা এক একটী পুষ্পপূর্ণ পুষ্পাধার হস্তে দণ্ডায়মান। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইলাম। আ ছিঃ ছিঃ, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম! আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইলাম। ভাবিলাম, এই বালক বালিকারা আমায় স্বপ্নের ঘোরে কাঁদিতে দেখিয়া নিশ্চিত কেশবকে ডাকিয়া আনিয়াছে। এরূপ প্রকাশ্যস্থলে শয়ন করাটা ভাল হয় নাই। যাহাই হউক, উপস্থিত দুরবস্থা হইতে কোনও রূপে মুক্তি লাভের আশায় আমি একটু হাস্যের অভিনয় করিয়া যোগমায়া ও সুশীলার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তোমরা বুঝি, ফুল তুলে ফিরে আস্‌বার সময় আমাকে এই গাছের তলায় শুয়ে থাক্‌তে দেখে ভয় পেয়েছিলে; তাই বুঝি কেশবকে ডেকে এনেচ?" যোগমায়া ব্রীড়ায় চক্ষুদুটী অবনত করিয়া আমার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না; কিন্তু সুশীলা আমার কথার যেন প্রতিবাদ করিয়া বলিল 'তা কেন? আমরা বনে ফুল তুলে এই পথে বেড়িয়ে আস্‌চি, আর দেখ্‌লুম, আপনি এখানে শুয়ে ঘুমুচ্চেন, আর এক একবার হাত ছুড়চেন, আর ফুকুরে ফুকুরে কেঁদে উঠচেন! তাই না দেখে,

দিদি আর আমি থম্‌কে দাঁড়ালুম। ভূদেব আপনার কাছে গিয়ে "দেবেন বাবু, দেবেন বাবু" ব'লে দু তিন বার ডাক্‌লে। কিন্তু আপনার কোনই সাড়া পেলে না। আবার আপনি 'মা মা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। তাই দেখে, আমি ভয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলুম; কিন্তু দিদি বল্লে "ওরে থাম, যাস্‌ নে; কেশবকে ডেকে আনি।" তাই আমরা তিন জনে দৌড়ে গিয়ে কেশবকে ডেকে আন্‌লুম। ভূদেব দৌড়াতে দৌড়াতে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; সুশীলার সরল হাস্য দেখিয়া আমারও হাসি পাইল। সুশীলা সেইরূপ হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে লাগিল "ভূদেব যেমন পড়েচে, অমনি ওর সাজিসুদ্ধ ফুল মাটীতে উল্টে গেছে; আমি বল্লুম 'ওরে আর কুড়োস্‌ নে, আর কুড়োস্‌ নে, তোর ফুল ঠাকুর পূজোয় লাগ্‌বে না।" কিন্তু ভূদেব আমার কথা না শুনে, ঐ দেখুন, সব ফুল কুড়িয়ে এনেচে।"

এই বলিয়া সুশীলা আবার হাসিতে লাগিল। বেচারা ভূদেব সুশীলার উচ্চহাস্যে অপ্রতিভ হইয়া যোগমায়ার পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নিষ্ঠুর হৃদয়া সুশীলা তাহাতেও বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল 'ওরে ভূদেব দেখিস্‌ আমাদের সাজির সঙ্গে তোর সাজি ঠেকাস্‌ নে, তা হ'লে সব ফুল নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

ভূদেবকে বিপন্ন দেখিয়া আমি তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলাম। সুশীলার মুখে তাহার পতনের কথা শুনিয়া আমি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই ভূদেব, তোমার তো কোথাও লাগে নাই?" ভূদেব স্ফূর্ত্তির সহিত মাথা নাড়িল। আমি বলিলাম 'আহা, তোমার ফুলগুলি সব নষ্ট হয়ে গেল!' ভূদেব তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, "নষ্ট হ'বে কেন? আমি এই ফুলে আমার নিজের ঠাকুর পূজো কোর্‌বো।"

ভূদেবের কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। যোগমায়া ঈষৎ হাসিয়া ভূদেবের দিকে মুখ ফিরাইল। সরলপ্রাণা সুশীলা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে আবার বলিতে লাগিল "দেবন বাবু, ভূদেবের ঠাকুর দেখেচেন? একটা মাটীর পুতুল! মা ওকে পুতুলটো খেলা কর্‌তে দিয়েছিলেন; ভূদেব সেইটেকে ঠাকুর বানিয়ে রোজ রোজ পূজা করে। নিজের খাবার থেকে কিছু রেখে দিয়ে ঠাকুরকে তারই ভোগ দেয়, আর মাকে আমাকে আর দিদিকে পের্‌সাদ দেয়।"

সুশীলার কথা শুনিয়া ভূদেবের মুখখানা বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় হইল। তাহা দেখিয়া আমি বলিলাম "না, সুশীলা, তুমি জান না; ভূদেব সত্যি করে ঠাকুর পূজো করে।" এই বলিয়া অন্য কথা পাড়িবার ইচ্ছায় সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমরা কেশবকে ডেকে আন্‌লে; তার পর কি হ'ল?" সুশীলা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কেশব বলিল, "আজ্ঞা, আমি এসে দেখ্‌লাম, আপুনি অত্যন্ত ঘাম্‌চো, হাত মাথা নাড়্‌চো, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেল্‌চো, আর এক একবার কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চো। তাই দেখে আমার বড় ডর হ'লো। আমি তোমাকে তিন চারি বার ডাক্‌লাম; গা নাড়া দিলাম; কিন্তু কোন উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, আপনি কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লে। তাই দেখে আমি যোগমায়াকে ব'ল্‌লাম, দিদি ঠাকুরাণ, আমাদের ঘর থেকে শীগ্‌গীর এক ঘটী জল নিয়ে আস্‌তে পার?" দিদি ঠাকুরাণ জল আন্‌লে আমি সেই জল তুমার মাথায় ও মুখে দিলাম; আর দিদি ঠাকুরাণ আঁচল দিয়ে তুমাকে বাতাস কর্‌তে লাগ্‌লো। খানিক পরেই আপনি জেগে উঠ্‌লে; যাই হোক, ভাগ্যে তো দিদি ঠাকুরাণ আজ এই-দিকে ফুল তুল্‌তে আস্‌ছিল, আর আমাকে ডেকে দিয়েছিল; তা না হোলে কি হ'তোক্?" এই বলিয়া কেশব আমাকে তিরস্কারমিশ্রিত নানাপ্রকার উপদেশের কথা বলিতে লাগিল।

যোগমায়াকে গমনোদ্যত দেখিয়া আমি সুশীলাকে বলিলাম, "সুশীলা, তুমি তো আমায় দেখে ভয় পেয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়ুচ্ছিলে; ভাগ্যে তো তোমার দিদি ছিল, তাই কেশবকে এখানে ডেকে এনেছিল। আজ যোগমায়া না থাক্‌লে হয়ত আমার কোন বিপদ ঘট্‌তো?"

সুশীলার মুখখানা একটু গম্ভীর হইল। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, "কেন? আমি বাড়ী গিয়ে বাবাকে ব'ল্‌তুম, আর বাবা এসে আপনাকে দেখ্‌তেন?"

সুশীলার কথা শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাহার পর তাহার ও যোগমায়ার দিকে চাহিয়া একটু কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিলাম "গত রাত্রিতে আমি ভাল ঘুমুতে পারি নাই, তাই এই গাছের তলায় শু'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা কুস্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম; আর এই ভাবে শুয়ে থাক্‌লে বড় কুস্বপ্নও দেখ্‌তে হয়। যাই হোক আমাকে দেখে তোমরা যে বড় ভয় পেয়েছিলে এই জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু

কেশবকে ডেকে এনে তোমরা যে আমার উপকার ক'রেচ, তা আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না। গোস্বামী মশাই মহাত্মা ব্যক্তি; তাঁর পুত্র-কন্যাদের এইরূপ উপযুক্ত কাজই বটে। আমি আজ্‌কের এই ঘটনার কথা গোস্বামী মশাইকে স্বয়ং ব'লে আস্‌বো। মাও এই কথা শুনে যারপর নাই আনন্দিত হবেন। ভগবান্ এইরূপ ছেলেমেয়েদের মঙ্গল করেন। তিনি তোমাদিগকে সুখে রাখুন।" এই বলিয়া আমি ভূদেবকে বলিলাম, "ভূদেব ভায়া, তুমি কিন্তু পড়ে যাওয়াতে আমি বড় দুঃখিত হ'য়েচি। আর ফুলগুলি——" আমার কথা শেষ না হইতে হইতে আনন্দময়ী সুশীলা ভূদেবের দিকে চাহিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ভূদেব, বোধ করি, বেগতিক দেখিয়া এবং তাহার যে কোথাও লাগে নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য, সাজি-হস্তে ঘরের দিকে দৌড় মারিল এবং খানিক দূর গিয়া আমার দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দেবন বাবু, এই দেখুন, আমার কোথাও লাগে নাই।" এই বলিয়া আবার দৌড় মারিল। সুশীলা হাসিতে হাসিতে তাহার দিদির সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিল এবং "ওরে, দৌড়িস্‌নেরে, থাম্; আবার প'ড়ে যাবি" এই কথা বার বার বলিতে লাগিল। কিন্তু কে কার কথা শুনে? সুশীলা যত চীৎকার করে, ভূদেব তত দৌড়িতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা ধীরে ধীরে চক্ষুর অদৃশ্য হইল।

যতক্ষণ তাহারা নয়নগোচর হইতেছিল, ততক্ষণ আমি একদৃষ্টিতে এই কৌতুক দেখিতেছিলাম এবং তাহাদের কথা চিন্তা করিয়া আনন্দিত ও চমৎকৃত হইতেছিলাম। দেবরূপিণী যোগমায়ার দেব-হৃদয়ের কথা মনে করিতে করিতে আমার চক্ষুতে জল আসিল এবং তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল; সরলপ্রাণা সুশীলার কথা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল এবং দেবশিশু ভূদেবের বীরত্বব্যঞ্জক স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমি কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই বালক-বালিকাগুলির পবিত্র আকারে আমি যেন দেবরাজ্যের ছায়া দেখিতে পাইলাম। বহুদূরে গিয়া যোগমায়া ছলনাক্রমে একবার আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল; কিন্তু আমরা একদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছি, ইহা বুঝিতে পারিয়া আর ফিরিয়া চাহিল না। তাহারা দৃষ্টি-পথের অতীত হইলে, আমি সানন্দমুখে কেশবের দিকে চহিলাম। কেশবের মনেও

ঐরূপ কোনও চিন্তা হইতেছিল; যেহেতু সে আমাকে বলিতে লাগিল, "যেমন আমাদের প্রভু, তেমনই প্রভুর ছেলেগুলি। আহা, প্রভুর বড় কন্যা যোগমায়াটি যেন সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনই ব্যবহার। অহঙ্কার নাই, ঘিন্না নাই, সকলের ছেলেকেই কোলে লিচ্ছেন, আদর ক'চ্চেন, ঘরকে লিয়ে গিয়ে খেতে দিচ্চেন। এইরূপ করেন ব'লে, আমরা গ্রামশুদ্ধ লোক কত ডরাই। বলি, একে প্রভু কন্যে, তায় আবার যেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী। বাপরে, শূদ্দুরের ছেলে কি ওঁর কোলে উঠ্‌তে পারে? আহা, দিদি ঠাকুরাণের বিয়ার জন্যে প্রভু কত ভাব্‌চেন। প্রভুর ভাবনা দেখে, আমাদেরও ভাবনা হয়। কিন্তু এক একবার ভাবি, "দিদি ঠাকুরাণ চ'লে গেলে, আমাদের পলাশ-বন গ্রাম যেন আঁধার হ'য়ে যাবেক, দিদিঠাকুরাণ যেন গ্রামের আল।"

কেশবের এই কথা শুনিতেছি, এমন সময়ে দেখি, বাড়ী হইতে ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে এ সময়ে হঠাৎ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, "মা ঠাকরোণ কি জন্য আপনায় শীগ্‌গীর ডাক্‌চেন।" আমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে চলিলমাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জননী আমায় অসময়ে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ভৃত্যকে অনেক প্রশ্ন করিয়াও কিছু জানিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি অনন্য মনে দ্রুতপাদক্ষেপে বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পিতৃদেব বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বৈষয়িক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অতএব, তাঁহার নিকট আর না দাঁড়াইয়া একেবারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, জননীদেবীও গৃহকার্য্যে নিযুক্তা; কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও চিন্তাভারাক্রান্ত; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তিনি রোদনও করিয়াছেন, তাহা চক্ষু দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম। তিনি গৃহের কার্য্যাদি করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহাতে যেন তাঁহার চিত্ত সংলগ্ন নাই। না করিলে নয়, এইরূপ ভাবেই যেন তিনি গৃহ কর্ম্মাদি করিতেছেন। আমি ব্যাকুল মনে চিন্তিত হৃদয়ে তাঁহার সন্নিহিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বস্ত্রাঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমি এই অচিন্তনীয়

ব্যাপারে যারপরনাই কাতর ও উদ্বিগ্ন হইলাম এবং তাঁহাকে বারম্বার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, আরও রোদন করিতে লাগিলেন এবং আমার মস্তক ও চিবুক স্পর্শ করিয়া হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি আমার ভ্রাতাদের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইলাম এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অদ্য কোনও পত্র আসিয়াছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া মঙ্গলা দাসী গৃহান্তর হইতে আসিয়া আমায় বলিতে লাগিল-"দাদাঠাকুর, তুমি অত উতলা হ'চ্চ কেন? সকলেই ভাল আছে; আজ কোথ্থেকেও কোন পত্র আসে নি। মা আজ সকাল থেকে উঠে অবধি তোমার জন্যেই কেঁদে কেঁদে আকুল হ'চ্চেন। ভোরের সময় স্বপন দেখেছিলেন, তুমি যেন সন্নিসি হ'য়ে কোথায় চলে গেছ। ভোরের স্বপন মিথ্যে হয় না কি না; আর মা উঠে তোমায় আজ দেখ্তেও পান নি; সেই অবধি কেবল কাঁদ্‌ছেন আর কাঁদছেন। বাপ রে ওঁ'র কান্না তো আমি আর দেখ্‌তে পারি না। যখন তখন কেবল তোমারই কথা নিয়ে কান্না হচ্চে। বলি, হেঁগা দাদাঠাকুর, তুমি এত লেখাপড়া শি'খেচ; বলি লেখাপড়া শিখে কি মা'কে এম্নি ক'রেই কাঁদাতে হয়? তোমার শরীরে কি একটুও দয়া মায়া নেই? দেখ্‌চো না, মা কেবল তোমারই জন্যে ভেবে ভেবে আধখানা হ'য়ে গেছেন? আর মাকে কাঁদিয়ে তোমার সুখ হয় নাকি? খেষ্টানী বিদ্যেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দণ্ডবৎ বাবা। আমরা তো মায়ের চোখে জল দেখ্‌লে একেবারে ম'রে যেতুম। অত কথাতেই কাজ কি? এই ধর না, আমি তো ভগ্নী; আমারই চোখে একটু জল দেখ্‌লে আমার গদাই ভাই যেন অস্থির হ'য়ে যেতো!" মঙ্গলার এই তিরস্কারসূচক বাক্যের শেষ না হইতে হইতে পিতৃদেব অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আমিও তাঁহাকে দেখিয়া একটু ব্যস্ত সমস্ত হইলাম। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "কিসের আবার গোল হ'চ্চে, মঙ্গলা?" মঙ্গলা গৃহমার্জ্জনা করিতে করিতে মার্জ্জনী একবার জোরে আছাড়িয়া বলিল, "কিসের আবার গোল! যে গোল চিরদিনই হয়, আজও তাই হ'চ্চে।" এই বলিয়া সে আবার সজোরে মার্জ্জনী সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিন্তু যে স্থানে তাহার মার্জ্জনী আছাড় খাইতেছিল, তাহা এরূপ পরিষ্কৃত যে, সেখানে একবিন্দু সিন্দুর পড়িলেও অনায়াসে তাহা খুঁটিয়া লওয়া যাইত মঙ্গলার ভাবগতিক

দেখিয়া আমি মনে করিলাম, তাহার শক্তি থাকিলে আজ সে আমার বিষ ঝাড়িয়া ফেলিত।

পিতৃদেব আর বাক্য ব্যয় না করিয়া তামুকু খাইতে খাইতে একখানা বেঞ্চের উপর বসিলেন এবং আমাকেও বসিতে বলিলেন। আমি অদ্যকার ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অবহিতচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "দেবু, তুমি এতদিন বালক ছিলে; তাই তোমায় কিছু বলি নাই। কিন্তু এখন বলিবার সময় আসিয়াছে। তুমি জ্ঞানবান্ ও বিদ্বান্ হইয়াছ। তোমার বিদ্যাশিক্ষার প্রশংসা শুনিয়া আমরা সকলেই গৌরবান্বিত হই। দেশ শুদ্ধ লোক একমুখে তোমার স্বভাব চরিত্র ও জ্ঞানের প্রশংসা করে। তুমি যে কোনও চাকরী বা কাজকর্ম্ম করিলে না, তজ্জন্য আমি দুঃখিত নই। তুমি যে উদ্দেশ্যে পলাশবনে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা অতীব সাধু এবং আমিও তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্তু আমি কোন মতেই তোমার একটী সঙ্কল্পের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না;—তুমি যে আজীবন অবিবাহিত থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, আমার বিবেচনায় তাহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন নহে। সংসারী না হইলে মানুষের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয় না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এতদিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ। অতঃপর গৃহী হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন কর। গৃহধর্ম্ম পালন করিতে করিতে ভগবানের মহিমা ও কৃপা আরও বুঝিতে পারিবে। তুমি শান্তিপ্রিয়, তাহা আমি জানি। তুমি সংসারের কোলাহল, অশান্তি, বিপদ্ আপদ্ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া হয়ত তন্মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করিতেছ না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, পরমেশ্বর মানুষের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে বিপদ আপদের মধ্যে ফেলিয়া থাকেন। স্বর্ণে নিকৃষ্ট ধাতু থাকিলে, অগ্নি দ্বারা তাহা শোধিত হয়; সেইরূপ বিপদ আপদের মধ্যে পড়িলে মানুষের অহঙ্কার অভিমানাদি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সে নির্ম্মল ও একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হয়। বিপদ, অশান্তি ও স্বজন-বিয়োগের আশঙ্কা করিয়া সংসার হইতে দূরে থাকা পৌরুষের চিহ্ন নহে, বরং কাপুরুষেরই লক্ষণ। এতদ্দারা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই করা হয়। দেখ, সংসারী হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করাই জগতের নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা সাধ্যপক্ষে উচিত নহে। স্থলবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা দোষের না হইতে পারে; কিন্তু তুমি যে সেরূপ

স্থল নও, ইহা বলাই বাহুল্য। ভগবান্ সংসারে তোমাকে সুখই দিন আর দুঃখই দিন, দুইই মাথা পাতিয়া লইবে। সংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্থান নহে। সুখের নিত্য সহচর দুঃখ। সুখ দুঃখ দুইয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। দুঃখ দেখিয়া ভয় পাইও না, অরণ্যে পলাইবার চেষ্টা করিও না। ভগবান না করুন, কিন্তু কখনও যদি তোমার ভাগ্যে দুঃখ বা বিপদ্ ঘটে, তবে তাহা বিধাতার বিধান ও ইচ্ছা বলিয়াই জানিবে। দুঃখে, বিপদে অধীর না হইয়া তৎসমুদয় সহ্য করিবে। তুমি সকলই বুঝিতে পারিতেছ; তোমাকে এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর একটী কথা আমি তোমাকে কর্ত্তব্য বোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমার নিজের সম্বন্ধে হইলে, তাহা বলিতাম না; কিন্তু তোমার গর্ভধারিণীর মুখ চাহিয়া আমাকে তাহা বলিতে হইতেছে। তুমি বিবাহ না করায় তোমার জননী যার পর নাই দুঃখিতা। ইনি তোমাকে সংসারী দেখিলে নিরতিশয় আনন্দিতা হন। তুমি অবশ্যই ইহা জানিতেছ ও মনে মনে বুঝিতেও পারিতেছ। জননীর সন্তোষ-বিধান করা তোমার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য এবং আমার বিবেচনায় একটী প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্মও বটে। পরের মঙ্গল ও সুখ সাধন করা যখন তোমার জীবনের একটী প্রধান ব্রত, তখন গর্ভধারিণী জননীর দিকে চাহিবে না, এ কিরূপ কথা? আত্মত্যাগ না করিলে কখনও পরের উপকার করা যায় না এবং কোনও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। বিবাহ করিলে যদি তোমার সুখের ব্যাঘাত ঘটে আর তোমার জননীর আনন্দ হয়, তাহা হইলেও তোমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য। নিজে কষ্ট না সহিলে কি কখনও পরের সুখ সাধন করা যায়? কিন্তু বিবাহ করিলে, তোমার সুখের ব্যাঘাতই বা কিসে হইবে? যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার মনোমত না হন, তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া কালযাপন করিবে। সক্রেটীশের কথা তুমি সবিশেষ অবগত আছ; তিনি কিভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ কর। কিন্তু তোমার তত দূরও আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। আমি তোমার জন্য একটী উপযুক্তা পাত্রী স্থিরীকৃত করিয়াছি। পাত্রীটি তোমারই অনুরূপা এবং সর্ব্বপ্রকারে তোমারই যোগ্যা। বালিকাটিকে দেখিয়া অবধি আমার মনে হইয়াছে, ভগবান্ তাহাকে তোমারই জন্য এবং তোমাকে তাহারই জন্য অভিপ্রেত করিয়াছেন। আর তাঁহার এই মঙ্গলময় অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে বলিয়াই বুঝি তিনি তোমাদিগকে

পরস্পরের নিকটে আনয়ন করিয়াছেন। আমি কাহার কথা বলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছ—গোস্বামী মহাশয়ের কন্যা যোগমায়া।"

এই বলিয়া পিতৃদেব আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি আর কি উত্তর দিব? উত্তর দিবার আমার মুখ ছিল না। নিজের সুখান্বেষণ করিতে গিয়া আমি জননীদেবীর সুখ দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত করি নাই, পিতৃদেবের স্নেহমিশ্রিত এই মৃদু মধুর তিরস্কার বাক্যে আমি যারপরনাই লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হইলাম। আমি মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, ভণ্ড আমি, নরাধম আমি, স্বার্থপর আমি—এইরূপেই কি আমি ধর্ম্মজীবন লাভ করিব? প্রাণ দিলেও যাঁহাদের ঋণের পরিশোধ করা যায় না, বিবাহ করিলে যদি তাঁহাদের যৎসামান্য সন্তোষ সংসাধিত হয়, তবে সে বিবাহ আমি করিব না? তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যোগমায়া যদি নরকের কীটও হয়, তথাপি আমি তাহাকে বিবাহ করিব এবং বিবাহ করিয়া যদি আমি প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে শতবৃশ্চিক যন্ত্রণাও অনুভব করি, তথাপি একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন জগতের আর কেহই তাহা জানিতে পারিবে না। আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া, পিতৃদেব বলিলেন, "দেবু, তুমি আমার কথায় কি বল?"

আমি বলিলাম, "আপনার কথার প্রত্যুত্তরে আমার কিছুই বলিবার নাই। আপনার ও জননীর আদেশ ও ইচ্ছা আমার অবশ্য পালনীয়। যোগমায়াই হউক, আর যেই হউক, যাহার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তাহারই সহিত আমার বিবাহ হইবে। কদাপি ইহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু যোগমায়ার সহিত বিবাহ দেওয়া যদি আপনাদের মত হয়, তবে এক মাস কাল এ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিবেন না, ইহাই আমার প্রার্থনা। এক মাস পরে, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন। আমি আপনার নিকট এক মাসের সময় প্রার্থনা করিতেছি।"

পিতৃদেব আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে; আর এক মাস কাল আমিও এখানে থাকিতে পারিতেছি না। কোনও বিষয় কার্য্যোপলক্ষে আমায় স্থানান্তরে যাইতে হইতেছে। তোমার গর্ভধারিণীর ইচ্ছা, ইনি এই এক মাস কাল তোমার কাছে পলাশবনেই বাস করেন। মঙ্গলাও কাছে থাকিবে। ভৃত্য এই বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তুমি কি বল?''

আমি-বলিলাম, "এ অতি সুন্দর প্রস্তাব। মা পলাশ বনে থাকিলে, আমাকে আর নিত্য দুই বেলা এখানে গতায়াত করিতে হয় না।" তারপর জননীর দিকে চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "কিন্তু মা, গোস্বামী মশাইয়ের মেয়ের সহিত আমার বিয়ের কথা তুমি বা মঙ্গলা কা'কেও ব'লো না বা জান্‌তে দিও না। যদি এই কথা হঠাৎ রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে ওখানে বিয়ে হওয়া সম্বন্ধে গোলযোগ হ'বে, তা ব'লে রাখ্‌ছি।"

জননী দন্তে দন্তে জিহ্বা পেষণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তা কি আমি ব'ল্‌তে পারি? আর তুমি যখন মানা ক'রচ, তখন ব'ল্‌ব কেন?"

মঙ্গলাও বলিয়া উঠিল, "দাদাঠাকুর, তুমি বুঝি, আমাকে তাই মনে করেচো। মঙ্গলার পেটের কথা বা'র করে, সংসারে তো এমন কা'কেও দেখি নি।" এই বলিয়া মার্জ্জনী রঞ্জিত হস্তা মঙ্গলা দাসী সগর্ব্বে চঞ্চল-পাদবিক্ষেপে অন্যত্র গমন করিল।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া, জননীর অনুরোধ ক্রমে পিতৃদেব ও আমি স্নানের উদ্যোগ করিতে গেলাম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

ঝরণার পাশে।

দেবি　আমি প্রতিদিন এমনি সময়ে
　　থাকিব হেথায় আসিয়া,
ওই　ঝরণার পাশে কঠিন পাথরে
　　বসিয়া,
এই　ম্লান জ্যোছনা-কর-মাখা আঁধারে
　　তোমারি পথপানে চাহিয়া।

তুমি　সারাদিন পরে গৃহকাজ সারি
　　কলসি তুলি কাঁখেতে,
ওই　কালো কেশগুলি পড়িবে এলায়ে
　　পিঠেতে,
আসি　সন্ধ্যাটির মত ধীরে ধীরে, রেখো
　　কলসি আমার পাশেতে।

ওগো তুমি একটিও কথা বলিও না,
লজ্জারাগ মুখে মাখিয়ে
শুধু ওইখানে থেকো ছবিটির মত
দাঁড়িয়ে,
ওই ঝরণার জল পড়িবে আসিয়া
চরণের কাছে ছড়িয়ে,
যাবে সান্ধ্য পবনে পুষ্পিত শাখা
অধরের পাশে দুলিয়ে।

আমি একবার শুধু দেখিব চাহিয়া
ওই লজ্জা-নত মু'খানি,
দেব নির্ঝরিণী জলে কলসি ভরিয়া
তখনি,
তুমি আপনার ঘরে যেয়ো চলে যেন
আমারে কখনো দেখনি।

দেবি ওই শাখাটির পরে ভর রাখি
আধ-আলো আধ আঁধারে
আমি দেখিতে থাকিব কলসি কাঁখেতে
তোমারে,
ওগো তনুখানি তব মিশে যাবে ধীরে
অদূর গ্রামের মাঝারে।

মধু জল কলরোলে পাহাড়ের কোলে
নির্জ্জন কুটীরে শয়নে
ধীরে মুদে যাবে আঁখি, দেখিব তোমারে
স্বপনে,
ওগো সারাদিন ধরে গড়িব তোমারে
মনের মতন যতনে,
সাঁঝে আসিব গো পুন তোমারি আশায়
এখানে।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জগদ্রাম রায়ের সময় নিরূপণ।

গত ৪র্থ সংখ্যক দাসীতে জগদ্রাম রায়ের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা দেখিলাম। পড়িয়া মনে হইল, যেন সময় নিরূপণ সম্বন্ধে গোলযোগ টানিয়া আনা হইয়াছে। জগদ্রাম কৃত "দুর্গাপঞ্চরাত্রি ও অদ্ভুত রামায়ণে" ঐ ঐ পুস্তক রচনাকাল স্পষ্ট লেখা আছে। সুতরাং পুস্তক রচয়িতার কালও সহজে জানা যায়। দাসীর সম্পাদক মহাশয় তর্ক-বিতর্কের একটী মীমাংসা নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করিয়াছেন দেখিয়া, নিম্নে দুই একটী কথা বলিতে সাহসী হইলাম।

প্রথমে বলা আবশ্যক যে, ঐ দুই পুস্তকের কোন খানিই আমি দেখি নাই। এ বিষয়ে দাসীতে যতটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই আমার মূল।

দুর্গাপঞ্চরাত্রির শেষে লেখা আছে,—

ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র শক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে শুক্লপক্ষ শুভ দিনে॥
ষোড়শ দিবস প্রতিপদ শুক্রবারে।
কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগ সৌভাগ্য সুন্দরে॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে, ১৬৯২ শকে ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতি বার প্রতিপদ্ তিথিতে দুর্গাপঞ্চরাত্রি রচনা সমাপ্ত হয়। রন্ধ্র বা ছিদ্র শব্দ দ্বারা চিরকালই ৯ বুঝিয়া থাকি। শূন্য, আকাশ ও তাহার যাবতীয় প্রতিশব্দ দ্বারা ০ বুঝায়। বস্তুতঃ ১৬৯২ শক বুঝিতে কোন গোলযোগ নাই!

কিন্তু ঐ দিবস বৃহস্পতিবার ও শুক্লপ্রতিপদ্ ছিল কি? বার তিথি নক্ষত্র না মিলিলেওবা শক সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত। কিন্তু গণনা দ্বারা জানা যায় যে, ১৬৯২ শকের ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতিবার শুক্ল প্রতিপদ্ কৃত্তিকা নক্ষত্র হইয়াছিল।

এরূপ গণনা করিবার অনেক সংক্ষিপ্ত নিয়ম আছে। সকলের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনায় একটি সহজ নিয়ম দেওয়া যাইতেছে। আশা করি পাঠকবর্গ এজন্য আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

প্রায় ৩৬৫·২৬ দিনে আমাদের এক বর্ষ হইয়া থাকে। উহাকে ৭ (সপ্তাহ) দিয়া ভাগ করিলে ১·২৬ দিন অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ প্রতিবর্ষে ১·২৬ দিন করিয়া বারে বৃদ্ধি হয়। এখন ১৮১৮ শক যাইতেছে। ১৬৯২ হইতে ১৮১৮ শক পর্য্যন্ত ১২৬ বৎসর। সুতরাং

অত বৎসরে ১৫৮ দিন বারে বাড়িয়া আসিয়াছে। ৭ দিয়া উহাকে ভাগ করিলে ৪ অবশেষ থাকে। ১৬ বৈশাখ এবৎসর সোমবার ইহা হইতে ৪ দিন পিছাইয়া গেলে বৃহস্পতিবার হয়। অতএব জানা যাইতেছে যে, ১৬৯২ শকের ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইয়াছিল।

ঐ দিবসে শুক্ল প্রতিপদ্ হইয়াছিল কি? দেখা যায় যে,এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রায় ২৯·৫৩ দিন এবং প্রতিবর্ষে ১২টী অমাবস্যা হইয়া ১০·৮৯ দিন অতিরিক্ত থাকে। সুতরাং এ বৎসর যে যে দিন অমাবস্যা হইল, আগামী বর্ষে সেই সেই দিন হইতে ১০·৮৯দিন পিছাইয়া অমাবস্যা হইবে এবং গতবর্ষে অতদিন পরে অমাবস্যা হইয়াছিল। ১৬৯২ হইতে ১৮১৮ শক পর্য্যন্ত ১২৬ বৎসর। অতএব বর্ত্তমান শক হইতে ১৬৯২ শকে ১৩৭২ দিন বাড়িয়াছিল। উহাকে চান্দ্রমাস পরিমাণ ২৯·৫৩ দ্বারা ভাগ করিলে ১৩ অবশেষ থাকে। অর্থাৎ জানা গেল যে এ বৎসর যে যে মাসের যে যে দিন অমাবস্যা প্রতিপদ্ ইত্যাদি ঘটিয়াছে, ১৬৯২ শকের সেই সেই মাসের সেই সেই দিনের ১৩ দিন পরে অমাবস্যাদি হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ৩রা বৈশাখ প্রতিপদ্ গিয়াছে। সুতরাং ১৬৯২ শকে ১৩+৩ =১৬ বৈশাখ প্রতিপদ্ হইয়াছিল। ১৬ বৈশাখ প্রতিপদ্ তিথি পাইলেই সেই দিবসের নক্ষত্র ও যোগ মোটামুটী গণনা করিতে পারা যায়। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা গেল না। যাহা হউক দেখা গেল যে,দুর্গাপঞ্চরাত্রির রচনাকাল সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই।

পুনশ্চ, অদ্ভুত রামায়ণের শেষে লেখা আছে,

সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশ যুক্ত তাথে।
ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
ঊনত্রিশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি।

"শতাব্দ" লইয়া একটু গোলযোগ আছে। সম্ভবতঃ "শকাব্দ" লিখিতে ভ্রমক্রমে "শতাব্দ" হইয়াছে। যাহা হউক, গণনা দ্বারা জানা যায় যে, ১৭১২ শকাব্দের ২৯ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ও শুক্লপঞ্চমী ছিল। অতএব "শতাব্দ" লইয়া তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখি না। পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে "সম্বৎ" অব্দানুসারে বৎসর গণিত হইত কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক শতাব্দ অর্থে সম্বৎ, এ স্থলে কিছুতেই হইতে পারে না।

কিন্তু যদি জগদ্রাম ১৬৯২ শকে দুর্গাপঞ্চরাত্রি এবং ১৭১২ শকে অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তবে নিম্নের ভণিতাটীতে এরূপ লেখা কেন? দাসীতে উদ্ধৃত ভণিতাটী এই,—

পিতা জগদ্রাম মোর রাম পরায়ণ।
যেঁহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ॥
তা' পর পুস্তক দুর্গাপঞ্চরাত্রি নাম।
দুর্গা প্রীতে কাব্য কৈলা অতি অনুপাম॥

যেরূপ আকারে "তা' পর" দাসীতে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে "তা পর" অর্থে "তার পর" অর্থাৎ অদ্ভুত রামায়ণের পরে দুর্গাপঞ্চরাত্রি রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন। অথচ পূর্ব্বে ঐ ঐ পুস্তক প্রণয়নের যে কাল লিখিত আছে, তাহাতে দুর্গাপঞ্চরাত্রি প্রথমে লেখা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু "তা পর" অর্থে "তার অপর" বুঝা অন্যায় নহে। আমার বোধ হয় অদ্ভুত রামায়ণ খানি দুর্গাপঞ্চরাত্রি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্ততঃ জগদ্রামের পুত্র ঐরূপ মনে করিয়া প্রথমে প্রধান পুস্তকখানির নাম করিয়া থাকিবেন। যাঁহার নিকট ঐ দুই পুস্তক আছে, তিনি অনায়াসে এই অনুমানের সত্যাসত্য বিচার করিতে পারিবেন।

কিন্তু আরও একটা কথা আছে। দাসী পাঠে জানা যায় যে, জগদ্রাম রায়ের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এখন বর্ত্তমান। বিলাতি সাহেবেরা ৩ পুরুষে ১০০ বৎসর গণিয়া থাকেন। আমাদের দেশে ৩ পুরুষে ১০০ বৎসর হয় কি? অবশ্য এ সকল গণনা নিতান্ত স্থূল এবং অনেক পুরুষের সময় জানিতে গেলেই এরূপ গড় হিসাবে সময় কতকটা নিরূপণ করিতে পারা যায়। যাহা হউক নানা কারণে আমাদের দেশের লোকের মধ্য আয়ুষ্কাল ৩৩ বৎসর অপেক্ষা অনেক কম। ২৫ বৎসর ধরিলে বড় একটা দোষ হইবে না।* এই হিসাবে ৫ পুরুষে ১২৫ বৎসর থাকে। বলা বাহুল্য দুই চারি পুরুষ লইয়া এরূপ গণনা করিলে ভ্রম অধিক হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, এই হিসাবেও জগদ্রাম রায় ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বে কবি না হইয়া একশ সওয়াশ বৎসরের পুরাতন হন!

শ্রীসত্যকুমার রায়।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ।

দাসাশ্রম ভগবানের কৃপায় আর এক মাসিকাল আপনার ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হইয়াছে। রোগী ও স্থায়ী আতুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে তথাপিও এখনও আরও কতকগুলি পুরুষের স্থান খালি আছে। দাসাশ্রমের বন্ধুগণ অনুগ্রহ করিয়া কোথাও কোন অনাথ আতুর দেখিলেই পাঠাইবার সুবিধা করিতে পারিলে আমাদিগকে সংবাদ দিবেন।

* জীবন বিমার কাগজ পত্র দেখিলেও কথাটার যাথার্থ বুঝা যাইবে।

বর্ত্তমান মাসের রোগীর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। গোপালচন্দ্র নন্দী, ৩। দেবীয়া, ৪। স্বর্ণ, ৫। ফুলমণি, ৬। দুর্গামণি, ৭। নবদুর্গা, ৮। হীরামণি, ৯। রাজেশ্বরী, ১০। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১১। ঈশ্বরী, ১২। রামচরণ, ১৩। কৃষ্ণভাবিনী, ১৪। কেদারনাথ সার মাতা, ১৫। সুমিত্রা, ১৬। অম্বিকা, ১৭। চিন্তামণি, ১৮। ভোলানাথ রজক।

গোপালচন্দ্র নন্দী আপাততঃ দাসাশ্রম হইতে বিদায় লইয়া কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন। হীরামণি—প্রায় আরোগ্যলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। রাজেশ্বরী—আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—আরোগ্যলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। রামচরণ—অবস্থা পুনরায় শোচনীয় হওয়ায় হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণভাবিনী—বয়স ৩০ বৎসর। নিবাস ফরাসডাঙ্গা। সাত বৎসর হইতে চক্ষুর পীড়া হইয়া অন্ধ হয়। কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ কোনও ধনবান দয়ালু ব্যক্তির সদাব্রতে প্রতিপালিত হইত। সম্প্রতি প্রায় ১২ দিন জ্বর ও নিউমোনিয়ায় ভোগার পর বাবু নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার কর্ত্তৃক দাসাশ্রমে আনীত হয়। পৃথিবীতে হতভাগিনীর আপনার বলিবার কেহ ছিল না। অশেষ প্রকারের যন্ত্রণাভোগ করিয়া অবশেষে ১২ই এপ্রেল ইহ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। কেদারনাথ সার মাতা—নানাপ্রকার স্ত্রীরোগে অনেক দিন হইতে কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসার্থ এখানে তাঁহার পুত্র আনয়ন করেন, কিন্তু হাঁসপাতালের বড় বড় ডাক্তার রোগ একান্ত অসাধ্য বলাতে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। পাবনার বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী ইঁহাকে প্রেরণ করেন। সুমিত্রা—জাতি কায়স্থ, বয়স ১৫, অন্ধ, নিবাস ঢাকা জেলায়। অতি কষ্টে ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিত। বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য যখন ঢাকায় যান তখন ইঁহাকে আনয়ন করেন। অম্বিকা—জাতি স্বর্ণবণিক, বয়স আন্দাজ ৮০, অন্ধ, ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিত। রাণিগঞ্জের দয়াশীল সেরেস্তাদার বাবু রজনীনাথ রায় বিশেষ উদ্যোগ করিয়া ইঁহাকে দাসাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। অম্বিকা এখানে আসিয়া প্রথমতঃ নাম পর্য্যন্ত বলিতে অস্বীকার করিয়াছিল। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে যেন একেবারে বিমর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? দিবারাত্রি হরিনাম গান করিতেছে। চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়—রসুয়ে ব্রাহ্মণ, বয়স ২২ কতকগুলি ঝি ইহাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পীড়িত দেখিয়া ইহাকে এখানে আনয়ন করে। রোগ জ্বর, কাশি ও উদরাময়। এখন একটু ভাল, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

ভোলানাথ রজক—জাতি ধোপা বয়স ৩৫। ৩৬, নিবাস বটতলা। রোগ নানাপ্রকার। চিকিৎসার সুবিধা হইবে বলিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

দানপ্রাপ্তি।

গত মাসে নিম্নলিখিত দানগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা দাতাগণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মোট আয়।

বাবু হরিপদ ঘোষাল মার্চ্চ ।০, বাবু কেদারনাথ দাস মার্চ্চ ।০, নবাব সৈয়দ আবদুল শোভান চৌধুরী, মার্চ্চ, এপ্রেল ২৲, বাবু দীনেশচন্দ্র চৌধুরী এপ্রেল ॥০, বাবু পিয়ারীমোহন ভড় মার্চ্চ ।০ বাবু নন্দলাল ঘোষ জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ৪৲, বাবু রাজেন্দ্রনাথ শেঠ ফেব্রুয়ারী ১৲, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, মার্চ্চ ॥০, বাবু নন্দকুমার দত্ত মার্চ্চ ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র চন্দ্যোপাধ্যায় মার্চ্চ ১৲, A lady C/o babu Sreenath Das মার্চ্চ ১৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত মার্চ্চ ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর মার্চ্চ ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু মার্চ্চ ॥০, ৪।২ নং ছকুখানসামার মেস মার্চ্চ, এপ্রেল ৷৷০, ৪০।১ কলুটোলা মেস মার্চ্চ ॥০, বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র মার্চ্চ ।০, বাবু অনাথনাথ দেব, মার্চ্চ এপ্রেল ২৲, বাবু পশুপতিনাথ বসু মার্চ্চ ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ মার্চ্চ ও এপ্রেল ২৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, এপ্রেল ১৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ ২৲, একজন ভদ্র মহিলার মাসিক চাঁদা ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী মার্চ্চ ১৲, মোট ২৫৲।

এককালীন দান।

শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী রায় চৌধুরাণী পাঙ্গাশিয়া ।১০, শ্রীমতী মহামায়া দাসী ১৲, কুমার ত্রিদেবেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মণঃ ১৲, আজিম উদ্দিন আহম্মদ ৩৲, বাবু দেবীবর চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু উমাচরণ সেন ১৲, বাবু কুঞ্জবিহারী রায় ॥০, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ১৲, একজন বন্ধু ১৲, বাবু কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, বাবু দীনবন্ধু সেন ১৲, বাবু গণেশচন্দ্র দাস ১৲, বাবু পার্ব্বতীনাথ ঘোষ ॥০, বাবু অশীতকুমার গাঙ্গুলী ১৲, বাবু কাশীশ্বর নাগ ॥০ বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ ১৲, বঙ্কবিহারী বক্সী ১৲, বসন্তকুমার গুপ্ত ১৲, বাবু কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৲, ¡Monk Khijari Esqr, ২৲, বাবু হরিপদ দত্ত ।০, বাবু কেদারনাথ মিত্র ॥০, Dr. S. P. Sharbadhikari ২৲, বাবু নীলমাধব বসু ১৲, বাবু শ্রীপতি দত্ত ।০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু ।০, বাবু হেমন্তকুমার পাল ।০, বাবু শিশিরকুমার ঘোষাল ৵০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৵০, বাবু ক্ষেত্রগোপাল সীকদার ।০, Mrs. G. Ghose ১৲, বাবু কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ।৵০, ১৬ নং মুসলমানপাড়া মেস্ ।০, ১২৬ নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস ।০, ৩০ নং ওল্‌ডবৈঠকখানা মেস ।৵০, বাবু সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী ২৲, শ্রীমতী সুশীলা দাসী ২৲, বাবু হিরন্‌কুমার দাসগুপ্ত ৵০, বাবু রমেশচন্দ্র ৴০, বাবু ব্রজলাল বসু ৵০, বাবু কুঞ্জবিহারী রায় ॥০, বাবু শশীকুমার সেন ॥০, বাবু আশুতোষ দত্ত ॥০, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৵০, বাবু গদাধর দাস ।০, বাবু বিভূতিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৴০, বাবু শশীভূষণ মল্লিক ॥০, ১০০।২ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট মেস ১৲, ৩৩।১ নং মেছুয়াবাজার মেস ॥০, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ ৫৲, ৪০ পঞ্চাননতলা মেস ।০, ৮।১ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন মেস ॥০, Jetta Joychand Esqr. ২০৲, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ আঢ্য ৵০, বাবু ইন্দুভূষণ মুস্তফী৵০, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, ২০ নং পটুয়াটোলা মেস ॥০, বাবু মুকুন্দলাল রায় ১৲, ৪০।১ পঞ্চাননতলা মেস ।০, বাবু দুলালহরি ঘোষ ৷৷০, বাবু যতীন্দ্রমোহন দত্ত ।০, বাবু শরৎচন্দ্র রায় ।০, বাবু বনবিহারী বসু ।০, বাবু অপূর্ব্বকুমার গাঙ্গুলী ৵০, বাবু বসন্তকুমার রায় ৵০, ৪।১

ছকুখানসমার লেন মেস ।/০, বাবু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।/০, বাবু রমেশচন্দ্র শীল ।/০, বাবু বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ।/০, ডাক্তার হীরালাল ঘোষ ৪৲, ৭ নং কাশিঘোষের লেন মেস ॥০, ৪২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস ।০, ৬৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস ।০, বাবু উপেন্দ্র মহাপাত্র ।০, বাবু নবগোপাল দত্ত ১৲, বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ ১৲, বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার ॥০, K. G. Gupta Esq. পুত্রের আরোগ্যলাভ উপলক্ষে ১০৲, বাবু অনন্তরাম ঘোষ ২৲, বাবু বামাচরণ সেন ১৲, শ্রীমতী উর্ম্মিলাবালা দেবী ॥০, বাবু দেবেন্দ্রকুমার রায় ।০, বাবু মোহিনীমোহন বসু ।০, শ্রীমতী শশীমুখী নাথ ১॥০, শ্রীমতী সুনীতিবালা রায় ১৲, ১৬৩ নং বাঙ্গালা বাজার মেস ।০, শ্রীমতী অন্নদা গুপ্ত ২৲, ঢাকা ৩৲, শ্রীমতী সরলা দাস ৫৲, বাবু দুর্গাদাস রায় কনিষ্ঠ পুত্রের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲, নববিধান সমাজের একজন বন্ধু ১৲, ১২৩ দিক্ বাজার মেস ।০, K. P. Bose Esq. ১৲, ৯০ পাতলা খাঁর গলি মেস ১৶৫, ২২২ বাঙ্গালাবাজার মেস ।০, সোনারঙ্গ মেস ॥/০, ১৭ নং লালচাঁদ মেস ॥০, বাবু বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী ১৲, Lily cottage ২৲, বাবু দীনবন্ধু মজুমদার ॥০, ১৪ নং মালিটোলা মেস ॥০, ৮১ নং কামারন গড় মেস ।/০, দিক্‌বাজার মেস ১৲, সার্ভে বোর্ডিং ১৲, বাবু অদ্বৈতপ্রসাদ দে ২৲, A. B. Chatterji Esqr. ১৲, Justice Gurudas Bannerji ৫৲, বাবু ইন্দ্রচন্দ্র দুধোরিয়া ৫৲, ২১।১ পটুয়াটোলা মেস ।০ বাবু ভোলানাথ লাহিড়ী ১৲, বাবু বনমালী চক্রবর্ত্তী ৩৲, বাবু জানকীনাথ মজুমদার ১৲, বাবু গৌরীশঙ্কর দে ১৲, বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু ।০, শ্রীমতী সৌদামিনী গুহ ২৲, I. C. Bose Esqr. ১৲, বাবু রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় ।০, বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।০, বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী /০, বাবু যুগলকৃষ্ণ ত্রিপাঠী ।/০, বাবু গোপালচন্দ্র ত্রিবেদী ।/০, ১ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট মেস ।০, A sympathiser ১৲১০ বাবু প্রিয়নাথ বসু ১, S. N. Dutt Esqr. ২৲, শ্রীমতী সুলোচনা সিংহ ॥০, বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, বাবু তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীমতী থাকমনি ঘোষ মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, শ্রীমান ভোলানাথ দাস ও বিপিনবিহারী সর্দ্দার কাটোয়া ১॥০, বাবু বঙ্কবিহারী দাস ॥০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু বেণীমাধব মিত্র (সবজজ) ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম,এ ৪৲, হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণ বাবু বসন্তকুমার মাল দ্বারা সংগৃহীত ৸৶১০, বাবু ঈশানচন্দ্র দে ১৲, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী গুপ্তা পতিপুত্রের মঙ্গলার্থে ২৲, বাবু পার্ব্বতীচরণ সরকার ১৲, বাবু শ্রীনাথ বসু ।০, বাবু শ্রীপতিচরণ দত্ত ॥০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, বাবু হারাধন মিত্র ॥০, বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।০ বাবু গোঁসাইদাস দাস ।০, বাবু অমরনাথ রায় ।০, বাবু ঈশানচন্দ্র ভুঞা, অনাথবন্ধু সমিতি ১৲, বাবু লক্ষণ সিংহ ১, ৬৩ নং হ্যারিসন রোড মেস ।৶০ ছাত্রগণ ২৲, পাবনার জনৈক ভদ্রলোক ১৲, ছাত্রগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাঃ হেমচন্দ্র সরকার ৫৸৶০, মোট ১৭৬।/১৫।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

সুরাজমোহিনী ফণ্ডের সুদ ২০৲, বাটীভাড়া প্রাপ্ত ৫।/০, ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের বকেয়াবাকী ॥৶০, পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ১১৶১০, দাসীর সাহায্য ৩০॥০, খুচরা দান সংগ্রহ ৩॥/১২॥, সুধীরচন্দ্র হালদারের জিম্মাশোধ ১।৶০, মোট ৭২॥/২॥।

মোট আয়।

মাসিক চাঁদা ২৫৲, এককালিন দান ১৭৬৸/১৫, অন্যান্য প্রকারে আয় ৭২৷৴২৷, পূর্ব্ব-মাসের স্থিত ১৫৲, হিসাব গরমিল ১৷৴১৫, মোট আয় ২৯০৷৶১২৷।

ব্যয়।

খাই খরচ ৩৬৶২৷, রাঁধুনী ৭৲, চাকর ৪৸০, মেথর ৮৷/১০, বাটী ভাড়া ৫০৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৪২৷৴০, রোগী ও আতুরের গাড়ীভাড়া ১৪৲১০, দাহ খরচ ১২৲, ধোপা ২৷০, পূর্ব্ব-মাসের গচ্ছিত শোধ মাং ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ২৫৲, গচ্ছিত রাখা যায় মা: প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ২০৲, ঔষধ ২৲, ভুলক্রমে দুইবার জমা ৸৴০ আদায়কারীর খরচ ৩২৷৴১৫ বিবিধ ২৷৴১৫ খুচরা জমা মাঃ ম্যানেজার ৯৴৫ মোট খরচ ২৮৭৸/১২৷।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ২৯০৷৶১২৷ মোট ব্যয় ২৮৭৸/১২৷ মোট হস্তে স্থিত ২৸/০

বিশেষ ধন্যবাদ।

এবার K. G. Gupta Esqr. কে তাঁহার ১০৲ দানের জন্য ও বাবু বিপিনবিহারী রায় মানিকদহের জমিদারকে তাঁহার ঘড়ি দানের জন্য ও রাণিগঞ্জের সেরেস্তাদার বাবু রজনীনাথ রায়কে তাঁহার রোগী পাঠাইবার জন্য ক্লেশ স্বীকারে আমরা অন্তরের সহিত বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

"দাসী"র মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

১০৩৯ বঙ্কুবিহারী বসু ১৲, ১৮৬১ বঙ্কুবিহারী দত্ত ১৲, ১৮০১ অমৃতনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, ২৯ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ২৲, ৩০ শ্রীমতী মৃনালিনী দেবী ২৲, ১৫৬৯ তারিণীশঙ্কর ঠাকুর ২৲, ১৯১১ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ১৪৮৩ ডাক্তার তারিণীচরণ পাল ২৲, ১৯১২ শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৩১২ অতুলচন্দ্র বসু ২৲, ১৩৬০ শ্রীমতী অনুজানন্দিনী রায় ২৲, ১৩২২ রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর ২৲, ১৭৮৯ বিপিনবিহারী রায়চৌধুরী ২৲, ১৬৮০ যোগেন্দ্রনাথ ঘটক ২৲, ১২৪১ ডাক্তার কেদারনাথ দত্ত ২৲, ৫৪ মিস্ লাবণ্যপ্রভা বসু ২৲, ৮৯৪ মিস্ হেমপ্রভা বসু ২৲, ১১৭১ মহেন্দ্রনারায়ণ সেন ২৲, ১৩৫ গৌরিলাল রায় ২৲, ১৩৭ কাকিনিয়া ব্রাহ্মসমাজ ২৲, ১৪০৯ সুরেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, ২০৬ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২২ কুমুদবন্ধু বসু ২৲, ১৬০৯ হরিপদ সামন্ত ২৲, ৯৩২ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, ৬২৮ সতীশচন্দ্র সিংহ (সাবেক) ১৷০, ১০১৬ বিষ্ণুপদ ঘোষাল ২৲, ১৫২ শ্রীমতী সুশীলা বসু ২৲, ১৭৫৯ কুঞ্জবিহারী সেন ২৲, ৪৭১ ললিতমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ১৮৯২ সূর্য্যকুমার সেন ২৲, ১৮৯৭ L. M. Paulit ২৲, ১৮৯৮ ডাঃ মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৲, ৮৯৫ পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় ২৲, ১৮৯১ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১৯০০ শ্রীমতী সরলতা ঘোষ ২৲, ১৯০১ কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র ২৲, ১৯০২ ভুবনেশ্বর মিত্র ২৲, ১১৯৫ বিজয়সিংহ দুধোরিয়া ২৲, ১৯০৩ মুনিলাল বোথরা ২৲, ৪০৩ শরচ্চন্দ্র গোস্বামী ১৲, ১৯২ মুলচাঁদ রায় ২৲, ১১৩৭ পলমার্থান খ্রীষ্টীয়ান ২৲, ৮০৩ হেমচন্দ্র ঘোষ ২৲, ১১০১ নারায়ণচন্দ্র সরকার ১৲, ১৯১৩ যোগেশপ্রসন্ন ভাদুড়ি ২৲, ১৭১৪ হরিচরণ সরকার ২৲, ১১৫৫ বামাচরণ ঘোষ ১৲, ১১৫৩ হিরালাল ঘোষ ২৲, ১৭৬৫ রাধিকানাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲, ১৭৯৮ করুণাদাস বসু ২৲, ১৪৯৩ নগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৲, ১৪৪২ অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৪৯৯ মহিতচন্দ্র বসু ২৲, ১৯১৪ নবকৃষ্ণ গুহ ১৲, ১৯১৫ কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় ১৲, ১১৩২ অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১২৫৫ প্রসাদদাস বড়াল ২৲, ১৩৪০ নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ২৲, ১৪৩১ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲, ৮৮৮ সম্পাদক গরিবহিতসাধিনী সভা ২৲, ১১০৫ বিনয়ভূষণ সেন ১৲, ১০৪২ ডাঃ নন্দলাল ঘোষ ১৲, ২১০।১ শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী রায় ২৲, ৯০১ যোগেশচন্দ্র দত্ত ২৲, ১৮৩৬ উপেন্দ্রনারায়ণ দে ২৲, ৮০৪ আনন্দচন্দ্র মিত্র ২৲, ১৫১৭ ডাঃ আদ্যনাথ বসু ২৲, ১৯১৬ অন্নদাপ্রসাদ মিত্র ২৲, ১৩৬৯ শ্রীমতী অরুণময়ী দাসী ২৲, ১২৯৭ শ্রীমতী ক্ষিরোদবাসিনী রায় ২৲, ১৬৭২ কালিদাস রায় চৌধুরী ২৲, ১৯১৭ Mother, C/o of Moti Lall Bose ১৲, ১৯১৮ জগৎকিশোর আচার্য্য ২৲, ১১৭০ শরৎচন্দ্র খাঁ ২৲, ১৮১২ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত ২৲, ১২৫৪ ডাঃ ক্ষিরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১৬৭৬ দেবেন্দ্রনাথ ভঞ্জ ২৲, ১৫৯৬ যোগেন্দ্রনাথ শ্রীমানী ২৲, ১১৫০ প্রমথনাথ কর ২৲, ১৮১৭ শ্রীমতী মহামায়া দেবী ২৲, ১৪১৪ অমৃতলাল রায় ১৲, ১০৭২ পূর্ণচন্দ্র দত্ত ২৲, ৮৯৭ আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৲, ১৭৫২ কেদারনাথ মল্লিক ২৲, ১৬৮৪ বেচারাম মল্লিক ২৲, ১০২৪ অন্নদাপ্রসাদ মল্লিক ২৲, ১৪৫৭ প্রমথলাল সেন ১৲, ১৯১৯ অক্ষয়কুমার সেন ১৲, ১৬৮৬ বেনীমাধব ভড় ২৲, ১৯২০ কুমারকৃষ্ণ দত্ত ২৲, ৮৯৬ ডাঃ কেদারনাথ দাস ২৲, ১০৩১ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার ২৲, ১৭৩৪ বরদাকান্ত বসু চৌধুরী ২৲, ১২৪৮ রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর ২৲, ৬৩১ উমেশচন্দ্র পাল ১৲, ১২১০ সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী ২৲।

ক্রমশঃ।

দাসী

অমৃতে গরল।

ভারত গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় ও পৃষ্ঠপোষকতায়, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিবিহীন কোন কোন সংস্কারকদিগের বাহাবায়, এবং সর্ব্বোপরি আপনাদিগের অমিত উৎসাহে বলীয়ান হইয়া, বুথ সাহেবের মুক্তিফৌজদল সম্প্রতি এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন যে, আমাদিগের দেশের দরিদ্র কৃষকদিগের উন্নতিকল্পে ইহারা তাহাদিগের উত্তমর্ণ হইবেন। টাকা, বীজ, আবাস-গৃহ প্রভৃতি যাহা চাহি, তাহাই দিয়া কৃষকদিগের উপকার করিবেন। চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে যখন এই ঘোষণা সংবাদ-পত্রে পাঠ করিয়া অবগত হই, তখন দুঃখে এবং ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, অবশ্যই বুদ্ধিমান্ দেশহিতৈষিগণ এই হিতব্রতের অন্তরালে যে ভবিষ্যৎ অহিত নিহিত রহিয়াছে, তাহা দেশের লোককে বুঝাইয়া দিবেন এবং যাহা হয় একটা প্রতিকারের বিধান চেষ্টা দেখিবেন। কিন্তু কই? দেশহিতৈষীদিগের দৃষ্টি সুধুই আকাশে! কংগ্রেস্, ভড়ং এবং ফাঁকা আওয়াজ লওয়াই সকলে ব্যস্ত; এই ধূলিময় ক্ষুদ্র পৃথিবীর সুখ দুঃখের কথা তাঁহাদের ভাবিবার অবকাশ নাই।

একথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে, ঋণবদ্ধ এবং কৃতজ্ঞতাবদ্ধ কৃষকগণ দিন দিন স্বদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয়দিগের বাধ্য হইয়া উঠিবে, এবং ধীরে ধীরে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাম যদু প্রভৃতির পরিবর্ত্তে জোহন সামুয়েল হইয়া আমাদিগের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া পড়িবে। খ্রীষ্টিয়ান হইলেই যে আমাদিগের সহিত সম্পর্কশূন্য হইবে, এ কথার প্রমাণ কই? প্রমাণ আছে। আমি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা রমাবাই প্রভৃতির কথা বলিতেছি না; কারণ শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে মতভেদ বা ধর্ম্মভেদে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যেখানেই খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেই যে রাজনৈতিক মহানিষ্ট সাধিত হইয়াছে, ইহা আমি বহু স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নানা কারণে

সকল কথা খুলিয়া লেখা গর্হিত; বিশেষতঃ যাঁহারা ইঙ্গিত মাত্রে এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না, আমি তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না।

উপমাকেই যুক্তি বলিয়া মনে করিয়া খ্রীষ্টিয়ানেরা বলিয়া থাকেন যে, পুরাতন বোতলে নূতন সুরা রাখিলে যখন বোতল ফাটিয়া যায়, তখন খ্রীষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার আয়োজন স্বরূপে প্রাচীন শরীরমনও পরিবর্ত্তন করাইবার প্রয়োজন। এই পরিবর্ত্তনের ফল এই হয় যে, দেশের প্রাচীনতা এবং গৌরবের প্রতি খ্রীষ্টিয়ানগণ হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন; এবং কাজেই স্বদেশীয় সকল জিনিষকেই ঘৃণা করিতে শিক্ষা করেন। খ্রীষ্টিয়ানদিগের আদর্শ সর্ব্বদাই ফিরিঙ্গিয়ানা; তবে পয়সায় যতদিন না কুলায়, ততদিন নরসিংহ কোন প্রকারে মেষ চর্ম্মাবৃত হইয়া বাস করেন, এই মাত্র। হুঁকার নলচে এবং খোল দুইই পরিবর্ত্তিত হয়, অথচ জোহন নামে প্রাচীন হলধর বাগদিকে আমাদিগকে চিনিয়া লইতে হয়। যাঁহারা কোন সাঁওতালদিগের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত, তাঁহারাই জানেন যে, এই সকল অসভ্যনামখ্যাত সরল সত্যনিষ্ঠ জাতিয়েরা মাদলের বাদ্যে অধীর হইয়া নৃত্যগীত করিয়া কি প্রকার পবিত্র আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু কোলদিগকে যেখানে খ্রীষ্টিয়ান করা হইয়াছে, সেখানেই তাহাদের খোল ও নলচের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, ইহারা ইহাদিগের একটি সঙ্গীতে গাইয়া থাকে, যে "ঐ শোন মাদল বাজাইয়া শয়তান আমাদিগকে ডাকিতেছে, আর অন্যদিকে ঘণ্টা (গির্জ্জায়) বাজাইয়া পরমেশ্বর আমাদিগকে ডাকিতেছেন।" সর্ব্বত্র যখন নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা এইরূপে স্বজাতীয় লোকের প্রতি হীনশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে, এবং দেশের গৌরবময় ঐতিহাসিকতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর বলিতে হইবে কি, যে দেশের কোন সৎকার্য্যে আমরা এই খ্রীষ্টিয়ানদিগের কোন সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারিব না?

নিম্নশ্রেণী আমাদের সমাজের স্তম্ভ-স্বরূপ; যদি সেই স্তম্ভ ক্ষীণবল বা অপসারিত হয়, তবে আর ভারত সমাজ কি প্রকারে রক্ষা পাইবে? এই আসন্ন বিপদের সময় কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? কোথায় পুনরুত্থানকারী দল, কোথায় তোমরা? অসার এবং মিথ্যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাদের যুক্তিযুক্ত মূর্খতা আর কত দেখাইবে? এ সময়ে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়িয়া ভারতের কৃষক জাতির উদ্ধার সংকল্পে কিছু করিতে পার কিনা,

তাহার চেষ্টা দেখিবে কি? কৃষক জাতি আমাদের হাতছাড়া হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। কোথায় ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহপূর্ণ শব্দপ্রিয় বক্তৃতাকারিগণ? লোকে বলে যে একদিন খ্রীষ্টিয়ানীর রাক্ষস করাল হইতে তোমরা শিক্ষিত দলকে উদ্ধার করিয়াছিলে। আজ কোথায় তোমরা? সহরে সহরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইবার পক্ষে সুবিধা ও সুখ বিলক্ষণ আছে; কিন্তু এই মহাদুর্দ্দিনে আপনার সুখ সুবিধা ভুলিয়া, কৃষকদিগের হৃদয় যাহাতে দেশের সহিত সংযুক্ত থাকে, তাহার জন্ত চেষ্টা করিবে কি? সমাজ-ভিত্তি ধসিয়া পড়িলে কলিকাতার 'কীর্ত্তিস্তম্ভ কোথায় থাকিবে? আর কোথায় তোমরা জমিদারগণ? তোমাদের আশ্রিত হইয়াও যাহারা তোমাদের আশ্রয়, তাহাদের উদ্ধার কামনায় তোমরা কি নিরস্ত থাকিবে? যে কার্য্য বিদেশীয়েরা করিবে বলিয়া অগ্রসর হইতেছে, এ কার্য্যে যদি আজি তোমরা অগ্রসর হও, তবে কাহার সাধ্য যে দেশের ধ্বংস সাধন করে? নিষ্ফল প্রার্থনা হইলেও তোমাদিগের নিকট যুক্তকরে নিবেদন করিতেছি, "হে বুথপ্রমুখ মুক্তিফৌজদল, তোমরা কৃষকদিগের প্রতি অনুগ্রহ কোরে, এই কোরো, অনুগ্রহ কোরো না তাহারে"।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পলাশ-বন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আমি বিবাহ করিতে সম্মত হইলে, জননীদেবীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আমারও হৃদয় প্রসন্ন হইল। দুই তিন দিন পরে পিতৃদেব কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলেন; আমরাও পলাশবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জননীদেবী পলাশবনে কিয়দ্দিন বাস করিবেন, এই সংবাদ শ্রবণে গ্রামের মহিলারা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। প্রায় প্রত্যহই প্রবীণা ও নবীনারা অবসর ক্রমে আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সেই সময়ে আমি সচরাচর বাটীর সংলগ্ন শালবনে প্রবেশ করিয়া একটী মনোরম স্থানে সুকোমল তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া পুস্তকপাঠে নিমগ্ন থাকিতাম। সেখানে অন্য কোনও জনপ্রাণী আসিত না; কেবল কেশব মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমায় দেখিয়া যাইত

মাত্র। সেই দিনের ঘটনা হইতে কেশব আমার গতিবিধির উপর বিশেষ-রূপে লক্ষ্য রাখিত এবং বনের মধ্যে একাকী শয়ন করিয়া থাকিতে আমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিত।

আমি পিতৃদেব ও জননীদেবীকে যে এক মাস কাল আমার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, তাহার কতিপয় বিশিষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আমি এতদিন বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা গম্ভীরভাবে চিন্তা করি নাই। সুতরাং বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য-পথ নির্ণয়ার্থ একটু সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমি মনে করিয়াছিলাম, যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহের কথা রাষ্ট্র হইলে, আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রত্যহ গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে যাইতে পারিব না এবং যোগমায়াও আমার সাক্ষাতে কদাচ বাহির হইবে না। এইরূপ ব্যাপার যে, আমার কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় কারণ এই যে, যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহ দিতে আমার জনকজননী মনস্থ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণমাত্র যোগমায়াকে ভাল করিয়া দেখিবার ও জানিবার ইচ্ছাটা আমার মনে স্বতঃই বলবতী হইয়া উঠিল। যোগমায়াকে যে ইতঃপূর্ব্বে দেখি নাই, তাহা নহে। কিন্তু কি জানি কেন সে দেখাটা আমার নিকট যেন "ভাল করি পেখন না ভেল" বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। বিবাহের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, এই "দেখা"র সুবিধা না ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা ছিল।

এইরূপ নানা কারণে, পিতামাতার নিকট আমি উক্ত প্রকার প্রস্তাব করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা আমার ঐ প্রস্তাবের কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমার দূরদর্শিতার ফল আমি সদ্য সদ্যই দেখিতে পাইলাম। জননী পলাশবনে আসিয়া দুই চারি বার গোস্বামী মহাশয়দের বাটী গিয়াছিলেন; গোস্বামী মহাশয়ের পত্নী পুত্রকন্যা সহ দুই চারিবার আমাদের বাটী আসিয়াছিলেন। তাহার পর সাংসারিক কার্য্যাদি নিবন্ধন মার কিম্বা গোস্বামী-পত্নীর প্রায়ই পরস্পরের গৃহে যাওয়া আসা ঘটিত না; কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রকন্যাদের তৎসম্বন্ধে সেরূপ কোনও বাধা বিঘ্ন ছিল না। তাই তাহারা প্রায় প্রত্যহই আহারাদির পর আমাদের বাটীতে আসিত। জননীদেবী তাহাদিগকে ত স্বভাবতঃই ভাল বাসিতেন; এক্ষণে সেই ভালবাসা নানা কারণে বর্দ্ধিত

হইয়া উঠিল। বালকবালিকারাও জননীদেবীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। তাহারা নিয়তই আমাদের বাটীতে যাতায়াত করিত। যদি কোনও দিন কোনও কারণে না আসিতে পারিত, জননীদেবী তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আনয়নের জন্য মঙ্গলাকে প্রেরণ করিতেন। আমি দ্বিপ্রহরের সময় গৃহে বড় একটা থাকিতাম না। আমি সচরাচর এই সময়ে বনমধ্যে সেই তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে শয়ন করিয়া ওয়ার্ডস্বয়ার্থের কবিতা পাঠ করিতাম।

একদিন গ্রামের মহিলারা চলিয়া গেলে, আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া পাঠাগারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমার পুস্তকগুলি কে অতিশয় সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। কেশব পুস্তকগুলি প্রত্যহ ঝাড়িয়া রাখিত বটে; কিন্তু সে তাহাদিগকে যথোপযুক্তরূপে বিন্যস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু আজ তাহাদিগকে সাজানো গোছানো দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম এবং কৌতূহলপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ মঙ্গলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মঙ্গলা আজ আমার বইগুলি কে এমন ক'রে সাজালে?"

মঙ্গলা একটু গম্ভীরভাবে বলিল, "যার কাজ দাদাঠাকুর, সেই সাজিয়েছে।"

আমি বলিলাম, "কই, কেশব ত একদিনও এমন ক'রে বই সাজিয়ে রাখ্‌তে পারে না? তবে কি তুই সাজিয়েচিস্?"

মঙ্গলা বলিল, "না দাদাঠাকুর, আমরা কি ওসব কাজ ক'র্‌তে পারি? ভাল করে ঘর ঝাঁট্‌ দিতে বল, আনাজ কুট্‌তে বল, বাসন মাজতে বল, কাপড় কাচ্‌তে বল, তা এমন ক'রে ক'রবো যে, কেউ চোখের মাথা খেয়ে একটুও খুঁৎ ধর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমরা মুখ্‌খু সুখ্‌খু লোক, আমরা কি তোমার বই গুছিয়ে রাখ্‌তে পারি? যে সংস্ক জানে, ভট্‌চায্যির মতন পড়্‌তে পারে, আর লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত, সে নইলে কি আর কেউ ওসব কাজ ক'র্‌তে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কে সাজালে? মা ত এ ঘরে আসেন নাই? সংস্ক কে জানে? ভট্‌চায্যি কে?"

মঙ্গলা বলিল, "তাইত মা তো পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গল্পেই মত্ত ছিলেন; ওঁর অপ্‌সর কোথায়? আর অপ্‌সর থাক্‌লেই কি উনি তোমার বই এমন করে সাজিয়ে রাখ্‌তে জানেন?"

আমি ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া বলিলাম, "তবে কি ভূতে বই সাজিয়া গেল?"

মঙ্গলা বড় ভূতের ভয় করিত!

ভূতের নামে সে শিহরিয়া উঠিল; তার পরেই বলিতে লাগিল, "আঃ আমার পোড়া কপাল। ভূতে সাজাবে কেন গো? তোমার কি ধারার কথা গো? ভূতেই এই সব কাজ করে না কি?"

আমি আরও একটু চড়িয়া বলিলাম, "তবে কে সাজালে রে, পোড়ার-মুখি, তাই খুলে বল্ না?"

মঙ্গলার মুখখানা মেঘের মত হইল। চক্ষু দুটি যেন ছল ছল করিতে লাগিল; সে বলিল, "দাদাঠাকুর, তুমি গাল দিচ্চ, দাও; আমি কিন্তু কিছু জানি টানি নে। আমি নিজের কাযেই ব্যস্ত; কে তোমার বই সাজালে, কে তোমার কি কল্লে, অত শত, খবর আমি রাখি নে; আর রাখ্‌বার আমার অপ্‌সরও নেই।" এই বলিয়া মঙ্গলা গমনোদ্যতা হইল।

আমি বলিলাম, "বেশ কথা, যাও। কিন্তু দেখো, এঘরে আর একলা এস না। ঐ যে জানালার কাছে চাঁপা গাছটি দেখ্‌চো,—যার ডাল এসে জানালার ভিতর উঁকি মার্‌চে,—ঐ গাছে একটা ব্রহ্মদৈত্যি আছে। সেই মাঝে মাঝে এসে আমার বইগুলি গুছিয়ে টুছিয়ে যায়। আজও ভর্ত্তি দুপুর বেলায় সে নিশ্চয়ই এসে থাক্‌বে। আমি বামুন কিনা; এই পৈতে দেখে কিছু বলে না। কিন্তু তুই সুদ্দুরের মেয়ে—খপরদার এ ঘরে একলা আসিস্ না; একলা দেখ্‌তে পেলেই তোর ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত চুষে খাবে। এইটী বুঝে শুঝে কাজকর্ম্ম করিস্।"

ব্রহ্মদৈত্যের কথা শুনিতে শুনিতে মঙ্গলা ভয়ে চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে কেশবের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। বৈকালের সময় সিঁড়ি প্রায় অন্ধকারময় হইয়াছিল। কেশব যে উপরে আসিতেছিল, তাহা মঙ্গলা দেখিতে পায় নাই। ভয়ে তাহার কিছু দেখিতে না পাইবারও কথা। যেমন মঙ্গলা কেশবের ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে, অমনি কেশব আহত হইয়া ক্রোধে তাহাকে এক চড় মারিয়াছে। মঙ্গলা তাহাকে সত্য সত্যই ব্রহ্মদৈত্য মনে করিয়া, "বাপ্ রে ম'লাম রে; বেহ্মদৈত্যিতে খেলে রে", এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে তিন চারিবার আছাড় খাইয়া নীচের বারাণ্ডায় গিয়া পড়িল। তাহার চীৎকার শুনিয়া জননী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'লো, মঙ্গলা? কি হ'লো, মঙ্গলা?"

আর-কি হ'লো মঙ্গলা! মঙ্গলা কি আপনাতে আপনি আছে যে, সে উত্তর দিবে? মঙ্গলা কেবল চীৎকার করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কান্দিতে কান্দিতে বলিল, "ও, মা গো—আমায় ব্রহ্মদৈত্যিতে ধ'রে ছিল গো—আমি এখনি ম'রে ছিলুম গো"—

জননী বলিলেন, "ব্রহ্মদৈত্যি কি লো? ব্রহ্মদৈত্যি কোথায় লো?"

"ও গো, সিঁড়িতে গো!"

মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সিঁড়িতে কি লো? এই যে কেশব উপরে যাচ্ছিল! তা'কেই তো আমি উপরে পাঠালুম! দেখ্, ছুঁড়ি, তুই চোখে দেখ্‌তে না পেয়ে বুঝি তাঁরই ঘাড়ে প'ড়েছিস্?"

মঙ্গলা ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিল, "ওমা, কেশব হ'বে কেন গো? ওমা, বেহ্মদৈত্যিটা যে কাল ঢেঙ্গা মুস্কো জোয়ানটার মতন গো! ওমা, আর একটু হ'লেই যে সে আমার ঘাড়টা মট্‌কে ফেলেছিল গো!"

মঙ্গলার কথা শেষ না হইতে হইতে কেশব নীচে গিয়া বলিল, "মা ঠাকুরা'ণ, সত্যি বটে, আর একটুকু হ'লেই আমি ইয়ার ঘাড়টা মচড়ে ফেল্‌ত্যম। আমার নাকের উপরে এমন জোরে মাথা ঠুকেছিল যে এখনও নাকটা ঝন্‌ঝনাচ্চে।"

মঙ্গলা তখন দাঁড়াইয়া বলিল, "হেঁ রে ছোঁড়া, তুই আস্‌ছিলি, তা আমায় ব'ল্‌তে নেই? আর তোর হাত কি শক্ত রে? হেঁ রে এমনি জোরেই চড় মার্‌তে হয়?—মা গো—আমি তোমায় গড় কর্‌চি গো—তুমি আমায় ছেড়ে দেও গো—আমি আর তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌ব না গো—বাপরে, আমায় একটা চাকরের হাতেও মার খেতে হ'লো? বগলা ঠাক্‌রোন আমায় এখানে আস্‌তে সত্যিই মানা ক'রে ছিল গো! দাদা ঠাকুরের কেশবা এক বেহ্মদৈত্যি; আবার তার সত্যিকার একটা বেহ্মদৈত্যি আছে গো। সে নাকি জানালার ধারে ঐ চাঁপাগাছে থাকে! মা গো, তোমরা বামুন গো, তোমাদের সে কখনও কিছু কর্‌বে না গো। আমি সুদ্দূরের মেয়ে, সে কোন্ দিন আমারই প্রাণটা বধে ফেল্‌বে গো। সে দাদাঠাকুরের সঙ্গে কথা কয় এবং তার বই সাজিয়ে দিয়ে যায়। আজ নাই যোগমালা ও আমি বই সাজিয়েছিলাম, কিন্তু সে যে নিত্যই বই সাজিয়ে দিয়ে যায় গো। যদি কেশ্‌বার হাতে বাঁচি, তা হ'লে তার হাতে যে রক্ষে নেই গো! হায়, হায়, মা গো—শেষকালে বেহ্মদৈত্যির হাতে আমার মরণ

ছিল ?" এই কথা বলিতে বলিতে মঙ্গলা দাসীর শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। সে পা ছড়াইয়া, সপ্তমে স্বর তুলিয়া, মৃত জননীকে উদ্দেশ করিয়া দস্তুরমত ক্রন্দন করিতে বসিল। সেই ক্রন্দনে গীতির অনেকগুলি করুণ পদ ছিল; কিন্তু তাহার প্রধান ধূয়ার অর্থ এই প্রকার:—"মঙ্গলা দাসীর অভাগিনী জননী তাহাকে কি বেহ্মদৈত্যির হাতে মারিবার জন্যই গর্ভে ধরিয়াছিল ?"

মঙ্গলা দাসীর অভাগিনী জননী আজ বাঁচিয়া থাকিলে অবশ্যই আদরিণী কন্যার এই প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক উত্তর দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিত। কিন্তু তদ্বিষয়ের কোনও সম্ভাবনা না থাকায়, অগত্যা আমার জননীদেবীই মঙ্গলাকে তাহার প্রশ্নের একটা সদুত্তর দিয়া ক্রন্দন সম্বরণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তাহাতে মঙ্গলা দাসীর কণ্ঠস্বর নিবৃত্ত না হইয়া অপ্রত্যাশিতরূপে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া জননীদেবী অবিচারিতচিত্তে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন।

মঙ্গলা বাষ্পজলে সমাচ্ছন্ন থাকায় এতক্ষণ চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া দেখিল, তাহার নিকটে কেহই নাই! মঙ্গলা তবে এতক্ষণ অরণ্যে রোদন করিতেছিল! ঠিক্ এই সময়ে কেশবচন্দ্র মঙ্গলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "ও মঙ্গলা, তুই অত কাঁদ্‌চুস্ কেনে ? বেহ্মদৈত্যি কুথায় যে, তোর ঘার মোচাড়বেক্ ? বেহ্মদৈত্যি থাক্‌লে আমাকে এত দিন রাখ্‌তোক্ না কি ? আমি যে কত দিন একলাই এই ঘরে শুয়েছিল্যম।"

কেশবকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া মঙ্গলা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল, "ওরে, ডাংপিটে, সর্ব্বনেশে ছোঁড়া তুই বকিস্‌নে, পালা আমার সাম্‌নের থেকে—ওরে ছোঁড়া বেহ্মদৈত্যি তোর আর কি কর্‌বে ? ম'লে তুইও যে বেহ্মদৈত্যি হবি রে ?"

কেশব বলিল, "আচ্ছা, এখন গাল দিচ্ছ্‌স্ দে; রেতের বেলায় দেখা যাবেক্। হে বেহ্মদৈত্যি ঠাকুর, তুমি সব শুনে রাখ্‌বে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মঙ্গলার বড় ভয় হইল। কেশব চলিয়া গেলে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া জননীর নিকট গমন করিল এবং অশ্রুচ্ছকণ্ঠে বলিতে লাগিল:—"মা, দাদাঠাকুরের পিস্‌গীর বিয়ে দিবে তো দাও, আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বো

না। দাদাঠাকুর বউ নিয়ে এখানে থাকুক। আমরা আমাদের বাড়ীতে যাই চল। বন জঙ্গলে আমাদের কাজ নেই; আমাদের সেই বাড়ীই ভাল। ওগো যেমনি দাদাঠাকুর, বউটিও তেমনি হ'বে দেখ্‌চি। বউ কত লেখাপড়া সংস্কৃ জানে, ভট্‌চায্যি ঠাকুরের মতন মন্‌তর পড়ে, আবার দাদাঠাকুরের মতন বনে বেড়া'তেও ভাল বাসে। সে আইবুড় মেয়ে, রোজ রোজ বনে ফুল তুল্‌তে যায়। হেঁগা, বলি, আইবুড় মেয়ের কি যখন তখন ফুলের গাছ ছুঁতে আছে? ফুলগাছে ঠাকুর দেবতা কত কি থাকে। কখন্ কি হবে, তার ঠিক্ কি? এদের কারুর সঙ্গেই আমার ব'ন্‌বে না বাছা। আবার চাকরটিও তেমনি হ'য়েচে। বাবা বাড়ী এলেই দাদাঠাকুরের শীগ্‌গার বিয়ে দিয়ে দাও। আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না। আমি গরীবের বাছা; কোন্ দিন ভূতের হাতে আমার পরাণটা যাবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মঙ্গলা চুপ করিল। বোধ হয়, ভূতের হাতে মরণের কথা ভাবিয়া তাহার চক্ষে আবার জল আসিয়াছিল।

জননী বলিলেন, "তুই ছুঁড়ি কেঁদে মরিস্ কেন? ভূত দেখা দূরে থাক্, ভূতের নাম শুনেই যে ম'লি! দেবুর সঙ্গে তুই লাগিস্, তাইতো দেবু তো'কে ভয় দেখায়?"

মঙ্গলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হেঁ, আমিই লাগি বুঝি? তুমি তো সব জান? আগে বিয়ের নামে জ্ব'লে যেত, এখন একশ বার যোগমালার কথা জিজ্ঞেস করা হ'চ্চে! আমি মেয়ে মানুষ, অত মার পেঁচ কি বুঝ্‌তে পারি? আর ওঁর মত বেহায়াপনাও আমি ক'র্‌তে পারি না।"

আমি দেখিলাম, তামাসা মন্দ নয়। ঈষৎ ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে ডাকিলাম, "মঙ্গলা।"

মঙ্গলার কণ্ঠস্বর একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই বৃহৎ বাটী খানিতে অনেকক্ষণ আর মানব-কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মঙ্গলার প্রকৃতিই এইরূপ। মঙ্গলা মিথ্যা কথার একটী বৃহদায়তন ঝুড়ি। মঙ্গলা যাহাকে বুঝিতে পারে না, তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহার পৃষ্ঠে বিষদন্ত বসাইয়া দেয়। মঙ্গলার দংশনে

প্রাণের কোন আশঙ্কা হয় না বটে, কিন্তু তাহার জ্বালা বড়ই তীব্র এবং সেই জ্বালা ক্ষণস্থায়িনী হইলেও যারপরনাই অসহ্য। আধ্যাত্মিক অর্থে, বগলা সুন্দরী ও মঙ্গলাদাসী উভয়েই সহোদরা; কেহ কেহ বলেন, যমজ-ভগিনী। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবও যথেষ্ট ছিল। এই কারণে সকলেই ইহা-দিগকে ভয় করিত; আমিও করিতাম।

মঙ্গলা যতক্ষণ প্রসন্ন থাকে, ততক্ষণ সে মঙ্গলময়ী। কোনও কারণে অপ্রসন্না হইলে, সে মূর্ত্তিমতী চণ্ডী। যাহার উপর মঙ্গলার ক্রোধ হয়, সুযোগ পাইলে মঙ্গলা তাহাকে নিজ হলাহল দ্বারা জর্জ্জরিত করিবেই করিবে। কিন্তু ক্রোধের নিবৃত্তি হইয়া গেলে, মঙ্গলা নিজের উপর উৎপীড়ন, আক্রোশ ও প্রতিহিংসার আশঙ্কা করিতে থাকে। এই কারণে সে যতক্ষণ অপকৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে আর কিছুতেই শান্তি থাকে না। তোষামোদ, ক্রন্দন, অম্লান অপরাধ স্বীকার যেরূপেই হউক, সে অপকৃত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট না করিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইবে না। মঙ্গলার প্রধান ভয়, পাছে কেহ শত্রুতাচরণ করিয়া তাহাকে কোনও ভৌতিক ব্যাপারে ফেলিয়া দেয়! মঙ্গলা মৃত্যু অপেক্ষাও ভূতকে অধিকতর ভয় করিত! এই ভূতভীতিই মঙ্গলাকে মানবীর পদে অবিচ্যুত রখিয়াছিল। নতুবা সে যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা হউক, অপকৃত ব্যক্তিকে কোনও রূপে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই মঙ্গলার আনন্দের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মঙ্গলা অপর এক ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া বসিত। এইরূপে প্রায় দেশশুদ্ধ লোকেরই সহিত মঙ্গলার বিবাদ হইত, আবার দুই দিন পরে অক্লেশে সেই বিবাদ মিটিয়াও যাইত। বিবাদ মিটিয়া যাইত বটে, কিন্তু কেহই তাহাকে দুইটী চক্ষে দেখিতে পারিত না।

আমাদের গৃহেও মঙ্গলা প্রচুর অশান্তি আনয়ন করিত। মঙ্গলা জনক-জননীহীন এবং অল্প বয়সে বিধবা হইয়া অনাথা হইলে, জননীদেবী তাহাকে আমাদের গৃহে আশ্রয় দেন। সেই অবধি সে আমাদের গৃহে, যেন আমাদের কোনও আত্মীয়ার ন্যায়, বাস করিতেছে। আমরা কেহই তাহাকে একটী দিনও দাসী বলিয়া ভাবি নাই। জননীদেবী তাহাকে মাতৃস্নেহে পালন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সমস্ত "জ্বালা"ই অম্লান-বদনে সহ্য করিতেন। আমরাও তাহাকে আমাদের ভগিনীর তুল্য মনে

করিতাম। আমি যখন বালক ছিলাম, তখন মঙ্গলা আমাকে মধ্যে মধ্যে কঠোর ভাবে তাড়না করিত। আমিও সেই কারণে তখন তাহাকে বড় ভয় করিতাম। এখন আমি বড় হইয়াছি; বড় হইয়া আমি নিজের ইচ্ছামত কার্য্যাদি করিতেছি। কার্য্যগুলি আমার মনোমত হইলেও মঙ্গলা অনেক-গুলির অনুমোদন করিত না। সেই কারণে, সে আমার উপর মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্টা থাকিত। অসন্তুষ্টা থাকিত বটে, কিন্তু আমার সাক্ষাতে সে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিত না। তবে আমার উপর কোনও দিন রুষ্টা হইলে, সে অসাক্ষাতে আমার যথেষ্ট নিন্দা করিত। অদ্যও তাই আমার উপর অপ্রসন্না হইয়া, সে জননীর সমক্ষে একটু বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া ফেলিল। আমি কিন্তু তাহাকে বিষোদ্গীরণ করিতে দেখিলাম; এবং আমি যে তাহা দেখিয়াছি, ইহা তাহাকে জানাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। মঙ্গলা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইল। আড়ষ্ট হইবার একটী প্রধান কারণ ছিল—তাহা ব্রহ্মদৈত্যের সহিত আমার তথাকথিত সখ্য বা সাহচর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সে দিন মঙ্গলার মনে ঝড় বহিতে লাগিল। মঙ্গলা আমার নিকট অপ-রাধিনী ছিল; সুতরাং সে দিন সে আমার আর সম্মুখীন হইতে পারিল না। আমি কিন্তু বাস্তবিক তাহার উপর রাগ করি নাই। এইরূপ একটী না একটী ঘটনা প্রায় নিত্যই উপস্থিত হইত। এমত স্থলে কতই আর রাগ করা যাইবে? মঙ্গলার ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি একটী কথা কহিলেই সে যেন কৃতার্থ হইয়া যায়। সুতরাং পরদিন প্রাতঃকালে মঙ্গলা যখন গৃহমার্জ্জন করিতে আমার পাঠগৃহে উপস্থিত হইল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "কি মঙ্গলা, কাল বড্ড লেগেছিল না কি?"

মঙ্গলা বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিল, "লাগে নি আবার দাদাঠাকুর? কেশ্‌বা ছোঁড়া এমন জোরে চড় মেরে ছিল যে, আমার গালে পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ ব'সে গেছল। আর কাল এমন মাথাও ধ'রেছিল যে আমি সারারাত্রির মধ্যে একটীবারও মাথা তুল্‌তে পারি নি। আর প'ড়ে গিয়ে আমার হাঁটু টাটুও ছ'ড়ে গেছে। আজ পায়ে ভারি বেদনা হ'য়েচে।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু হইতে দুই চারি বিন্দু অশ্রু পড়িল।

আমার সহানুভূতির উদ্রেক করাই মঙ্গলার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহার অবস্থা দেখিয়াও আমি বড় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম।

আমার মনে হইল, মঙ্গলাকে ভূতের ভয় দেখাইয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। গত কল্যই আমার মনে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক মঙ্গলার অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমি বলিলাম, "মঙ্গলা, আমি বড় লজ্জিত হ'য়েচি। তুমি যে প'ড়ে গিয়ে এত কষ্ট পাবে, তা আমি ভাবি নাই। যা' হোক তুমি কিছু মনে ক'রো না। আর কেশব ছোক্‌রাও বড় গোঁয়ার দেখ্‌চি। লাগ্‌লোই বা তার নাকে। তা ব'লে কি মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুল্‌তে হয়? তুমি কিছু মনে ক'রো না. মঙ্গলা। আমি তাকে সাবধান ক'রে দেবো।"

এই সহানুভূতি বাক্যে মঙ্গলার অশ্রুপাত আরও প্রবল হইয়া উঠিল। নীরবে মঙ্গলা অনেকক্ষণ কাঁদিল, তার পর ঈষৎ সংযত হইয়া বলিল, "দাদা-ঠাকুর, অভাগিনীর উপর কি তোমাকে রাগ কর্‌তে হয়? আমি রাগের মাথায় কখন কি বলে ফেলি, তার ঠিক থাকে না। তুমি আমার উপর রাগ টাগ ক'রো না। আমার গদাই ভাইয়ের চেয়েও তুমি আপনার। তোমরা আছ ব'লে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তা নইলে অকূলপাথারে আজ কোন্ দিক ভেসে যেতাম। যে ক'দিন বেঁচে থাকি, তোমরা আমায় পায়ে ঠেলো না।"

আমি বলিলাম, "মঙ্গলা, তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন? আমরা কি কখন তো'কে কিছু বলি? কাল তুই মা'কে কত মিথ্যে কথা বল্‌লি। ভাব্‌লুম, রাগের মাথায় যা বল্‌চে বলুক গে। তোর কথায় আমি আদবে রাগ করি নাই।"

মঙ্গলা অম্লানবদনে বলিল, "আমি কাল কি বলেছি, দাদা, তা আমার মনে নেই। তুমি কিছু মনে টনে ক'রো না। আমার পোড়া কপাল, তাই আমি তোমার সঙ্গে হাসি তামাসা কর্‌তে গেছ্‌লুম। যোগমায়া আর আমি কাল তোমার বই সাজিয়েছিলুম্। সে সব কথা তোমাকে পরে বল্‌ব মনে ক'রেছিলুম। কিন্তু তুমি বেহ্মদৈত্যি ঠাকুরের যে ভয় দেখালে!—হেঁ দাদা ঠাকুর, সত্যি এই চাঁপা গাছে ঠাকুর আছে?"

প্রশ্ন করিতে করিতেই মঙ্গলার গায়ে কাঁটা দিল এবং সে করজোড়ে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "দূর্ পাগ্‌লি, বেহ্মদৈত্যি আবার কোথায়? ও সব ঠাকুর টাকুর মিছে কথা; আমি তোকে ভয় দেখাচ্ছিলুম।"

মঙ্গলা আমার কথায় যেন অবিশ্বাস, করিয়া বলিল, "না দাদাঠাকুর, তুমি আমায় ভোলাচ্চ।"

আমি বলিলাম, "আমি তোকে সত্যি বল্‌চি, চাঁপাগাছে ব্রহ্মদৈত্যি নাই। ভয় কর্‌লেই ভয় হয়। আমি তোকে একটী কথা বলে দিচ্ছি, সেইটী মনে রাখিস্। তোর যখনই ভয় হ'বে, তখনই তুই ভগবান্‌কে মনে কর্‌বি। তা হ'লে আর তোর ভয় হ'বে না।"

মঙ্গলা বলিল, "আচ্ছা, রাম নাম কর্‌লেও তো ভূতের ভয় হয় না?"

আমি বলিলাম, "সে একই কথা। রাম নামই কর্‌বি।"

মঙ্গলা যেন কিছু আনন্দিত হইয়া বলিল, "দাদাঠাকুর, তুমি যে আমায় স্নেহ কর ও আমার মঙ্গল ভাব, তাকি আমি জানি না? যোগমায়ার কথা আমি যা যা জেনেছি, তোমায় এক সময় সব ব'লব। ঐ শোন, মা কি জন্যে ডাক্‌চে, একবার শুনে আসি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যা"। ভূতের ভয় তিরোহিত হইল, আমিও প্রসন্ন হইলাম। মঙ্গলার আর আনন্দ দেখে কে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যোগমায়া সম্বন্ধে মঙ্গলা কি জানিয়াছে, তাহা অবগত হইবার জন্য আমার একটু ঔৎসুক্য জন্মিল। জননীর মুখে শুনিলাম, যোগমায়ারা তিন চারি দিন আমাদের বাড়ী আসে নাই। মঙ্গলা তাহাদিগকে ডাকিতে গেলেও যোগমায়া আমাদের বাড়ী আর আসিতে চায় না! কথা শুনিয়া একটু বিস্মিতও হইলাম। ব্যাপার কি, তাহা অবগত হইবার জন্য একদিন মঙ্গলাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মঙ্গলা, যোগমায়া আর আমাদের বাড়ী আসে না কেন? তুই আজ তা'দের ডাক্‌তে গেছ্‌লি?"

মঙ্গলা বলিল, "এই তো আমি ওদের বাড়ী থেকে আস্‌চি দাদা। যোগমায়া কোন মতেই আস্‌তে চায় না।"

"কেন?"

"তা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? ওর মা ওকে আমার সঙ্গে আস্‌তে কতবার বল্লে। কিন্তু সে না এলে আমি কি ক'র্‌বো?"

"তবে তুই কিছু ব'লেছিস্ না কি?"

আর মঙ্গলা যায় কোথায়? এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র অকপট-হৃদয়া মঙ্গলা দাসী কাঁদিয়া দেশ গোল করিবার উদ্যোগ করিল। মঙ্গলা

এই তিন চারি দিনের মধ্যে ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুরের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মঙ্গলার ভাবগতিক দেখিয়া আমার মনোমধ্যে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। হয়ত সে যোগমায়াকে আমার বিবাহ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিয়াছে, তাই সে আমাদের বাড়ীতে আর আসিতে চায় না। আর এই কারণেই হয়ত আজ ক'এক দিন তাহাকে গোস্বামী মহাশয়ের ভাগবত পাঠের সময়ও দেখিতে পাইতেছি না! সন্দেহটা উপস্থিত হইবামাত্র মনের ভাব গোপন করিয়া মঙ্গলাকে বলিলাম, "তুই মিছেমিছি চেঁচিয়ে দেশ গোল ক'চ্ছিস্ কেন, মঙ্গলা? ভাল চাস্ তো চুপ্ কর্।"

মঙ্গলা কিন্তু নীরব হইল না। সে অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তোমার ও কি কথা, দাদাঠাকুর? আমি কি সে কথা বল্‌তে পারি?"

আমি বলিলাম, "কি কথা?"

মঙ্গলা আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। বলিল, "এই যে, সেই কথা—যে কথা তুমি ব'ল্‌তে মানা ক'রেছ—আমি কি সে কথা কখন পেকাশ ক'র্‌তে পারি, দাদাঠাকুর? এই সেদিন তুমি আমাকে তোমার বই সাজানো নিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লে। কই, আমি তোমাকে কিছু ব'লে-ছিলুম?"

শ্রীমতী মঙ্গলা দাসী তাহার বাক্য গোপন করিবার শক্তিটি যে আমার উপরেই প্রয়োগ করিবেন, তাহা আমি প্রথমে তত ভাবি নাই। যাহা হউক মঙ্গলার উত্তরটা আমার নিকট ঠাকুর গৃহে কদলী-ভক্ষণ-সম্বন্ধীয় অস্বীকারের ন্যায় বোধ হইল। সন্দেহ ক্রমেই বিশ্বাসে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। মঙ্গলাই যে সেদিন যোগমায়াকে আমার বিবাহের কথা বলিয়া দিয়াছে ও সেই কারণেই যে যোগমায়া আমাদের বাড়ী আর আসিতে চাহিতেছে না, ইহাই আমার নিকট খুব সম্ভবপর বোধ হইল। আমি কথাটি রাষ্ট্র করিতে তাহাকে ও জননীদেবীকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম। মঙ্গলা এই কথা প্রকাশ করিয়া আমার নিকট অপরাধিনী হইয়াছে; সুতরাং সে যে সহজে সত্য কথা বলিবে বা অপরাধ স্বীকার করিবে, তাহা বোধ হইল না। অগত্যা আমিও চতুরতা অবলম্বন করিয়া কৌশলক্রমে তাহার নিকট হইতে সত্য কথা বাহির করিয়া লইতে তৎপর হইলাম।

আমি বলিলাম, "যোগমায়ার বই সাজানোর কথা তুই আমাকে সেদিন বলিস্ নাই, তা সত্যি বটে। কিন্তু যোগমায়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বার কথাটা তুই তা'কে ব'লে থাক্‌লেও থাক্‌তে পারিস্। আর বলাই সম্ভব। যখন আর দু'দিন পরেই তার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে যাচ্চে, তখন বলায় আর দোষ কি?" এই বলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুই যোগমায়াকে কি ব'লেছিলি, আর যোগমায়াই বা কি ব'ল্লে?"

আমি যদি গাছের তলে তলে ভ্রমণ করি, মঙ্গলা গাছের আগায় আগায় ফিরিতে থাকে। আমার প্রশ্ন শুনিয়াই মঙ্গলা সাক্ষাৎ সরলতা ও নির্দ্দোষিতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিস্ময়সূচক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওমা, তোমার কি ধারার কথা গো! ওমা, আমি কোথায় যাব গো! এ সব মিছে কথা তোমায় কে লাগাচ্চে গো! বুঝেছি, পোড়ার মুখো কেশবাই আমার উপর বাদ্ সাধ্‌চে!"

আমি দেখিলাম, এ ভাবে চলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই তাহাকে বলিলাম, "কেশবকে তুই অকারণ গাল দিচ্চিস্ কেন? সে আমায় কিছুই বলে নাই। আর ও কথা নিয়ে তোকে অত ব্যাকুল হ'তে হবে কেন? তুই কিছু বলিস্ নাই তো বলিস্ নাই। আর যদি ব'লেই থাকিস্, তাতেই বা কি হ'বে? যাক্—যোগমায়া আমার পড়্‌বার ঘরে ব'সে সেদিন সংস্কৃত পড়্‌ছিল না?"

"সংস্ক মংস্ক অত কে জানে, দাদা। যোগমায়া তোমার সেই বড় বইখানা টেনে পাতা গুলো উল্টে পাল্টে পড়্‌ছিল।"

"ভট্‌চার্য্যি ঠাকুর যে রকম পুঁথি পড়ে, সেই রকম ক'রে পড়্‌ছিল, বল্‌ছিলি না?"

"হাঁ, তা বই কি? আমার তো ভারি হাসি পাচ্ছিল।"

"তার পর? যোগমায়া কিছু বল্লে?"

"বল্লে বই কি। যোগমায়া বই গুলোর দুরবস্থা দেখে, কেশ্‌বার নিন্দে ক'র্‌ছিলো। আমি বল্লুম, না হয় তুমিই বোন্ সাজিয়ে দাও। আমি নিজে বই সাজাতে জান্‌লে কি এমন হ'য়ে থাকে? আমার কথা শুনে যোগমায়া বইগুলি গুছিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌লো, আর আমি ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগ্‌লুম। যোগমায়ার স্বভাবই ঐ রকম; কোথাও একটু অপরিষ্কার বা ময়লা দেখ্‌তে পারে না। যোগমায়া যখনই আমাদের বাড়ী আসে, তখনই মার বাসনপত্র

সাজিয়ে দিয়ে যায়; আঁল্‌নায় একখানি কাপড় বেমানান হ'য়ে থাক্‌লে তখনি সেটি ঠিক্‌ ক'রে দেয়। মা তো যোগমায়াকে দেখে আনন্দে আটখানা হন। মা বলেন, যোগমায়া আমার যেন কত আপনার। যোগমায়া বৌ হবে, এই কথা মনে হ'লে মার তো আর আনন্দ ধরে না।"

"আচ্ছা, তা নাই হ'লো। তার পর যোগমায়াকে তুই কি ব'লেছিলি?"

মঙ্গলা ঝটিতি আত্মরক্ষায় তৎপর হইল। সে বলিল "ওমা আমি আবার কি বল্‌বো গো? তোমার ঐ এক কি ধারার কথা গো?" আমি দেখিলাম, মঙ্গলাকে সহজে আঁটিয়া উঠিতে পারিবার যো নাই। তাই ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা মঙ্গলা, ভেবে দেখ্‌, আর দুদিন পরেই তো যোগমায়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে যাবে। তখন তো আর কোন কথা ছাপা থাক্‌বে না? সবই জান্‌তে পার্‌বো। তবে আর লুকোচুরিতে কাজ কি? ভাল মানুষের মতন সব কথা ব'লে যা।"

মঙ্গলা আমার কথা শুনিয়া যেন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। তার পর সে বলিল, "দাদাঠাকুর, তবে বলি শুন; রাগ ক'রো না। আজ কাল্‌কের মেয়েগুলো বড় সেয়ানা; মুখ ফুটে কিছু বলে না, তাই। তা নইলে মনের ভাব আর বুঝ্‌তে পারা যায় না?"

আমি বলিলাম, "তুই যোগমায়ার মনের ভাব কি বুঝেছিস্‌, বল্‌।"

"কিছু হো'ক্‌ বুঝেছি।"

"কি বুঝেছিস্‌, তাই খুলে বল্‌ না।"

"আচ্ছা, দাদাঠাকুর, সুশীলা তোমার কথা উঠ্‌লে 'দেবেন বাবু, দেবেন বাবু' বলে। কিন্তু যোগমায়া কেন একটী দিনও তোমার নাম করে না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "নাম করে না তো তা'তে কি হ'লো? যোগমায়া আমার নাম ক'র্‌বার কোনও দরকার দেখে না, তাই সে নাম করে না। মিছেমিছি একটা ভদ্রলোকের নাম করার ফল? সুশীলা ছেলে মানুষ, যার তার কাছে, তার ছোট বড় সকল লোকেরই নাম ধ'রে কথা কয়। কিন্তু যোগমায়ার বুদ্ধিশুদ্ধি হ'য়েচে, সে তা কর্‌তে যাবে কেন?"

"আচ্ছা, দাদাঠাকুর, তা নাই হ'লো। কিন্তু এই কথাটা ধর দেখি। যোগমায়ার সই ঘোষালদের ভাবিনী শশুর বাড়ী থেকে এসেচে। ভাবিনী তোমার এই বাড়ী তৈয়ের হ'তে দেখে যায় নি; তাই সে এ বাড়ীতে এসে যোগমায়ার সঙ্গে সব ঘর দেখে বেড়াচ্ছিল। তুমি ওপরে আছ মনে ক'রে

যোগমায়া ছম্‌ছম্‌ ক'র্‌ছিল। ভাবিনী অনেকবার বলাতেও যোগমায়া ওপরে উঠ্‌তে চায় নি। তাই দেখে আমি ব'ল্লুম, 'এস না, ওপরে যাই, কেউ নেই। দাদাঠাকুর এখন ঐ বনের মধ্যে আছে। এখন আর বাড়ীতে আস্‌বে না।' আমার কথা শুনে যোগমায়া আর ভাবিনী ওপরে উঠ্‌লো। আমরা তিন জনেই ওপরের সব ঘর দেখে বেড়াতে লাগ্‌লুম। তোমার পড়্‌বার ঘরে এসে যোগমায়া তোমার বইগুলো দেখে কেশ্‌বার নিন্দে ক'র্‌তে লাগ্‌লো। সে কথা তো তোমায় ব'লেছি। যোগমায়া আর আমি বই সাজাচ্ছিলুম, এমন সময় ভাবিনী চাঁপাগাছের ধারে সেই জানালাটা খুলে মুখ বাড়িয়ে বন দেখ্‌তে লাগলো। সে বন দেখেই আমাকে বল্লে, 'হেঁ গা, তোমার দাদাঠাকুর কি এই বনের মধ্যেই আছে?' আমি বল্লুম 'হাঁ'। তুমি বনের মধ্যে কি কর, ভাবিনী তাই আমায় জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে; আমি বল্লুম 'পড়ে শুয়ে থাকে, কত কি ভাবে।' তাই না শুনে ভাবিনী বল্লে, 'হেঁ গা, তোমার দাদাঠাকুরকে তোমরা বনের মধ্যে গাছতলায় একলা শুয়ে থাক্‌তে দাও কেন? কোন্‌ দিন যে বিপদ হ'বে।' কথা শুনেই আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম, বল্লুম 'সে কি কথা গো; বিপদ কেন হ'তে যাবে?' ভাবিনী বল্লে, 'বিপদ না হ'লেই তো ভাল। আমরা কি আর বিপদ হোক্‌ বল্‌চি। কিন্তু কেশবকে জিজ্ঞেস্‌ করগে দেখি, ভাগ্যে সে দিন আমার সই ছিল, তাই রক্ষে হ'য়েচে।' আমি বল্লুম,'বল কি গো! কই কেশ্‌বা ছোঁড়া তো আমাদের কিছুই বলে নি। কি হ'য়েছিল, তোমরাই বল না, শুনি।' ভাবিনী সব কথা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু যোগমায়া তা'কে চোখ্‌ টিপে দিলে, তাই সে আর কিছু ব'ল্লে না। দেখে শুনে আমার বড্ড রাগ হ'লো। আমি যোগমায়াকে বল্লুম, 'অত চোখ্‌ টেপাটেপিতে কাজ কি ভাই? আর দু'দিন পরেই তো তুমি আমার দাদাঠাকুরের রক্ষক হ'বে, তা আর অত লুকোচুরিতে ফল কি?' কথাটা ব'লে ফেলেই দাদাঠাকুর আমি মুখ সাম্‌লে নিলুম। কিন্তু ভাবিনী বড় চতুর; সে আমায় সব কথা খুলে ব'ল্‌তে বল্লে। আমি কিন্তু কিছু ভাঙ্গ্‌লুম না। তোমার সেই কথাটা মনে প'ড়ে গেল।"

আমি বলিলাম, "ভাঙ্গ্‌তে তো বড় বাকী রেখেছিস্‌! আচ্ছা, যা ক'রেচিস্‌, ক'রেচিস্‌। এখন যোগমায়ার মারও কাছে তুই কিছু শুনেচিস নাকি?"

"যোগমায়ার মাও, দাদা, এই কথা জেনেচে। কিন্তু তাকে যে কে বল্লে তা আমি জানি না। কথা কতক্ষণ ছাপা থাকে বল? কথা পাঁচকাণ হ'লেই ঢাকের বাদ্যির মতন বেরিয়ে পড়ে। আহা, মাগী কিন্তু বড় ভাল মানুষ। আমি গেলেই আমাকে জিজ্ঞেস্ করে। 'হ্যাঁমা সত্যি তোমাদের কর্ত্তা গিন্নি মত করেচে? আমার কি এমন ভাগ্যি হবে মা? যোগমায়ার ভাগ্যে কি এমন বর ঘটবে মা? এমন তপস্যা কি ও ক'রেচে"—

মঙ্গলাকে বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "থাক্, থাক্, ঢের করেচে। ঢের হয়েচে। তোকে আর কিছু বল্‌তে হবে না। তুই বাড়ীর ভেতর গিয়ে কাজকর্ম্ম দেখ্‌গে যা।"

মঙ্গলা বাড়ীর ভিতর গেল। আমিও কিয়ৎক্ষণ পরে আমার পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া সুসজ্জিত পুস্তকগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ বাল্মীকি-রামায়ণের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। মঙ্গলার কথা সত্য হইলে এই পুস্তকখানিই যোগমায়া পাঠ করিয়াছিল। যোগমায়া তবে সংস্কৃত পড়িতে জানে! যোগমায়া তবে এই পবিত্র দেবভাষা বুঝিতে পারে! চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতেছে ও বাল্মীকি বুঝিতে পারিতেছে, ইহা আমার নিকট বড়ই বিস্ময়কর বোধ হইল। মঙ্গলার কথায় সহজে প্রত্যয় হইল না। সন্দেহ নিরাকরণার্থ তাহাকে একবার উপরের ঘরে আসিতে বলিলাম। সে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহাকে বলিলাম, "যোগমায়া কোন্ বইখানি পড়্‌ছিল, মঙ্গলা?"

মঙ্গলা বলিল, "দাদাঠাকুর, আমি কি সে বই খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌বো? তোমার সেই ডাগর বইখানা। এই টে!" এই বলিয়া মঙ্গলা বৃদ্ধ বাল্মীকিকেই টানিয়া বাহির করিল।

আমার আর কোনই সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আমি মঙ্গলাকে মনে ও মুখে বিস্তর গালি দিতে লাগিলাম। আমি তাহাকে তিরস্কারমিশ্রিত আবদারের স্বরে বলিলাম, "মুড়্‌লি, পোড়ারমুখি, তুই যদি এখন সব কথা না ভাঙ্গতিস্, তা হলে হয় ত কোনও দিন আমার ভাগ্যে যোগমায়ার সংস্ক পড়া শোনা ঘট্‌তো। কিন্তু তোর পেটে আর কথা থাক্‌ল না। থাক্‌বেই বা কেমন করে? যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ যে তা হলে মিথ্যে হয়ে যায়।"

আমার তিরস্কারবাক্যে মঙ্গলা যেন কিছু কুণ্ঠিত হইল। সে বলিল, "দাদাঠাকুর, আমার যা দোষ হ'য়েচে তা তো তোমায় ব'লেচি। আমার

আর বক্‌লে কি হবে ? আচ্ছা, তোমায় যদি একদিন যোগমায়ার সঙ্গে পড়া শুনিয়ে দিই, তা হ'লে ত হবে ?”

আমি বলিলাম, “কেমন করে শোনাবি ?”

“যেমন করেই হোক্‌।”

আমি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলাম, “না, আর আমি শুন্‌তে চাই না ; যোগমায়ার সঙ্গে তুই যে কোন চাতুরী খেলবি, তা আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। যোগমায়া সরলা ; তার সঙ্গে প্রতারণা কর্‌লে, তোকেও প্রতারিত হ'তে হবে।”

আমার কথা শুনিয়া মঙ্গলা দাসী গৃহান্তরে গমন করিল। যাইবার সময় সে নিজ অঞ্চলে ঈষৎ মুখাবরণ করিল। বোধ হইল, আমার ভাব গতিক দেখিয়া তাহার হাসি পাইতেছিল।

৺ হরিনাথ মজুমদার।

(কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকির)

একজন চিন্তাশীল কবি মানবজীবনকে জল-বুদ্‌বুদের সমান বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলে সত্য সত্যই ইহা জল-বুদ্‌বুদ ভিন্ন আর কি ? তেমনি ক্ষণস্থায়ী, হয় ত বা তেমনিই অসার, কিন্তু সেই অচিরস্থায়ী বুদ্‌বুদোপম মানবজীবনে কখন কখন এমন একটি বিশাল শক্তি, উজ্জ্বল আলো, জ্ঞান-ভক্তি-মহত্বের এমন একটি হিল্লোল ফুটিয়া উঠে যে, সকলে চলিতে চলিতে বিস্ময়মগ্ন দৃষ্টিতে সেই সকল দেবপুরুষের দিকে চাহিয়া দেখে, তাঁহাদের চরণতলে বসিয়া আপনাদিগের রৌদ্রতপ্ত মরুময় জীবন শীতল করে, এবং যখন তাঁহারা নিয়তিক্রমে মাটির দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য-ধামে প্রস্থান করেন, তখনও তাঁহাদের গুণ ভুলিতে পারে না ; তাই কবি উচ্চকণ্ঠে তাঁহাদের বিজয়গীতি গান করেন, কর্ম্মযোগী তাঁহাদের অমর নাম স্মরণপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন, এবং তাঁহাদের পবিত্রস্মৃতি বহুদিন ধরিয়া অপরিণামদর্শী, অপূর্ণ মানবকে জীবনের অম্লান সার্থকতার কনক-মন্দিরের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। আমরা আজ এই প্রকার একজন স্বদেশহিতৈষী, পরোপকারে-উৎসর্গীকৃত-জীবন, পরস্বার্থপরায়ণ প্রেমিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী “দাসী”র পাঠকবর্গের নিকট কীর্ত্তন করিব। তিনি আজ-

নাকে অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র কাঙ্গাল বলিয়া জানিতেন, অনেকে তাঁহাকে সামান্ত বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু ভস্মের অন্তরালে যে জীবনী-বহ্নি নিহিত ছিল, যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহারাই জানিত, অত্যাচার এবং পাপ সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কিরূপে ভস্ম হইয়া যাইত।

নদীয়া জেলায় কুমারখালী একখানি সম্পন্ন ভদ্রপল্লী। আজ কাল গোয়াড়ী, কুষ্টিয়া, রাণাঘাট প্রভৃতি নগর নদীয়া জেলার প্রধান স্থান বলিয়া সাধারণ্যে প্রথিত, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন এই সকল স্থানের নাম কেহ জানিত না, তখন রাণাঘাট 'রাণা' নামক দস্যুসম্প্রদায়ের 'ঘাটি' বা আড্ডা ছিল, কৃষ্ণনগরের উত্তর অংশ খড়িয়ার তীরবর্ত্তী গোয়াড়ী বিশাল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল,—সুপ্রসিদ্ধ দস্যুপতি 'বিশ্বনাথ' বাবু ও তাহার অনুচর বৈদ্যনাথ প্রভৃতির ভয়ে এ দিকে লোক যাতায়াত করিত না, দুই একজন সামান্ত লোক, যাহারা কুটীর বাঁধিয়া বাস করিত, তাহারা বড় একা দস্যুভয় করিত না, কারণ দস্যুতে তাহাদের কি লইবে? কিন্তু বাঘ ভালুকের ভয়ে তাহারা একপ্রহর বেলা থাকিতে গৃহদ্বার বন্ধ করিত,—কুষ্টিয়াতে আজ আড়াই দিন রেল হইয়াছে, রেল হওয়ার পর এখানে আদালত স্থাপিত হইল, স্কুল হইল, স্বাস্থ্যকর স্থান, তাহার উপর নদী-তীরবর্ত্তী বলিয়া ব্যবসা বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা, নানাদিক হইতে নানা শ্রেণীর লোক দলে দলে আসিয়া এখানে বাস করিতে লাগিল; কুষ্টিয়া একটা বড় কারখানার মত, জলে স্থলে চারিদিকেই মহা ধুমধাম চলিতেছে—হাটবাজার, দোকান-পাট, সর্ব্বত্র লোকের ভীড়, নদীতীরে অসংখ্য নৌকা; সকল সময়ই হট্ট-গোল লাগিয়া আছে; কিন্তু বুনিয়াদি অধিবাসী এখানে একটীও নাই, রেল স্থাপনের পূর্ব্বে একটিও ছিল না, কেবল মহাদুর্দ্দান্ত কুঠিয়াল কেরি সাহেব তাহার প্রকাণ্ড কুঠি এবং অসংখ্য লাঠিয়াল লইয়া এই জনবিরল স্থানের দরিদ্র অধিবাসিগণের উপর সভ্যতাসঙ্গত ডাকাইতি করিত। মেঘের মত ঘন সন্নিবদ্ধ নীলবন শত শত বিঘা জমীর উপর বায়ুভরে দুলিত, আর দূর-বিস্তৃত নদীর বাতাহত বক্ষ হইতে দিবারাত্রি অস্ফুট কল্লোল ফুটিয়া উঠিত।

এই সময়ে নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল; কৃষ্ণনগরই নদীয়া জেলার রাজধানী। ধরিতে গেলে, কৃষ্ণনগর তখন লক্ষ্মীর কুঞ্জবন, আর নবদ্বীপ সরস্বতীর কমলকানন আখ্যা লাভের উপযুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব, জ্ঞান এবং ভক্তিতে তখন নবদ্বীপ ভাগাভাগি

হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোল, টিকি, ছাত্র এবং নস্য, ব্যবস্থা ও ব্যাকরণের চোটে নবদ্বীপের এক অংশ যেমন মধুকরগুঞ্জিত মধুচক্রের ন্যায় সর্ব্বদা মুখরিত হইত, অন্য দিকে সেইরূপ নিমাই পণ্ডিতের গুরুমায়া চেলাদিগের মহাধূম ছিল; মালা, তিলক, ঝোলা, খোল করতাল সেবা-দাসী এ সকলের আর অন্ত ছিল না। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের পর শান্তিপুর ও বীরনগর (উলা) তখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এখনো যেমন, তখনো তেমন; শান্তিপুর চিরকালই নদীয়া জেলার 'ফেসানের' রাজধানী, শান্তিপুর, আমাদের নদীয়া জেলার ফ্রান্স; আমার শান্তিপুরবাসী বন্ধুগণ ক্ষমা করিবেন, এই নগরটির উপর পূর্ব্বাপরই কন্দর্প ঠাকুরের একটু 'নেক-নজর' আছে, শান্তিপুরে কাপড় হইতে শান্তিপুরের সৌন্দর্য্য, সকলের সঙ্গেই খানিকটা সখ মিশানো; শান্তিপুরে মেয়েদের পাতলা কাপড় পরা ছাড়া-ইবার জন্য নামজাদা ডেপুটি ঈশ্বর বাবুর অধ্যবসায়ের গল্প পল্লী অঞ্চলে অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। বাহুবল ও লাঠির কৌশলের জন্য বীরনগর স্বনামধন্য ছিল। মেহেরপুরের মহাপরাক্রান্ত জমীদার বাবু মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, তাঁহার লাঠির চোটে দুর্দ্দান্ত নীলকর মেহেরপুরের ত্রিসীমানায় ঘেঁসিবার সাহস করিত না। লোকে জমীদারের চাকরী করিত, না হয়, চাষ বাস করিয়া খাইত, জমীদার-বাড়ীতে যাত্রা পাঁচালী শুনিত, কবির লড়াই শুনিয়া স্ত্রীপুরুষে আমোদ পাইত, জমীদার বাড়ীতে বারো মাসে তের পার্ব্বন লইয়া ধুমধাম করিত;—খাইয়া শুইয়া যে টুকু সময় বাঁচিত, তাহা দলাদলী, লোকের জাতি-মারা এবং নিন্দা কুৎসাতেই কাটিত। লোকের সাধারণ অবস্থা মন্দ ছিল না বটে, কিন্তু প্রকৃত জীবনের লক্ষণ কিছু ছিল না,—সমস্ত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, এবং সর্ব্বত্র আধ্যাত্মিক শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

এই সময় কুমারখালী নদীয়া জেলার 'মাঞ্চেষ্টার' ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অসংখ্য তাঁতি নানা রকম বস্ত্র প্রস্তুত করিত, এবং ইহার নাম সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল; এখানে মাননীয় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠী ছিল, এবং 'কুমারখালী মার্কা' রেশম অধিক মূল্যে বিলাতের বাজারে বিক্রীত হইত, কুমারখালীর নীলপেড়ে কাপড়ের পাকা নীল রঙ্গের জন্য সাহেব সওদাগরদিগেরও মনে লোভ সঞ্চার হইত। কুমারখালীতে এখন আর রেশমের কুঠী নাই, কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, এখনো 'কুমার-

খালী মার্কা’ রেশম আছে ; যাহা হউক এই রেশমের কুঠী উপলক্ষে এখানে অনেক লোক সম্পত্তিপন্ন হইয়া উঠে, অনেকে অন্যত্র হইতে এখানে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এখন এখানেই বাস করিতেছেন। তিলি জাতি বহুকাল হইতে কারবারের জন্য বিখ্যাত, রেশমের কুঠী উপলক্ষে অনেক তিলি বহুপূর্ব্ব হইতে কুমারখালিতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, এবং নানাপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া প্রভূত ধনের অধিকারী হন। এই জাতির মজুমদার বংশে ১২৩৫ সালে হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য-জীবনের কথা, তাঁহার স্বলিখিত ‘আত্মপরিচয়’ নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহার সম্পাদিত ‘গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা’র ১২৮৫ সালের ১৩ই আষাঢ় তারিখের সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন :—

“যখন আমার বয়স এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন মাতৃদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি মাতৃহীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় যে কত কাঁদিয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে? খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু বোধ হয় তন্নিমিত্তই সংসারে উদাসীন ছিলেন। তিনি বিষয়কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ বিধান না করায়, পৈত্রিকসম্পত্তি যাহা ছিল, তৎসমুদায়ই নষ্ট হয়। সুতরাং মাতৃ-বিয়োগ হইতেই সাংসারিক দুঃখ যে আমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাল্যখেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতা-মাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটি ভিজাইয়াছি; এই অবস্থায় কতকদিন গত হয়। পরে বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন, নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া কত কাঁদিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময় কুমারখালীবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় একটী ইংরাজিস্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম। খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন সাহায্য করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কর্ম্ম গেল। অর্থাভাবে আমারও লেখা পড়া বন্ধ হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কতকদিন শিক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাবে আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।”

সুতরাং বলা বাহুল্য, পড়া শুনা বন্ধ হইয়া গেল। হরিনাথের শরীরে বিশেষ বল ছিল, বল ও সাহসে তিনি সেকালের ছেলেদের মধ্যে গ্রামে অদ্বিতীয় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সাহস মহত্ত্বে পূর্ণ ছিল, দুর্ব্বল বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া তিনি বলের অপব্যবহার করিতেন না, বরং দুর্ব্বল এবং অপরের হস্তে লাঞ্ছিত বালকদিগকে তাঁহার সবল বাহুদ্বয়ের দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। প্রতিভা-সম্পন্ন বালক লেখা পড়া ছাড়িয়া দিলে তাহার জীবনের গতি যেমন কিঞ্চিৎ উদ্দাম হইয়া উঠে, তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। তিনি সমস্ত দিন শুধু মাঠে মাঠে দৌড়িয়া ও খেলা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তিনি কিছু লেখা পড়া শিখুন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার একজন ধনবান আত্মীয় তাঁহাকে কয়েকখানি বাঙ্গলা পুস্তক পড়িতে দিলেন; তিনি তিন দিনের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়—একে পিতৃমাতৃহীন বালক, তাহাতে জ্যেষ্ঠতাতের গলগ্রহ, "তের চৌদ্দ বছরের ছেলে শুধু দুবেলা খাবে, কাজ কর্ম্মের নাম নাই"—ইত্যাদি অনেক কটু কাটব্য তাঁহাকে প্রতিদিন শুনিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি একটি ভদ্রলোকের জন্য রামমোহন রায় প্রণীত 'চূর্ণক' নামক পুস্তকখানি এক রাত্রে নকল করিয়া দিয়া একখানি নববস্ত্র উপার্জ্জন করেন। হরিনাথ কতদিন আমাদের কাছে এই দারিদ্রের গল্প বলিয়াছেন, এই নূতন কাপড়খানি লাভ করিয়া তাঁহার মনে কি আনন্দ হইয়াছিল—সে কথা শেষ জীবনেও তাঁহার মনে ছিল।

কুমারখালীতে প্রচুর কাপড়ের দোকান ছিল, এখনো এই সকল দোকানের সংখ্যা কম নহে। হরিনাথ অবশেষে একখানি কাপড়ের দোকানে হিসাব পত্র লেখা শিখিতে নিযুক্ত হইলেন। কথা ছিল, তিনি মাহিয়ানা বাবদ কিছু পাইবেন না, সম্বৎসরের উপযুক্ত কাপড় পরিতে পাইবেন। কিছুদিন এই ভাবে গেল। একদিন সেই দোকানদার একজন পাওনাদারের নামে কিছু টাকার জন্য নালিশ করে। দোকানদার হরিনাথকে নূতন করিয়া এক মিথ্যা হিসাব প্রস্তুত করিতে বলিল; মকদ্দমায় কৃতকার্য্য হইলে হরিনাথ যে উত্তম পুরস্কৃত হইবে, দোকানদার হরিনাথকে তাহাও জানাইল। অন্য সাধারণ বালক হইলে মনিবের এই প্রস্তাবে সে অতি উৎসাহের সঙ্গে নূতন জমা খরচ প্রস্তুত করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু হরিনাথের হৃদয়ের উপাদান স্বতন্ত্র ছিল। এই নিরক্ষর, দরিদ্র, গ্রাম্য বালক দোকান-

দারের কুঅভিপ্রায় শুনিয়া আপনার বিপদ ও কষ্টের কথা মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না করিয়া, নির্ভীকচিত্তে সতেজে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না, এরূপ কথা শুধু বালকদিগের নীতিপুস্তকের পৃষ্ঠাতে মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়। হরিনাথ ঘৃণার সহিত দোকানদারকে বলিলেন, "না খাইয়া মরিতে হয় তাহাও স্বীকার, এমন অধর্ম্ম করিতে পারিব না।"— দোকানদার বালককে দোকান হইতে দূর করিয়া দিল, বলিল, হরিনাথ কোন কালে কাজের লোক হইতে পারিবে না। শুধু দোকানদার নহে, বাড়ীর এবং পাড়ার সকলে হরিনাথের উপর বিরক্ত হইলেন। যে জ্যেষ্ঠতাত এক মুঠা অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন, তিনিও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এমন জেঠা ছেলেও ত কখন দেখিনি, ধর্ম্মের অবতার আর কি?"— হরিনাথের এই কার্য্য সেকালের স্ত্রীপুরুষের নিকট বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ইহাতে সেকালের লোকের নৈতিক আদর্শ কিরূপ ছিল, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

বাড়ীতে এই রকম অবস্থা। গ্রামে না আছে লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা, না আছে অন্ন সংস্থানের কোন উপায়। কেহ তাঁহাকে নির্ব্বোধ ভাবে, কেহ এঁচোড়ে পাড়া জ্যাঠা বলিয়া বিবেচনা করে, সমস্ত গ্রামবাসীর চক্ষে তিনি একটা দুর্গ্রহের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। এই অবস্থা বড়ই শোচনীয় এবং যে বয়সে সাধারণের আদর, সহানুভূতি এবং প্রীতি লাভের ইচ্ছা হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে, সেই বয়সে যদি সকলের বিরক্তি ও উপেক্ষাই জীবনের অবলম্বন হয়, তাহা হইলে জীবন বড় দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। অনেক মহৎ ব্যক্তির বাল্য জীবন এইরূপ ক্লেশকর হইতে শুনা যায়। সংসারের সঙ্গে বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার বাল্য জীবনের সেই যুদ্ধক্লান্তি পরিণত বয়সেও তাঁহার ললাটে অঙ্কিত ছিল। গ্রামে কোন উপায় হইল না দেখিয়া, হরিনাথ লেখাপড়া শিখিবার সংকল্প লইয়া কলিকাতায় চলিলেন। তখন রেল হয় নাই, নদীপথে দশ বারো দিনে কলিকাতা যাইতে হইত; কলিকাতাতেও কোন সুবিধা হইল না, আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা আর হইল না। সেকালে পল্লীগ্রামে দুই একখানির অধিক পুস্তক পাওয়া যাইত না, সংবাদ পত্রের মধ্যে "প্রভাকর" পড়িতে পাইতেন। ইহা পড়িয়াই তাঁহার ভাষা শিক্ষা

হইল। হরিনাথ "সংবাদ প্রভাকরে" প্রথম প্রথম কবিতা লিখিতেন, সেকালের কবিতা আর একালের কবিতাতে অনেক তফাৎ, সেকালের কবিতা-সুন্দরী অনুপ্রাসের লৌহবর্ম্মে নিতান্ত পীড়িতা, ভাব থাক না থাক ভাষার ঝঙ্কারে অস্থির; গুপ্তকবি সেই কবিতার 'ওস্তাদ' ছিলেন, হরিনাথও অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার উপযুক্ত 'সাকরেদ' হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সংবাদ পত্রে কবিতা লেখা অপেক্ষা লেখনী সার্থক করিবার আরো বিষয় ছিল। স্বদেশের হিতকামনা তাঁহার যুবক-হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। এখন আমরা গ্রামে গ্রামে 'ভারত উদ্ধারের' সভা করি, বক্তৃতা করি, দেশে আজ কাল ম্যাটসিনীর সংখ্যাও অগণ্য, কিন্তু হরিনাথের বয়স যখন ১৮।১৯ তখন এদেশে রাজনৈতিক সভাসমিতির অস্তিত্বও ছিল না। দেশের এবং দশের সেবা করা একটা কাজ বলিয়া পল্লী অঞ্চলে কেহই জানিত না। সহরে দুই একজন দেশহিতব্রতধারী মহাত্মাকে দেখা যাইত। তখন দেশ এ রকম ছিল না, জমীদারের হস্তে প্রজার লাঞ্ছনা সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, নীলকর সাহেবেরা রাজ-ক্ষমতা হস্তে লইয়া দরিদ্র কৃষকের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছিল, এমন কি, শিক্ষিত শ্রেণীও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য জীবন বহন করিত; মেয়েরা শুধু ঝুমুর পাঁচালী শুনিতে ভাল বাসিত, পুরুষেরা তরজা ও কবির লড়াইয়ে আমোদ উপভোগ করিত এবং যখন সাহিত্য আলোচনা হইত, তখন ঈশ্বর গুপ্ত ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের অপাঠ্য কুৎসাকষায়িত কবিতা পাঠ পূর্ব্বক তাহারা জীবন ধন্য মনে করিত। দুঃখের বিষয় এই, কবির লড়াই আমাদের সাহিত্য জগৎ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় নাই, তবে এখন আর সে কুরুচি কবিতায় ধ্বনিত হয় না, এখন তাহা গদ্য সাহিত্যরূপে প্রতি সপ্তাহে মুদীখানার দোকানে প্রচারিত হয়।

পল্লীগ্রামের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন হরিনাথ তাঁহার স্বগ্রামের অভাব অত্যাচার, প্রজাপীড়ন প্রভৃতি কাহিনী প্রভাকরে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন নিঃসহায় যুবকের এইরূপ সাধুসংকল্প দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইলেন।

এই সময়ে হরিনাথের মনে আর এককথা উঠিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কয়েকদিন পাঠ করিয়া তাঁহার বিদ্যা শেষ হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইল, দেশের লোক ভাল

করিয়া বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করে; গুরুমহাশয় যে নিয়মে পাঠশালায় লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন, সে ভাবে না গিয়া তিনি সাধারণকে শুধু বই পড়ান দরকার মনে করিলেন, এবং সেই অনুসারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কুমারখালী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অতি সুন্দর ভাষা শিক্ষা হইত; হরিনাথ কেমন করিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহা তাঁহার কথায় লিখিতেছি—"আমার বাল্যসখা মথুরানাথ মৈত্র পাবনা ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, তিনি অবকাশ উপলক্ষে যখন বাড়ী আসিতেন, তখন আমি তাঁহার নিকট ক্ষেত্রতত্ত্ব, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতাম। * * * বন্ধু যখন কুমারখালী ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকতা স্বীকার করিলেন, তখন আমার পড়ার ও পড়াইবার সুবিধা হইল।" স্বর্গীয় মথুরানাথ মৈত্র মহাশয়ের সহিত হরিনাথের প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। মথুরানাথ মৈত্র মহাশয় একজন সাধু ব্যক্তি ছিলেন, রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজ ও কুমারখালীর 'দরিদ্র ভাণ্ডার' তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী; মথুরানাথ অনেক বিষয়েই হরিনাথের উপযুক্ত বন্ধু ছিলেন।

ইংরাজী বিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, হরিনাথ বঙ্গ বিদ্যালয়েও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন; সেকালে পাঠশালে ছাপা বই পড়িবার নিয়ম ছিল না, বালকেরা যথাক্রমে তালপাত, কলাপাত ও কাগজে লিখিত এবং হিসাব শিখিত। চিঠিপত্র এবং দলিল দাখিলা লেখায় সাধারণ জ্ঞান হইলেই চলিত। হরিনাথের নূতন ধরণের শিক্ষা প্রচলন দেখিয়া, উড্রো, মার্টিন প্রভৃতি ইনেস্‌পেক্টরগণ এই বাঙ্গালা স্কুল পরিদর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন; পূর্ব্বে বঙ্গবিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইত না, এই অভিনব শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হরিনাথের বাঙ্গালা স্কুল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করে। বর্ত্তমান কালের এই প্রদেশস্থ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই হরিনাথের ছাত্র; আমরা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্নেহের ক্রোড়ে লালিত; মধ্যে মধ্যে অবসরকালে যে সামান্য সাহিত্য সেবা করি, হরিনাথ তাহার আদি গুরু, তিনি হাতে ধরিয়া আমাদিগকে লিখিতে শিখাইয়াছেন, শেষ জীবনেও লেখা সম্বন্ধে তিনি নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। ভরতীতে যে ভাষায় ও ভাবে আমি আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করি,—সে সম্বন্ধে আজ আট নয় মাস হইল তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি সেটাকে এমন করিয়া ফেলিলে কেন? পড়িতে

বেশ মিষ্ট বটে, কিন্তু তুমি কি মনে কর বঙ্গসাহিত্যকে তোমরা ঐ পথে লইয়া যাইবে। স্বীকার করি তোমরা যে ভাষায় লেখ, তাহাতে ভাব প্রকাশের সুবিধা হয়, কিন্তু ভাষার গাম্ভীর্য্য ও বাঁধুনী নষ্ট হইয়া যায়। এ শিক্ষা তুমি কোথায় পাইলে ?" এ বিষয়ে হরিনাথের সঙ্গে আমার অনেক তর্ক বিতর্ক হয়, আমি আমার মত বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "তা তোমরা যাহা ভাল বোঝ কর, আমরা আর কদিন, যে কয়েক দিন বাঁচিব, দীর্ঘ সমাসের ঝোঁক ত্যাগ করিতে পারিব না।"

এখনকার মত সেকালে এত পাঠ্য পুস্তক ছিল না, এই জন্য হরিনাথ নিজে কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন ; 'বিজয় বসন্ত' তাহার মধ্যে প্রধান। এই 'বিজয় বসন্তে'ই হরিনাথের নাম বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত। এখন ছাপাখানার কল্যাণে, এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে উপন্যাস এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ গল্পে বাঙ্গলা দেশ ঢাকিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু যে সময় হরিনাথের বিজয় বসন্ত ছাপা হয়, সে সময় উপন্যাসের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল, এমন কি বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী বোধ হয় বিজয় বসন্ত প্রকাশের অল্পদিন পূর্ব্বে বা পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গসাহিত্যের উচ্চ আদর্শ হিসাবেও বিজয় বসন্ত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ; এখানি ব্যতীত তিনি আরো কতকগুলি গদ্য এবং পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, সেই সকল গ্রন্থ একালের ছাঁচে ঢালা না হইলেও তাহার মধ্যে যে একটি সরল মাধুর্য্য এবং গ্রন্থকারের নিজস্ব মৌলিকতা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

বাঙ্গলাস্কুল যখন বেশ চলিতে লাগিল, তখন তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। প্রথম হইতেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার না হইলে নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে ; কিন্তু কিরূপে এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপন করা যায়, সেই চিন্তায় তাঁহার অনেক দিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি কয়েকটি বালিকা লইয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় পাঠশালার শিক্ষাদান ভার তাঁহার জনৈক সুশিক্ষিত প্রিয় ছাত্রের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এইরূপ করিবার একটা বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। সে সময়ে পল্লী অঞ্চলে বালিকা

বিদ্যালয়ের প্রচলন হয় নাই ;—ঘরের মেয়েদিগকে বাহিরে আনিয়া শিক্ষা দানের জন্য তাহাদিগকে অপরিচিত যুবকের হস্তে সমর্পণ করিতে অনেক পিতাই অস্বীকার করিতেন, এমন কি,—ইহাতে হরিনাথের সংকল্পও ব্যর্থ হইতে পারে। তাই তিনি স্বয়ং এই গুরুভার গ্রহণ করিলেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করিলে বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইতে কাহারও আপত্তি হইবে না ; এই বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি যে প্রণালীতে শিক্ষা দান করিতেন, তাহা বালিকাগণের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর ছিল। ভাল ভাল পুস্তক পাঠ, সামান্য হিসাব রাখা ও সূচীকার্য্য শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা ছিল ; এমন কি, বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্দ্ধেকের অধিক সময় তিনি সূচী কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। আমরা হরিনাথের ছাত্র, শিক্ষকতা কার্য্যে কেশ পরিপক হইয়া আসিল, অনেক স্থানে এ পর্য্যন্ত অনেক শিক্ষক দেখিয়াছি কিন্তু হরিনাথের ন্যায় শিক্ষাদানে নিপুণ, ক্ষমতাশালী শিক্ষক এ পর্য্যন্ত একজনও দেখিলাম না। কিরূপ ভাবে শিক্ষা দিলে একটি নূতন বিষয়ও বালকবালিকাগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইতে পারে এবং তাহা সহজে তাহাদের আয়ত্ত হয়, তাহা তিনি অতি উত্তম জানিতেন। ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশ হইলে তিনি শিক্ষক-শ্রেষ্ঠ স্পেনসারের সমান সম্মান এবং খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে না। প্রতিভার পূজা এদেশে অনেক বিলম্বে আরম্ভ হয় এবং যখন মানুষ প্রতিভাসম্পন্ন বক্তিকে পূজা করিতে আরম্ভ করে, তখন তাঁহাকে দেবতা বা অবতার করিয়া ফেলে। সুতরাং যাঁহারা পরের সেবার জন্য এদেশে খাটিতে আসেন, তাঁহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া এই দুরন্তর প্রবাসে একাকী আজীবন অতিবাহিত করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন সেকালে যখন দেশের মধ্যে আলোক ও জীবন সঞ্চার করেন, তখন তিনি একাকী ছিলেন। এই শিক্ষিত, উর্ব্বর-মস্তিষ্ক বঙ্গযুবক প্লাবিত একালেও যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের এবং সমাজের হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তখনও তিনি একাকী! ভক্তবীর হরিনাথ এইরূপ নীরবে একাকী কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়টি এখনও বর্ত্তমান আছে এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথেই তাহা পরিচালিত হইতেছে ; আমরা জানি এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সূচীকার্য্যে এমন পারদর্শিনী হইত, যে তাহারা গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া অবসর সময়ে সূচীকার্য্যের দ্বারা গৃহস্থের

অনেক সাহায্য করিত। একটি বালিকা অল্প বয়সেই বিধবা হইয়াছিল, হরিনাথ তাহাকে দুই তিন বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দান করেন, অবশেষে সে সূচীকার্য্যে এরূপ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিল যে, তদ্দ্বারা যথেষ্ট উপার্জ্জন পূর্ব্বক দরিদ্র পিতামাতার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিত। কুমারখালি অঞ্চলে এরূপ বিধবার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে এবং তাহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে হরিনাথের নিকট ঋণী।

অতঃপর আমরা হরিনাথের মহদ্‌ব্রতের উল্লেখ করিব। হরিনাথ পরম ধার্ম্মিক এবং পরম জ্ঞানী ছিলেন। সেই জ্ঞান ও ধর্ম্ম তিনি তাঁহার হৃদয়ের দুর্ল্লভ অন্তঃপুরটির মধ্যেই সংগুপ্ত রাখেন নাই, তিনি বাউলের গানে ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া দেশ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সরল, মধুর ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া পাষাণহৃদয়ও গলিয়া যাইত। হরিনাথের সহিত আলাপ করিলে তাঁহার শিশুর ন্যায় সরলতার সহিত পাণ্ডিত্য এবং পবিত্র ভাব দেখিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিত। দেশে কিন্তু হরিনাথ অন্য নামে পরিচিত ছিলেন, হরিনাথ বলিলে তাঁহাকে কেহই চিনিত না, সকলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"কোন হরিনাথ?"—"কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ" বলিলে অনেকে চিনিত, কিন্তু "এডিটার মহাশয়" বলিলে তিন বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিত, হরিনাথের কথা বলা হইতেছে। দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঈশ্বরচন্দ্র বলিলে লোকে হা করিয়া থাকিত, 'বিদ্যাসাগর'—তাঁহার সার্ব্বজনিক নাম। 'এডিটার মহাশয়' ও সেইরূপ হরিনাথের সার্ব্বজনিক নাম ছিল। হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার' সম্পাদক ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'এডিটার' মহাশয় বলিত।

বাঙ্গলা ১২৭০ সালে তিনি গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; সে সময় সোমপ্রকাশই বাঙ্গালায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ছিল। গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ করিবার সময় তাঁহার মনোভাব এবং সংকল্প তাঁহার স্বলিখিত লিপি হইতে এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"এই গ্রামে বিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থসম্পন্ন কত লোক আছেন, তাঁহারা মনে করিলে গ্রামবার্ত্তার ন্যায় কত পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারেন। এত লোক থাকিতে আমি বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাশূন্য দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া এরূপ মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম কেন? এ কথার উত্তর কে

করিবে? তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, কুমারখালীবাসী সম্ভ্রান্ত মহা-জনগণ একবার জমীদারকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যারপরনাই অপমানিত হন এবং কয়েক হাজার টাকা ঋণ দান করেন; তখন আমার বয়স ১২।১৩ বৎসরের অধিক নহে। আমি স্বচক্ষে নির্দ্দোষ মহাজনগণের অপমানজনিত অশ্রুপাত দেখিয়া, ইহার কোন প্রতিকারের পথ আছে কিনা সর্ব্বদা সেই চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু কে যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতে লাগিলেন, "সংবাদপত্র ব্যতীত এরূপ অত্যাচার নিবারণের আর উপায় নাই"—'কিন্তু সংবাদপত্র কি? কিরূপে তাহার কার্য্য চালাইতে হয়, ইহার কিছুই জানি না। বিদ্যা সম্বলের মধ্যে কুমারখালীর ইংরাজী বিদ্যালোক-দাতা বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের দয়া বিতরিত-ফাষ্ট নম্বর রিডারের দুই চারিটি গল্প ও তিন চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তকের উপদেশ। কি করি, কি করি, কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে বুঝিতে পারি না, অথচ যিনি হৃদয়ে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন, তিনি ছাড়েন না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কুমারখালীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিলেন, অনেকে 'খাতাই' ব্রাহ্ম হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়াল চাঁদ শিরোমণি উপাচার্য্য হইয়া কুমারখালী আসিলেন, তাঁহার নিকট পড়িতে আরম্ভ করিলাম, কিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান হইল, প্রথম খণ্ড হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট যত খণ্ড ছিল, তৎসমুদয় পাঠ করিলাম। পূর্ব্বে কেবল স্বভাবতঃ পদ্য লিখিতে জানিতাম, এক্ষণে গদ্যও লিখিতে শিখিলাম। সংবাদ প্রভাকর গতিকে সতিকে আনাইয়া সংবাদপত্র কি এবং তাহা কিরূপে সম্পাদন করিতে হয়, তাহাও দেখিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে লিখিয়া পরিশেষে প্রভাকরের একজন সংবাদদাতা বা লেখক মধ্যে গণ্য হইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে নীলকুঠীতে ও মহাজনদিগের গদিতে ছিলাম, জমীদারের সেরেস্তা দেখিয়াছিলাম, এবং দেশের অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছিলাম; যেখানে যত প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা আমার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। দেশীয় সংবাদপত্রের অনুবাদক রবিন্সন সাহেব যখন অনুবাদ কার্য্যালয় খুলিলেন, আমিও সেই সময় গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ করিলাম।"

গ্রামবার্ত্তায় তিনি অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিতে

কোন দিন কুণ্ঠিত ছিলেন না, এজন্য তাঁহাকে অনেক সময়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, এমন কি দুই এক সময় তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই। সেই সকল কাহিনী বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে ক্ষুদ্রকায়া দাসীতে স্থান সংকুলান হইবে না, সুতরাং অগত্যা আমরা সে সকল বিবরণ বর্ণন করিতে বিরত হইলাম, বিশেষতঃ যোগ্যতর লেখকগণ অন্য পত্রিকায় সকল কথার উল্লেখ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে। অতএব হরিনাথের সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বিদ্যালয়ের পরিশ্রম,' গ্রামবার্ত্তার গুরুতর সম্পাদনভার, তাহার পর অন্নচিন্তা, এ সমস্ত অনিয়ম তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহসী বীরের ন্যায় সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মানুষের সহ্য করিবারও একটা সীমা আছে, তাঁহার ঋণভার ক্রমে বাড়িয়া উঠিল—শরীর রোগে জীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অগত্যা গ্রামবার্ত্তার সম্পাদনভার আমাদের অযোগ্য হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক ১২৯০ সালে কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

তখন বঙ্গে নূতন স্রোত প্রবাহিত, নগরে বড় বড় সংবাদ পত্র, বড় বড় লেখক, প্রবল উৎসাহ, প্রচণ্ড কোলাহল, তখন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের কথা কে শুনিবে? গ্রামবার্ত্তার জীবন থাকিল না, ২২ বৎসর কাল স্বদেশের সেবা করিয়া ১২৯২ সালে গ্রামবার্ত্তা খানি উঠিয়া গেল। বৃদ্ধ হরিনাথ স্বদেশের পরিচর্য্যা করিয়া জীবন বিপদ-সঙ্কুল করিয়া, ঋণভার মস্তকে লইয়া, ভগ্ন-হৃদয়ে, জরাজীর্ণ দেহে, গৃহপ্রাঙ্গণে বসিলেন। দেশের জন্য তিনি যে এত খাটিলেন, এজন্য কেহ তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত করিল না। এত দিন পরে শ্রীযুক্ত রামগোপাল সান্ন্যাল মহাশয় তৎপ্রণীত Bengal Celebrities নামক গ্রন্থে হরিনাথের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

দেশের জন্য যাহা করিবার সাধ্যানুসারে হরিনাথ তাহার ত্রুটী করেন নাই। অতঃপর তিনি ধর্ম্মালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়নিহিত ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। এতদিন রাজ-নীতি ক্ষেত্রে তাহার বিকাশ শুধু ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে সে ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তিনি বাউলের গান লইয়া পড়িলেন, কাঙ্গাল ফিকির চাঁদের গানের পরিচয় দেওয়ার স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংকুলান হইতে পারে না। হরিনাথের 'ব্রহ্মাণ্ড বেদ' এক অপূর্ব্ব

সামগ্রী—তাহা মাসিক আকারে খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রকাশিত হইত, জ্ঞানী ধর্ম্ম পিপাসুগণ 'ব্রহ্মাণ্ড বেদে' অনেক অমূল্য রত্ন লাভ করিতেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাহারও কিয়দংশ ছাপা হইল না, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি 'ব্রহ্মাণ্ড বেদ' লিখিয়াছেন।

হরিনাথ স্বভাবকবি ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সেকালে কুমারখালীতে বড়ই সংকীর্ত্তনের ধূম ছিল, অনেকে সুন্দর সুন্দর পদ প্রস্তুত করিয়া গান করিতেন, কিন্তু হরিনাথের রচিত পদগুলি মহাজনবিরচিত পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; আমরা হরিনাথের সমস্ত সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি, একদিন একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা একটি গান রচনা করিয়া কিছুতেই শেষ চরণ মিলাইতে পারিতেছেন না; অনেক চিন্তা করিতেছেন কিন্তু শেষ চরণটি মনের মত হইতেছে না, বালক হরিনাথ সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, স্বীয় প্রতিভাবলে বালক এমন সুন্দর ভাবপূর্ণ শব্দ যোজনা করিয়া শেষ চরণটি মিলাইয়া দিলেন যে, সকলে অবাক্ হইয়া গেল। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি শুনিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার সংকীর্ত্তনে অনেকের চক্ষে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহার বাউলের গানে এক সময় বঙ্গের অনেক স্থান মাতিয়া উঠিয়াছিল, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের আবালবৃদ্ধ তাঁহার বাউলের গানের সহিত পরিচিত; এখনো রাখাল বালক সন্ধ্যাকালে ক্লান্তদেহে গোচারণ ক্ষেত্র হইতে ফিরিতে ফিরিতে উচ্চকণ্ঠে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া স্তব্ধ সান্ধ্য আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিতে থাক;—

"বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে,
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে।"

এবং বর্ষার রাত্রে কূলপ্লাবী পদ্মার বিশালবক্ষে উন্মত্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল ক্ষুদ্র ডিঙ্গিখানিতে বসিয়া মাছ মারিতে মারিতে জেলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এক একবার গাহিয়া উঠে;—

"মন আমার টোপাপানা, ডুবতে চায় না,
সেই ভাবনা রাত্রি দিনে।"

চরাচর হইতে তাহার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি উঠিয়া যেন ক্ষণকালের জন্য তাহার অন্তরের মানুষটিকে জাগাইয়া তুলে। অনেকের সঙ্গীতে বিশ্বের

অনেক সুখ দুঃখ ধ্বনিত হইয়াছে—কিন্তু হরিনাথের বাউল সঙ্গীতে হৃদয়ের মধ্যে যেমন নিষেধ,যেমন অনাসক্ত ভাব জাগাইয়া তুলে এমন আর কিছুতেই নহে। রূপের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের অভিমান, বাসনার বহ্নি হইতে ক্ষুদ্র নরহৃদয়কে রক্ষা করিবার পক্ষে হরিনাথের সঙ্গীত এক অমোঘ বর্ম্ম স্বরূপ। বর্ত্তমান জীবনী-লেখক হরিনাথের সঙ্গে অনেক সময় অনেক স্থানে এই বাউল গান উপলক্ষে গিয়াছেন। ঢাকা, ফরিদপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার অনেক লোক হরিনাথকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ঢাকায় যখন হরিনাথ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রমে অতিথি হন, তখন ঢাকা সহর হরিনাথের বাউল-সঙ্গীত-স্রোতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। অনেকে অনেকদূর হইতে হরিনাথকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ইহাতে হরিনাথ নিজেকে মহা অপরাধী জ্ঞান করিতেন—তিনি এত আলোক সহিতে পারিতেন না। অপরের অলক্ষ্যে থাকিয়া কাজ করাই তাঁহার কামনা ছিল। প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পত্রান্তরালে থাকিয়া, সৌরভ বিকাশ করাই তিনি মহাব্রত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাই, যদি কোন সময় তাঁহার কোন কথা স্মরণার্থ নোট করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইত, তাহা হইলে তিনি অপ্রতিভ ভাবে বলিতেন, "তোমরা কি আমাকে পাগল করিবে? নীরবে কাজ কর, গোলমালে কাজ নাই।"—তিনি জগৎ হইতে কার্য্য করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। প্রতিদিন সূর্য্য উঠিতেছে, পৃথিবীর গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে নীরবে এক বালুকাকণাবৎ বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ উৎপন্ন হইতেছে; তিল তিল করিয়া বাড়িয়া প্রকৃতি-মাতার কোমল ক্রোড়ে কিরূপে অভ্রভেদী-কানন-শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে,—কোন প্রকার শব্দ নাই, অসন্তোষ নাই; অখণ্ড সহিষ্ণুতা, অনন্ত শান্তি;—আমরা কেন অসহিষ্ণু, অশান্ত হইব? আমাদের ক্ষুদ্র কাজে কেন উচ্চ কলরব উঠিবে? ইহাই তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষা ছিল; তিনি জীবনে কখন এই পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।

বার্দ্ধক্যকালে হরিনাথ সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সংসার-চিন্তা অন্নকষ্ট কিছুই তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পরের উপকার করা তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল, অন্তিম মুহূর্ত্তেও তিনি সেই পরম পবিত্র ব্রত পালনে উদাসীন ছিলেন না। দুঃখী, তাপী, অনাথ, অসহায়, রোগী, শোককাতর ব্যক্তি সকলেই কাঙ্গালের স্নেহ পাইত। তিনি পিতৃহীনের

পিতা, মাতৃহীনের মাতা, বিপন্নের বন্ধু, সম্পন্ন ব্যক্তির সুপরামর্শ-দাতা, এবং কুপথগামী জনগণের সুপথ-প্রদর্শক ছিলেন। দাসের ন্যায় তিনি অনাথের সেবা করিতেন। বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগ হইত। যৌবনকালে হরিনাথ অত্যাচারীর যম ছিলেন। ধনী জমীদার, প্রতাপশালী নীলকর, দুর্দ্দান্ত মহাজনদিগের সহিত তিনি একাকী অসহায় হইয়াও বিধাতার চিরমঙ্গল আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অক্লান্ত ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে তিনি রোগী ও তাপীর সান্ত্বনার স্থল ছিলেন। উত্থানশক্তি-রহিত মৃতকল্প চিররোগী তাহাদের এই দেবহৃদয় বন্ধুটিকে দেখিয়া একবার সসম্ভ্রমে উঠিবার চেষ্টা করিত, পারিত না; শুধু জ্যোতিহীন দুইটি দীন নেত্র হইতে অবসাদপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞদৃষ্টি প্রেরণ করিত। হরিনাথ ধীরে ধীরে রোগীর মস্তকপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিয়া তাহার শিরস্পর্শ করিতেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, কত আশার কথা বলিতেন; শুনিতে শুনিতে সেই মৃতপ্রায় দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইত। রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাঁহার সেই তেজঃপূর্ণ, উন্নত সুগৌর দেহ, শ্বেত শ্মশ্রু, গৈরিক বস্ত্র, নগ্নপদ এবং পৃষ্ঠ-বিলম্বিত শ্বেতবর্ণ রুক্ষ কেশভার দেখিলে মনে হইত স্বর্গ হইতে বিধাতা বুঝি কোন দেবদূতকে এই রোগীর সেবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।

হরিনাথের জীবনী প্রকাশের ভার কোন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার ন্যায় অযোগ্য লেখকের দ্বারা তাঁহার মহৎ চরিত্রের কাহিনী যথাযথরূপে বর্ণিত হইতে পারে না; কিম্বা আমি চরিত্র-সমালোচকের আসনও গ্রহণ করি নাই; তাঁহার সদ্গুণ সমূহ স্মরণপূর্ব্বক আমার শোকাবেগ লাঘব করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম। হরিনাথের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনীর অনেক কথা জানি না, যাহা জানি তাহাও সকল বলিতে পারি নাই, এবং যাহা বলিয়াছি তাহাও যেমন করিয়া বলা উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। হরিনাথ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন, আমরা তাঁহার কিছুই করিতে পারি নাই। কিন্তু হায়! যদি তাঁহারই নির্দ্দেশমত দেশের জন্য—আর্ত্ত, পীড়িত, বিপন্নের জন্য কিছুও খাটিতে পারিতাম! তাঁহারই দিকে চাহিয়া যদি বলিতে পারিতাম—

"তোমারই চরণ করিয়ে স্মরণ চলেছি তোমারই পথে,
তোমারই ভাবেতে হইব বিভোর ধরি এই মনোরথে।"

শ্রীজলধর সেন।

কবিতা সুন্দরী।

মম ক্ষুব্ধ তৃষিত চঞ্চল চিতে
সঞ্চর সদা
কেন, ওগো কবিতা সুন্দরী ?
আমার, জীর্ণ, বিদীর্ণ হৃদয় কুটীরে
তোমায়, বরিব কেমন করি ?
সুখ হেথা নাই, নাহিক শান্তি
মরীচিকা ঘেরা অনন্ত ভ্রান্তি
দিগন্ত হ'তে আনিছে ক্লান্তি
আমার শ্রান্ত বক্ষ-ভরি,
আমার, জীর্ণ, বিদীর্ণ হৃদয়ে, গো দেবি,
তোমায়, বরিব কেমন করি ?

কোন্ অনন্ত দূরে বাস তব দেবি,
আমি ধূলির মাঝারে পড়ি !
আশাহীন প্রাণে সংশয় লয়ে
আগে পাছে চাই সঙ্কোচ ভয়ে,
বহ্নিরূপিণী হে চিত্তহারিণি,
তুমি আলোক অঞ্চল ধরি
চঞ্চলা সম লঘু পদ ভরে
সঞ্চর সদা দিক্ আলো ক'রে
কি আছে কি দিয়ে পুজিব তোমারে
বুঝিতে নারি,
তাই, বিফল চিন্তার অন্ধ আবেগে
ঘুরিয়া মরি,
ওগো, বিকল চিত্ত মাঝারে তোমারে
কেমনে বরি ?

তুমি কখন আকাশে, কখন পাতালে
কভু জ্বল তুমি অরুণের ভালে,
নাচ গঙ্গার মাঝে বজ্রের তালে
অয়ি, অব্যক্ত আনন্দময়ি,
তুমি এস মম হৃদে
তোমার প্রসাদে
হইব পৃথিবীজয়ী।
আমার আঁধার হৃদয় আলো-করা ধন,
এই অনাথ বাঞ্ছিত-দুর্লভ-রতন,
ভরি থাক দেবি এ মরুজীবন
আমি অজর, অমর হই ;
আমি জগৎ ভুলিয়ে তব প্রেমসুধা
অঞ্জলীপুরে লই।

পাখী যবে গাছে গান করে সুখে
মেলিয়ে পুলকে পাখা
প্রভাতের কালে, উষার আলোকে
কাঁপায়ে তরুর শাখা,
অথবা সন্ধ্যায় গগনের কোলে
দেখি জলদেরে বায়ুভরে দোলে
চিত্রিত চারু পাখাখানি মেলে
যবে রামধনু দেয় দেখা ;
আমি, তাহাদের মাঝে পাইগো দেখিতে
তব মুখখানি হাসিমাখা,
রমণীর মুখে, প্রকৃতির বুকে,
দেখি, তোমারই মাধুরী আঁকা।

তুমি রূপহীন রূপে বিশ্বের মাঝে
বিরাজিত দিন রাতি,
নিশীথ গগনে ধরে তারাগণে
তোমারই স্নিগ্ধ ভাতি ;
নিবিড় কৃষ্ণ তব কেশপাশ,
নিশার আঁধার করিছে প্রকাশ,
চন্দ্রে তোমার হাসির আভাস
চকোর-চিত্ত মাতি,
অঙ্গের তব সুরভি গন্ধ
বহে, চম্পক যূথি যাতি।

কোন কালে, দেবি, তব সাথে মম
হয়েছিল নাকি দেখা ?
পারনি ভুলিতে, এতকাল পরে
এসেছ আবার নারীরূপ ধ'রে,
নয়নে কৌতুক, মধুর অধরে
হাসির সরস রেখা,
বুঝি গো ও হাসি, জানি আঁখি কোণে
রয়েছে কি কথা লেখা।

যদি এসেছ, গো দেবি, যেয়োনাকো চলি,
গাও করুণ কোমলসুরে,
আমি, ব্যথিতের ব্যথা, আর্ত্তের গান,
টানিয়া আনিব ভরি মন প্রাণ,
করিব তোমারে উপহার দান,
দেখি যেয়োনাকো চলে দূরে
আমার চির সাধ ভেঙ্গে চূরে ;
শুধু, বিশ্বের সুধা, আকণ্ঠ পিয়াও
নিতি প্রীতি অঞ্জলী পুরে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শেষ দান।

মনে পড়ে সাধের সে গেহ,
—আহা কত সুখের আলয় ;—
ক্রমে ক্রমে সে দিন আসিল
যে দিনেতে না আসিলে নয়।
নয়নের নিবে গেল জ্যোতি
বয়নের হাসি গেল ঝরে' ;—
গৃহ ছাড়ি রহিতে হইবে
পরদেশে দীর্ঘকাল ধরে'।
স্নেহময়ী জননী আমার,
তাঁর পায়ে প্রণাম করিয়া
রাজপথে বাহির হইনু
আঁখিজলে নয়ন ভরিয়া।

শুকতারা তখনো ডোবেনি,
গাছপালা তখনো আঁধার ;
বেশী দূর আসি নাই আমি,—
শুনিলাম পদশব্দ কা'র।
দেখিলাম—পশ্চাতে জননী
আসিছেন কিসের লাগিয়া ;
কই ? কিছু, মনে ত পড়ে না,
এসেছি কি ফেলিয়া রাখিয়া ?

মা আমার কহিলেন—"বাছা
আপনার ইষ্টদেবতায়
যে ফুলেতে পূজা করিয়াছি,
সেই ফুল দিলাম তোমায়।
সাথে সাথে রাখিয়ো সর্ব্বদা,
অকুশল আসিবে না কাছে ;
পাপ দূরে পলাইয়া যাবে,
সে দেশেতে বড় ভয় আছে।"
সেই ফুল ধরিয়া হৃদয়ে
চলিলাম দীর্ঘপথ বাহি ;
আজিও তা রয়েছে হৃদয়ে,
নিশিদিন তারি পানে চাহি।

স্নেহময়ী প্রকৃতি-জননী
—ওগো মহা জননী আমার !
আসিয়াছি পৃথিবী প্রবাসে,
সাথে লয়ে সে ফুল তোমার।
ভাগ্যে মাতা দিয়েছিলে ইহা,
তাই ত মা রয়েছি বাঁচিয়া ;
এখানে যে শত্রু পদে পদে
ফিরিতেছে রাক্ষস সাজিয়া।
এ যে হেথা মরুভূমি মাগো,
সে আমার সুধা নির্ঝরিণী ;
এ যে মহা ব্যাধির নরকে
সে আমার মৃতসঞ্জীবনী।
মূর্ত্তিমতী বিবেকসুন্দরী
সে আমার এ পাপ নিলয়ে,
সে আমার সুখ, সে সন্তোষ,
সেই আশা, উৎসাহ হৃদয়ে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র।

আনন্দমঠ।—আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ভাব বিষয়ক উপন্যাস। গ্রন্থের বিষয় কিছু জটিল হইলেও গল্পাংশে বা চরিত্রে জটিলতা নাই। গ্রন্থের বিষয় নূতন এবং প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র তাহা নূতন ভাবে ব্যবহার করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু এই গ্রন্থে প্রতিভার ম্লানতা অনুভূত হয়—ইহাতে নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রভূত চেষ্টা সত্ত্বেও যেন বোধ হয়, যে জীবনব্যাপী গুরুতর পরিশ্রমে কর্ম্মক্লান্ত নানাবিষয়োদ্ভাবিনী প্রতিভা বিশ্রাম চাহিতেছে। যথন অশোক,

বকুল প্রভৃতি তরুরাজীর ঘনবিন্যস্ত পত্রাবরণে শতখণ্ডে বিভক্ত উষালোক উজ্জ্বলতর হইয়া, নদীতীরে শ্যামপুষ্পোপরিস্থ শিশিরবিন্দুর উপর জ্বলিতে আরম্ভ করে, তখন যেমন বিহগের প্রভাতী সঙ্গীতে একটু ক্লান্তির স্বর শ্রুত হয়,—আনন্দমঠেও সেইরূপ কিছু ক্লান্তির লক্ষণ দৃষ্ট হয়। উপমার পুনরাবৃত্তি ও ভাবের পুনরাবৃত্তি এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। হয়ত ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভূত পর্য্যবেক্ষণের অভাব হইতে উৎপন্ন। যাঁহারা বহু ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ইংরাজী ঔপন্যাসিক এক একটা অধ্যায় রচনায় কত চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণের পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু এই ম্লানতার অন্য কারণও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—এই গ্রন্থ রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে যে অত্যুজ্জ্বল কিরণময় ধর্ম্মচিন্তার উদয় লক্ষিত হয়, তাহার আলোকে অন্য চিন্তার উজ্জ্বল কিরণও ম্লান পরিদৃষ্ট হওয়া বিস্ময়কর নহে। এই ধর্ম্মচিন্তার বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম গ্রন্থদ্বয়ে।

এই গ্রন্থান্তর্গত প্রধান চরিত্র, শান্তি ও জীবানন্দ, কল্যাণী ও মহেন্দ্র, ভবানন্দ এবং সত্যানন্দ।

আনন্দমঠের সকল চরিত্রই অল্পাধিক পরিমাণে রহস্যকুহেলিকাচ্ছন্ন। তাহার কারণ, আমরা সম্পূর্ণরূপে কাহাকেও দেখিতে পাই না। মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় সকলকে অল্পক্ষণের জন্য দেখিতে পাই, যতটুকু দেখিতে পাই, তাহাতে সেই অন্ধকার-চিত্রপটে তাঁহাদিগের উজ্জ্বলতা অনুভূত হইলেও, সে দর্শন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। আনন্দমঠে তাঁহারা যতক্ষণ এবং আনন্দমঠে তাঁহাদিগের যতটুকু, আমরা প্রায় কেবল ততক্ষণ তাঁহাদিগের ততটুকু মাত্র দেখিতে পাই। শান্তিরও প্রায় তাহাই। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণ সকলে শান্তির জীবন আরও রহস্যাবৃত ছিল—পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রথম জীবনের একটা ইতিহাস দিয়াছেন। তাহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে এমন মনে হয় না। বরং এখানে বলিয়া রাখি যে, পরবর্ত্তী সংস্করণে, গ্রন্থে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে শান্তি-চরিত্রের মাধুরী একটু বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে। শান্তিচরিত্র আদ্যোপান্ত বিস্ময়কর—অদ্ভুত। অতি শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া শান্তি পিতার ছাত্রদিগের সহিত মিশিয়া কতকটা পুরুষভাবাপন্না হইয়াছিল;—ব্যাঘ্র সহবাসে থাকিয়া মানবশিশু ব্যাঘ্র ভাবাপন্ন হয়, শান্তির পুরুষ ভাবাপন্ন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বিবাহের পর

সেই বন্ধনবিরোধিনী বালিকার গৃহত্যাগ ও তাহার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। বন্ধনবিরোধিনী বালিকার হৃদয়ে প্রেমোদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক—বিশেষ শান্তি যখন সন্ন্যাসী সাজিয়া পলাইতে পারিয়াছিল, তখন আর শান্তি শিশু নহে। * কিন্তু শান্তি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত দেশে দেশে ঘুরিয়া, শেষে অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনে পতির নিকট ফিরিয়া আসিল। বিবাহের পর প্রেমের ভার প্রজাপতির উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াই পুষ্পধন্বার উচিত; কারণ বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর প্রেমে যে পবিত্রভাব থাকে, বিবাহের পূর্ব্বে তাহা থাকে না। গ্র্যাণ্ট অ্যালেনের The Woman who did এর কার্য্যে পরিণত হইবার সময় যে এখনও আইসে নাই, তাহা নিশ্চিত। গৃহে ফিরিয়া জীবানন্দকে দেখিয়া শান্তি ভাবিল :—

> "শিখে' পুরুষের বিদ্যা, পরে' পুরুষের
> বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এত দিন
> ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
> আপনাতে আপনি অটল মূর্ত্তি হেরি'
> সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে নারী
> আমি।"

সেই সাক্ষাতের সময় উভয়েই মনে করিল :—

> সুগভীর কলধ্বনিময়
> এ বিশ্বের রহস্য আকুল;
> মাঝে তুমি শতদল ফুটে ছিলে ঢল ঢল
> তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

তাহার পর গৃহত্যাগী সন্তান-সম্প্রদায়ভুক্ত জীবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইতে শান্তির জীবন অদ্ভুত। তাহার সন্তান-সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদিগকে সাহস প্রদান করা, লিণ্ডনের অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করা—সকলই অদ্ভুত। শান্তির এই রঙ্গাঙ্গনা বেশে অশ্বারোহণের অদ্ভুতত্ব বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গীতিকবি বাবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেন, "ধুতি চাদর পরিয়া ঘোড়ায় চড়ার হাস্যকরত্ব সম্বন্ধে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই এবং বোধ

---

* শ্রদ্ধেয় বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "সমাপ্তি" নামক গল্পে এইরূপ একটি বন্ধন-বিরোধিনী বালিকার হৃদয়ে প্রেমোদ্রেক সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক।

হয় কাহারও নাই। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার অপেক্ষাও হাস্যকর ব্যাপার 'শান্তি' নাম্নী বীরবঙ্গনারীর সাড়ী পরিয়া অশ্বারোহণ ও মলের গুঁতা দিয়া অশ্ব পরিচালনার কিম্ভূতত্ব বঙ্কিম বাবুর ন্যায় এক জন সুনিপুণ সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞ 'আর্টিষ্টে'র হৃদয়ঙ্গম হইল না। মলের গুঁতায় অশ্ব চলিতে পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালী রমণীর মত (বেসেলাই) সাড়ি পরিয়া পুরুষের মত করিয়া দুই দিকে পা ঝোলাইয়া ঘোড়ায় চড়া ও সাড়ি পরিধানের সার্থকতা রাখা কিরূপে সম্ভব, তাহা আমার চক্ষুর ও মনেরও অগোচর। এই সব কল্পনা উক্ত গ্রন্থকারের শেষ বয়সে বিকৃত মস্তিষ্কের চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।" * কেবল শেষকালে যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন সকল ভুলিয়া শান্তি, "সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, তখনই শান্তি প্রকৃত শান্তি। সত্যই তারকাকুন্তলা সন্ধ্যার স্বচ্ছান্ধকারময় গগনে যেমন উষালোক ভাল লাগে না, তেমনই শান্তির চরিত্রে এই কঠোর বীরভাব ভাল লাগে না। শান্তিচরিত্র আমাদিগের ভাল লাগে না, তাহার কারণ প্রচলিত আচার ও ব্যবহার ফলে যে সকল ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, সে সকলের আঘাত-সহনীয়তার একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রান্ত হইলেই গোল বাধে। দেশকালপাত্রভেদে আবার সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতায় আমরা এখন কতকাংশে অভ্যস্থ হইলেও কাশীদাসের সুভদ্রার অনুকরণে সূর্য্যমুখীর গাড়ী হাঁকানটা অনেকের ভাল লাগে না। বর্ত্তমান সময়ের একটা দৃষ্টান্ত লইলে কথাটা পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার সুবিধা হইতে পারে। ইংলণ্ডে রমণীর অধিকার সম্বন্ধীয় শত বাদ প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে নরনারীর আবির্ভাবে ইংরাজী সাহিত্য এখন কলুষিত, যে নরনারীর প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে ইংলণ্ডে বিবাহ-প্রথা যদি বিলুপ্ত না হয়, তবে কেবল দীর্ঘকেশশালী পুরুষগণ হ্রস্বকেশশালিনী রমণীগণকে বিবাহ করিবে, আর রমণীগণ ফুটবল খেলিয়া, দ্বিচক্ররথ চালাইয়া কাল কাটাইবে এবং সভাস্থলে সমবেত হইয়া তীব্র ও কদর্য্য ভাষায় সন্তানের জন্মের অনাবশ্যকতা এবং অন্যায় ভাব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে, ইংলণ্ডে সেই নরনারী এখনও ঘৃণিত। শান্তি, আমাদিগের বহুকালের ধারণা এবং প্রচলিত আচার নিষ্ঠুর ঘৃণার চক্ষে দেখে বলিয়াই আমাদিগের নিকট তাহার চরিত্রের মাধুরী রক্ষিত হয় না। এই বিস্ময়কর চরিত্রে একমাত্র সুন্দরভাব—প্রেম।

* ভারতী—চৈত্র ১৩০২।

প্রেমহীন মানব-হৃদয় সাগরমধ্যস্থ পাদপহীন, জীববাসের অযোগ্য মরুময় দ্বীপের সহিত তুলনীয়। প্রেমহীন নারীচরিত্র আমরা দেখিতে পারি না, তাই আজকালকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Benson সৃজিত Dodo চরিত্র বা Iotaর A yellow Aster নামক গ্রন্থে Gwer এর চরিত্রের প্রথমাংশ রাক্ষসীর চরিত্র বলিয়া বোধ হয়। রমণীর প্রেমই রমণীর মাধুরী, সৌন্দর্য্য, কোমলতা, সর্ব্বস্ব। ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—

"Man's love is of man's life a thing apart,
'Tis woman's whole existence."

কুরুক্ষেত্রের কবি বলিয়াছেন, "রমণীর প্রেম আহা, রমণীর প্রাণ।" অস্মদ্দেশীয় কোনও গীতিকবি আরও উচ্চে উঠিয়া বলিয়াছেন ;—

"প্রণয় রমণী জীবন,
ইহকাল পরকাল।"

যখন শান্তি সত্যানন্দকে বলিল, "আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব ;" যখন সে বলিল, "ইহলোকে স্ত্রীর পতিসেবা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা— আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড় ;" তখন সে সত্যসত্যই তেজো-গর্ব্বিতা বঙ্গরমণী। আবার যখন সে জীবানন্দকে বলিল, "তুমি আমায় ভাল বাস, আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে !" তখন সে সত্য সত্যই রমণী। তাহার হৃদয়ে এই প্রেম আছে বলিয়াই বিচিত্রচরিত্রা সন্ন্যাসিনীর সুখ দুঃখের কথা আমরা শুনিতে পারি। তাহার হৃদয়ে এই প্রণয় না থাকিলে শান্তি এই বীর্য্য সত্ত্বেও কোনরূপেই আমাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিত না।

"নির্ব্বাপিত-অরুণ-লাবণ্য-লেখা
ঊষার মতন যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে' থাকে ;
বীর্য্য-শৈল-শৃঙ্গ-'পরে নিত্য একাকিনী"

সেই প্রেমহীনার চিত্র আমাদিগের ভাল লাগে না।

জীবানন্দ অসাধারণ চরিত্র নহে। যে দিন জীবানন্দ সমাজের ভয়ে বিবাহিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই, সেই দিন তাঁহার

মানসিক বলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহার পর আর সে কর্ত্তব্য-পরায়ণ নহে। সন্তানসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া সে শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চলিয়া গেল, তাহার "রমণীতে নাহি সাধ" সত্য নহে। পতি হইয়া—পত্নীত্যাগী পতি হইয়া—কোন্ মুখে জীবানন্দ শান্তিকে বলিল, "তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই।" !! পতি-দর্শন-সুখও যে রমণীর ভাগ্যে নাই, সে কি খাইলে পরিলেই সুখী হয়? মূর্খ জীবানন্দ তখনও পত্নীকে চিনে নাই, পত্নী যে পতির সকল কার্য্যে সহায় তাহা বুঝে নাই। সত্যই "নারী জানা, মণি কেনা দুর্ঘট ঘটনা।" তবে তাহার মনে তখনও ভালবাসা ছিল, নহিলে সে কাঁদিত না। তাহার পর তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শান্তি তাহার প্রেম বর্দ্ধিত করিয়াছিল; নহিলে যখন "সন্তান"গণকে উৎসাহিত করিবার সময় সহসা ইংরাজের বজ্রনাদী কামানের শব্দ শুনিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "Arm! Arm! it is —it is the cannon's opening roar!" তখন জীবানন্দ কাতর দৃষ্টিতে পার্শ্বস্থিতা পত্নীর দিকে চাহিত না। জীবানন্দের সাহস ছিল; হৃদয়ে বলও ছিল, নহিলে সে শত্রুনাশ ও আত্ম জীবননাশোদ্যোগ করিতে পারিত না। জীবানন্দের দোষও ছিল, গুণও ছিল।

কল্যাণী কয়বার মাত্র পাঠককে দেখা দিয়াছেন। তাঁহার সেই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যদীপ্তগগনে মেঘচ্ছায়ার ন্যায় বিষাদময় হৃদয়ের দৃঢ়তার মাত্র পরিচয় পাইয়াছি। দুইবার সে দৃঢ়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়—একবার যখন তিনি বিষপান করিয়াছিলেন—আর একবার যখন তিনি ভবানন্দকে বলিয়াছিলেন—"(তোমাকে) ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।" (পাঠক! ইহার সহিত অমরনাথের প্রতি লবঙ্গলতার কথা তুলনা করুন।) কিন্তু কল্যাণীকে দূর করিবার জন্য সেই স্বপ্নের আবির্ভাব কেন? কল্যাণীকে ওরূপে দূর করা কি নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল? কল্যাণী ভাবিয়াছিলেন যে ছোট ছোট ধর্ম্মে স্ত্রী স্বামীর সহায়; কিন্তু বড় বড় ধর্ম্মে কণ্টক। গ্রন্থ-কারও বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়।" বলিতে ক্ষতি নাই যে আমরা এখনও বুঝি নাই বাঙ্গালীর স্ত্রী কেন অনেক সময় বাঙ্গালীর প্রধান সহায় নহে। কল্যাণী বলিয়াছেন, "যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে?" আমরা বলি পত্নীকে যদি কলসী বলি-

তেই হয়, বল; কিন্তু কাদাপোরা বলিও না, কলসীটা লইয়া হয়ত সময় সময় একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়, কিন্তু সংসারসমুদ্রে সাঁতার দিতে সেই কলসীর মত সহায় আর নাই। গ্যারিবল্ডীর পার্শ্বে অ্যানিটা, অর্জ্জুনের পার্শ্বে দ্রৌপদী না থাকিলে বীরগণের বাহুতে অতিশক্তি হয়ত সঞ্চারিত হইত না। পত্নীর সাহায্য—অন্ততঃ সহানুভূতি পাইলে অনেক প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত না। আমরা হীন, তাই মনে করি "Woman is the lesser man!" আশ্চর্য্যের বিষয় যে মহাভারতে দেখিয়াছি "কামিনীদিগের নিকট, বিবাহ স্থলে এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলেও পাতক নাই।" (দ্রোণপর্ব্ব)। আবার স্ত্রীর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে। (শান্তিপর্ব্ব)। প্রকৃত প্রস্তাবে "ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, পরমবন্ধু এবং ত্রিবর্গ লাভের মূল কারণ। ভার্য্যাবান লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়; ভার্য্যাবান লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভার্য্যাবান লোকেরাই সর্ব্বদা সুখী হয় এবং ভার্য্যাবান লোকেরাই সৌভাগ্য-সম্পন্ন হয়। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতাস্বরূপ, আর্ত্তব্যক্তির জননীস্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রামস্থান স্বরূপ।" (আদিপর্ব্ব)। শান্তি সত্যানন্দকে বুঝাইয়াছিলেন যে সে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতেই আসিয়াছিল। সে বলিয়াছে "অর্জ্জুন যখন যাদবীসেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিল, কে তাহার রথ চালাইয়াছিল? * দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?

শান্তি বলিয়াছে:—

"পুরুষের বামা বন্ধু, বামা মন্ত্রী তার,
বীরের একাই সেই সহায় রমণী।"

মহেন্দ্রের হৃদয়ের বল তেমন অধিক নহে। তাহা অধিক হইলে সে অত সহজে সন্তান সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে সম্মত হইত না। যে সম্প্রদায়ের

* সুভদ্রার রথ চালানার কথার উল্লেখ "বিষবৃক্ষেও" পাইয়াছি। কিন্তু মূল মহাভারতে তাহা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আপান 'কৃষ্ণচরিত্রে বলিয়াছেন—অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সুভদ্রা তাঁহার সারথী হইয়া গগনমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিলেন—এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সৃষ্টি কি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কথকদিগের সৃষ্টি, তাহা বলা যায় না।" (২২৫ পৃষ্ঠা)। তবে শান্তির মুখে কথকের কথা বা কাশীদাসের কথাই শোভা পায়। লেখক।

জন্ম সে কল্যাণীকে হারাইয়াছে, সহজে সে সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে চাহিত না।

ভবানন্দের গ্রন্থ মধ্যে বিশেষ উপযোগিতা নাই। তবে বিচিত্র সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু বিরহমিলনময় গৃহ, চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন শিশুর হাস্য, সংসারের সুখ হৃদয়ের বন্ধন পত্নী, সকল হইতে দূরে আসিয়া মানবকে প্রকৃতির বিরোধী কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে তাহার অধঃপতন যে সহজেই হয় এই চরিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা যেরূপে ভবানন্দকে পাইয়াছি, তাহাতে তাহার "Every inch that is not fool is rogue." কল্যাণী সম্বন্ধে তাহার—

"But to see her was to love her,
Love but her, and love for ever."

কিন্তু তাই বলিয়া এই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর এই চিত্তচাঞ্চল্য, এই বাসনা-নিবৃত্তি-ক্ষমতাভাব নিতান্ত অমার্জ্জনীয়। জীবানন্দ যখন "বন্দেমাতরম্" গাহিতে গাহিতে প্রাণত্যাগ করিল; তখন গ্রন্থকার বলিলেন, "হায়! রমণী রূপলাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্।" বহুকাল হইতে,—

"The light that lies
In woman's eyes"

সংসারে নানা অনর্থের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। সীতার রূপানলে রক্ষোরাজের,—

"কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলি-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম"

সুন্দরীপুরী, বিরাটবংশ, বিচিত্রবল, সকলই ভস্মীভূত, হেলেনের রূপ বহ্নিতে ট্রয় ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু আমরা কাহাকে ধিক্কার দিব—রমণীরূপ-লাবণ্যকে না পুরুষের মনকে! শোভাময়ী প্রকৃতির অনন্ত শোভার মধ্যে রমণীও এক শোভা, কিন্তু পুরুষ সংযত এবং কর্ত্তব্যবোধী হইলে তাহা হইতে কুফল উৎপত্তির কোনই সম্ভাবনা থাকে না। পুরুষ সকল সময় বুঝে না,

"যে বিদ্যুৎ ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।"

আমরা বলি পুরুষের আত্মসংযম চেষ্টাভাব, তোমাকেই ধিক্।

ভবানন্দের সম্বন্ধে কেবল বলিবার আছে:—

"Nothing in his life
Became him, like the leaving it."

সত্যানন্দ ও সন্তান-সম্প্রদায় বড় বিজড়িত। সত্যানন্দের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে; কিন্তু তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। যখন "মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" তখন জনকতক লোকের পক্ষে দলবদ্ধ হইয়া গোটাকতক তিতুমিরের লড়াই ফতে করা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু যে সম্প্রদায় মানবকে সকল সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যের সার প্রেম হইতে দূরে রাখে, যে সম্প্রদায় পতিকে পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য, পিতাকে সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতে বলে সে সম্প্রদায় স্থায়ী হইতে পারে না। "পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ"? সন্তান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোন্মত্ততা ছিল না। ধর্ম্মোন্মত্ততায় মানব যাহা করিতে পারে, তাহা আর কিছুর জন্য করিতে পারে না। ক্রিশ্চিয়ানের ক্রুসেড, মুসলমানের দিগ্বিজয় তাহার পরিচয়। যখন মুসলমান "করালকৃপাণ মুখে ধর্ম্মের বিস্তার" করিতে অগ্রসর হইয়া বাহুবলে প্রাচীন ভূভাগ কম্পিত করিয়াছিল,—যখন মুসলমান রোমনগরীতে সেণ্টপিটার্সের বেদীর উপর আপনার তুরঙ্গকে ওট ভোজন করাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তখন সে কেবল ধর্ম্মোন্মত্ততায় তাহা করিয়াছিল। মুসলমানের যে অসীম বলশালী নিষ্ঠুরতার অনলশিখা এখনও অতীতের অন্ধকার মধ্যে দেদীপ্যমান তাহা এই ধর্ম্মোন্মাদ হইতেই উদ্ভূত। এই ধর্ম্মোন্মত্ততা থাকিলে সন্তানসম্প্রদায় অত সহজে বাত্যামুখে শুষ্কবৃক্ষের পত্রের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইত না। সন্তান সম্প্রদায়ের বল ছিল না।

দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, দেবীচৌধুরাণী বা আনন্দমঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে আনন্দমঠের আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। (সন্ন্যাসীবিদ্রোহের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠক পরিশিষ্টে পাইবেন।) বিশেষ সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ঐতিহাসিক উপন্যাসের উত্তম ভিত্তিই নহে। তবে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ যদি মুসলমানের হস্ত হইতে ইংরাজের হস্তে এ দেশের শাসনভার অর্পণে কিছু সাহায্যও করিয়া থাকে তবে যে সন্ন্যাসীবিদ্রোহে এ দেশের প্রভূত উপকার হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আনন্দমঠের শেষ কথা—"বন্দেমাতরম্।" শ্রদ্ধেয় বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মিলে সব ভারতসন্তান" উহাতে একটি সুন্দর কোরাস থাকা প্রযুক্ত সভাস্থলে বা বৃহৎ বৃহৎ সমাগমে গীত হইবার বিশেষ উপযোগী। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে বঙ্গভাষায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র গেয় জাতীয় সঙ্গীত-গুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" এবং রবীন্দ্রবাবুর "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। "বন্দেমাতরম্" জননী জন্মভূমির পূজার পবিত্র মন্ত্র। কোনও সভাস্থলে একবার "বন্দেমাতরম্" গীত হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে যে ভাবময় হাস্য ফুটিতে দেখিয়াছিলাম আজিও তাহা ভুলিতে পারি নাই। "বন্দেমাতরম্"এর মত জাতীয় সঙ্গীত যে কোন ভাষাতেই হউক দুর্ল্লভ। এখন জাতীয় মহাসমিতির কৃপায় আমরা শিখিয়াছি ;—

"আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,—
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
　　পুণ্য-প্রেমের বাতাসে।"

আশা করি জাতীয় মহা সমিতিতে যে জাতীয় ভাব এখন পূর্ব্বাকাশে শুকতারা রূপে উদিত হইয়াছে, যখন তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে আমাদিগের জাতীয় জীবন উদ্ভাষিত হইবে, তখন গৃহে গৃহে গীত হইবে :—

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
　　ত্বং হি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
　　মন্দিরে মন্দিরে।"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সত্যধর্ম্ম ও সমাজ।

(৫)

আমি এযাবৎ ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে বিজ্ঞানই ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্ম বিজ্ঞানের চরম। যে ধর্ম্মের মূল বিজ্ঞানাবিষ্ট নহে, তাহাকে সত্যধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না; বিজ্ঞান জগৎকার্য্যের বিধান প্রকটন করিতেছে, অতএব যাহা বিজ্ঞানবিরোধী তাহা জগৎকার্য্যের বিধান-বিগর্হিত। আবার বিজ্ঞান প্রকৃতির কুটিল ক্রিয়াকলাপ হইতে সত্যোদ্ধার করিতেছে, অতএব যাহা বিজ্ঞান-বিরোধী তাহা সত্য নামে বাচ্য হইতে পারে না। এস্থলে কেহ হয়ত বলিবেন যে, বিজ্ঞান কি সমস্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে যে বিজ্ঞান যাহাকে সত্য বলিবে না, তাহা জগতে সত্য নামে বাচ্য হইতে পারিবে না? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে তাহাই বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইতেছে;—অতএব ইহা বুঝা যাইবে যে বিজ্ঞান যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতেছে না, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। এইরূপে দেখা যায় যে, সত্য যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয় তবে বিজ্ঞানই তাহার একমাত্র আশ্রয় এবং অবলম্বন। প্রথম প্রস্তাবে ইহা সূচিত হইয়াছে যে সত্যের সম্মাননা ও অসত্যের অবমাননাকে ধর্ম্ম কহা যায়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে—অসত্যের নির্ব্বাসন ও সত্যের অভিষেক বিজ্ঞানের কার্য্য। এ কারণ ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে সত্যধর্ম্মের মূল বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, এবং ধর্ম্ম অর্জ্জন ও সাধন বিষয়ে বিজ্ঞানই প্রকৃষ্ট উপায়।

যে সমাজে বিজ্ঞানচর্চ্চা বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, এবং বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের মূল ও ধর্ম্মকে বিজ্ঞানের চরম বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, অধিকন্তু যে সমাজে ঐরূপ বিজ্ঞানচর্চ্চাকে ধর্ম্মসাধনের সোপানরূপে পরিগণিত করা হয়, সেই সমাজে উপরোক্ত প্রকার বিজ্ঞান চর্চ্চার অবশ্যম্ভাবী ফল ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন।

পূর্ব্বে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমাজ গঠিত হইলেই তাহাতে "সংস্কার" জন্মাইতে আরম্ভ করে। যে সমাজে বিজ্ঞানকে ধর্ম্মসাধনের সোপান বলিয়া পরিগণিত করা হয়, সে সমাজে ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার বিজ্ঞান-মূলক হইয়া প্রতিভাত হয়, অতএব তাহা সত্যাশ্রিত সুসংস্কাররূপে জন্ম গ্রহণ

ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের নিকট এই মত এত পরিস্ফুটরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল যে জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ কবি জ্যোতিষকে ধর্ম্মার্থকাম ও যশোলাভের একমাত্র হেতু প্রতিপন্ন করিতে গিয়া এইরূপ গাহিয়াছিলেন :—

"তস্মাদ্দ্বিজৈরধ্যয়নীয়মেতৎ
পুণ্যং রহস্যং পরমঞ্চ তত্ত্বম্।
যো জ্যোতিষং বেত্তি নরঃ স সম্যগ্
ধর্ম্মার্থকামান্ লভতে যশশ্চ ॥"

তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক বিদ্যাই "বেদাঙ্গ" বলিয়া গণ্য হইত এবং প্রত্যেক জ্ঞানই ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়া অধীত হইত। নিদান, জ্যোতিষ, শব্দশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, উক্ত, নিরুক্ত যাহা কিছু বিদ্যা আছে, হিন্দুর নিকট সমস্তই ধর্ম্মসাধনের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগের প্রাচীন মতের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে;—এক আঘাতেই আমাদের শিক্ষাকে ধর্ম্মসাধন হইতে মূলতঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। আমাদের যাহা কিছু পূর্ব্বার্জ্জিত জরাজীর্ণ সংস্কার সম্বল ছিল, তাহা অবিদ্যা-সমাশ্রিত হইয়া ঘোরকৃষ্ণ কুসংস্কারে পরিণত হইয়া গিয়াছিল; এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণ সংস্কারবর্জ্জিত অসামাজিক সমাজের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া ফেলিয়াছে।

এক্ষণে আমাদের শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য লোপ পাইয়াছে এ কারণ আমাদের মধ্যে ধর্ম্মসংস্কার জন্মাইতে পারিতেছে না। ধর্ম্মবিষয়ে আমাদের পরস্পর মতের সমন্বয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, একারণ আমরা সমাজ গঠন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উপরন্তু বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সহিত আমাদের ধর্ম্মমতকে সম্মিলিত করিয়া পরস্পরের একীকরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, একারণ আমাদের ধর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। এইরূপ সময়ে এবং এবম্বিধ অবস্থাতে ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ সত্যধর্ম্মের প্রচারে ব্রতী;—এই ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" গ্রন্থে বলিয়াছেন, জগতে যাহা কিছু নূতন সত্য যে কোন সময়ে আবিষ্কৃত হইবে তাহা সমস্তই ব্রাহ্মধর্ম্মের মত এবং অঙ্গীভূত হইবে! এই মত ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিসর পর্য্যন্তদূর কত বিস্তৃত করিয়া দিতেছে এবং

ব্রাহ্মধর্ম্মকে কি পরিমাণে সত্য ও বিজ্ঞানমূলক ধর্ম্মের পদবীতে সমারূঢ় করিয়া দিতেছে, তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই চিন্তনীয়।

রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত সত্যধর্ম্মের সহিত তাহার বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, একারণ আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম আখ্যা প্রদান করিতে সাহসী হইতেছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এই মতকে সমর্থন এবং কার্য্যতঃ তাহাকে ধর্ম্মমতরূপে গ্রহণ করিতেছেন কি না, তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম-রূপে পরিগণিত না হয়, তবে জগতে তাহা কি পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ করিবে তাহাও বিবেচনাসাপেক্ষ। আমরা প্রথম প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজ নূতন সমাজ, একারণ তাহাতে এ পর্য্যন্ত সংস্কার জন্মাইতে পারে নাই। ব্রাহ্মসমাজে যে একেবারেই সংস্কার নাই তাহা অবশ্য বলা যায় না; কারণ অধিকাংশ ব্রাহ্মই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ হইতে সমাগত। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রকোপে তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার বহু পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও একে-বারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। যদি নূতন সমাজে আশু সংস্কার জন্মাইবার প্রয়াস না দেখা যায়, তবে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, অনতিবিলম্বে তাহাতে পূর্ব্ব সংস্কারের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করিবে। ইহা সমাজের পক্ষে শুভ কিম্বা অশুভকর তাহা সমাজের নেতাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত; এবং যখন যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিজ্ঞানই ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন। বিজ্ঞান বলিতে কেবল যন্ত্র-সমন্বিত শিক্ষা বুঝাইবে না; কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ ও তাহার কারণানুসন্ধানে মনোনিবেশ করাকেই বিজ্ঞানচর্চ্চা বলা যাইবে। এইরূপ চর্চ্চা ব্রাহ্মের ধর্ম্মসাধনের মুখ্যাঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থিতি এবং ক্রমোন্নতি যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, জ্ঞানার্জ্জনই ব্রাহ্মের পক্ষে প্রকৃষ্ট ধর্ম্মসাধন। ব্রাহ্মবালকবালিকাগণ বাল্যকাল হইতে মাতৃদুগ্ধের সহিত যেমন কুসংস্কার বর্জ্জিত মত সকল অন্তরস্থ করিতে শিক্ষা করিবে, তেমনই বিদ্যাশিক্ষাকে ঈশ্বরোপাসনার সোপান এবং মিথ্যাকথন, পরদ্রব্যাপহরণের ন্যায় বিদ্যার্জ্জনে অবহেলা ও জ্ঞানলাভে অরুচিকে পাপ-

কার্য্য বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা করিবে। প্রাচীন ঋষিকুমারগণ যেরূপ বেদাধ্যয়ন ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ মনে করিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকিতেন, ব্রাহ্মসন্তান সেইরূপ জ্ঞানার্জ্জনকে ধর্ম্মসাধনের মুখ্য সোপান বলিয়া গণ্য করিতে শিক্ষা করিবে। বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা হয়, তাহা ব্রাহ্মসন্তানের নিকট প্রকৃষ্ট ধর্ম্মশিক্ষা বলিয়া ধারণা হইবে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া ব্রাহ্মসন্তানের নিকট অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে।

বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মসন্তানের একটী বিশেষ শিক্ষা দরকার; তাহা বিজ্ঞানবিষয়ক। বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন এবং বিজ্ঞান চর্চ্চাতে তৎপর না হইলে ব্রাহ্মের সন্তান ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত হইবে না। ব্রাহ্মের নিকট বিজ্ঞান গ্রন্থগত বিদ্যা না হইয়া প্রত্যক্ষতঃ ধ্যান ও ধারণার বস্তু হইবে। এইরূপ জ্ঞানসাধনকে ব্রাহ্মের ধর্ম্মসাধনের মূলে প্রতিষ্ঠিত করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে সত্যধর্ম্মরূপে চিরজীবী হইয়া থাকিবে এবং ব্রাহ্মসমাজ জগতে আদর্শ সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আমাদের দেশে শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও জীবনের সমবায় নাই বলিয়া আমরা "বাপের ছেলে" খুব কম দেখিতে পাই। ইয়ুরোপে শিক্ষা ও জীবন ওতঃপ্রোত ভাবে সমন্বিত হইয়া যায় বলিয়াই তথায় এক ব্যক্তির সুশিক্ষার ফল তিন পুরুষেও মলিনতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঐরূপ শিক্ষার ফলে ডারুইনের পুত্রগণ সকলেই জগদ্বিখ্যাত ডারুইন; হর্শেলের বংশধরগণ সকলেই জগতে সত্যের প্রতিষ্ঠাতা ও আবিষ্কর্ত্তা; (এই বংশে মেয়ে পর্য্যন্ত জ্যোতিষিক আবিষ্ক্রিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন!)

অনেক পিতামাতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াই শিক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; অনেকে অপরের সন্তানের শিক্ষাতে অধিকতর নিবিষ্ট থাকিয়া আপন সন্তানকে অবহেলা করেন। সন্তানকে জ্ঞানদান করা যে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মানুশাসিত কার্য্য তাহা ভাবেন না। অনেকে আবার কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য যত অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, তাহার অংশবিশেষ পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষাতে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত,—কারণ তখন তাঁহাদের অর্থাভাব মনে উদয় হয়। ইঁহারা এইটী ভাবেন না যে কন্যার বিবাহদান পিতামাতার যত অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, শিক্ষাদান তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক কর্ত্তব্য। ইহার একমাত্র কারণ সমাজে এখনও জ্ঞান ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ-বিরোধ। প্রত্যেক পিতামাতা ইহা স্মরণ রাখিবেন যে সন্তানের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্মকাল হইতে তাহার জ্ঞানার্জ্জনের দায় অধিক পরিমাণেই পিতামাতার উপর নির্ভর করে। ব্রাহ্মসমাজে যে পর্য্যন্ত জ্ঞানার্জ্জন ও বিজ্ঞানচর্চ্চা ধর্ম্মসাধনের মূল বলিয়া গণ্য না হইবে এবং সন্তানদিগকে জ্ঞানদান পিতামাতার ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত বলিয়া ধারণা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতি সুদূরপরাহত।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

প্রতিবাদ।

"দাসী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় যে "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়কৃত "রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

উমেশ বাবুর কথার অসত্যতা প্রমাণার্থ অঘোর বাবু সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছেন যে "নগেন্দ্র বাবু সবিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছেন," কিন্তু কিরূপ অনুসন্ধান তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে অঘোর বাবু নগেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে তো বোধ হয় যে, সেই গ্রামস্থ বৃদ্ধগণের মুখে শুনা কথাই অনুসন্ধানে জানা কথা। কারণ এতদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা সেই মহাত্মার জীবনের বিষয় অবগত হওয়া অসম্ভব। অতএব আমার বিবেচনায় বৃদ্ধদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান। কিন্তু আবার অঘোর বাবুর বিশ্বাস দেখিতেছি বিপরীতরূপ। তাঁহার মতে 'বৃদ্ধদিগের কথা বিশ্বাস্য নহে,' কেন তাহা বলিতে পারি না। অবশ্য বৃদ্ধেরা সামান্য বিষয়কে গুরুতর করিয়া তুলে, কিন্তু তাহার মূলে যে সত্য আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রায় ও বটব্যাল বংশে যে পূর্ব্ব হইতেই বিবাদ ছিল, তাহা অঘোর বাবুও স্বীকার করিবেন ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার যে সেই বিবাদের পুনরারম্ভের কারণ তাহাও সম্ভব, ও বোধ হয় তাহারই প্রতিশোধ স্বরূপ রামজয় রামমোহনের উপর অত্যাচারের সূত্রপাত করে। কিন্তু এই সামান্য অত্যাচার হইতে কথাটি বাড়াইয়া বাড়াইয়া বৃদ্ধগণ ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে ও বোধ হয় সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া নগেন্দ্র বাবু সেই ভীষণ অত্যাচারের কথা লিখিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু যদি এতভিন্ন কোন কথার উপর নির্ভর করিয়া এই কথা লিখিয়া থাকেন ও তাহার সত্যতা যদি প্রমাণ করিতে পারেন, তবে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক "দাসী" বা "সাহিত্য" পত্রিকায় আমার কথার প্রতিবাদ করেন।

অঘোর বাবু একস্থানে বলিয়াছেন যে রামজয় বোধ হয় মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছিল ও রামমোহন কোন যত্ন করেন নাই তাই বাদী ডিগ্রী পাইয়াছিলেন। হঠাৎ মোকদ্দমা মিথ্যা প্রমাণ করিতে প্রয়াস করা নির্বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে। তিনি রামমোহনের চরিত্র সমর্থন করিতে গিয়া কি সকলকেই নিতান্ত হীন বলিয়া জ্ঞান করেন? তিনি কি বিশ্বাস করেন না যে চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে? তিনি কি নগেন্দ্র বাবুর ভুলে বিশ্বাস করেন না? তাঁহার কি জ্ঞান নাই যে "Even Homer sometimes nods?"

অন্যত্র অঘোর বাবু মোকদ্দমার কথা মিথ্যা সপ্রমাণ করিবার জন্য উমেশ বাবুর প্রকাশিত মোহরযুক্ত ফয়সলার নকল মিথ্যা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রামমোহন রায় সিলেক্ট কমিটিতে যে যে উত্তর

দিয়াছেন, তদ্দারা সেই ফয়সলার নকল মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করায় তিনি হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। সেই উত্তরের প্রথমটি হইতে আমরা জানিতে পাই যে "Generally তাঁহারা পারস্য ভাষায় জমানবন্দী লিখেন" Generally শব্দ হইতেতো আমরা সাধারণতঃ বুঝি; অঘোর বাবুর মত পোষণার্থ কি "সর্ব্বতঃ" বুঝিতে হইবে? আবার এক স্থানে আছে যে "Some of the judges" এস্থানে Some অর্থ কি "সমস্ত" বুঝিতে হইবে? অঘোর বাবু নিশ্চয়ই "generally অর্থে "সর্ব্বতঃ" ও "Some" অর্থে "সমস্ত" বুঝিয়াছেন, নতুবা এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি উমেশ বাবুর মোহরযুক্ত ফয়সলার নকল মিথ্যা বলিবেন কেন? অঘোর বাবুর প্রমাণের কাছে ইংরেজী ভাষা হারি মানিল।

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে কোন কোন স্থানে বাঙ্গালা ভাষায় জমানবন্দী লওয়া হইত, কিন্তু বোধ হয় সেই জমানবন্দীর পারস্য অনুবাদ সদর আদালতে প্রেরিত হইত। যাহা হউক উমেশ বাবুর ফয়সলার নকল যে মিথ্যা নহে, হুগলী আদালতের মোহর হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। মোকদ্দমা যে মিথ্যা নহে, তাহাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কিন্তু মহাত্মা যে এ বিষয়ে কতদূর দোষী তাহা বলা যায় না। কারণ অঘোর বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন যে "মহাত্মা" এই সময়ে কলিকাতায় বাস করিতেন ও হয়ত তাঁহার কর্ম্মচারিগণ রামজয়ের অত্যাচারের প্রতিশোধার্থ তাহার বাড়ী লুট তরাজ করিয়াছিল। এই হেতু মোকদ্দমা হয় ও মহাত্মা সত্যের পোষণার্থ সেই মোকদ্দমায় হস্তার্পণ না করায় রামজয় ডিক্রি পায়।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে উভয় পক্ষের কেহই কাহারও প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু এক গ্রামে দুইজন প্রধান লোকে যেরূপ বিবাদ সম্ভব, তাহাই হইয়াছিল। ইহা বাড়াইয়া যেরূপ কথা করা হইয়াছে, তাহাতে রামমোহনের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় লোকদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ হওয়ার অসম্ভাবিতা নাই।

আর এক কথা, অঘোর বাবু পরিশেষে উমেশ বাবুকে যেরূপ বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিতান্ত অন্যায়; কারণ, তিনি যেন Helpsএর কথা মনে রাখেন যে,—

"Another rule for living happily with others is to avoid stock subjects of disputations, for he adds "there is a tendency in all minor disputes to drift down to it."

এই কথাটি মনে করিয়া তাঁহার উমেশ বাবুর পূর্ব্বের কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করা উচিত ছিল না ও যদিও Helps এই কথাটি এক সংসারবাসী মনুষ্যকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, তথাপি আমার মতে এই নিয়ম সমস্ত পৃথিবীর জনগণের মধ্যে প্রচলিত হওয়া উচিত। আর অঘোরবাবু যে বলিয়াছেন উমেশ বাবু বটব্যাল বলিয়া এইরূপ বলিয়াছেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ তাঁহার লিখনভঙ্গী দর্শনেই বোধ হয়, তাঁহার এরূপ লিখিবার কারণ এই যে তিনি অতিরঞ্জনের পক্ষপাতী নহেন। শ্রীনরেশচন্দ্র সেন।

প্রতিবাদের উত্তর।

প্রতিবাদকারী আসল কথার কোন উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই। অপিচ প্রকারান্তরে স্বীকারই করিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার যে সেই বিবাদের পুনরারম্ভের কারণ তাহাও সম্ভব, ও বোধ হয়, তাহারই প্রতিশোধ স্বরূপ রামজয় রামমোহনের উপর অত্যাচারের সূত্রপাত করে।" কিন্তু শ্রীযুক্ত উমেশ বাবুর ধারণা এই যে, "প্রকৃতপক্ষে রামজয় রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক, রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।" (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩ জ্যৈষ্ঠ)। রামজয়ের সহিত রামমোহনের বৈষয়িক বিবাদের কথা আমি অস্বীকার করি নাই। আমি লিখিয়াছিলাম যে, "রামকান্ত রায়ের সহিত রামজয় বটব্যালের বিবাদের কথা সত্য বলিয়া অবধারণ করিলেও, রামজয় বটব্যাল যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উপলক্ষে রামমোহনের প্রতি কথিত প্রকার অত্যাচার করেন নাই, একথা সপ্রমাণ হয় না। অপিচ, এই উপলক্ষে রামমোহন রায়ের প্রতি উৎপীড়ন করিয়া রামজয় বটব্যাল যে রামকান্ত রায়ের সহিত শত্রুতার প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,একথাও বলা যাইতে পারে।" উমেশ বাবু রামজয়কে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামমোহনের মস্তকেই সমস্ত অপরাধ সংস্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, "রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।" উমেশ বাবুর এই একদেশদর্শিতা দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া আমি মে মাসের দাসীতে প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে, নরেশ বাবু উমেশ বাবুকে সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়া প্রকারান্তরে আমাকেই সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং নরেশ বাবুর সমর্থন সম্বন্ধে উমেশ বাবু বলিতে পারেন, "Save me from my friends !"

নগেন্দ্র বাবু গৃহে বসিয়া কল্পনা করিয়া রামমোহনের প্রতি রামজয়ের ভীষণ অত্যাচারের উল্লেখ করেন নাই। উমেশ বাবুর ন্যায় তিনিও "স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে" এবং রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও তাঁহার সহিত সংস্পৃষ্ট বহু লোকের মুখে অবগত হইয়াই লিখিয়াছেন। তবে উমেশ বাবুর একথা যথার্থ যে, নগেন্দ্র বাবু অমর্য্যাদার সহিত রামজয়ের নামোল্লেখ করিয়া ভাল করেন নাই। নগেন্দ্র বাবুর "রামমোহন রায়ের জীবন চরিত" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। আশা করি তিনি স্বীয় গ্রন্থে এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিবেন।

উমেশ বাবুর কথিত ফয়সালা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মোহরযুক্ত ফয়সালার নকল উমেশ বাবু প্রকাশিত করেন নাই। ফয়সালার যে অংশ তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। নরেশ বাবুর মতে "কোন কোন স্থানে বাঙ্গলা ভাষায় জমানবন্দী (?) লওয়া হইত কিন্তু বোধ হয় সেই জমানবন্দীর পারস্য অনুবাদ সদর আদালতে প্রেরিত হইত।" "বোধ হয়" রূপ অকাট্যযুক্তির সাহায্যে নরেশ বাবু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নরেশ বাবু বোধ হয় আদালতের কার্য্য-

প্রণালীর সহিত সুপরিচিত নহেন, নতুবা জবানবন্দী ও ফয়সালাকে এক মনে করিতেন না। সদর আদালতে পারস্য অনুবাদ থাকার কথা প্রতিবাদকারী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং উমেশ বাবুও লিখিয়াছেন, "এই মকদ্দমায় জজ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে বাদী ডিক্রী পাইয়াছিলেন।" সুতরাং নরেশ বাবুর কথানুসারেই আমি বলিতেছি যে সদর দেওয়ানী আদালতের পারস্য ভাষায় লিখিত ফয়সালার নকল উপস্থিত করা আবশ্যক। সিলেক্ট কমিটীতে রামমোহন রায়ের সাক্ষ্যের বাঙ্গালা অনুবাদ আমি প্রকাশিত করি নাই, সুতরাং generally শব্দের অর্থ লইয়া বিদ্যা প্রকাশ করার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। সেই সময়ে পারসী যে "Court language ছিল, তাহাই প্রতিপাদন করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। নরেশ বাবু বলিতেছেন, ইহা "হইতে আমরা জানিতে পাই যে, generally তাঁহারা পারস্য ভাষায় জমানবন্দী লিখেন।" Proceedings of the courts বলিলে কেবল জবানবন্দী বুঝায় না। নরেশ বাবু ইহা স্মরণ করিবেন।

নরেশ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন, "মোকদ্দমা যে মিথ্যা নহে, একথাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে।" কি জন্য? রামজয় ডিক্রী পাইয়াছিলেন বলিয়া কি? প্রতিবাদ-প্রবন্ধে আমি এ কথার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় নরেশবাবু তাহার কিছুমাত্র উত্তর দিতে চেষ্টা করেন নাই।

নরেশ বাবুর প্রবন্ধের একটী স্থল পাঠ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম। আমি লিখিয়াছিলাম "রাজা রামমোহন রায় এই সময়ে বিষয়ব্যাপার হইতে এক প্রকার অবসর লইয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনি এই মোকদ্দমার বিষয়ে মনোযোগ না করায় কর্ম্মচারিগণের তদ্বিরের ত্রুটিতেই বোধ হয় এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারেন নাই।" কিন্তু নরেশ বাবু লিখিতেছেন—"অঘোর বাবু একস্থানে বলিয়াছেন যে মহাত্মা এই সময়ে কলিকাতায় বাস করিতেন ও হয়ত তাঁহার কর্ম্মচারিগণ রামজয়ের অত্যাচারের প্রতিশোধার্থ তাহার বাড়ী লুটতরাজ করিয়াছিল। এই হেতু মোকদ্দমা হয় ও মহাত্মা সত্যের পোষণার্থ সেই মোকদ্দমায় হস্তার্পণ না করায় রামজয় ডিগ্রি পায়।" নরেশবাবু আমার উক্তি বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণ দেখিবেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নরেশ বাবু কি এই প্রকারে সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পাঠকসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

নরেশ বাবু পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, "আমার বক্তব্য এই যে উভয় পক্ষের কেহই কাহারও প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন নাই। ইত্যাদি।" সুতরাং উমেশ বাবুর এই কথাটি অর্থাৎ "প্রকৃত পক্ষে রামজয় রামমোহনের উপর উৎপাত করা দূরে থাকুক, রামমোহনই তাঁহার উপর উৎপাত করিয়াছিলেন।" এই কথাটি নরেশ বাবুই খণ্ডন করিতেছেন। অতএব উমেশ বাবু নরেশ বাবুর সমর্থন সম্বন্ধে পুনর্ব্বার বলিতে পারেন, "Save me from my friends!"

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

যাঁহার অশেষ করুণায় আর এক মাস নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল সেই দীন দুঃখী অনাথদিগের দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

বর্ত্তমান মাসের রোগীর সংখ্যা।

১ বাবুরাম, ২ দেখিয়া, ৩ স্বর্ণ, ৪ ফুলমণি, ৫ দুর্গাতারিণী, ৬ নবদুর্গা, ৮ ঈশ্বরী, ৯ সুমিত্রা, ১০ অম্বিকা, ১১ চিন্তামণি, ১২ রুক্মিণীকান্ত সরকার, ১৩ ঘামন, ১৪ বুঝাওন, ১৫ সারদা, ১৬ গঙ্গা, ১৭ সরস্বতী, ১৮ নিস্তারিণী, ১৯ শোভনকাহার, ২০ গোবিন্দবালা।

ঈশ্বরী।—উদরী রোগে শেষ অবস্থাপন্ন হইয়া দাসাশ্রমে আসিয়াছিল। হাত পা ফুলিয়া গিয়াছিল এবং নিশ্বাস প্রবল ও ঘন হওয়ায় হাঁফাইতে হাঁফাইতে যখন উপস্থিত হইল তখন মুহূর্ত্তের জন্যও আশা করিতে পারা যায় নাই যে সে আবার ফিরিয়া বাড়ী যাইবে। হাঁসপাতালে পাঠাইবার নামে একেবারে নারাজ। অগত্যা তাহাকে আশ্রমে রাখিয়াই চিকিৎসাদি করাইতে হয়। যাহা হউক দীনবন্ধুর কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

চিন্তামণি।—অবস্থা বেশ আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

রুক্মিণীকান্ত সরকার।—কঠিন পীড়াক্রান্ত, হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

ঘামন।—পায়ের ক্ষত অনেক আরাম হইয়াছে, ভয়ানক দুর্ব্বল।

বুঝাওন—বাতরোগে একেবারে পঙ্গু হইয়া উঠিবারমত হইয়াছিল। অনেক ভাল হইয়াছে।

সারদা—এই হতভাগিনীর তারকেশ্বরের নিকট বাড়ী; কোলে একটী ৪ বৎসর বয়স্ক সন্তান। হাড়ির মেয়ে; বাত হইয়াছিল বলিয়া কোন চিকিৎসা করে নাই। তাহার আত্মীয়েরা তালপাতার ঘর করিয়া কোন মতে এক মুঠা ভাত দিয়া আসিত। যখন যাতনা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, হাত পা সব কঙ্কালসার হইয়া উঠিল, সেই সময়ে বাবু উমাপদ রায় মহাশয় অনেক কষ্টে নিজের খরচে কলিকাতায় আনিয়া দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। দেখিবামাত্র ডাক্তার মহাশয়েরা হাড়ের মধ্যে টিউমার হইয়াছে এবং একেবারেই চিকিৎসার বা'র হইয়া গিয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। হতভাগিনী যে কটা দিন জীবিত ছিল রোগের বিষম যন্ত্রণায় ও ছেলেকে দেখিবার জন্য দিবানিশি চীৎকার করিত। কিন্তু এহেন যাতনারও শেষ আছে এবং মৃত্যুই সেই অমৃত স্বরূপের শেষ অমৃত বিধান। অভাগিনী ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত করিয়া সমস্ত যন্ত্রণা চিরদিনের মত বিস্মৃত হইল। যাইবার সময় ছেলেটীর সম্বন্ধে কিছুই বলিয়া যাইতে পারে নাই।

গঙ্গা।—তাঁতির মেয়ে বর্দ্ধমান জেলায় পূর্ব্বনিবাস। শ্রীপুরগ্রামে দাসীবৃত্তি করিয়া, পরে গরু পুষিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। হঠাৎ চক্ষুর পীড়া হওয়ায় চিকিৎসার জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করে কিন্তু চক্ষু আর পাইল না। এই অবস্থায় একটী সদাশয় ভদ্রলোকের বাড়ী বাসনাদি মাজিত ও তিনিও খাইতে পরিতে দিতেন। শেষে ভয়ানক বাতশ্লেষ্মাগ্রস্ত হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ও উন্মাদগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় বাবু শৈলেন্দ্রনাথ বসু খরচ পত্র দিয়া দাসাশ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন।

সরস্বতী।—নদীয়া জেলার মধ্যে কবিবপুর গ্রামে ইহার বাড়ী। প্রায় দুই বৎসর হইল পক্ষাঘাত রোগে ইহার বাম অঙ্গ একেবারে পতিত হইয়া গিয়াছে, উঠিবার শক্তি একেবারে নাই। বাবু আনন্দচন্দ্র গুঁই মহাশয়ের পত্র পাইয়া ইহাকে আনিবার জন্য দাসাশ্রম হইতে একজন কর্ম্মচারী পাঠান হয়। এখন ইহার অবস্থা ভাল নয়। তিনিই ইহার পাথেয় দেন।

নিস্তারিণী।—রেভারেণ্ড এ, সিমন্স্ মহোদয় মুরশিদাবাদের কোন রাস্তায় ইহাকে পাইয়া নিজের বাড়ীতে আনিয়া প্রায় মাসাবধি ইহাকে রাখেন। পরে দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শোভানকাহার।—অনেক দিন হইতে আমাশয় ও জ্বর হওয়ায় শোথ হইয়া পড়ে। ইহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

গোবিন্দবালা।—বাড়ী চাঁপাতলা। বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। বাবু অধরচন্দ্র মজুমদার ইহার ঘোরতর দুর্দ্দশা দেখিয়া দাসাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়া ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানসমূহ স্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

কেদারনাথ দাস এপ্রেল ও মে ॥০, A lady co Babs Sreenath Das, এপ্রেল ১৲, তেজচন্দ্র বসু এপ্রেল ॥০, ত্রিপুরাকান্ত বসু এপ্রেল ।০, রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর এপ্রেল ১৲, নন্দকুমার দত্ত এপ্রেল ১৲, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এপ্রেল ১৲, N. D. Bose Esqr. এপ্রেল ১৲, পিয়ারীমোহন ভড় এপ্রেল ।০, শ্যামাদাস কবিভূষণ এপ্রেল ॥০, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মার্চ্চ ।০, ১৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট মেস মার্চ্চ ॥০, বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী এপ্রেল ১৲, অভয়চরণ মল্লিক এপ্রেল ॥০, যদুনাথ বরাট, এপ্রেল ১৲, নবীনচন্দ্র বড়াল মার্চ্চ ১৲, কালীশঙ্কর সুকুল মার্চ্চ ১৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী দেবী চৈত্র ১৲, অভয়চরণ মল্লিক মে ॥০, রামচন্দ্র মিত্র মে ১৲, বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী মে ১৲, রাধাগোবিন্দ সাহা চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ ১॥০, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর এপ্রেল ১৲, বঙ্কুবিহারি মিত্র এপ্রেল ।০, যদুনাথ বরাট মে ১৲, নবীনচন্দ্র বড়াল এপ্রেল ১৲, প্রসন্নকুমারী বসু জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ১৲, হরিপদ ঘোষাল এপ্রেল ।০, রাখালদাস মিত্র জানুয়ারী হইতে এপ্রেল ॥০, হরিপদ ঘোষাল মে ।০, মহেন্দ্রনাথ দাস এপ্রেল ১৲, প্রমথনাথ দাস মার্চ্চ ২৲, মোট—২৫॥০।

এককালীন দান।

ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ডিব্রুগড় ১৲, বীরেশ্বর সেন গৌহাটী ২॥০, A Das of Dasasram ॥০, দেবেন্দ্রনাথ বসু কৃষ্ণনগর ৬৲, ৯নং পঞ্চাননতলার ছাত্রগণ ১॥০, শ্রীমতী শরৎকুমারী গুপ্তা ২।৵০, A friend Mithapur ॥৵০, শরৎকুমার বসু ৶০, কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী ।৵০, ক্ষেত্রপাল সিংহ রায় চৌধুরী ১৲, চন্দ্রকালী ঘোষ ১৲, Sympathisers. Grey Street ॥০, নগেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, Messrs H. C. Ganguli & Co ॥০, বসন্তকুমার মল্লিক ১৲, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এপ্রেল ১৲, A Debtor ৯৲, বেণীমাধব বিশ্বাস ॥০, নন্দলাল মুখোপাধ্যায় ।০, চারুচন্দ্র সরকার ১৲, ক্ষুদিরাম বসু এপ্রেল ॥০, সৈয়দ আবদুল জব্বর চৌধুরী ২৲, হরিশচন্দ্র নিয়োগী ১৲, Rev. A. Sims ১০৲, শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী ১৲, নবীনচন্দ্র দত্ত দ্বারভাঙ্গা রোগী পাঠানর জন্য ১৫৲, K. G. Gupta Esq মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৫৲, শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী খাওয়াইবার জন্য ২৲, কালীপ্রসন্ন দে ২৲, কবিরাজ সীতানাথ গুপ্ত ১৲, তারিণীচরণ সেন ১৲, সতীশচন্দ্র ঘোষ ॥০, শ্রীচন্দ্রদাস ৸০, হরেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি এল ১০৲, জিতেন্দ্রিয় ভট্টাচার্য্য ৫৲, গোবিন্দচন্দ্র দাস এম-এ বি-এল ১৲, শ্রীমতী প্রভাবতী মল্লিক ১৲, দেবীচৌধুরাণী ১৲, দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ বি-এল ২৲, রায় কালিদাস চৌধুরী বাহাদুর ২৲, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ১৲, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ৪৲, Proprietor Druggist Hall ২৲, রাধাকিশোরি ঘোষ ২৲, A friend of Dasasram ॥০, R. N. Sett Esqr ১৲, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৫৲, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, সত্যানন্দ বসু এম-এ বি-এল ২৲, পুলীনচন্দ্র কুণ্ডু নাতির বিবাহ উপলক্ষে ২৲, P. C. Paul Esq ২৲, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲, গোপালচন্দ্র সিংহ ১৲, S. C. Mukerjee Esq ।০, ১২৩ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ।০, গরীব হিতসাধিনী সভা ৩৲, উপেন্দ্রনাথ সেন ১৲, মহীতোষ বিশ্বাস ॥৫, ত্রিপুরাকান্ত দাস গুপ্ত ৫৲, রমাসুন্দরী ঘোষ ২৲, সেখ সুবাজি মহম্মদ সা ।০, মুন্সী আসি-

রুদ্দিন ৶০, মস্থিরচন্দ্র দাস /০, জগন্নাথ বেজ বড়ুয়া ৶০, উমেশচন্দ্র গুহ ৶০, লক্ষ্মীকান্ত খারগড়িয়া /০, হারাণচন্দ্র দে /০, অডিট আফিস ডিব্রুগড় ১৷/০, কাকিনিয়া মধ্যশ্রেণী ইংরাজী ইস্কুলের ছাত্রগণ ১।০, রাধানাথ ঘোষ ১৲, কৈলাসচন্দ্র মিত্র।০, দুর্লভনারায়ণ বিশ্বাস ৶৫, কালীপ্রসন্ন আচার্য্য।০, মহম্মদ ছলিম ৶০, আদিনাথ নিয়োগী /০, শ্রীনাথ বিশ্বাস ১৲, রেবতীমোহন সেন ৷১০, মহেশচন্দ্র সাহা /০, কৃপানাথ চৌধুরী ।০, জগচ্চন্দ্র ঘোষ ৷০, হরিনারায়ণ রায় ।০, টাঙ্গাইল সবরেজিষ্টারস্ আফিসের আমলাগণ ৷০, বিনোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲, শশিভূষণ তালুকদার ২৲, হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৲, মহিমচন্দ্র দে।০, দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী ২৲, শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস ৷০, প্রসন্নহরি মিত্র ১৲, টাঙ্গাইল স্কুলের ছাত্রগণ।৶০, জনৈক ভদ্রলোক ৶০, দুর্গাচরণ সান্যাল।০, B. S. Matheson Esqr ২৲, দীনবন্ধু নন্দী ২৲, দুর্গানন্দ ঘোষ ২৲, রজনীকান্ত চৌধুরী ।/০ শ্রীমতী মাতঙ্গিনী মিত্র।৴০, আনন্দগোপাল গুই রোগী আনার জন্য ৩৲, কামিনীকান্ত গুপ্ত ১৲, A Hindu lady ১০৲, মানসকুমার রায়।০, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ১৲, রাধারমণ সাহা ২৲, কবিরাজ এন্, এন্ সেন কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ১০৲, সুরেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, [illegible] lady of Burdwan পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে মাং বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী ৫৲, কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী।/০, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩।/০, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর ভাওয়েলের রাজা ১০০৲, শ্রীমতী জীবনবালা দত্ত পুত্রের আরোগ্য উপলক্ষে ২৲, হীরালাল দত্ত ১৲, সতীশচন্দ্র দাস।/০, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে ১৲, রমণীকান্ত দাস পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, মোট——৩১৯৸৶০।

অন্যান্য প্রকার আয়।

পুস্তক বিক্রয় ২।৶০, বেতন জমা ১।৶০, পুরাতন জিনিস বিক্রয় ২।০, বাক্সে প্রাপ্ত ৵১৫, ঋণশোধ বাবৎ প্রাপ্ত ৫৲, গচ্ছিত জমা ২০৲, কর্ম্মচারী খোরাকবাবৎ প্রাপ্ত ১৷৴১০, ফেরৎজমা মাং ইন্দুভূষণ রায় ১৲, পূর্ব্বমাসের কার্য্যাধ্যক্ষের স্থিত।/১০ মোট——৩৪/১৫।

বস্ত্রাদি দান।

চন্দ্রনাথ চৌধুরী নূতন কাপড় ১। পুরাতন কাপড় ১। কুঞ্জবিহারী সেন নূতন কাপড় একজোড়া। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পড়িয়া পাওয়া রূপার বোতাম ১। Rev. A. Sims নূতন কাপড় এক। সত্যচরণ সেন সতরঞ্চি ১ লেপ ৩ বালিস ৪ বিছানার চাদর ১ থালা ১ ষ্টীলের গ্লাস ১ রেকাব ১ বড়বাটী ১। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী চাউল ১মণ। সত্যচরণ সেন মোটা চাদর ১ সরুচাদর ১ বালিসের ওয়াড় ১ হাফমোজা ১জোড়া, চাকু ১ আয়না ১ ব্রাস ১। বিপিনবিহারী রায় ঘড়ি ১। শ্রীমতী প্রভাবতী মল্লিক কামিজ ১ প্যাণ্টালুন ১। ত্রিপুরাকান্ত দাস গুপ্ত কোট ১। কালীপ্রসন্ন দত্ত মোজা ৩, পিরাণ ১ মসারি ১ চাদর ১ ব্যাপার।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

মাসিক চাঁদা ২৫৷০ এককালীন দান ৩১৯৸৶০ অন্যান্য প্রকারে আয় ৩৪/১৫ পূর্ব্বমাসের হস্তেস্থিত ২৸/০ মোট জমা ৩৮২।১৫।

ব্যয়।

খাইখরচ ৪৩।/১৫ রাঁধুনী ৭৲, চাকর ৪।০, মেহতর ৭৷/০ কর্ম্মচারীর বেতন ৫৪৶১৫ রোগীর গাড়ী ভাড়া ৫৶০ আসবাব খরিদ।/০ গোয়ালা ১২৸১২৷ দাহ খরচ ১১।৴০ ধোপা ১৷০ ঔষধ।/০ রোগী আনার খরচ ১৯৷৶০ কর্জ্জদেওয়া যায় ৫৫৲ যন্ত্রাদি খরিদ ৫৲ আদায়কারীর খরচ ৩৪৷১০ বাটীভাড়া ৫০৲ ঋণটাকার সুদ ২৲ রিপোটছাপার কাগজ ৩০৲ অতিরিক্ত জমা শোধ ৷৶০ দাসাশ্রমের অধ্যক্ষের হস্তে স্থিত ৩৶১২৷ অন্যান্য খরচ ১৷/৫ মোট ব্যয় ৩৫২/১০। মোট আয় ৩৮২।১৫ মোট ব্যয় ৩৪৯/১০ মোটহস্তে স্থিত ৩২৸৴৫।

দাসী

একটা কথা।

যোগবল।

সেদিন রণ্টনের (Röntgen) আবিষ্কৃত তাড়িতের রূপের কথা পড়িতে-ছিলাম। সবে ৫।৬ মাস মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহারই মধ্যে উহা বিজ্ঞান-জগৎকে বিলোড়িত করিয়াছে। নিবিড় অন্ধকারের ভিতর হইতে কত কি ক্ষীণ আলোকের কিরণ দেখা যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হার্জ (Hertz) সাহেব তাড়িতের অন্য এক রূপ দেখাইয়াছিলেন। এখন আর এক। এই রূপের আলোকও তত অপ্রতুল নহে। আমাদের অজ্ঞাত ছিল বলিয়া রণ্টেনের আলোক এত বিস্ময় জন্মাইয়াছে। আবার সেদিন দেখিতেছিলাম ফ্রান্সের বঁ সাহেব (M. be Bon) সামান্য কেরোসিন আলোকের এক বিচিত্র গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন। লোহা ও সীসের পাতে মোড়া ফটোগ্রাফ তুলিবার কাচে ঐ আলোক ছবি অঙ্কিত করিতে পারে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কেন, এখনও ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় গাঢ় অন্ধকার আবশ্যক হয়। কিন্তু অন্ধকার বলিয়া জিনিসটাই বা কই? লোহার, সীসার পাত যখন আলোক বন্ধ করিতে পারিল না, তখন ফটোগ্রাফির জন্ম আর কাল কাপড়ে কি করিবে? There are more things······

এই সকল ব্যাপার চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় আমার এক নব্য বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বন্ধু। কি ভাব্‌ছেন?

আমি। ভাবছিলাম, আমাদের পুরাতন শাস্ত্রে যে সকল যোগবলের কথা লেখা আছে, সে গুলা কি সব মিথ্যা? সে গুলা খাঁটি কল্পনা, না মূলে কিছু সত্য আছে?

বন্ধু। (ঈষৎ হাস্যে) দেখ্‌ছি আপনিও যে একজন শাস্ত্র-চূড়ামণি হ'য়ে বসেছেন। যেটা superstition, সেটার জন্য মাথা ঘামান কেন?

আমি। আপনি কি সে গুলা superstition বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন? কোন প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখেছেন, বা কোন...

বন্ধু। সব কথাই কি পরীক্ষা করিতে হয়? যেটা palpably absurd, তাকে লইয়া পরীক্ষা করিতে হইলে নিজেকে fool বলিয়া প্রমাণ করিতে হয়।

আমি। এ ত মন্দ argument নয়! কোন বিষয় না দেখিয়াই, না শুনিয়াই একটা সিদ্ধান্ত করিতে পারা, বড় সহজ কথা নয়। তার উপর পাছে লোকে fool বলে, এই আশঙ্কায় সকল বিষয়ে নাস্তিকতা প্রকাশ করাটা আরও ভাল।

বন্ধু। (কিঞ্চিৎ কুপিত স্বরে) তা বলিয়া আপনার মত আর্য্যামি দেখানও ভাল নয়। আজকাল কি একটা হাওয়া উঠেছে, সে হাওয়া এত সংক্রামক বলিয়া জানিতাম না। সকল বিষয়েই "আমাদের শাস্ত্র" "আমাদের শাস্ত্র"। যেন শাস্ত্রের ভিতর কত কি অমূল্য ধন স্তূপাকার হইয়া আছে।

আমি। যাহা হউক, শাস্ত্রগুলা আমাদের ত? অত বিরক্ত হলে চলিবে কেন?

বন্ধু। না হইয়া থাকিতে পারি কই? সোজা কথা গুলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কত কি ব্যাখ্যা বাহির হইতেছে। কেহ ভাবে না যে, যোগবলের ভিতর যদি কিছু সত্য থাকিত, তাহা হইলে তাহা এতদিন লুকান থাকিত না! এখন nineteenth centuryর শেষভাগ যাইতেছে, মনে রাখিবেন। Dark ages অনেক দিন গত হয়েছে। আপনি যে তখনকার গাঁজাখুরীর কথা আন্দোলন করিতেছেন, তাই বিস্ময়ের বিষয়। আর বিস্ময়ই বা কি? কত generationএর superstition আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, তা কি দুই চারি দিনের লেখা পড়ায় ঘুচে? আরও এক century না গেলে আমাদের educationএর কোন ফল হবে না। সহরের "ভাগ্য গণনা আফিস" "অদৃষ্ট পরীক্ষালয়" গণিয়া দেখেছেন; বাঙ্গলা কাগজে "সন্ন্যাসী দত্ত মহৌষধ" "স্বপ্নলব্ধ আশ্চর্য্য ঔষধ," প্রভৃতির কতগুলা বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে, একবার ভেবে দেখেছেন? বিধাতা এ দেশটাকে charlatanদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আমি। আমাদের beginningটা বড় ভাল হল না। কথাটাও বড়

diffuse হ'য়ে প'ড়ল। বাস্তবিক, যোগবলের কথাগুলা কি একেবারে মিথ্যা মনে হয় ?

বন্ধু। আচ্ছা, যোগবলের ব্যাপারটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারেন ?

আমি। না জানিয়াই বুঝি, হাসিয়া উড়াইতেছিলেন। তা যাক্। এটা আপনার দোষ নয়, দেশের হাওয়ার দোষ। যে দেশের শিক্ষিত লোক অম্লানবদনে বলিতে পারে যে, "যদি এটা সত্য হইত, তাহা হইলে কি জানিতে বাকি থাকিত, সে দেশে নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনের অনেক বিলম্ব। আমি নিজে যোগসাধন কখনও করি নাই। যা শুনেছি, তাতে বোধ হয় যে, যোগসাধন দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আপনার আমার কাছে যাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, যোগীদের নিকট তাহা সম্ভব। যোগসাধন দ্বারা ভৌতিক জগতের উপর ক্ষমতা বিস্তৃত হয়।

বন্ধু। কি ! মাছি অপেক্ষা ক্ষুদ্র হওয়া, আকাশ অপেক্ষা বড় হওয়া, বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা হওয়া, এই সব বুঝি যোগের ক্ষমতা ?

আমি। শুধু ও সব কেন, আরও অনেক ক্ষমতার বর্ণনা পাওয়া যায়। মোটের উপর, আমাদের অনেক অজ্ঞাত বিষয় যোগিগণের নিকট প্রত্যক্ষ বোধ হয়।

বন্ধু। ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য বাড়াইতে ইচ্ছা থাকে ত বিজ্ঞান শিখুন। চোখ বুজে ঘুমাইলে চলিবে না, Edisonএর Laboratory তে গিয়া apprentice হউন !

আমি। কথাটা কতক সত্য। কিন্তু মনে হয়, একটা স্থানে যাবার কি দুইটা পথ থাকিতে পারে না ? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মনকে জড়ের পরিণাম বলিতে প্রয়াস পাইতেছে। এজন্য Psychologyকে Physiologyর একটা শাখা বলিয়া গণনা করে। কিন্তু আর্য্যগণ অন্য পথে গমন করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, মনই জড়ের চালক। এজন্য তাঁহারা জড়কে একেবারে ত্যাগ করিতেন না, কিন্তু উহা যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাঁহারা ভাবিতেন, যন্ত্রী নইলে যন্ত্র চালায় কে ? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যন্ত্র লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছে। যন্ত্রটা সবিশেষ শিক্ষা করিলে যন্ত্রীর কথা কতকটা জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু একেবারে যন্ত্রীকে অনুসন্ধান করাও চলে।

বন্ধু। কথাটা মন্দ নয় ! মন বলিয়া একটা জিনিস যাকে ধরিতে

ছুঁইতে পারা যায় না, যেটা দ্বারা পৃথিবীর একটা রেণুও নড়ে না, সেটাকে অনুসন্ধান করিতে যাওয়া আর গঞ্জিকার টানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব অবগত হওয়া এক কথা।

আমি। উপহাস না করিয়া একটু ভাবিতে দোষ কি? চক্ষুকর্ণাদি পাঁচটা ইন্দ্রিয় আমাদের যত কিছু জ্ঞান গরিমার পুঁজি। মনে করুন যেন, যোগসাধন দ্বারা সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসীমা বাড়িয়া যায়। এরূপ ঘটিলে, যাহা আপনার আমার কাছে অসম্ভব, তাহা তখন কতকটা সম্ভব হইবে। যোগ শব্দটায় যদি আপত্তি থাকে, ভৌতিক বিদ্যা বলুন, না হয় বিজ্ঞান বলুন।

বন্ধু। (ব্যগ্রভাবে) বিজ্ঞানের সঙ্গে সেগুলা জড়াইবেন না। আর, পাঁচটা ইন্দ্রিয় না বলিয়া ছয়টা sense organ বলুন। Tactual senseএর সঙ্গে muscular sense মিশাইলে দোষ পড়ে। যাহা বলিবেন, তাহা যেন বিজ্ঞানসম্মত হয়। নতুবা বৃথা তর্কে ফল নাই।

আমি। যাক্ আপনার এভাব দেখিয়া একটু ভরসা হ'ল। দেখুন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বলে যে, তাপ আলোক তাড়িত প্রভৃতির বাহ্য কারণ ঈথরের কম্পনবিশেষ। সেই ঈথরের কম্পনবিশেষ চক্ষুর স্নায়ুকে উত্তেজিত করে ও তৎসঙ্গে বাহ্য বস্তুর দৃষ্টিজ্ঞান হয়। সেই ঈথরের কম্পনবিশেষে তাপ, তাড়িত, চুম্বকত্ব, সব ঘটিতেছে। শুধু তাই নয়, এককে অন্যে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। যেমন ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ক্ষুদ্র তরঙ্গ এবং বাত্যাবিক্ষোভিত সাগরের ঊর্ম্মি বস্তুতঃ এক, অথচ রূপে ও কার্য্যে কত প্রভেদ, তেমনই তাপ আলোক তাড়িত প্রভৃতির কারণ এক, কেবল রূপে ও কার্য্যে প্রভেদ। ঈথরের নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে, কতকগুলি আমাদের শরীরের কোন কোন অংশের বিকাশ জন্মাইতেছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের এক এক বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে। পুষ্করিণীর ক্ষুদ্র তরঙ্গে নৌকা বিচলিত হইবে না, কিন্তু সাগর-তরঙ্গে প্রকাণ্ড জাহাজ ওলট্‌-পালট্ হইয়া যায়। সেতারের তার আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া তারে আঘাত করুন, তার নড়িবে বটে কিন্তু কোন শব্দ শুনিতে পাইবেন না। আবার সেই তার খুব টান করিয়া বাঁধিয়া তারে আঘাত করুন, তার নড়িবে কিন্তু শব্দ শুনিবেন না। তবেই, যখন তারের কম্পনসংখ্যা এক একটা সীমার মধ্যে থাকে, তখনই আমাদের শব্দ জ্ঞান হয়। সেই সীমা অতিক্রম করিলে

তার নড়িলে কি হইবে, আমাদের কাণ তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমাদের অপরাপর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তাই। মনে করুন যেন, কোন উপায়ে আমার চক্ষু কর্ণের স্নায়ুকে অত্যন্ত দ্রুত বা অত্যন্ত মৃদু কম্পন গ্রহণ করিবার যোগ্য করিলাম। তাহা হইলে আপনি যে বস্তু দেখিতে পাইবেন না বা যে শব্দ শুনিতে পাইবেন না, তাহা আমি পাইব। আপনার কাছে যাহা অজ্ঞাত, তাহা আমার কাছে জ্ঞাত হইবে। দেওয়ালের আড়ালে বা দূরে কেহ থাকিলে তাহা আমি দেখিতে পাইব, আপনি পাইবেন না। মনে করুন, এইরূপে আপনাতে আমাতে কত প্রভেদ হইয়া পড়িবে।

বন্ধু। আপনি যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ব্যস্ত হইয়াছেন! বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দোকানে দেশটা ভরিয়া গিয়াছে। আবার কেন?

আমি। একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক বলিয়া সকল গুলিই কি ভুল? তা ছাড়া, যোগসাধন দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশের একটা rationale খুজিতে ছিলাম। তাই এই রকম একটা ব্যাখ্যা করিতে হইল। এইটাই যে ঠিক, অবশ্য তা আমি বলি না। কিন্তু এই রকম একটা না একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।• যেমন করিয়া হউক, আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসীমা বাড়াইতে পারিলে আমাদের জ্ঞান কত বাড়িতে পারে, তাহারই আভাস দিতেছিলাম। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু কর্ণই প্রধান। ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা ইন্দ্রিয় বটে। কিন্তু একটা রসাস্বাদ, একটা গন্ধ ঘ্রাণ বা একটা স্পর্শসুখ আমাদের কত দিন বা মনে থাকে? যাহা হউক, সংসারে যে এই পাঁচটী মাত্র ইন্দ্রিয় আছে, অপর ইন্দ্রিয় নাই,এমনও মনে করিতে পারা যায় না। যদি আমাদের আর একটা ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমাদের আরও কত কি জ্ঞান হইত!

বন্ধু। আপনি কল্পনার চোখে অনেক ব্যাপার দেখিতেছেন। এই কল্পনা-বলেই আপনি যোগ-বলের পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। মনে রাখিবেন, দূরবর্ত্তী লোকের মূর্ত্তি দেখিতে বা তাহার কথা শুনিতে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। সেই সকল যন্ত্র ব্যতীত আমাদের ইন্দ্রিয় ঐ ঐ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। কল্পনাকে একটা ইন্দ্রিয় মধ্যে গণিতে পারিলে আপনার কথা কতকটা সত্য হইত। আমাদের ছয় সাতটা কেন, ছয় সাত ডজন ইন্দ্রিয় আছে মনে করিতে পারিলে কত জ্ঞান বৃদ্ধি হইত।

আমি। কেন? কোন কোন নিকৃষ্ট প্রাণীর অপর একটা স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়

স্পষ্ট না থাকিলেও, যে কয়টা আছে, তাহাদের কার্য্য ক্ষমতা অধিক বলিয়া মনে হয়। আমরা আলোকের কতটুকুই বা গ্রহণ করিতে পারি? সূর্য্য-কিরণের যতখানি spectrum হয়, তাহার প্রায় ৭ ভাগের ১ ভাগ মাত্র আমাদের চক্ষুর গ্রাহ্য। আমরা spectrum এর violet বর্ণের পর আর কিছু দেখিতে পাই না। পিপীলিকা তাহার কিয়দংশ দেখিতে পায় বলিয়া বোধ হয়। আমরা যে শব্দ শুনিতে পাই না, কোন কোন কীট তাহা শুনিতে পায়।

বন্ধু। তাতে কি? কোন্ প্রাণীর কি প্রকার দর্শনশক্তি আছে, তাহার বিচারে আমাদের যোগসাধন হবে না।

আমি। বোধ করি আপনি Darwin, Hæckel প্রভৃতির Theory of Evolution এ বিশ্বাস করেন?

বন্ধু। খুব বিশ্বাস করি। অমন grand doctrine আর আছে কি?

আমি। আপনি সেই Italian Abbeর নিষ্ঠুর পরীক্ষার বিষয় পড়িয়া-ছেন কি! তিনি ঘরের কড়ি হইতে কতকগুলা দড়ি ঘরের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। পরে কয়েকটা বাদুড়ের চোখ কাণ নষ্ট এবং নাক বদ্ধ করিয়া সেই ঘরে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বাদুড় গুলা সেই ঘরের ঝুলান দড়িগুলার মাঝে এমন উড়িতে লাগিল যেন তাদের কোন ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয় নাই। একগাছি দড়িও তাদের গায়ে ঠেকিল না, বাঁকিয়া বাঁকিয়া যেখানে যেমন, তেমনই ভাবে ঘুরিয়া অক্লেশে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

বন্ধু। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ করিতে চান?

আমি। ইহাতে এই জানা যায় যে, বাদুড় গুলার চক্ষু কর্ণ ব্যতীত হয়ত তাদের অপর একটা ইন্দ্রিয় আছে, হয় ত তাদের চর্ম্মময় পক্ষে ঈথর তরঙ্গের কম্পন আলোক-জ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান জন্মাইতে পারে। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। পুং ও স্ত্রী দুইটি গুটিপোকার ডিম্ব জাপান হইতে আমেরিকার চিকাগো নগরে আনা হয়েছিল। তখন সে নগরে সে রকম গুটিপোকা আর ছিল না। দুইটি ডিম্ব প্রায় দেড় মাইল অন্তরে রাখা হয়েছিল। ডিম ফুটিবার পর দিন দেখা গেল যে, দুইটি পোকা একত্র বসিয়া আছে। এখানে কি বলিবেন? দূরে থাকিয়া কোন ক্রমে তাহারা পরস্পর মনের ভাব জানিতে পারে, স্বীকার করিতে হইবে।

বন্ধু। স্বীকার করি, না করি, এ সব দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমাদের তর্কের সম্বন্ধ কি?

আমি। সম্বন্ধ বিলক্ষণ আছে। নিকৃষ্ট প্রাণীর ক্রমবিকাশ দ্বারা যদি মানুষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে মানিতে হইবে যে নিকৃষ্ট প্রাণীর যে সকল গুণ বা ক্ষমতা ছিল বা আছে, তৎসমুদয় আমাদেরও আছে। তবে কোন কোনটা latent বা potentially আছে আর কোনটা বা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। তাহা হইলেই দেখুন, আমাদের ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যসীমা বৃদ্ধি করা একেবারে অসম্ভব হইল না।

বন্ধু। বহু, বহু পূর্ব্বকালে কোন্ প্রাণীর কি ক্ষমতা ছিল, আর আমাদের উৎপত্তির সময় কতগুলি ইন্দ্রিয় কি ভাবে কাজ করিত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। আপনি imaginationকে basis করিয়া যা তা সম্ভব অসম্ভব বলিতে পারেন।

আমি। আপনার কথাটা বিজ্ঞানসম্মত হইল না। আপনি Darwin এর grand doctrine এ কথায় বিশ্বাস করেন কিন্তু তার consequences এ বিশ্বাস করিতেছেন না। এখানে কোন কল্পনা দেখিতে পাই না। যাহা হউক, আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের কোন কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-সীমা বৃদ্ধি করা একেবারে অসম্ভব বলিতে পারেন না। তা ছাড়া, আরও আছে। অন্ধ ব্যক্তিদিগের কাজকর্ম্ম দেখিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। যখন কোন অন্ধ নির্জ্জন নিঃশব্দ ঘরে একা বসিয়া থাকে, তখন সেই ঘরে কেহ প্রবেশ করিলে, সে তাহা কখন কখন টের পায়। কখন কখনও অন্ধকার ঘরে আমরাও বুঝিতে পারি যেন কেহ সেখানে আছে। বোধ হয় ব্যবহার অভাবে আমাদের নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে প্রাপ্ত কোন কোন ইন্দ্রিয় একেবারে লুপ্ত না হইলেও পূর্ব্বের ক্ষমতা হারাইয়াছে। কলিকাতা সহরে short sighted ছেলের সংখ্যা কেমন বাড়িয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন?

বন্ধু। আপনি যতই প্রমাণ প্রয়োগ করুন, আসল কথাটা যেমন তেমনই রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি যোগবলের সত্যতা প্রমাণ করিতে চান, তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণে আসুন।

আমি। সকল বিষয়ই কি আপনি প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বাস করেন?

আপ্তবাক্যে বিশ্বাস না করিয়া আপনি কি দুই দণ্ড চলিতে পারেন? আমরা কেবল কথায় বলি, "প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ;" কিন্তু কাজের বেলায় আপ্তবাক্যই সম্বল।

বন্ধু। কিন্তু যার তার কথাকে আপ্তবাক্য বলা যাইতে পারে না। আপনার রামা শ্যামার কথা আর বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের কথায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। সচরাচর যে ব্যাপার দেখা যায় না, এমন বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে কি প্রকার প্রমাণ আবশ্যক, তাহা ত আপনি জানেন। জলের উপর দিয়া কোন ব্যক্তি রাত্রে খড়ম পায়ে দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এ কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু বিলক্ষণ কঠোর প্রমাণ চাই। নতুবা তাহা বিকারে রোগীর প্রলাপ মাত্র জানিবেন।

আমি। আচ্ছা, আপনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের কথা আপ্তবাক্য বলিয়া জ্ঞান করেন কি?

বন্ধু। এক শ বার জ্ঞান করি।

আমি। আপনি জানেন, অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অলৌকিক ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাঁহারা অনেক কথা বলেন বা মানেন, যাহা আপনি মানেন না বা মানিয়া চলেন না। সুতরাং দেখুন, কোন্ বিষয়ে কাহার কথা মানিব, তাহা আমরা নিজে নিজেই ঠিক করিয়া লই। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এ বিষয়ে আমাদের বিবেক বুদ্ধিই একমাত্র সম্বল।

বন্ধু। (বিরক্ত হইয়া) আপনি ঠিক main lineএ থাকিতে পারেন না। কথায় কথায় personality না আনিয়া যা বলিবার থাকে বলুন।

আমি। আমরা মুখে অনেক কথা বলি। বলি এটা বিশ্বাস করি, ওটা superstition। কিন্তু যখনই কাজে দেখিতে যাই, তখন অনেক বিষয়ে অন্যথা দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকের আপ্তবাক্যে আপনার কতদূর আস্থা, তাই জানিবার জন্য দৃষ্টান্তটা দিয়াছিলাম। আমরা আপ্তপ্রমাণে বিলক্ষণ বিশ্বাস করি। তবে কোন্‌টা আপ্ত বলিয়া মানিব, তাহা আমাদের শিক্ষা ও রুচি অনুসারে ঠিক করিয়া লই। অমুক বিলাতী সাহেব বা অমুক দেশী সাহেব যোগের কথা বিশ্বাস করেন না, সুতরাং......

বন্ধু। আপনি আমাকে convince করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। আপনি সহস্র কথা বলিলেও, যেগুলা gross superstition, সেগুলাকে

মানিতে পারিব না। একটা সত্য ঘটনা বলি। সে দিন কোন এক ব্যক্তি এক জন যোগী সম্বন্ধে বলিতেছিলেন। কয়েকজন শিক্ষিত শ্রোতা জুটিয়াছিল। তিনি seriously বলিলেন যে, "সেই যোগী গাঁজার একটানে পিতলের একটা কলিকা ফাটাইয়া ফেলিয়াছেন।" শ্রোতারা অমনই বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, আপনি সেই কলিকাটা নিজে দেখিয়াছেন? উত্তর হইল, 'নিজে দেখেছি বই কি—নইলে কি বলিতাম? এমন মোটা পিতল, এত বড় কলিকা," ইত্যাদি। আমি থাকিতে না পারিয়া বলিলাম, "মহাশয়, একথাটা কি seriously বল্‌ছেন?" লোকটা বলিল কি,—"আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, তবে যে দোকানে আর একটা নূতন কলিকা কিনিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সে সব জানে।" লোকটার কি সুন্দর power of observation! কি সুন্দর inductionএর জ্ঞান!

আমি। আমি কি বল্‌ছি যে, যে গাঁজা খায়, সেই যোগী?

বন্ধু। আপনি না বলুন, দেশের লোকগুলা ত ভড়ং দেখে, গাঁজা টান দেখে যোগে বিশ্বাস করে।

আমি। দেশের লোকে অনেক কথা বলে। শুধু আমাদের দেশ কেন, যেখানে Huxley Tyndallএর জন্ম, যেখানে Edison বিরাজ করিতেছেন, সে দেশের লোকদের মধ্যেও এই রকম জ্ঞান দেখ্‌বেন। আর, supernatural power সম্বন্ধে যদি dark ages হইতে এ পর্য্যন্ত সকল দেশে বিশ্বাস আছে, তাহা হইলে তাহার মূলে কিছুই নাই, বলিতে পারেন কি? কোন বিষয়ে universal belief থাকিলে তাহা একেবারে উপহাস করিয়া উড়াইবার উপযুক্ত নয়। বহু পূর্ব্বকাল হইতে আমাদের দেশের লোকেরা যোগবলে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। আমাদের কোনও শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা পাই না।

বন্ধু। ও সব wholesale জুয়াচুরী।

আমি। পিতৃপুরুষদিগকে ওরকম কথা বলায় পাপ আছে।

বন্ধু। সত্য কথা বলিতে পাপ নাই।

আমি। কথা বলিতে পাপ নাই, যদি কথাটা সত্য হয়। এ সব শিক্ষার গুণ। যাহা হউক, যার আসল নাই, তার নকল হইতে পারে কি? যদি ভণ্ডযোগী দেখিয়া থাকেন, তবে আসল যোগী নাই বা ছিল না কি?

বন্ধু। ও সব কেবল কথার মার পেঁচ। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে?

কোন observant এবং trustworthy লোক কখনও যোগবলের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখেছেন ?

আমি। সাহেবদের সাক্ষ্য চান ? হরিদাস সাধুর বিষয় ইতিহাসে দেখুন। একজন নয়, দু জন নয় ; কতজন সাহেব ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমি একটা ঘটনা দেখেছি। যদিও তাহা যোগে হয় নাই, তথাপি সেটা ভাবিবার বিষয় বটে।

বন্ধু। আপনার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু আপনাকে biased দেখিতেছি। আর আপনিও deceived হইয়া থাকিতে পারেন।

আমি। আমি যাহা দেখেছি, তাহা একবার একজন বাজীকর দেখাইয়াছিল। অনেক দিনের কথা বটে,, কিন্তু এখনও আমার কাছে প্রত্যক্ষবং বোধ হইতেছে।

বন্ধু। যোগের কথা আর ভেল্কি বাজীর কথা এক না কি ? হ'তেও পারে। হয়ত যাকে যোগবল বলে, তাহা ভেল্কি মাত্র।

আমি। ভেল্কি কি না, তাহা পরে বুঝিবেন। কি দেখেছি, আগে বলি। সকাল বেলা ৯।১০ টার সময় ৮।১০ হাত দূর হইতে দেখেছি। একটি ১০।১১ বৎসরের মেয়েকে একখান কাপড় দিয়া ঘেরিয়া ২।৩ মিনিট পরে বাজীকর কাপড়খান তুলিয়া লইল। তখন দেখা গেল, মেয়েটি পদ্মাসন করিয়া তিনটি কাঠির উপর উপবিষ্ট। কাঠি তিনটি প্রায় এক হাত লম্বা; মাটিতে গর্ত্ত করিয়া পোঁতা ছিল না। দুই জানুর নীচে দুইটি কাঠি ও অপরটি পশ্চাদ্‌ভাগে লাগান ছিল। মেয়েটি নিস্তব্ধ ও নিমীলিত নেত্র। ক্রমে ক্রমে একটি জানুর নীচের কাঠিটি রাখিয়া অপর দুইটি সরাইয়া লইল। মেয়েটি একটি কাঠির উপর জানু রাখিয়া ৮।১০ মিনিট কাল বসিয়া রহিল। কোমরে কৌপিন মাত্র পরা ছিল ; কোন প্রকার কল কব্জা লোহার পাত ইত্যাদি ছিল না। ধরিয়া নামাইবার পর দেখা গেল যে, মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে।

বন্ধু। কুম্ভকযোগ না কি ? যাহা হউক, এর ত বেশ explanation আছে। শরীরটা stiff করিয়া একটা কাঠির উপর equilibrium করিয়া ছিল।

আমি। নামে কিছু আসে যায় না। আর, explainও করিতে পারা যায় না। আপনার laws of equilibriumএ explained হয় না।

অবশ্য, সকল ব্যাপারেরই একটা না একটা explanation আছে। কেবল কোনটার বা আমরা জানি, কোনটার বা জানি না।

বন্ধু। যাহা হউক, ওটা আর ভাবিবার কথা কি! বোধ হয়, চোকে ভেল্কি লাগিয়া থাকিবে। বাস্তবিক এখন বোধ হইতেছে, ভেল্কিই উহার যথার্থ explanation।

আমি। আপনি ভেল্কিতে বিশ্বাস করেন?

বন্ধু। সত্য বিষয় বিশ্বাস করিব না? ভেল্কি কথাটা hypnotismএর বাঙ্গালা বই ত নয়। বোধ হয় আপনাকে hypnotise করিয়া ফেলিয়াছিল। Hypnotism by suggestion একটা ভয়ানক জিনিস আবিষ্কার হয়েছে।

আমি। Hypnotismএর মূলকারণ যাহাই হউক, তাহা আপনিও জানেন না আর আপনার পাশ্চাত্য ডাক্তারগণও জানেন না। ফলে দাঁড়ায় একই। আপনারা যাকে mesmerism, hypnotism বলেন, তাহাকে আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে মন্ত্রশক্তি বলিয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আপনাদের পণ্ডিতগণ মন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন না।

বন্ধু। কথাটা উঠিবামাত্রই ত বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণ চাই। যাই হউক, hypnotismএর বাঙ্গালা মন্ত্রশক্তি বলিতে আমি রাজী নই।

আমি। কেন, Mesmer একশ সওয়া শ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার mesmerism প্রকাশ করেন। তিনিও আবার Paracelsusএর পদানুসরণ করেন; তা যাক্। পাশ্চাত্য দেশে animal magnetism, mesmerism, hypnotism, thought-transference প্রভৃতি লোকে আর অবিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। আমি বলিতেছিলাম, এসব গুলা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে জানা ছিল। ইহারই প্রকারান্তর স্পর্শ দ্বারা রোগ-চিকিৎসা বহু পূর্ব্বকালে চীনদেশেও ছিল। য়ুরোপেও কোন কোন ডাক্তার এইরূপে রোগ চিকিৎসা করিতেন।

বন্ধু। Charlatan and impostor সকল দেশেই সম্ভবে।

আমি। কথাটা বোধ হয়, না ভাবিয়াই বলেছেন। যাহা হউক, চুম্বক সাহায্যে রোগশান্তি যদি সম্ভব হয়, আর আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানের যদি চুম্বক-ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে অনেক কথা বুঝিবার আশা করা যায়। আর, একটা explanation দিতে পারা যাক্ আর নাই যাক্, প্রত্যক্ষ ফলে

কখনও অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বেশী দিনের কথা নয়। ৺ সীতানাথ ঘোষ এই কলিকাতায় চুম্বক সাহায্যে রোগ নিবারণ করিতেন। এখনও অনেকে magnetic belts ব্যবহার দ্বারা উপকার পাইয়া থাকেন। Electropathy বলিয়া একটা নূতন চিকিৎসা প্রণালীর সূচনা হইতেছে।

বন্ধু। কি কথা হইতে কি কথায় আসিতেছেন ?

আমি। বেশী দূর যাই নাই। এই সকল ঘটনা হইতে জানা যায় যে, আমাদের শরীরে চুম্বকের ধর্ম্ম আছে এবং তাহা চুম্বক দ্বারা বশীভূত হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিবেন, চুম্বকের গুণটা ঈথরের কম্পনবিশেষ জনিত। আবার, আলোক Electromagnetic rays বলিয়া পণ্ডিতেরা ঠিক করিতেছেন। তবেই আমাদের শরীর দ্বারা ঈথরে কম্পন বিশেষ উৎপাদন করিতে পারা যায় কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। এই একটা বিষয় সত্য হইলে অনেক রহস্য জানিতে পারা যাইবে। এক রণ্টেনের আবিষ্কারে possibilities কত বাড়াইয়াছে মনে করুন, তার উপর শরীর যন্ত্রের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের কথা।

বন্ধু। আপনি কেবল possibilitiesই দেখছেন। কিন্তু কাজের কথা একটাও হ'ল না ? যোগীদের যদি এতই বিদ্যা আছে, কাহাকেও একটু বিদ্যা দান করিয়া বিদ্যার নমুনা দেখাতে আপত্তি কি ? তাঁরা না কি হিমালয়ে বাস করেন বা করিতেন। পৃথিবীর উপর দিয়া, আমাদের দেশের উপর দিয়া কত বিঘ্ন বিপত্তি চলিয়া যাইতেছে, একটু আসিয়া বাঁচাইতে পারেন না। যোগীদের ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা যে পূরা selfish তা স্বীকার করিতে হইবে।

আমি। অমুকে কেন এ কাজ করে না, তাহার জবাব আমি কি দিব ? আর, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন যোগীকে আমি এপর্য্যন্ত দেখি নাই কিম্বা দেখিলেও চিনিতে পারি নাই। আমাদের কথাটাও এ ভাবের হ'য়ে আসে নাই। তা যাক্। আপনি Baron Reichenbach's researches গুলা একেবারে অবিশ্বাস করিবেন কি ? তিনিই medical magnetism এর দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন। বহুবিধ লোক, শিক্ষিত অশিক্ষিত, রোগী নীরোগ, স্ত্রী পুরুষ, একটা অন্ধকার ঘরে বসাইয়া তাহাদের হাতের নিকট তাঁহার নির্ম্মিত চুম্বক ধরিতেন। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে তাহারা আলোক ছটা বহির্গত হইতে

দেখিত। সুতরাং এমন একটা পদার্থ আছে, যাহা চুম্বক দ্বারা ক্রিয়াবান্ হয় এবং তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। কোন কোন স্ফটিকের এই গুণ আছে, কোন কোন ব্যক্তির দেহের এই গুণ আছে। তদ্দ্বারা আলোক নির্গত করা যাইতে পারে।

বন্ধু। আপনি ক্রমে ক্রমে Theosophyর astral matterএ আসিতেছেন। যোগের কথাগুলা কোন Theosophyর কাগজে পাঠাইয়া দিবেন। আদর করিয়া ছাপা হইবে।

আমি। তাতে কি? ঐ পদার্থটাকে আকাশ বলুন, ether বলুন আর astral matter বলুন, নামে কিছু আসে যায় না। হক্স্‌লি, টিণ্ডাল এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই বলিয়া, ইহা নাই, এমন নয়। আর, এও বলি, এ বিষয়ে তাঁহারা কিছু বলেন নাই বলিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তিরও লাঘব হয় না। যিনি যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সেই বিষয়ই বলিতে পারেন। অন্য বিষয়ে তিনিও যেমন প্রমাণ আপনি আমিও তেমনই হইতে পারি। মন্ত্রশক্তি শব্দ ব্যবহার করিতে আপনার অভিমত নাই। কিন্তু নামে যাহাই হউক, উহার আধুনিক প্রকাশিত ক্ষমতার সম্বন্ধে পূর্ব্বকালের অনেক কথার ঐক্য দেখা যায়।

বন্ধু। মন্ত্র মন্ত্র করিলে পাছে আবার উচাটন বশীকরণ মনে আসে, এজন্য hypnotism বলিতে বলি।

আমি। আপনি তবে hypnotismএর সমুদয় ক্ষমতা শুনেন নাই। তদ্দ্বারা উচাটন ও বশীকরণের সহস্র প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এমন কি, Parliamentএ এবিষয়ে একটা Bill হবার কথা শুনিতেছি। যে সে লোক যাকে তাকে hypnotise করিলে সমাজ রক্ষা হইবে না, এই আশঙ্কায় অনেকের মন ব্যাকুল হইয়াছে। উচাটন সম্বন্ধে Parisএর Dr. Charcotএর hospitalএর report পড়িবেন।

বন্ধু। মারণ সম্বন্ধেও প্রমাণ যোগাড় করেছেন না কি?

আমি। যোগাড় করিতে হয় না, অমনই প্রমাণ আসিয়া পড়ে। Anna Kingsford,—Her Life, Letters Diary and Work by E. Maitland পড়িবেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত জানুয়ারি মাসের Review of Reviewsএ আছে।

বন্ধু। ব্যাপারটা কি? বাণ মারার কথা না কি?

আমি। ব্যাপারটা এই। Parisএ Anna, Claude Bernardকে মারণমন্ত্র দ্বারা হত্যা করে। আবার ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে Anna যখন ইংলণ্ডে, সেখান হইতেই ফ্রান্সে Paul Bertকে হত্যা করে। এই মেয়েটা নাকি Pasteurকেও বাণ মারিতে চেয়েছিল।

বন্ধু। মেয়েটা নিশ্চয়ই ডাইনী ছিল!

আমি। ডাইনী কিনা, জানিনা। কিন্তু তাহার চরিতলেখক লিখিয়াছেন, I refer to the record of the assassinations which she deliberately planned. I call them assassinations because they were attempts to murder—murder not by dynamite or by dagger, but by the determined exercise of a vengeful and concentrated will.

বন্ধু। কি জানেন, সব সময় সব কথা বুঝিতে পারা যায় না।

আমি। এতক্ষণ আমি তাই বলিতেছিলাম। অমুক ব্যাপারটা আপনি দেখেন নাই বলিয়া যে তাহা ঘটিতে পারে না, একথা বলিতে পারা যায় না। অবশ্য একেবারে বিশ্বাসও করিতে বলি না। আপনি Huxley's Possibilities and Impossibilities খানি মনোযোগ করিয়া পড়িয়াছেন কি?

বন্ধু। আমি ভাবছি, যোগবলরূপ এমন একটা ভয়ানক ব্যাপার রহিয়াছে, অথচ কেহ তার সন্ধান পেলে না? আশ্চর্য্য বটে!

আমি। কেহই সন্ধান পায় নাই, বলায় একটু দোষ পড়িতেছে। সে দিন আমার—বন্ধু এক সাহেব ডাক্তারের একখান ইংরাজি বহির কথা বলিতেছিলেন। আমার বন্ধুটি যোগ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর পড়িয়াছেন। তিনি ইংরাজি বহিখানি পড়িয়া বলেন যে, এখানি পূর্ব্বকালের হঠযোগের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। অর্থাৎ সেই ডাক্তার যে সকল প্রক্রিয়ার কথা লিখেছেন, সে গুলি পড়িলে মনে হয় যেন তিনি আমাদের শাস্ত্রের হঠযোগ আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া লিখিয়াছেন।

বন্ধু। এইটুকু বাকি ছিল। যাহা হউক, আজ অনেক কথা জানা গেল। অনেক কথার আভাস পাওয়া গেল। আবার হবে।

এই বলিয়া আমার বন্ধুটি চলিয়া গেলেন। বোধ হয় ভাবিতে ভাবিতে গেলেন যে লোকটা কি fool!

শ্রীসত্যকাম।

দুইটি সঙ্গীত।

(১)

প্রিয় মাধবী, ও মাধবী গো—
তোর বদন খানি হেরি,
হ'ল নয়ন কেন ভারী।—
পরশ-লতা তুমি সই গো পতি-পাগলিনী;
(আছ) পতি-অঙ্গে মিশে রঙ্গে দিন যামিনী।

(মরি, মরি কিবা শোভা গো, যুগলরূপ মাধুরী হেরি)
শ্যাম তনু খানির শোভা গো, শ্যামল প্রসূনে,
স্বামীর সোহাগ-রাগে শোভে শত গুণে।
(প্রেম উছুলিয়ে যায় গো, অনন্ত ফোয়ারায়)
সোহাগ-পুতলী সই গো, অনিল হিল্লোলে
বাসর তরঙ্গে ভাসি তনুখানি দোলে
হেরে আঁখি (নীরে) ভরিল, কি জানি কি মনে হ'ল।
সই বল না, . সে কি সাধনা
যায় পূরালে মনস্কামনা।
মরমের টানে, ও সই প্রাণে প্রাণে
রব জড়িত হ'য়ে দু জনে।—
(সই গো তোমার মত)—
(তখন) দিঠে দিঠি (দিঠি) বাঁধা রবে ;
(মুখের) কালো আঁধার ঘুচে যাবে,
(প্রাণের) কালো জলে চাঁদ খেলিবে,
(তখন) লতা পাতায় ফুল ফুটিবে,
(ও সই তোমার মত)
(তখন) অলি আসি গুঞ্জরিবে
(তখন) তখন দিয়ে পিয়ে বিভোর হবে।
(তখন) তখন আপনারে হারাইবে।

(২)

নিশীথ শয়নে একাকিনী
কার লাগি আঁখি নীরে ভাসি ! !
উ—উ—উ উ বুক ফেটে যায়
কোথা নাথ,—দেখ মরে তব দাসী
নিশীথ ঘুমের সোহাগ ভুলিনু
কুহকী আশার টানে,
পিয়াসার ঘোরে,
ধৈরজ না ধরে

আলেয়া কীর্ত্তন—লোফা।

মরমে হানিয়ে মুরছা ডাকে
ক্ষণেক ভুলিতে তারে ;
বুক ভাঙ্গি চাহে উদ্দাম হৃদয়
ছুটিতে গো কার পানে ;
হ'ল এ হৃদয়, অনল নিলয়,
যার তরে ; কোথা বল সে হইয়ে উদাসী ।
আকাশের তারা বৃথাই চাহে গো
ভুলায়ে রাখিতে মোরে।
নিশার আঁধার বৃথাই চাহে গো
ঘুমায়ে রাখিতে ঘোরে ;
জ্বালাময়ী স্মৃতি, না পায় নিবৃতি,
ঘুমন্ত জ্ঞানে জাগায়ে তুলি গো পোড়ায় রতি রতি ;
মানের গরবে— মরিব নীরবে
আঁখির নীরে তর্পণ করিবে
অন্তিমেতে আসি । *

প্রকৃতি গায়িকা।

পলাশ বন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কথা আর ছাপা থাকিল না। এক কাণ, দুই কাণ হইতে হইতে গ্রামশুদ্ধ লোক বিবাহের কথা শুনিল। শুনিয়া অবশ্য সকলে যার পর নাই আনন্দিত হইল। যোগমায়া তো বাড়ী হইতে বাহির হওয়া অনেক দিন বন্ধ করিয়াছিল ; আমাকেও বাধ্য হইয়া গ্রামের মধ্যে গতায়াত বন্ধ করিতে হইল। সকলেই আমার মতিগতির প্রশংসা করে, যোগমায়ার রূপগুণের কথা পাড়িয়া প্রাচীন উপমাটির উল্লেখ করে এবং গোস্বামী মহাশয়ের চিন্তাভার লাঘবের কথা মনে করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। গ্রামবাসীদের ভাবে প্রকারে ইহাই বোধ হইতে লাগিল, যোগমায়াকে

* কাফিসিন্ধু—ঢিমে একতালা অথবা চৌতাল।

বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া আমি শুধু গোস্বামী মহাশয়কে নহে, যেন তাহাদিগকেও চিরকালের জন্য কিনিয়া রাখিতেছি! দেখিলাম, বিষম বিপত্তি! এই বিপত্তিতে পড়িয়া আমি গৃহ হইতে আর বহির্গত না হইবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা দেখিলাম না। সময়ে অসময়ে গ্রামের বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢ়ারা দলে দলে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া জননীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। বালিকা প্রৌঢ়াদের কথা দূরে থাকুক, অবগুণ্ঠনবতী যুবতীরাও অকুতোভয়ে ও দুর্জ্জয় সাহসে দ্বিতলে উঠিয়া আমার পাঠগৃহে উঁকি মারিতে লাগিলেন। যাঁহারা নিত্য আমায় দেখিতেছিলেন, তাঁহাদেরও দিদৃক্ষা অসম্ভবরূপে বলবতী হইয়া উঠিল। আমি দেখিলাম, বাড়ীতে তো তিষ্ঠান ভার। আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের বনবাসই শ্রেয়স্কর। এই সিদ্ধান্ত করিয়া আমি কতিপয় দিবস প্রত্যূষ হইতে প্রদোষ পর্য্যন্ত বনের মধ্যেই অতিবাহিত করিলাম; কেবল আহারাদির প্রয়োজন বশতঃই এক একবার বাড়ীতে আসিতাম মাত্র। কিন্তু বন সর্ব্বক্ষণ ভাল লাগিবে কেন? স্বেচ্ছায় বনবাস, আর অনিচ্ছায় বনবাস, ইহাদের মধ্যে যে কি প্রভেদ, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। কি করি, আর কাহাকেই বা দুঃখের কথা বলি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একদিন কোনও প্রয়োজনবশতঃ বনরূপ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সশঙ্কচিত্তে, মৃদুপদসঞ্চারে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, সৌভাগ্যক্রমে সেখানে কোনও প্রতিবাসিনী রমণী নাই; কেবল জননীদেবী মঙ্গলাকে লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে একাগ্রচিত্তে কলাইয়ের বড়ি দিতেছেন। আমি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বড়ি দেওয়ারূপ কার্য্যটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং বাল্যকালে এই সদ্যজাত অশুষ্ক বড়ি ভক্ষণে কেন এত অনুরাগ প্রকাশ করিতাম, কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সহিত তদ্বিষয়েও চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই নিকৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা হইতে গর্ব্বিত মন মহাশয় শীঘ্রই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। আমি জননীদেবীকে একটী কথা বলিবার অভিপ্রায় করিতেছিলাম; সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিলাম—"মা, বড়ি তো দিচ্চ, আমার একটী কথা শুন্‌বে?"

জননী অমনি বড়ি দেওয়া বন্ধ করিয়া পিষ্ট কলাই হস্তে ব্যাকুলনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি কথা বাবা? তোমার আবার কথা শুন্‌বো না?"

আমি বলিলাম,—"বেশী কিছু নয় ; বলি,আমাকে কি এত শীঘ্রই বনবাস কর্‌তে হ'বে ?"

প্রশ্ন শুনিয়াই মা চমকিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "বনবাস কি রে ? বনবাস তুমি কেন কর্‌তে যাবে, বাবা ? শত্রুকেও যেন কখনও বনবাস কর্‌তে না হয় !"

আমি বলিলাম,—"তা তো ঠিক্ কথা ! কিন্তু আমার যে সত্যি সত্যিই বনবাস হ'য়েচে। তুমি কি কোন খবর রাখ ? কেবল না'বার খাবার সময়েই তুমি আমাকে বাড়ীতে দেখ্‌তে পাও ; তারপর সমস্ত দিনটা যে আমি কোথায় থাকি, তা কি তুমি জান ? তুমি তো বড়ি দিতে, আর কলাই ভাঙ্গতে, আর বিয়ের উদ্যোগ ক'র্‌তে ভোর থেকে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাক। আমার কোন খোঁজ খবর রাথ কি ? আমি যে বাড়ীতে দুই দণ্ড তিষ্ঠিতে পার্‌চি না ? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল বনবাসই আশ্রয় ক'রেছি। যদি বিয়ের আগেই বনবাস ক'র্‌তে হলো, তবে বিয়ে আর কে ক'র্‌বে।"

"কেন বাবা কি হ'য়েচে ? তুমি বাড়ীতে থাক না কেন ? তোমাকে তো সত্যি আমি সমস্ত দিন দেখ্‌তে পাই না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌তে হ'লে. কোথাও খুঁজে পাই না। তুমি বনের মধ্যে একলা কেন থাক, বাবা ? আমি তো তোমায় অনেক দিন মানা ক'রেচি ?"

আমি বলিলাম,—"তা তো ক'রেচ, সত্য। কিন্তু আমি যে পাড়ার মেয়েগুলোর জ্বালায় অস্থির হলুম। যারা বার মাস ত্রিশ দিন আমায় দেখ্‌চে, তারাও যে ওপরে উঠে আমার ঘরে উঁকি মার্‌চে ! বলি, হাঁ মঙ্গলা, বিয়ের কথা হচ্চে ব'লে আমার চেহারা খানারও কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েচে না কি ? পাড়ার মেয়েগুলো আমায় দেখবার জন্তে এত উঁকি ঝুঁকি মারে কেন, তা বল্‌তে পারিস্ ?"

বস্ ! আমার কথা শেষ না হইতে হইতে মঙ্গলা দাসী হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রন্দনের স্বরে বলিতে লাগিল,—"যত দোষ, নন্দ ঘোষ ! পাড়ার মেয়েরা ওপরে উঠে ওঁ-কে দেখ্‌তে যায় কেন, তারও কৈফিয়ৎ আমায় দিতে হবে। মা বুঝ্‌তে পার্‌চ দাদাঠাকুরের কথা ? আমিই যেন ওঁ-কে বনবাসী করেচি। আমিই যেন পাড়াশুদ্ধ মেয়েকে ডেকে এনে ওঁ-র ওপরের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্চি। জানি নে আমার উপর বাদ সাধচে কে

পোড়ার মুখো! মা গো, তুমি শীগ্‌গীর আমাদের ও বাড়ীতে চল; আমি এখানে আর থাক্‌তে পার্‌বো না। হেঁ গো, এক মাস হ'য়ে গেল, বাবা যে এখনও বাড়ী এলেন না! আজকে যে চিঠি এসেচে, তা'তে বাবা কি লিখেচে গো?"

চিঠির কথা শুনিয়া মা বলিলেন,—"সত্যি তো; কই চিঠিখানা তুই দেবুকে দিস্ নেই? তোকে যে দিয়ে আস্‌তে বল্লুম?"

"বল্লে তো,কিন্তু বনের ভিতর কে একলা যাবে, বাবা? কেশ্‌বা ছোঁড়াও সেই যে কখন হাটে গেছে, এখনও তো ফিরে আসে নি! আমি ঐ বালি-শের নীচে চিঠিখানা রেখে দিয়েচি।"

আমি বলিলাম,—"বেশ করেচো। আহা, তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে কি আর ভূ-ভারতে আছে? দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়?"

এতক্ষণ গর্জ্জন হইতেছিল, অতঃপর সত্য সত্যই বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল।

আমি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িয়া ফেলিলাম। মা বলিলেন, "কি লিখেচেন?"

আমি বলিলাম,—"সংবাদ ভাল; বাবা কাল সকালে এখানে এসে পৌঁছিবেন। সঙ্গে বড় বৌ, মেজ বৌ ও ছেলেরা আসচে! বড় দাদা এখন ছুটী পাবেন না, সুতরাং তাঁরই কেবল আসা হচ্চে না। মেজ দাদা বিয়ের কাছা কাছি দুই চারি দিনের ছুটী নিয়ে আস্‌বেন। আর যতীনও আস্‌বে। কিন্তু মাসীমাকে আন্‌তে এখান থেকে লোক পাঠাতে হ'বে। দেখ মা, বাবা বুঝি সেখান থেকে আমার বিয়ের সম্বন্ধে গোস্বামী মশাইকে চিঠিপত্র লিখেছিলেন? এই শোন না বাবা কি লিখচেন:—'শুভ পরিণয় কার্য্য যাহাতে এই ফাল্গুন মাসেই সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য গোস্বামী মহাশয় অত্যন্ত জিদ্ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমারও বিবেচনায়, আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই। তোমার গর্ভধারিণীকে বলিবে, তিনি যেন উদ্যোগ আয়োজন করিতে তৎপর হন। আমিও শীঘ্র যাইতেছি, ইত্যাদি।'

বৃষ্টি পড়িতে পড়িতে রৌদ্র উঠিল। অশ্রুমুখী মঙ্গলা এই শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিয়া উঠিল,—"দাদাঠাকুর, তুমি আমায় দোষ দিচ্ছিলে? এই দেখ না, বাবাই ওদের পত্র লিখেচেন! তাই তো আর যোগমায়া আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে চায় না!"

আমি মঙ্গলাকে চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া নীরব হইতে বলিলাম এবং তৎপরেই বলিলাম,—"তুই ব'কে মর্‌চিস্ কেন? এখন শীগ্‌গীর বড়ি দেওয়া শেষ করে, ঘর দুয়োর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্‌গে যা। বৌদিদিরা আস্‌চে,—যতীন আস্‌চে—জানিস্ তো যতীন ধূলো ময়লা দেখতে পারে না—আবার যতীনের মুখ খেয়ে ম'র্‌বি?"

মঙ্গলা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ইস্, আমার যতীন ভাই তেমন ছেলে নয়, যতীন আমাকে বড় বোনের মতন ভক্তি করে। যেমন মাসী-মা তেমনি যতীন। যাই হো'ক্, তুমি সত্যি ব'লেচো, আমার ঢের কাজ আছে। মা, তুমি বাপু একলাই বড়ি দেওয়া সাঙ্গ কর। আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখি গে। বৌরা কেউ এই বাড়ীখানা দেখে যায় নি। আমার কোন দোষের জন্যে যদি তারা এই বাড়ীর নিন্দা করে, তবে তা ভাল দেখাবে না, বাছা। দাদাঠাকুর, তুমি কেশবকে ডেকে বাইরের ঘর আর উঠোন পরিষ্কার করতে বল গে। আমি ভেতরের সব দেখ্‌চি। ওগো, তুমি কল্‌কেতা থেকে যে ছবিগুলি এনেচো, সেগুলি ওপরের নীচের ঘরে টাঙ্গিয়া দাও না? কখন আর টাঙ্গাবে? আমি সব নিকিয়ে পুছিয়ে ঠাকুর ঘরের মতন পরিষ্কার ক'র্‌বো। মঙ্গলার যে কেউ দোষ ধর্‌বে, তা তো প্রাণ থাক্‌তেও সহ্যি হবে না, দাদা।" এই বলিয়া মঙ্গলা বড়ি দেওয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি পিষ্ট কলাইয়ে লেপিত থাকিলেও বাম হস্তে মার্জ্জনী ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রক্ষালন করিতে গমন করিল।

জননী-দেবীর অবশ্য আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী এবং ভগিনী-পুত্র আসিতেছে শুনিয়া তিনি বড়ি দিতে দিতেই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি মঙ্গলার উপদেশক্রমে উপরের ও নীচের ঘরে যথা স্থানে ছবিগুলি টাঙ্গাইবার উদ্যোগ করিতে গেলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৌদিদিরা তাঁহাদের পুত্রকন্যা ও দাসীদের সহিত পিতৃদেবের সমভি-ব্যাহারে পলাশবনে উপস্থিত হইলেন। যতীন্দ্রও আসিল। আবার যথা-সময়ে মাসিমা ও রাজুদিদিও (আমার মাস্‌তুতো ভগিনী) আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। বড় দাদার কন্যা অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা নীরদা ও মেজ দাদার পুত্র-দ্বয় চুনী ও মতির আনন্দ কোলাহলে গৃহ সর্ব্বক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার উপর গ্রামের বালক বালিকা ও যুবতী প্রৌঢ়াদের নিয়ত গমনাগমনে ও কথোপকথনে গৃহ যেন হাটে পরিণত হইয়া উঠিল। আমার তো আর গৃহে তিষ্ঠিবার যো ছিল না। আনন্দময়ী মেজ বৌ দিদি অবসর ও সুযোগ পাইলেই বিদ্রূপ ও উপহাস দ্বারা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলি-তেন। আমি তাঁহার ভয়ে আমার বনরূপ দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলাম। যে দিন তাঁহারা পলাশবনে আসিলেন, সেই দিন গৃহে পদার্পণ করিয়াই তিনি আমাকে কিরূপ অপ্রতিভ করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

মেজ বৌ দিদি আমাকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "তবে ঠাকুরপো, আমাদের কিসের জন্যে নেমন্তন্ন করা হ'য়েচে ? বলে ছিলে না এজন্মে কখন বিয়ে করবে না ? মনে আছে, আমি বলেছিলুম, বেঁচে থাকি তো দেখ্‌বো ! আমার কথা সত্যি হ'লো কি না দেখ। বলি, ক'নে মনে ধ'রেচে তো ? কোথায় ক'নের বাড়ী ? আমরা একবার দেখ্‌তে পাব না ?"

আমি বলিলাম,—"এত ব্যস্ত কেন, বৌ দিদি ? আগে ব'স, ঠাণ্ডা হও ; দুদিন থাক ; তার পর বিয়ে হোক। বিয়ে হ'লে যত ইচ্ছে, তত দেখো।"

"ও ভাই, তোমার কথায় আমি ভুল্‌চি না। বিয়ে হ'লে, আমরা বুঝি আর ইচ্ছেমত দেখ্‌তে পাব। আমাদের বুঝি আর কাযকর্ম্ম নেই। আর তখন আমরা দেখ্‌ব, না তুমি দেখ্‌বে ? উঁহুঁ, তা হ'বে না। বলি, ও মঙ্গলা ঠাকুজ্‌জি, তুই বুঝি ক'নেকে এনে রাখ্‌তে ভুলে গেছিস্‌। আমরা যে আস্‌চি, তা বুঝি তুই মনের মাথা খেয়ে ভুলে গেছিস্‌ ?"

মঙ্গলা হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আস্‌তে তর নাই ভাই, গাল্‌ দিতে আরম্ভ ক'রলে ? দেখ্‌চি, বিয়েবাড়ীতে আমাকে আর লুচিমণ্ডা খেয়ে পেট ভরাতে হ'বে না। তোমার গাল্‌ খেয়েই আমার পেট ভ'রে যাবে ! কিন্তু সত্যি বল্‌চি, ভাই, তোমার গাল্‌ লুচিমণ্ডার চেয়েও মিষ্টি। আজ অনেক দিন তোমার গাল্‌ খাই নি। বলি, বৌ দিদি, আমাদের কি এমনি ক'রেই ভুলে থাকৃতে হয় ? দাদাঠাকুর তো বেশ ভাল আছে ?"

"ভাল আছে বই কি ? এই এল ব'লে ; দুদিন পরেই তাঁকে দেখ্‌তে পাবি। এখন তুই ক'নে আনায় কি কচ্চিস্‌ বল দেখি ? শীগ্‌গীর গিয়ে

একবার ক'নেকে ধ'রে নিয়ে আয়। ক'নেকে বল্‌গে যা, ঠাকুরপো একবার দেখ্‌তে চেয়েচে।"

আমি বলিলাম,—"বল কি, বৌ দিদি ? তুমি যে মুস্কিল ক'র্‌লে ?"

"মুস্কিল কিসের ? আমরাই বুঝি একলা দেখবো আর তুমি চোখ্‌ বুজে থাক্‌বে ! তোমার দেখাই দেখা ; আমরা তো কেবল চোখেই দেখ্‌'ব ; তুমি যে চোখে ও মনে তুইয়ে মিলিয়ে দেখ্‌বে !"

"তা তো আমি অনেকবার দেখেচি আর নিত্তিই দিখ্‌চি। এখন তুমি দেখ্‌তে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা।"

"আচ্ছা তাই হ'বে। আমরাই দেখবো, কিন্তু দেখো, ভাই, ক'নে এলে তুমি যেন উঁকি ঝুঁকি মেরো না। আমি মঙ্গলা ঠাকুজ্জিকে কড়াকড় পাহারা দিতে ব'লে দেবো। ঠাকুর ব'ল্‌ছিলেন, তুমি ঐ বনের মধ্যে কোন্‌ খানে দিন রাত ব'সে থাক ; তুমি সেইখানেই যাও। আ আমার পোড়া মন,— ঠিক্‌ কথাই তো, তুমি যে আজকাল বনের মানুষ বনমানুষ হয়েচো। তোমার আবার ক'নে দেখা কি ? তুমি কতকগুলো বই নিয়ে সেইখানে শুয়ে শুয়ে পড়্‌গে, যাও।"

"ইস্‌, বৌ দিদি যে ভারি পণ্ডিত হ'য়ে এসেচ দেখ্‌চি।"

"হব না কেন ? যার ঠাকুরপো পণ্ডিত, তার বৌ দিদি পণ্ডিত হ'বে না ?" "ঠাকুরপো তো বনমানুষ, ঠাকুরপোর মতনই বুঝি বৌদিদি পণ্ডিত ?"

"তা কাযেকাযেই। এখন মঙ্গলা ঠাকুজ্জি, তুই ক'নে আন্‌তে যাচ্চিস্‌ ?"

মঙ্গলা বলিল, "যাব না কেন ? এই চল্লুম। কিন্তু ক'নে যদি আসে, তা হ'লেই তো ? আজ পনর দিন সাধ্যিসাধনা ক'রে তাকে তো একটীবারও এ বাড়ীতে আন্‌তে পাল্লুম না।"

"আচ্ছা, তুই ক'নেকে ব'ল্‌গে যা, আমাদের এখানে জুজুর ভয় নেই। আর জুজু থাক্‌লেও, দিনের বেলায় সে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তবে তার আর ভয় কিসের ? তাকে আরও বলিস্‌ সে যে সম্পর্কে আমার বোন্‌ হয় ! যোগমায়ার মা আমার হরপিসীর সাক্ষাৎ জা রে ! আমি ঠাকুরের কাছে যোগমায়ার বাপের কথা শুনে তখনি সব সম্পর্ক ব'লে দিয়েছিলুম।"

মঙ্গলা বলিল,—"বটে ? সত্যি না কি ?" কিন্তু সংবাদ শুনিয়াই সে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ওমা মা, আর শুনেছ, যোগমায়া যে আমাদের মেজ বৌ দিদির কি রকম বোন হয় গো !"

জননী তো মঙ্গলার কথা তিন চারি বারেও শুনিতে পাইলেন না। মতি তাঁহার কোলে চাপিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। জননী দেবী তাহাকে জোর করিয়া কোলে রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু সে কোন-মতেই কোলে থাকিবে না। মতির চীৎকারে, মঙ্গলার উচ্চস্বরে, ও জননীর ভৎ´সনা শব্দে গৃহখানি শব্দায়মান হইতেছিল। আমিও সুযোগ বুঝিয়া মেজ বৌ দিদির বিদ্রূপবাণ হইতে মুক্তি লাভের আশায় বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আসিয়াই দেখি, নীরদা ও চুনী ভিত্তিবিলম্বিত চিত্রপটগুলি মনোযোগ সহকারে দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "নেরো, চুনী, ভাল আছিস্?"

আমার স্বর শুনিয়াই দুইজনে দৌড়িয়া আসিয়া আমার দুই হাত ধরিল এবং অতিশয় বিনয় ও ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে লাগিল, "কাকাবাবু, আমাদের একবার ঐ বনের মধ্যে নিয়ে চল না। যতীনকাকা ওর মধ্যে বেড়াতে গেল; আমরাও যাচ্ছিলুম, কিন্তু যতীনকাকা আমাদের যেতে দিলে না; বল্লে, বিকেল বেলায় তোদের নিয়ে যাব। কাকাবাবু, তুমি এখনি একবার আমাদের বন দেখিয়ে নিয়ে এস না?"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে।" এই বলিয়া দুইজনকে দুই হাতে ধরিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।"

নীরো ও চুনীর নানা প্রকার অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমি তাহাদিগকে বনের কিয়দংশ দেখাইয়া লইয়া আসিলাম। পরে গৃহমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে দেখিতে পাইলাম, একটী ছায়াসমন্বিত মনোরম স্থানে, কতিপয় পুষ্পিত শাল বৃক্ষের তলে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপরে যতীন্দ্র ভায়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে। যতীনকে দেখিয়াই বলিলাম, "কি, যতীন, বাড়ীতে না গিয়ে সোজাসুজিই যে বনের মধ্যে ঢুকেচো! মুখ হাত ধুলে না, স্নান কল্লে না, কিছু খেল্লে না?"

"এই যাচ্চি; এখনও তত বেলা হয় নাই; আর একটু দেরী হ'লেও তত-ক্ষতি নাই। কিন্তু যা' হো'ক, দাদা, বড় সুন্দর যায়গাতেই আপনি বাড়ী ক'রেচেন। আমি তো এমন মনোরম স্থান কোথাও দেখি নাই। এতবার এ দেশে এসেচি, কই একবারও তো পলাশ বনটা দেখে যাই নাই। এত নিকটে যে এমন স্থান থাক্‌বে, তা তো আমি একটী দিনও ভাবি নাই।

আমি ঐ পাহাড়টার উপরে উঠেছিলাম। আহা, ওর উপর থেকে কি সুন্দরই শোভা! একটী ছোট নদী ওর তলে ব'য়ে যাচ্চে। আমি সেই নদীটি ধ'রে বনের মধ্যে অনেক দূর বেড়িয়ে এলাম। আমার তো এখান থেকে উঠ্‌তে মন যাচ্চে না।"

"হাঁ, জায়গাটি খুব মনোরম বটে; তুমি এখানে কিছুদিন থাক; তোমার সঙ্গে দিনকতক খুব সুখে কাল কাটানো যাবে। এখানে আমায় বড় একলা একলা ঠেকে। কারুর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে পাই না; কেবল মাঝে মাঝে বই পড়ি আর এদিক্ ওদিক্ বেড়িয়ে বেড়াই। তোমাদের বি, এ, পরীক্ষার ফল এখনও বেরোয় নাই?"

"না; শীগ্‌গীর বেরুবে। পাশ হ'বার তো অনেকটা আশা করি। তবে এখন কি রকম হয়, তা বল্‌তে পারি না।"

"হ'বে আর কি? ভালই হ'বে। এখন চল বাড়ী যাওয়া যাক্। এই ছেলে-গুলো এসে অব্‌ধি এখনও কিছু খায় নাই। আর তুমিও কিছু খাবে চল।"

যতীন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া আমার সঙ্গে চলিল।

পথিমধ্যে কেশবের সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল "মহাশয়, আমি তো আপনাকে খুঁজে খুঁজে হায়রান হলাম। ঘণ্টা খানেক আপনার, যতীনবাবুর ও এই ছেলে দুটীর তল্লাসে ঘুরে বেড়াচ্চি। ইনারা এখনও কিছু খায় নাই। আর মা কিসের তরে তো আপনাকে ডাক্‌চেন। মঙ্গলা বল্লেক, তিনি উপরে আপনার পড়বার ঘরটাতে বসে আছেন।"

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিলাম। পড়িবার ঘরে গিয়া দেখি, সেখানে মা নাই; কিন্তু এক ঘর মেয়ে ছেলে। মেজ বৌদিদি, বড় বৌদিদি, তাঁহাদের দাসীদ্বয়, আমাদের শ্রীমতী মঙ্গলা, প্রতি-বাসিনী দুই একটী নবীনা, ভূদেব, সুশীলা, ভাবিনী ও যোগমায়া! সর্ব্বনাশ! সব মেজবৌদিদির চাতুরী! আমাকে দেখিয়াই মেজবৌ, বড়বৌ হাসিয়া উঠিলেন। মঙ্গলা ও দাসীদ্বয়ও সেই হাস্যে যোগদান করিল। আমি ব্যাপার দেখিয়া চম্পট দিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; কিন্তু মেজবৌদিদি আমার ভাবভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া নিমেষের মধ্যে আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আ ঠাকুরপো, যাও কোথায়? এমন শোভা দেখ্‌তে মন যায় না? একবার চোখ খুলে দেখ দেখি! কেবল বন জঙ্গল আর পাহাড় দেখে কি কখন এমন চোখ জুড়োয়? এই দেখ

না, খোকাবাবু (মতি) এরই মধ্যে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেচে। যোগমায়াকে দেখে খোকা বল্লে,—"মা এ কে ?" আমি বল্লুম,—"তোর কাকী মা ?" "মা আমি কাকীমার কোলে ভাপ্‌বো।" এই দেখ না, খোকা বাবু সেই অবধি তার কাকীমার কোল দখল ক'রে বসেচে। ছেলে নারায়ণ, আপনার লোক দেখেই চিন্তে পেরেচে।—বলি ঠাকুরপো, তুমি তো আর মেয়েমানুষ নও ; তুমি এত লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্চ কেন ?"

আমি বল্লুম,—"নীরো ও চুনীকে বন দেখাতে নিয়ে গেছ্‌লুম।"

বৌদিদি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া যোগমায়াকে বলিল,—"ও ভাই, তুমিও একবার চোখ দুটী তোল দেখি। ঠাকুরপো আমার বনমানুষ নয়, জুজুও নয় ; কার্ত্তিকের মতন ছেলে। বিদ্যের জাহাজ। এক দণ্ডের তরেও যে তুমি এঁকে চোখের আড়াল ক'র্‌বে না, তা তো বুঝ্‌তেই পাচ্চি। এখন একবার আমাদের সাম্‌নে ওঁকে শুভদর্শন কর দেখি ? দেখে একবার আমাদের পোড়া চোখ জুড়িয়ে যাক্।"

আমি বৌদিদির হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম ; কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতেছিলাম না। সহসা এই সময়ে পিতৃদেবের আহ্বান শুনিতে পাইলাম।

পিতৃদেবের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র, বৌদিদি হাত ছাড়িয়া দিলেন। আমিও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং তদ্দণ্ডেই ঊর্দ্ধশ্বাসে নীচে পলাইয়া আসিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনেরা প্রায় সকলেই আসিয়া পঁহুছিলেন। আসিলেন না কেবল বড় দাদা ও বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ। বড়দাদা ছুটী পান নাই বলিয়া আসিতে পারিলেন না। আর সত্যেন্দ্র শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসিল না। সত্যেন্দ্র না আসাতে আমি বড় দুঃখিত হইলাম। তাহার উপর আমার একটু অভিমানও হইল। কিন্তু তাহার পত্রখানি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলাম, সে বাধ্য হইয়াই আসিতে পারিল না। আজ প্রায় ছয় মাস কাল সত্যেন্দ্র ম্যালেরিয়া জ্বরে কষ্ট পাইতেছে ; তাহার শরীর এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। ডাক্তারেরা তাহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাই সে

এক বৎসরের অবকাশ লইয়া কিছুদিন এলাহাবাদে ও কিছুদিন অন্যত্র বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সত্যেন্দ্র অবকাশের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে। এখনও প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ হইলেই সে এলাহাবাদ যাত্রা করিবে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, সত্যেন্দ্রের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। সুরমারই সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা বার্ত্তা স্থিরতর হইয়া আছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রের শরীর অসুস্থ এবং কিছুদিন পূর্ব্বে সুরমারও জননী-বিয়োগ হওয়াতে, তাহাদের বিবাহ কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত আছে। যাহা হউক, সত্যেন্দ্র বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত হইতে না পারিলেও, পত্রে হৃদয়ের সহিত নবদম্পতীর সুখ ও মঙ্গল কামনা করিয়াছিল এবং যোগমায়ার ও আমার জন্য যথাযোগ্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিল।

বিবাহের লগ্ন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; অবশেষে একদিন আসিয়া পড়িল এবং যোগমায়াকে ও আমাকে পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নিমেষের মধ্যে অতীতের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যোগমায়ার সহিত পরিণীত হইয়া আমার মনে হইতে লাগিল, যোগমায়া যেন আমার কত কালের পরিচিতা; যোগমায়া যেন আমার কতকালের পরিণীতা পত্নী; যোগমায়া যেন চিরকালই আমার ছিল; তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন যেন কোন্ দূর-সুদূর-স্মরণাতীত যুগে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে; সে গ্রন্থি যেন এখনও তেমনই অটুট ও দুশ্ছেদ্য! ব্যাপার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সবই যেন মায়ার ক্রীড়া, সবই যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেহের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম যোগমায়াতে ও আমাতে যেন কিছু মাত্র প্রভেদ নাই—আমরা উভয়েই অভিন্নদেহ! মনের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম আমরা উভয়েই একমন! আত্মার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম আমরা উভয়েই অভিন্নাত্মা! আশ্চর্য্য ব্যাপার! অদ্ভুত কাণ্ড! যোগমায়ার সহিত আমার এই বিস্ময়কর মিলন একদিনে—এক মুহূর্ত্তে কিরূপে সংঘটিত হইল, তাহা কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

বিবাহের পর বরবধূর বিদায়। কন্যাবিদায়-রূপ স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন ব্যাপার গৃহে গৃহে নিয়তই অনুষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে নূতন কথা আর কি বলিব? তবে এই স্থলে এই মাত্র উল্লিখিত হইতে পারে যে, কন্যা বিদায় করিবার কালে গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় সংযতচিত্ত ব্যক্তিও বালকের মত রোদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং যখন সকলেই নয়নজলে

ভাসিতেছিল, তখন ভূদেব ভায়া বিজ্ঞের ন্যায় আশ্বাসসূচক স্বরে পিতা-মাতাকে বলিয়াছিল, "মা, বাবা, তোমরা কাঁদ্‌চ কেন? আমি দিদির সঙ্গে যাব। তোমাদের ভাবনা কি?" বালকের এই কথা শুনিয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "দুঃখের উপর হাসি" যাহাকে বলে, ভূদেব ভায়া তাহারই অভিনয় করিয়াছিল।

বধূকে লইয়া আমি গৃহে উপস্থিত হইলাম। জননীদেবীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার মনের সাধ এত দিনে পূর্ণ হইল। তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাড়ীতে কতিপয় দিবস আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বগলাপিসীও নিমন্ত্রিতা হইয়া পলাশবনে আসিয়াছিলেন। তিনি বাড়াতে পদার্পণ করিয়াই মাকে বলিযাছিলেন,—"দেখ্‌লে বৌ, আমার কথা সত্যি হলো কি না? আমি বলেছিলুম, তুমি দেবুর জন্য ভাবচো কেন? দেবু তো তোমার তেমন ছেলে নয়; অত লেখাপড়া শিখেচে; জ্ঞানমান হ'য়েচে; ও কি কখন তোমার মনে কষ্ট দিতে পারে? আহা, দেবু বড় শান্ত শিষ্ট ছেলে গো। আমাদের সকলকেই বড় ভক্তি করে।"

কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম,—"তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু, বাপু, আগে যোগমায়াকে দেখে দেবু এই পলাশবনে নিশ্চিত ঘর ফাঁদায় নাই।"

বৌদিদিদের জ্বালাতনে আমি সর্ব্বদাই অস্থির হইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাদের বিদ্রূপ বাণের ভয়ে বনরূপ দুর্গে আর আশ্রয় লইতাম না। যোগমায়াকে দেখিবার ও তাহার সহিত কথোপকথন করিবার সুযোগ আমি সর্ব্বদাই খুঁজিয়া বেড়াইতাম। দেখার সুযোগ প্রায়ই ঘটিত; কিন্তু কথোপকথনের সুযোগ বড় একটা ঘটিত না। এই কারণ অনেক সময় বড় ক্ষুব্ধ হইয়া থাকিতাম।

বিবাহের গোল ক্রমে কমিতে লাগিল। দূরস্থিত আত্মীয় কুটুম্বেরা একে একে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। যোগমায়াও মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে যাইয়া দুই চারি দিবস থাকিত। আবার আমাদের বাটী আসিত। আমি অল্পে অল্পে যোগমায়ার অন্তরের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। কিন্তু সে পরিচয়ে প্রথমে ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহের পর আমাদের দেশে প্রেম জন্মে। সুতরাং বিবাহ করিয়াই কেহ বলিতে

পারেন না, তিনি দাম্পত্য সুখের অধিকারী হইবেন কি না। এই সুখ অধিগত না হওয়া পর্য্যন্ত, সকলকেই সংশয়দোলায় দুলিতে হয়। এই সংশয়ের কালটি বড়ই যন্ত্রণাজনক। তবে আশাটুকু মাত্র সুনিপুণ শিল্পী হইলে আমরা মনোমত দেবতা গড়িয়া লইতে পারি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মাসী-মা ও রাজু দিদি স্বদেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু জননীদেবীর বিশেষ অনুরোধ ক্রমে তাঁহারা পলাশবনে আরও কিছুদিন থাকিতে সম্মত হইলেন। যতীন্দ্র ভায়া তো পরীক্ষার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমার নিকটে থাকিতে স্বীকৃতই হইয়াছিল। কিন্তু ভায়াকে গৃহে বড় একটা দেখিতে পাইতাম না। ভায়া আমার বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে ও নিকটস্থ কৃষকগ্রাম সমূহে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত এবং নীরো, সুশীলা, ভূদেব প্রভৃতি বালকবালিকাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সখ্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে নানা স্থান দেখাইয়া লইয়া বেড়াইত। নীরো ও সুশীলার মুখে আমি তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রতিদিনই শুনিতে পাইতাম এবং সে বনের মধ্যে বসিয়া তাহাদিগকে পেন্সিলে যে সকল সুন্দর সুন্দর পশু পক্ষী, পুষ্প ফল, বৃক্ষলতার ছবি আঁকিয়া দিত এবং ছোট ছোট সরল কবিতা লিখিয়া দিত, তাহাও আমি দেখিতে পাইতাম। যতীন্দ্র এইরূপে বাহিরে বাহিরেই প্রায় সমস্ত দিন কাটাইত; প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ীর মধ্যে বড় একটা আসিত না।

একদিন বৈকালে, আমি পাঠ-গৃহে বসিয়া পাঠে নিমগ্ন আছি, এমন সময়ে যোগমায়া কি প্রয়োজন বশতঃ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুশীলা এবং ভূদেবও আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূদেব ও সুশীলাকে দেখিয়া আমি বলিলাম, "কি গো, খবর কি?"

সুশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "খবর আর কি! এই একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলুম।"

আমি বলিলাম, "বেশ ক'রেচো। আজ যতীনের সঙ্গে তোমরা কোন্ দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে।"

সুশীলা বলিল, "আজ আমরা বেশীদূর যেতে পারি নি। ঐখানে ব'সেছিলুম।"

"কেন ? যতীন আজ কি কচ্ছিল ?"

"যতীনবাবু আজ আমাকে একটা ছবি এঁকে দিয়েচেন, আর ভূদেবের জন্যে একটী কবিতা লিখে দিয়েচেন।" এই বলিয়া সুশীলা ভূদেবের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "কিসের কবিতা ? আর কি ছবি দেখি।"

সুশীলা ছবি ও কবিতা দেখাইবার পূর্ব্বে হাতের মধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া, বলিতে লাগিল "আজ, ভূদেব, তোমার গোলাপ গাছের একটী বড় ফুল তুলে তার পাপ্‌ড়ীগুলি নষ্ট ক'রেছিল। তাই না দেখে যতীনবাবু বল্লে 'ভূদেব, তুমি ফুলটি নষ্ট করে ভাল কর নি। এস আজ তোমার জন্যে একটী কবিতা লিখে দি।' এই বলে তিনি একটী গাছের তলায় ব'সে এই কবিতাটি লিখ্‌লেন। আমি বল্লুম, 'যতীনবাবু আমায় একটী ছবি এঁকে দাও না ?' তাই শুনে যতীনবাবু তোমার ফুলগাছের ও ভূদেবের এই ছবিটী এঁকে দিয়েচেন।" এই বলিয়া আনন্দময়ী সুশীলা হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে সেই ছবি ও কবিতাটি দেখাইল।

আমি বলিলাম, "বেশ ছবি হয়েচে। কিন্তু ভূদেবের চুলগুলো এই রকম উস্কো খুস্কো না কি ?"

সুশীলা ও যোগমায়া ছবি দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। ভূদেব অপ্রতিভ হইয়া তাহার বড়দিদির পশ্চাতে আশ্রয় লইল।

আমি বলিলাম "সুশীলা, ছবি তো দেখ্‌লাম, এখন যতীন কি কবিতা লিখেচে পড় দেখি শুনি।"

সুশীলা পড়িতে আরম্ভ করিল :—

'ফুলের উক্তি।"

ওহে শিশু ভাই,
ভালবাস তুমি মোরে,
কাঁদহ আমার তরে,
একবার মোরে পেলে
নাচ দুই হাত তুলে ;
বড় প্রীতি পাই।

কিন্তু ওহে যবে,
গাছের ডালেতে বসি,
মনের আনন্দে হাসি,
কেন মোরে তুলে ফেলে
ছিঁড়িয়া আমার দলে,
নাশ হাসি তবে ?

৩

ভাই হে তোমার,
হাসিটি কাড়িয়ে ল'য়ে,
তার স্থানে কান্না দিয়ে,
যদি কেহ মজা দেখে,
ভাল কি বাসিবে তাকে,
বল দেখি সার ?

৪

তবে, ভাই, কেন,
বেচারী ফুলের প্রাণ,
কর তুমি খান খান,
হাসিটি কাড়িয়ে লও,
তার স্থানে কান্না দাও ?
ভাল কিহে হেন ?"

সুশীলার মুখে কবিতাটি শুনিয়া আমি সানন্দচিত্তে বলিলাম, "যতীন তো বেশ কবিতা লিখেছে, সুশীলা ?"

সুশীলা কিছুই উত্তর দিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে যেন ঈষৎ ভাবিয়া বলিল,—"আচ্ছা, দেবেন বাবু, তবে আমরা যে রোজ ঠাকুর পুজোর জন্যে ফুল তুলি, তা তো দোষ ?"

আমি এ প্রশ্নের যে কি সদুত্তর দিব, সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, "ঠাকুর দেবতার পুজোর জন্যে ফুল তোলা দোষের নয়। ফুল তুলে মিছেমিছি নষ্ট করাই দোষ। এই শোন না, আমাদের দেশের একজন কবি বলেচেন :—

'কিন্তু রে কুসুম, আর্য্যসুতগণে,
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে,
সেই সে তোমার ঠিক্ ব্যবহার,
এই কথা আমি ভাবি মনে মনে
এমন সুন্দর এমন কোমল
দেবপদ ভিন্ন কোথা যাবে বল।'

আমার উত্তর শুনিয়া সুশীলার মুখ যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

সুশীলার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার আর কোনও বিষয় নাই দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম,—"সুশীলা তোমার দিদির তো একটী বর জুটে গেল,—এখন তোমার একটী রাঙ্গা বর জুটলেই আমরা বড় সুখী হই।"

সুশীলা তাই শুনিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া হাসিতে হাসিতে আমার হাত ধরিয়া মৃদু মধুর অস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল,—"কেন আমি যতীন বাবুকে বিয়ে ক'র্‌বো।"

কথা শুনিয়াই যোগমায়া ও আমি আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে চমকিত

হইয়া উঠিলাম। আমি প্রফুল্লমুখে বলিলাম, "আঁা, যতীন তোমাকে কিছু বলেচে না কি, সুশীলা ?"

"বলেচে বই কি ? যতীনবাবু আমাকে বল্‌ছিল, 'সুশীলা আমার বে' কর্‌বি ?' আমি বল্লুম, 'ক'র্‌ব'।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যতীনকে তোমার বেশ পছন্দ হ'য়েচে ?"

সুশীলা বলিল, "হয়েচে।"

এই কথা শুনিবামাত্র আমি সুশীলাকে সবলে তুলিয়া বারাণ্ডায় বাহির হইয়া বলিলাম, "ওমা, ও মাসিমা, ওগো, আর একটী আমাদের বৌ হ'য়েচে গো। সুশীলা যতীনকে বিয়ে ক'র্‌বে ব'লেচে, শুন্‌বে এস।" এই আকস্মিক ও অসম্ভাবিত বিপৎপাতে সুশীলা অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া আমার হস্ত-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আশায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরিশেষে কোনও রূপে কৃতকার্য্য হইয়া আলুলায়িত বেশে ও বিগলিত কুন্তলে হস্ত হইতে নিপতিত সেই কবিতা ও ছবিটি পর্য্যন্ত তুলিয়া লইবার অবসর না পাইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। ভূদেব ভায়া ভগিনীকে কোনও গুরুতর বিপত্তিতে বিপন্না মনে করিয়া তৎপূর্ব্বেই বেগে চম্পট দিয়াছিল। ভায়ার বোধ হয় এইরূপ কোনও নীতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকিবে :—"যঃ পলায়তে, স জীবতি।"

হাসিতে হাসিতে আমাদের তো দেহের বন্ধন খসিবার উপক্রম হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মা, মাসিমা, বড়বৌ, মেজবৌ, রাজুদিদি প্রভৃতি উপরে আসিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সেই ছবি ও কবিতা দেখাইয়া সমস্ত ব্যাপার বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া মা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা, কি আশ্চর্য্যি মিলন গো! এই যে এই মাত্তর দিদির সঙ্গে আমি এই বিষয়ে কথা কচ্ছিলুম!"

মেজবৌদিদি তাহা শুনিয়া বলিলেন, "মাসিমা, আর কি দেখ্‌চো বাছা, তোমার ছেলের বে'তে লুচিমণ্ডা না খেয়ে আমরা আর যাচ্চি না।"

মাসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই হোক্ মা, তাই হোক্ মা; এত আনন্দেরই কথা।"

এই গোলমালের সময় বাবা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমিও কালবিলম্ব না করিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

———

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মেজবৌদিদি যতীন ভায়াকে লইয়া কতিপয় দিবস আবার খুব হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতীন সহজে অপ্রতিভ হইবার ছেলে ছিল না। দুই জনে সমানে সমানে পড়িয়াছিল। একদিন যতীন ও আমি পড়িবার ঘরে বসিয়া সাহিত্যালাপ করিতেছি, এমন সময়ে মেজবৌদিদি, যোগমায়ার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। যতীন যোগমায়াকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল; কিন্তু আমি তাহাকে নিবারণ করিলাম, তাহা দেখিয়া মেজবৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, তুমি যতীনকে আট্‌কিয়ে রাখ্‌বে কেন? ওর যে সময় নষ্ট হবে।"

যতীন বলিল, "কি রকম?"

মেজবৌদিদি বলিলেন, "কি রকম! ন্যাকা আর কি! ভাই আমার যেন কিছুই জানেন না! সুশীলা, ভূদেব এসেচে যে, সুশীলার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না।"

"যাব বই কি? কিন্তু কেবল সুশীলারই সঙ্গে তো আর বেড়াই না। সুশীলা, ভূদেব আর আমাদের বাড়ীর ছেলেরা সকলেই তো সঙ্গে যায়।"

"তা তো যায়; কিন্তু সুশীলারই সঙ্গে আজ কাল আসল বেড়ানোটা হ'চ্চে।"

"কি রকম?"

"কি রকম! যেন কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চেন না! বলি, ছেলেমানুষ পেয়ে ফুস্‌লে ফাস্‌লে বে কর্‌বার যোগাড় করাটা তোমাদের পৌরুষের কায না কি? এই তোমার দাদা তো একটী মেয়েকে ফাঁদে ফেলে নিজস্ব ক'রে ফেল্‌লেন। তুমিও দাদার ভাই কি না, তাই তুমিও আবার আর একটীর যোগাড়ে ব'সেচো।"

আমি বলিলাম, "তুমি আমায় এমন কথা বলো না, বৌদিদি! এই তোমার সাম্‌নেই তো যোগমায়া র'য়েচে। একে জিজ্ঞাসা কর দেখি, বে' হবার আগে একটী দিনও আমি যোগমায়ার সঙ্গে কখনও কথা ক'য়েছিলাম? যোগমায়া তো বে' হ'বার আগে কতবার আমাদের বাড়ী এসেছিল? কই একদিনও আমি যোগমায়াকে দেখেছিলাম? আমি বনের মধ্যেই তো সমস্ত দিন থাক্‌তাম।"

মেজ বৌ দিদি বলিলেন, "না, যোগমায়ার সঙ্গে কোন কথা কও নেই;

আর যোগমায়াও তোমার সঙ্গে কোন কথা কয় নেই। তা সকলই সত্যি বটে। কিন্তু গাছের তলায় তুমি ঘুমিয়ে পড়লে যোগমায়া এসে তোমায় উঠিয়ে দিত। তোমার মুখ ধোবার জন্যে বাড়ী থেকে জল এনে দিত আর তুমি ঘামতে আরম্ভ করলে আঁচল দিয়ে বাতাস দিত। কথা ক'বার দরকার কি ভাই? কথা নেই বা কইলে?"

যোগমায়া অপ্রতিভ হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা মেজবৌদিদির গা টিপিতে লাগিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি তাই শুনেচো বুঝি?"

"যাই শুনি; বলি এখন নেই তোমাদের বে' হ'য়ে গেচে। যা হ'বার তা তো হ'য়েচে; এখন আর কেউ তার দোষ ধ'রবে না। কিন্তু যতীন ভাই, তুমি যে সুশীলাকে বে' ক'রবে বলেচো, ফুসলে ফাসলে তার মনটি কেড়ে নিয়েচো, যদি কোনও গতিকে সুশীলার সঙ্গে তোমার বে' না হয়, তা হ'লে তো মেয়েটার মাথা খেয়ে ফেলচো দেখচি।"

যতীন বলিল, "বে' হবে না কেন? এক শ বার হ'বে! আমি সুশী-লাকে বে' করবো; আর সুশীলাও আমাকে বে' করবে বলেচে।"

"কিন্তু ছেলেমানুষের মন, যদি তার মন ঘুরে যায়?"

"যায় তো যাবে; তার জন্যে আর ভাবনা কি? আমার মন তো ঠিক থাকলেই হ'লো। সুশীলা যদি বে' করতে চায়, আমি পেছপা হ'ব না।"

"বেশ, বেশ। খুব কবিতা লিখতে শিখেছিলে যাই হো'ক। তোমার মতন আর গোটা কতক কবি এ অঞ্চলে থাকলে দেখচি আইবুড়ো মেয়ে-দের মা বাপকে পাত্র খুঁজে খুঁজে হায়রান্ হ'তে হ'ত না। বেশ ভাই শিগ্গীর বে'টা ক'রে ফেল; আমরাও দেখে যাই। আমাদের তো আর বেশী দিন থাকবার যো নেই। কই তুমি একদিন আমাদের বন জঙ্গল পাহাড় দেখিয়ে নিয়ে এলে না? আমরা চ'লে গেলে, দেখাবে না কি? আর তুমি যে কোন্ সতীর বিষয়ে কি একটা কবিতা লিখেচো ব'লছিলে? সে দিন আমাদের অপসর ছিল না বলে তোমার কবিতা শুনতে পাল্লুম না। তা' আমাদের আর শোনানো হ'বে না, না কি?"

যতীন বলিল,—"বেশ কথা আজই তোমরা বেড়াতে চল। আজই তোমাদের সব দেখিয়ে আনবো আর সেই পাহাড়ে ব'সে সেই কবিতাটী শোনাবো।"

মেজবৌদিদি যোগমায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি ভাই, আজই যাবে? বিকেল বেলাতেই যাওয়া যাক্, চল। ঠাকুর এখন বাড়ীতে নেই; আর সকাল বেলাতে কাজের ঝঞ্ঝাটে আমাদের তো মর্‌বারও অপ্‌সর থাকে না! চল, রাজু ঠাকুজ্জি ও বড়দিদিকে বলি গে।" এই বলিয়া মেজবৌদিদি, যোগমায়ার সহিত নীচে গমন করিলেন।

আমি বলিলাম "কি বিষয়ের কবিতা লিখেচো, যতীন?"

"সিন্দুরে পাহাড় সম্বন্ধে।"

"সিন্দুরে পাহাড়? সিন্দুরে পাহাড় কোথায়?"

যতীন বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সিন্দুরেপাহাড় জানেন না? কি আশ্চর্য্য! এই যে আপনার বাড়ীর উত্তরে ছোট কাল পাহাড়টা, যার নীচে যমুনা নদী ব'য়ে যাচ্চে।"

"ওটার নাম সিন্দুরে পাহাড় না কি? কে জানে ভাই অত? আমি জানি একটা কাল পাহাড়। রোজই তো ওর উপরে বেড়িয়ে আসি; কিন্তু নাম টাম তো একদিনও শুনি নাই। তুমি নাম শুন্‌লে কোথায়?"

"কেন এই পলাশবনেরই লোকের কাছে।

ঐ পাহাড় সম্বন্ধে একটী সতীর অতি সুন্দর গল্প আছে। আমি সেই গল্প শুনে ঐ পাহাড়ের উপরেই ব'সে, এক কবিতা লিখেচি। মেজ বৌদিদি সেই কবিতারই কথা বল্‌ছিলেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তুমি দেখ্‌চি আমাদের ওয়ার্ড-স্বার্থ। ওয়ার্ড-স্বার্থও এই রকম বেড়াতে বেরিয়ে মনের মধ্যে কোনও ভাবের উদয় হ'লে পকেট থেকে কাগজ পেন্‌শিল বা'র করে কবিতা লিখ্‌তে বস্‌তেন। তাঁর অনেকগুলি কবিতা এই রকম ক'রে ঘরের বাইরেই লেখা হ'য়েছিল।"

"হাঁ, তা জানি। কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা ক'র্‌চেন! ওয়ার্ডস্বার্থ ছিলেন স্বর্গের কবি। জগতের মধ্যে একমাত্র তিনিই আদর্শ কবি-জীবন যাপন করেচেন।"

"তিনি যে আদর্শ কবি-জীবন যাপন ক'রেচেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে জগতের মধ্যে তিনিই একক ন'ন।"

যতীন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আর কে?"

আমি বলিলাম "আমাদের দেশে, এই ভারতবর্ষেই এরূপ কবি ছিলেন।"

"আমাদের দেশে ছিলেন? কে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম "কবিকুলগুরু মহর্ষি বাল্মীকি।"

"বাল্মীকি!"

যতীন্দ্রের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, "তুমি কি মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ পড় নাই?"

যতীন্দ্র বলিল "ছেলে বেলায় তো একবার কৃত্তিবাসের রামায়ণ প'ড়েছিলাম। তা'তে তো লেখা আছে, বাল্মীকি রত্নাকর ডাকাত ছিলেন। পরে রাম নাম ক'রে তার পাপক্ষয় হওয়াতে ব্রহ্মা এসে তাঁকে রামায়ণ লিখ্‌তে বলেন।"

আমি বলিলাম,—"মহর্ষির মূল রামায়ণে রত্নাকরের কোনই উল্লেখ নাই। তিনি রত্নাকর ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহও আছে। আর যদিই ধর, তিনি প্রথম জীবনে কুকর্ম্মী রত্নাকর ছিলেন, তা হ'লেও মনে রাখ্‌তে হ'বে, আমি রত্নাকরের কথা ব'ল্‌চি না। আমি মহর্ষি বাল্মীকিরই কথা ব'ল্‌চি।"

"আচ্ছা, বাল্মীকি কি প্রকার জীবন যাপন ক'রেছিলেন?"

"বাল্মীকি মহর্ষির জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি সেই সত্য, সুন্দর, মহান্, এক ও অদ্বিতীয় মহাপুরুষের ধ্যানধারণায় জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাপন করিয়া গিয়াছেন। লোকালয়ের বহির্ভাগে, মহারণ্যের মহান্ সৌন্দর্য্যের মধ্যে, শান্তিপূর্ণ আশ্রমে বাস করিয়া, কতিপয় অনুরূপ শিষ্যের সহবাসে, তিনি কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের লীলা হইয়াছিল, তাহা আমি মুখে প্রকাশ করিতে অক্ষম। সেই সৌন্দর্য্যের কণিকা মাত্র ধারণ করিতে গিয়া আমার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। জগৎপূজ্যা সীতাদেবী যাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, মহাত্মা রামচন্দ্র, ধীমান্ লক্ষ্মণ ও ভ্রাতৃভক্ত ভরত যাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভাবলে আজিও ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যে জাজ্বল্যমান থাকিয়া সমানভাবে পূজ্য হইতেছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞানের কথা কি আর বলিতে হয়? রামায়ণ কিরূপে প্রথমতঃ রচিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা তো তুমি জান?"

"না।"

"তবে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মহর্ষি স্বভাবকবি ছিলেন। সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও পূর্ণ পবিত্রতার একমাত্র আধার মহান্ পরমেশ্বরের আরাধনা

করিতে করিতে, জগতে তাঁহার এই পূর্ণতার অভিনয় দেখিবার জন্য, মহর্ষির হৃদয়ে স্বভাবতঃই এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। জগতের সমস্ত মহাকবিরই হৃদয়ে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জগৎ অপূর্ণ; বোধ হয়, সেই পূর্ণ মহাপুরুষের ইচ্ছাই এই প্রকার। কিন্তু অনেকে জগতে অপূর্ণতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয় এবং সতর্ক না হইলে জগৎবিদ্বেষী ও মানববিদ্বেষী হইয়া পড়ে। মহর্ষিরও জীবনে এক সময়ে এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সংসারের মধ্যে কোথাও পূর্ণতা না দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবর্ষি ত্রিলোক ভ্রমণ করিতেন; সুতরাং বাল্মীকি ইঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভগবান, আপনার তো কোন স্থান অগম্য ও অবিদিত নাই; আপনি বলিতে পারেন, জগতে এমন কোনও ব্যক্তি আছেন, যিনি পূর্ণ, আদর্শস্থানীয় ও সর্ব্বগুণোপেত।' নারদ বাল্মীকির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'মহর্ষে, আপনি যেরূপ পুরুষের কথা বলিলেন, জগতে তদ্রূপ পুরুষ একান্ত দুর্লভ। কিন্তু বর্ত্তমান কালে, এইরূপ এক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র। তিনি অযোধ্যার রাজা ও মহারাজ দশরথের পুত্র। এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের জন্ম হইতে তাৎকালিক ঘটনা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেন। ভগবান রামচন্দ্র এই সময়ে লঙ্কা হইতে সীতা সমুদ্ধার পূর্ব্বক অযোধ্যার রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া প্রজাপালন করিতেছিলেন।

"দেবর্ষি নারদের মুখে রামচন্দ্র ও সীতাদেবী প্রভৃতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাল্মীকির ক্ষুব্ধ হৃদয় আনন্দ ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে এক অলৌকিক দীপ্তি নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি এই সংসারক্ষেত্রে যেন স্বর্গরাজ্যের অভিনয় দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেবর্ষি নারদ স্থানান্তরে গমন করিলেন। বাল্মীকিও প্রাত্যহিক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মানুরোধে প্রিয়শিষ্য ভরদ্বাজের সমভিব্যাহারে তমসার স্বচ্ছজলে অবগাহন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু বাল্মীকির হৃদয়ে তখনও বীণার অমৃতময় ঝঙ্কারের নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। জগতের প্রত্যেক পদার্থেই তিনি অলৌকিক পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছিলেন।

তমসার স্বচ্ছ জল দেখিয়াই তিনি উল্লাসে ভরদ্বাজকে বলিলেন,—"বৎস,দেখ, দেখ, তমসার জলরাশি সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের ন্যায় কিরূপ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল।" স্বচ্ছজল দেখিয়াও তাঁহার হৃদয় যেন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ভরদ্বাজকে বলিলেন,—"বৎস, তুমি আমার বল্কল দাও; আমি এই নদীতীরবর্ত্তী অরণ্যে একবার পর্য্যটন করিয়া আসি। এই বলিয়া তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন———"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াছি, এমন সময়ে নীরো, চুনী, সুশীলা, ভূদেব প্রভৃতি একদল বালক বালিকা আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "আমি যাব, আমি যাব।"

আমি বলিলাম,—"কোথায় রে?"

নীরো বলিল,—"এই যে মা, কাকীমা,রাজুপিসী, মঙ্গলাপিসী সবাই কাপড় প'রে তোমাদের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে যাচ্চে। আমাদেরও নিয়ে চল না, কাকাবাবু। মা আমাদের নিয়ে যেতে চাচ্চে না। তোমরা যদি না নিয়ে যাও, তবে আমরাও তোমাদের পেছু পেছু যাব।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, যাবি। গোল করিস্ নে, থাম্।"

এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র মতিও উপরে উঠিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পর আমার কোঁচা ধরিয়া ও মুখপানে চাহিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, ব্যাকুলভাবে, তাহার স্বর্গীয় ভাষায় বলিতে লাগিল "কাকাবাবু আমিও দাব; আমিও দাব।"

আমি বলিলাম,—"আচ্চা যাবি; আমার কোলে ওঠ।"

বাল্মীকির বৃত্তান্ত আর আমার শেষ করা হইল না। বৌদিদিরা, যোগমায়া, মঙ্গলা, রাজুদিদি, বৌদিদিদের দাসীদ্বয় সকলে পরিস্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেজ বৌদিদি আসিয়াই বলিলেন, "কই, ঠাকুরপো, যতীন্দ্র,—তোমরা চল।"

আমি সকলের পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "মেজ বৌদিদি, তোমরা কোথাও নেমন্ত্রণ খেতে যাচ্চ না কি? আমরাও দুই একটা মেঠাই সন্দেশ পাব তো?"

"তা পাবে বই কি? আমরা কি আর একলা খাব?"

আমি বলিলাম,—"যতীন্দ্র ভায়া ওঠ; আর দেখ্‌চো কি? অন্য কোনও সময়ে আবার বাল্মীকি সম্বন্ধে গল্প করা যাবে।"

এই বলিয়া আমরা সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। গৃহে কেবল জননী, মাসীমা ও কেশব রহিল। মেজ দাদা বাবার সঙ্গে কোথায় গিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

দেশীয় বস্ত্র।

(১)

গত ফেব্রুয়ারী মাসে তুলাজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক সম্বন্ধে যে কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টের চিরকালই অর্থের টানাটানি হইবারই কথা। আয় বুঝিয়া ব্যয় করা গবর্ণমেণ্ট ইতরতা বোধ করেন। যেমন একজন ধনী লোকের আব্‌দেরে ছেলে থাকিলে কাজে কাজেই তাঁর ব্যয়বাহুল্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ আমাদের গবর্ণমেণ্টের অনেক আব্‌দেরে ছেলে থাকায় কিছুতেই ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না। আয় বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে সেই জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে আমদানী ও কতকগুলি মোটা ধাতুর বস্ত্র ছাড়া কলে প্রস্তুত দেশীয় বস্ত্রের উপর শতকরা ৫৲ টাকার হিসাবে কর লওয়া ধার্য্য হয়। ইহাতে মাঞ্চেষ্টারে মহা গোলযোগ পড়িয়া যায়। জিনিসের উপর কর লইলেই তাহার দাম বাড়ে, এবং দাম বাড়িলেই প্রায় কাট্‌তি কমিয়া যায়। মাঞ্চেষ্টারের গণ্ডগোলের এই এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ দেশীয় কতকগুলি মোটা বস্ত্রের উপর শুল্ক না লওয়া। যদিও ওরূপ বস্ত্র বিলাত হইতে আমাদের দেশে আমদানী হয় না, এবং উহা শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় মাঞ্চেষ্টারের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি মাঞ্চেষ্টার বুদ্ধিমান বলিয়া ইহা জানে যে যতদিন দেশীয় কলকয়টা বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন তার উদ্‌বেগের কারণও বর্ত্তমান থাকিবে, এবং তাহাদের উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। এই দুই কারণের জন্য তুলাজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপনের পূর্ব্বোক্ত আইন পাশ হওয়ার দিন হইতেই মাঞ্চেষ্টার আন্দোলন আরম্ভ করে। মাঞ্চেষ্টারের ভোট অনেক, সুতরাং বিলাতের প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাহাকে ভয় করিয়া চলেন। মাঞ্চেষ্টার ভারত সেক্রেটেরির নিকট ঘন ঘন প্রতিনিধি পাঠাইতে লাগিলেক। প্রথম দিন কয়েক সেক্রেটেরি মহাশয় ভারতের

অর্থের অনটনের কথা তুহিয়াছিলেন। কিন্তু মাঞ্চেষ্টার নাছোড়বান্দা। এ দিকে মন্ত্রীসম্প্রদায়ও পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বর্ত্তমান মন্ত্রীসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রীসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনের প্রাক্কালে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মাঞ্চেষ্টারকে আশা দিতে কখন অবশ্য ভুলেন নাই। ইহারা ক্ষমতা পাইলেই সে ইঁহাদিগকে চাপিয়া ধরিল। ফল এই হইল যে কিছু দিনের মধ্যে বিলাত হইতে বস্ত্রশুল্ক পরিবর্ত্তনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের হুকুম আসিল। কাজেই গত ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্ব আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থির হইল যে আমদানী ও কলে প্রস্তুত সমুদায় বস্ত্রের উপর শতকরা ৩।৹ টাকার হিসাবে মাসুল লওয়া হইবেক, এবং সকল প্রকারের আমদানী তুলা মাসুল হইতে অব্যাহতি পাইবে। এই ব্যবস্থায় কি কি ফল হইল? (১) মাঞ্চেষ্টার সন্তুষ্ট হইল। ইহাতে যে বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের কি সুবিধা হইল তাহা যাঁহারা বিলাতী রাজ্য-শাসন-নীতির উপর দৃষ্টি রাখেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। পার্লেমেণ্টের আগামী সভ্য নির্ব্বাচনের সময়ে বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের ইহাতে বিলক্ষণ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। (২) মাঞ্চেষ্টারের সন্তোষ সাধনোদ্দেশে ভারতের ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আয় পরিত্যাগ। ভারতের যদি সচ্ছল অবস্থা হইত তাহা হইলে যাহাই হউক না কেন, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ আয় ত্যাগ যে কতদূর অন্যায় ও অযৌক্তিক তাহা বুঝাইবার প্রয়াস অনাবশ্যক। লবণ করের মত পীড়ক কর আর আছে কিনা সন্দেহ। যদি ইহা উঠাইতে বা কমাইতে বল তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অনটনের দোহাই দিবেন বা ভ্রূ কুঞ্চন করিবেন। যে ব্যক্তির বার্ষিক ৫০০৲ টাকা আয় তাহাকে প্রতি টাকায় ৪ পাই করিয়া আয় কর দিতে হয়; এ বিষয়ে যদি গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে বল; সেই এক কথা। অথচ মাঞ্চেষ্টারের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা আয় ছাড়িয়া দিতে কোন উচ্চ বাচ্য হইল না। (৩) দরিদ্র নিপীড়ন। পূর্ব্বে কতকগুলি মোটা ধাতুর কাপড় শুল্ক হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। ফল এই হইয়াছিল যে কতকগুলি গরীব লোকের সস্তায় বস্ত্র পাইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। এখন এই দাঁড়াইল ধনী হও, দীনই হও, একখানা কাপড় কিনিতে হইলেই মাঞ্চেষ্টারের খাতিরে কাপড় খানা পিছু ৪টা পয়সা করিয়া সেলামি দিতে হইবে। (৪) আমদানী সূতার উপর মাশুল উঠিয়া যাওয়াতে উক্ত সূতায় প্রস্তুত হস্তে নির্ম্মিত দেশীয় বস্ত্রের

দাম কিছু কমিতে পারে। যদি হস্তনির্ম্মিত দেশীয় বস্ত্রের দাম কমে, তাহা হইলে তাঁতিদের কিছু সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে প্রতি বস্ত্র খানার কত দাম কমিতে পারে? তাঁতিদের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, দেশীয় কাপড়ের অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছে, কাপড়খানা পিছু সম্ভবতঃ দুই চার পয়সা দাম কমিলেও কোন পক্ষের যে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

অনেকে ভারতগবর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে বিস্মিত হইলেন। কেহ কেহ বড় সহজেই বিস্মিত হন অথবা তাঁহারা বিস্মিত হইয়াই আছেন বলিলে হয়। বস্তুতঃ ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই দেখা যায় না। ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন স্বাধীনতা নাই। ভারত সেক্রেটেরির আদেশ প্রতিপালনই ইহাদের কার্য্য। তাঁহার নাম হুকুম, ইহাদের নাম তামিল। উপরে যে যে কথা বলা হইল ইহা কল্পিত নয়। ভারতীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন কোন সদস্য আইন সভায় বসিয়া ঈদৃশ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব ভারত সেক্রেটেরি যদি কোন আদেশ করেন, তাহার অন্যথা করিবার ক্ষমতা ভারত-গবর্ণমেণ্টের নাই। আর এক কথা, মাঞ্চেষ্টার হইল প্রভূত ক্ষমতাশালী ইংরাজ বণিক ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়, আর আমরা হইলাম প্রাণশূন্য নিশ্চল ভারতবাসী। প্রবলের আব্‌দারের কাছে দুর্ব্বলের মঙ্গলামঙ্গলের কথা টেকিতে পারে না। প্রবলের জয় ও দুর্ব্বলের পরাজয় হইতেছে প্রাকৃতিক নিয়ম। এ নিয়মের বিপরীতে মস্তকোত্তলনের চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হইতে পারে এমন সময় আসিবে, যখন প্রবলের জয় ও দুর্ব্বলের পরাজয় না হইয়া প্রবলের পরাজয় ও দুর্ব্বলের জয়ই নিয়ম হইবে। কিন্তু যতদিন এ বিপর্য্যয় না ঘটিতেছে, ততদিন বর্ত্তমান নিয়ম শিরোধার্য্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। আর একটু কথা আছে। মাঞ্চেষ্টার দল হইল জেতা, আমরা বিজিত। তাহাদের স্বার্থ আগে না আমাদের স্বার্থ আগে? ভারত সেক্রেটেরি বা ভারত গবর্ণমেণ্ট যে নিজেদের জাতীয়দের মঙ্গলের কথা পাঁকে পুতিয়া কিম্বা তাহাদের স্বার্থের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আমাদের দিকে তাকাইবেন, এরূপ আশা করা যে অধিকতর বাতুলতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইবার, কিম্বা ইহাদিগকে গালি দিবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ইহাদের অবস্থায় পড়িলে আমরা কি করিতাম।

যাউক, এ সব কথা এখন যাউক। আমাদের কথা পাড়া যাউক। বস্ত্র-শুল্ক আইন পরিবর্ত্তিত হইবার পর মধ্য-প্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে দুই চারিটি সভা হইয়া গেল। সভার লোকে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদূর সম্ভব বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ ও দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবেন। বাঙ্গালীরা আজ কাল দেশের মধ্যে অগ্রণী—তাঁহারা ছাড়িবেন কেন? তাঁহারাও দুই একটী সভা করিলেন। সভায় হইল কি? প্রথম বিশ পঞ্চাশ জন লোকের আগমন। দ্বিতীয় বাঙ্গালায় কিম্বা ইংরাজীতে দুই একজন বক্তার স্বদেশানুরাগোদ্দীপক ইংরাজ-নিন্দা মিশ্রিত বক্তৃতা। "দেশের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে; ইংরেজেরা তায় বিধিমতে সহায়তা করিতে বসিয়াছেন, দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায় আজ লুপ্তপ্রায়; অন্নাভাবে আজ তাঁতীদের ঘরে হাহাকার। আমরা যদি দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি, এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবেক; দেশীয় শিল্পীদের উপকার ও ইংরাজদের অপকারসাধন। খতাইয়া দেখিলে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিলে মোটের উপর লাভ বই অলাভ নাই; দেশীয় বস্ত্র টেঁকে বেশী। যতদিন ব্যবসায়ের উন্নতি না হইতেছে, ততদিন দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে কিছু লোকসান হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের খাতিরে আমাদের সে লোকসান সহ্য করা উচিত। অতএব ভাই সকল আসুন, আমরা যতদূর সম্ভব দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। সর্ব্বশেষ বহুল পরিমাণে দেশীয় বস্ত্র প্রচলনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

বোম্বাই কিম্বা মধ্য-প্রদেশের অবস্থা বিশেষ অবগত নই। বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগের প্রতিজ্ঞা সেখানে কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু উক্ত প্রদেশদ্বয়ের লোকেরা ঠিক বাঙ্গালী নয়। দুই দশটা কাপড়ের কল তাহারা করিয়াছে ও চালাইতেছে। উহাদের "মরদ্ কি বাত" হইতে পারে।

আমাদের কি হইল? ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদাৎ আমাদের মুখ ফুটিয়াছে। কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আমরা মনে করি, যদি একটা সভা আহ্বান করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের উপায়াবলম্বনার্থে একটা সমিতি গঠিত করিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত না হউক উদ্দেশ্যটার যে নিদান সাড়ে বার আনা আন্দাজ কাজ সাধিত হইল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সমিতি গঠিত হইয়া বস্ত্রসভা সকল সন্ধ্যার পরেই ভঙ্গ হয়।

সমিতির সদস্যগণ অবশ্য রাত্রে নিদ্রা গিয়াছিলেন। আজও তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। যদি তাঁহাদের কখন নিদ্রা ভাঙ্গে, তাহা হইলে তাঁহারা সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য কতদূর সফল করিয়া তুলিতে পারিবেন দেখা যাউক।

(২)

দেশীয় বস্ত্র উঠিল কেন? ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বিলাতী বস্ত্রের প্রচলন খুব কমই ছিল। বেশ মনে হয়, ছেলে বেলায় আমরা আটপহুরে দেশী কাপড় ব্যবহার করিতাম। দেখিতে দেখিতে উহার ব্যবহার কমিয়া আসিতে লাগিল, এবং বিলাতী কাপড়ের কাট্‌তি বাড়িয়া গেল। এখন বোধ হয় কম লোকই আছেন যাঁহারা আটপহুরে দেশী কাপড় ব্যবহার করেন। অনেকে পোষাকী কাপড়ও দেশী তুলিয়া দিয়াছেন। আর একটী কথা আছে, আজকাল তাঁতে বোনা যে সকল দেশীয় বস্ত্র প্রচলিত তাহাদের অধিকাংশই বিলাতী সূতায় তৈয়ারি। ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার প্রায় উঠিয়া আসিল কেন তাহার কারণানুসন্ধানে বেশী দূর যাইতে হইবেক না। ইহার কেবল একই মাত্র কারণ আছে। বিলাতী কাপড় দেশী অপেক্ষা ঢের সস্তা। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কেহই বিলাতী কাপড় ধরিত না। ১॥০ টাকা দামের এক জোড়া বিলাতী ধুতি যেরূপ কাপড় হইবে সেইরূপ এক জোড়া দেশী ধুতি যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ২॥০ টাকা ৩৲ টাকার কম পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বোধ হয় তাতে বহরে সেইরূপ এবং সেইরূপ জমিওয়ালা দেশী কাপড় খুব বিরল। এ কথা নিশ্চয় যে, যে সময় বিলাতী কাপড় প্রচলন আরম্ভ হয়, সে সময় এক জোড়া বিলাতী কাপড় যে দরে পাওয়া যাইত, তদ্রূপ এক জোড়া দেশী কাপড় সেই দরে কিম্বা তাহা অপেক্ষা কম দরে কখনই পাওয়া যাইত না। আজকাল যে দেশী কাপড়ের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে তাহা ত বোধ হয় না। উহার কাট্‌তি যেরূপ কম অবনতি হইবারই সম্ভাবনা। লোকের যখন কাপড় দরকার হয় তখন তাঁহারা দেশী বিলাতী ভাবিবার অবসর পান না। প্রথমতঃ সস্তা খুঁজেন এবং দ্বিতীয়তঃ যে দাম দিতে তাঁহারা সক্ষম সেই দামে যতদূর ভাল কাপড় পাওয়া সম্ভব তাহাই খুঁজেন। যাঁহারা তাঁতে বোনা দেশী কাপড়ের পক্ষপাতী তাঁহারা তিনটী কথা বলেন;—(১) দেশীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা হাহাকার করিতেছে, তাহাদের অন্ন জুটিতেছে না, দেশের একটা

শিল্প নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং দেশের ধন দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়া বিদেশী লোকের উদর পূর্ণ করিতেছে। এরূপ হইতে দেওয়া কখনই উচিত নয়, অতএব নিদান দেশ-হিতৈষিতার খাতিরে আমাদের দেশী বস্ত্র যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা উচিত। (২) দেশী কাপড় আপাততঃ কিছু মহার্ঘ হইলেও দামের পক্ষে উহা সস্তা। (৩) চেষ্টা করিলে বিলাতী কাপড় যে দরে পাওয়া যায় অনেক সময় সেই দরে সেইরূপ দেশী কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। উৎসাহ নাই বলিয়া আর দেশে আবশ্যক মত নানাপ্রকার কাপড় তৈয়ারি হইতেছে না, এবং অনেক হাত ফিরে বলিয়া সময়ে সময়ে দেশী কাপড়ের দর অকারণ বৃদ্ধি হয়। তিনটী কথারই পর পর আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) এ স্থলে স্বদেশ-হিতৈষিতার দোহাই বৃথা। দোষই বলুন আর গুণই বলুন মনুষ্য স্বভাব হইতেছে সস্তা পাইলে আর কেহ অধিক দাম দিয়া জিনিস কিনিতে যায় না। ইহা যে সুধু আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম বলবৎ। স্থলবিশেষে ও সময় বিশেষে ইহার অন্যথার কথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। মনে করুন একজনের এক জোড়া কাপড়ের দরকার। ১৷৷৹ টাকা হইলে তিনি তাঁর পছন্দসই এক জোড়া বিলাতী কাপড় পান। ধরিয়া লইলাম ঠিক সেইরূপ এক জোড়া দেশী কাপড় দুই টাকায় পাওয়া যায়। তিনি কি তখন ভাবেন যে ১৷৷৹ টাকা দিয়া কাপড় জোড়াটা কিনিলে একজন বিদেশীয়ের উপকার করা হয়, কিন্তু ২৲ টাকা দিয়া কিনিলে একজন স্বদেশীয়ের উপকার করা হইবে, অতএব আমার দুই টাকা দিয়া দেশী কাপড় জোড়াটাই কেনা উচিত। হয়ত কোন মহাপুরুষের মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে, কিন্তু জগতে মহাপুরুষ বড় বিরল। সচরাচর লোকের মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় না। আর এক কথা, এরূপ ভাব মনে উদয় হইলেও কয়জন লোক ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম? প্রত্যেক গৃহস্থকে তাঁর পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্ততঃ বৎসরে ৩।৪ জোড়া কাপড় কিনিতে হয়। উড়ানি পিরাণ প্রভৃতি ধরিলাম না, কারণ অনেক দরিদ্র গৃহস্থকে সাধারণতঃ ঐ সকল জিনিসের ব্যবহার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এরূপ গৃহস্থের যদি নিজেকে লইয়া ৫।৬ জন পোষ্য থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বৎসরে অন্ততঃ

১৫।২০ জোড়া কাপড় কিনিতে হইবেক। অর্থাৎ যদি তাঁর দেশী কাপড় ব্যবহারের সখ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অন্ততঃ বৎসরে ৮।১০ টাকা অধিক ব্যয় করিতে হইবেক। জিজ্ঞাসা করি দেশে এরূপ কয়জন গৃহস্থ আছেন যাঁহারা এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারগ? যে হিসাবটা উপরে দেওয়া গেল তাহা সকল দিকেই কম করিয়া ধরা তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ১ জোড়া ১॥০ দামের বিলাতী কাপড় অপেক্ষা এক জোড়া দুই টাকা দামের দেশী কাপড় ঢের নিকৃষ্ট। অনেক গৃহস্থের ৫।৬টীর উপর পোষ্য এবং প্রত্যেকের প্রতি বস্ত্রের অঙ্কে সুধু ৩।৪ জোড়া কাপড়ের দামের অপেক্ষা অনেক অধিক খরচ হয়। একজন ২০।২৫ টাকা মাহিনার কেরাণীকে বা একজন সামান্য কৃষককে সুধু দেশ-হিতৈষিতার খাতিরে অধিক ব্যয় করিতে বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারি না। আর যাহারা অতি কষ্ট করিয়াও নিজেদের মোটা ভাত মোটা কাপড় যোগাইয়া উঠিতে পারে না তাহাদিগকে এরূপ করিতে বলা বিদ্রূপ ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন আমরা "যতদূর সম্ভব" দেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—অনেকে তাহা করিতেছেন। অনেকে আজও পোষাকী কাপড় দেশী ছাড়া ব্যবহার করেন না। অনেকে কানপুর, নাগপুর ও অন্যান্য স্থানের জিন প্রভৃতি মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাই মিলের পরণের কাপড় অত্যন্ত মোটা বলিয়া বাঙ্গালায় তার ব্যবহার কম। দেশ-হিতৈষিতায় খালি ২।১০ জন হয়তঃ উহা ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে সুধু দেশ-হিতৈষিতার জন্য রুচি ও স্বচ্ছন্দ জ্ঞান পরিত্যাগ করিতে বলা, কিম্বা তাহারা ঐরূপ করিবে আশা করা, অথবা তাহারা ঐরূপ না করিলে তাহাদিগকে গালি দেওয়া কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়।

(২) দেশী কাপড় আপাততঃ কিছু মহার্ঘ হইলেও দামের পক্ষে সস্তা। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। এক জোড়া রেলির ৪৯ নং ধুতি বা সাটী ২।০ সিকা হইতে ২।৶০ আনায় পাওয়া যাইতে পারে। ঐরূপ এক জোড়া কাপড়কে সময়ে সময়ে এক বৎসরেরও অধিক যাইতে দেখা যায়। উহার দেড়া কিম্বা দুনা দাম দিয়া যদি এক জোড়া দেশী কাপড় কেনা যায়, কেহ কি বলিতে পারেন যে উহা দুই বৎসর

পর্য্যন্ত যাইবে ? দুই বৎসর না যাইলে আর দেশী কাপড় ব্যবহারে লাভ নাই। দুই বৎসরেও ঠিক লাভ হয় না। বিলাতী এক জোড়া ১৷৷০ টাকা দামের সাটী যদি ৬ মাস যায় এক জোড়া ২৲ টাকার দেশী কাপড়কে ৮ মাসের কিছু উপর যাওয়া চাই। কিন্তু ধরিয়া লইলাম দেশী কাপড় দামের পক্ষে সস্তা। তাহাতে আসিয়া গেল কি ? অনেকের পক্ষে একেবারে বেশী টাকা বাহির করা কঠিন। সকলেই জানেন যে চাউল খুচরা না কিনিয়া যদি বেলিয়াঘাটার কোন আড়ত হইতে পাইকেরি দরে বেশী কিনিয়া আনা যায় তাহা হইলে অনেক লাভ হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতা সহরের মধ্যে কয়জন তাহা করিতে পারেন ? আমরা জানি যদি ৩৲ টাকায় এক জোড়া খেলো জুতা না কিনিয়া ৫৲ টাকা দিয়া এক জোড়া টেঁকসই জুতা কেনা যায় তাহা হইলে মোটের উপর লাভ বই লোকসান হয় না। কিন্তু এই জ্ঞান সত্ত্বেও কয়জন জুতা কিনিবার সময় এক দমে ৫৲ টাকা খরচ করিতে পারেন। পয়সার অভাবে অনেক সময়ে লোককে খেলো জিনিসে সন্তুষ্ট হইতে হয়। মনে করুন, একজন গৃহস্থের এক মাসে ৪ জোড়া কাপড় আবশ্যক। দেড় টাকা করিয়া হইলে ৪ জোড়া বিলাতী কাপড়ে ৬৲ টাকা লাগিবে। যদি ২৲ টাকা দিয়া বিলাতী অপেক্ষা টেঁকসই দেশী কাপড় পাওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাকে ৮৲ টাকা খরচ করিয়া ৪ জোড়া দেশী কাপড় কিনিতে হইবেক। দেশের মধ্যে কয়জন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ এইরূপ ব্যয় করিতে সক্ষম তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

(৩) যাঁহারা বলেন চেষ্টা করিলে দেশী কাপড় বিলাতীর দরে পাওয়া যায় তাঁহাদিগকে বলি, সর্ব্বসাধারণ এরূপ চেষ্টা করিতে অপারগ ; তাঁহারাই কেন চেষ্টা করিয়া যাহাতে লোকে সুলভ মূল্যে অর্থাৎ বিলাতীর দরে তদ্রূপ দেশী কাপড় পাইতে পারেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করুন না ? যদি সাত হাত ফিরিয়া দেশীর মূল্য অকারণ বৃদ্ধি হয় ঐরূপ সাত হাত ফেরা বন্ধ হয় না কেন ? যখন বিলাতীর মূল্যে তদ্রূপ দেশী পাইয়া লোকে শেষোক্ত কাপড় ব্যবহার না করিবেন তখন তাঁহাদিগকে দুই কথা শুনাইবার সময় হইবেক। কিন্তু একটা কথা উঠিতে পারে। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ত দেশীই ছিল। তখন ত উৎসাহের অভাব ছিল না। তবে দেশী উঠিল কেন ? বিলাতীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়াই দেশীকে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছে।

(৩)

যাঁহারা বস্ত্র সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সস্তায় লোককে কাপড় যোগাইবার কোন উপায় করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আন্দোলনের কোন ফল হইবে, নতুবা কেবল উহা অরণ্যে রোদন মাত্র। হস্ত কখন কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, কাপড়ের কল হয় ত ভাল, নতুবা ম্যাঞ্চেষ্টারের মুখাপেক্ষা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কল যে বলিলেই হয় তাহা নয়। তাহা হইলে দেশে এত দিন কল ছাইয়া পড়িত। বিলাতে কল এক দিনে হয় নাই। কল চালাইতে হইলে শিক্ষা চাই, অধ্যবসায় চাই, মূলধন চাই, বিশ্বাস চাই। মুখে আমরা যতই বলি না কেন, আমাদের মধ্যে এ সমস্তরই অভাব। ভারতের অন্যান্য স্থানে দুই দশটা কল হইয়াছে বটে কিন্তু সে সব কলের অধিকারীরা বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালীরা ইংরাজী শিখিয়াছেন, গলাবাজী করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু ইহা ছাড়া যে আর কিছু শিখিয়াছেন তাহার প্রমাণাভাব। অন্যান্য স্থানে যে কয়টী কল হইয়াছে তাহাদের বিলাতী কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে কত কষ্ট হইতেছে তাহা উহাদের স্বত্বাধিকারীরাই জানেন। পরিণামে ফল কি দাঁড়াইবে তাহা কেহ বলিতে পারেন না। আমাদের দেশে পরিশ্রম সস্তা এবং তুলাও অনেক জন্মিয়া থাকে ও আবশ্যক হইলে আরও অধিক উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিশ্রম সুলভ হইলেই, কাঁচা মাল যথেষ্ট হইলেই হইল না। শ্রমিকের নিপুণতা ও কার্য্যকারিতা, ব্যবসায়ীর বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও অধ্যবসায়, মূলধনের বহুলতা এ সব সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আমাদের দেশ এখনও অনেক দূরে। ব্যবসায়ের লাভালাভ অনেক পরিমাণে ইহাদের উপরই নির্ভর করে।

যদি কোন একটা শিল্প এক দেশে অধিক কাল ধরিয়া প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে সেই শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন পক্ষে সেই দেশের ক্রমে ক্রমে অনেক সুবিধা হইয়া উঠে। সেই দেশের শ্রমিকেরা ঐ শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ নিপুণতা লাভ করে, ঐ সম্বন্ধীয় কল কারখানার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, যাঁহারা ঐ শিল্পে আপনাদের মূলধন নিযুক্ত করেন, নানা বিষয়ে তাঁহাদের ঐ সম্বন্ধে বিস্তর অভিজ্ঞতা জন্মায়। অতএব সেই দেশে ঐ শিল্পজাত দ্রব্য যত সস্তায় উৎপাদিত হইতে পারে, এক নূতন দেশে তাহা

সম্ভব নয়। অনেক বৎসর হইতে বিলাতে কলে কাপড় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। তবে বস্ত্র-বুনন প্রথা প্রথম প্রচলিত করিবার সময় অবশ্য অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। আজ কাল কিন্তু সে সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমাদের যদি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবেক। অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব কি না তাহা ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। কোন দেশে একটা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা এত কঠিন বলিয়াই অনেক সময় সে দেশের গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় আমদানী দ্রব্যের উপর মাস্থল লইয়া থাকেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য দেশে নূতন শিল্প প্রচলনে উৎসাহ দেওয়া। ইহার দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় বিস্তর পশম জন্মে। পূর্ব্বে ঐ পশম প্রায় সমস্তই বিলাতে রপ্তানী হইত। পশমী বস্ত্র উৎপাদন শিল্প বিলাতের এক প্রধান শিল্প। এ দিকে অষ্ট্রেলিয়াকে অনেক পশমী বস্ত্র কিনিতে হয়। কিছুদিন পরে লোকে দেশেই পশমী বস্ত্রের কল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নূতন দেশ ও নূতন শিল্প। বিলাতী পশমী বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করা সহজ নয় বুঝিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকল আমদানী পশমী বস্ত্রের উপর শুল্ক স্থাপন করিলেন। ফলে এই হইল যে, বিদেশীয় বস্ত্রের দাম বৃদ্ধি হইল এবং দেশীয় বস্ত্রকারকগণ বিদেশীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইল। আমেরিকাতেও ঠিক ঐরূপ হইয়াছে। অনেক বিষয়ে খুব সুবিধা সত্বেও আমেরিকা নূতন দেশ। দেশীয় শিল্প স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট অনেক বিদেশজাত দ্রব্যের উপর মাস্থল লইয়া থাকেন। কথা হইতেছে এ প্রথা ভাল কি মন্দ। চিরস্থায়ী হইলে ইহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয় এবং দ্রব্য উৎপাদকদের খাতিরে দ্রব্য ব্যবহারকদের ঘাড় ভাঙ্গা হয়। কিন্তু যদি এই প্রথা দ্বারা এক নূতন শিল্প স্থাপনের সহায়তা হয় মাত্র, এবং শিল্পটী স্থাপিত হইলে ইহা রদ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে দিনকতক শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহারকদিগের অসুবিধা হইলেও পরিণামে ইহা দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। দেশে নূতন শিল্প যতই প্রচলিত হয় ততই তার মঙ্গলের বিষয়; ততই লোকের অন্ন সংস্থানের সুবিধা হয়। কিন্তু যদি কোন দেশে কোন শিল্পজাত

দ্রব্য সম্বন্ধে কিছুদিন পরে এই উপায় রদ করিবার অসম্ভাবনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবেক সেই শিল্পটী সে দেশের উপযোগী নয়। দেশের মূলধন ও পরিশ্রম ঐ শিল্পে নিয়োজিত না হইয়া শিল্পান্তরে নিয়োজিত হওয়াই ভাল। অনেক সময় শিশুকে হাঁটান শিখাইবার জন্য কৃত্রিম সহায় আবশ্যক হয়, কিন্তু সে বড় হইয়াও যদি কৃত্রিম সহায় ব্যতীত হাঁটিতে না পারে, তাহা হইলেই বুঝা গেল তার পায়ের দোষ আছে, ও সে কখনই আপনি হাঁটিতে পারিবেক না। তদ্রূপ যে শিল্পকে কৃত্রিম উপায় দ্বারা চিরকাল খাড়া করিয়া রাখিতে হয় তাহাতে দেশের কাহারও উপকার হয় না। যাহারা ঐ শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করে তাহাদিগকে বেশী দাম দিয়া উহা কিনিতে হয়। যদি বল যে, মূলধনের ও শ্রমিকদিগের উপকার হয়, তাহাও নয়; কারণ যে ধন ও শ্রমিকগণ এই শিল্পে নিয়োজিত উহা না থাকিলে তাহারা শিল্পান্তরে নিয়োজিত হইতে পারিত। এ স্থানে ইহা বলা উচিত যে আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিতেছেন, যে শিল্পবিশেষ দেশে বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছে তখন তাঁহারা সেই শিল্পজাত বিদেশীয় দ্রব্যের উপর মাসুল কমাইয়া বা উঠাইয়া দিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে উপরে যে প্রথার বিষয় উক্ত হইল উহা আমাদের দেশে অবলম্বিত হইতে পারে কিনা। না, উহা পারে না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিলাতস্থ ভারত সেক্রেটারির অধীন। ভারতের উপকার সাধনোদ্দেশে ইঁহারা বিলাতের অপকার করিতে পারিবেন না। আমেরিকা স্বাধীন, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা প্রভৃতি নামে মাত্র বিলাতের অধীন—ইঁহারা মাতৃভূমির তোয়াক্কা রাখেন না। ভারতের অবস্থা যে সেরূপ নয় বুঝাইবার প্রয়াস অনাবশ্যক। পূর্ব্বোলিখিত বস্ত্রশুল্ক-আইনের পরিবর্ত্তন ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যখন অষ্ট্রেলিয়ান, আমেরিকান প্রভৃতিরা দেশের মঙ্গলের জন্য উচিত মূল্যাপেক্ষা বেশী দিয়া অনেক দ্রব্য কিনিতেছেন তখন আমরা কেন আবশ্যক হইলে বেশী দাম দিয়া দেশীয় বস্ত্র কিনিতে পারিব না? ইঁহাদের বুঝা উচিত যে, অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতিরা বেশী দাম দিতেছেন পরম্পরা সম্বন্ধে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়। এ উভয়ের প্রভেদ অনেক। জিনিস কিনিবার সময় তাঁহারা অনেক সময় ভাবিয়া দেখেন না যে, বেশী দাম দিতেছেন, এবং ভাবিয়া দেখিলেই বা হইবে কি? বেশী দাম দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু আমাদের অবস্থা অন্যরূপ। সস্তা বিলাতী

ও মহার্ঘ দেশী বস্ত্র আমাদের সম্মুখেই থাকে, এবং কোনটী লইব তাহা স্থির করিবার স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করে না। এখন দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশে বস্ত্রশিল্পের পুনর্জীবন দান করা কত দুরূহ ব্যাপার। প্রথম বিলাতের ন্যায় শিল্পকুশলী দেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বিতীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য অভাব। অনুকুলাচরণ করা দুরে থাকুক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিকুলাচরণেরই সম্ভাবনা।

এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় বুঝাইবার প্রয়াস করা গিয়াছে (১) দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে যে একটু সামান্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহার মূল ভুল। দেশ-হিতৈষিতার দোহাই দিয়া দেশজাত বস্ত্র ব্যবহার প্রচলন অসম্ভব। (২) যদি লোককে আমরা দেশজাত বস্ত্র পরাইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আজকালকার দিনে কল প্রচলন ছাড়া উপায়ান্তর নাই। দেশী কলের কাপড় বিলাতী কাপড়ের ন্যায় সস্তা হওয়া চাই। (৩) বিলাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা বড় কঠিন, এবং ইহাতে আমরা গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্য পাইব না। আমরা বাঙ্গালী এবং নিজেদের জাতিকে বেশ চিনি। সমস্ত স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বাধা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালীরা যে কখন স্বদেশীয়দিগকে দেশের কলজাত বস্ত্র পরাইবেন এরূপ আশাত হয় না—তবে বলা যায় না।

দ

রবীন্দ্র বাবুর

সোনার তরী।

বহুবার শুনিয়াছি বাসন্তীর সাথে
কোয়েলার প্রেমগীতি ; জ্যোৎস্না নিশীথে
পাপিয়ার "পিউ কাঁহা" নভোনাট্যশালে ;
দুরাগত বীণার ঝঙ্কার, যাহা চিতে
অপূর্ব্ব উল্লাসমধু দিয়াছে ঢালিয়া ;
রজনীতে শৈলশিরে সেই গ্রীষ্মাবাসে
সুশীতল উপাধানে মস্তক রাখিয়া

দূর কল্লোলিনী মৃদু শঙ্কাপূর্ণ ভাবে
শুনেছি ক্রন্দন করে "হৃদি চূর্ চূর্।"
প্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গন তলে যারা
ঢালিতেছে স্বাভাবিক সঙ্গীতের ধারা
শতবার শুনেছি সে সকলের সুর;
কিন্তু মম প্রিয়তম-কণ্ঠস্বর ছাড়া
আর কিছু শুনি নাই অমন মধুর।

শ্রীসৌদামিনী গুপ্তা।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

নানা বিঘ্ন বিপত্তি এবং অভাবের মধ্য দিয়া যাঁহার করুণা নিরন্তর দাসাশ্রমকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে মাসান্তে সেই অনাথনাথ দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেবিয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণীকান্ত সরকার, ১০। ঘামন, ১১। বুঝাওন, ১২। গঙ্গা, ১৩। সরস্বতী, ১৪। নিস্তারিণী, ১৫। গোবিন্দবালা, ১৬। খুবলাল দোসাদ, ১৭। ফণীন্দ্রনাথ দাস, ১৮। বিধু প্রামাণিক, ১৯। ভুলো, ২০। কৃষ্ণনাথ বসু, ২১। সখী, ২২। বাবুলাল, ২৩। রাজেশ্বরী এবং ২৪। ব্রহ্মময়ী।

বাবুরাম। এবার বেচারা, ভয়ঙ্কর জ্বর ও প্লুরিসি হওয়ায় সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবলে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রায় /২। সের জল বাহির করিয়া তাহাকে রক্ষা করা গিয়াছে। এইজন্য আমরা বিশেষভাবে ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, মহোদয়কে ধন্য-বাদ দি।

রুক্মিণীকান্ত সরকার,বাড়ী নদীয়া জেলায়। পশ্চিমে রেলওয়েতে চাকরী করিতেন। নানা প্রকার কঠিন রোগে একেবারে অবসন্ন এবং চলৎ শক্তি রহিত হওয়ায় দ্বারভাঙ্গার সহৃদয় ডাক্তার বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে এখানে আনীত হয়। রোগ কঠিন দেখিয়া ইঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়। কিছুদিন পরে একদিন নিজে একখান পালকি করিয়া এখানে পুনরাগমন করিয়াছেন।

গোবিন্দবালা। জ্বর ও বাতশ্লেষ্মা রোগে এই ভগবৎভক্তি পরায়ণা বৃদ্ধা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। ইহার প্রকৃতি অতি সুন্দর ছিল। যতদিন জ্ঞান ছিল, আপন জপমালা কখনও পার্শ্বচ্যুত করে নাই। ভগবান ইহার আত্মাকে আপনার অমৃতক্রোড়ে স্থান দিন ইহাই আমাদের অন্তিম প্রার্থনা।

খুবলাল দোশাদ। ইহার রোগ অত্যন্ত কঠিন বলিয়া হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

ফণীন্দ্রনাথ দাস। ইনি একটী স্কুলের ছাত্র এবং নিতান্ত নিরাশ্রয়। ম্যালেরিয়া জনিত জ্বরের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাঁষপাতালে গ্রহণ যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় ইনি একেবারে নিরুপায় ও নিরাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে একটী স্কুলের ছেলের সঙ্গে ইঁহার পথে সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারই উপদেশ ক্রমে ইনি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে আসিয়াই জ্বর হইয়াছিল। এখন অনেক ভাল আছেন।

বিধু। জ্বরাক্রান্ত হইয়া পথে পড়িয়া ছিল। একটী ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়া পাঠাইয়া দেন। আরাম হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

ভুলো। ম্যালেরিয়া জনিত প্লীহা রোগে পা ফুলিয়া গিয়াছিল। হাঁসপাতালে যাইতে হইবে শুনিয়া, 'ভাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি' বলিয়া চলিয়া যায়। আর আসে নাই।

কৃষ্ণনাথ বসু। বাড়ী পাবনা জেলা; বয়স ২৫ বৎসর। একমাত্র বৃদ্ধা জননী জীবিত। রোগ কঠিন দেখিয়া হাঁসপাতালে পাঠান হয়। ডাক্তারেরা হতভাগ্যের জীবনের আশা করেন না।

সখী। বাড়ী সারাঘাট, বয়স ৩৫, বিধবা রংপুরে স্বামীর সহিত প্রবাসী হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। পায়ে ক্ষত হইয়া পা পচিয়া যায়; এইজন্য সেখানকার ডাক্তার সাহেব তাহার পা খানি কাটিয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য হন। বাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে এখন সে দাসাশ্রমে আনীত হইয়াছে।

বাবুলাল। ভয়ানক চক্ষুর পীড়াও মাথার যন্ত্রণা। দাসাশ্রমে চক্ষু রোগ চিকিৎসায় উপযোগী উপকরণাদি না থাকায় তাহাকে চক্ষুরোগ চিকিৎসার হাঁসপাতালে পাঠাইবার কথা হয়। ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

রাজেশ্বরী। হৃদ্‌রোগ; পূর্ব্বে একবার আরাম হইয়া চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু পরে অত্যাচার করিয়া আবার মৃত্যুদশাপন্ন হইয়া আসিয়াছে। এখন অনেকটা ভাল আছে।

দ্রবময়ী। বাড়ী যশোর জেলায় আড়ুয়া কান্দি গ্রামে। কনজ কায়স্থের কন্যা। জরা জীর্ণ অবস্থায় লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। শেষে একেবারে অন্ধ হওয়ায় চলৎ শক্তি রহিত হইয়া যায়। এ অবস্থায় বাবু আশুতোষ মৌলিক মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে দাসাশ্রমের একজন কর্ম্মচারী গিয়া তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসেন।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান সমূহ স্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

বাবু ভূতনাথ ঘোষ মে ।০, বাবু কামিনীকুমার গুহ মে, জুন ২৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র মে ।০, বাবু প্রসন্নকুমার বসু মে, জুন ॥০, বাবু রাধানাথ দেব এপ্রেল ॥০, বাবু তেজচন্দ্র বসু মে ॥০, বাবু শ্যামাদাস কবিভূষণ মে ॥০, নবাব সৈয়াদ আবদুল শোভান চৌধুরী মে, জুন ১৲, বাবু অশ্বিনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ১৲, বাবু যদুনাথ বরাট জুন ১৲, বাবু পিয়ারীমোহন ভড় মে ।০, বাবু নন্দকুমার দত্ত মে ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মে ১৲, N. K. Bose Esqr. C. S. মে ১৲, A lady C/o Babu Sreenath Das. মে ১৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস, মে, জুন ২৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী জুন ১৲, বাবু রাধা গোবিন্দ সাহা আষাঢ় ॥০, বাবু হরিপদ ঘোষাল, জুন ।০, বাবু গৌরীশঙ্কর দে মে ॥০, Hon. Mohini Mohun Ray বৈশাখ হইতে আষাঢ় ৩৲, বাবু ক্ষুদিরাম বসু, মে, জুন ১৲, বাবু রাধানাথ দেব এপ্রেল, মে ১৲, বাবু অভয়চরণ মল্লিক জুন ।০, বাবু অনাথনাথ দেব মে, জুন ২৲, বাবু পশুপতি নাথ বসু মে ১৲, বাবু কামিনীকুমার গুহ মে, জুন ২৲, বাবু নবীন চাঁদ বড়াল মে ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী ফাল্গুন হইতে বৈশাখ ৩৲।

এককালীন দান।

বাবু রুক্মিণীকান্ত নিয়োগী ॥০, বাবু দ্বারকানাথ বসু ২৲, ওয়াজেদ আলি খাঁ, জমিদার ২৲, বাবু চন্দ্রকান্ত দে ১৲, বাবু প্রসন্ননাথ ভাদুড়ী ॥০, বাবু মনমোহন হালদার ।০, বাবু রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ।০, বাবু গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী ॥০, ডাঃ ভারতচন্দ্র ধর ১৲, বাবু রুদ্রচন্দ্র মিত্র ১১, বাবু কৈলাশচন্দ্র বসু ১৲, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সরকার ১৲, বাবু তারকচন্দ্র রায় ১৲, বাবু নীলকান্ত বসু ॥০, বাবু দীননাথ চন্দ ।০, বাবু দ্বারকানাথ পোদ্দার ।০, বাবু গিরিশ চন্দ্র মজুমদার ॥০, বাবু হৃদয়চন্দ্র দে ১৲, বাবু চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ ১৲, A friend ৷০, বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥০, বাবু মথুরানাথ গুহ ১৲, বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহ ১৲, হরশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ।০, ছলিমদ্দিন ॥০, বাবু জয়শঙ্কর গুপ্ত ১৲, বাবু শ্যামাশঙ্কর মিত্র ॥০, বাবু শশীকুমার বসু ৷০, শ্রীমতী কান্তমোহিনী বসু আস্রের জন্য ১৲, বাবু শশীভূষণ তালুকদার ১৲, বাবু বিহারীলাল রায় ১৲, বাবু জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য ৫৲, বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন ১৲, বাবু শ্যামাচরণ সেন ॥০, বাবু লালমোহন সাহা ২৲, বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ১৲, ১ম শ্রেণী সিটিস্কুল ১৷/১০, বাবু শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ১৲, বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২১, W. C. Ghose Esqr. ২৲, আবগারী মহলের আমলাগণ ১/০, একজন মহিলা মাঃ বাবু নবদ্বিপচন্দ্র দাস আম ও দুগ্ধের জন্য ৪১, ভারত মহিলা সমিতি ঘড়ির জন্য ১৲, একজন ভদ্রমহিলা শ্যামবাজারের গাড়ী ভাড়া ॥০, বাবু মাধবরাম বড়দলুই ॥০, বাবু কালিনারায়ণ গুপ্ত পত্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫০৲, S. C. Mukerjee Esqr. ।০, বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ ২৲, A friend of Dasasram ১৲, বাবু প্রমথনাথ দত্ত ২৫৲, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার বসু ১৲, বাবু নগেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৲, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ধর জুন, জুলাই ১৲, বাবু লালমাধব মুখোপাধ্যায় ২৲, বাবু বেণীমাধব বসু, পিতৃ শ্রাদ্ধে ৫৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ১৷০, A friend of Dasasram ১৲, বাবু কালিনারায়ণ সান্ন্যাল ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় মে ।০, বাবু শ্যামলাল নাগ ১৲, বাবু অম্বিকাচরণ বসু ২৲, ডাঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় পুত্রের জন্মদিনে ১৲, একজন দাসাশ্রমের বন্ধু মাঃ বাবু দ্বারকানাথ সরকার ৫৲, বাবু রজনীকান্ত সেন ধুবড়ী ৪৲. বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী বাবু অন্নদাচরণ সেনের মাতৃশ্রাদ্ধে ২৲, বাবু সোমনাথ রায় ১৲, জমিদার পান্নালাল সিংহ ১৲, জমিদার রাধারমন মজুমদার ১৲, বাবু কৈলাশগোবিন্দ দাস ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ১৲, সবডেপুটী মৌলবী মুজাতালী আহম্মদ ॥০, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ॥০, জনৈক ভদ্র মহিলা ॥০, ডাঃ হরিনাথ সিংহ ১৲. স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে রংপুর ১৲, বাবু শ্রীগোবিন্দ সেন ৸৴১০, বাবু অনিলচন্দ্র বসু জন্মদিনে ১৲. বাবু হরনাথ ঘোষ ১৲. শ্রীমতী তারামণি দাসী ৷২৫, ২১১ পটুয়াটোলা মেসের ছাত্রগণ ॥০, ডাঃ মতীলাল মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী ক্ষীরোদা মিত্র ১৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।০, বাবু প্রিয়নাথ দত্ত, কন্যার বিবাহে ২৲, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল ॥০, বাবু মুক্তিনাথ সেন।০, R. N. Sett Esqr. ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু ১৲. ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ২৲. A friend of Dasaram ৪৲, বাবু রাখালদাস ঘোষ ১৲. Prosad Lodge Charity Box ।০, বাবু অঘোরনাথ মিত্র. বি, এল পুত্রের অন্নপ্রাশনে ৫৲, সেবালয় দর্শক ৵০।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

পুস্তক বিক্রয় ১০৸৶১০, বাক্সের দান ।৶০, মৃত গোবিন্দের জমা ।/০, খুচরা দান, রংপুর শুল্ক ৭৸৶১০. ভুলক্রমে জমা ১০৲, মোট ২৯॥০।

বস্ত্রাদি দান।

একজন বিধবা মৃত কন্যার স্মরনার্থ আম্র ও চাউল। বাবু বিপিনবিহারী সেন, কাপড় ১, বাবু উমাপদ রায় বেডপ্যান ২, বাবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দোয়াত ১, বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস ধুতি ২, বাবু সুরেশচন্দ্র দাস কাপড় ২, বেথুন কলেজ মেরুনা ফ্রক ১, বডিস্ ২, সাদা ফ্রক ৯, ইজার বডি ৩, গরম মোজা ১২ জোড়া, পেনিফ্রক ১, সাদামোজা ২ জোড়া, পরদা ২, চাদর ১। J. C. Dutt Esqr Rev J. W. Douglass কাপড় ১ ও চাদর ১।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

মাসিক চাঁদা ৩১॥০, এককালীন দান ২১৩৷৶০, অন্যান্য প্রকারে আয় ২৯॥০, গত মাসের হস্তেস্থিত ৩২৸৶৫, মোট আয় ৩০৭৷৶৫।

ব্যয়।

গত মাসের পচ্ছিত শোধ ২০৲, আদায় খরচ ৩০৸৶১০, কর্জ্জদান দাসীকে ৪৲, জিম্মা শোধ ১৷৶০, ভুলক্রমে দুইবার জমার শোধ ১৸০, খাইখরচ ৬০৷১২॥০, রাঁধুনী ৭৸৶০, মেথর ১০৸৶০, বাটী ভাড়া ৫০৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩০৲, রোগীর গাড়ী ভাড়া ১৪॥৶৭॥, আসবাব খরিদ ৪৷২॥০, দুগ্ধ ৯৷৶১২॥০, দাহ খরচ ৪৷১০, ধোপা ১৶৩, ঔষধ ॥/০, বিবিধ ১৷০, মোট ৩০১॥১৫।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ৩০৭।৵৫, পূর্ব্ব মাসের কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তেস্থিত ৩৵১২॥০, মোট ৩১০॥১৭॥০, মোট ব্যয় ৩০১॥১৫, বর্ত্তমান মাসের কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তেস্থিত ৩/১২॥০, মোট ৩০৪॥৵৭॥০, মোট হস্তেস্থিত ৫৸৵১০।

বিশেষ ধন্যবাদ।

বাবু কালিনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পত্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। সে জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

বাবু প্রমথনাথ দত্ত ২৫৲ টাকা এককালীন দান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমতী তারামণি দাসীর ২৫৲ টাকা বিশেষ দানের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বাবু আশুতোষ মল্লিক বিশেষ যত্নসহকারে ব্রহ্মময়ীকে পল্লীগ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া, এবং গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া তাহার পাথের সংগ্রহ পূর্ব্বক দাসাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দাসাশ্রমের বন্ধুর নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ। ভগবান তাঁহার সহৃদয়তার জন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বাবু হরেন্দ্রনাথ ঘোষ অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পাথের সংগ্রহ পূর্ব্বক সখীকে আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দাসাশ্রমে সম্প্রতি নিম্নলিখিত জিনিষগুলির নিতান্ত প্রয়োজন। যেগুলি আছে, সমস্ত অত্যন্ত পুরাতন ভগ্ন বা ছিন্ন, সেগুলির দ্বারা আর কাজ চলে না।

প্লেট ১৫ বাটী ২০ গেলাস ১৫ ডাল প্রভৃতি ঢালিবার জন্য বড় বাটী ৪ পট ২০ পিকদানি ২০ জল গরমের কেটলি বড় ১ লেপ কাঁথা, কাপড়, কাঁচি ১ গজ করিয়া অইল ক্লথ ৪ খানা চামচ বড় ছুরী ১ হারিকেন ২টা এবং ওয়াল ল্যাম্প ৪টা।

যাঁহারা অনাথ নিরাশ্রয় রোগী ও আতুরদিগকে একটু সচ্ছন্দে থাকিতে দেখিলে আনন্দ লাভ করেন আশা করি তাঁহারা এ সময় উদাসীন থাকিবেন না। এখনও কয়েকটী পুরুষের স্থান খালি আছে।

দাসী

ন্যায়পরায়ণ

রাম শাস্ত্রী।

(১৭৫৯ খৃঃ—১৭৯০)

যে পুণ্য-শ্লোক মহাত্মার নামে এই প্রবন্ধের শিরোলেখ ভূষিত করা হইয়াছে, তিনি চতুর্থ পেশওয়া মাধব রাওয়ের সময়ে মহারাষ্ট্র দেশের "মুখ্য ন্যায়াধীশ" (Chief Justice) ছিলেন। রাজ্যের যাবতীয় বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসার ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। প্রজাগণের মধ্যে কোন কারণে বিবাদ বিসংবাদ সংঘটিত হইলে, তাহারা প্রথমতঃ স্থানীয় গ্রামাধিকারী ও বাদী-প্রতিবাদীর নির্ব্বাচিত পঞ্চায়তের * সাহায্যে তাহাদিগের বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করিত। তাঁহাদিগের মীমাংসা মনোনীত না হইলে, যথাক্রমে মামলেদার (Collector of Revenues) ও সুভেদারের নিকট তাহার আপীল চলিত। তাঁহারাও পঞ্চায়তের সাহায্যে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সেখানে বাদীর অভীষ্টসিদ্ধি না হইলে, তাহাকে মুখ্য ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর নিকট আবেদন করিতে হইত। রামশাস্ত্রী সর্ব্বদা মহারাষ্ট্র রাজধানী পুণায় থাকিতেন। তিনি বার্ষিক দুই সহস্র টাকা বেতন পাইতেন। তদ্ভিন্ন পাল্‌কী খরচের ও পোষাক পরিচ্ছদের জন্য তাঁহার বার্ষিক ১২ শত টাকা বরাদ্দ ছিল। তাঁহার সহায়তার জন্য, কয়েকজন ধর্ম্মভীরু ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিয়োজিত ছিলেন। মুখ্য ন্যায়াধীশ ও তাঁহার সহকারিগণ বিচারকালে (গুরুতর মোকদ্দমা হইলে), স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তারপর যেরূপ প্রণালীতে বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন হইত, তাহা বর্ত্তমানকালের হাই কোর্টের জুরী প্রথার সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল।

---

* পঞ্চায়তের সভ্য-সংখ্যা, বিচার্য্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে, কখনও কখনও পাঁচ হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইত।

(১৭৬১ খৃঃ—১৭৭২ খৃঃ)

মহারাষ্ট্রপতি চতুর্থ পেশওয়ে মাধব রাও স্বয়ং যেরূপ ন্যায়পরায়ণ ও প্রজারঞ্জক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁহার অনুরূপ ন্যায়াধীশ পাইয়াছিলেন। ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর ন্যায় প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা, তীক্ষ্ণধীমত্তা, অপরিমেয় ধর্ম্মশীলতা, কঠোর ন্যায়নিষ্ঠতা, তথা অপূর্ব্ব নির্ভীকতা, নিরপেক্ষতা ও নির্লোভতা প্রভৃতি দেবোপম গুণ, পৃথিবীর যে কোনও দেশে, অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা রামশাস্ত্রী, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রবিচারে, তদানীন্তন প্রায় সমস্ত পণ্ডিতেরই অজেয় ছিলেন। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে, তিনি অতি কূট চক্রান্তেরও মর্ম্মভেদে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মশীলতা, নির্লোভতা ও সদাচরণ, তৎকালের মহারাষ্ট্র-জনসমূহের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। তাঁহার কঠোর ন্যায়নিষ্ঠতা দর্শনে স্বয়ং মহারাষ্ট্রপতিও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি এরূপ তেজস্বী, স্পষ্টবাদী ও ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন যে, অন্যায় আচরণ করিলে, স্বয়ং নরপতিও তাঁহার তীব্র তিরস্কারের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইতেন না;—তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরাও তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র অন্যায় অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশা করিতেন না। উপযুক্ত দোষ পাইলে, তিনি স্বীয় প্রভু, নরপতিরও প্রাণদণ্ডের আদেশ বিধান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার এই সকল দেবোচিত গুণের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, তাঁহাকে ততই মহৎ হইতে মহত্তর বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এই কারণে, আমরা মহারাষ্ট্র ইতিহাস হইতে এই মহাপুরুষের জীবনের কতিপয় অলৌকিক ঘটনা বঙ্গীয় পাঠকের সমক্ষে প্রকাশ করিলাম।

রামশাস্ত্রী সাতারা (Satara) জেলার অন্তঃপাতী "মাহুলী" নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে, বারাণসী গমনপূর্ব্বক তথায় বহু বর্ষ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনের বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও নিঃস্পৃহতা প্রভৃতি অলৌকিক গুণের সৌরভ সমস্ত মহারাষ্ট্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রপতি বালাজী বাজীরাও (মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট নানাসাহেব পেশওয়ে নামে পরিচিত *) তাঁহার গুণগ্রাম শ্রবণে এতদূর

* ইনি কানপুরের হত্যাকাণ্ডের সহিত সংসৃষ্ট নানাসাহেব হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি মহারাষ্ট্রদেশে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন। ইঁহার সময়ে পাণিপথের সুপ্রসিদ্ধ তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ১৭৫৯ খৃঃ মহারাষ্ট্র রাজ্যের তদানীন্তন "মুখ্য ন্যায়াধীশ" (Chief Justice) বিসাজী (বিশ্বনাথজী) কৃষ্ণ মহোদয়ের মৃত্যু ঘটিলে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামশাস্ত্রীকে ঐ মহাগৌরবকর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও পরিচয় সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না।

বিনা প্রার্থনায় রাজ সরকারে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াও, রামশাস্ত্রী ক্ষণকালের জন্যও কখন মনে মনে অহঙ্কার বোধ বা কোনও প্রকারে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তাঁহার আচরণ যৎপরোনাস্তি সরল ও ধর্ম্মানুগত ছিল। তিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, প্রাচীনকালের কামক্রোধবিবর্জ্জিত, লোকহিতব্রত দরিদ্র ব্রাহ্মণগণের ন্যায় অতিশয় সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার শান্তিময় কুটীরে বিলাস বা বিষাদের ছায়া কেহ কখনও দর্শন করেন নাই। তিনি কখনও এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতেন না। তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে, তিনি মাত্র দৈনন্দিন ব্যয়ের উপযুক্ত দ্রব্যাদি গৃহে রাখিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়া দিতেন। পরদিবসের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি অতীব শ্রদ্ধার সহিত ও যথাসাধ্য সম্পূর্ণভাবে তৎসমুদায়ের আচরণ করিতেন।

তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহার এতদূর ধর্ম্ম-সঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত ছিল যে, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ অপেক্ষা, তাঁহার আচরণে মহারাষ্ট্রবাসিগণ অধিকতর শিক্ষা ও উপকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অকৃত্রিম হিতৈষণার আশ্চর্য্যফলে, তিনি তাঁহার স্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।* তিনি ধার্ম্মিকের একমাত্র বন্ধু ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণের পক্ষে যমস্বরূপ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মাধিকরণের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, দেশের কোনও কোনও গণ্যমান্য ও ধনশালী ব্যক্তি দু-একবার তাঁহাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত

---

* **Grant Daff সাহেবও একথা স্বীকার করিয়াছেন। His (Ram Shastri's) conduct and unwearied zeal had a wonderful effect in improving the people of all ranks. Vol. I pp. 668.**

করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হওয়ায় এবং এইরূপ গর্হিত উপায় অবলম্বনে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হওয়ায়, আর কেহই শাস্ত্রী মহোদয়কে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেও সাহসী হন নাই। শাস্ত্রীমহোদয়ের প্রণীত নিয়মাদি ও তাঁহার কৃত বিবাদের মীমাংসাদি এখনও মহারাষ্ট্রদেশে সর্ব্বত্র ভ্রান্তি ও পক্ষপাত শূন্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

রামশাস্ত্রী যখন ন্যায়াধীশের পদ প্রাপ্ত হন, তখন পেশওয়ে মাধব রাওয়ের বয়ঃক্রম ১৫শ বৎসর মাত্র ছিল। ইহার তিন বৎসর পরে, ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পেশওয়ে বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যু হইলে, ১৮শ বর্ষবয়স্ক মাধব রাও মহারাষ্ট্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রামশাস্ত্রী এই তরুণ-বয়স্ক নরপতিকে প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে নানা সময়ে নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিতেন। মাধব রাওও শাস্ত্রী মহাশয়কে গুরুতুল্য ভক্তি ও সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন। ক্রমে মাধব রাওয়ের বয়োবৃদ্ধির সহিত, তাঁহার তেজ ও ক্ষমতা প্রভৃতির বিস্তার হইলে, তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা সৎপথে চালিত করা রাম শাস্ত্রীর পক্ষে অনেক সময় বড় কষ্টকর হইয়া উঠিত। মাধব রাও, সময়ে সময়ে, কাহারও উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। কখনও কখনও বা অপরের উপদেশে পরিচালিত হইয়া, রাম শাস্ত্রীর সাহায্য গ্রহণে অবহেলা প্রকাশ করিতেন। একদা কয়েকজন যোগপন্থী ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন করিয়া, মাধব রাওয়ের মন সহসা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি রাজকার্য্যে অমনোযোগিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বদা "দেবারাধনা ও জপ, ধ্যান" প্রভৃতিতে নিমগ্ন থাকিতে লাগিলেন। বলা অনাবশ্যক যে, ইহার ফলে অল্প দিনেই রাজকার্য্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রাম শাস্ত্রী দেখিলেন, সাধারণ উপদেশের দ্বারা মাধব রাওয়ের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে গেলে, তাঁহার সহিত মনোমালিন্য ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। মাধব রাওয়ের অসন্তোষে তাঁহার প্রিয় পাত্র ও সহচরগণেরও সহিত অকৌশল ঘটা অবশ্যম্ভাবী। এই সকল ভাবিয়া রাম শাস্ত্রী বিষম বিপদে পড়িলেন। কিন্তু মাধব রাওকে সদুপদেশ দিয়া রাজ কার্য্যে মনোযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে তিনি ক্ষান্ত হইলেন না।

একদিন রামশাস্ত্রী কোনও কার্য্য উপলক্ষে মাধব রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক জপে নিযুক্ত আছেন। রামশাস্ত্রী তাঁহার জন্য অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া গৃহে প্রতি-গমন করিলেন। অনন্তর আহারাদি কার্য্য সমাপন ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি একটী অশ্বে স্থাপন পূর্ব্বক, পুণা পরিত্যাগের উদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গমন কালে একবার স্বীয় প্রভু মাধব রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজসভায় গমন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট, ন্যায়াধীশ পদ পরিত্যাগের ও বারাণসী গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মাধব রাও ভাবিলেন, যে, তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত যথাসময়ে সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। এই কারণে তিনি স্বীয় ব্যবহারের অন্যায্যতা স্বীকার করিয়া শাস্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিলেন।

শাস্ত্রী বলিলেন। মহারাজ, জপ ও তপস্যা অবলম্বন করায়, রাজকার্য্যে ও প্রজাগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং আর এ রাজ্যে থাকা উচিত নহে।

মাধব রাও। ব্রাহ্মণের পক্ষে জপ, তপস্যা ও পূজা অতিশয় প্রশস্ত ও শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম নয় কি?

রাম শাস্ত্রী। নিশ্চয়ই প্রশস্ত, একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আপনি যখন ব্রাহ্মণধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনরূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তখন উক্ত ধর্ম্ম পালনে অযত্ন করিলে, আপনাকে পাপভাগী হইতে হইবে। নরপতির পক্ষে প্রজাগণের দুঃখ মোচন ও তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর নাই। এক প্রজাপালনের দ্বারা আপনি জপ, তপ ও পূজা ধ্যান প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়স্কর কার্য্যের ফল লাভ করিতে পারিবেন। তবে যদি আপনার শাস্ত্রবিহিত ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম পালনের আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, তবে এই সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া—সংসারের মোহপাশ ছেদন করিয়া, আমার সঙ্গে আসুন। উভয়ে গঙ্গাতীরে বাস পূর্ব্বক জপ, পূজা ও তপস্যাদি শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরম শান্তি লাভ করিব।

মাধব রাও এই উপদেশপূর্ণ ভৎর্সনার ন্যায্যতা স্বীকার করিলেন; এবং

সেই দিন হইতে জপ, পূজা ও তপস্যাদির মাত্রা হ্রাস করিয়া রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে পূর্ব্ববৎ মনোযোগী হইলেন।

পেশওয়ে বংশীয় নরপতিগণ প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দক্ষিণা বিতরণ করিতেন। প্রথম বাজীরাওয়ের সময়ে, ১৭৩১ খৃঃ এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত পাঁচদিন ব্রাহ্মণ ভোজন ও তৎপরে দুইদিন দক্ষিণা বিতরণ হইত। শাস্ত্রানুরাগী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা গুণানুসারে ২০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা পাইতেন। যজ্ঞোপবীত মাত্রধারী ব্রাহ্মণগণকে সাধারণতঃ ২৲ টাকা মাত্র প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এই "শ্রাবণ মাসীয় দক্ষিণা-সমারোহ" এতদূর প্রসর লাভ করিয়াছিল যে, মিথিলা, কাশী ও রামেশ্বর প্রভৃতি অতিদূরবর্ত্তী প্রদেশের পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাও দক্ষিণাগ্রহণের জন্য পুণায় আগমন করিতেন। প্রতি বৎসর প্রায় ৩০।৪০ সহস্র ব্রাহ্মণের সমাগম হইত; এবং পেশওয়ের রাজকোষ হইতে ৩।৪ লক্ষ টাকা এই উৎসবে ব্যয়িত হইত। কথিত আছে, মাধব রাওয়ের পিতার সময়ে (নানাসাহেব পেশওয়ের সময়ে) একবার এই উৎসবের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল।

এই শ্রাবণ মাসীয় দক্ষিণা বিতরণের ভার ন্যায়াধীশের প্রতি সমর্পিত ছিল। নানাফড়ণবীস (রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব পত্র পরীক্ষক সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী) টাকার তোড়া লইয়া নিকটে বসিয়া থাকিতেন এবং ন্যায়াধীশ রাম শাস্ত্রী ব্রাহ্মণগণকে গুণানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিতেন। একদা দক্ষিণা বিতরণ কালে, রামশাস্ত্রীর সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দক্ষিণাগ্রহণের জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্পর্কে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও, তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, সামান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অপেক্ষাও হীন ছিলেন। নানাফড়ণবীস তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ২০৲ টাকা দক্ষিণা দিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। রাম শাস্ত্রী এই ন্যায়বিরুদ্ধ অনুরোধে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ ২০৲ টাকা পাইবার অধিকারী নহে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, একারণে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ যাহা কিছু দিতে হয়, তাহা আমিই স্বয়ং অন্য সময়ে দিব। কিন্তু এই ধর্ম্মার্থ উৎসৃষ্ট অর্থ (দক্ষিণার টাকা) তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিলে, আমাকে, ঐ অর্থের

অপব্যয় ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পক্ষপাত জনিত পাপের ফলভাগী হইতে হইবে। অতএব ইহাকে সাধারণ প্রথানুসারে ২৲ টাকাই প্রদত্ত হউক।” নানাফড়ণবীস শাস্ত্রী মহাশয়ের এই রূপ নির্লোভতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। রাম শাস্ত্রী অম্লানবদনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দুইটী মাত্র টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

জেষ্ঠভ্রাতার ন্যায়, রাম শাস্ত্রী মহাশয়ের গোপাল নামে এক অতিশয় স্থূল-বুদ্ধি ও মূর্খ পুত্র ছিল। তিনি তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহার জ্ঞানলাভ হয় নাই। গোপাল বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে, একদা পেশওয়ে মাধব রাও, তাহার জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় সংকুলনার্থে, তাহাকে জায়গীর স্বরূপ কিছু ভূমি প্রদান করিবার ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেন। রাম শাস্ত্রী ইহা অবগত হইয়া মাধব রাওকে বলিলেন, “মহারাজ! এই মূর্খকে জায়গীর দিয়া কি হইবে? ইহাকে না দিয়া অপর কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে দিলে অনেক কাজ হইতে পারে। আমাদের গোপাল মহারাজের শাগির্দ্দগণের (ব্রাহ্মণ ভৃত্যগণের) সহিত প্রাসাদে থাকিয়া, জলোত্তোলন প্রভৃতি কার্য্য করিবে, এবং তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ দুবেলা পেট ভরিয়া ভোজন করিবে। এতদপেক্ষা অধিকতর অনুগ্রহ প্রাপ্তির যোগ্যতা গোপালের আছে বলিয়া আমি মনে করি না।” পেশ-ওয়ে মাধব রাও রাম শাস্ত্রীর এইরূপ নিরপেক্ষতা ও নির্লোভতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। শাস্ত্রী মহোদয় জীবিত থাকিতে, গোপাল কোনও রূপ রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই। ১৭৯০ খৃঃ শাস্ত্রী মহোদয় ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র গোপাল (তখন গোপাল শাস্ত্রী নামে পরিচিত!) স্বর্গীয় রাম শাস্ত্রীর পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রাজকোষ হইতে বার্ষিক ৩২ শত টাকা পাইতে লাগিলেন।

রাম শাস্ত্রীর ন্যায়পরতা ও নির্লোভতার ন্যায়, তাঁহার নির্ভীকতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয় ন্যায়াধীশের কার্য্য করিতেন বলিয়া রাজ সরকার হইতে তিনি পাল্‌কী ও “আব্‌দাগীর” (ছত্র) প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। প্রত্যহ সেই পাল্‌কী আরোহণে তিনি রাজসভায় যাইতেন। বহু দিনের ব্যবহারে, পাল্‌কীটী পুরাতন ও কিয়ৎপরিমাণে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে নানাফড়ণবীস পেশওয়ের মন্ত্রিত্ব পদে উন্নীত হইয়া-ছিলেন। তিনি রাম শাস্ত্রীর শিবিকা জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে

একটী নূতন শিবিকা পাঠাইয়া দিলেন। নানাফড়ণবীসের অনুচরেরা ঐ শিবিকা লইয়া শাস্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনুচরেরা বলিল যে, "নানাসাহেব আপনার জন্ত এ শিবিকা প্রেরণ করিয়াছেন।" এস্থলে বঙ্গীয় পাঠকগণের অবগতির জন্ত ইহা বলা আবশ্যক যে, মহারাজ মাধব রাওয়ের পিতা পেশওয়ে বালাজী বাজীরাও (রাজ্যকাল খৃঃ ১৭৪০—১৭৬১) "নানাসাহেব পেশওয়ে" নামে মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট পরিচিত ছিলেন। এবং মহারাষ্ট্রদেশের তাৎকালিক প্রথানুসারে পেশওয়েগণ ও তাঁহাদিগের আত্মীয়বর্গ ভিন্ন অপর কাহারও নামের সহিত "সাহেব" এই সম্মানসূচক উপাধি ব্যবহৃত হইত না। এই কারণে, নানা ফড়ণবীসের নামের সহিত "সাহেব" উপাধিযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া, রাম শাস্ত্রী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেন। এবং নানার দর্প-চূর্ণ করিবার জন্ত অনুচরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কি? নানা সাহেব, এই পাল্‌কী পাঠাইয়া দিয়াছেন? নানা সাহেব কে? তিনি ত অনেক দিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন!" এই বলিয়া তিনি শিবিকাটী ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন; এবং আজীবন তাঁহার সেই পুরাতন প্রভুর প্রদত্ত জীর্ণ শিবিকাটী ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই গেল এক শ্রেণীর নির্ভীকতা। আর এক শ্রেণীর নির্ভীকতার কথা বলিতেছি। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, ইংরাজী শিক্ষার গুণে, ভারত-বাসীর মন বহুলপরিমাণে সংস্কৃত হওয়ায়, তাঁহারা অনেক পরিমাণে স্বাধীন-চিন্তা শিক্ষা করিয়াছেন। তথাপি লোকাচারের বা শাস্ত্রকারগণের বিরুদ্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে গিয়া সময়ে সময়ে কিরূপ বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও রাম শাস্ত্রী এ বিষয়ে যেরূপ স্বাধীনচিন্তা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

একদা কোনও বৈষ্ণবী রাজপ্রাসাদে সঙ্কীর্ত্তন ও কথকতা করিতে-ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে, কলিযুগের রমণী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মতের উল্লেখ করিয়া, বৈষ্ণবী রাম শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—"কলিযুগের রমণীগণ বহুভোজিনী ও অধিকতর রিপুপরবশা হইবে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন, অথচ বর্ত্তমান যুগে, পূর্ব্বযুগ প্রচলিত বিধবা-বিবাহাদি প্রথারও প্রতিষেধ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি?" বৈষ্ণবীর

মুখে এই অদ্ভুত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সকলেই রাম শাস্ত্রীর উত্তর শুনিবার জন্ত ব্যগ্রভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে স্বাধীন-চিত্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"মা! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি যথার্থ। বস্তুতঃ এ বিষয়ের কোনও সরল মীমাংসা নাই। তবে আমার বিশ্বাস, শাস্ত্রকারগণ পুরুষ ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা স্থলে স্থলে রমণীগণের অযথা নিন্দা ও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পুরুষগণের সুবিধা মত নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। শাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মধ্যে যদি কেহ রমণী থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শাস্ত্রমধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে অনেক অনুকূল নিয়ম পাওয়া যাইত!" রাম শাস্ত্রীর ন্যায় ধর্ম্ম-নিরত, ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণের মুখে এই সরল সত্য, শাস্ত্রকারগণের সম্বন্ধে এই সুতীব্র মন্তব্য, শ্রবণ করিলে, তাঁহার নির্ভীকতা ও স্বাধীনচিত্ততা সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দেহ থাকে না।

শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ সময়ে ও যেরূপ সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় কঠোর সত্যপ্রিয়, নিরপেক্ষ ও নির্লোভ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ এরূপ লৌকিক বিশ্বাস-বিরোধী সত্য স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। যিনি এরূপ সত্যদর্শী ও নির্ভীক, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ মত ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একদা পেশওয়ে মাধব রাওয়ের জনৈক ব্রাহ্মণ-সেনাপতি সর্দ্দার পরশুরাম ভাউ'র অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা বিবাহের চতুর্থ দিবসে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইলে, 'ভাউ' রাম শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ইঁহাকে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতে, অথবা অপর স্বামীর পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করেন? এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় কিরূপ?" শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্র আলোচনা করিয়া উত্তর দিলেন,—"আমার বিবেচনায় শাস্ত্রানুসারে ইহার দ্বিতীয় বার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।" অনন্তর এই অশ্রুতপূর্ব্ব মতের মীমাংসার জন্য রাজ-প্রাসাদে পণ্ডিতগণের সভা আহূত হইয়াছিল। সভার সমস্ত পণ্ডিতগণের বিচারে রাম শাস্ত্রীর মতই শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হইল। নানা ফড়নবীসের পরামর্শ অনুসারে এ বিষয়ে কঙ্কণের ব্রাহ্মণ সমাজের ও বারাণসীর পণ্ডিতগণের মতও গৃহীত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মীমাংসার বিরুদ্ধে কেহই মত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এইরূপে বহুজনসম্মতি-মে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণিত হইলেও বোধ হয় কঙ্কণবাসী

সামাজিকগণের অনিচ্ছাহেতু ও অপর কতিপয় কারণে সে সময়ে আর পরশু রাম ভাউর কন্যার পুনর্ব্বিবাহ ঘটিয়া উঠে নাই।

রাম শাস্ত্রীর জীবনের আর একটী ঘটনার—তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্ব প্রধান ঘটনার—উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পেশওয়ে মাধবরাও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে অকালে রাজযক্ষা রোগে প্রাণত্যাগ করিলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'নারায়ণ রাও' সিংহাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। 'রঘুনাথ রাও' নামক নারায়ণ রাওয়ের এক পিতৃব্য ছিলেন। তিনি মাধব রাওয়ের পিতা বালাজী বাজী রাওয়ের মধ্যম সহোদর। এই কারণে বালাজী বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর হইতেই তিনি মহারাষ্ট্র রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পাইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। মাধব রাও যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন রঘুনাথ রাওয়ের আশা পূর্ণ হয় নাই। এক্ষণে নারায়ণ রাওকে অল্প বয়স্ক ও দুর্ব্বল দেখিয়া, তাঁহাকে বন্দী পূর্ব্বক তিনি স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের স্ত্রী দুষ্টমতি আনন্দীবাই স্বামীর সিংহাসন প্রাপ্তির সহায়তাকল্পে এক অতীব জঘন্যতম পৈশাচিক উপায়ের অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সুমের সিংহ ও খড়্গা সিংহ নামক দুই জন সেনানীর সাহায্যে নারায়ণ রাওকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ্যলুব্ধ রঘুনাথও পরোক্ষ ভাবে এই কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। তার পর যেরূপ নিষ্ঠুর ভাবে বালক নারায়ণ রাওকে সহসা হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা গত বর্ষের "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত "নারায়ণ রাওয়ের বধর" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিবরণের সহিত বর্ত্তমান প্রস্তাবের কোনও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই বলিয়া, এ স্থলে তাহার বর্ণনায় ক্ষান্ত থাকিলাম।

নারায়ণ রাও নিহত হইলে, নানা ফড়নবীস প্রভৃতি সচিবগণ রঘুনাথ রাওকে 'রক্তের তিলক' পরাইয়া সিংহাসনে বসাইলেন। রঘুনাথ রাওয়ের প্রতি অনেকের সন্দেহ থাকিলেও, তাঁহার বিরুদ্ধে কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা দিবার চেষ্টা করেন নাই। ন্যায়াধীশ রাম শাস্ত্রীও এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত করেন নাই। কিন্তু তিনি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে গোপনে এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রায় ৬ সপ্তাহ কাল সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধানের পর, তিনি রঘুনাথ রাওয়ের বিরুদ্ধে সু-

প্রমাণাদি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রঘুনাথের লিখিত এই ঘটনা সংক্রান্ত চিঠি পত্রের আবিষ্কার করিয়া রঘুনাথ রাওকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। রঘুনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আংশিক দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে 'সঙ্গদোষে আমি অকারণ জনাপবাদের ও অভিশাপের ভাগী হইয়াছি। এজন্য আমার কি প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত?' রঘুনাথ রাও সচিবমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসন হইতে শাস্ত্রী মহাশয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নির্ভীকহৃদয় রাম শাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য সভায় রঘুনাথের দোষোল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন,—"প্রাণদণ্ড ভিন্ন আপনার পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। 'কারণ ভবিষ্যতে আপনি আর কখনই কোনও প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। আপনার নিজের অথবা আপনার রাজ্যেরও উন্নতি কখনই হইবে না। আর আপনি যত দিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, তত্দিন আমি আর এই পাপ রাজ্যে পদার্পণ করিব না।" এই বলিয়া ন্যায়পরায়ণ রাম শাস্ত্রী রাজ কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, সপরিবারে পুণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণা নদীর তীরবর্ত্তী কোনও নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া বসতি করিলেন; এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ পরমার্থ সাধনে অতিবাহিত করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

"নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ।"

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

একটা কথা—চরিত্রানুমান বিদ্যা।

গত মাসের আমার কথায় কেহ বা সন্তুষ্ট,—কেহ বা আমার বন্ধুর মত নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। ঘনিষ্ঠ-বন্ধুদিগের মধ্যেও কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটিতে পারে, এ কথাটা অনেক লোকে ভুলিয়া যান। কোন বিষয়েই মতভেদ না হওয়াই বিচিত্র, এবং এরূপ না হওয়ার অর্থ এই যে, সে বিষয়ে আমরা রীতিমত মনোযোগ করি নাই। প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণন করিতে গেলেই যখন মতভেদের সম্ভাবনা, তখন বিবাদবস্তুর সত্যতার বিচারে মতভেদ অনিবার্য্য। আপনার শিক্ষা ও সংসর্গ অনুসারে আপনার মনের গতি হইবে, আমার শিক্ষা ও সংসর্গ অনুসারে আমার মনের গতি হইবে।

যে প্রমাণ আপনি যৎসামান্য মনে করিবেন, হয় ত তাহাই আমার নিকট যথোচিত বলিয়া বোধ হইবে।

* * *

এই মতভেদ অনেকে সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, যখন মতেই মিলিল না, তখন বন্ধুতা কিসের? আমি সরল মনে তাঁহার মতের ঠিক বিপরীত মত পোষণ করিতে পারি, এ কথা বলিলে তাঁহারা আশ্চর্য্য বোধ করেন। কিন্তু বিষয় অনুসারে মতভেদ না হওয়ার অর্থ—ঔদাসীন্য, প্রবল স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশের বা বুদ্ধি চালনার অভাব মাত্র। আপনার 'রায়ে' সায় দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইব, কিন্তু আপনার মনস্তুষ্টির জন্য যদি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইবে।

* * *

এই দীর্ঘ ভূমিকার উদ্দেশ্য এই যে, আজও একটা বিবাদবস্তু সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আজ কাল চরিত্রানুমান বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথাটার ইংরাজী অনুবাদ করিলে science of reading character হয়। বিদ্যা শব্দটা science বই আর কিছু নয়। কিন্তু আপনার কোন কোন পাঠক উহাকে বিজ্ঞান শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে দেখিলে মর্ম্মাহত হইবেন। হয়ত তাঁহারা পূর্ব্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মনে মনে শাকুন শাস্ত্র, পঞ্চপক্ষী, রমল যামল প্রভৃতি টানিয়া আনিবেন। কিন্তু এসকলের সহিত চরিত্রানুমান বিদ্যার আকাশ পাতাল প্রভেদ।

* * *

বস্তুতঃ চরিত্রানুমান বিদ্যাটা তত দুর্ল্লভ নহে। বরং বিলক্ষণ সুলভ। কেন না, কোন নূতন লোক দেখিলেই সকলে তাহার একটা না একটা ভাল মন্দ চরিত্র খাড়া করিয়া ফেলেন। 'অমুক লোকটির মুখ দেখিলেই তাহাকে সরল-স্বভাব বলিয়া মনে হয়,' 'অমুকের স্বর শুনিলেই তাহাকে ক্রূর বলিয়া বোধ হয়,' 'সে ব্যক্তির মনে মুখে এক নয়,' ইত্যাদি নানা প্রকার চরিত্রানুমান আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি। কিন্তু কথায় বলি আর মনে ভাবি, এগুলা চরিত্রানুমান বই অপর কিছু নহে। মুখের ভঙ্গীতে, নাসিকার বিস্ফারণে, নেত্রের দৃষ্টিতে, ভ্রূদ্বয়ের ঊর্দ্ধ গতিতে, ললাটের

আকুঞ্চনে, অধরোষ্ঠের দৃঢ়তায় লোকের মনের গতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

* * *

কিন্তু সকল সময় আমাদের অনুমান ঠিক হয় না। মুখ দেখিয়া যাহাকে অত্যন্ত সরল-প্রকৃতি মনে করিয়াছিলাম, কার্য্যকালে হয়ত সে বিপরীত ভাব দেখাইয়াছে। কত লোককে বিশ্বাস করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এইরূপে প্রতারিত হইতে কেহ ইচ্ছা করে না; পরন্তু প্রতারিত হইলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বিস্ময় প্রকাশেই জানা যাইতেছে যে, মুখ দেখিয়া লোকের চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ সবিশেষ অভ্যস্ত ও সাবধান না হইলে মনের ভাব মুখে প্রকাশ নিবারণ করিতে পারা যায় না। যাঁহারা দৌত্য কার্য্যে নিপুণ, তাঁহাদিগকে মনের ভাব মুখে গোপন করিবার ক্ষমতা অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। মনে মুখে এক না দেখানই তাঁহাদের ব্যবসায়। কিন্তু এটা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র।

* * *

লোকের মুখ দেখিয়া সহজে তাহার চরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কেন না, লোকের মুখ আমরা যত দেখি, অন্য অঙ্গ তত দেখি না। এক মুখেই কত স্থানে কত প্রকার কুঞ্চন লক্ষিত হয়। কুঞ্চনের রূপান্তর মনের ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। প্রেমিক প্রণয়িনীর একটু দৃষ্টিতে কত কথা বুঝিতে পারে। এমন কি, কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত লোক বুঝিয়া চীৎকার করে। লোকের চলন, বসা, দাঁড়ান প্রভৃতি লইয়া আমরা কত সময়ে উপহাস করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লোকটিকে আমরা যেমন প্রকৃতির দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহার অঙ্গ-চালনায় সে প্রকৃতির অন্যথা দেখিতে পাই। লোকে কথায় বলে, যে যাহাকে দেখিতে পারে না, সে তাহার চলন বাঁকা দেখে। অর্থাৎ যাহার সোজা চলন তাহার মন ভাল, যাহার মন ভাল নয় তাহার বাঁকা বই সোজা চলা ঘটিবে কেন?

* * *

ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি আছে? আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চেষ্টিত মনের গতির উপর নির্ভর করে। মনের বিভিন্ন ভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অবস্থা ঘটে। সুতরাং এই সকল চেষ্টিত দেখিয়া মনের ভাব অবগত হইতে পারা যায়। লোকে যখন শোকে কাতর হয়, কেহ বা বুক

চাপড়ায়, মাথা কুটিতে থাকে, হাতে হাত ঘষিতে থাকে। রাগের সময় লোকে ভূমিতে পদাঘাত করিতে থাকে। 'অমুকের কথা যেন খেতে আসে,' 'সে রাগে গর গর করিয়া হাত কামড়াইতে লাগিল,' ইত্যাদি কত প্রকারে আমরা চরিত্রানুমান-বিদ্যার পরিচয় পাই।

* * *

কেবল তাহাই নহে। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে সকল কাজ করিয়া থাকি, তৎসমুদয়েও মনের ভাব অল্প বিস্তর প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হাতের লেখার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলমের চালক হাত বটে, কিন্তু হাতের চালক মন। সুতরাং মনের অবস্থানুসারে হাত চলিতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে লেখার রূপান্তর ঘটে। তাড়াতাড়ি লেখার আর ধীর সুস্থির চিত্তে লেখার মধ্যে কত প্রভেদ, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি লেখার অর্থ মনের অস্থিরতা। সেইরূপ ক্রূর ব্যক্তির লেখা এক প্রকার, সরল স্বভাবের লেখা অন্য প্রকার; অসহিষ্ণু লোকের লেখা এক প্রকার, আর ধীর শান্ত পুরুষের লেখা অন্য প্রকার। বাস্তবিক বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের লেখা সবিশেষ পরীক্ষা করিলে লেখা দেখিয়া চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। এইরূপে বিলাতে graphology বা লেখন-বিদ্যা বলিয়া একটা চরিত্রানুমান-বিদ্যা হইতেছে।

* * *

আর একটু অগ্রসর হওয়া যাক্। চলন দেখিয়া লোকের চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। গরবের চলন, চিন্তিতের চলন, মাতালের চলন, স্থির-প্রতিজ্ঞের চলন, এ সকল কাহাকেও শিখাইতে হয় না। সুতরাং লোকের জুতার কোন্ অংশ কি প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাও দেখিয়া তাহার চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। সমান ভারী দুইজন লোকের জুতা ঠিক একই সময়ে ছিঁড়ে না। পা টিপিয়া চলায়, আর বালকের ন্যায় চঞ্চল চলায় জুতা সমান টিকিবে কেন? বালকের ও বৃদ্ধের বস্ত্রাদি সমান টিকিলে উভয়ে এক হইয়া পড়িবে।

* * *

তবেই দেখুন, চরিত্রানুমান বিদ্যাটা কত সুলভ। কোন এক বিষয় লইয়াই লোকের ভাল মন্দ চরিত্র অনুমান করিতে পারা যায়। মনের তেজঃ দেহে ফুটিয়া বাহির হয়। তেজীয়ান্ পুরুষের লক্ষণ ও কাপুরুষের

লক্ষণ এক নহে। ক্ষীণ ও মেদল দেহের প্রকৃতি এক নহে। দুর্ব্বল ও মাংসল ব্যক্তির নিকট একই প্রকার ব্যবহার আশা করা যায় না। 'অমুক লোকটার বুকের ছাতি দেখ,' এ কথায় অনেক সত্য লুকান আছে। আমাদের মস্তক, বক্ষঃ প্রভৃতি অঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রস্থাদির পরিমাণ লইয়া Bertillon সাহেব মানব-চরিত্র অনুমান করিবার সন্ধান বাহির করিতেছেন। পুরুষ লক্ষণে দেখা যায়,—

সমবক্ষসোঽর্থবন্তঃ পীনৈঃ শূরাস্ত্বকিঞ্চনাস্তনুভিঃ।

যে পুরুষের বক্ষঃ সমান অর্থাৎ উচ্চনীচ নহে, সে ধনবান্। যাহার বক্ষঃ পুষ্ট সে বীর, যাহার ছোট সে অকিঞ্চন অর্থাৎ পুরুষার্থ হীন।

* * *

সে দিন কোন বিলাতি কাগজে দেখিতেছিলাম, এক ব্যক্তি আমাদের আঙ্গুলের নখ দেখিয়া চরিত্র সম্বন্ধে অনুমান করিবার কয়েকটা নিয়ম বাহির করিতেছেন। বাস্তবিক একটু সন্ধান ধরাইয়া দিলে, মানুষের নখেও তাহার চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ, phrenology বা মস্তিষ্ক-বিদ্যার আলোচনায় যাঁহারা নিপুণ, তাঁহারা নাকি মস্তকের অংশ বিশেষের পরিপুষ্টি দেখিয়া আমাদের অভিরুচি বা দক্ষতা, সমুদয় বলিতে পারেন। সকল লোকের সকল প্রকার কাজে মন যায় না; কিম্বা সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষা হয় না। বুদ্ধি বিবেচনার আধার আমাদের মস্তিষ্ক। সুতরাং মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কাজে নিপুণতার সম্বন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। আবার, আমরা যে অঙ্গ সর্ব্বদা চালনা করি, তাহার পুষ্টি ঘটিয়া থাকে। আমি যদি বীর পুরুষ হই, তাহা হইলে আমার হস্তাদি অঙ্গ বিশেষের চালনা সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। সুতরাং হাতের গঠন, আঙ্গুলের বিন্যাস, দৈর্ঘ্য, স্থূলতা প্রভৃতির দ্বারা বিচক্ষণেরা পুরুষ নির্ণয় করিতে পারেন। এইরূপ প্রায় সকল অঙ্গেই অল্প বা অধিক লক্ষণ বর্ত্তমান। তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি থাকিলে চরিত্রানুমান-বিদ্যা অভ্যাস হইয়া পড়ে।

* * *

অবস্থান্তর বা মনের ভাবান্তর ঘটিলে মুখের শ্রী বিলক্ষণ পরিবর্ত্তিত হয়। বৃদ্ধের ললাট-কুঞ্চনের মধ্যে কত চিন্তা লুকান থাকে। যাঁহারা চিত্র-বিদ্যা জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, কত সহজে 'হাসি হাসি' মুখকে 'কাঁদ কাঁদ' ...ত পারা যায়। কেবল মুখের পাশের দুইটা রেখা নীচের দিকে বা

উপর দিকে বাঁকাইয়া দিলেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ফটোগ্রাফে অনেকে নিজের বা বন্ধুর মুখ ঠাওরাইতে পারে না। না বুঝিয়া অনেক সময় ফটোগ্রাফারের দোষ দেয়। আলোক ও ছায়ার তারতম্যে আমার মুখের ছবি অপরের মুখের মত দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু আমি যেমন মুখ করিয়া থাকিব অর্থাৎ ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় আমার মনে যে ভাবের উদয় হইবে তদনুসারে ছবি উঠিবে। তাহা ছাড়া, দীন ব্যক্তির টাকা আসিতে থাকিলে বা সুখীর দুঃখ ঘটিলে মুখের কত পরিবর্ত্তন ঘটে। চোর ডাকাতকে জেলখানায় পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহাব মুখের ফটোগ্রাফ রাখা হইত। উদ্দেশ্য এই যে, পরে অন্য দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিল কি না, তাহা সেই ফটোগ্রাফ দেখিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ফটোগ্রাফ বড় কঠোর সাক্ষ্য দেয়। অবস্থান্তর বা মনের ভাবান্তর ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফ বদলাইতে হয়। অর্থাৎ ফটোগ্রাফের সাক্ষ্য ভ্রমে ফেলিতে পারে।

* * *

এজন্য আজ কাল জেলখানার কয়েদীদিগের হাতেব আঙ্গুলের রেখার ছাপ রাখা হইয়া থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দেখিয়া মানুষ ঠাওরাইতে পারা যায়। তবেই মুখের বা অন্যান্য অঙ্গের পরিবর্ত্তন হইলেও হাতের রেখাগুলির বক্রতা যেমন তেমনই থাকে। তবেই এক এক ব্যক্তির হাতের রেখাগুলি তাহার আমরণ সহচর। ইহাই সামুদ্রিক শাস্ত্র। উহা একটা সত্য বিদ্যা কিনা, এবং সেই বিদ্যার পরিসরই বা কত, সে বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে। এখন দেখা যাইতেছে, করতলের রেখাগুলির সঙ্গে আমাদের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। যদি আমার আঙ্গুলের রেখা অপর কাহারও মত না হইল, তবে সেই রেখা দেখিয়া আমাকে চিনিতে পারিবেন না কেন? আমার মুখ দেখিয়া যদি আমাকে চিনিতে পারেন, আমার আঙ্গুলের রেখা দেখিয়া চিনিতে পারিবেন না কেন? মুখের বরং পরিবর্ত্তন হয়, করতলের রেখার নাকি পরিবর্ত্তন নাই।

* * *

কিন্তু করতলের রেখার সঙ্গে আমার জীবনের সম্বন্ধ আছে, একথা ভাবিতে পারি না। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। যদি এমন প্রশ্ন হইত যে, আমার করতলে এই প্রকার রেখা আছে, আমি কি কর্ম্ম করি বা আমার সাংসর্গি

অবস্থা কিরূপ? এ কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ হাতের রেখা দেখিয়া ভূত ঘটনা বলা সম্ভব হইলেও, ভবিষ্যৎ ঘটনার অনুমানও করিতে পারিব কেন? যাঁহারা সামুদ্রিকের পক্ষপাতী, তাঁহারা উত্তর দেন যে, "উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, ইহাই বলিতে পারি। কেন এরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা জানি না। কিন্তু প্রত্যক্ষ ফলে অবিশ্বাস করিব কেন? শূন্যে স্থিত লোষ্ট্র ভূমিতে পতিত হয়; ভূমির সহিত লোষ্ট্রের কেন সম্বন্ধ আছে, তাহার উত্তর জানি না।"

*

কিন্তু এই খানেই বিবাদ। হাতের রেখার সঙ্গে ভাগ্যের সম্বন্ধ বাস্তবিক দেখা যায় কি? অনেকে গণককে হাত দেখাইয়াছেন এবং গণকের অন্ততঃ দুই চারিটা কথা যে সত্য, হয়ত তাহাও বলিবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, "যে দুই চারিটা গণনা মিলে না, তাহা গণকের দোষ বা সামুদ্রিক শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতার দোষ। সামুদ্রিক শিক্ষা করুন, উহার উন্নতি বিধান করুন, দেখিবেন যে তদ্দ্বারা লোকের চরিত্র, ভাগ্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম, পুত্রকলত্র, আয়ুঃ প্রভৃতি সমুদয় বলিতে পারা যায়।" বলা বাহুল্য, এরূপ যুক্তি করগণনা ও জাতকগণনা, উভয়ের পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

*　　*　　*

যাঁহারা এরূপ গণনার বিরোধী, তাঁহারা বলেন যে, "যদি বিধাতা এরূপ লক্ষণ দিয়াই আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের নিজের নিজের কৃতিত্ব থাকে কই? যদি আমাদের ভাগ্য বিধাতা বাঁধিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমরা কলের পুতুল মাত্র। আমার চেষ্টা, অধ্যবসায়, উদ্যম প্রভৃতির কোন ফল নাই কি? বিধাতার এ প্রকার নিয়ম সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।"

*　　*　　*

কিন্তু এ যুক্তি তত বলবতী নহে। আমার আকাঙ্ক্ষার সহিত কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য হইল না বলিয়া নিয়মটা উল্টাইয়া যাইবে কেন? এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না বলা ধৃষ্টতা মাত্র। যে সকল ব্যাপার অবলম্বন করিয়া তুমি তোমার কৃতিত্ব দেখিতেছ, সেগুলি হয়ত ঠিক ধরা হয় নাই। বিধাতার নিকটে সকলের ভাগ্যই বাঁধা আছে। বিধাতা কপালে

যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা উল্টাইয়া দিবার সাধ্য কি? কূপমণ্ডুকের ন্যায় কূপটাকেই বিশ্বচরাচর ভাবা উচিত নহে।

* * *

বাস্তবিক সামুদ্রিক বিশ্বাস করিতে হইলে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করিতে হয়। শিক্ষা ও সংসর্গ গুণে কেহ বা বিশ্বাস করিবেন, কেহ বা তাহা কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ করিবেন। আমার বোধ হয়, সকল বিদ্যারই যেমন একটা সীমা আছে, সেইরূপ অপরাপর চরিত্রানুমান বিদ্যার ও সামুদ্রিকেরও একটা সীমা আছে। অপরাপর বিদ্যার সীমার বাহিরে গেলে যেমন গণনা মিথ্যা হইয়া পড়ে, সামুদ্রিক সম্বন্ধেও তাই। জ্ঞানের বাহিরে গেলেই ঠকিতে হয়। সামুদ্রিক শাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যদি অধিক আস্ফালন না করেন, তাহা হইলে কোন কথাই থাকে না।

শ্রীসত্যকাম।

বারুণী-স্নান।

প্রতি বৎসর বারুণীর দিনে "মাধবে" বহু লোকের সমাগম হয়। আমাদের এখান হইতে মাধব দশ এগার মাইল ব্যবধান।

আমরা কয়েক জন শেষরাত্রে উঠিয়া পদব্রজে মাধব দর্শনে যাত্রা করিলাম। রাত্রি শেষ প্রায়, দুই একটী মাত্র ঝিঁ ঝিঁ র শব্দ শুনা যাইতেছিল। প্রকৃতি প্রশান্ত—নিস্তব্ধ, অতি ধীরে নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; দুই একটি জোনাকী রাস্তার ধারে তৃণ আস্তরণে ঝিকিমিকি করিতেছে; দূরবর্ত্তী গ্রামে কচিৎ কুকুরের দুই একটী ডাক শুনা যাইতেছে।

এই সময়ে মনে প্রায়ই পবিত্র ভাবোদয় হয়, কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র গতিশীল দলের মধ্যে কখন কখন হাসির কল্লোল উঠিতেছিল। বিস্তৃত মাঠের মধ্যে, সেই নিস্তব্ধ সময়ে, এই হাস্য পরিহাস পৈশাচিক কিলিবিলির ন্যায় বোধ হইতেছিল। অদূরে নদী,—পার হইতে হইবে।

তখন উষা প্রভাসিতা, পূর্ব্বদিকে সমুজ্জ্বল শ্বেতাভা প্রকাশিত হইয়াছে। নদীর তীরে বৃক্ষতলে দূরাগত যাত্রিগণ নিশিযাপন করিতেছে। নিদ্রা যায় নাই, আগুন জ্বালিয়া গান গাহিতেছে, আনন্দ করিতেছে। নিরাশাদগ্ধ

ব্যক্তির মুখমণ্ডলের ন্যায় সে অগ্নির আর দীপ্তি ছিল না। উৎসবান্তে পরিশ্রান্ত ভগ্নকণ্ঠ ব্যক্তির বাক্যের ন্যায় সে অসাময়িক গীতও সুখশ্রাব্য ছিল না।

অদূরে ক্ষুদ্র পাহাড়, যোগমগ্ন পুরুষ যেন স্থির হইয়া ধ্যানে বসিয়া রহিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে আমরা জঙ্গলাকীর্ণ পথে আসিয়া পৌছিলাম। রাত্রি তখন প্রভাতপ্রায়। একটী বৃক্ষঝোপ অতিক্রম করিয়া ৩০।৪০টী মণিপুরী স্ত্রীলোক যাত্রীর সঙ্গ পাইলাম। ইহাদের অধিকাংশই অবিবাহিতা কুমারী, মণিপুরীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। ইহাদের সঙ্গে রক্ষক স্বরূপ ৫।৭ জন মাত্র পুরুষ।

প্রকৃতি-সন্তান মণিপুরী বালারা সোৎসাহে সেই পার্ব্বত্য পথে চলিতেছে। ইহাদের সরল স্বভাব ও পরিপাটিবিহীন বেশভূষাদি তাহাদের বাহুল্য-বর্জ্জিত রূপশোভারই ন্যায় নির্ম্মল—পবিত্র। কর্ত্তিতাগ্র কুন্তলগুলি তাহাদের শুভ্র ললাটে নৃত্য করিতেছে; তাহাদের যৌবনসুলভ অনাবৃত হাস্য-লহরী সুললিত সৌকুমার্য্যের লীলাস্থল, ক্ষণে ক্ষণে তাহা পাহাড়তল কম্পিত করিতেছিল। সে হাস্যে কোন কাপট্য নাই—মলিনতা নাই, তাহাদের নগ্নরূপেরই ন্যায় তাহা শুভ্র—পবিত্র।

মণিপুরী রমণীগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ পথে পরমানন্দে যাইতে লাগিল; কখন বা বন্য কুসুম সাগ্রহে সংগ্রহ করিতে লাগিল;—দৃশ্য মন্দ নহে। শীঘ্রই আমরা ইহাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিয়া চলিলাম।

সম্মুখে পাহাড়, নবীন সূর্য্যকিরণের সহিত আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। কখন ৫০।৬০ হাত উপরে উঠিতেছি, কখন বা তত নীচে নামিতেছি। কখন কখন আমাদিগকে পর্ব্বতপ্রবাহিতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত অতিক্রম করিতে হইতেছে। এইরূপে আমরা একটী অত্যুচ্চ টিলার উপর উঠিলাম, তাহার উচ্চতা প্রায় চারিশত হস্ত হইবে। ইহার উপর হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, বড় সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর হয়। টিলার তল হইতেই বংশ কানন প্রসারিত। অতি রমণীয় শোভা। ঈষৎ হরিদ্রাভ নবনধর শ্যামল পত্রাবলী বিশোভিত বংশাবলী সতেজতা ও সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্যের জীবন্ত ছবি। ক্রোশের পর ক্রোশ—দৃষ্টি যতদূর চলে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ, অনন্ত জলধির ন্যায় চলিয়াছে। নিবাত—নিষ্কম্প, একটী পাতাও নড়িতেছে না, একটী শব্দও শুনা যাইতেছে না। দেখিতে দেখিতে দর্শকের মনে অজ্ঞাতে ভাব-তরঙ্গ সমুখিত হয়, দেখিতে দেখিতে তাহাকে

আত্মহারা করিয়া ফেলে। বিস্তৃত মাঠে অবিচ্ছিন্ন ধান্য তরঙ্গের শোভা মোহনীয় বটে, ইহা ততোধিক সুন্দর—ততোধিক মনোরম।

এই স্থানে আমরা কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। সম্ভবতঃ শত হস্ত নীচে নামিয়াই একটী পার্ব্বত্য স্রোত ধরিয়া চলিলাম। জলের গভীরতা অর্দ্ধ হস্তের অধিক হইবে না। বলা বাহুল্য, এই স্রোত পাহাড়ের উপরেই প্রবাহিত, ভূপৃষ্ঠ হইতে তাহা অনেক উচ্চে।

দুই দিকে উচ্চ পাহাড়, বড় বড় নানাজাতি বৃক্ষ; আমরা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। যাইতে যাইতে ঘন বনপ্রদেশে উপস্থিত হইলাম। সূর্য্যের তেজ সেখানকার ঘন পত্রাবলী ভেদ করিতে অল্পই সক্ষম। ক্ষুদ্র স্রোতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ড বুকে করিয়া অশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে। ক্ষুদ্র স্রোতটীর বক্ষে কোথাও বা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড জল আটকাইয়া রাখিতে সমুদ্যত, জল যথাসাধ্য বলে চীৎকার করিয়া সেই প্রেম-বন্ধন হইতে পলাইতেছে—পথ করিয়া লইতেছে। কতকদূর অগ্রসর হইয়া আমরা পর্ব্বতপ্রমাণ বৃহৎ একটী পাষাণ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কেহ কেহ সোৎসাহে উহার উপরে উঠিলেন। আমাদের অনুসঙ্গী ভারবাহী এই কার্য্যে আমাদিগকে নিষেধ করিল, এবং সে স্বয়ং ভক্তিভরে এই পাষাণকে প্রণাম করিল। তাহার এই ভক্তি দেখিয়া, গীতার—

"যদ্‌যদ্বিভূতি মৎসত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ॥"

শ্লোকটী মনে পড়িল।

পাষাণ খণ্ডের সম্মুখে পাষাণের গায়ে লাগিয়া একটী কুণ্ড, পরিসর বৃহৎ নহে কিন্তু গভীর, সুচিক্কণ নীল জল টলমল করিতেছে। এইরূপ আমরা ক্রমশঃ ছয়টী কুণ্ডই প্রাপ্ত হইলাম। তৎপর সপ্তম কুণ্ড, উপর হইতে পাহাড়ের নীচে দেখিতে পাওয়া গেল। পূর্ব্বে যে স্রোতটীর উল্লেখ করা গিয়াছে, পাথরের উপরে বিভাগিত হইয়া, এই স্থান হইতে তাহা হঠাৎ পাহাড়ের নীচে পড়িয়া গিয়াছে। পাহাড় আশ্রয় করিয়া পড়ে নাই, পাহাড় যেন সম্মুখে নত হইয়া রহিয়াছে; তাহার উপর হইতে জলরাশি সলম্ফে শূন্য দিয়া পড়িতেছে। আন্দাজ ৩০০ শত হাত উপর হইতে মহাশব্দে সবেগে নীচে পড়িতেছে।

যে স্থানে জল পড়িতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাহাড়, মধ্য-দেশ একটী

গুহা বিশেষ। দীর্ঘ প্রস্থে অর্দ্ধ মাইলের অধিক হইবে না। ইহার কতকটা স্থান ব্যাপিয়া কুণ্ড। ইহাই "মাধব।"—একটা ক্ষুদ্র জল-প্রপাত মাত্র। বারুণী দিনে সাধারণ লোকে এখানে স্নান তর্পণ করিয়া থাকে। আমরা উপর হইতে দেখিলাম, সে স্থানটি লোকে পূর্ণ—ছিদ্র নাই। স্থান না পাইয়া লোকে পাহাড়ের গায় গায় বসিয়াছে,—দৃশ্য সুন্দর বটে। কিন্তু বারি-পতন শব্দের সহিত লোককোলাহল মিশিয়া যে অদ্ভুত শব্দ উৎপন্ন হইতেছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এবং আপতিত জল হইতে কণারাশি চতুর্দ্দিকে উড়িয়া এবং তাহাতে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যে শোভার ভাণ্ডার সৃষ্ট হইতে-ছিল, তাহার তুলনা নাই।

আমরা বৃক্ষ লতা অবলম্বনে বড় কষ্টে নীচে আসিলাম। লোকের ঠেলা-ঠেলিতে কুণ্ডের কাছে যাওয়া কষ্টকর।

এইবার আমাদের সাধ মিটিল, মাধবকুণ্ডে ঝাঁপ দিলাম। কোন কোন সাহসী ব্যক্তিকে আমরা ধারার তলে যাইতে দেখিয়াছিলাম। আমাদেরও সে সাধ জন্মিল। কিন্তু কুণ্ডটী বৃহৎ, আর জল অতি শীতল, এই যা বাধা। বাধা কোন ক্রমে অতিক্রম করিয়া সেই ক্ষুদ্র ধারাতলে উপস্থিত হইলাম। এখানে পাহাড়ের গায়ে একটী পাথর আছে, আমরা বুকজলে সেই পাথরে দাঁড়াইলাম। ধারা অবিশ্রান্ত শিরে পড়িতেছে। অধিক দাঁড়ান অসম্ভব, এই ক্ষুদ্র ধারাটির পতনবেগেই ঘাড় শুদ্ধ মাথাটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বোধ হইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলাম। তীরে আসিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিলাম, কিন্তু শীত আর যায় না।

অল্পদূরে অগ্নিশিখা দেখিয়া সেদিকে গেলাম। একটা গুহার ভিতরে অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ একত্র বসিয়া অগ্নি সেবন করিতেছে। উপরে প্রস্তর, যেন প্রস্তরের একখানি একচালা ঘর বহুযত্নে মানুষে নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছে। এই গুহায় এককালে শত লোকের বসিবার স্থান স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। ইহাকে "কাপ" বলে।

অতঃপর ইতর লোকেরা স্থানে স্থানে যেসব অদ্ভুত আকৃতির দেবতা স্থাপন করিয়া পয়সা ও তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে আমরা পাহাড় হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। মাধবের বাজারে যাইবার পথ একটী চা-বাগানের ভিতর দিয়া। সুশ্রেণীবদ্ধ সতেজ চা-গাছ, নানা কল কারখানা, কুলিনিবাস দেখিতে দেখিতে ও কুলিদের অভিশপ্ত দীন জীবন

আলোচনা করিতে করিতে মাধব বাজারে উপস্থিত হইলাম। বারুণী উপলক্ষে সকাল হইতেই সুবিস্তৃত শূন্য মাঠে বাজার বসে। বাজারে স্ত্রী-লোকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদের উৎসাহ—ক্রয়-প্রণালী প্রভৃতি—অধিক মূল্য দিয়া আক্ষেপ, কখনবা শস্তা হইয়াছে বলিয়া আনন্দ, এরূপ প্রত্যেক দৃশ্যই বড় তৃপ্তিকর বোধ হইল।

সন্নিকট গ্রামবাসী একটী কুটুম্ব আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। অগত্যা আমরা তখন সেই আড়ম্বরশূন্য দৃশ্যাবলী ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম।

সেই কুটুম্বের আলয়ে আমরা একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইলাম। দেখিলাম; পুথিখানি জীর্ণ, বঙ্গীয় ১১৫০ সনের লিখিত প্রতিলিপি খানি আমরা প্রাপ্ত হইলাম। ইহা একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি। অদ্য ইহাই উপহার দিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম।*

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

আধুনিক সূত্র-কাতন।

[MODERN COTTON SPINNING]

(১)

অতি দুঃখের বিষয় যে বঙ্গ-ভাষায় বৃত্তি-শাস্ত্র (Technology) বিষয়ক গ্রন্থের অত্যন্ত অভাব। ইহা কতকটা লেখকের অভাবে ও কতকটা বঙ্গ-বাসীর বৃত্তি শিক্ষায় অমনোযোগ-হেতু। যাহা হউক, নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি বঙ্গীয় পাঠকগণের জন্য লিখিত হইল; যদি তাঁহাদিগের ইহা ভাল লাগে (আর যদি আমার বিদ্যার কুলাইয়া উঠে), তাহা হইলে সূত্র-কাতন ও বয়ন বিষয়ে ভবিষ্যতে আরও লিখিবার বাসনা রাখি। কিন্তু পাঠকগণকে এই বেলা বলিয়া রাখা ভাল যে, তাঁহারা যেন আমার কাছে অধিক প্রত্যাশা না করেন, কেন না আমি একজন সামান্য Cotton Spinner মাত্র, লেখা পড়ার

* বিশ্বকোষ সম্পাদক বন্ধুবর নগেন্দ্র বাবুকে গ্রন্থখানি দিয়াছি। বিশ্বকোষে "বাঙ্গালা ভাষা" শব্দে ইহার আলোচনা থাকিবে বলিয়া এখানে ঐ গ্রন্থ হইতে নমুনা উদ্ধৃত হইল না।

বেশি ধার ধারি না। তাই অনেক সময়ে ভাব যুটিলেও কথা যোটে না। মেকানিকের সকলেই মূর্খের দলে।

সূত্র-কাতন বিষয়ে কিছু লিখিবার আগে উপকরণ (Raw material) বিষয়ে কিছু লেখা নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব প্রথম পরিচ্ছেদটি কার্পাস বিষয়ে লিখিত হইল। বঙ্গভাষার অসম্পূর্ণতা হেতু মিশ্রিত ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কার্পাস বৃক্ষ—প্রধানতঃ চারি জাতিতে বিভক্ত; যথা—Gossypum Herbecum, Gossypum Arborium, Gossypum Hirsutum এবং Gossypum Barhadense. প্রথম জাতীয় বৃক্ষ ৩।• হাত হইতে ৩৮• হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহা ভারত, চীন, তুর্কিস্থান, আরব্য ও মিশর দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জাতীয় বৃক্ষ গড়ে ১০ হাত উচ্চ হয়। ইহা ভারতের কোন কোন স্থানে, চীন ও মিশর দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় জাতীয় বৃক্ষ উচ্চে চার হাত, ইহা আমেরিকাতেই অধিক জন্মে। চতুর্থ জাতীয় উচ্চে ৭ হাত লম্বা; ইহা কেবল ফ্লরিডা ও জর্জ্জিয়া দেশেই পাওয়া যায়। এই শেষ জাতীয় হইতেই "সমুদ্র দ্বীপ জাত" (Sea Island) তুলা উৎপন্ন হয়। উপরে যে জাতিগত নাম দেওয়া হইল, তাহা উদ্ভিদ শাস্ত্র প্রদত্ত। কিন্তু তদ্ভিন্ন তুলার বাণিজ্যগত (Commercial) নাম আছে, যথা, —সমুদ্র দ্বীপ জাত, মিশর দেশীয় (Egyptain), ব্রেজিলীয় ও পেরুদেশীয়, (Brazilian and Peruvian), মার্কিন (American), সুরাট * অর্থাৎ ভারতীয় তুলা। কাতকগণ (spinners) তুলার বাণিজ্যগত নামই ব্যবহার করিয়া থাকেন; সেজন্য আমরাও সেই নাম ব্যবহার করিব। এই সকল নাম তুলার জন্মস্থানের বা তদ্দেশীয় কোন প্রধান বন্দরের নামানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে।

কার্পাস বৃক্ষ অনেক গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বিনা চাষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সকল বৃক্ষের ফসল হইতে সুন্দররূপে সূতা কাতা যাইতে পারে না। অতি যত্নের সহিত আবাদ করিলেও কাতকের মনোমত অর্থাৎ কাতন-প্রক্রিয়া সহন-শীল ভাল তুলা পাওয়া কঠিন।

অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তুলার আঁশ বা তারকে (fibre, technically

* মুসলমান রাজত্ব কালে সুরাট ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। এদেশীয় তুলা সেই বন্দর হইতে দেশদেশান্তরে রপ্তানি হইত। সেজন্য আজিও ভারতীয় তুলা বণিকদিগের মধ্যে "সুরাট" নামে বিখ্যাত।

called staple) * ফাঁপা বাঁশের মতন দেখায়; তাহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। ইহার পরিধি একেবারে গোল নহে, ঈষৎ বাদামি ভাবে চেপ্টা; উত্তমরূপে বর্দ্ধিত ও সুপক্ক তার পেঁচের ন্যায় মোড়া (Convoluted or spirally twisted); তুলার পক্ষে ইহা একটি মহাগুণ, কারণ ইহাতে এই উপকার হয়, যে সূতা কাটিলে একটি আঁশ তৎপার্শ্বস্থিতটিকে উত্তমরূপে জড়াইয়া ধরে, ইহাতে সূতা অধিক শক্ত হয়। তুলার তারের ব্যাস আগার ভাগ অপেক্ষা গোড়ার ভাগে (অর্থাৎ যে ভাগ বীজে লাগিয়া থাকে) অধিক দীর্ঘ। এই আধিক্য সমুদ্রদ্বীপজাত তুলায় $\frac{১}{১৬৮৯}$ ইঞ্চ ও ভারতীয় তুলায় $\frac{১}{১১৮৪}$ ইঞ্চ। তুলার আঁশের দীর্ঘতা ও সবলতা তাহাদের জাতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সবলতা সম্বন্ধে ভারতীয় তুলাই প্রথম, সমুদ্র-দ্বীপ-জাত তুলা অধম ও মিশর দেশীয় তুলা মধ্যম। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে তুলার গুণাগুণ তাহার বলের উপরই নির্ভর করে না, কারণ যে তুলার মোড়নে সমতা নাই, সেই তুলাই মোটা ও শক্ত হয়। মোড়নে সমতাই তুলার প্রধান গুণ; যে তুলার তার দীর্ঘ, সমভাবে মোড়া ও শক্ত সেই তুলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু কোনও তুলাতেই ঐ সকল গুণ একত্রে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত গুণ কতক পরিমাণে মিশর দেশীয় তুলায় দেখিতে পাওয়া যায়, সেজন্য ইহার আদরও অধিক। তুলার তারের উপর মোমের আবরণের ন্যায় একটি আবরণ আছে। সেজন্য নূতন সূতা কিম্বা কাপড় শীঘ্র জলে ভিজে না। সাদা কাপড় কিম্বা সূতায় ইহা থাকিলে হানি নাই, কিন্তু কাপড় কিম্বা সূতা রং করিবার সময় ইহাকে আগে ধুইয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ রং প্রবেশ করে না।

তুলার এই সাধারণ বিবরণের পর বোধ হয় জাতিগত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে।

১ম—সমুদ্রদ্বীপ-জাত তুলা—(sea Island)। এই জাতীয় তুলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার তার দীর্ঘ, মিহি, নমনশীল (flexible), এবং ইহার মোড়ন সমভাবাপন্ন। যদি ইহা খুব সাবধানে জিন (Gin)† করা হয়,

---

* বঙ্গের কাটকগণ staple কে "তার" বলিয়া থাকে।

† কার্পাস হইতে বীজ আলাহিদা করিবার প্রক্রিয়াকে জিন্ করা বলে। পাঠকগণকে এই খানে বলিয়া রাখা ভাল যে বোম্বে অঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে বীজ শুদ্ধ তুলাকে কাপ্‌সা অর্থাৎ কার্পাস বলে এবং বীজ বিহীন তুলাকে তুলা বা রুই বলে; আমরাও সেই অর্থে উক্ত শব্দদ্বয় ব্যবহার করিব।

তাহা হইলে ইহা হইতে অতি উত্তম ও মিহি নম্বরের * সূতা কাতা যাইতে পারে। এই জাতীয় তুলার তার ২·২০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার দৈর্ঘ্য গড় পড়তা ১·৮ ইঞ্চ। কেবল ফ্লরিডায় যাহা জন্মায় তাহাই ২·২০ ইঞ্চ লম্বা, নচেৎ অন্যত্র কম। যথা—পেরু ১·৫৬ ইঞ্চ, ফিজি ১·৮৭ ইঞ্চ এবং অষ্ট্রেলিয়া ১·৬৫ ইঞ্চ। এই জাতীয় তুলা রেশমের ন্যায় ঈষৎ মলিনাভ; এই গুণ আর কোন তুলায় নাই।

২য়—মিশর দেশীয় তুলা (Egyptian cotton) দৈর্ঘ্যে, বর্ণে ও অন্যান্য গুণে পরস্পর বিভিন্ন। গ্যালিনি জাতি বর্ণে সোনার মত, তার কড়া, শক্ত এবং মোড়ন অসম; ইহা দীর্ঘে গড়ে ১॥ ইঞ্চ। মিশর দেশে আর এক প্রকার তুলা পাওয়া যায় তাহার বর্ণ পিঙ্গল (brown), দীর্ঘ গালিনির মত, কিন্তু তার গালিনির মত কড়া ও শক্ত হইলেও তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, ও মোড়নে সমতা আরও কম, গড়ে ১·৪ ইঞ্চ লম্বা হইয়া থাকে; ইহার ব্যাস ১১২৫ ইঞ্চ, ইহা বর্ণের নামেই বিখ্যাত। মিশর দেশে আরও এক প্রকার তুলা জন্মায়, তাহা তদ্দেশীয় তুলার মধ্যে বর্ণে ও অন্যান্য গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহা বর্ণে ঈষৎ স্বর্ণাভ, ইহার তার শক্ত এবং নমনশীল কিন্তু ইহার মোড়ন অতি অল্প, সে জন্য ইহা হইতে যে সূতা হয় তাহা ওজনে সমান হইলেও, অন্য তুলা-জাত সূতা অপেক্ষা ব্যাসে মোটা হয়। ইহা শ্বেত তুলা বলিয়া বিখ্যাত ও ইউরোপে অত্যন্ত আদৃত। কেন না ইহা অন্য জাতীয় তুলার সহিত মিশাইলে তাহার গুণ বর্দ্ধন করে ও অন্য তুলায় সে গুণ বেশী নাই (অর্থাৎ কাতন প্রক্রিয়া সহনশীলতা) ইহা তাহা দান করে, কারণ ইহা অত্যন্ত নমনশীল।

৩য়—ব্রেজিল ও পেরু দেশীয় তুলা—পর্ণাম্বুকো প্রদেশ-জাত তুলা ঈষৎ স্বর্ণাভ এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন; তন্নিমিত্ত ইহা কাপড়ের টানার উপযুক্ত; ইহা ১·০ ইঞ্চ দীর্ঘ। মারানহাম প্রদেশজাত তুলার বর্ণ সোনার মত; ইহা মার্কিন তুলার সহিত সুন্দররূপে মিশ্রিত হয়। পেরু দেশজাত তুলা কর্কশ, আবর্জ্জনা শূন্য ও শক্ত; বর্ণ ঈষৎ মলিন, মোড়নে সমতা নাই, দীর্ঘ গড়ে ১·৩ ইঞ্চ।

৪র্থ মার্কিন তুলা—অনেক জাতিতে বিভক্ত ও প্রদেশগত নামে প্রসিদ্ধ।

---

* Different sorts of yarn are known by their counts or number fixed according to their weight.

যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশে এই তুলা জন্মায়। দীর্ঘে অর্লিন্স তুলাই প্রথম, এই জাতীয় তুলা সমভাবে দীর্ঘ, সাফ ও বেশির ভাগ নির্ম্মল শ্বেত বর্ণের। অর্লিন্স তুলা কাতকের (spinners) বড় আদরের ধন, কেন না ইহা অত্যন্ত নমনশীল ও প্রক্রিয়া সহিষ্ণু ; ইহা অত্যন্ত সমভাবে মোড়া ও দীর্ঘে ১ ইঞ্চ। টেকসস্ প্রদেশীয় তুলা বর্ণে আর্লিন্স অপেক্ষা ময়লা ও সেরূপ নমনশীল নহে এবং প্রায়ই অবর্দ্ধিত তার বিশিষ্ট ; দীর্ঘ প্রায় আর্লিন্সের ন্যায়। অন্তর্গত (up-land) প্রদেশ সকলের তুলা অতি পরিষ্কার ও আবর্জ্জনা রহিত। ইহা হইতে সুন্দর পড়েনের সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে, কারণ ইহা কোমল ও নমনশীল। অবিমিশ্র ভাবে ব্যবহার করিলে ইহা হইতে ৪২ নম্বরের সূতা প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু মিশর দেশীয়ের সহিত মিশাইলে আরো মিহি সূতা হইতে পারে। মোবাইল তুলা বর্ণে আর্লিন্সের মত ও বলে অন্তর্গত প্রদেশীয়ের মত, কিন্তু ইহাদিগের ন্যায় মিহি কাযের উপযোগী নহে, কারণ ইহাতে অনেক আবর্জ্জনা আছে ও তার অপেক্ষাকৃত ছোটা।

৫ম সুরাট বা ভারতীয় তুলা—পৃথিবীতে যত প্রকার তুলা জন্মায় ভারতীয় তুলা তন্মধ্যে সকলের অধম।* ভারতীয় তুলায় আদপে মোড়নে সমতা নাই, দৈর্ঘ্যেও সেইরূপ। ভারতীয় তুলার এই অসমতা এত অধিক যে একই বৃক্ষের একই কোয়ার তুলায় তারের সমতা অতি কষ্টে পাওয়া যায়। ভারতীয় তুলার মধ্যে হিঙ্গনঘাটের তুলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু ইহারই মোড়নে সমতা আছে ; কিন্তু ইহাতে তারের ব্যাস ও দীর্ঘতার সামঞ্জস্য আদপে নাই, হিঙ্গনঘাট গড়ে ১·০৩ ইঞ্চ লম্বা। হিঙ্গনঘাটের নীচেই ভড়োচ প্রদেশীয় তুলা। ইহার বর্ণ হিঙ্গনঘাটের ন্যায় সাদা নহে, ঈষৎ স্বর্ণাভ ; বৃক্ষের পত্র ও অকাল মৃত তার ইহাতে অনেক পাওয়া যায়, তবে ইহা মন্দের ভাল এই মাত্র ; দীর্ঘ ·৯ ইঞ্চ ; ইহাতে হিঙ্গনঘাট অপেক্ষা দৈর্ঘ্যের কিছু সমতা আছে কিন্তু মোড়ন নিতান্তই খারাপ। ঢলেরা প্রদেশের তুলা বর্ণে শ্বেত ও পড়েনের সূতা হইবার উপযোগী। অমরাবতী প্রদেশের তুলা ঈষৎ মলিনাভ, তার ছোট কিন্তু শক্ত ; ইহাতে আবর্জ্জনা অনেক কিন্তু মোড়ন অপেক্ষাকৃত ভাল। মান্দ্রাজ টিনিভলি তুলার জন্ম স্থান, ইহার বর্ণ অমরাবতীর ন্যায়, তার শক্ত কিন্তু নমনশীল। বঙ্গীয় তুলা জগতে সর্ব্ব নিকৃষ্ট। সাধারণতঃ ভারতীয় তুলা মাত্রেই খারাপ, তাহা অগ্রে

* ইহা ভারতবর্ষীয় কৃষকগণের পক্ষে একান্তই লজ্জার বিষয় বটে।

বলা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গীয় তুলা সকলের সেরা খারাপ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে বঙ্গদেশ মস্‌লিনের জন্ম চিরপ্রসিদ্ধ, যে বঙ্গদেশ হইতে অতি পুরা কালেও পারস্য তুরস্ক রুম প্রভৃতি দেশের সুলতানগণের সুন্দরীবর্গের মনোরঞ্জনার্থ হাওয়ার ন্যায় মিহি মস্‌লিন যাইত, সেই বঙ্গদেশের তুলা সর্ব্ব নিকৃষ্ট। ইহা যে মাটির গুণে তাহা নয়, ইহা বাঙ্গালী জাতির অলসতার ফল, আর ইহা বাঙ্গালী জাতির পরমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করিতেছে। কারণ বিদেশীয় তুলা ভিন্ন, বঙ্গদেশীয় তুলার সূতায় কখনও ঢাকাই, শান্তিপুরি, ফরেশডাঙ্গার ন্যায় কাপড় হইতে পারে না। আজও মেঞ্চেষ্টারে এ সকলের ন্যায় কাপড় কদিচ হইতেছে; কিন্তু আর বেশী দেরী নাই। আমরা মূর্খের ন্যায় "স্বায়ত্ব শাসন" * "স্বায়ত্ব শাসন" করিয়া চেঁচাইতে থাকি আর বিদেশীয়েরা গালে চড় মারিয়া মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া যাউক। পুরাকালে ভারতের মাঠে মাঠে তুলার চাষ হইত ও ঘরে ঘরে সূতা কাতা হইত। ভারতের সুখের দিনে অর্দ্ধেকেরও অধিক লোক সূতা কাতিয়া কাপড় বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অন্য দেশ হইতে, এমন কি অন্য গ্রাম হইতে কাপড় ক্রয় করা কি তাহারা তাহা জানিত না। মধ্য প্রদেশ, বেরার, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি প্রদেশ নিচয়ে অতি সহজেই কার্পাস জন্মিয়া থাকে। সাধারণ কৃষকেরাই এই ব্যবসায় করিয়া থাকে, সে জন্য ফসলও ভাল হয় না; যদি কোন উদ্যমশীল ধনবান আধুনিক প্রথানুসারে ইহার চাষ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতীয় তুলার অনেক উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

আমাদের উন্নতি।

দেশে কতকগুলি লোক জন্মিয়াছেন, যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কিছুই ভাল দেখিতে পান না, কোন উন্নতির লক্ষণই তাঁহাদের নয়নগোচর হয় না। ইহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল প্রাচীনত্বের গোঁড়া, ইহাদের ধুয়া, দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, সনাতন আর্য্য রীতি নীতি

* যাহা আমরা কোন পুরুষে জানি না, আর জানিব কি না সন্দেহ।

গোপ পাইতে বসিল, লোকের এখন আর দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি উঠিয়া গেল, সাহেবদের চর্ব্বিত চর্ব্বণে সকলেই ব্যস্ত। অপর দল "সাহেবী"—আনার গোঁড়া। ইহাঁরা বলেন দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, ইংরাজী শিক্ষাভিমানীরা পর্য্যন্ত আজও মাদুরে বসেন, ধুতি পরেন, সম্পূর্ণ ইংরাজীতে কথা কন না, স্ত্রী স্বাধীনতা দেন নাই, এবং মেয়েদের সাড়ী পরিতে দেন। আমরা অদ্য দেখাইতে চেষ্টা করিব যে অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কোন দলেরই হতাশ হওয়ার কারণ দৃষ্ট হয় না।

আর্য্যকুলধুরন্ধর প্রাচীন ঋষিরা সকল বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতার কথা আর কি বলিব! পুরা কালের কথা না তুলিয়া, বর্ত্তমান পতিত হিন্দুরাও পূর্ব্বপুরুষ-প্রসাদাৎ আধ্যাত্মিকতায় আজও জগতে অদ্বিতীয়। এখনও ঐ সম্বন্ধে—

"কোন জাতি মোদের সমান ?"

এখনও ঐ সম্বন্ধে আমাদের

"পদ চিহ্ন ধরে অন্য জাতি দম্ভ করে।"

পার্থিব বিষয়েও আর্য্য ঋষিরা জগতের অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহাদের দর্শন, তাঁহাদের বেদ ইত্যাদি তাহার সাক্ষ্য। বৈদ্যশাস্ত্র, জ্যোতিষ, পাটীগণিত, বীজগণিতাদি সমস্ত শাস্ত্র অন্য জাতিরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে চুরি করিয়াছে। ঋষিরা অস্থিও পাটীগণিত জানিতেন, মাধ্যাকর্ষণ জানিতেন, এবং বিজ্ঞানের এখন বিলুপ্ত অন্য অন্য কূটতত্ত্ব সকল জানিতেন। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যসন্তানগণ তাড়িত বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহাদেরই ব্রহ্মাস্ত্র, তাঁহাদেরই আগ্নেয়াস্ত্র, তাঁহাদেরই বরুণাস্ত্র, তাঁহাদেরই পুষ্পক রথ। উহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া আজ কালকার ভ্রান্ত নর উহাদিগকে কাল্পনিক মনে করে। বাহুল্য ভয়ে অনেক কথার উল্লেখ করা গেল না। কালের করাল স্রোতে আজ সেই আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত, এবং সেই সঙ্গে সেই বৈজ্ঞানিক উন্নতিও অস্তমিত। আজ কিনা সাহেবরা আমাদিগকে ধর্ম্ম শিখাইতে আসেন, এবং তাঁহাদের সামান্য কলের গাড়ীর ও ম্যাক্‌শিম কামানের ও টেলিগ্রাফের বড়াই করেন; এবং আমরা পূর্ব্ব গৌরব ভুলিয়া তাঁহাদিগকে বাহবা দিই! কিন্তু আজ কাল একটু সুর ফিরিয়াছে। পূর্ব্বাবস্থা আর হইবে না, কলিতে তাহা অসম্ভব। ঊর্দ্ধবাহু

হইলেও আমরা বামন। কিন্তু জনকত মনিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু আচার ব্যবহারের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, ব্যখ্যা শুনিয়া আজ ইংরাজীশিক্ষাহেতু বিকৃতমস্তিষ্ক বাঙ্গালীও চকিত, স্তম্ভিত ও ভক্ত্যাপ্লুত। আমরা আমাদের পূর্ব্বগৌরব বুঝিতেছি ও পুরাকালের আধ্যাত্মিকতা নিদান কিয়দংশ পাইবার চেষ্টা করিতেছি। ক্রমে আরও উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অন্যান্ত উন্নতি আপনি আসিয়া পড়িবে। দেবদ্বিজে ভক্তি বাড়িলে কমলা ও বাগ্দেবী সদয়া হইবেন।· তাই বলি বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে রক্ষণশীল দলের নিরুৎসাহ হইবার কারণ দেখা যায় না। যেরূপ চেষ্টা করিতে তাঁহারা আরম্ভ করিয়াছেন, একাগ্রতার সহিত তাহা করিতে রহুন, সফল মনোরথ হইবেনই হইবেন। তাঁহাদের ভরসার আর একটী বিশেষ কারণও আছে। সংস্কৃতের আলোচনা বাড়িতেছে, গীতাদি গ্রন্থ অনেকেই পাঠ করিতেছেন, শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইতেছেন, এবং যাঁহারা সংস্কৃত রসে বঞ্চিত, তাঁহাদের জন্য ধর্ম্মগ্রন্থ নিচয়ের সুন্দর ও সুলভ বঙ্গানুবাদ বাহির হইতেছে। কিছু দিনের মধ্যে ধর্ম্মালোক যে দেশময় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে আমাদের ত তাহাতে অণুমাত্র সংশয় হয় না।

এখন অপর দলকে দুই একটা কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। আমাদের স্থানাভাব, বেশী কথা অবশ্য বলিতে পারিব না। প্রথমতঃ ধরুন শিক্ষা; উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হু হু করিয়া হইতেছে। ১৮৫৭সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হয়। তাহাতে কেবলমাত্র ২৪৪ জন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়। ১৮৫৮ সালে ৪৬৪ জন প্রবেশিকা ও ১৩ জন বি,এ, পরীক্ষা দেয়, এবং একজন ও এম, এ, পরীক্ষা দেয় না। ১৮৯৪ অব্দে প্রবেশিকায় ৫৩৯২ জন, বি,এ, ১৪৩০ জন, এবং এম,এ, পরীক্ষায় ১৪৮ জন উপস্থিত হয়। অপরে যাহাই বলুন আমরা ইহাকে সামান্ত উন্নতি বলিতে প্রস্তুত নই। এই হারে বৃদ্ধি পাইলে বৎসর-কয়েক পরে উচ্চ শিক্ষার ঢেউ কিরূপ প্রবল হইবে, একথা ভাবিয়া দেখুন দেখি। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে যে সব লোক উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে তাহাদের সব বাঙ্গালী নয়। স্বীকার করিলাম। অধিকাংশ যে বাঙ্গালী তাহাতে কি কিছু সন্দেহ আছে? ১৮৯৪-৯৫ সালে মধ্যম শিক্ষা পাইয়াছে ২০৬৯৮৯ জন, তার পূর্ব্ব বৎসর ঐ শিক্ষা ১৯৮৭৩৬ জন বই পায় নাই। এই দুই ও পরবর্ত্তী দুই সংখ্যা অবশ্য

বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যার জড়াইয়া, কিন্তু ইহা হইতে বাঙ্গালায় মধ্যম ও নিম্ন শিক্ষার একটা আভাস পাওয়া যায়। প্রায় বার আনা ছাত্র বাঙ্গালী। তারপর নিম্ন শিক্ষা। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের রিপোর্টে জানা যায়— ১৮৯৪-৯৫ সালে ১২০৬১৩১ জন নিম্ন শিক্ষা পাইয়াছে। তার পূর্ব্ব বৎসর উহাদের সংখ্যা ছিল ১১৩০২২৮। নিম্ন শিক্ষার বিস্তারের দিকে গতি খুব প্রবল না হইলেও অপ্রতিহত। এই হারে বৃদ্ধি পাইলে ৪।৫ শত বৎসরের মধ্যে দেশে আর অশিক্ষিত পুরুষ থাকিবে না। বৎসরের সংখ্যা দেখিয়া কেহ কেহ হতাশ হইতে পারেন। তাঁহাদের বুঝা উচিত জাতীয় জীবনে ৪।৫ শত বৎসর অতি সামান্য সময়। শেষ স্ত্রী শিক্ষা। ইহারও বিস্তার হইতেছে মন্দ নয়। বিথুন কলেজে মহিলারা উচ্চ শিক্ষা পাইতেছেন। দেশের মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ও কম নয়। ১৮৯৪-৯৫ সালে শত করা ২ জন বালিকা শিক্ষা লাভ করিয়াছে। তার পূর্ব্ব বৎসর শত করা ১·৯ জন শিক্ষা পাইয়াছিল। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার আশানুরূপ হইতেছে না বলিয়া যাঁহারা দুঃখ করেন, তাঁহাদিগকে বলি এত উতলা হইলে চলিবে কেন? ২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রী শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল একবার ভাবুন। এখানে একটী মাত্র ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিতে চাই। তাহা আইন। দেশ আজ কাল সুবিদ্বান দক্ষ ব্যবহারাজীবে পরিপূর্ণ। সমাজের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে ইহাঁরাই আমাদের সমাজের নেতা। কি চরিত্র-বলই বলুন, কি ন্যায়পরতাই বলুন, ইহাঁরা দুইয়েতেই সর্ব্ব প্রধান। পরোপকারই ইহাঁদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে ইহাঁরাই প্রধান সহায়। মিথ্যা হইতে সত্য বাছিয়া বাহির করাই ইহাঁদের প্রধান কাজ। কি নৈতিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, যে কোন উন্নতিই বলুন না কেন ইহাঁরা সবই সাধন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। যে দেশে এমন চরিত্রবান, হৃদয়বান, ধর্ম্মপ্রাণ কার্য্যতৎপর, দেশ হিতকর ব্রতে রত, উৎসাহী ও দক্ষ উকীলদল সৃষ্ট হইয়াছেন ও হইতেছেন, সে দেশের যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অবশ্যম্ভাবী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাঁরা সকলেই বৃষস্কন্ধ, দেশের ভার ইহাঁদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়।

শিক্ষা বিস্তার কিরূপ হইতেছে তাহা উপরে দেখান গেল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক উন্নতিরও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গিয়াছে। নৈতিক

ফলই প্রধান ফল, এবং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবেক যে আজ কাল কার শিক্ষিত বাঙ্গালী নেশা ভাঙ, ব্যভিচারাদি হইতে এক প্রকার বিরত, সত্যব্রত ও কর্ম্মনিষ্ঠ; সামাজিক কোন দোষ দৃষ্ট হইলেই তাঁহারা সভা করিয়া তার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন। "সমাজ-শৃঙ্খল মালা নবসূত্রে" গাঁথিতে তাঁহারা কত উৎসুক। তাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী, বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী। অধিক আর কি বলিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বতঃ পরতঃ আজ দেশহিতে রত, এবং নৈতিক উন্নতি না হইলে প্রকৃত দেশোন্নতি হয় না বলিয়া যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় সেই চেষ্টাই একরূপ তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুই দশজন শিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যাইতে পারে যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী ও বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী নন। ইহাতে কিন্তু দুঃখিত হইবার কারণ নাই। উন্নতিশীল সমাজে মতভেদ থাকিবেই। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থার ও এক্ষণকার মতভেদে একটু সামান্য প্রভেদ আছে। এখনকার মতভেদে উচ্ছৃঙ্খলতার আমেজ মোটে নাই। যিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী ও বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী তিনিও যেমন শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরাও সেইরূপ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছেন। এ দৃশ্য যে কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতিপ্রদ তাহা ক্ষুদ্র লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এইরূপ উন্নতি ত হইবারই কথা! হিন্দু নীতির চেয়ে আর নীতি নাই, এবং এত দিনের পর শিক্ষিত হিন্দু সন্তানের সনাতন নীতির প্রতি যখন মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? আবার দেখুন দৈহিক বলের অনাবশ্যকতা আজও মনুষ্যসমাজে হয় নাই। আমরা তাহাও বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। হিন্দু আচার ব্যবহার অবশ্য সম্পূর্ণরূপে দৈহিক বল বৃদ্ধির সহকারী। দিন কতক ধাঁধায় পড়িয়া আমরা ও সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন চারিদিকে ব্যায়াম চর্চ্চার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এমন কি যে সব বড় লোক কস্মিনকালে এক পা হাঁটেন নাই তাঁহারাও ব্যায়ামের উপকারিতা এতদূর বুঝিয়াছেন যে যখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলায় ব্যায়ামের উৎসাহ দিবার অর্থে চাঁদা তুলেন, তাঁহারা অকাতরে মোটা মোটা চাঁদা দিয়া থাকেন। অনেক পিতামাতা আজ কাল যে স্কুলে ব্যায়মের চর্চ্চা নাই সে স্কুলে ছেলে পাঠাইতে বিরত হইতেছেন।

আমাদের কার্য্য-কুশলতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু না

বলিয়া থাকা গেল না। রেলওয়ে নির্ম্মাণ ও পরিচালনা এক দুরূহ ব্যাপার। এ হেন দুরূহ ব্যাপারেও বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ নন। বাঙ্গালী জগতকে দেখাইয়াছেন যে রেলওয়ে নির্ম্মাণ ও পরিচালনায় তাঁহারা কোন জাতি অপেক্ষা হীন নন। তাঁহাদের পথে যে কত বিঘ্ন ইহা যিনি ভাবিয়া না দেখিয়াছেন তিনিই কেবল বলিবেন যে বাঙ্গালী যাহা দেখাইয়াছেন তাহা কিছুই নয়। বাঙ্গালীরা দেশলাইএর কল করিয়াছেন, তেলের কল ও ময়দার কল চালাইতেছেন, শীঘ্র বোধ হয় কাপড়ের কলও করিবেন, এবং ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত স্থাপিত করিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন যে কাজ যতই কঠিন হউক না কেন বাঙ্গালীরা চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের কাছে তাহাকে অবনতমস্তক হইতে হইবে। চা, রেশম ও নীলের কাজে বাঙ্গালী আছেন এবং ইহাঁরা খনি হইতে পাথুরিয়া কয়লা পর্য্যন্ত তুলিতেছেন। ভরসা আছে ক্রমে বিদেশীয়গণ এই সব এবং এখানে স্থানাভাবে উল্লেখ করা গেল না এমন আরও সব কঠিন ব্যবসা হইতে বিদূরিত হইবেন। যে দিন লর্ড রিপন আত্মশাসন আইন জারি করেন সে দিন কত লোকে কত কথা বলিয়াছিল! বাঙ্গালীর শত্রুরা কতই না হাসিয়াছিল! অনেকে বলিয়াছিল, 'অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী যাঁহারা ভাজা মাছখানাও উল্টাইয়া খাইতে জানেনা, তাহাদের হাতে আত্মশাসন! আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সেই ঘৃণিত বাঙ্গালী মিউনিসিপাল সভায় ও জেলা বোর্ডের অধিনেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। জেলায় শিক্ষা, রাস্তা ঘাট, স্বাস্থ্য প্রভৃতি এখন তাঁহাদের হাতে। দেশের ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল নগরগুলিরই তাঁহারা হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এই সব গুরুতর কার্য্য তাঁহারা যে কিরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, এক কথায় তাহা বুঝাইয়া দিব। সকলেই জানেন প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনর ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের মত বাঙ্গালী বিদ্বেষী আর জগতে আছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালী বাবুকে গালি দেওয়াই তাঁর প্রধান কাজ। মিউনিসিপালিটি ও বোর্ডগুলির কার্য্য এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে যে কখন কখন ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেবের কলমকেও গালাগালির বেগ সংহার করিতে হয়। বাঙ্গালীর ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালীরা যদি এইরূপ শীঘ্র পদে উন্নতির দিকে ধাবমান হন, তাহা হইলে ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও জন কয়েক সাহেব শীঘ্র ঈর্ষায় ফাটিয়া মরিয়া যাইবেন।

একবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্। বাঙ্গালীরা বেশ বুঝিয়াছেন যে, পরের উপর দেশ রক্ষার ভার দেওয়া ভালনয়। সেই জন্য তাঁহারা ভলণ্টিয়র হইবার আশায় গভর্ণমেণ্টের দ্বারে নিয়ত আঘাত করিতেছেন। অপর আর যাহা দোষ থাকুক না কেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু বোকা নন। মুখে যাহাই বলুন না কেন, ইংরাজ রাজপুরুষগণ বাঙ্গালী-দিগকে চিনেন, এবং একটু ভয়ও করেন। তাঁহারা মনে করেন বাঙ্গালীকে ভলণ্টিয়র হইতে দেওয়া ভারত হারাইবার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় হইবে। সেই জন্য বোধ হয় বাঙ্গালী শীঘ্র ভলণ্টিয়র দলে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহাতে বর্ত্তমানে বাঙ্গালীদের স্বদেশ হিতৈ-ষিতা বা শৌর্য্য বীর্য্যের কোন লাঘব হইতেছে না। অপর দিকে দেখুন, বৃটিশ ভারত ও ভারতসভাপ্রমুখ রাজনৈতিক সভা বাঙ্গলায় যত হিন্দুস্থানের আর কোন প্রদেশে তত দৃষ্ট হইবেক না। জাতীয় জীবন যে কত তেজোপূর্ণ তাহার ইহা অপেক্ষা উত্তমতর প্রমাণ আর দেওয়া যাইতে পারে না। যেখানে এক আধটী রাজনৈতিক সভা নাই, এমন সহর দেশে খুব বিরল, এবং প্রত্যেক সভাই সজীব। প্রত্যেক রাজনৈতিক প্রশ্ন এই সভাগুলি কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়, এবং ইহারা দেশের জ্ঞান বৃদ্ধির এক প্রধান সহায়। তারপর দেখুন বাঙ্গালী পরিচালিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদ পত্র। সভ্য দেশে সংবাদ পত্র এক প্রধান ক্ষমতা, এবং লোক-শিক্ষার এক বিশেষ উপায়। আমাদের সংবাদ পত্র সমূহ যে খুব দক্ষতার সহিত চালিত, তাহা কি শত্রু কি মিত্র সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ইহাদের দলাদলি আছে, কিন্তু ইতরতা নাই, তীব্র সমালোচনা আছে, কিন্তু গালাগালি নাই, ওজস্বিতা আছে, কিন্তু রূঢ়তা নাই, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আছে, কিন্তু অন্ধতা নাই, ক্ষমতা আছে কিন্তু অপব্যবহার নাই। সংবাদপত্র দেশে নূতন, কিন্তু উন্নতি দেখিয়া বোধ হয় যে অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের সমকক্ষ পাওয়া যাইবেক না। এ প্রসঙ্গে আর একটী কথা মাত্র বলিতে চাই। ভারতের রাজনৈতিক গগনে আজ কংগ্রেস উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এ হেন. কংগ্রেস বাঙ্গালীর সৃষ্ট। শুনিতে পাই না কি একজন স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী উকীল ইহার জন্মদাতা। যে কংগ্রেসের নামে আজ ইংরাজ চকিত, যার খ্যাতি আজ ইউরোপ মহাখণ্ডে প্রতিধ্বনিত, বাঙ্গালীই সেই কংগ্রেসের প্রাণ, একজন বাঙ্গালী উকীল সেই কংগ্রেসের জন্মদাতা, একথা

ভাবিতে গেলে যুগপৎ আনন্দিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার পর যে বলিবে—

"ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি,"

সে হয় ভয়ানক হিংসুক, নয় নিরেট বোকা। কেহ কেহ মনে করেন কংগ্রেস হইতে কোন উপকার হইতেছে না। আমরা বলি যখন কংগ্রেসে শিক্ষিত লোক আছেন তখন ইহা দ্বারা প্রভূত উপকার সাধিত হইবেই। তাহার সম্ভাবনা না থাকিলে আমাদের দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় কাজ-পাগল ও কার্য্যদক্ষ সম্প্রদায় কখনই ইহাতে যোগ দান করিতেন না। ইহাঁরা যোগ দেওয়াতে পরিণামে কংগ্রেসের সফলতা আমাদের কাছে জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় জ্ঞান হয়। জাতীয় উন্নতির আর দুইটি চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

(১১) শিক্ষিত বাঙ্গালীর পোষাক। সভ্য জগতে পোষাকই সব। ইহাই সভ্যতাব্যঞ্জক, ও তাহার মাত্রার পরিচায়ক। একজন ইংরাজীতে প্রগাঢ় পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি কার্লাইল নামে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থকার পোষাক সম্বন্ধে এক বই লিখিয়াছেন, এবং তাহাতে বলিয়াছেন পোষাকই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। পোষাক খুলিয়া লও, রাজা প্রজার কোন প্রভেদ থাকিবেক না। একবার এক সভাস্থলে আমাদের দেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মহোদয় বলিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারেন না শিক্ষিত বাঙ্গালী কি করিয়া ধুতি চাদর পরিয়া বেড়ান। শিক্ষিত বাঙ্গালী এত দিনের পর তাঁর ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন, পোষাকের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন। যাঁহারা বিলাত পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, তাঁরা ত সভ্য জগতের পোষাকই অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা বোম্বাইয়ের অধিক যান নাই তাঁহারাও ধুতি দেখিলে শিহরিয়া উঠেন। সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর পোষাক যে ক্রমে সভ্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহা, যাঁহারা পোষাকতত্ত্ব আলোচন তৎপর, তাঁহারা বেশ বুঝিতেছেন। মহিলারাও মাথায় বনেট দিতেছেন। এখন পরিবর্ত্তনের সময় নানা মুনির নানা মত। প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষ বা স্ত্রীলোকের পোষাকে একটু না একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়, পোষাক দেখিলেই হঠাৎ বাঙ্গালী বুঝা যায় না, কিন্তু এমন সময় শীঘ্র আসিবে যখন পুরোহিত ঠাকুর হইতে মেথর পর্য্যন্ত সকলকেই একই বিলাতী ছাঁচে ঢালা পোষাকে আবৃত দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং কাজে কাজেই জাতীয়

উন্নতি চরম সীমায় উঠিবে। পরিবর্ত্তনের দিক ও গতি দেখিয়া সকল দেশ-হিতৈষীই এরূপ আশা করিতে পারেন। (২) শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাষা। একজন অল্পদৃষ্টি লোক একবার বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ইংরাজী না জানিলে বুঝা যায় না। শাদা বাঙ্গালারই সম্বন্ধে যখন এই মত, তখন তিনি ইংরাজী কথা বা বাক্যের দ্বারা অলঙ্কৃত সাধারণ কথোপকথন শুনিলে যে কি বলিতেন বলিতে পারি না। বস্তুতঃ কিন্তু এইরূপ ইংরাজীমিশ্রিত বাঙ্গালা জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক। বিস্তীর্ণ ইংরাজী ভাষায় যত ভাব প্রকাশ করা যায় সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় তাহা যায় না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাব-রাজ্যের উপর এত দখল জন্মিয়াছে যে তার সমান ভাব প্রকাশ করিতে গরিব বাঙ্গালা ভাষা অক্ষম। কাজে কাজেই তাঁহাকে ইংরাজী ভাষার আশ্রয় লইতে হয়, এবং বাঙ্গালা বলিবার সময় তাহার সঙ্গে ইংরাজী বুকনি মিশাইতে হয়। এই কারণে বাধ্য হইয়া চিঠি পত্রও তাঁহাকে ইংরাজীতে লিখিতে হয় ও বক্তৃতা আন্দোলনাদি ইংরাজীতে করিতে হয়। মনোভাবের সংখ্যার তারতম্যই সভ্যতা অসভ্যতা, এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অবস্থার প্রভেদ। বাঙ্গালী যতই উন্নত হইতেছেন ততই তাঁহার মনোভাবের সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই তাঁহাকে বাঙ্গালা হইতে অন্তর হইতে হইতেছে। এ উন্নতির শেষ সীমা দেশ হইতে বাঙ্গালা উঠিয়া যাওয়া। কে বলিতে পারে ফলে তাহা ঘটিবে না?

আমাদের উপপাদ্য বিষয় আমরা একরূপ খাড়া করিয়া তুলিলাম বলিয়া মনে হইতেছে। রক্ষণশীলতার দিক হইতেই দেখ আর পরিবর্ত্তনশীলতার দিক হইতেই দেখ বাঙ্গালীর উন্নতি হইতেছে। সকল দিকেই যে সমান বেগে হইতেছে তাহা বলি না, কিন্তু মোটের উপর চারি দিকেই উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। যদি এমন কেহ থাকেন, যিনি এ প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করেন নাই; তিনি একটা আপত্তি তুলিতে পারেন। তিনি হয়ত বলিবেন প্রবন্ধ অসঙ্গতি দোষে দুষ্য। প্রবন্ধের প্রথমে প্রমাণ করা হইয়াছে, ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের চর্চ্চা আমাদের মধ্যে বাড়িতেছে, এবং পরে যে আরও বাড়িবে এরূপ আশা করা হইয়াছে। লোক যে ক্রমে অধিকতর হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবেন এ কথাও বলা হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষ ভাগে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ক্রমে ইংরাজী চাল চলনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন, এবং দেশ যত

অগ্রসর হইবে ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী পোষাক দেশে তত প্রবল হইয়া উঠিবে। এ দুইটী বস্তু পরস্পরের বিরোধী, এবং একটী সত্য হইলে অপরটী সত্য হইতে পারে না। এই আপত্তির উপরে আমরা বলি যে প্রবন্ধে যে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতে পারে, তাহা বাহ্যিক, আভ্যন্তরিক নয়। বস্তুতঃ মনোভাবের সঙ্গে পোষাক চাল চলন বা ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। হিন্দুভাব পোষাকের সঙ্গেও জড়িত নয়, চাল চলনের সঙ্গেও নয়, এবং ভাষার সঙ্গেও নয়। আপনারা কি কেহ এরূপ লোক দেখেন নাই যিনি বাহিরে সম্পূর্ণ সাহেব, ইংরাজী ছাড়া কথা কন না, অথচ সম্পূর্ণ হিন্দু? যদি দেখিয়া না থাকেন, এরূপ লোকের কথা শুনেনও নাই কি? যদি দেখিয়া বা শুনিয়া না থাকেন বা কল্পনাতেও আনিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনারা কৃপার পাত্র আপনাদের অদৃষ্ট মন্দ। দেশীয় পোষাক উঠিয়া গেলে জোর এই হইবে যে আমাদিগকে সাহেবী মতে শোক প্রকাশ করিতে হইবে; এবং দেশীয় ভাষা উঠিয়া গেলে না হয় বেদ বেদান্তাদির ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিতে হইবেক, না হয় দর্শন ভগবদ্গীতা, সাহিত্য ও সংহিতাদি রোমান অক্ষরে পাঠ করিতে হইবেক। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মাচরণের যে কি ব্যাঘাত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। কত খাস সাহেব যে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন, এবং দুই চারি পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া পড়িবেন, ইহা কি আপনাদের জানা নাই? এত কথার পরও যদি কেহ বলেন যে প্রবন্ধের অসামঞ্জস্য মূলীভূত এবং দূর হইবার নয়, তাঁহার প্রতি এইমাত্র বক্তব্য, আমরা যুক্তি দিতে পারি, বুদ্ধি দেওয়া আমাদের ক্ষমতাতীত।

দ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নাসা-বৈচিত্র।

মস্তিষ্কতত্ত্ববিদ্‌গণ মস্তকের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া মানব প্রকৃতির নির্দ্দেশ করেন, করচিহ্ন দ্বারাও কোন কোন দেশে জীবনের শুভাশুভ নির্ণীত হয়। 'পামিষ্ট' পত্রিকায় জনৈক লেখক লিখিয়াছেন যে মানবচরিত্র নাসিকার গঠনের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নাসিকার গঠনের মধ্যে কিছু না কিছু বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু

মানব নাসিকাকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কাহারও নাসিকার মূলদেশ, কাহারো মধ্যভাগ এবং কাহারো অগ্রভাগ স্ফীত বা উচ্চ দেখায়; প্রথম শ্রেণীর নাসিকাকে 'মিলিটারী,' দ্বিতীয় শ্রেণীর নাসিকাকে 'রোমাণ্টিক' এবং তৃতীয় শ্রেণীর নাসিকাকে 'সেলফিষ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। যাহাদের নাসামূল উচ্চ তাহাদের চরিত্রে প্রবল কার্য্যকুশলতা, অসাধারণ বল এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রকাশ পায়, এই প্রকার নাসিকাকে অনেকে 'ওয়েলিংটনীয়' এই আখ্যা প্রদান করেন। সেনাপতি ওয়েলিংটনের নাসিকা এই জাতীয় নাসিকার শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গণ্য হইত; 'প্যালেশ থিয়েটারের' সুযোগ্য অধ্যক্ষ মিঃ চার্লশ মর্টনের নাসিকা বর্ত্তমান কালে 'মিলিটারী' নাসিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রোমান এবং গ্রীসিয়ান নাসিকা।

যাহাদের রোমাণ্টিক শ্রেণীর নাসিকা, অন্যের সহিত সখ্যতা লাভের ইচ্ছা তাহাদের অত্যন্ত অধিক। তাহারা উৎপীড়কের হস্ত হইতে আর্ত্তকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করে এবং নিতান্ত স্বার্থশূন্যভাবে অন্যের উপকারে প্রবৃত্ত হয়। 'সেলফিষ' শ্রেণীর নাসা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাহাদের নাসিকার অগ্রভাগ স্ফীত বা উচ্চ তাহারা স্বতঃপরতঃ স্বার্থানুসন্ধানে ব্যস্ত; স্বার্থই তাহাদের জীবনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য, নিজের স্বার্থ-সাধনের জন্য তাহারা অন্যের সুবিধা অসুবিধা বা ক্ষতি লাভের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নাসিকার অগ্রভাগ উপরের দিকে ঘুরান হইলে মানুষ অত্যন্ত কুটিল, রসিক এবং বিদ্রূপ-পরায়ণ হয়, এই বিদ্রূপ ও রসিকতায় অনেকেই মর্ম্মে আঘাত পায়। এই প্রকার নাসাধারিগণের কলহ-প্রবৃত্তিও অত্যন্ত অধিক; ক্ষমতা না থাকিলেও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যেক কাজে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা তাহাদের বিশেষ প্রবল। যে সকল স্ত্রীলোকের নাক এই প্রকার তাহারা সাধারণতই কলহপ্রিয় হয়।

যে সকল নাসিকার উপরিভাগ উচ্চনীচ নহে, ঠিক সমতল, তাহাদিগকে গ্রীসিয়ান নাসিকা কহে। যাহাদের এই প্রকার নাসিকা তাহাদের কিছু-মাত্র চরিত্রবল নাই, তাহারা সুরুচিসম্পন্ন এবং আরামপ্রিয়।

নাসিকার আকার।

নাসিকার আকার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। যে সকল লোকের নাসিকা দীর্ঘ এবং নাসাগ্র নিম্নগামী, তাহারা ধূর্ত্ত, সন্দিগ্ধচিত্ত,

সতর্ক, ষড়যন্ত্রপ্রিয় এবং মতলব-বাজ লোক। ইহুদীদিগের মধ্যে নাসিকার এই বৈচিত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এই প্রকার নাসিকা থাকায় তাহারা সহজেই বুঝিতে পারে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কিঞ্চিৎলাভ হওয়া সম্ভব। যাহাদের এই শ্রেণীর নাসিকা আইনেও তাহাদের যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখা যায়। লর্ড চীফজষ্টিস্ রসেল, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত।

নাসিকার আয়তন ক্ষুদ্র হইলে মানুষ চঞ্চলচিত্ত হয়, তাহাদের চরিত্রবল থাকে না, ইহা সর্ব্বত্র অবিসম্বাদিতরূপে সত্য নহে; কোন কোন ইংরেজ লেখক বলেন 'যাহার নাক যত বড় সে ব্যক্তি তত গুণবান।' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র নাসিকাধারী অনেক ব্যক্তিকেও প্রধান্য লাভ করিতে দেখা যায়। যাহাদের নাসারন্ধ্র অত্যন্ত বিস্তৃত তাহারা দরিদ্র এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হইয়া থাকে; যাহাদের নাসারন্ধ্র সংকীর্ণ তাহারা ধনবান হয় বটে ;কিন্তু অমিতব্যয়িতা দোষে তাহারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না।

নাসাগ্র।

যাহাদের নাসাগ্র স্থুল, তাহারা অত্যন্ত বচনবাগীশ হয়। তাহারা গৃহস্থালী সম্বন্ধে বা অন্য কোন সামান্য বিষয় লইয়া এমন উৎসাহের সহিত গল্প আরম্ভ করে যে সহজেই শ্রোতার সহিষ্ণুতা নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু তাহাদের বাক্যস্রোত বন্ধ হয় না। এইরূপ নীরস গল্পে তাহারা অনায়াসেই দুই এক ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারে এবং গল্পের মধ্যে হাস্যরসের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকিলেও বক্তার মুখবিবর হইতে ক্ষণে ক্ষণে প্রচুর হাস্যরস উদ্গত হইয়া অসহিষ্ণু শ্রোতাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে।

যাহাদের নাসাগ্র সরু তাহারা সতর্ক এবং গম্ভীর। যাহাদের নাসিকার অগ্রভাগ অত্যন্ত অধিক সুঁচল, তাহাদিগকে জীবনের অনেক সুবিধাই হারাইতে হয়। রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকের নাসিকা এই শ্রেণীর। সামান্য বায়ুর শব্দেও তাহারা ভয় চঞ্চল হইয়া সাবধানতা অবলম্বন করে।

সংক্রামক পীড়ার নিদান।

সময়ে সময়ে এক এক স্থানে সংক্রামক পীড়া আবির্ভূত হইয়া তত্রত্য বহুসংখ্যক অধিবাসীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে; জলে বা বায়ুমণ্ডলে

প্রবল কীটাণুর আধিক্যই ইহার কারণ বলিয়া বর্ত্তমান যুগের ভৈষজ্যতত্ত্ববিৎ-গণের বিশ্বাস হইলেও সংক্রামক রোগের প্রকৃত কারণ আজও রহস্যসঙ্কুল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এরূপ ভূরি প্রমাণ কীটাণু কোথা হইতে আসে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া ডাক্তার টমাস ব্লেয়ার 'মেডিক্যাল নিউস' নামক পত্রিকায় এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন 'পার্থিব বায়ুমণ্ডলের বহির্দ্দেশে তাহাদের উৎপত্তি, অর্থাৎ তাহাদের স্থান প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রলোকে। আমরা উক্ত ডাক্তারের লিখিত প্রবন্ধের সর্ব্বা-পেক্ষা চিত্তাকর্ষক অংশটির অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"হাজার হাজার টন উল্কাপিণ্ড এবং ধূলি বৎসর বৎসর পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে পৃথিবীর উপর আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই সকল সঞ্চিত পদার্থ যে বহুবিধ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কেহ কেহ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল পদার্থ বহুল পরিমাণে জীবাণুর (life germ) সহিত সংহত হয়। ডারউইন সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন যে একবার দশ লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ডের উপর এক আশ্চর্য্য ভৌতিক পদার্থ বর্ষিত হইয়াছিল। ইহা যে ভূবায়ুমণ্ডলের বহির্দ্দেশস্থ পদার্থ তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। জার্ম্মাণীতে পেকেলো নামক স্থানে একবার পীতবর্ণ তুষার ধারা বর্ষিত হইয়াছিল। ওয়েবার নামক একজন পণ্ডিত তাহাতে পুঞ্জীকৃত কীটাণু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইটালীর উত্তরভাগে একবার ভৌতিক পদার্থের বর্ষণ হয়, তাহাতে ছয় শত বর্গমাইল ভূখণ্ড একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং আল্প পর্ব্বত নয় ফিট পুরু রঙ্গীন বরফে আবৃত দেখা গিয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফরাসীদেশে এক প্রকার আণবিক (microscopic) পদার্থ বর্ষিত হইয়াছিল, তাহারা প্রায় শতাধিক বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট; ইরেনবর্গ নামক জনৈক পণ্ডিত গণনার দ্বারা স্থির করেন যে, ইহার সহিত পঁয়তাল্লিশ টন কীটাণু বর্ষিত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইটালীদেশে, এবং ইহার দশ বৎসর পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কালেব্রিয়াতেও এক প্রকার কীটাণুবর্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। আর একবার প্যালেষ্টাইনে এবং পশ্চিম কেণ্টকীতে এই ঘটনার পুনরাভিনয় হয়। এ সমস্ত যে পার্থিব পদার্থ তাহা অনুমান করা কঠিন। আধুনিক পর্য্যবেক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে রঞ্জিত তুষার সমূহ কীটাণুপুঞ্জে পরিপূর্ণ এবং মেরুপ্রদেশস্থ তুষারে তিনশত বিভিন্ন প্রকারের

জীবাণু বর্ত্তমান আছে। ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুমণ্ডলে এই সকল জীবাণুর উদ্ভব সম্ভবপর নহে বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন।

যাহাদের সহিত অগ্নির কোন সম্বন্ধ আছে সেই সকল ভিন্ন অন্য সমস্ত পার্থিব পদার্থই জীবাণুতে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই জড় পদার্থের স্বরূপ অভিন্ন, অতএব ব্যাক্টেরিয়া বা উদ্ভিজ্জাণু যে অন্যান্য গ্রহ এবং গগনবিলম্বী মেঘসমূহ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, একথা অতি সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর বহির্ভাগস্থ অসংখ্য কীটাণুর অধিকাংশই মৃত অবস্থায় পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছে, কারণ তাহাদিগকে অতি শৈত্যময় শূন্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু কীটাণু ও উদ্ভিজ্জাণুর জীবন শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। তুষার রাশির মধ্যেও অনেকে সজীব অবস্থায় থাকে; আবার অনেক উদ্ভিজ্জাণু কালক্রমে অধিক উত্তাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা লাভ করে। কোন কোন জাতীয় কীটাণু কিছুকাল জীবিত থাকিয়া অবশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ইহারা যে সংক্রামক রোগের উৎপত্তি করে, ইহাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই রোগও অন্তর্হিত হয়।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে 'ব্ল্যাক প্লেগ" নামক মড়কে পৃথিবীর পাঁচ কোটী অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। রোগ-কীটাণু দ্বারাই যে এই সংক্রামক ব্যাধি স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বাণিজ্যোপলক্ষে এক দেশের সহিত অন্য দেশের সংস্রবে এই রোগ এত শীঘ্র বিস্তৃত হইতে পারিত না। জলে স্থলে সর্ব্বত্রই ইহার প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। এই রোগ বিস্তার উপলক্ষে একখানি প্রাচীন পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল—"দূষিত বায়ু যখন মৃত্যুভার বহন করিয়া আসিত, তখন তাহা প্রকৃতই দৃষ্টিগোচর হইত, আকাশ ভয়ানক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত।" অনেক সময় কোন কোন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত মেঘ সংক্রামক পীড়ার বীজ বহন করিয়া আনে। পৃথিবীতে 'ব্ল্যাক প্লেগের' আবির্ভাব এবং তিরোভাবের কারণ কি—এই প্রশ্ন লইয়া তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক মহলে বিশেষ আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল—অবশেষে স্থির হয় যে রোগ-কীটাণুর বিস্তারই ইহার কারণ। পৃথিবী—তাহার আবর্ত্তনপথে শূন্যমণ্ডলের এইরূপ কীটাণুপূর্ণ স্তরে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই অংশ অতিক্রম করিলেই পৃথিবী হইতে রোগ

বিদূরিত হইয়া গেল, পৃথিবীর জলবায়ু এই রোগাণুর অনুকূল না হওয়াতে তাহারা অধিক দিন পৃথিবীতে স্থায়ী হইতে পারে নাই। 'স্পটেড্ ফিভার' নামক এক প্রকার জ্বরের আবির্ভাবেরও ইহাই কারণ। এই জ্বরের কথা এখন অনেকেই অবগত নহেন এবং এই পীড়া পৃথিবী হইতে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ১৮৬৬।৬৭ খৃষ্টাব্দের black deathএর ন্যায় এক সময় ইহা অত্যন্ত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। অন্যান্য সংক্রামক পীড়ারও আবির্ভাব এবং হটাৎ তিরোভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু প্রচলিত 'থিওরি' দ্বারা তাহাদের কার্য্যকারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া নিস্ফল।

ডাক্তার ব্লেয়ার তাঁহার মতকে অভ্রান্ত বলিতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন ইহা দ্বারা একটি অভিনব চিন্তার পথ প্রশস্থ হইবে; এবং এ সম্বন্ধে গভীর পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজনীয়। ডাক্তার ব্লেয়ারের এই নূতন আবিষ্কার (আমরা ইহাকে আবিষ্কারই বলিতেছি) চিত্তাকর্ষক এবং কৌতুকোদ্দীপক। ইহাদ্বারা একদিন জগতের প্রকাণ্ড অভাব নিরাকৃত হইতে পারে।

বেলুনে ছয় মাইল উর্দ্ধে।

ডাক্তার এ. পারসন নামক একজন গগনবিহারী জর্ম্মণীর ষ্ট্রাটগার্ট নগরে 'ফিনিক্স নামক বেলুনে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধাকাশে উঠিয়াছিলেন'। তাঁহার এই আকাশ বিহার বৃত্তান্ত 'দি জর্ণাল অব দি এরোনটিক্স্' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের কৌতুহল দূর করিবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিলাম :—

এই বেলুন দুই হাজার কিউবিক মেটার জলজান বাষ্পে পরিপূর্ণ করা হয়; এবং আকাশস্থ বায়ুর গতি, চাপ ও শীতোষ্ণতা পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাতে বায়ুমান যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রাদি লওয়া হইয়াছিল। বেলুন আকাশে উঠিবার পনেরো মিনিট মধ্যে ইহা ছয় হাজার পাঁচশত ফিট উর্দ্ধে উঠিল। ঠিক এক ঘণ্টা হইলে দেখা গেল ইহা ১৬ হাজার ফিট উচ্চে উঠিয়াছে, সেখানে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ—১৮° সিণ্টিগ্রেড্। দুই ঘণ্টার মধ্যে বেলুন ২৬ হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিল; অর্থাৎ তখন বেলুন এক হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ ব্যতীত পৃথিবীস্থ সমুদয় পর্ব্বত শৃঙ্গের উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছিল; এখানে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ ৩৯° সেণ্টিগ্রেড। ডাক্তার পারসন পূর্ব্ব হইতে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাহাতে উর্দ্ধস্থ বায়ুমণ্ডলের লঘুতা এবং নিদারুণ শৈত্য তাঁহার কোন অপকার

করিতে পারে নাই; বায়ু অত্যন্ত পাতলা হইয়া আসিলে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অম্লজান বাষ্পের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্ত অম্লজান বাষ্পপূর্ণ ব্যাগের সাহায্যে নিশ্বাস গ্রহণ না করাতে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন,মস্তক ঘুরিতে লাগিল এবং দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া আসিল। কিন্তু অম্লজান বাষ্পের পুনঃ পুনঃ শ্বাস গ্রহণে এত-উর্দ্ধেও তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই। বেলুনে আরোহণের আড়াই ঘণ্টা পরে ডাক্তার ত্রিশ হাজার বারো ফিট উচ্চে উঠিলেন, এখন তিনি হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘারও প্রায় হাজর. ফিট উর্দ্ধে। ডাক্তার পারসন এখানে বায়ুমান যন্ত্রে দেখিলেন বায়ুর চাপ দুইশত একত্রিশ মিলিমেটার। এখানে তাপমান যন্ত্রের পরিমাণ—৪৭.৯০ সেণ্টিগ্রেড। ডাক্তার আরও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বেলুন চালিত করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার অঙ্গুলী অসাড় হইয়া আসিল এবং তিনি অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বেলুন ধীরে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিল। ডাক্তার পারসন স্থয়েনওয়াল্ড নামক স্থানে এক শস্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। উর্দ্ধস্থ বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সত্য তিনি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। শীতোষ্ণমণ্ডলে পাঁচহাজার ফিট উচ্চ হইতে ত্রিশ হাজার ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ুর বেগ এবং শৈত্যের পরিমাণ বিস্ময়জনক ক্রমে পরিবর্ত্তনশীল।

ফরমোজা।

চীনযাপান যুদ্ধের সালে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহার সহিত ফরমোজাদ্বীপের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায় এই দ্বীপ সহসা বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। চীন সম্রাট এই দ্বীপ যাপানের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা লাভ করিয়া যাপানের বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং ইহাতে যাপানের প্রাধান্ত আরও বর্দ্ধিত হইবে। চীন ভাষায় এই দ্বীপের নাম তাই,—ওয়ান; ইহা চীনের কো-কিন প্রদেশ হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। ফরমোজা দ্বীপ ২৪৫ মাইল দীর্ঘ, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতির পরিমাণ একশত মাইল। আকার সিংহল দ্বীপের অর্দ্ধাংশেরও অধিক, পরিমাণ ফল ১৪৯৮২ বর্গ মাইল। ইহার লোক সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। এই দ্বীপের পশ্চিম অংশ কো-কিন প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল, এবং পূর্ব্বাংশ অসভ্য বন্যজাতির অধিকার ভুক্ত ছিল। এক

সুদীর্ঘ পর্ব্বত শৃঙ্খলে এই দ্বীপকে দীর্ঘ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, এই পর্ব্বত অল্প উচ্চ নহে, ইহার কোন কোন শৃঙ্গ বার হাজার ফিট উচ্চ। অধিকাংশ শৃঙ্গই শুভ্র তুষার মণ্ডিত। পর্ব্বতের সানুদেশ সুদীর্ঘ সুন্দর বৃক্ষ-রাজীতে ও তৃণপূর্ণ শ্যামল গোচারণ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। সমুদ্র হইতে এই পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর এবং জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে বহুসংখ্যক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, গন্ধক ও কেরোসিন তৈলের খনি অপর্য্যাপ্ত; আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতও মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। চীনের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের সহিতই প্রধানতঃ এই দ্বীপ বাণিজ্যব্যাবসায়ে লিপ্ত। প্রধান পণ্যদ্রব্য চাউল, তদ্ভিন্ন কর্পূর, চিনি পাথুরিয়া কয়লা, কাষ্ট, চা প্রভৃতি দ্রব্যও অল্লাধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। ফরমোজার অরণ্য প্রদেশে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ এবং নেকেড়ার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কিলঙ নামক স্থানের নিকট পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে। আদিম অসভ্য অধিবাসিগণের আকার দীর্ঘ, বর্ণ কটা, ইহারা মস্তকে সুদীর্ঘ চুল রাখে এবং দন্তে কৃষ্ণবর্ণ মাজন ব্যবহার করে। এই অসভ্য জাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; কোন কোন সম্প্রদায়ে লেখাপড়ার চর্চ্চা আছে। ইহারা সত্যবাদী, ন্যায়বান, কিন্তু অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। য়ুরোপীয়গণ বহুদিন হইতে ইহাদিগের আবাস-স্থানে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই দ্বীপের চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অংশ চারিটি জেলায় বিভক্ত। তামসুই এবং কিলং প্রধান বন্দর, এতদ্ভিন্ন আরও দুইটি বন্দরে বৈদেশীকগণ পণ্যদ্রব্য আমদানী করিতে পারিতেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বরফ।

কলিকাতা ও অন্যান্য সহরবাসী অনেকেই বরফ "আহার"* বা বরফজল পান করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলে এই প্রাণ-মন-মুগ্ধকারী, গ্রীষ্ম-ক্লেশ-নিবারণ-কারী, হুইস্কি-পেগ-শীতল-কারী দ্রব্য যে কিরূপে প্রস্তুত করা হয় তাহা বোধ হয় জানেন না। অনেকের জানিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে;

* বাঙ্গালায় সকলেই জল "খাইয়া" থাকেন কদিচ কখনও পুস্তকে "পান করিয়া" থাকেন।

সেজন্ত এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল। বরফসেবীদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী জানেন, অতএব এই প্রবন্ধে যদি ইংরাজী technical expressions ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।

কৃত্রিম বরফ, অর্থাৎ যে বরফ সচরাচর বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা কৃত্রিম শীত সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই শীত কার্বনিক এসিড, জল, এমোনিয়া, সালফিউরাস এসিড ও ইথর প্রভৃতির সাহায্যে পাওয়া যায়। অনেক কারণে আজকাল ইথরের বেশী ব্যবহার ও আদর, অতএব এক্ষণে ইহারই বিবরণ দেওয়া যাক্।

ইথর অত্যন্ত ভলেটাইল (volatile)* সচরাচর (অর্থাৎ under atmospheric pressure) ইহা ৯০° (Fahr) গরমে বাষ্প হইয়া যায়, কিন্তু ভ্যাকুয়ামে (vacuum) ইহা ফ্রিজিং পয়েণ্টের (freezing point) অনেক ডিগ্রি নীচে বাষ্প হয়। এইরূপ শীঘ্র বাষ্পোদ্গমন (rapid evaporation) হেতু ইথর হইতে অতি সহজে শীত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইথর-বরফের কল নিম্নলিখিত অঙ্গ সকলে বিভক্ত, যথা—একটি বাষ্প-পম্প (vapour-pump), একটি শীতোৎপাদক বাক্স (refrigerator), একটি বাষ্প-তরল-কারক যন্ত্র (Condensor), একটি জলের পাম্প, আর একটি লবণ-জলাধার (Brine-box) ও কতিপয় বরফের ছাঁচ্ (Ice vessel or mould), উপরি উক্ত দুইটি পাম্প চালাইবার জন্য একটি এঞ্জিন আর এই এঞ্জিন চালাইবার জন্য একটি বয়লারের আবশুক।

এই সকল অঙ্গের কার্য্য "নামেন পরিচিয়তে।" বাষ্প-পাম্পের কাজ হইতেছে শীতোৎপাদক† বাক্স হইতে ইথরের বাষ্প নিকাশ করা। ইথর ইহার শোষক (suction) মুখ দিয়া বাষ্প হইয়া প্রবেশ করে এবং নির্গমনের (discharge) মুখ দিয়া condensorএ যায়। শীতোৎপাদক বাক্সের কাজ হইতেছে লবণ-জলকে শীতল করা। এই যন্ত্রের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া নল (pipe) গিয়াছে; তাহার ভিতর দিয়া লবনজল সর্ব্বদা পম্প সাহায্যে বহমান।

বাষ্প তরলকারক যন্ত্রের কাজ হইতেছে ইথর বাষ্পকে পুনর্ব্বার তরল

*Volatileএর বাঙ্গালা জানি না; অভিধানে দেখিলাম ইহার মানে উড্ডয়নশীল; পাঠক তাহাতে ইহার মানে পক্ষীই বুঝুন আর অল্প গরমে বাষ্প হইয়া যায় এমন কোন তরল পদার্থই বুঝুন, যাহা হয় বুঝিয়া লইবেন।

† এই বাক্সের অর্দ্ধেকের কিঞ্চিৎ অধিক তরল ইথরে পূর্ণ।

ইথর করা; ইহাতে সর্ব্বদা ঠাণ্ডা জল পড়িতেছে ও আপনার কাজ করিয়া অন্যদিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। জল সমান পরিমাণে আসা যাওয়া হেতু এই যন্ত্র সর্ব্বদা জলে পরিপূর্ণ থাকে; এই জলের ভিতর দিয়া ইথর বাষ্প যাইবার জন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া পাইপ গিয়াছে; ইথর এই পাইপের ঠাণ্ডা গায়ে লাগিয়া পুনরায় তরল হইয়া যায়।

জলের পাম্প—ইহা একটি ছোট দমকলের ন্যায়; ইহা লবণজলের আধার হইতে শীতোৎপাদক বাক্সের মধ্য দিয়া লবনজল টানিয়া পুনরায় ইহাকে লবণজলাধারে পাঠাইয়া দেয়।

লবণজলাধারে সারি দিয়া নির্ম্মল জল পূর্ণ ধাতু নির্ম্মিত বরফের ছাঁচ সকল রাখা হয়, এই ছাঁচের ভিতরকার যে জল তাহাই জমিয়া ভক্ষনীয় বা পানীয় বরফ তৈয়ার হয়।

বরফের কলের উপরি উক্ত অঙ্গ সকলের কাজ নিম্নলিখিতরূপে চলিয়া থাকে—বয়লারের ষ্টীম এঞ্জিনকে চালায়, এঞ্জিন বাষ্প পাম্পকে চালায়, এই পাম্প রিফ্রিজরেটরস্থ ইথর হইতে ভ্যাকুয়ম (vacuum) সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করিয়া আকর্ষণ করে; সেই বাষ্প এই পাম্পের নির্গমন পথ (discharge side) দিয়া তরল-কারক (condensor) যন্ত্রে যায়; সেখানে যাইয়া ইথর বাষ্প পুনরায় তরল হইয়া পশ্চাদস্থিত বাষ্পের ধাক্কায় পুনরায় রিফ্রিজিরেটরে যায়। ইহাতে এই কার্য্য সাধিত হয় যে—রিফ্রিজিরেটরস্থ তরল ইথর শীঘ্র বাষ্পোদ্গমন (rapid evaporation) হেতু অত্যন্ত শীতল হইয়া যায়; এই শীতকেই কাজে আনা হয়; ইহার দ্বারাই জল জমান হইয়া থাকে। রিফ্রিজিরেটরস্থ ইথর অতি অল্পই খরচ হইয়া থাকে, কারণ তাহা বাষ্পাবস্থা হইতে পুনরায় ইথর হইয়া রিফ্রিজিরেটরে যাইয়া পুনরায় কার্য্য করে। ইথর-বাক্সের কার্য্য অবিরতভাবে চলিতে থাকে, সেজন্য শীতও অবিরতভাবে জন্মিতে থাকে।

ইথরের শীত নিম্নলিখিত ভাবে কাজে আনা হয়।—বরফের কলের অঙ্গ পাম্পটিও এঞ্জিন দ্বারা চালান হয়। তাহার শোষক নল (suction pipe) রিফ্রিজিরেটরের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া লোনাজলের আধারে যোগ হইয়াছে, এই নল দিয়া পম্প লবণ-জলাধারস্থিত জলকে আকর্ষণ করে; এই লোনাজল রিফ্রিজিরেটরস্থিত পাইপের ভিতর দিয়া যাইবার সময় শীতল ইথরের সংস্পর্শে আসিয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়; এই শীতল

লোনাজল পম্পের নির্গমন পথ দ্বারা পুনরায় ব্রাইন-বক্সে প্রেরিত হইয়া থাকে; সেখানে যাইয়া এই শীতল জল বরফের ছাঁচের গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া পুনরায় রিফ্রিজিরেটরে গিয়া ঠাণ্ডা হইয়া পুনরায় এই বাক্সে আসে। এইরূপ অবিরত শীতল লবণজল বরফের ছাঁচের গায়ে লাগার জন্য ছাঁচের ভিতরস্থিত নির্ম্মল জল শীত সংস্পর্শে ক্রমে জমিয়া বরফ হইয়া যায়।

এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈয়ারি হয়। বরফ জমিতে সচরাচর প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগিয়া থাকে; অত্যন্ত গরমের সময় আরো অধিক সময় লাগে; শীতকালে কিছু কম সময়ে জমিয়া যায়। বৃহৎ চাঙ্গড় জমাইতে হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে।

বরফের কলের উপ-অঙ্গও অনেক আছে; কিন্তু সে সব ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্যের জানিবার আবশ্যক নাই। বরফের ছাঁচ সচরাচর পাঁচ হইতে ছয় ইঞ্চ পর্য্যন্ত চওড়া হয়, কারণ তিন ইঞ্চের অধিক বরফ জমাইতে অনেক অধিক সময় লাগে; ছাঁচ পাঁচ ছয় ইঞ্চ হইলে দুধার হইতে বরফ জমিয়া বেশ নিরেট চাঙ্গড় জন্মে। এই ছাঁচ সকলের গায়ে ঠাণ্ডাজল উত্তমরূপে লাগা উচিত; সেজন্য ব্রাইন-বাক্সের ভিতর কাঠের বাঁধ ও ব্রেকার (breaker) প্রভৃতি অনেক দেওয়া থাকে যাহাতে শীতল জলের স্রোত সুন্দররূপে ছাঁচের চারিধারে লাগিতে পারে। বরফের কলে লোনা জলের সাহায্য লওয়া হয়, কারণ ইহা কখনও জমে না, ইহার টেম্পরেচর প্রায় ২০° (Fahr) নিম্নে, আর ৩২° ডিগ্রিতে জল জমে অতএব খালি জল হইলে ব্রাইন-বাক্সস্থিত জল রিফ্রিজিরেটরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় জমিয়া যাইত, সেজন্য লোনা জল ব্যবহার করা হয়।

আজকাল বরফের কলে বেশ দুপয়সা লাভ আছে। কারণ বরফ খাইতে লোকে জাতিভেদ মানে না; সকলেই খাইয়া থাকে সেজন্য বরফের কাটতিও অধিক। সহর ও মফস্বলে বরফের কাটতি আরো বাড়িতে পারে, যদি দাম আরো সস্তা করা হয়। নিজ কলিকাতা সহরে আরো দুইটি বরফের কল উত্তমরূপে চলিতে পারে। হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগরের মধ্যে একটি দুই-টন বরফের কলে বেশ লাভ হইতে পারে। বর্দ্ধমানেও একটি দুইটন অন্তত এক টনের-কল চলিতে পারে। এইরূপ সাহেব ফিরিঙ্গী ও বাবু লোক প্রধান মফস্বলস্থ সহর সমূহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের কলে বেশ লাভ হইতে পারে। আমাদের দেশের বড়লোক ও ব্যবসায়ীদিগের এবিষয়ে মনযোগ হইলে,

তাঁহাদিগেরও বিশেষ দুপয়সা আসিতে পারে আর অনেক গরিব লোকেও তাঁহাদের আশ্রয়ে খাটিয়া খাইতে পারে, এবং অনেক পাড়াগেঁয়েও বরফ খাইয়া সভ্য হইতে পারে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

"স্বর্ণলতা"-প্রণেতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কোথাও এক ছত্র লেখা বাহির হইল না,—ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অনেকের মতে স্বর্ণলতা বাঙ্গলার একখানি অতি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস। "কলিকাতা রিভিউ" এই পুস্তক সমালোচনায় বলিয়াছিলেন,—"উপন্যাস বল ত স্বর্ণলতাই বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস; বঙ্কিমের বহিগুলি ত উপন্যাস নহে—সেগুলি কাব্য।" স্বর্ণলতাই তারক বাবুর প্রথম উদ্যম; স্বর্ণলতা লিখিয়াই তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন; কিছু অর্থাগমও হইয়াছিল। স্বর্ণলতার মুনাফা হইতে তারক বাবু গৃহিণীকে কিছু স্বর্ণালঙ্কার গড়াইয়া দিয়াছিলেন—তাই তিনি সর্ব্বদা স্বামীকে তাগাদা করিতেন—"বই লেখ না—আরও বই লেখ না।" কিন্তু স্ত্রীর প্রবর্ত্তনায় বা তাড়নায় স্বর্ণলতার পর আর যাহা কিছু তারক বাবু লিখিলেন, তেমনটি আর হইল না। যাহা হউক, একা স্বর্ণলতার অনুরোধে বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে তাঁহার জীবনচরিত রক্ষিত হইতে পারে। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, তিল কুড়াইয়া তাল হয়; তারক বাবুর জীবনীর গুটিকতক তিল "দাসী" মারফৎ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিলাম; দেখা যাউক ইহা কুড়াইয়া কখনও কেহ তাল গড়িতে চেষ্টা করেন, অথবা Oblivion-পক্ষী আসিয়া তাহার সুদীর্ঘ চঞ্চুপুটের সাহায্যে এগুলিকে লইয়া আপনার জঠরানলে আহুতি দেয়।

তারক বাবুর নিজের কথায়, তাঁহার জন্ম ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার বাগ-আঁচ্ড়া গ্রামে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা অঞ্চলের লোক যশোহর জেলার লোককে "যশুরে বাঙ্গাল" বলিয়া বিদ্রূপ করে জানিয়া তিনি সর্ব্বদা কিছু সশঙ্কিত থাকিতেন। "আপনার বাড়ী কোন জেলায়?" জিজ্ঞাসা করিয়া অনেকেই এই

প্রকার উত্তর পাইয়াছেন—"আমাদের গ্রামটা চিরকালই নদীয়া জেলার ভিতর ছিল হে, সম্প্রতি যশোর হয়ে গেছে।" গ্রামের গুরুমহাশয়ের নিকট কিছুদিন বিদ্যা ও বেত্র সেবন করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন। ভবানীপুর এল্. এম্, এস্, ইনৃষ্টিটুট্যশনে ইংরাজী পড়া আরম্ভ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৮৲ বৃত্তি লইয়া উত্তীর্ণ হন। তাহার পর মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। যথাসময়ে মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন মেট্রপলিটানে রসায়ন-অধ্যাপকের কার্য্য করেন। তৎপরে ১০০৲ বেতনে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভ্যাক্সিনেসন্ ইন্স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। এই সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্য্যটন করিতে হইত এবং এই সময়ই স্বর্ণলতা রচিত হয়। পল্লীগ্রামে ঘোড়ার গাড়ী যোটে না, সুতরাং গোরুর গাড়ীই ভরসা। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোনও বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিয়দ্দূরে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ সদ্য-নির্ম্মিত ইষ্টকের চুল্লীতে হাঁড়ি চাপাইয়াছে। ডাক্তার বাবু গোরুর গাড়ীর তলায় শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া স্বর্ণলতা লিখিতেছেন। স্বর্ণলতার অধিকাংশ এইরূপে গোরুর গাড়ীর তলায় রাজপথের উপর রচিত হইয়াছিল।

পুস্তক খানি ক্রমশঃ জ্ঞানাঙ্কুর নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তখন উহা সাধারণ পাঠক কর্ত্তৃক কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা জানা নাই। জ্ঞানাঙ্কুরে, সরলার পীড়ায় বর্ণনায় এরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবতারণা করিয়াছিলেন যে, পড়িলে সহজেই মনে হইত গ্রন্থকর্ত্তা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার সময় সেইজন্য সেগুলি কতক ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মনে মনে তারক বাবুর বিশ্বাস ছিল, স্বর্ণলতার মত উপন্যাস বাঙ্গলায় আর নাই। বঙ্কিমের উপর তিনি অত্যন্ত চটা ছিলেন। কেহ যদি বঙ্কিমের নিন্দা ও স্বর্ণলতার সুখ্যাতি করিল, ত মহাখুসী। তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত করিতেন। তিনি বলিতেন —"বঙ্কিমের উপন্যাস গুলা প্রায়ই ফেলিয়োর্—অস্বাভাবিক।" বলিতেন —"বঙ্কিমের মত লেখকের দুই তিন খানির অধিক উপন্যাস লেখা উচিত ছিল না; কতকগুলা লিখিতে গিয়া অধিকাংশই রাবিষ্ হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে Fieldingকে অনুসরণ করাই উচিত। Fielding অধিক উপন্যাস

লেখেন নাই ; যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।" নিজেকে স্বর্ণলতা-প্রণেতা বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। একবার আমার এক আত্মীয় তাঁহার সহিত রেলে এক কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। দুইজনে আলাপ হইলে, একথা সেকথা পাঁচ কথার পর তারক বাবু বলিলেন—"স্বর্ণলতা পড়েছেন কি ? সে খানি আমার লেখা।" বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ অনাহূত ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল।

পান দোষটা তাঁহার কিছু প্রবল ছিল। বক্সারে অবস্থানকালে, কোনও রেলওয়ে কর্ম্মচারীর পুত্রের কলেরা হয়। অনেক রাত্রিতে বিপন্ন পিতা আসিয়া বহু চেষ্টায় ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া তারক বাবুকে লইয়া গেলেন ; তারক বাবু রোগী দেখিয়া প্রেশ্‌ক্রিপ্‌ষ্যন্‌ লিখিয়া দিয়া আসিলেন। প্রভাতে যখন সে ব্যক্তি ডাক্তার বাবুর কাছে পুনরায় উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা কিছুমাত্র স্মরণ করিতে পারিলেন না। "গিয়েছিলাম ? প্রেশ্‌ক্রিপ্‌ষ্যন্‌ লিখে দিয়ে এসেছি ? কিছু ত মনে নাই ;—একবার আন দেখি, সেখানা দেখি।" প্রেশ্‌ক্রিপ্‌ষ্যন্‌ আনা হইল, দেখিয়া বলিলেন,—"ঠিকই লিখেছি।" গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া ক্রমে তাঁহার ২৫০৲ বেতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু চিকিৎসক বলিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বাহিরের লোক শীঘ্র তাঁহাকে ডাকিত না। রোগীর প্রতি বিশেষ একটা যে যত্ন বা মনোযোগ, তাহা কখনও তাঁহার দেখা যায় নাই। তিনি নিজ মুখেই বলিতেন, যাহাকে কালে ঘিরিয়াছে, সেই যেন আমাকে ডাকে।

অনেক প্রতিভাশালী লেখকের কেশ বেশের প্রতি যে অমনোযোগ শুনা যায়, তারক বাবুর তাহার লেশমাত্রও ছিল না। বর্ত্তমান লেখক বাল্যকালে এক দিন তাঁহার কাছে বসিয়া ছিলে । তারক বাবুর পকেট ঘড়িটা বিগড়াইয়া যাওয়াতে এক ঘড়িওয়ালাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। ঘড়িওয়ালা বলিল, মেরামত করিয়া পরশ্ব দিয়া যাইবে। তারক বাবু বলিলেন—"বিলক্ষণ ! কাল Jailer বাবুর মেয়ের বিবাহ ; আমি কি ঝুলাইয়া যাইব ? কালই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘড়ি চাই।"

তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। হিন্দুসমাজের গণ্ডীর ভিতর তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। নিষিদ্ধ পক্ষীবিশেষের মাংস না হইলে তাঁহার রাত্রিভোজন সম্পন্ন হইত না। এক হিন্দু সহিস

ছিল, সে বেচারী চাকরীর দায়ে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ষ্টেশনের কেল্‌নার্‌ ভট্টা-চার্য্যের বাড়ী হইতে এক প্লেট "কারি" আনিয়া দিয়া গঙ্গাস্নান করিত। অনেক লোক আছেন, যুবা বয়সে কিছু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির থাকেন, বয়স একটু ঢলিয়া আসিলেই সন্ধ্যা-আহ্নিকটা আরম্ভ করেন; তারক বাবু? আরে রামঃ—সে দিক দিয়াও যান নাই। তিনি বলিতেন,—"যিনি প্রাতঃ-কাল করেছেন, তিনিই 'সন্ধ্যা' করিবেন, আমাদের ও হাঙ্গামায় কায কি?" চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। কেহ এ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—"ক্ষেপেছ; বুড়ো বয়সে কি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তৈয়ারি করে যাব?" মুগ্ধবোধ ব্যাকরণটা কি রকম জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া আওড়াইতেন:—

মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া।

তিনি বড় বড় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অপেক্ষা সামান্য বেতনভোগী কেরাণী প্রভৃতির প্রতি সমধিক অনুরক্ত থাকিতেন। বলিতেন, ডেপুটি, মুনসিফ্‌, সবজজ্‌ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বড় অহঙ্কারী। "হরিষে বিষাদে" ডাক্তার বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রিতা মহিলা-মহলে এক কোন্দল বাধিয়াছে। মুনসিফ্‌ বাবুর স্ত্রী বলিতেছেন,—"ডেপুটি আবার হাকিম্‌; আরসুলা আবার পাখী—আ আমার পোড়া কপাল!"

বর্দ্ধমানের উকীল বিখ্যাত লেখক বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারক বাবুর সহপাঠী ছিলেন। তিনি তাঁহার বাল্যকালের অনেক সংবাদ দিতে পারেন। ভাগলপুর সেণ্ট্রাল্‌ জেলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেককাল তারকরত্নাস সঙ্গে বন্ধুভাবে বক্‌সারে কাটাইয়াছেন। তিনিও সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনের অনেক কথা অবগত আছেন। তারক-বাবুর আর আর আত্মীয় বন্ধু যাঁহারা জীবিত আছেন, সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিলে তাঁহার জীবনীর উপাদান অনায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারে। ইন্দ্রনাথ বাবুই কেন তাঁহার বন্ধুর একখানি জীবনচরিত প্রণয়নের ভার গ্রহণ করুন না?

গ্রন্থ-সমালোচনা। ৮

মাধবিকা। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র হইতে শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০।

নাম দেখিয়াই অনেকে বুঝিতে পারিবেন এখানি কবিতা-পুস্তক। বলেন্দ্র বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত;—গদ্য-লেখক বলিয়াই সুপরিচিত; কবিতা তিনি অধিক লেখেন নাই। যাহাও দুই চারিটি মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা এ পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট করেন নাই। কাব্যে সুতরাং এই তাঁহার প্রথম উদ্যম;—আমরা নবকবিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।

গদ্য রচনায় বলেন্দ্র বাবু যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। সাধনায় উড়িষ্যার কনারক মন্দিরের তিনি যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেরূপ ললিত-সুন্দর ভাষা আজ কাল প্রায় পড়িতে পাই না। তাঁহার অধিকাংশ গদ্যই গদ্যচর্ম্মাবৃত কবিতা; এবার ছন্দ ও মিল সেই আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মাধবিকার অধিকাংশ কবিতাই সনেট্। ভাবের নূতনত্ব আছে। আজ কালকার অধিকাংশ নব্যকবির রচনার ন্যায় অর্থশূন্য বা হুতাশে পূর্ণ নহে। এক একটিতে তিনি বিলক্ষণ রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নে দুইটি নমুনা তুলিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

মূঢ়তা।

রমণী প্রলয়ঙ্করী বলেছে যে কেহ
বিষম সাহস তার নাহিক সন্দেহ,
বুদ্ধি কিছু কম, নহিলে সে মূঢ়মতি
এক বাক্যে হারায় কি সকল সম্পত্তি!
বৈকুণ্ঠে আছেন লক্ষ্মী, কৈলাসে ভবানী,
ইন্দ্রালয়ে শচীদেবী, মর্ত্ত্যে সুনয়ানী
ঘরের গৃহিণী মহাদেবী;—হে অজ্ঞান
কোথা হবে ঠাঁই তব? করিবে প্রয়াণ

কোন্ রসাতল পুরে নাহি নাগবালা
যেথা নাহি অনুক্ষণ দিতে বিষজ্বালা
শিরায় শিরায় তব? জেনেছিলে মনে
প্রলয় লুকান যদি ঐ আঁখি কোণে,
ফুৎকারে জাগালে কেন তাহা? মর দহি'
তুষানলে পলে পলে রহি' রহি' রহি'।

বৃথা গর্ব্ব।

নরজাতি অস্ত্রহীন অক্ষম অগতি,
নারীদল সর্ব্ব-অঙ্গে মায়া অস্ত্রমতী।
বল, হে মন্মথ, তব কারে পক্ষপাত—
কার প্রতি খরতর তব শরাঘাত?
আপন জাতির কিছু রাখ কি খাতির,
অথবা তাহারে হান বাছা বাছা তীর
নারীর যৌবন-দুর্গে লুকাইয়া বসি'!
এই কি গৌরব তব, হে মহা সাহসী,
যে জন মরিয়া আছে নূপুর তাড়নে,
জর্জ্জর নির্জ্জীব বন্দী মেখলা বন্ধনে—
পঞ্চত্বের বাকি নাই, পঞ্চশর তায়?
যে মরেছে মৃগলোচনের মৃগয়ায়
সে মৃগ বধের গর্ব্ব তুমি কর কে হে
তব নামাঙ্কিত শর বিঁধি তার দেহে!

বাঙ্গালা ভাষার কোন কোনও কবি আসরে অবতীর্ণ হইয়া যাই দুই চারিটী রাগিণী একটু ভাল করিয়া গাহিয়াছেন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে মুষল ধারায় প্রশংসা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সেই যে তাঁহারা অন্তর্ধান হইয়াছেন, আর দেখা নাই। দৈবাৎ কখনও মাসিকপত্রের আড়াল হইতে একবার উঁকি মারেন, কিন্তু সে মানুষ বলিয়া আর চেনা যায় না। তাই নবকবিকে ভয়ে ভয়ে প্রশংসা করিতে হয়। আমরা বলেন্দ্র বাবুর কবিতার উত্তরোত্তর বিকাশ দেখিতে পাইলে সুখী হইব। *

---

* এই সমালোচনা সম্পাদকীয় নহে।

দাসাশ্রামের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

যাঁহার কৃপায় দাসাশ্রম জীবিত থাকিয়া আপনার উদ্দেশ্যপথে আর এক মাস অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল, সেই দয়ার সাগর ভগবানকে বার বার নমস্কার করিয়া আমরা জুলাই মাসের কার্য্য বিবরণী সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেবিয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণীকান্ত সরকার, ১০। গঙ্গা, ১১। ঘামন, ১২। বুঝাওন, ১৩। সরস্বতী, ১৪। নিস্তারিণী, ১৫ সখী, ১৭। রাজেশ্বরী, ১৮। ব্রহ্মময়ী, ১৯। বিধুকাহার, ২০। নবিসেখ, ২১। সুখময়ী, ২২। আশাবিবি, ২৩। সোণামণি।

এই মাসে এই সকল আতুরগণের মধ্যেই অনেকেই জ্বর ও কাশিতে ভুগিয়াছে।

গঙ্গা। গঙ্গার অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং বেড্‌সোর হইয়া শয্যাগত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার আহার একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়াতে তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে। সেখানে গিয়া তাহার অবস্থা একটু ভাল হইয়াছে। আবার জীবনের আশা হইয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার সংবাদ লওয়া হয়। আর একটু ভাল করিয়া আরোগ্য হইলেই আবার ফিরাইয়া আনা হইবে।

ঘামন। আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

বুঝাওন। অনেক চেষ্টাতেও বিশেষউপকার না হওয়ায় হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিধুকাহার। রোগবিশেষ গুরুতর দেখিয়া হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

নবিসেখ। বয়স ১২, মুসলমান। নিবাস যশোহর জেলাস্থ খালকুলি গ্রামে। রোগ পচা ঘা। চলিয়া যায়।

সুখময়ী। বয়স আন্দাজ ৪৫, হিন্দু, নিবাস কলিকাতায়। ডিসট্রিক্ট চারিটেবেল সোসাইটির সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্রমিত্র ইহাকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া দাসাশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে স্থায়ীভাবেই থাকিবে বলিয়া তাহার বাসা ছাড়িয়া দিয়া কাপড়াদি আনিতে যাইবে বলিয়া ঐ মর্ম্মে এক চিঠি লইয়া ঈশ্বর বাবুর নিকট যাই বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু আর ফিরিয়া আসে নাই।

আশাবিবি। নিবাস নিল্‌ফামারি। তথাকার দয়ালু মোক্তার বাবু বিশ্বেশ্বর সেন ইহাকে আয়োজন করিয়া প্রেরণ করেন। বয়স ১২ বৎসর, মুসলমান কন্যা, রোগ গলিত-কুষ্ঠ। শুনা গেল তাহার বাপ আছে, কিন্তু তাহাকে রাখিতে প্রস্তুত নহে। যাহাদের সঙ্গে আশ্রমে আসে, তাহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলা হয়, কিন্তু তাহারা বারাণ্ডায় ফেলিয়া দিয়া সরিয়া পড়ে। আমাদের আশ্রমে কুষ্ঠ রোগী থাকিবার নিয়ম নাই। তখন আমরা বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া, বহুকষ্টে ও অনেক আয়োজনের পর কলিকাতা কুষ্ঠাশ্রমে তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাকে দেখিতে যাওয়া হইয়াছিল, সেখানে বেশ আছে। তাহার ঘা বেশ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে সে তাহার বাপের সংবাদ পাই-বার জন্য বড় ব্যস্ত। হায়রে মায়া, যে বাপ সন্তানকে ফেলিয়া দিল, সন্তান সেই বাপের মায়ায় অশ্রুবিসর্জ্জন করে।

সোণামণি। বয়স ৮৫ বৎসর। হিন্দু, নিবাস বরিসাল জেলায় সোরকুল। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আলিপুরের রাস্তায় পড়িয়াছিল। তথাকার দয়াশীল মাজিষ্ট্রেট তাহাকে লোক দিয়া গাড়ী করিয়া দাসাশ্রমে প্রেরণ করেন। এই বৃদ্ধার ভয়ানক উদরাময় পীড়াহয়। তাহাকে কিছুতেই ঔষধ খাওয়ান যাইত না, অথবা ভাত না দিলে সে কিছুতেই থাকিতে চাহিলনা। আমরা বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া তাহাকে অবশেষে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়াছি।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী জ্যৈষ্ঠ ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস জুন।০, বাবু নন্দকুমার দত্ত জুন।০, বাবু পিয়ারীমোহন ভড় জুন।০, A lady C/o Babu Sreenath Das জুন ১৲, বাবু গৌরীশঙ্কর দে জুন ॥০, বাবু শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এপ্রেল হইতে জুন ৸০, বাবু যদুনাথ বরাট জুলাই ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র বড়াল জুন ১৲, বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র জুন।০, বাবু তেজচন্দ্র বসু জুন ॥০, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জুন ১৲, N. K. Bose Esqr. জুন ১৲, বাবু শ্যামাদাস কবিভূষণ জুন, ॥০, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মে হইতে জুলাই ৸০, ৪।২ নং ছকুখানসামা মেস জুন জুলাই ৸০, বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জুন।০, বাবু রামচরণ মিত্র জুন ১৲, বাবু নন্দলাল দত্ত, মে হইতে জুলাই ৩৲, বাবু করুণাদাস বসু, জুলাই।০, বাবু কুঞ্জবিহারী রায় মে ॥০, ৬৮।১ নং বেচু চাটুর্জ্জির ষ্ট্রীট জুন।০, বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, জুন ॥০, District Charitable Society for 6 Calcutta inmates ১৮৲, বাবু ভূতনাথ ঘোষ জুন।০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বৈশাখ ১৲ বাবু প্রমথনাথ দাস, এপ্রেল হইতে জুন ৬৲ বাবু হরিপদ ঘোষাল, জুলাই।০ বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় জুলাই ॥০, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী জুলাই ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র জুলাই ১৲, বাবু পশুপতিনাথ বসু জুন ১৲, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা, শ্রাবণ ॥০, বাবু অভয়চন্দ্র মল্লিক জুলাই ॥০, বাবু কেদারনাথ ঘোষ জুন।০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু, জুলাই ১৲, ডাঃ চুনিলাল বসু জুলাই ১৲, বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জুলাই ১৲।

এককালীন দান।

বাবু গৌরীলাল রায় কাকিনিয়া ১৲, বাবু ইন্দুভূষণ রায়, পড়িয়া পাওয়া ৵০, শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ, আশ্রের জন্য ১৲, বাবু শীতলদাস রায় ১৲, বাবু চন্দ্রকান্ত গুহ মৌলীক ॥০, বাবু রসিকলাল পাল ১৲, বাবু রজনীকান্ত ঘোষ ॥০, বাবু কৃষ্ণনাথ বসু।০, বাবু চন্দ্রভূষণ রায়।০, বাবু চারুচন্দ্র সরকার।০, বাবু কান্তিভূষণ মিত্র।০, বাবু রামচন্দ্র ভাদুড়ী।০, বাবু কেদারনাথ ঘটক।০, বাবু বঙ্কবিহারী কর্ম্মকার।০, বাবু উমেশচন্দ্র সমাদ্দার।০, বাবু গতিনাথ সরকার।০, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ কাঞ্জিলাল।০, বাবু বিপিনবিহারী সেন।০, বাবু অমৃতলাল কর।০, বাবু কালিকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।০, বাবু কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় /০, বাবু গতিনাথ মৈত্র।০, বাবু শশীভূষণ ঘোষাল।০, বাবু লোকনাথ ঘোষ।০, বাবু লালবিহারী বসু।০, বাবু দুর্গাদাস ভাদুড়ী।০, কজনদ্দি বিশ্বাস।০, বাবু সন্তোষচন্দ্র রায়।০, বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র।০, বাবু মহিমাচন্দ্র দত্ত।০, বাবু তারিণীচরণ মৌলীক ১৲, বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।০, বাবু পঞ্চানন মৌলিক।০, বাবু সত্যচরণ বসু।০, বাবু পরেশনাথ মজুমদার /০, বাবু ইন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার /০, কুটির দেওয়ান ৵০, সেকেন্দার চোকীদার ১০ দাসাশ্রমের হিতৈষী ভদ্রলোক ॥০, পাড়য়া যাওয়া ১০, বাবু শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৵০, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় /০, বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত।০, বাবু গৌরহরি সাহা /০, বাবু আদ্যনাথ সাহা /০, বাবু চুনিলাল আগরওয়ালা।০, বাবু জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় /০, বাবু কেদারনাথ রায়।০, বাবু গদাধরকুণ্ডু ৵০, বাবু নকড়ি ঘোষ ৵০, বাবু প্রসন্নকুমার প্রামাণিক ৸০, বাবু ক্ষুদিরাম ধর।৵০, বাবু যদুনাথ কর্ম্মকার।০, বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।০, বাবু রামলাল সরকার ৵০, বাবু হীরালাল পান।০, কুমুদকুমারনা ১০, শ্রীমতী বিধুবর্ণী দাস্যা ১০, মুনসী কারাও খাঁ ১৲, বাবু বনচারী প্রামাণক ১৲, বাবু পূর্ণচন্দ্র মৌলীক ॥০, বাবু হীরালাল মৌলীক ৵০, বাবু গোপাল সাহাজী ॥০, বাবু শ্রীরামচন্দ্র প্রামাণিক।০, বাবু দীননাথ কুরি।০, বাবু কেশবলাল কুরি।০, বাবু রামচরণ কুরি ৵০, বাবু হরিনাথ মজুমদার।০, বাবু রতিকান্ত চক্রবর্ত্তী ৵০, বাবু প্রাণনাথ সর্দ্দার /০, বাবু গোপীনাথ মণ্ডল /০, বাবু হরিনাথ মণ্ডল /০, বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র সর্দ্দার /০, বাবু কালিচরণ বিশ্বাস ৵০, বাবু ভীমচন্দ্র সর্দ্দার ৫০, শ্রীমতী সুশীলা বসু মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, বাবু চারুচন্দ্র গুপ্ত, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৲, বাবু সারদাকান্ত সেন ১৲, বাবু বিহারীলাল ঘোষ ১৲, ১৭ নং কানাইলাল ধরের মেস্ /০, বাবু শশীভূষণ ঘোষ ১৲, ২১ নং পটুয়াটোলা

মেস্ ।•, Abdul Rahim Esqr. ২৲, মৌলভী সিরাজউল ইস্‌লাম বাহাদুর ৫৲, ৪ নং ছকু খানসামা মেস্ ॥•, ১০৭ নং ওল্ডবৈঠকখানা মেস্ ৷০, ৬৭ নং ওলড্‌বৈঠকখানা মেস ৷১৫, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ।৶০ বাবু ক্ষেত্রগোপাল সরকার ৷০, বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু ১৲, বাবু নিমাইচরণ ঘোষ ১৲, শ্রীমতী দেবী চৌধুরাণী ॥•, ১২৬নং ওল্‌ডবৈঠকখানা মেস॥•, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।•, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার ২৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ১॥•, ৬৫ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট মেস্ ।•, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু হেমন্তকুমার পাল ॥•, বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু ১৲, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল ।•, বাবু হেমেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ১০৲, Dr. U. Bannerjee ১৲, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৲, ১১৮ নং ওল্‌ডবৈঠকখানা মেস্ ৷০, শ্রীমতী সৌদামিনী ঘোষ২৲, বাবু ললিতকুমার গুহ ১৲, এক জন শুভাকাঙ্ক্ষী ২৲, ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাসার বালকগণ ১৶০, বাবু ভূতনাথ ঘোষ ৲১৫, ২নং সরকার সেন মেস্ ॥• বাবু অক্ষয়কুমার দাস গুপ্ত ॥•, বাবু সুরেন্দ্রকুমার সেন ।•, বাবু গোরাচাঁদ দাস বরিশাল ২৲, ৮৫ নং হ্যারিসন রোড মেসের জিনিস বিক্রয় ৩৲ বাবু শরৎচন্দ্র মজুমদারি কন্যার বিবাহ ১৲ শ্রীমতী নিতম্বিনী দেবী ।•, বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ৫৲, বাবু পরেশনাথ সেন ১৲, বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ১৲, জনৈক দাসাশ্রমের বন্ধু মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে মাঃ নবদ্বীপচন্দ্র দাস ৪৲, বাবু বিনোদবিহারী পাল ১৲, বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ১৲, A friend ৶০, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র বসু ৶০, বাবু প্রিয়নাথ রায় ॥•, বাবু রামচন্দ্র রায় ।•, বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ ১৲, ৪।৩ ছকুখানসামা মেস্ ।•, ৩৮।৪ সুকীয়াষ্ট্রীট মেস্ ।•, বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ১৲, বাবু কালিচরণ সোম ১৲, বাবু কুমুদনাথ মজুমদার ৪৲, A sympathiser of Chinipothy ২৲, বাবু শ্যামাচরণ হাজরা ১৲, বাবু শিশির কুমার ঘোষাল ।৶০, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার ৫৲, ১০ নং পটলডাঙ্গা মেস ॥•, বাবু জগদীশচন্দ্র সেন গুপ্ত ॥•, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু ।•, বাবু বনবিহারী ঘোষ ।•, বাবু অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৶০, বাবু শশীকুমার সেন ।৶০, বাবু শরৎকুমার বসু ।৶০, বাবু ইন্দুভূষণ মুস্তফি ।৶০, ৮৫ নং হ্যারিসন রোড মেস্ ১৲, বাবু ব্রজলাল বসু ৶০, ৫৮ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট মেস ।•, ২২ নং রাধানাথ মল্লিক লেন মেস ॥০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেট ১৲, ৯নং পঞ্চানন তলা মেস ৶০, বাবু প্রভাতচন্দ্র সিংহ ২৲, ৭নং কাশিঘোষের মেস ৲৫, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল ।•, বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৲, Mrs. A. M. Bose ৫৲, Mrs. Nilratan Sirkar ২৲, বাবু যদুনাথ ঘোষ ২৲, একজন দাসাশ্রমের বন্ধু ২০৲, বাবু সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী ১৲, জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা ১৫টা গ্রাসের মূল্য বাবৎ ৪৲, বাবু সতীশচন্দ্র সিংহ ১৲, বাবু নরেশচন্দ্র মজুমদার স্বর্গীয়া স্ত্রীর স্মরণার্থ ১৲, বাবু সতীশচন্দ্র রায় ১৲, বাবু নরেন্দ্রকুমার বসু ১৲, বাবু রমেশচন্দ্র হাতী /০, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৶০ বাবু বিহারীলাল দে, জুলাই ॥•, বাবু কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ।/০।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

পুস্তক বিক্রয় ৩॥•, বাবু বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১২।৶১০, দাসীর সাহায্য ২৲, মোট ১৭৸/১০।

বস্ত্রাদি।

বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, গঞ্জি ১, সার্ট ১, কোট ১, জ্যাকেট ৪, কম্‌ফর্টার ১, চাদর ২। বাবু নির্ম্মলচন্দ্র বসু মিঠাকুমড়া ২।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

মাসিক চাঁদা ৫০॥•, এককালীন দান, ১৫১।•, অন্যান্য প্রকারে আয় ১৭৸/১০, গতমাসের হস্তেস্থিত ৫৸/১০, মোট আয় ২২৫॥/০।

ব্যয়।

খাই খরচ ৬৪।৶১৫, রাঁধুনী ও চাকর ১০৸০, মেহতর ৮।৶৯, বাটিভাড়া ৫০৲, কর্ম্মচারীর

বেতন ৩৬৲, রোগী আনার গাড়ীভাড়া ১৩৶/১০, দুগ্ধ ৪৸৶/১৫, ধোপা ২।০, আলোনিত ১৻১৫, গাড়ীভাড়া অন্যান্য ৩৷৶/১৫ আদায় খরচ ১৯।/১০, বিবিধ ১।/৫, ঔষধ ।৶০ আসবাব ১।১০ মোট ব্যয় ২১৭।০।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ২২৫।/০, পূর্ব্বমাসের দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তেস্থিত ৩/১২॥, মোট ২২৮॥৶/১২॥ মোটখরচ ২১৭॥০, দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষের বর্ত্তমান মাসের হস্তেস্থিত ৫৸৶১২৷, মোট খরচ ২২৩৷৶/১২॥, মোট হস্তেস্থিত ৫৶০।

বিশেষ ধন্যবাদ।

বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত তাঁহার পুত্রের শুভবিবাহ উপলক্ষে ১০৲ দানের জন্য আমরা বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

একজন দাসাশ্রমের পুরাতন বন্ধু মাসকাবারে আমাদের ২০৲ বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে শুনিবামাত্র ২০৲ এককালীন প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ চিন্তার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আমরা অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটির নেটিভ সেক্সনের সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র সি, এস, বিশেষ চেষ্টা করিয়া ছয় জন কলিকাতাস্থ আতুরের মাসিক ৩৲ হিঃ ১৮৲ সাহায্য মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা উক্ত সোসাইটিকে এবং উক্ত মহাত্মাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দাসাশ্রমের বিশেষ অভাবের জন্য আমরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি দানশীল মহাত্মা এবং দানশীলা মহিলাগণ আমাদের অভাব ত্বরায় দূর করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন।

প্লেট অথবা থালা ১৫, বাটি ২০, বড় বাটী বা ছোট গামলা ৪, পট ১০, পিকদানি ১০, জল গরমের কেটলি ১, লেপ, কাঁথা, কাঁচি, অয়েল ক্লথ, চামচ, বড় ছুরি ১, হারিকেন ২, ওয়াল ল্যাম্প ৪।

টাঙ্গাইলের একজন মুসলমান মহিলা দয়া করিয়া আমাদের গ্লাসের সকল অভাব দূর করিয়াছেন। হাইকোর্টের উকিল বাবু দুর্গামোহন দাস এবং বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বিশেষ দয়া করিয়া আমাদের আপাততঃ কাপড়ের অভাব একেবারে দূর করিয়াছেন। কিন্তু থালার অভাবে রোগীদিগকে পাতে ভাত দিতে হইতেছে। বড়বাটি ও গামলার অভাবে ভাত ব্যঞ্জন পরিবেশনের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

পূজার ছুটিতে অনেকের ঠিকানা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হয় বলিয়া, বৎসর বৎসর দুই মাসের কাগজ একত্রে বাহির হয়। তদনুসারে এ বৎসরও সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের অর্দ্ধেক আগামী মাসে বাহির হইবে।

দাসী

একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত।

আমি একদিন রাত্রে আহারের পর রাস্তার ধারে বারান্দায় ঈজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় আল্‌বোলার নলটি মুখে দিয়া ঢুলিতেছিলাম। দারুণ গ্রীষ্ম-কাল, কিন্তু সে দিন সন্ধ্যা হইতে ঘণ্টা দুই বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে কিছু ঠাণ্ডা ছিল। পল্লীগ্রাম,—অধিকরাত্রি হইবার বহুপূর্ব্বেই পথে লোক-চলাচল বন্ধ হইয়াছে। হালদারদের বাগানের ভিতর একটা নারিকেল গাছে দুইটা পেচক বাসা করিত, তাহারাই মধ্যে মধ্যে ঝঙ্কার দিতেছিল, আর সব নিস্তব্ধ। ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ যেন মনে হইল, আমার মুখনলটা আস্তে আস্তে বলিতেছে—"বলি শুনিতেছ? এত ত লেখ, আমার জীবনের ইতিহাসটা লিখিয়া ছাপাইয়া দাও না; বেশ একটা গল্প হইবে।" আমি ঘুমের ঘোরে বলিলাম,—"তুমি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পার না—অচেতন পদার্থ, তোমার আবার ইতি-হাস কি?" সে বলিল,—"আমি এখনই অচল হইয়াছি, চিরদিনই কি এমন ছিলাম? যখন জীবিত ছিলাম, তখন আমি যেমন দ্রুত ও নিয়ত একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতাম, তেমন তোমার জীবজগতের কেহ পারে না কি?" আমি বলিলাম, "ভাল, তুমি না হয় সচলই ছিলে, তা বলিয়া তোমার ইতিহাস আবার কি?" মুখনল এক মুখ হাসিয়া উত্তর করিল,—"বৃথা এতকাল তোমায় ধূমপান করাইয়াছি! মানুষেরই বুঝি সুখ দুঃখ, বিপদ্‌-সম্পদ্, সোণারূপার বুঝি সে সব কিছুই নাই? তবে আমার জীবনের কাহিনী শ্রবণ কর, তাহার পর বিচার করিয়ো।" বলিয়া আরম্ভ করিল:—

আমার জন্মদিনটা ঠিক মনে নাই, বৎসরটা গায়ে লেখাছিল, দেখিয়া-ছিলে কি? আশ্বিনমাস—শীঘ্রই পূজার বন্দ হইবে বলিয়া টাঁকশালে কাযের ভারি ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। দিবারাত্রি যন্ত্রের ঘট্‌ঘট্ শব্দে মনে হইত, চিরবধির হইয়া জন্মিতাম সেই ভাল ছিল। আমার জন্মের তিন

চারি দিন পরেই বড়বাজারের এক মাড়য়ারি মহাজন বড় বড় থলি করিয়া দশ হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়া গেল—আমাকেও সেই সঙ্গে যাইতে হইল। আমি তখন সংসারের ব্যাপার কিছুই জানি না; মনে করিলাম, ভারি মহাজনের দোকানে যাইতেছি, দোকানে বসিয়া কত কি দেখিতে পাইব, শুনিতে পাইব, কত আমোদ হইবে। ও মহাশয়, গাড়ি হইতে নামিয়া দুষ্ট মহাজন দুইজন ভৃত্যের সাহায্যে থলিগুলা একটা অন্ধ-কূপের মত ঘরে লইয়া গিয়া মেঝেতে দমাদ্দম্ করিয়া ফেলিল, তাহার পর ক্যাঁচকড়াৎ করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহার পর ঘটাং করিয়া আর একটা শব্দ হইল, তাহার পর বলিল, "লে আও।" তাহার পর এক এক করিয়া থলিগুলার নিম্নকর্ণ দুইটা ধরিয়া লোহার সিন্দুকে হুড়্ হুড়্ করিয়া ঢালিতে লাগিল। আমাদের শরীরটা শৈশব হইতেই কিছু কঠিন, নচেৎ সেই পতনেই, বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাঙ্কে রাজা বা রাণীর ন্যায়, মৃত্যু অনি-বার্য্য হইত।

মহাজন যখন সিন্দুক বন্ধ করিয়া, চাবি দিয়া, চলিয়া গেল, তখন আমরা সকলে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। সকলেই ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জানি না। বাঙ্গালীর ঘরের কচিমেয়ে শ্বশুরবাড়ী আসিলে তাহার যে কি মনে হয়, তাহা অন্তরে অন্তরে বেশ অনুভব করিতে পারিলাম। যাহা হউক, সকলে মিলিয়া নীরবে আপনাপন অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, এমন সময় মহাজন আসিয়া সিন্দুক খুলিল। একমুঠা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া দেখিল, আরও তিনটা লইল, লইয়া সিন্দুক বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তখন পূজার বাজার, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা বারোটা অবধি দোকানে ক্রেতাগণের অবিশ্রাম কোলাহল শুনিতে পাইতাম। অধিকাংশ লোকই নোট্ লইয়া আসিত, তাহাদের বাকী টাকা ফিরাইয়া দিবার সময় সিন্দুক খোলা হইতে লাগিল, এবং মুঠা মুঠা টাকা বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের আশা হইল, এ অন্ধ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ হইবে,—শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক। দুই দিন পরে আমি বাহির হইলাম। পল্লীবাসী এক বৃদ্ধ তাঁহার পুত্রবধূর জন্য একখানি বোম্বাই শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিলেন, পঞ্চাশ টাকার একখানি নোট ছিল, ফেরৎ টাকার সঙ্গে আমি তাঁহার হাতে গিয়া পড়িলাম।

কিন্তু বৃদ্ধের নিকট আমাকে বহুক্ষণ থাকিতে হইল না। বড়বাজার

ছাড়াইবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি কাঁচি দিয়া তাঁহার পিরাণের পকেট ছিন্ন করিল এবং সেই সুদ্ধ আমাদের লইয়া সরিয়া পড়িল। বোধ করি, বাসায় ফিরিয়া তিনি আমাদের বিরহে অনেক অশ্রুপাত হা হুতাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কোনই সংবাদ পাই নাই। আমরা দুর্গন্ধময় গলির ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া একটি খোলার চালের ঘরে নীত হইলাম এবং সেখানে কিছুদিন রহিলাম। সমস্ত দিন ঘরে কেহ থাকিত না; সন্ধ্যা ৮টার পরে সহসা বহুলোকের সমাগম হইত, বোতল বোতল মদ আসিত, গান বাজনা হইত, অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প চলিত—তাহারা সমস্ত দিন কেমন করিয়া কৌশলে লোককে ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারই কাহিনী তাহারা একভাগ সত্যের সহিত তিনভাগ মিথ্যা মিলাইয়া বলিত, শুনিয়া বিস্ময়ে আমি স্তম্ভিত হইয়া থাকিতাম। একদিন টাকা ভাগ হইল, আমি যাহার ভাগে পড়িলাম সে আমাকে লইয়া যাইতে যাইতে পথে এক দোকানে আমাকে দিয়া এক যোড়া জুতা কিনিয়া লইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে ভাড়ার টাকার মধ্যে আমি জুতা-বিক্রেতার বাড়ীওয়ালার হাতে গিয়া পড়িলাম।

যাঁহার বাড়ী, তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, নিজে চাকরি করেন, দুইটি পুত্র চাকরি করে, আর দুইটি বিবাহিতা কন্যা, তাহার মধ্যে ছোটটি পিত্রালয়ে ছিল, সেই আমাকে অধিকার করিল। বাড়ীভাড়া আদায় করিয়া আসিয়া বাবুটি টাকাগুলি বাক্সে রাখিবার সময় দেখিলেন, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা নূতন ও উজ্জ্বল। মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন,—"চারু, একটা জিনিষ নিবি?"

"কি বাবা!"

"এই দেখ," বলিয়া তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে আমাকে ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ঘুরাইতে লাগিলেন। মেয়ে বলিল,—"দাও বাবা, দাও বাবা, দাও!"

"রোজ কিন্তু আমার পাকা চুল তুলে দিতে হবে।"

"তা দোব।"

"তবে এই নে"—মেয়েটি আমাকে পাইয়া ভারি খুসী—বারম্বার উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে লাগিল, দেখা শেষ হইলে সিন্দূরের কৌটার ভিতর আমাকে রাখিয়া দিল।

তাহার সিন্দূরের কৌটার ভিতর আমাকে অনেক মাস থাকিতে হইয়া-

ছিল। মধ্যে মধ্যে সেই নোলকপরা ছোট মেয়েটি আমাকে বাহির করিয়া দেখিত, আছি কি নাই। আমি কি পালাই? পা ত নাই, সুতরাং একথা বলা আমার সাজে না; কিন্তু যদি থাকিত, তবে শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি পলাইতাম না। তত সুখ, তত যত্ন আর কোথায় পাইতাম? আমি তখন দেখিতে কি সুন্দরই হইয়াছিলাম; যন্ত্র হইতে সদ্য বাহির হইয়াছি; ঝক্‌মক্ করিতেছি; দেহে স্থানে স্থানে সিন্দূর মাখা; এমন অতি অল্প টাকারই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

একদিন বাড়ীতে কোলাহল শুনিতে পাইলাম,—"জামাই এসেছে, জামাই এসেছে।" দুদিন খুব লোকজন, হাস্যপরিহাসে বাড়ী গুলজার্ রহিল; তাহার পর দিন ক্রন্দন; মেয়েটিও ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। জামাইটার উপর ভারি রাগ হইল; মনে হইতে লাগিল, যদি আমি উহার হইতাম, তবে এই দণ্ডেই হারাইয়া যাইতাম। যেন হারাইয়া যাওয়াটা সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তাধীন! তোমার পাঠকেরা বোধ হয় এ কথায় কেহ আপত্তি করিবেন না; তাঁহারা কি শতবার সহস্রবার এমন ইচ্ছা করেন নাই যাহা তাঁহাদের পক্ষে এমনই অসম্ভব? সে কথা যাক্। ঘোড়ার গাড়ী, তাহার পর রেলের গাড়ী, তাহার পর ষ্টীমারে চড়িয়া আমি অনেকদূর গেলাম; ক্রমে মেয়েটির শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলাম। বিবাহের পর বধূ এই প্রথম "ঘরবসত" করিতে আসিল। দেখিলাম, তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী দরিদ্র; ছেলেটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করে, গুটিকত টাকা বেতন পায় তাহাতেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসারটি চলিয়া যায়। ছেলের মা-টি রুগ্না, মাসের মধ্যে পনেরো দিন তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। চারু আসিয়া, রন্ধনশালায় তাঁহার "প্রবেশ নিষেধ" করিল। যে চারু কলিকাতায় অট্টালিকায় বাস করিত, মায়ের "কোলপোঁছা" মেয়েটি, কত আদরের, তিনি কখনও তাহাকে একটি কাজ করিতে দেন নাই, সেই চারু সকালে উঠিয়াই চৌকাঠে জল দিতে লাগিল, ঘর বারান্দা অঙ্গন পরিষ্কার করিতে লাগিল. দেখিয়া আমার যেমন দুঃখ হইত, তেমনই আহ্লাদও হইত। একটি ঠিকা ঝি ছিল, সেই বাসন মাজিয়া কাপড় কাচিয়া দিয়া যাইত; চারু ধুচুনি করিয়া পুকুরের ঘাট হইতে চা'ল ধুইয়া আনিয়া, তরকারি কুটিয়া, মসলা বাঁটিয়া, দশটার সময় স্বামীর "স্কুলের ভাত" প্রস্তুত করিয়া দিত। চারু তাহাদের পরিবারে আসিয়া যত শোভা করিল, তত কাজ করিল, তত সহও করিল। তাহার স্বামীটিও

দেখিলাম বেশ মানুষ, অর্দ্ধরাত্রি অবধি তাহাদের কত গল্প হইত, কত হাসিখুসি হইত, কোনও কোনও দিন প্রদীপ লইয়া দুজনে তাস খেলিতে বসিত। কিন্তু তাহাদের এ সুখ অধিক দিন রহিল না। তাহার স্বামী জ্বরে পড়িল, তিন মাস মাহিনা পাইল না; সংসারে দীনদশা ঘিরিয়া আসিল। পিতার নিকট চারু সাহায্য প্রার্থনা করে নাই—নিজের যতগুলি টাকা ছিল, সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছে; শেষে একদিন বাক্স খুলিয়া আমার থাকিবার কৌটাটি বাহির করিল। আমাকে লইয়া আমার গায়ের সিন্দূর বস্ত্রে ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিল, তার পর জলে ধুইয়া ফেলিল, যখন দেখিল কোথাও সিন্দূরের আর চিহ্নমাত্রও নাই, তখন দাসীহস্তে দিয়া চাউল কিনিতে পাঠাইল। একটু দুঃখ করিল না, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল না, অকাতর-চিত্তে আমাকে বিদায় দিল। তাহা দেখিয়া প্রথমটা আমি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছিলাম, পরে ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের জাতিটাই বড় খারাপ; আমাদের যে অধিক ভালবাসে, সেই নিন্দার পাত্র হয়। চারু যদি আমায় বিদায় দিবার সময় অশ্রুপাত করিত, তবে সে কার্য্যটা নিতান্ত অচারু হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমি সে রাত্রি মুদির তহবিল বাক্সে যাপন করিলাম।

পরদিন প্রভাতে বাক্সে বসিয়া বেচাকেনা, দরদস্তুর, তাগাদা স্তোক-বাক্যের বিচিত্র কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। যত বেলা হইতে লাগিল, ততই খরিদ্দার বাড়িতে লাগিল। বেলা ৯টার পর ক্রমে কমিয়া আসিল, ঘণ্টা দুই পরে দোকান একেবারে নিস্তব্ধ। কেবল মধ্যে মধ্যে পথে দুই একখানা গোরুর গাড়ীর চাকার কঁ্যাচকোচ এবং চালকের জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বেলা যখন দ্বিপ্রহর, তখন মাথায় গামছা বাঁধিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে মুদির ছেলে আসিয়া বলিল, "বাবা, খেয়ে আসগে, আমি দোকান আগ্‌লুই।" মুদি তহবিল বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া চাবির গোচ্ছা ঘুন্‌সিতে বাঁধিয়া লইল; ছেলেকে বলিল, "দেখিস্ যেন খদ্দের ঠকিয়ে না যায়—আর বেশী টাকার জিনিস চায় ত বলিস, বসো, তামুক খাও, বাবা এল বলে।" মুদি চলিয়া গেল; অল্পক্ষণ পরে গুন্ গুন্ করিয়া মুদিপুত্র গান ধরিল—

প্রাণপতি করি এই মিনতি,
আমার জীবন রামকে বনে দি-ই-ই-ওনা।

একবার পথে নামিয়া দেখিয়া আসিল, বাবা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। তখন সে আপনার ঘুন্‌সি হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া তহবিল বাক্সটি খুলিয়া ফেলিল। তৈলোজ্জ্বল কৃষ্ণমুখমণ্ডলে শুভ্রদন্তপংক্তির শোভা বিস্তার করিয়া বলিল—"এঃ, আজ আর মেলা নেই; বেশী নিলে বাবা শালা টপ্‌ করে ধরে ফেল্‌বে"—বলিয়া আমাকে তুলিয়া লইল, আর একটা আধুলি লইল, লইয়া কোঁচার খুঁটে বাঁধিল, বাঁধিয়া সমস্তটা পেট কাপড়ে গুঁজিয়া রাখিল। বাক্স বন্ধ করিয়া, তখন আবার পূর্ব্বমত ঘাড় কাঁপাইয়া তাহার সঙ্গীতচর্চ্চা চলিতে লাগিল—

জীবন রামকে সঙ্গে করে, না হয় খাব ভিক্ষা করে,
অযোধ্যা পুরে।
জীবন রামকে বনে দিলে,
জীবনে জীবন রবে না—আ-আ-আ। ইত্যাদি।

তাহার আচরণ দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম; ভাবিলাম, দেখ একবার, কলিকালে বাপ বেটায় বিশ্বাস নাই, অন্য লোকের মধ্যে থাকিবে কি করিয়া? সেই দিন বৈকালে তাহার পেটকাপড় হইতে একটি ময়লা ছিটের থলির মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া একটি ভাঙ্গা টিনের পেটরায় বন্ধ হইলাম। এ অবস্থায় আমায় মাস দুই থাকিতে হইয়াছিল।

এক দিন শুনিলাম, মুদিপুত্র মামার বাড়ী যাইতেছে। যাহা আশা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল; যাত্রা করিবার সময় আমার থলিটি চুপে চুপে বাহির করিয়া লইয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে পিতৃদত্ত সদুপায়ে অর্জ্জিত আরও কয়েকটি টাকা থলির ভিতর রাখিয়া দিল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, কৃষাণ, রাস্তামেরামতকারী কন্‌ট্রাক্টর মিস্ত্রী প্রভৃতি বহুলোকের নিকট হইতে কলিকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে, কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখন গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে, সহচারী লোকদিগের নাম ধাম, গন্তব্যস্থান, পিতৃপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে সহস্র অনর্থক প্রশ্ন করিতে করিতে, বগলে ছাতা, বামহস্তে জুতা ও দক্ষিণে পুঁটুলি লইয়া অবশেষে ষ্টেশনে উত্তীর্ণ হইল। টিকিট কিনিবার সময় আমাকে ছাড়িয়া দিল, আমি সেই দুর্গন্ধময় বস্ত্রকারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম।

টিকিট বাবু আমাকে পাইবামাত্র একবার ঠং করিয়া টেবিলে আছাড় দিলেন—আমি ভাবিলাম, "বাবা, বহুদিন হইল মন্দ নয়, এইরূপে বারকতক

সম্ভাবিত হইলেই ত গিয়াছি।" যতক্ষণ টিকিট বিক্রয় চলিতে লাগিল, ততক্ষণ আমি চিৎ হইয়া টেবিলের উপরই পড়িয়া রহিলাম। আমার উপরে, পার্শ্বে, ঝন্‌ঝন্ করিয়া আরও টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, পয়সা আসিয়া পড়িতে লাগিল। বিক্রয় শেষ হইলে, বাবু ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের মুদ্রা আলাদা করিয়া গণিয়া সাজাইয়া ক্যাশ মিলাইতে লাগিলেন। শেষ আলমারি বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে পুনরায় টিকিটের ঘণ্টা বাজিল। আবার আলমারি খুলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে টিকিটবাবুর একটি কার্য্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আলমারির একটি কোণে একটি টাকা একাকী পড়িয়া ছিল; বেশ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিলাম, বুঝিতে পারিলাম সেটি অভিজাত বংশীয় নহে,—অর্থাৎ তোমরা যাহাকে বল মেকি টাকা। টিকিট বাবু এক ব্যক্তির নিকট টাকা লইয়া, সাঁ করিয়া সেই মেকি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে ফিরিয়া দিলেন, বলিলেন, বদ্‌লাইয়া দাও, এটা চলিবে না। সে বেচারী তাঁহার জুয়াচুরি ধরিতে পারিল না; বলিল, "দোহাই হুজুর, আর আমার একটিও টাকা নাই, এই দ্যাখেন আমার কাপড় চোপড়। যেমন করে হোক্, দ্যান আমায় নির্ব্বাহ করে কর্ত্তা।" বাবু রূঢ়স্বরে বলিলেন—"একি কর্ত্তার বাবার ঘরের কথা? কি ক'রে তোমায় নির্ব্বাহ ক'রে দোব? যখন আমার মাইনে থেকে কেটে নেবে তখন কোন বেটাকে ধর্‌বো?" লোকটা যত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, বাবু মহাশয় ততই সপ্তমে চড়িতে লাগিলেন। তিনি অনায়াসেই সেই টাকা পরে অন্য কাহারও স্কন্ধে চালাইতে পারিতেন, কিন্তু কি জানি কেন তিনি রণে ভঙ্গ দিতে চাহিলেন না। বাবু অবশেষে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার বাকী টাকা পয়সা গুলি মুঠা করিয়া হুহুঙ্কারের সহিত সেই গরীবের গায়ে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন; সে ব্যক্তির আর যাওয়া হইল না। আহা, আবার বোধ হয় তাহাকে পাঁচ সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া একটি ভাল টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইয়াছিল।

সেই দিন রাত্রে ডাকগাড়ীর পূর্ব্বে এক সাহেব আসিয়া বোম্বাইর টিকিট চাহিলেন। নোট দিয়া তাঁহার যে টাকা ফিরিল, তাহার সহিত আমাকেও যাইতে হইল। আমি সুকোমল মনিব্যাগে বদ্ধ হইয়া সাহেবের পকেটে বাসা করিলাম। পথে যাইতে যাইতে কথায় বার্ত্তায় জানিতে পারিলাম, তিনি নূতন মাজিষ্ট্রেট হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন,

সম্প্রতি ছুটি লইয়া পরিবার আনিতে যাইতেছেন। আমি মনে করিলাম, এই সুযোগে একবার বিলাতটা বেড়াইয়া আসা হইবে; আশায় উৎফুল্ল হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না; সাহেব জলরথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে যে হোটেলে পানাহার করিলেন, তথায় আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি হোটেলের ক্যাশবাক্সে এবং ক্যাশবাক্স হইতে আয়রণচেষ্টে স্থান প্রাপ্ত হইলাম।

আমি এই সময়ে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম,—"ওহে তোমার গল্প যে ক্রমশ "ডল" হইয়া পড়িতেছে; আমার পাঠকেরা যে বিরক্ত হইয়া উঠিবেন; তাহা ছাড়া তোমার জীবনের প্রতি ঘটনা এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর যে নিতান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে—সম্পাদক মহাশয় আমাকে লাঠি নিয়া তাড়া করিয়া আসিবেন। তুমি বরং তোমার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বলিয়া যাও।" মুখনল বলিল, —"বটে? আচ্ছা তাহাই হইবে। আর আমার জীবনের বেশী বাকীও নাই, কিন্তু আসল ঘটনাগুলিই বাকী রহিয়াছে। উঃ—আমি এত সহ্য করিয়াছি, এত সুখভোগ করিয়াছি যে তোমরা হইলে আতিশয্যে দম ফাটিয়া মরিয়া যাইতে। মন দিয়া শুন।"

হোটেলের আয়রণচেষ্টে প্রতিদিন টাকা যাহা জমা হয়, পর দিন সমস্ত ব্যাঙ্কে গিয়া পৌঁছে—কিন্তু আমাকে ব্যাঙ্ক যাইতে হইল না। হোটেল-সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রটি অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। সে সেইদিন বহু বন্ধু সমভি-ব্যাহারে দূরদেশে শিকার করিতে চলিল। পথখরচের জন্য একখানা নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা লইল, তাহার মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। সাহেবতনয়-গণ বোম্বাই ষ্টেশনে গাড়ী চড়িয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টার পর এক স্থানে অবতরণ করিল; ষ্টেশনের কিছু দূরে তাম্বু ফেলিল; তাহার পর হিপ্ হিপ্ হুররে নাদে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। দুম্দাম্ বন্দুকের আওয়াজ, বিজাতীয় চীৎকার, কখনও ধীরপদে গমন, কখনও ধাবন, কখনও লম্ফন, এইরূপ করিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সকলে তাম্বুতে ফিরিল। এই-রূপ সাহেবের পকেটে থাকিয়া প্রতিদিন শিকারে যাইতে লাগিলাম। একদিন একটা কৃষ্ণসারজাতীয় হরিণ সাহেবদের লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া একটা গভীর জঙ্গলে লুক্কায়িত হইল। সে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিতে সাহেবরা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাইল না। সেই স্থানে একটি

কাঠুরিয়াদের ছোট মেয়ে কাঁসার মল পরিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, সে বলিল,—"সাহেব লোক, আমি প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিতে পারি, আমার কি দিবে আগে বল।" আমার সাহেব, মনিব্যাগটি খুলিয়া আমাকে বাহির করিয়া মেয়েটিকে দেখাইলেন; দেখাইয়া মনিব্যাগটি, তৎপশ্চাৎ আমাকে খোলা অবস্থায় পকেটে ফেলিয়া দিলেন। মেয়েটি আগে আগে চলিল, সাহেবরা তাহার অনুগমন করিল; শেষে মেয়েটির দর্শিত পথে এক স্থানে খুব ঝুঁকিয়া দুই হাতে ডালপালা ঠেলিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। মেয়েটি তখন প্রতিশ্রুত পুরস্কার চাহিল; সাহেব বন্দুক উঁচাইয়া বিকৃত মোটাগলায় বলিলেন; "ব্যা—গো"। সে বেচারী সুবিধা নয় দেখিয়া সরিয়া পড়িল। সাহেবের এই আচরণ দেখিয়া আমার বড় লজ্জা হইতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই দুরাচারের কাছ হইতে হারাইয়া যাই; এবার আমার অভীষ্ট সফলও হইল, এবং আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কাল আরম্ভ হইল। সাহেবগণ হরিণের জন্য অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিল। যখন সন্ধ্যা হয় হয়, মোটা ঘাসগুলি বেশ দেখা যাইতেছে, সূক্ষ্মগুলি ভাল দেখা যাইতেছে না, তখন সাহেবরা এক অনতিউচ্চ প্রস্তরবেদীর উপর উঠিল, সেখানে খালের ধারে বন্যহংস চরিতেছিল। সাহেবরা তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিল। একটা বৃক্ষের স্থূলবক্রশাখার উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার সাহেব যখন নিশানা করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার বুকপকেট হইতে ঠুন্ করিয়া পড়িয়া গেলাম। সাহেব আমার পতনশব্দ বোধ হয় শুনিতে পাইলেন, কারণ তাঁহার মুখে একটা "ইণ্টর্জেক্সনে"র অস্ফুটধ্বনি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যেমন নিশানা করিতেছিলেন, তেমনি করিতে রহিলেন। আমি এই অবসরে পাথরের উপর দিয়া, ঘাসের উপর দিয়া, বালির উপর দিয়া, গড়াইয়া ঠিকরাইয়া একটা গাবভেরাণ্ডার ঝোপের পাশে গিয়া পড়িলাম। সাহেবের বন্দুক সে বার বিশ্বাস রাখিল, পাখীর ঝাঁক উড়িয়া গেল কিন্তু দুইটা পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। সাহেব মত্ত হইয়া সেইদিকে ছুটিলেন, আমার কথা আর খেয়াল হইল না।

সাহেবেরা চলিয়া গেল, আমি মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত বাতাসে পড়িয়া রহিলাম। আজ আমার জীবনের বড় শুভরাত্রি। এমন আরাম, এমন স্বাধীনতা জন্মের পর এই আমার প্রথম ঘটিল। সে রাত্রি অতি

আহ্লাদে আমি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতে লাগিল, দূরে কাছে ঝোপে ঝাপে বনপুষ্প ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার গন্ধ একপ্রকার নূতনতর, আমি বাক্সে বাক্সে আতর গোলাপ বিলাতী এসেন্স, বাগানে বাগানে গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধা, কত পুষ্পের আঘ্রাণ পাইয়াছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও পাই নাই—সে অতি অপূর্ব্ব।

আমি বলিলাম,—"ভুল; তোমার ওটি ভুল। সৃষ্টির আদিকালে বাগানের ফুলও বনে ফুটিত, কিন্তু যে সকল ফুলকে শোভায় সৌরভে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানুষ বিবেচনা করিল, তাহাদিগকেই তুলিয়া আনিয়া বাগান সাজাইল। বাগানের ফুল অপেক্ষা বনফুলকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া আধুনিক কবিদিগের একটা ফ্যাসান হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অবিচার।"

মুখনল বলিল,—"আমি ত আর কবি নহি, কোনও আধুনিক কাব্যও পাঠ করি নাই, তবে আমার সে গন্ধ এত ভাল লাগিয়াছিল কেন?"

আমি অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম,—"উহার ভিতর একটু মনস্তত্ত্বঘটিত জটিলতা আছে।" যখন তুমি আতর, এসেন্স, বেলা, গোলাপের গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুভব করিয়াছিলে, তখন তুমি পরাধীন। এখন তুমি স্বাধীন; তখন ভালও মন্দ লাগিবার কথা, এখন মন্দও সুধাবৎ লাগিবে। সেই শ্লোকটা জান না?"

মুখনল বলিল,—"থাম, থাম, অত বিদ্যা আমার নাই। আচ্ছা না হয় তোমার থিওরিই মানিয়া লইলাম। শুনিয়া যাও, বৃথা তর্ক করিয়া রসভঙ্গ করিও না। হাঁ, কি বলিতেছিলাম, চারিদিক্ হইতে ফুলের গন্ধ আসিতেছিল, আকাশে দুইটি একটি করিয়া শত সহস্র নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিল, জীবজন্তুর কোথাও আর কোনও চিহ্ন দেখা গেল না, কেবল অনেক রাত্রে একটা নেকড়ে বাঘ জল খাইতে আসিয়াছিল, তাহার পা লাগিয়া একটা প্রস্তর গড়াইয়া আমার অতি নিকট দিয়া নীচে গড়াইয়া গেল। রাত্রি গভীর হইল, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রখণ্ড ভাসিয়া উঠিল, শিশির পড়িতে লাগিল,—সে কি স্নিগ্ধ! প্রাণমন শীতল হইল; ভাবিলাম, এই ভারতবর্ষের সাম্রাজ্ঞীর মুখমণ্ডল-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া, কত কোটি কোটি আমার স্বজাতীয়গণ বিচরণ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কয়জন এমন করিয়া শিশির জলে স্নান করিতে পাইতেছে? সকলে আয়রণ চেষ্টে, না হয় কাঠের বাক্সে,—

না হয় চর্ম্মপেটকে বা রুমালে, নয় ত দেশী লোকের কাপড়ের কিম্বা চাদরের খুঁটে, ট্যাঁকে এবং অবস্থাবিশেষে কক্ষে, আবদ্ধ আছে, ভাল করিয়া নিশ্বাসও ফেলিতে পাইতেছে না। আমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে কোনও বৃহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই সুকৃতির বলে আমার এই সুখলাভ হইল। যদি কেহ লোকালয়ে পথে ঘাটে দৈবাৎ পড়িয়াও থাকে, তবে সেও আমার ন্যায় এমনি আরামে আছে বটে, কিন্তু সে তাহার কতক্ষণ? প্রভাত হইতে না হইতেই কোনও উষাচারী পথিক তাহাকে কবলিত করিয়া পকেটে ফেলিবে, আবার যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা! আর আমি দিনের পর-দিন, রাত্রির পর রাত্রি এই খানে পড়িয়া বিশুদ্ধতম বনবায়ু সেবন করিব, শিশিরে অঙ্গধাবন করিব, পাখীর গান শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়িব, মুখে প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া লাগিলে জাগিয়া উঠিব। আহা, যদি চলিতে পারিতাম, তবে ঐ স্ফটিকস্বচ্ছ ঝরণার জল একটু পান করিয়া আসিতাম, আর গোটা-কত ঐ ফুল তুলিয়া আনিয়া বিছাইয়া শয়ন করিতাম, আর ঐ কি একটা লাল টুক্‌টুকে ফল পাকিয়া রহিয়াছে, উহার রস দিয়া মুখটি একটু রাঙাইয়া লইতাম। বাসনার এইরূপ নিষ্ফল আবেগ প্রতিনিয়ত আমার বক্ষঃপঞ্জরে আঘাত করিত, তথাপি বড় সুখে ছিলাম। কিন্তু প্রতিদিন আমার উপরে ধূলিস্তর জমা হইতে লাগিল। দেখিলাম, ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি। একটু দুঃখ হইল, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। মাসের পর মাস চলিয়া গেল, আমি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া গেলাম। আর পাখীর গান শুনিতে পাই না, ফুলের গন্ধ পাই না, নবরৌদ্ররাগে রঞ্জিত প্রভাতগগনের শোভা দেখিতে পাই না, আমি যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিলাম। কতকাল পরে বলিতে পারি না, একদিন কিঞ্চিত শীতলতা অনুভব করিলাম। দেখিলাম, আমার দেহের আবরণমৃত্তিকা সিক্ত হইতেছে; ক্রমে তাহা গলিয়া ধৌত হইয়া গেল; আমার যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেখিলাম, পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশটা পূরিয়া গিয়াছে, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, আমার এমন সুখ-বোধ হইল যে, সে আর তুমি কি বুঝিবে? তোমরা বৃষ্টির সময় ছাতা, ওয়াটারপ্রুফ্ ব্যবহার কর, প্রকৃতিদত্ত একটা মহাসুখ হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া থাক, তোমাদের কথাই স্বতন্ত্র। আমি দেখিলাম, বনের সমস্ত গাছ-পালা উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, যেন কতদিনকার তৃষ্ণা আজ সাগ্রহে মিটাইতেছে। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক দিতে লাগিল; সেই

এক চমৎকার ব্যাপার, একবার করিয়া বিদ্যুৎ চমকে, আর আমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকি—যতক্ষণ মেঘ না ডাকিবে, ততক্ষণ নিশ্বাস ফেলিব না। সে একটা খেলামাত্র, তাহার কোনও বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল না। ক্রমে জল ছাড়িয়া গেল; পূর্ব্বদিকে রামধনু দেখা দিল; ক্রমে সন্ধ্যায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। বর্ষাকাল, প্রায়ই এইরূপ জল হইত; ক্রমে বর্ষা ছাড়িয়া শরৎ আসিল, হেমন্ত আসিল, আমি আবার ঢাকা পড়িয়া দুরন্ত শীত হইতে আত্মরক্ষা করিলাম। আবার বর্ষাকালে সহসা একদিন বাহির হইলাম। এইরূপ প্রতিবৎসর হইতে লাগিল; ক-বৎসর কাটিয়া গেল, তাহার কোনও হিসাব রাখিতে পারি নাই; একদিন আমার অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ডিটেক্‌টিভ্‌-পুলিশের এক দেশীয় কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে সেই বনে প্রবেশ করিয়া, যেখানে আমি পড়িয়াছিলাম তাহার অতি নিকট দিয়াই যাইতেছিলেন। যাই আমাকে দেখিতে পাওয়া, অমনি অশ্ব হইতে লম্ফ দান, এবং বাক্যব্যয়মাত্র না করিয়া আমাকে পকেটে গ্রহণ।

তুমি আমার জীবনচরিত সংক্ষেপে বলিতে বলিয়াছ; সুতরাং কেমন করিয়া আমি পুলিস্‌কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে পোষ্ট আফিসে, এবং তৎপর দিন সেভিংস্‌ব্যাঙ্কের টাকার সহিত স্কুলের হেডমাষ্টারের নিকট ও ক্রমে ক্রমে ফল বিক্রেতা, সাহেবের খানসামা, মৎস্য-বিক্রেতা, বস্ত্র বিক্রেতা, আয়কর কর্ম্মচারী, গভর্ণমেণ্ট ট্রেঝরি, এবং তথা হইতে বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া মিরজাপুরের এক শিবমন্দিরের পূজারীর হস্তে আসিয়া পড়িলাম, তাহার সবিস্তার বর্ণনায় আর প্রয়োজন নাই। পূজারী মহাশয় আমাকে ট্যাঁকে গুঁজিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, কম্পিত স্বরে উচ্চারণদুষ্ট সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন এবং বিরলকেশ সুমসৃণ মস্তক খানিতে সঘন করসঞ্চালন করিতে করিতে ডুবের পর ডুব দিতেছিলেন, হেনকালে তাঁহার নীবিবন্ধ শিথিল হইল, আমি তাঁহার ট্যাঁকচ্যুত হইয়া অতি কোমল মৃত্তিকা শয়ন লাভ করিলাম। স্নানান্তে তীরে উঠিলে তিনি জানিতে পারিলেন আমি হারাইয়াছি। আবার জলে নামিয়া দুই দণ্ড ধরিয়া ডুব পাড়িয়া পাড়িয়া অনেক ব্যর্থ অন্বেষণ করিলেন; আমার আশে পাশে তাঁহার হস্ত আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু আমি যেখানকার সেই খানেই রহিলাম। স্রোতে স্রোতে চুল পরিমাণ সরিয়া সরিয়া সমস্ত দিবা-

রাত্রে যেখানে পড়িয়াছিলাম সেখান হইতে দুই হস্ত পরিমিত দূরে গিয়া পড়িলাম। সেখানে মগ্ন জল, সুতরাং পরদিন স্নানের বেলা কেহই সেখানে আসিল না। আমি জলের ভিতর দিয়া জলতলবিহারী প্রাণীদের আহার ক্রীড়া যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত উদ্যম দেখিতে লাগিলাম। সে রাজ্য সম্পূর্ণ অরাজক। সবল দুর্ব্বলের প্রতি অবাধে নির্ভয়ে অত্যাচার করে; কেহ তাহার প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হয় না। কুম্ভীর, রাজার মত গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; আর করিবেনই বা কাহার সঙ্গে? কেহ তাঁহার নিকট ঘেঁসিতেই সাহস করে না। মৎস্যগণ খুব আনন্দ করিয়া বেড়াইতেছে। চুনা পুঁটিরা কিছু চপল প্রকৃতির, প্রপিতামহ রোহিতের স্কন্ধে পুচ্ছে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে। কর্ক্কটকুল আপন আপন বিবরে বসিয়া দাড়া নাড়িতেছে। এইরূপ জল-বাসে আমার অনেক মাস অতিবাহিত হইল। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে গঙ্গা আপনার জল সরাইয়া সরাইয়া এক দিন আমাকে স্বীয় কুক্ষি হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু আমার উপর কিয়দংশ কর্দ্দমের আচ্ছাদন রাখিয়া গেলেন, বোধ হয় আশা ছিল, আবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সময় ভাল হইলে আমাকে অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। একটী প্রৌঢ়াদাসী তীরে বসিয়া কটাহ মাজিতে মাজিতে অঙ্গুলি দিয়া মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে-ছিল, সে আমাকে দৈবধন বলিয়া ললাটে স্পর্শ করিয়া উত্তমরূপ ধৌত করণনান্তর অঞ্চলবদ্ধ করিল।

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তোমাকে আবার প্রভাতে গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইতে হইবে, সুতরাং গল্প শেষ করি। সেই দাসীর হস্ত হইতে ক্রমে আমি বহুলোকের হস্ত অতিক্রম করিয়া ভিজিট্ স্বরূপ কেমন করিয়া তোমার হাতে আসিয়া পড়িলাম, সে কথায় আর কায নাই; বিশেষতঃ, উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন কিছুই ঘটে নাই। একবার কেবল এক দুই বৎসরের শিশু কর্ত্তৃক তাহার মাতার অজ্ঞাতে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া বিলক্ষণ বিপদে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু হায় হায়, তাহার পর যে বিপদ ঘটিয়াছে, তুলনা করিলে ভাতের হাঁড়ির সেই উত্তাপকে শীতলতাই বলিতে হয়। তুমি যখন গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা নূতন মুখনল গড়াইবার জন্য স্বর্ণকার ডাকিয়া খুকীর মলের ভগ্নাংশের সহিত আমাকে অর্পণ করিলে, তখনি আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল! তাহার পর সেই

সদ্যরচিত মৃৎপাত্র হাফরে রাখিয়া বাঁশের চোঙায় ফুৎকার দিতে দিতে যখন আমার সাক্ষাৎ যমরূপী কৈলেস সেকরা আমাকে তাহাতে ফেলিল, তখন উঃ—

আমি বলিলাম, ভাই আর কায নাই; কিন্তু আমাকে অপরাধী কর কেন? আমার দোষ কি?

মুখনল বলিল, তোমার আর দোষ কি? অদৃষ্ট ভিন্ন পথ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আমার জীবনী জনসমাজে প্রচার করিয়া তোমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ো।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গালা ভাষা।*

আজ কাল একটা সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার স্থান হওয়া উচিত এই বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আন্দোলনকারীরা অবশ্যই বাঙ্গালার কথা আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলনের ফল অন্যান্য দেশীয় ভাষার সম্বন্ধেও ফলিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন দেশীয় চলিত ভাষার স্থান নাই বলিলেই হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত, পারস্য, আরব্য, প্রভৃতি ভাষার স্থানে বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি লওয়া চলে বটে, কিন্তু যাহারা ভারতীয় কোন চলিত ভাষা লয় তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দ্ধতন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। এফ-এ, কিম্বা বি-এ, পরীক্ষায় কোন চলিত দেশীয় ভাষার স্থান নাই। কাজে কাজেই যে প্রবেশিকায় দ্বিতীয় ভাষার স্থলে বাঙ্গালা কি হিন্দী লইল তার পক্ষে এফ-এ পরীক্ষার দ্বার রুদ্ধ বলিলেই হয়। আজ কাল আমরা কেহ কেহ বুঝিতেছি যে এরূপ হওয়া উচিত নয়। দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার স্থান না থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। যে শিক্ষা দেশীয় ভাষা ও ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবেক। আমরা ইংরাজীর যতই চর্চ্চা করি না কেন, কখনই সাহেব হইতে পারিব না; এবং যদিও হইতে পারি, সাহেব হওয়া আমাদের পক্ষে ভাল কি না; সমাজের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত দল যদি সাহেব হইয়া যায়, তাহা

* সম্প্রতি এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষার যে পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। সম্পাদক।

হইলে নিম্নস্তরের লোকদিগের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, এবং উর্দ্ধস্তরের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, এ সব ভাবিবার কথা। যে শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান নাই, তাহা অঙ্গহীন, যে সমাজে মাতৃভাষার আদর নাই সে সমাজের উন্নতি অসম্ভব। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বিলাতের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির স্থান নাই, তাহাতে বিলাতের কি ক্ষতি হইয়াছে? ক্ষতি হইয়াছে কি না, সাহেবরাই বলিতে পারেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে বিলাতের ও বাঙ্গালার অবস্থা এক নয়। এক জন সাহেবের পক্ষে ইংরাজি চর্চ্চার যত সুবিধা এক জন বাঙ্গালীর পক্ষে কি বাঙ্গালা চর্চ্চার তত সুবিধা? বিলাতে সাধারণতঃ শিক্ষা প্রদানের ভাষা ইংরাজি, এবং সেখানে জাতীয় সমস্ত কার্য্য ইংরাজিতে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে কি তাই? তদ্ভিন্ন বিলাতের যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষার স্থান নাই সেই স্থলে ইংরাজি প্রচলনের জন্য যে কত চেষ্টা হইতেছে, এবং চেষ্টা যে কতক অংশে ফলবতী হইয়াছে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। বিলাতে দেশীয় ভাষার বহুল প্রচলন ও চর্চ্চা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে উহার প্রচলনের চেষ্টা আমাদিগকে এক মহতী শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

বাঙ্গালা পক্ষপাতীদের কেহ কেহ আর একটী জিনিস চান। তাঁহারা বলেন, "ইংরাজি ছাড়া প্রবেশিকার অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা বাঙ্গালায় হইলে ভাল হয়।" ভাল যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোট ছোট বালকদিগকে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী হইতেই ইংরাজিতে শিখিতে হয়। এই সব বিদেশীয় ভাষায় শিখা সুশিক্ষার যে কত দূর অন্তরায়, যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন। মনে করুন এক জন ১০।১১ বর্ষীয় বালককে একটী ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিতে হইবেক। অঙ্কটী অবশ্য ইংরাজিতে। অঙ্ক কষিবার পূর্ব্বে প্রথম তাহাকে উহার অর্থ বুঝিতে হইবেক। অনেক সময় দেখা যায় বালকেরা অর্থ বুঝিতে না পারায় অঙ্ক কষিতে পারে না। বাঙ্গালায় অর্থ বুঝাইয়া দেও অমনি অনেকে অঙ্কটী কষিতে পারিল। পাটীগণিত সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ভূগোল প্রভৃতির সম্বন্ধেও তাহা খাটে। ভাষার ব্যাঘাত না থাকিলে অনেকেই এ সব বিষয় সহজে শিক্ষা করিতে পারে, এবং ভাষার ব্যাঘাত আছে বলিয়া অধিকাংশ বালকদের এ সব বিষয়ে জ্ঞান অতি অল্পই জন্মায়। শিক্ষক মাত্রেই জানেন,

ছোট ছোট ছেলেরা অনেক স্থলে অর্থগ্রহণ না করিয়া ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি মুখস্থ করে মাত্র। প্রবেশিকার কথা দূরে থাকুক, অনেক সময় দেখা যায় যে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি ইংরাজিতে শিখিতে হয় বলিয়া এফ-এ ও বি-এ শ্রেণীর ছাত্রদেরও অসুবিধা হয়। অনেকে বলেন এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মৌলিকতা বড় কম। উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে প্রথমতঃ—মৌলিকতা জগতে নিতান্ত সুলভ নয়; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের শিক্ষা হয় অতি সামান্য, এরূপ সামান্য শিক্ষায় মৌলিকতা আশা করা দুরাশা মাত্র; তৃতীয়তঃ,ইংরাজীর উত্তাপে যাহা কিছু মৌলিকতা থাকে তাহা শুকাইয়া যায়। ইংরাজীস্কুলে প্রবেশ করা হইতে এম্,এ,পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রই ইংরাজী লইয়া ব্যস্ত, তাহাকে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা করিতে হয়, অঙ্ক কষিতে হয় ইংরাজীতে, ইতিহাস শিক্ষা করিতে হয় ইংরাজীতে, বিজ্ঞানাদি অনুশীলন করিতে হয় ইংরাজীতে, চিন্তা করিতে শিখিতে হয় ইংরাজীতে, মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যাস করিতে হয় ইংরাজিতে। ইহার উপর যদি ইংরাজীতে দোষ হইল, তাড়না ও সাহেবদের বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। একজন লোকের পায়ে বেড়ী দিয়া তাহাকে একটা ঘোড়ার সঙ্গে ছুটীতে বলা যতদূর যুক্তি-সঙ্গত, আমাদের কাছে অধিক পরিমাণে মৌলিকতা প্রত্যাশা করা ততদূর যুক্তিসঙ্গত। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন অনেক টোলের ছাত্রের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধিক শিক্ষা হইত না, সেইরূপ আজ কাল আমাদের অনেকেরই কিঞ্চিত ইংরাজী ছাড়া আর কিছুই শিক্ষা হইতেছে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে আমাদের কিছুই হইতেছে না বলিতে হইবেক। সকলকেই ইংরাজী লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং ইংরাজীর প্রতিই বেশী মনোযোগ দিতে হয়; অন্য কিছু শিক্ষা আর অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই অনেকে বাঙ্গালার দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রবেশিকায় অঙ্ক, ইতিহাস প্রভৃতির পরীক্ষা গ্রহণ বাঙ্গালায় দেখিতে চান, তাঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য কোমলমতি বালকদিগের শিক্ষার ভার কমান; দ্বিতীয়, নামে মাত্র না হইয়া, যাহাতে যথার্থই তাহাদের কিছু শিক্ষা হয়, তাহার উপায় করা। উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ এবং সাধিত হইলে যে বহুল মঙ্গলোৎপাদক হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা পক্ষপাতীদের দুইটী অভিলাষ,—(১) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার স্থান হওয়া; (২) প্রবেশিকায় গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের

পরীক্ষা বাঙ্গালায় গৃহীত হওয়া। এখন দেখা যাউক বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হওয়া কতদূর সম্ভব। আমাদের বিবেচনায় সকল দিক দেখিতে গেলে, এখন তাঁহাদের অভিলাষ সম্পন্ন হওয়া একরূপ অসম্ভব। কেন, তাহা নীচে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বাঙ্গালা ছাড়া আরও অনেকগুলি ভারতীয় চলিত ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার তৃতীয় দিনের অপরাহ্নিক প্রশ্ন পত্রিকায় দেশায় ছাত্রদের নিমিত্ত, কোন দেশায় চলিত ভাষার অনুবাদের জন্য, যে ইংরাজি রচনা থাকে; তাহা নিম্নলিখিত ভাষা সকলে অনুবাদিত হইতে পারে; বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া, মারহাট্টী, ব্রাহ্ম, উর্দ্দূ, পার্ব্বতীয়, আসামী, তেলুগু, গুজরাটী, খাসিয়া ও তামিল। এই তালিকায় অন্য ভাষা যোগ করিবার ক্ষমতা সিণ্ডিকেট সভার আছে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দ্ধতন পরীক্ষায় বাঙ্গালাকে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলে অপর ভাষা সকলকে স্থান কেন না দেওয়া হইবেক, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। অতএব ধরিয়া লইলাম উহাদিগকেও স্থান দেওয়া হইবে। এখন কথা হইতেছে দেশীয় ভাষা সমূহের সাহিত্যের কি এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে তাহাদিগের হইতে এফ, এ, ও বি,এ'র পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতে কোন অসুবিধা হইবেক না? বাঙ্গালায় দুই চারি খানি ভাল কাব্য ও উপন্যাস এবং দুই একখানি ভাল প্রবন্ধপুস্তক হইয়াছে ঠিক। ধরিয়া লইলাম হিন্দি, উর্দ্দূ, গুজরাটী প্রভৃতি সাহিত্যের অবস্থা বাঙ্গালার সমান উন্নত না হউক অনেকটা উন্নত হইয়াছে। কিন্তু উড়িয়া, ব্রাহ্ম, পার্ব্বতীয়, আসামী এবং খাসিয়া ভাষার অবস্থা যে কত হীন তাহা বুঝাইবার আবশ্যক আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখন যদি বাঙ্গালার ন্যায় উন্নত ভাষাকে স্থান দিতে হয়; অন্য ভাষা সকলের সম্বন্ধে কি করিতে হইবেক? অন্যভাষীয় পরীক্ষার্থীদিগকে অবশ্য জোর করিয়া বাঙ্গালা লওয়ান কাহারও মত হইবেক্ না। তাহা অত্যন্ত অন্যায় হইবেক, ও তাহাদের উপর এরূপ গুরুভার চাপাইতে বোধ হয় সেনেট সভা কখনই রাজী হইবেন না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই অধিক। অন্য পরীক্ষার্থীর জন্য তাহাদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা অনুচিত। অন্যের জন্য তাহাদের শিক্ষা অঙ্গহীন হইবেক কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালী ছাত্র সংখ্যা

যে ঢের বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কি অন্যভাষী পরীক্ষার্থীদিগকে ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন? তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও তাহাদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য। উপরে বলিয়াছি যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

আর একটুকু কথা আছে। ধরিয়া লইলাম যে, যে সকল দেশীয় চলিত ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকায় স্থান দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির সাহিত্যের অবস্থা এরূপ উন্নত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্য হইতে এফ, এ, ও বি, এ'র পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতে কোন অসুবিধা হইবেক না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে উর্দ্ধতন পরীক্ষায় দেশীয় চলিত ভাষা কি সংস্কৃত বা অন্যান্য প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তে লওয়া চলিবে, না, উহারা শিক্ষা ও পরীক্ষার এক নূতন বিষয় হইবেক? সংস্কৃতাদির পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা লওয়ার পক্ষে অনেকের আপত্তি হইতে পারে। অন্যান্য ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া সংস্কৃতের কথাই ধরা যাউক। যাহা ইহার পক্ষে খাটে তাহা অন্য প্রাচীন ভাষার পক্ষেও অনেক পরিমাণে খাটে। সংস্কৃত ভারতীয় অনেক চলিত ভাষার প্রসূ। সংস্কৃত না জানিলে অনেক চলিত ভাষায় ভালরূপ অধিকার জন্মে না! সংস্কৃত দেশের অতীতের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত, হিন্দুদের শাস্ত্রাদি সব সংস্কৃতে, অতএব ইহার চর্চ্চা কমিয়া যাওয়া বোধ হয় উচিত নয়। একেত ইহার চর্চ্চা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বে ইহা যে ভাবে চর্চ্চিত হইত, এখন আর সে ভাবে চর্চ্চিত হইতে পারে না। এখন শিক্ষার বিষয় এত হইয়াছে যে, সংস্কৃতের যথার্থ গুরুত্ব নাই কমুক, ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার চর্চ্চা যে দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইবেক, তাহা বোধ হয় কোন দেশহিতৈষীর ইচ্ছা নয়। দেশের কতক লোকের ইহা ভাল করিয়া শিক্ষা করা উচিত, এবং সকল শিক্ষিত লোকের ইহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা কর্ত্তব্য। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দেশের অতীত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া ভাল নয়। ইহা ছাড়া আর একটু কথা আছে। সংস্কৃত পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ ও কঠিনতম ভাষা। ইহার আলোচনা বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনার এক প্রকৃষ্ট উপায়, এবং বুদ্ধি পরিচালনা অভ্যাস শিক্ষার এক প্রধান উদ্দেশ্য। যে কারণে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গ্রীক লাটীনের চর্চ্চা হইয়া থাকে, সেই কারণেই ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সংস্কৃতাদির

চর্চ্চা হওয়া আবশ্যক। একটী উৎকৃষ্ট ও কঠিন প্রাচীন ভাষা চর্চ্চা মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও কোমল মনোবৃত্তি সমূহের পরিচালনার এক বিশেষ সহায়। সংস্কৃতাদি কঠিন বলিয়াই অনেকে ভয় করেন যে যদি ইহাদের পরিবর্ত্তে কোন চলিত ভাষা লইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে অনেক ছাত্রই চলিত ভাষা লইবে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচীন ভাষা সকল উঠিয়া যাইবে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, যদি চলিত ভাষা প্রচলন হেতু সংস্কৃতাদি উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে জোর করিয়া উহা-দের রাখার দরকার কি? যদি শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতাদি শিখিতে না চায়, তবে কেন তাহাদিগকে ঐ সব ভাষা শিখিতে বাধ্য কর? উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে, ছাত্রদিগের মত লইয়া শিক্ষার বন্দোবস্তের সময় আজও আইসে নাই। সমাজের নিয়মই হইতেছে জোর করিয়া অনেককে কাজ করান। শিক্ষামাত্রেই জোর। "গোপালের" ন্যায় "সুবোধ" ছেলে ছাড়া আর কেহই ইচ্ছা করিয়া লেখাপড়া শিখিতে চায় না। অতএব জোর করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্কৃত পড়াইলে ছাত্রসম্প্রদায়ের স্বাধীনতায় একটু হাত দেওয়া হয় বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে তাহাদের পরকাল একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। অনেকে বলিবেন যে দেশীয় চলিত ভাষা শিক্ষার ও পরীক্ষার নূতন বিষয় হউক, প্রাচীন ভাষা শিক্ষা যে একেবারে উঠিয়া যাইবেক তাহা হইতে পারে না। ছাত্রেরা ইংরাজী ও একটী প্রাচীন ভাষার সঙ্গে তাহাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করুক। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের অনেক স্থলে ছাত্রদিগকে দুইটী প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, এবং সে দুইটীই কঠিন ভাষা। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে মাতৃভাষা ছাড়া আর দুইটী ভাষার পরীক্ষা দিতে হয়। তবে আমাদের দেশের ছাত্রেরা ইংরাজী ও সংস্কৃতাদি ছাড়া আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে অপারগ হইবে কেন? বুদ্ধিতে বাঙ্গালী বালক ও যুবকেরা অন্য দেশীয় বালক ও যুবকদিগের অপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা অন্যে পারে, তাহা তাহারা পারিবে না কেন? প্রস্তাবটী নিতান্ত মন্দ বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু ইহার বিপক্ষেও এক গুরুতর আপত্তি উঠিয়াছে। অনেক বিজ্ঞলোকে বলিতেছেন ইংরাজীতে শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয় শিখিতে হয় বলিয়া ছাত্রদিগের ভার বড় গুরু হইয়া পড়িয়াছে, ইহার উপর ভার বাড়াইলে তাহাদিগকে প্রাণে মারা হইবেক। এখনই এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে ছেলেরা খেলাইবার

সময় পায় না। আপত্তি যে গুরুতর তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। যাঁহারা শিক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে ইংরাজী অতি কঠিন বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতি যে কত অধিক সময় দিতে হয়, তাহা বলা যায় না। ইহার জন্যই ছাত্রদিগকে অনেক আবশ্যকীয় নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিক্ষা দিবার সময় পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে, নূতন কিছু বলার আবশ্যক দেখি না। এই মাত্র বলিতে চাই যে আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে চলিত ভাষাকে স্থান দিবার সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় আপত্তি সামান্য বলিয়া বোধ হয় না।

এখন বাঙ্গালা পক্ষপাতীদের দ্বিতীয় অভিলাষের প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ দেওয়া যাউক। তাহা এই, প্রবেশিকায় গণিত ইতিহাস ভূগোল ও বিজ্ঞানের পরীক্ষা বাঙ্গালায় গৃহীত হউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই অভিলাষের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বর্ত্তমান অবস্থায় অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব। কেন, তাহা দেখাইবার প্রয়াস করা যাইতেছে। নিম্নে যে তালিকাটী দেওয়া গেল তাহা হইতে ১৮৯২, ১৮৯৩ এবং ১৮৯৪ সালে প্রবেশিকায় কত পরীক্ষার্থী পরীক্ষার প্রথম দিবসের অপরাহ্নের প্রশ্ন পত্রিকা সম্বন্ধে কোন কোন চলিত ভাষা লইয়াছিল, ইহা বুঝা যাইবে।

সাল	১৮৯২	১৮৯৩	১৮৯৪
মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	৫২০৮	৫৭১৯	৫৩৯২
বাঙ্গালা	৩৬১১	৪০০৯	৩৭৬৬
হিন্দি	৩৬২	৩৭৪	৩১১
উড়িয়া	৮২	৮০	৯২
উর্দ্দ	৫৭৭	৫২৮	৫৩৩
মারহাট্টি	১৯৩	২৪২	২২২
ব্রাহ্ম	৮২	৭৭	১০৭
পার্ব্বতীয়	২	৩	৩
আসামী	২৯	৪৯	৩৬
তেলুগু	১	৯	৪
গুজরাটী	৪	৪	৫
খাসিয়া	৬	৬	৫
তামিল	১৪	২৩	৩৯
আর্ম্মাণী	—	৪	—
ইংরাজী	২৪৫	৩১১	২৫৯

১৮৯২ সালে ৫২০৮ জন পরিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৬১১ বাঙ্গালা, ও ১৫৯৭ জন অন্যান্য ভাষা ১৮৯২ সালে ৫৭১৯ জনের মধ্যে ৪০০৯ বাঙ্গালা, ও ১৭১০ জন অন্যান্য ভাষা, এবং ১৮৯৪ সালে ৫৩৯২ জনের মধ্যে ৩৭৬৬ জন বাঙ্গালা, ও ১৬২৬ জন অন্যান্য ভাষা, লইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বাঙ্গালী ছাত্র সংখ্যা বেশী হইলেও অন্যান্য ছাত্রদিগকে ছাঁটিয়া ফেলা যায় না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাঙ্গালা ভাষার প্রতি কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তাহা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাত-দোষ দুষিত হইতে হইবেক। এখন দেখা যাউক গণিত ইতিহাসাদির পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় গৃহীত হইলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে। তালিকা হইতে যদি পার্ব্বতীয়, তেলুগু প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র ভাষাগুলি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ৮।৯টী বৃহৎ ভাষা বর্ত্তমান থাকিবে। পরীক্ষা-কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবেক? এখন প্রত্যেক প্রশ্ন পত্রিকার জন্য ৭।৮ জন পরীক্ষক নিযুক্ত হন, এবং তাঁহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য, ও যতদূর সম্ভব তাঁহাদিগকে একভাবে চালাইবার জন্য, প্রত্যেক বিষয়ে একজন করিয়া প্রধান পরীক্ষক থাকেন। নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে কি হইবে? ধরুন ইতিহাস। আজ কাল পরীক্ষা ইংরাজীতে গৃহীত হয়, প্রত্যেক বৎসর ইহার জন্য ৮ জন পরীক্ষক ও ইতিহাস ভূগোলাদির জন্য একজন প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হন। যদি প্রধান পরীক্ষক কার্য্যক্ষম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হন তাহা হইলে তিনি তাঁহার নিম্নস্থ ইতিহাসের পরীক্ষকদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন, এবং নিদান কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদিগকে একভাবে চালাইতে পারেন। যদি ইংরাজীতে না হইয়া দেশীয় চলিত ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার জন্য নিদান ৫ জন, ও হিন্দি, উর্দ্দু, মারহাট্টি, উড়িয়া, ব্রাহ্ম, আসামী, তামিল, ও ইংরাজীর জন্য এক একজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবেক। ক্ষুদ্র ভাষাগুলি ছাড়িয়া দিলাম। পরীক্ষক ত নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু প্রধান পরীক্ষকের লোক কোথায় মিলিবে? বপ্‌ ও ম্যাক্সমুলারের অপেক্ষা কম-দরের লোক এ কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিতে অক্ষম; এবং সাহেব বা দেশীয় লোকদের মধ্যে তেমন দরের লোক কয়জন আছেন? এখনই পরীক্ষার্থীর এবং সেই জন্য পরীক্ষকের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে, যে পরীক্ষার সমতা রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেই হয়। প্রশ্ন

বিভ্রাট ত লাগিয়াই আছে, তাহার উপর ভাষা বিভ্রাট উপস্থিত হইলেই সোনায় সোহাগা হইবে। ইতিহাসের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, গণিত ভূগোলাদির প্রতিও তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য। আমাদের বোধ হয়, যদি ইতিহাসাদির পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় লওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হয়, তাহা হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

ইহা ছাড়া আর একটী কথা আছে। যদি প্রবেশিকায় গণিত ভূগোলাদি দেশীয় ভাষায় লিখান হয়, উর্দ্ধতন পরীক্ষার সময় কি হইবে? হয় ইংরাজী ভাষা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সমস্ত পরীক্ষা দেশীয় ভাষায় গ্রহণ করিতে হইবে, নয় বালকদিগকে গণিত প্রভৃতির পরিভাষাদি আবার নূতন করিয়া ইংরাজীতে শিখিতে হইবে। বাঙ্গালা পক্ষপাতীরা আজও উর্দ্ধ পরীক্ষা সকল দেশীয় ভাষায় গৃহীত হইবার কথা তুলেন নাই। এখনও সকল দেশীয় ভাষাতেই গণিত, বিজ্ঞান, ও দর্শনাদির পুস্তকের সমূহ অভাব। ধরিয়া লইলাম, আবশ্যক হইলেই উচ্চ দরের পুস্তক লিখিত হইবেক। কিন্তু উপরে প্রবেশিকা সম্বন্ধে যে আপত্তি করা গিয়াছে, অন্যান্য পরীক্ষার সম্বন্ধেও সে আপত্তি সম্পূর্ণরূপে খাটিবে। যাহা হউক যখন প্রশ্ন এখনও উঠে নাই, ইহার বিশেষ আলোচনার দরকার নাই। ধরিয়া লইলাম যেন প্রবেশিকায়ই দেশীয় ভাষার প্রচলন হইল। তাহা হইলে এফ,এ, পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে গণিত প্রভৃতির পরিভাষাদি আবার নূতন করিয়া ইংরাজীতে শিখিতে হইবে। ছাত্রেরা যত উপরে উঠে, শিক্ষণীয় বিষয় এবং তাহাদের উপরে চাপও তত পড়ে। এফ, এ, শ্রেণীতে কতকগুলি বিষয় যদি তাহাদিগকে নূতন করিয়া ইংরাজীতে শিখিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের কষ্ট ও অসুবিধা কি পরিমাণে বাড়িবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

এখানে একটী কথা স্মরণ করাইয়া দেই। যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় দেওয়া চলিবে, এরূপ নিয়ম হয়। এ নিয়মানুযায়ী কতদিন কাজ হইয়াছিল, বলিতে পারিলাম না, কিন্তু কিছুদিন পরে এ নিয়ম রদ হইয়া যায়। নিশ্চয়ই নিয়মের অসুবিধা উপলব্ধি করিয়াই ইহার রদ হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অতীতে যাহা হয় নাই, তাহা যে বর্ত্তমানে হইবে না, বা হইতে পারে না, ইহা কেমন

কথা? আমরা তাঁহাদের হইতে ভিন্ন মত নই। অতীতের দোহাই দিয়া বর্ত্তমান উন্নতির পথ বন্ধ করা, আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এইমাত্র বলি যে অতীতের বহুদর্শিতা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রচলিত ও পরে রদ্ হয়, তাহা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অনেক বিভিন্ন। তখন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঢের কম ছিল, এবং পরীক্ষা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই। পূর্ব্বে যে নিয়ম অচলনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, এখন যে তাহা সহজে চলনীয় হইবে, এরূপ মনে করা ভুল।

এ পর্য্যন্ত ৩টী বিষয় বুঝাইবার প্রয়াস করা গিয়াছে। (১) ইংরাজীতে অনেক বিষয় লিখিতে হয় বলিয়া আমাদের বড় অসুবিধা। (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকলে দেশীয় চলিত ভাষার স্থান দিবার সময় আসিয়াছে কি না সন্দেহ। (৩) বর্ত্তমান অবস্থায় প্রবেশিকার ভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা দেশীয় চলিত ভাষায় গ্রহণ করা অসম্ভব। মোটের উপর বলিতে গেলে আমাদের শিক্ষাবিভ্রাট উপস্থিত। এ বিভ্রাট নিবারণের কি কোন উপায় আছে? নিম্ন হইতে দেখা যাউক।

প্রবেশিকায় দেশীয় ভাষা। উপরে দেখাইয়াছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রবেশিকায় গণিত, ইতিহাসাদির পরীক্ষা দেশীয় ভাষায় গ্রহণ একরূপ অসম্ভব, এবং সম্ভব হইলেও যতদিন ঊর্দ্ধতন পরীক্ষা ইংরাজীতে গৃহীত হইবে ততদিন অত্যন্ত অসুবিধাজনক। অসুবিধার কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাউক কি করিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় ইহার একমাত্র উপায় আছে। উপায়টী আপাততঃ আকাশ-কুসুমবৎ মনে হইতে পারে, কিন্তু আজি যাহা অসম্ভব, কালি তাহা সম্ভব হইতে পারে বলিয়াই আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। উপায় হইতেছে প্রবেশিকা পরীক্ষার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্রব ত্যাগ এবং ইহাকে প্রাদেশিক বা বিভাগীয় পরীক্ষায় পরিণত করণ। প্রত্যেক প্রদেশ বা বিভাগে এখন দুই একটা করিয়া কলেজ আছে। যেখানে একটি কলেজ আছে সেখানে সেই কলেজ হইতে একটী সমিতি গঠিত হউক। যে বিভাগে একাধিক কলেজ আছে তাহাতে সকল কলেজ লইয়া এক যুক্ত সমিতি হউক। সমিতিতে বাহিরের ২।৪ জন শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির স্থান থাকুক। প্রত্যেক প্রাদেশিক বা বিভাগীয় সমিতির উপর সেই প্রদেশের বা বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষা

গ্রহণের ভার অর্পিত হউক। এরূপ হইলে যেখানে যে ভাষা প্রবল সেখানকার প্রবেশিকা সেই ভাষায় গৃহীত হইতে কোন অসুবিধা হইবেক না। বিহারের ন্যায় প্রদেশে হিন্দি ও উর্দ্দুর ন্যায় একাধিক ভাষা প্রবল হইতে পারে। এরূপ স্থলে দুই ভাষার পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে কোন এক ভাষা-বিশেষ-প্রধান বিভাগে কতকগুলি অন্যভাষী পরীক্ষার্থী থাকিবে। এরূপ স্থলে ঐ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা তাহাদের ভাষা যে স্থানে প্রবল সেই বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে হইতে পারে। তাহাদের যে সেই বিভাগে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইবে ইহা আমরা বলিতেছি না। নিজেদের বিভাগেই থাকিয়া বিভাগান্তরের প্রশ্ন পত্রিকা দ্বারা তাহারা পরীক্ষিত হইতে পারিবে। কেহ কেহ বলিবেন এরূপ হইলে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষার মধ্যে বড় তারতম্য হইয়া পড়িবে। ইহা কিন্তু কতক পরিমাণে বন্ধ করিবার উপায় আছে। এই সমস্ত পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে গৃহীত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী সংস্কৃতাদি সাধারণ বিষয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচন করিবেন এবং অন্যান্য বিষয়ে কতদূর জ্ঞান আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া দিবেন। সকল বিষয়ের প্রশ্ন পত্রিকাও এক হইবেক। ইহাতে পরীক্ষার তারতম্য অনেকটা কমিবার সম্ভাবনা। বাকী যেটুকু থাকিবে তাহার জন্য বিশেষ কিছু আইসে যাইবে না। এখন যেমন শিক্ষাবিভাগের কতকগুলি পরীক্ষা কেবল বিভাগীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, প্রবেশিকাও সেইরূপ হইবে। এক বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা অবশ্য অন্য বিভাগের কলেজে পড়িতে পারিবে, এবং সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে সমান অধিকারী হইবে। আমাদের প্রস্তাব কতদূর যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভাব্য তাহা নির্ণয় করিবার ভার পাঠকদের উপর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় দেশীয় ভাষার স্থান। উপরে দেখাইয়াছি বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা হইতে পারে না। যদি কখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গ্রাহ্য অন্যান্য দেশীয় ভাষার অবস্থা বাঙ্গালার ন্যায় কতকটা উন্নত হয়, তাহা হইলে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। বাঙ্গালার অবস্থা যে বিশেষ উন্নত, তাহা আমাদের মনে হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রগুলির কথা ছাড়িয়া দিয়াও অপর ভাষা সকলের অবস্থা বাঙ্গালার ন্যায় হওয়ারও ঢের দেরী। বাঙ্গালার স্থান হইবার আর এক উপায় আছে। যদি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

ক্রমে এত হইয়া পড়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় আর সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন না, এবং বাঙ্গালী ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট কাজ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন পরীক্ষাসমুহে বাঙ্গলার স্থান হইবার প্রধান অন্তরায় বিদুরিত হইবে। অর্থাৎ যদি কখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যা-লয়ে পরিণত হয়, তখন পরীক্ষায় বাঙ্গালার স্থান অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। এ অবস্থাও যে খুব শীঘ্র হইবে, এমন বোধ হয় না। যাহাতে ইহা শীঘ্র শীঘ্র আসে, বাঙ্গালাপক্ষপাতীদের তাহার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

যখন আমাদের নিজেদের একটী বিশ্ববিদ্যালয় হইবে; যখন তাহাতে আমাদের মাতৃভাষার স্থান হইবে; এক কথায়, যখন আমরা সত্য সত্যই এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইব, তখন পরীক্ষার ভাষা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলি-বার সময় আসিবে। তখন শিক্ষা প্রদানের ভাষার কথা উঠিতে পারিবে। ইংরাজী অবশ্য আমরা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না; ইংরাজী না থাকিলে আমাদের চলিবে না। শুধু আমাদের কেন ভারতের সকল জাতির সম্বন্ধেও ইহা ঠিক। যতদিন আমরা ইংরাজাধীন থাকিব, ততদিন ইংরাজী আমাদের চাই ই। কিন্তু যদি বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হয়, তাহা হইলে পরীক্ষার ভাষা ক্রমে বাঙ্গালা হইবে, এবং ইংরাজী ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ের শিক্ষাপ্রদান পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় হইবে। বাঙ্গলা ভাষায় এখন অবশ্য ইতিহাস, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞানাদির উচ্চ অঙ্গের পুস্তক নাই। হইবেই বা কি করিয়া? ঐ সব বিষয় বাঙ্গালায় শিক্ষা হয় না। যাহার আবশ্যক নাই, তাই তাহার দরকারও নাই। কতদিনে যে অবস্থান্তর হইবে, তাহা বলা যায় না। এখন শিক্ষার অবস্থা যেরূপ তাহাতে উহা সুদূর। শিক্ষার অবস্থা বর্ত্তমানাপেক্ষা অনেক উন্নত হইলে পর উহা সম্ভব হইবে। এখনও বিদ্যার উচ্চ শাখা সকল শিক্ষার জন্য আমাদিগকে ইংরাজ অধ্যাপকের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। যতদিন তাঁহাদের সাহায্য আবশ্যক হইবে ততদিন শিক্ষাদান বাঙ্গালায় হইতে পারিবে না। বাঙ্গলাপক্ষপাতী-দের উদ্দেশ্য সফল হইতে হইলে, চাই, প্রথম বাঙ্গলায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয়, শিক্ষার এতদূর উন্নতাবস্থা যে বিদেশ হইতে অধ্যাপক আমদানীর অপ্রয়োজন, এবং তৃতীয়, বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। প্রথম দুইটী সম্ভাব্য হইলে শেষোক্তটির জন্য যে বিশেষ অসুবিধা হইবেক এরূপ বোধ হয় না; অথবা উহারা সংশোধিত হইবার পর সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কথা ভাবিবার সময় আসিবে।

দ।

পলাশ বন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই আমরা আমাদের গৃহ-সংলগ্ন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মেজবৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপো, বনের মধ্যে ভাল পথ আছে তো?"

আমি বলিলাম, "মানুষের তৈয়েরী পথ নাই। তবে গাছের মধ্যে এরূপ ফাঁক আছে, যা'র ভিতর দিয়ে অনায়াসেই যাওয়া আসা যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে কাঁটা গাছ আছে, তোমরা কাপড় চোপড় একটু সাবধানে গুটিয়ে যাবে, যেন কাঁটাতে কাপড় না লাগে।"

যতীন পথ দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইল। বালকবালিকারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের পশ্চাতে চলিল। আমি চলিলাম সর্ব্ব পশ্চাতে। মতিলালই কেবল তাহার দাসীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল।

মেজবৌদিদি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরপো, বনেতো কিছু ভয়ের কারণ নেই? তোমরা কি ক'রে বনের মধ্যে বেড়াও ভাই! এ যে গাছ বই আর কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে না! ঐ ঝোপগুলো এরই মধ্যে যে অন্ধকার হ'য়ে এসেচে! ওদের ভিতর তো কিছু লুকিয়ে থাকে না? ওমা, এযে দিনের বেলাতেই বনে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো!"

আমি বলিলাম, "মেজবৌদিদি, ভয় কি তোমাদের? কিছু ভয় থাক্‌লে, আমরা কি তোমাদি'কে এদিকে নিয়ে আস্‌তুম? সুশীলারা তো রোজই এই দিক দিয়ে ফুল তুল্‌তে যায়! কি সুশীলা, তোমার ভয় পাচ্চে?"

সুশীলা হাসিয়া বলিল, "ভয় পাবে কেন? কিসের ভয়? আমিতো কতবার একলাই এই পথে ফুল তুল্‌তে যাই;"

মেজবৌদিদি বলিলেন, "তোমার না হয় যতীন রয়েছে ভাই। তোমার দিদিরও জন্যে না হয় ঠাকুরপো র'য়েচে। তোমাদের তো কোন ভয় নেই; যত ভয় আমাদেরই হচ্চে। মঙ্গলা ঠাকুঝি ফিরে যাবি?"

মঙ্গলার মুখ শুকাইয়া আসিতেছিল। সে বলিল, "ওগো, আমার মনে

ছিল না গো। বগলাপিসী আমাকে বনের মধ্যে যেতে অনেকবার মানা ক'রেছিল গো।" তাহার পর ঈষৎ অনুচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ও বৌদিদি, বনে বাঘ ভালুক নেই বা থাক্‌লো? বনে যে কত ঠাকুর দেবতা থাকে গো?"

মঙ্গলার এই কথা শ্রবণমাত্র স্ত্রীলোকেরা সহসা নিশ্চল হইল। যোগমায়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। যতীন্দ্র বালকবালিকাদিগকে লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিল। সে মঙ্গলার এই সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে পায় নাই। রাজুদিদি ভয়সূচক স্বরে যতীনকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে যতীন, ফিরে আয়; আর বনে বেড়াতে যেতে হ'বে না।"

যতীন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তোমরা চ'লে এস না, আমরা দিব্যি ফাঁকা জায়গায় এসেচি।"

কে যতীনের কথা শুনে! মঙ্গলা ও রাজুদিদি বাড়ী ফিরিয়া যাইবার মত করিল। মেজবৌ বড়বৌ ও তাঁহাদের দাসীদ্বয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মতিও তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া যেন ভয় পাইয়াছিল। সে বলিল, "মা, তুই কোলে নে।" এই বলিয়া দাসীর ক্রোড় হইতে মাতৃক্রোড়ে গেল। যোগমায়ার অবশ্য কিছুই ভয় হয় নাই। সে রাজুদিদিকে মৃদুস্বরে বলিতেছিল, "বনে কিছু ভয় নেই, ঠাকুর্জ্জি, তোমরা এস।"

মঙ্গলাকে যত অনর্থপাতের মূল দেখিয়া আমি বলিলাম, "মঙ্গলা, ঠাকুর দেবতার নাম ক'রে তুই সকলকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্চিস্‌। আচ্ছা যা, মনে ক'রে দেখ্‌, যদি কেউ কোথাও ঠাকুর দেখ্‌তে যায়, আর অর্দ্ধেক পথ থেকে ফিরে আসে, তা হ'লে তার কি হয়! বনের ঠাকুরদের বনই মন্দির; এই মন্দির থেকে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্চিস্‌, আচ্ছা যা। এর পর মজাটি দেখ্‌তে পাবে।"

মঙ্গলা ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওমা, আমি কি যেতে মানা কচ্চি? বৌরা যে আপনারাই যেতে চাচ্চে না গো?"

আমি বলিলাম, "বৌদিদি, তোমরা এস; কিছু ভয় নেই।" এই বলিয়া সকলের অগ্রসর হইলাম।

গৃহে ফিরিয়া যাইলে কোনও অমঙ্গল হইতে পারে, এই মনে করিয়া স্ত্রীলোকেরা কাষ্ঠপুত্তলিকার স্থায় আমার অনুবর্ত্তিনী হইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা একটী পরিষ্কৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রায় দুই বিঘা পরিমিত স্থান একেবারে বৃক্ষশূন্য; কিন্তু তাহার চারিদিকেই বন। বৈকালিক রৌদ্রপাতে সেই স্থানটি আলোকিত। বালকবালিকারা সেখানে দৌড়াদৌড়ি ও কোলাহল করিতেছে। কেহ নিকটবর্ত্তী আরণ্য পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছে। যতীন্দ্র ভায়া একটী বৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের উপরে বসিয়া আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা বনের ভিতর হইতে সহসা এই পরিষ্কৃত ও আলোকিত স্থলে উপনীত হইয়া যেন বিস্মিত আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইল। কাহারও মুখমণ্ডলে একটুও ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। মেজবৌদিদি বলিয়া উঠিলেন, "আহা, কি সুন্দর জায়গা ঠাকুরপো! আমি মনে করেছিলাম, বুঝি কেবলই গাছ। ওমা, বনের মধ্যে এমন জায়গা আছে বলে কে জানে? ওখানে ও কি? গরু চ'রে বেড়াচ্চে না কি, ঠাকুরপো? ঐ ছোট মেয়েটি একলাই এই বনের ভিতর গরু চরায় না কি? মেজঠাকুঝি, ঠাকুরপো সত্যিই ব'লছিল, বনের মধ্যে কিচ্ছুরই ভয় নেই। আমরা তাই সহুরে লোক; বন তো কথনও দেখিনি; তাই ভয়ে ম'রে যাচ্ছিলুম।"

আমি বলিলাম, "এই দেখ না, এই শালগাছের তলায়, এই ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে রোজই আমি বই পড়ি। আজও সকালে এইখানে এসেছিলাম।"

বড়বৌদিদি বলিলেন, "বেশ জায়গাটি। এইখানে আমরা একটু বসি।" এই বলিয়া তিনি ভূমিতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি অপর সকলেই বসিল। মেজবৌদিদি ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ও ঠাকুরপো, ওটা কি গো! ঐ লম্বা লম্বা কান! ঐযে গো, ঐ দেখ, ঐ বনের মধ্যে ঢুকে গেল!"

বৌদিদির কথা শুনিয়াই মঙ্গলা ভয়সূচক-স্বরে চীৎকার করিয়া সলম্ফে আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি রাগান্বিত হইয়া বলিলাম, "করিস্ কি, পোড়ারমুখি, তোকেই আগে খেয়ে ফেল্লে না কি?" অপর সকলে মঙ্গলার ভাব দেখিয়া ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "বৌদিদি, ওটা খরগোশ। নিরীহ জীব। কারুর অপকার করে না। বেচারী আগাছার কচি কচি পাতাগুলি খেয়ে বেড়াচ্ছিল, এখন তোমাদের ভয়েই গর্ত্তের মধ্যে লুকিয়ে গেল। মানুষ যে ওদের শত্রু; মারিয়া ওদের মাংস খায়!"

বড়বৌ বলিলেন, "ওমা সেই যে কথামালাতে খরগোশ ও কুকুরের গল্প আছে, সেই খরগোশ!"

আমি বলিলাম, "হাঁ"।

স্ত্রীলোকেরা আবার নিশ্চিন্তমনে সেই স্থানে উপবেশন করিল। যাহারা খরগোশটি দেখিতে পায় নাই, তাহারা খরগোশ দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল, যদি আবার বাহির হয়। বনের ভিতর হইতে সুকণ্ঠ পক্ষীদের শ্রুতিমধুর গান শুনা যাইতেছিল, সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি সকলকেই সাধ্যমত উত্তর দিলাম। সহসা দূর বনে একটা ময়ূর ডাকিয়া উঠিল। সকলেই ভীত ও চকিত মুখে আবার আমার দিকে চাহিল। আমি স্ত্রীলোকদের আকার প্রকার দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, "তোমাদের কিছু ভয় নাই, বনে ময়ূর ডাকৃচে।"

যাহারা ইতঃপূর্ব্বে কখনও কোথাও ময়ূরের ডাক শুনিয়াছিল, তাহারা আমার কথার সমর্থন করিল।

যতীন বলিল, "এখানে ব'সে থাকৃলে তো চল্‌বে না; চল আমরা পাহাড় দেখে আসি।"

যতীনের কথায় আবার সকলে উঠিলাম। স্ত্রীলোকদের বনভ্রমণের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া যতীনকে বলিলাম, "ভায়া, যমুনা নদীর ধার দিয়ে যাওয়া যাক্। নদীর ধারে বন নাই, বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন; আর রৌদ্রও আছে।" যতীন আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই দিকেই চলিল।

যমুনার ক্ষীণ স্রোত কোথাও একটী স্থূল রৌপ্য রেখার ন্যায় প্রলম্বিত ছিল; কোথাও কুল কুল শব্দে প্রস্তরময় উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া শ্বেত ফেনপুঞ্জ উদ্গীরণ করিতেছিল; কোথাও বা বক্রগতি ধারণ করিয়া বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। বালক বালিকারা তটিনী-গর্ভে সুগোল সুচিক্কণ বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরখণ্ড সকল সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল; এবং কোলাহল করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। নদীর বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে এবং নানা প্রকার অদ্ভুত বিষয়ের গল্প করিতে করিতে আমরা পরিশেষে কৃষ্ণকায় সিন্দূরে পাহাড়ের পাদমূলে উপনীত হইলাম।

পাহাড়ের ভীম সৌন্দর্য্য দর্শনে স্ত্রীলোকদের মনে কিরূপ ভাব হইল, তাহা

সহজেই অনুমিত হইতে পারে। আমি বলিলাম "মেজবৌদিদি " এই দেখ, সিন্দূরে পাহাড়। উপরে উঠিবে চল।"

কথা শুনিয়াই সকলের বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল। আমি বলিলাম, "কিছু ভয় নাই। উঠ্‌তে কোনই কষ্ট হবে না। এই নদীর দিকে পাহাড়টা সমান ভাবে খাড়া হয়েচে বটে; কিন্তু এদিক্ দিয়ে আমরা উঠ্‌ব না। পূর্ব্বধারে চল।"

সকলকে পাহাড়ের অপর পার্শ্বে লইয়া গেলাম এবং ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলাম। সোপান পরম্পরা সংযোগে দ্বিতলগৃহে উঠিতে যেরূপ কোনই কষ্ট হয় না, সেইরূপ পাহাড়ের লম্বিত, আনত, রুক্ষ দেহ ভাঙ্গিয়া তাহার শিখরদেশে উপনীত হইতে কাহারই কিছু মাত্র কষ্ট বা শ্রমবোধ হইল না। পাহাড়ের গাত্র প্রশস্ত ছিল; সুতরাং তাহা যেন একটী বিস্তৃত, ঈষৎ আনত, কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রাঙ্গন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। পাহাড়টি পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বিত ছিল।

স্ত্রীলোকরা ও বালকবালিকারা যথেচ্ছ উপবেশন করিয়া পাহাড়ের উপর হইতে সবিস্ময়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখিতেছিল। পাহাড়ের পশ্চিম-ভাগে তাহার পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া যমুনাতটিনী বিসর্পিত গতিতে অনন্ত অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইতেছিল। নদীটি উত্তর পূর্ব্ব দিক্ হইতে আসিয়া পাহাড়কে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতেছিল। বৈকালিক সূর্য্যের রশ্মিমালা বনের সুচিক্কণ হরিৎ-পত্ররাজির উপর বিকীর্ণ হইয়া মনোহর শোভার সৃষ্টি করিতেছিল। পাহাড়ের পূর্ব্ব দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত পলাশ-বৃক্ষের অন্তরালে কৃষ্ণ প্রস্তর স্তূপ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিন্যস্ত হইয়া সেই স্থানের ভীষণতা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিতেছিল। স্ত্রীলোকদের মুখাব-লোকন করিয়া বুঝিতেছিলাম, তাহারা এই ভীমসৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে কিছুমাত্র সমর্থ হইতেছিল না। পাহাড়ের অব্যবহিত দক্ষিণ দিক্‌টি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত। বন এক প্রকার নাই বলিলেও চলিতে পারে। সেই দিকে চাহিতে চাহিতে নীরো বলিয়া উঠিল, "মা, ঐ দেখ, বনের মধ্যে কাদের বাড়ী।" সকলেই সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মেজবৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সত্যি তো! ও কাদের বাড়ী ঠাকুরপো?" আমি হাসিয়া বলিলাম "কাদের বাড়ী, তোমরা দেখ নাই না কি?" সুশীলা একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া বলিল, "ও হো এ যে তোমাদের বাড়ী গো!

ঐ যে আমাদের গ্রাম!” স্ত্রীলোকেরা অবাক্ হইল। মেজবৌদিদি বলিলেন, “ঠাকুর পো এত নিকটে আমাদের বাড়ী? কই এদিকে তো বেশী বন নাই? তবে তো আমাদিকে আর বনের ভিতরের রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে হবে না?” আমি হাসিয়া বলিলাম, ‘না।’

মেজবৌদিদি অমনি বলিয়া উঠিলেন, “আঃ বাঁচলুম ভাই। তোমাদের বন বেড়ানোকে দণ্ডবৎ করি। আমি তো দিশে হারা হ’য়ে গেছ্লুম। কোন্ দিক্ দিয়ে এলুম, কোন্ দিক্ দিয়ে বেরুলুম, আর কোন্ দিক্ দিয়ে যে যাব, তা তো আমি কিছুই ঠিক্ কর্‌তে পারি নি; বাড়ীর দিকেই এতক্ষণ আমার মনটা পড়েছিল। বাড়ীটে দেখে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ’লো।

আমি হাসিয়া বলিলাম “মেজবৌদিদি, বন জঙ্গল তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের জন্য ঘর সংসারই উপযুক্ত স্থান। বনের মধ্যে তোমাদের মনের স্ফূর্ত্তি হয় না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেবল সীতা দেবীই তাঁর স্বামীর সঙ্গে গভীর অরণ্যের মধ্যেও নির্ভীকচিত্তে বেড়াতে সমর্থ হ’য়েছিলেন। তিনি কিরূপ নারী ছিলেন, যোগমায়ার কাছে শুন্‌বে।”

মেজবৌদিদি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা ভাই তাই হ’বে; ভটচাযি্য মশায়কে এখন জিজ্ঞেস করে জানবো।—যতীন, তুমি কি এই পাহাড়ের সম্বন্ধেই কবিতা লিখেচো? কই, আমাদের তা শোনাও দেখি?”

যতীন বলিল, “আগে এইখানে এসে একটি ফাট দেখে যাও।”

আমরা সকলেই গিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের উত্তরাংশটী আমূল ফাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ফাটটি এরূপ প্রশস্ত যে, তাহা লাফাইয়া পার হইতে শঙ্কা হয়। তাহার নিম্নদেশ অন্ধকারময় ও লতাকীর্ণ। স্ত্রীলোকেরা তাহাকে কোনও ভীষণ বন্যজন্তুর নিভৃত আবাস-স্থান বলিয়া শঙ্কিত হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যতীন সকলকে বসিতে বলিয়া নিজেও একটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিল এবং গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল:—“বহুকাল পূর্ব্বে এই পলাশবন গ্রামে একটী সতী স্ত্রীর বাস ছিল। সেই সময়ে এই পাহাড়ের

কন্দরে একটী বড় অজগর সাপও বাস করিত। (কথা শুনিয়াই স্ত্রীলোকেরা সকলে শিহরিয়া উঠিল)। সেই সাপটা একদিন সেই সতীর স্বামীকে পাহাড়ের ধারে পাইয়া গ্রাস করিয়া ফেলিল। (স্ত্রীলোকদের ভয়সূচক অস্ফুট চীৎকার)। সতী ঘরে বসিয়া সিন্দুরের কৌটা হইতে সিন্দুর লইয়া মাথায় সিন্দুর পরিতেছিল, এমন সময়ে সে তাহার স্বামীর বিপদের কথা শুনিল। শুনিয়াই সে কৌটা-হাতেই পাহাড়ের ধারে ছুটিয়া আসিল এবং তাহার স্বামীকে ও সাপকে বাহির করিয়া দিবার জন্য পাহাড়ের অনেক স্তবস্তুতি করিল। কিন্তু পাহাড় সতীর কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন সতী রাগে আগুন হইয়া পাহাড়ের গায়ে হাতের সেই কৌটার বাণ মারিল। পাহাড়ের গায়ে যেমন কৌটা লাগিল, অমনি পাহাড় ভয়ঙ্কর কড়কড় শব্দে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। সাপ মরিল এবং সাপের পেট হইতে সতীর স্বামী জীবন্ত দেহে বাহির হইয়া আসিল। সতী পাহাড়কে সিন্দুরের কৌটা মারিয়াছিল বলিয়া পাহাড়ের নাম হইল, "সিন্দূরে পাহাড়।"

গল্প শুনিতে শুনিতে স্ত্রীলোকেরা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যোগমায়া তাহার আয়ত চক্ষুদুটি যতীনের দিকে স্থির করিয়া সবিস্ময়ে একমনে এই গল্প শুনিতেছিল। বালকবালিকারাও নিশ্চল হইয়া গল্প শুনিতেছিল এবং যতীনের বাক্য শেষ না হইতে হইতে ভয়াকুলিতচিত্তে স্ত্রীলোকদের মাঝখানে আসিয়া বসিল। মেজবৌদিদি ভীতিব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"যতীন, আমরা তো তবে পাহাড়ের উপরে উঠে ভাল কাজ করি নি!"

যতীন বলিল,—"উঠেচো তো কি হ'বে! এখানকার মেয়েদি'কেও তো আমি পাহাড়ের ধারে আস্‌তে দেখেচি। একদিন এই পাহাড়ে এসে সতীর পূজো দিয়ে যেও, তা হ'লেই হ'বে।"

"তাই ক'র্‌বো" এই কথা বলিয়া মেজ বৌদিদি পাহাড় ও সতীকে প্রণাম করিবার উদ্দেশে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ আনত করিয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন। অপর স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকারাও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। মতি কিছু করিল না দেখিয়া দাসী তাহার ঘাড় নোয়াইয়া দিল।

যতীন বলিল,—"এখন সকলে স্থির হইয়া কবিতা শোন। শুনিলে নিশ্চিত আনন্দিত হইবে।" এই মুখবন্ধের পর সে কবিতা-পাঠ আরম্ভ করিল:—

"সিন্দুরে পাহাড়

"নগ্নদেহ কৃষ্ণকায় সিন্দুরে পাহাড়,
এক ভাবে, এক ধ্যানে,
কত কাল এই স্থানে,
ব'সে আছ, যোগী হেন, নিস্পন্দ অসাড়—
ধ্যানমগ্ন মহাযোগী, সিন্দুরে পাহাড়।

"রুক্ষদেহ, শুষ্কপ্রাণ, ভ্রূকুটী ভীষণ
হেরিয়া তোমার পাশে
নরনারী নাহি আসে,
দূরে দূরে থাকি ক'রে তোমার পূজন—
সিন্দুরে পাহাড়, তুমি ভীমদরশন।"

যতীন এই পর্য্যন্ত পড়িয়াছে, এমন সময়ে মেজ বৌদিদি তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই দেখ, যতীন, তুমি তো নিজেই লিখেচো, পাহাড়ের পাশে কেউ আসে না! আমাদের তবে এখানে আন্‌লে কেন? কোন তো অপরাধ হ'বে না?"

যতীন বিরক্ত হইয়া বলিল,—"কি আপদ! তুমি ভয় পাচ্চ কেন? কবিতাতে ওরূপ না লিখ্‌লে কি চলে? তোমরা মন দিয়ে শুনে যাও; আমাকে পড়ার সময় বাধা দিও না।" এই বলিয়া আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিল:—

"নগ্নদেহ কৃষ্ণকায় সিন্দুরে পাহাড়,
এক ভাবে, এক ধ্যানে,
কত কাল এই স্থানে,
ব'সে আছ, যোগী হেন, নিস্পন্দ অসাড়—
ধ্যানমগ্ন মহাযোগী, সিন্দুরে পাহাড়।

"রুক্ষদেহ, শুষ্কপ্রাণ, ভ্রূকুটী ভীষণ
হেরিয়া তোমার পাশে
নরনারী নাহি আসে,
দূরে দূরে থাকি ক'রে তোমার পূজন—
সিন্দুরে পাহাড় তুমি ভীম দরশন।

"অজর অমর তুমি, অতি পুরাতন—
জানি না যে কোন্ কালে
উঠিয়াছ মাথা তুলে,
ভেদি ধরণীর এই দৃঢ় আবরণ,
কে করে তোমার শৈল, কাল নিরূপণ?

"না জানি কতই যুগ তুমি শৈলেশ্বর,
আপন জনম হ'তে
হেরিয়াছ এ ভারতে,
সত্য ত্রেতা আদি করি কত মন্বন্তর,
অনন্ত কালের সাক্ষী, তুমি গিরিবর।

"নীরব তোমার ভাষা, প্রাণ-উন্মাদিনী!
বসি তব পদতলে
শুনি শৈল, কুতূহলে,
কত-না পুরাণ কথা, অপূর্ব্ব কাহিনী,
কতবার অশ্রুজলে ভিজাই ধরণী!

"সতীর মহিমা তুমি করিছ প্রচার,
নীরব গম্ভীর স্বরে,
এ জগৎ চরাচরে,
অবলা নারীর কাছে অচলের হার,
তুমি হে জীবন্ত সাক্ষী সতী-মহিমার।

"সতীর পবিত্র ধনে ভীম অজগর
গরাসিল যবে হায়,
ঠাঁই দিলে তুমি তায়
তোমার কন্দরে, নাহি ভাবি পূর্ব্বাপর—
ভাবিলে না সতীতেজ কিরূপ প্রখর।

"পতির দুর্দ্দশা শুনি সতী অচঞ্চল
অশনি-তাড়িতা প্রায়!
সহসা সে বেগে ধায়
মুহূর্ত্তে সম্বিৎ লভি, বাঁধিয়া আঁচল।
ছুটিলা যথায়, তুমি আছহে অচল।

"পতি সোহাগিনী ধনী মনের হরষে
সুবেশ রচনা করি,
ভালেতে সিন্দুর পরি,
সিন্দুরের কৌটা হাতে গৃহে ছিলা ব'সে,
আহা, প্রিয় প্রাণপতি আগমন আশে।

"হাতে কৌটা ছিল যথা, ছুটিলা তেমনি,
উত্তরিলা তব পাশে
প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে,
আলু থালু,বেশ কেশ যেন পাগলিনী—
পতিহীনা অভাগিনী মণিহারা ফণী!

"পতি তরে মুগ্ধা বালা চারিদিকে চায়;
পতিধনে নাহি হেরি,
পতিনাশ শঙ্কা করি,
মুক্তকণ্ঠে কাঁদে আহা, কুররীর প্রায়—
পতিশোকে সতী নারী ধরণী লুটায়।

"স্থাবর জঙ্গম স্তব্ধ সতীর রোদনে,
যমুনার স্বচ্ছ জল,
সতী শোকে অচঞ্চল,
প্রকৃতি বিষাদময়ী সতীর কারণে,
হাহাকার ধ্বনি শুধু পশিল শ্রবণে।

"উন্মাদিনী সতী নারী তোমার অচল,
কতই বিনয় ক'রে
সেই কাল অজগরে
নিঃসারিতে বলিলা হে. হইয়া বিকল,
পাষাণ হৃদয় তবু হ'লো না তরল।

"তবে সতী রোষে অতি আপনা হারায়;
নয়নে অনল ছুটে;
কটীতে বসন আঁটে,
কৌটাসহ বাহু তুলে মহাবেগে ধায়,
দেখি সে মুরতি সবে ভরসা পলায়।

"বলে সতী উচ্চৈঃস্বরে শুনহে তপন,
তুমি সকলের গতি,
যদি আমি হই সতী,
কায়মনোবাক্যে যদি পতির পূজন
কখনও ক'রে থাকি
তা হ'লে থাকিবে সাক্ষী,
কৌটার আঘাতে গিরি করিব ছেদন,
উদ্ধারিব আজি আমি প্রিয় পতিধন।"

"জ্যোতির্ম্ময়ী বালা যেই এতেক বলিয়া,
তবোপরি কৌটা হানে;
কড় কড় মহাস্বনে,
ফাটিলে, কঠোর গিরি, দুখান হইয়া—
মহানাদে জীব জন্তু উঠে চমকিয়া।

"অজগর বুক ফেটে ত্যজিল পরাণ;
অক্ষত শরীরে পতি
বাহিরিলা শীঘ্র গতি;—
স্বরগে দুন্দুভিধ্বনি, সতী যশোগান—
চারিদিকে আনন্দের উচ্ছ্বাস মহান্।

"ছুটিল যমুনা জল কুলু কুলু তানে,
সতীত্ব মহিমা কথা
মর্ম্মরিল বৃক্ষ লতা;
প্রকৃত হাসিলা পুনঃ সতীর সম্মানে;
দশ দিক্ পূর্ণ হ'ল আনন্দের গানে।

"এদিকে লভিয়া পতি হরষিত মনে
তোমার চরণ-মূলে,
পতিসহ কুতূহলে
প্রণতি করিলা সতী সলজ্জ নয়নে,
তুষিলা তোমায়, গিরি. মধুর.বচনে।

"আশীর্ব্বাদ করি তারে বলিলে তখন:—
'প্রসন্ন তোমার প্রতি,
হ'য়েছি গো আমি, সতি,
তোমার সতীত্ব-যশ ঘোষিবে ভুবন।
যাবৎ এ চরাচর,
তারা, শশী, দিবাকর,
তাবৎ তোমার কীর্ত্তি করিব ঘোষণ,
সতীত্ব-প্রতাপ-চিহ্ন করিব ধারণ।'

" 'সিন্দুরে পাহাড়' তেঁই তব অভিধান।
সতীত্বের কীর্ত্তি ব'লে,
যমুনা তরঙ্গ তুলে
তব পদ ধৌত ক'রে আনন্দে অজ্ঞান—
কল কল নাদে ধায় পতি-সন্নিধান।

"এখনো কৃষাণ-বালা চারু মধু মাসে,
করযোড়ে তব আগে,
পতিব্রতা-বর মাগে
পতি সোহাগিনী হ'তে তব কাছে আসে;
এখনো পূজয়ে তোমা পতিসুখ আশে।"

"বালবধূ পতিগৃহ গমনের কালে,
তোমার চরণ-তলে,
করে নতি কুতূহলে,
ভিজায় চরণ তব তপ্ত অশ্রুজলে,
তোমার পবিত্র দেশ ছাড়িবার কালে।"

"এখনো প্রাবৃট্ কালে মেঘাবৃত দিনে,
যবে বরিষার ধারা,
বুক পাতি লয় ধরা,
ঠাকুমার কাছে বসি যত শিশুগণে,
শুনে সতী-কীর্ত্তি কথা অবহিত মনে।

"অদূরে কৃষক গ্রামে যদি কোন নারী,
যৌবনের মত্ততায়,
পথি ভ্রষ্ট হ'তে চায়
তোমার ভ্রূকুটী দেখে ভয় হয় তারি,
সিন্দুরে পাহাড় তাহা মহিমা তোমারি।"

কবিতা পাঠ শেষ হইলে, স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে একটী বিস্ময় ও আনন্দের অস্পষ্টধ্বনি সমুত্থিত হইল। আমিও যতীন ভায়ার কবিতাটির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যতীন তাহার কবিতার প্রশংসা শুনিয়া যেন ঈষৎ হৃষ্ট হইল এবং বলিতে লাগিল "কিন্তু এই পাহাড়ের উপরে ব'সে কবিতাটি পাঠ না ক'র্‌লে ইহার তত সৌন্দর্য্য থাকে না।"

আমি বলিলাম,—"তুমি যথার্থ ব'লেচো।"

সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইবার প্রায় উদ্যোগ করিতেছিলেন। পাহাড়ের কাল ছায়া ধীরে ধীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছিল। অদূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটী অস্পষ্ট কলরব উত্থিত হইতেছিল। রাখাল বালকেরা গো মহিষাদি লইয়া একে একে বনের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল এবং কখন কখন সুমধুর কণ্ঠে দুই একটী গান গাহিয়া সুস্বরলহরীতে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করিতেছিল। বিহঙ্গম-কুলের কোলাহলে বনস্থলী শব্দায়মান হইতেছিল এবং বৃক্ষপত্র মর্ম্মরিত করিয়া সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। সায়ংকালের এই রমণীয় দৃশ্যটি স্ত্রীলোকদের মনেও একটী অস্পষ্ট অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার করিয়া থাকিবে; যেহেতু অনেকক্ষণ কেহ একটীও কথা কহিল না এবং বালকবালিকারাও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মেজবৌদিদি যেন ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন,—"ঠাকুরপো, এ যে সন্ধ্যে হ'য়ে এল; চল বাড়ী যাই। মা আবার ভাব্‌বেন।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিলাম এবং সকলের সহিত ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে অবতরণ করিলাম। স্ত্রীলোকেরা কিন্তু নামিয়াই পাহাড়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিল।

বাড়ী আসিতে আমাদের অধিক সময় লাগিল না। আমাদের প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া জননী কেশবকে আমাদের অনুসন্ধানে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। বৌ-

দিদিরা ও বালক বালিকারা জননী ও মাসীমার সহিত বন-ভ্রমণের গল্প করিতে আরম্ভ করিল। সুশীলা ও ভূদেব তাহাদের দিদির নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিল। আমরা বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপবেশন করিলাম।

পর দিন প্রভাতে জননী ও মাসীমা বলিলেন,—"দেবু-যতীন, আমরাও এক দিন সতীর পাহাড় দেখে আস্‌বো।"

যতীন বলিল,—"সেই দিন অমনি পূজো দিয়েও এসো।"

মহাযাত্রা।

শুনিয়াছি ভক্তিমার্গ বড়ই সরল,
নিতান্ত নিশ্চিত।
নাহি দস্যুভয়, অতি কোমল, মসৃণ,
কুসুম-বাসিত।
দিনে দিনে পথিকের পথ হয় শেষ,
আসে না যামিনী ;
নাহি শ্রান্তি, নাহি ক্লেশ, অবসাদ-মেঘ,
নিরাশা-নাগিনী।
নিদাঘ-অনল নাহি, শিশির তুষার,
বরষা-কর্দ্দম ;
শুধু সুখ, শুধু শান্তি, অপার বিশ্বাস,
আশা অনুপম।
কিন্তু হায়, নয়ন মুদিয়া
ও পথে চলিতে হয় ; তাহা নাহি চাহি।
হই নাই ধৈর্য্যহীন, অত শীঘ্র তার
প্রয়োজন নাহি।
সুবিশাল, সুকঠিন, দুরারোহ ঐ
জ্ঞানমার্গ, ও পথে যাইব ;
আজি কালি নাহি পাই, এক দিন তাঁরে
অবশ্য পাইব।

আমি শুধু চাহিনা তাঁহারে,
তাঁর মহিমাও আমি চাহি জানিবারে।
পূর্ণ হয় যদি সে বাসনা,
হয়ত তাঁহারে আমি আর চাহিব না।
বারিবিন্দু দিয়া যদি
সমুদ্র তুলনা করি—
প্রিয়ারে আমার দেখ নাহি চাহি তত
যত তার ভালবাসা হৃদয়ে রেখেছি ভরি।
এ বিপুল বিশ্ব-রচনায়
অণুতে অণুতে আমি অন্বেষিব তাঁরে;
প্রতিদিন মুগ্ধ হব তাঁহার দয়ার,
তাঁর স্নেহ, মহিমার নব নব আবিষ্কারে।
প্রতি পুষ্প, প্রতি তারা, প্রতি গান, প্রতি পাখী
প্রতি জননীর মুখ, প্রতি প্রেমিকের আঁখি,
প্রতি মেঘ, বৃষ্টিকণা, প্রতি বিজলীর খেলা,
প্রতি রামধনু, প্রতি সিন্দুর-মেঘের মেলা
প্রতিদিন রূপ-গুণ কহিবে তাঁহার
অনন্ত অপার।
নদ-নদী, জলস্তম্ভ, সিন্ধু, হিমাচল,
গাইসর্, আগ্নেয়-গিরি, উষ্ণপ্রস্রবণ,
ধূমকেতু, চন্দ্রসূর্য্য, পূর্ণিমা, অরোরা;
মনোজগতের মহাতত্ত্ব অগণন;
সকলের এক ভাষা, এক তান, এক লয়—
"আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্ত মহিমাময়।"
যুগ যুগান্তর ধরি,—কল্পান্ত অবধি
সে মহাসঙ্গীত যদি নাহি শুনিলাম,
নাহি যদি ধন্য হইলাম;
কেমনে জানিব তাঁরে, কেমনে বাসিব ভাল,
কেমনে করিব পূজা, হৃদয় করিব আলো?
এইরূপে প্রতিদিন হইব মহান

দেবতা সমান।
সৃজন করিয়াছেন তিনি যে আমারে,
সার্থকতা কোথা হ'ল তার,
মাণিক্য না হইলাম যদি
উজ্জ্বল করিয়া এই সৃষ্টি-পারাবার ?
নাহি জানি কত লক্ষ কত কোটি যুগ হ'ল,
বায়ুভরে উড়িতাম তৃণ, শুষ্কপাতা ;
আজি দেখ কি পরিবর্ত্তন !

আজি জানি কে আমার অস্তিত্ব-বিধাতা।
কত লক্ষ লক্ষ কত কোটি কোটি যুগ পরে,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সর্ব্বত্র করিয়া বাস,
এই আমি দাঁড়াইব তাঁর সিংহাসন-তলে,
তিনি হাসিবেন সুখে স্নেহসম্ভাষণহাস।
তবে না সম্পূর্ণ হবে উদ্দেশ্য তাঁহার
সেই তৃণ সৃষ্টি করিবার !

তাই আমি নাহি যা'ব চক্ষু কর্ণ রোধ করি
নাম-জপ-তরণীতে ভক্তি-নদী বাহি ;
হে কাণ্ডারী গুরুদেব, চরণে প্রণাম করি,
অত শীঘ্র অধমের মোক্ষে কায নাহি।
এস সখী স্বাধীনতা—সাথে লয়ে এস
জ্যোতিষ বিজ্ঞান রাশি, সাহিত্য দর্শন আদি,
দুই জনে জ্ঞানপথে পরম কৌতুকে
চলি দিবারাত্তি।
মহাসৌন্দর্য্যের মাঝে ডুবিয়া ডুবিয়া
হয়ে যাব পরম সুন্দর ;
মহা-মহিমার ছবি দেখিয়া দেখিয়া
প্রতি দিন হব মহত্তর।
প্রতি দিন সুদুর্জ্জয় বাড়িবে শকতি

পদে পদে বাধাবিঘ্ন দলি ;'—
স্বপ্নাতীত যাহা, তাহা ঘটিবে সহজে,
শকতির সীমা যাবে চলি।
একদিন পথ শেষ হবে,
দাঁড়াইব সম্মুখে তাঁহার ;
যবে হয় আসিবে সে দিন,
পথেও ত আনন্দ অপার।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩০১। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কেরল।

(৩)

দিবাবসানে অর্ণাকোলম্ সাগরতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়া একদা দুইটি বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ লাভ করি। আনন্দের সহিত তৎসমভিব্যাহারে ইউরোপীয় পান্থনিবাসে যাইয়া বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। গতবার ভ্রমণকালে বরদায় মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবার রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদককে পাইলাম। রাজপ্রসাদ লাভেচ্ছায় আগমন করিয়া, তাঁহারা উভয়স্থানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ডাক বাঙ্গালার সম্মুখে সুদূরব্যাপী হট্টের পথ; পার্শ্বে বিবিধ পণ্যশালা; কচিৎ মলয়ারি খৃষ্টানদিগের ভোগার্থ বংশনালীর ছাঁচে ঢালা তণ্ডুলের পিষ্টক বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে। এতদ্দেশে রজক ও নরসুন্দরের কার্য্যক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। একখানি বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য এক আনা ও ক্ষৌরকার্য্যের জন্য প্রত্যেককে দেড় আনা দিতে হয়। চোলমণ্ডল উপকূলের ন্যায় মলয়ার উপকূল সমশীতোষ্ণ প্রদেশ। ঋতুভেদে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। রাত্রে শয়ন কালে স্থূলবস্ত্র ব্যবহার করিতে হয় মাত্র।

বাঙ্গালায় বসন্তকালে যে দক্ষিণ বায়ু বহিতে থাকে, বাঙ্গালী কবি তাহাকে মলয়ানিল কহেন। উহাতে কেরলে শীতগ্রীষ্মের সাম্য ব্যক্ত হয়। মলয়ার স্বায়ত্ত-প্রেমের রাজ্য; বিয়োগবিধুর ব্যক্তি সুতরাং তৎসংস্পর্শে পরিতপ্ত হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি! কথিত আছে—

"স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তেত্বভোগা
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশি ভবন্তি।"

কিন্তু আমরা পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত, বাল্যবিবাহপরায়ণ, চির-সম্মিলিত দম্পতি কিরূপে সে উগ্রসুখের অধিকারী হইব ?

দেশভেদে রুচি বিভিন্ন ; তদনুসারে সৌন্দর্য্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এক স্থানে যাহা সুন্দর, অন্যত্র তাহা কদর্য্য বলিয়া পরিগণিত। জীবমিথুন পরস্পরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত সুন্দর হইতে চেষ্টা করে। সৌন্দর্য্যবিহীন হইলে সহচর দুষ্প্রাপ্য হয়। কেরলিগণ "কল্যাণম্" (বিবাহ) বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃতিক যৌন নির্ব্বাচন বিসর্জ্জন দেন না ; বোধ হয় সেইজন্য তাঁহারা দ্রাবিড় প্রতিবাসী অপেক্ষা সুরূপ। রূপজ মোহ প্রেম-নামের যোগ্য না হইলেও প্রেমের নিদান বটে ; ইহাতেও অন্যের সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। গুণজনিত প্রণয় ভিন্ন স্থায়ী স্নেহ জন্মে না, এজন্য রূপলালসাকে পাশব-প্রেম বলে। যুবক উচ্চ আদর্শমত সংসারে গুণের অন্বেষণ করিতে গিয়া অকারণ-দুঃখ রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন। রূপ পুরাতন হয়, গুণের নিত্য নববিকাশ থাকে ; কিন্তু সকলেরই এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন উপলব্ধি হইতে থাকে, "জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।" উপস্থিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ভিন্ন সুখের অন্য উপায় নাই ; কিন্তু সুবিধা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই পুরুষার্থ, এবং ধরাধামে যোগ্যতর বিষয় বা যোগ্যতম প্রাণী ভিন্ন রক্ষা পাইতে পারে না। মলয়ারিদিগের পক্ষে রূপগুণ বিবেচনা করিয়া যৌন সম্বন্ধ স্থির করা সুসাধ্য ; প্রণয়াস্পদকে ভর্ত্তা হইতে হয় না, প্রেয়সী কেবল সঙ্গিনী মাত্র। হৃদয়ে একটি ভাব প্রবল হইলে তদ্বিপরীত স্থান পায় না। মানবকে ভক্তি, বাৎসল্য বা বৈরাগ্যের চক্ষে দেখা অভ্যাস করিতে পারিলে যৌনভাব সমুপস্থিত হইবে না। অভ্যাসের দ্বারা স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়।

মলয়ার প্রেম-সরোবরে এখনকার কালে গুরুজন-জালা যে নাই এমন নহে। যদৃচ্ছা ভোজন যেমন স্বাস্থ্যকর নহে, তেমনি স্বৈরাচার পরিণাম-শুভকর নহে। উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে শিক্ষা দেওয়া সমাজের উদ্দেশ্য। লোকের কল্যাণের জন্য সমাজ বা শাসন সৃষ্ট হইয়াছে। যুবতী স্বয়ং "গুণদোষকার" (নায়ক) বরণ করিতে অধিকারিণী নহেন, যুবক বা উভয়পক্ষীয় কর্ত্তার দ্বারা উক্ত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। দ্রবিড় সীমান্তস্থ পালঘাট অঞ্চলে নায়ক প্রথম দিন বরযাত্রীর মত আত্মীয় সমভিব্যাহারে "সম্বন্ধকারীর" (নায়িকার) গৃহে "কড়কা কল্যাণম্" (শয্যাবিবাহ)

অনুষ্ঠান করিতে গিয়া থাকেন। যুবক বস্ত্র ও তৈল লইয়া উপস্থিত হইলে গৃহস্বামিনী পাদ্যঅর্ঘ্য প্রদানে তাহাকে সম্মানিত করেন। কর্ত্রীর হস্ত হইতে বরবর্ণিনী ঐ দ্রব্য গ্রহণ করিবামাত্র "পোতমরি" ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কেরলের অন্যত্র কে কাহার নায়ক সাধারণে পরিজ্ঞাত থাকে না, ব্রাহ্মণ নায়ক মিলিলে কোন অঙ্গনা অপরকে বরণ করেন না। নায়িকা অন্যের অনুবর্ত্তিনী হইলে পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। নায়ক স্বজাতীয় হইলে প্রণয়িনীর গৃহে নিশাকালে অন্ন গ্রহণ করেন, এবং সম্ভব হইলে অলঙ্কার আদি প্রদান করিতে ত্রুটি করেন না। এতদ্দেশে পূর্ব্বে উচ্চ বর্ণের মধ্যে একাধিক নায়ক নিয়োগের নিয়ম ছিল। ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ড, নায়ার হইলে অস্ত্র গৃহদ্বারে রক্ষা করত প্রবেশ করিতেন, তদ্দৃষ্টে অন্যে গৃহাভ্যন্তরে যাইতে বিরত হইত। অধুনা সে উদ্দালকের রাজ্য নাই, সভ্যতার উদ্রেকে দাম্পত্যধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন বন্যজাতিতে রমণী ব্যক্তিবিশেষের অনুবর্ত্তিনী বলিয়া গণ্য নহে। জন্তুবিশেষ সন্তানোৎপাদন-ঋতুতে বিযুক্তমিথুন হয় না; বানরকে বহুকাল যুগ্মতা রক্ষা করিতে দেখা যায়। কথিত বন্য মানব, সহোদর সহোদরায় মিলিত হইতে কুণ্ঠিত হয় না, উহাদের সন্তানের পিতা কে নির্ণীত হইবার উপায় নাই। অন্য রমণী সন্তান প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করায়, কদাচিৎ মাতার স্থিরতা হয় না; কেবল সে অমুক জাতীয় ব্যক্তি এইমাত্র তাহার পরিচয়ের স্থল। মাতৃবংশ প্রায়শঃ নিশ্চিত থাকে ও তদনুসারে পরিচিত হয়। কোন বনচর জাতিতে বহুপুরুষসহবাসিনী ললনা অতি সম্মানিতা।

আদিম অবস্থায় মনুষ্য সন্তানের ভরণপোষণে অক্ষম ছিল, এজন্য শিশুহত্যা করিতে হইত। পুত্র জীবন যাত্রায় সাহায্য করিতে পারে, কন্যা কেবল ভার মাত্র; ইহাতে শৈশবে বহু বালিকাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়; অপিচ কথিত আছে ভ্রূণ অধিকতর পুষ্ট হইলে কন্যাত্ব লাভ করে। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের শারীর যন্ত্রের আধিক্য তাহার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে। বোধ হয় সেই কারণে স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে কন্যার আধিক্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং আদিম কালে পুত্র সন্তানের ভাগ অধিক ছিল। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বহুজন এক নারীতে উপগত হইতে থাকে। নীলগিরিনিবাসী তোডা

জাতি ও দ্রবিড়ের নায়ারদিগের বহুস্বামী প্রথা আছে। তিব্বতীয় লাসা নিবাসিনী একটী মহিলা, কায়েত্তের বহুপত্নী প্রথা শ্রবণ করতঃ আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। "তাঁহাদের বহুপত্যাত্মক মর্য্যাদা কি সুবিধাজনক? এই প্রশ্নের উত্তরে" তিনি কহেন ভগিনী গৃহের কর্ত্রী ও ভ্রাতৃধনাধিকারিণী। স্বামিগণ তাঁহাকে অতি স্নেহ করেন। যথায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধনাধিকারী হইতে পারে না; সেখানে পৃথক স্ত্রীবরণ করা দুষ্কর। ভ্রাতৃসমবায়ের একস্ত্রী হইলে ব্যয়লাঘব হয়। কুন্তী ভিক্ষা বণ্টন করিয়া লইতে আজ্ঞা দেন। ভুটানে বহুস্বামী প্রথা আছে, কয়েক ভ্রাতা মিলিত হইয়া এক দার পরিগ্রহ করে। নেপালউপত্যকানিবাসিনী নেওয়ার কুমারীকে প্রথমতঃ বিল্ব ও গুবাক ফলের সহিত বিবাহিত হইতে হয়, তদনন্তর তিনি পর্য্যায়ক্রমে পাঁচটি পর্য্যন্ত পতিবরণ করিতে অধিকারিণী। পত্যন্তর গ্রহণের অভিপ্রায় না থাকিলে, বিল্বফল বারিমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বৈধব্য গ্রহণ করা বিধেয়। পূর্ব্বে ইহাদিগের এক সময়ে বহুস্বামী গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। খাসিয়া ও গারো জাতিতে অদ্যাপি উক্ত ব্যবহার অব্যাহত আছে, তজ্জন্য পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে কামরূপে পাতিব্রত্যের গৌরব আরম্ভ হয় নাই।

বহুস্বামী প্রথা যেমন অকারণে প্রাদুর্ভূত নহে, বহুস্ত্রী প্রথা তদ্রূপ আবশ্যকীয় প্রয়োজনে উৎপন্ন। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের ভাগ অল্প হইলে, এক নরে বহু নারী উপগত হইবে, তাহা কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। তবে পুংজাতির ক্ষমতাধিক্য প্রযুক্ত বহুপত্নী গ্রহণ কুত্রচিৎ প্রচলিত আছে। সিংহলবাসী বাদিয়া জাতীয় প্রধান লোকের একাধিক সীমন্তিনী না থাকিলে অপমানের বিষয়। বাঙ্গালায় কুমারীদের জন্য পাত্র নির্ব্বাচন করা দুষ্কর হইয়াছে, সুতরাং সমাজ-সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ কি করিয়া প্রচলন করিবেন?

কেরলে "নায়ক" বরণের পূর্ব্বে যে নিষ্ফল বিবাহের অনুকরণ করা হয়, তাহাকে তালি-বন্ধন কহে; এ পদ্ধতি যজমানের ক্রিয়াবাহুল্য করিবার জন্য পুরোহিতের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। দ্রাবিড় সধবা উভয় পদের মধ্যমাঙ্গুলিতে রৌপ্য অঙ্গুরীয় ত্রয় ও গলে মালাদ্বয় ধারণ করেন। ঐ মালাকে তালি কহিয়া থাকে, উহার এক গাছি পিতার, অপরটি স্বামী কর্ত্তৃক উদ্বাহকালে প্রদত্ত হয়। বৈষ্ণবের বিষ্ণুমূর্ত্তি ও শৈবের মাল্যে শিব-চিহ্নাঙ্কিত সুবর্ণ আলম্বন প্রদত্ত থাকে। কেরলি-বিবাহে তজ্জন্য কন্যার গলে তালি-

সূত্র আবদ্ধ করিতে হয়। বর দিনত্রয় অবস্থান করতঃ বিবাহ পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়া প্রস্থান করেন; তদবধি পাত্রীর সহিত সম্পর্ক রহিত হইল।

জেমরিন্ রাজবংশীয়া কন্যার কোন ব্রাহ্মণের সহিত তালি বন্ধন হইলে পশ্চাৎ অন্য নম্বুরিকে বরণ করিয়া থাকে। নায়ার কুমারী বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে তালিবন্ধন করিবে, তদনন্তর নায়ক স্থিরীকৃত হয়, পুরুষের পক্ষে তালিবন্ধন সংস্কার অনাবশ্যক। কোন নায়ার রমণী তীর্থ ভ্রমণ ব্যতীত, মলয়ার সীমান্তে কোরপুজা নদের পর পারে যাইতে অধিকারিণী নহেন; সেইজন্য "সম্বন্ধকারণের" সহিত বিদেশ যাত্রা করিতে সক্ষম। দ্রবিড়ে নাট কোট চেট্টীজাতীয়া রমণী ও কাশ্মীরে স্ত্রীজাতি স্বদেশের সীমা অতিক্রম করেন না। মলয়ারি গ্রাম্য শিক্ষক পদুপত্তর জাতীয়া ননন্দা, বধূর গলে তালিবন্ধন করিয়া দেয়। ভার্য্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে পতিগৃহে বাস করে, পুত্র জন্মিলে বিধবাবস্থায় পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ। গ্রহাচার্য্য কণিয়ার ও পনিক্কর জাতিতে ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া এক নারী গ্রহণ করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কাংসকার প্রভৃতি জাতিতে বহু-স্বামী প্রথা আছে। নারিকেলি-আসব ব্যবসায়ী থিয়ার জাতি, এখানকার প্রথম উপনিবেশী। তাহাদের দম্পতীকে জীবন-সংগ্রামে একত্র থাকিতে হয় না। আতিপুরের থিয়ার ভ্রাতৃগণ এক স্ত্রী মনোনীত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে মিলিত হয়।

মলয়ার স্বাধীন প্রেমের দেশ বলিয়া সন্তান পোষণের ভার মাতার উপর ন্যস্ত থাকে, তজ্জন্য ধনের উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে সাম্যনীতি প্রচলিত। "তারায়াদ" (একান্নবর্ত্তী পরিবার) মধ্যস্থ কোন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তদীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তি, পারিবারিক সাধারণ ধনের সহিত মিলিত হইবে। সাধারণ সম্পত্তির বণ্টন নাই। স্বোপার্জ্জিত বা পৃথকীকৃত ধনের দান বিক্রয় নিষিদ্ধ নহে। পরিবারস্থ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা নারী "কর্ণবন্' (কর্ত্তা) হইয়া ক্ষমতা সঞ্চালন করেন। তাঁহার আচরণ গর্হিত হইলে পরি-বারস্থ লোকে অপরকে অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারে। কর্ত্তা দায়াদ-গণের সম্মতিক্রমে স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে অধিকারী। তিনি স্বকীয় প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিলে পারিবারিক বিষয় তজ্জন্য দায়ী নহে। মৃত ব্যক্তির ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য ভাগিনেয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্বগ্রীয় পরিচয় স্থলে মাতুলের নাম লয়, কাহারও ভগিনীর অভাব হইলে

দত্তক ভগিনী গ্রহণ করিবে। সমৃদ্ধ পরিবারে আবশ্যক হইলে, সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য সেই সঙ্গে একটি বালককেও দত্তক গ্রহণের রীতি আছে। পুত্রের ন্যায় কন্যা মাতার এক উদরে জন্মগ্রহণ করেন, তজ্জন্য সে পরিবারের মধ্যে স্থান পাইতে অধিকারিণী। মলয়ারে ভগ্নী অতি আদরণীয়া ও তদীয় সন্ততি যত্নের সহিত প্রতিপালনীয়; অতএব স্বস্ত্রীয় উত্তরাধিকারী পদবাচ্য; তজ্জন্য রাজপরিবারে ভাগিনেয় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজভ্রাতা বা পরিবারস্থ অপর কেহ ভাগিনেয় অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিলে, "তারয়াদ" নিয়মানুসারে তিনি রাজ্য অধিকার করেন।

কেরলের দায়ভাগ সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থ নাই। এই বিষয় কেবল পরম্পরাগত ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে। অন্ধ্র, কর্ণাট ও দ্রবিড়ে তিনখানি স্মৃতি প্রচলিত। ১ম খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত, দেবানন্দ ভট্টের স্মৃতি-চন্দ্রিকা; ২য়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য্যের রচিত পরাশরমাধব্য নামক পরাশর সংহিতার টীকা; ৩য়, উক্ত শতাব্দীর বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্র কৃত স্বরস্বতী বিলাস। ইহাতে কেবল দায়াধিকার নিবদ্ধ হয় নাই। ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে দেশাচার নিয়মিত করা যায় না, দেশাচারকে আদর্শ করিয়া স্মৃতি রচিত হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের প্রমাণ না পাইলে স্মার্ত্তগণ শ্রুতি কল্পনা করেন; তজ্জন্য মিথ্যাবাদ অপকর্ম্ম বিবেচিত হয় না। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বমত স্থাপনের জন্য বহু প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রামাণিক কি না কেহ অনুসন্ধান করেন না। সভাস্থলে বিদ্যার্থিগণ পূর্ব্বপক্ষ ও অধ্যাপকেরা উত্তর পক্ষ গ্রহণ করেন। সত্যনির্ণয়, বিচারের উদ্দেশ্য না হইয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করা অভিপ্রেত বিষয় হইয়া থাকে। নবদ্বীপের কুশদহ সমাজান্তর্গত ইছাপুর নিবাসী কোন স্মার্ত্ত কাশীধামে অধ্যাপনা কালে কহিয়াছিলেন যে, তিনি যৌবনকালে এক শ্রাদ্ধীয় সভায় মত বিশেষ স্থাপন কালে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হইয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন করত তদুপযোগী একটি শ্লোক রচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের একটি পত্র পরিবর্ত্তিত করত, উক্ত শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত করেন, সেই পত্রের নবীনত্ব অপনোদনের জন্য গোময়ের মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল; পর দিন সভাস্থলে তৎ-প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ করিলেন। স্বাধীন মত সাধারণে গৃহীত হইবে না বলিয়া শাস্ত্রীয় টীকাকার আপন উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া মূলগ্রন্থ ব্যাখ্যা করেন; উহা অধিকতর উপযোগী হয়, ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্য অপেক্ষা মিতাক্ষরা

সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মলয়ারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের অনভ্যস্ত বলিয়া কেরল গার্হস্থ প্রণালী শাস্ত্রীয়তা প্রাপ্ত হয় নাই। মলয়ারে যখন নব ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে, কালক্রমে ভাগিনেয়াধিকার সংস্কৃত গ্রন্থে স্থান পাইবে। পয়নুর গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশে "মরুমকতয়ম্" (ভাগিনেয়ের দায়াদত্ব) প্রচলিত।

পূর্ব্বকালে কেরলে ভূসত্ব সম্বন্ধে উদার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ভূমি সমাজের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। পর্য্যায়ক্রমে শস্যবপন প্রথা ও সাময়িক বিভাগের নিয়ম অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। পশ্বাদি জীবকেও পরস্পর সাহায্য করিতে দেখা যায়; মানব মণ্ডলীতে সহায়তার জন্যই সমাজের উৎপত্তি। জন্ম গুণে বা ঘটনা পরম্পরার আনুকূল্যে কেহ বিপুল ধনাধিকারী ও অপরে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইবে, ইহা সমাজনীতি বিরুদ্ধ হওয়া উচিত। ভরণ পোষণের অতিরিক্ত সম্পদে সাধারণের স্বত্ব আছে। ইউরোপ সার্ব্বজনিক সমৃদ্ধি প্রিয়তার জন্য ধন্য। সে কালে ইউরোপ খণ্ডে সাধারণের জন্য বাণিজ্য হইত। ব্যবসায়ের উপযোগিতা এই যে প্রকৃতির কল্যাণে স্থান বিশেষে কোন দ্রব্য সুলভে উৎপন্ন হইয়া, অন্যত্র অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ করিয়া দিলেও তত্রত্য লোকের সুবিধা থাকে, সেই সুবিধার মূল্যকে লভ্য কহা যায়। এই লভ্য ইউরোপে জানপদগণকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। তদুপলক্ষে গ্রামান্তরবাসী সার্থবাহ আসিলে পৌরগণের অতিথিরূপে পরিগণিত হইতেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া অধুনাতন ইউরোপীয় শ্রমজীবিদলের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, বণিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, সাম্রাজ্য কর্তৃক বাণিজ্য পরিচালিত হউক। তাহারা শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, সাম্রাজ্যের রাজকোষ তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবে। যে আলস্য বশতঃ কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। পাশ্চাত্য সমাজ সাধারণতাপ্রবণ বলিয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে সম্ভূয়সমুত্থানের প্রাবল্য দেখা যায়। আমরা পরার্থপরতায় যে স্বকীয় হিত আছে, তাহা না বুঝায় সমবেত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি নাই।

নব উপার্জ্জিত স্থানে উপনিবেশিগণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে, তাহারা সে অবস্থায় সকলেই সমকক্ষ; ইহাতে যোদ্ধৃতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ করিবার অগ্রে মলয়ার প্রদেশে সর্ব্বাঙ্গীন যোদ্ধৃশাসন

প্রচলিত হইয়াছিল। কয়েকখানি "দেশম্" (গ্রাম) এক "দেশবলীর" অধীন থাকিত। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া "নাদ" গঠিত হইত, সেগুলি যাঁহার অধীন তিনি "নাদবলী" বা স্থানীয় নিয়ন্তা, তিনি "কোবিলগম্"এর (রাজার) অধীন ছিলেন। উত্তরাধিকারিবিহীন ভূমি, ভোগস্ব ভূমি, দ্রব্যজাত ও বিদেশীয়ের নিকট শুল্ক গ্রহণ প্রভৃতির আয় হইতে "কোবিলগম্" অর্থ সংগ্রহ করিয়া কর্ণাটের চের সম্রাটকে প্রদান করিতেন। এই কর সংগ্রাহক রাজা জনসমাজ কর্ত্তৃক নিয়োজিত ও তদধীনে কার্য্যকারক ছিলেন।

তৎকালে শূদ্রদিগের যে পল্লীসমাজ স্থাপিত হয়, তাহা "তর" নামে অভিহিত। ভূমির সাধারণ অধিকার তদধীন ছিল, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ উক্ত সংসদের নেতা ছিলেন। তাঁহাদিগকে "কুত্তং" (সভা) আহ্বান করিয়া কর্ত্তব্য আলোচনা করিতে হইত, কালে রাজা পরাক্রান্ত হইলে তিনি পল্লীসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন; ইহাতে সামাজিক বল হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। ইদানীং পূর্ব্বতন পল্লীসমাজ একান্নবর্ত্তী পরিবারের পরিজন-তন্ত্ররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালায় পূর্ব্বে যে পল্লীসমাজের অস্তিত্ব ছিল, মণ্ডলপতি, কোষ্ঠপাল ও পট্টলেখকের পদ দৃষ্টে তাহা অনুমিত হইবে।

মলয়ারে ভূমির সাধারণ স্বার্থস্বপ হ্রান্ গ্রামসত্ব হইতে সংকীর্ণ পারিবারিক সত্বে উপনীত হইলে পর, ব্যবহারিক বিষয়গুলি সামন্তবলের অধীন করিবার উপক্রম হইতে লাগিল। ইহাতে রাজা ও স্থানীয় নিয়ন্তাদিগের সহিত জনসমাজের ভোগস্ব সম্পর্ক উদ্ভূত হয়। পরিজনতন্ত্র সম্পত্তির উপর প্রাদেশিক নিয়ন্তা ব্যক্তিগত সত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহার ফলে সংগ্রামের সময় সেনাপতিকে যে অর্থ সাহায্য করিতে হইত, ক্রমে তাহা ভূমির কর হইয়া দাঁড়াইল। দেবস্ব ভূমির কৃষক ও ব্রাহ্মণ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে ক্ষতি রহিল না। করসংগ্রাহক ও শাসনকর্ত্তা ভূম্যধিকারিত্ব লাভ করিলেন। নায়ারগণ প্রজারূপে পরিগণিত হইল; তদবধি তাহারা স্থায়ি-সত্ববান হইয়াছে। যতকাল ভূমির উৎকর্ষ সাধনে বিরত না হয় ও কর প্রদানে সক্ষম থাকে, তদীয় স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে।

বৃটিষ মলয়ারে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশের ন্যায় ভূম্যধিকারীর সহিত রাজস্বের চিরস্থায়ী নিয়ম হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরাজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া প্রজার অধিকার বৃদ্ধি করিতে উৎসুক হইতেছেন। "বেরুম্ পাট্টাম্"

সত্বের প্রজা, শস্য উৎপাদনের ব্যয় গ্রহণ করতঃ উৎপন্ন সামগ্রী ভূম্যধিকারীকে দিয়া থাকেন। ভূম্যধিকারী প্রায়শঃ উৎপন্ন বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া কৃষকের নিকট একতৃতীয়াংশ অর্থ গ্রহণ করেন। "কানম্ পাট্টম্" প্রজা ভূস্বামীর নিকট কিঞ্চিৎ ধন বা ধান্য গচ্ছিত রাখিয়া অনধিক দ্বাদশ বৎসরের জন্য ভূমি গ্রহণ করে। তাহারা উৎপাদন ব্যয় ও বীজের মূল্য বিয়োগ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ ভূম্যধিকারীকে প্রদান করে, এবং স্বীয় গচ্ছিত অর্থের কুসীদ গ্রহণ করিয়া থাকে। যে ভূমির উপস্বত্ব আধমন রক্ষা করিয়া ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাহা "তট্টি" নামে অভিহিত, এই অর্থ ব্যবহারে কলাবৃদ্ধি নাই। ভূমি বিক্রীত হইলে উত্তমর্ণ সর্ব্বাগ্রে ক্রয় করিতে অধিকারী। হস্তান্তর করণের উপরিউক্ত বিধিত্রয়ের কোনটি অগ্রে অবলম্বিত না হইয়া বৃটিষ কেরলে ভূমি বিক্রয় হয় না। পুরস্কার বা কোন কার্য্যের বেতন স্বরূপ চিরস্থায়ী স্বত্বে যে ভূমি প্রদত্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে দাতা পুনঃপ্রাপ্ত হন। দেবস্ব সম্পত্তি পূর্ব্বে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল, ইংরাজ রাজশক্তি গ্রহণ করিলে, তদধীন হইয়াছে। কুচ্চি বৃটিষ মলয়ার ভুক্ত নহে, অত্রত্য ভূসত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে।

আমরা সুদূর ভারত সীমান্তে সাম্যের বিবিধ আকার পরিদর্শন করতঃ অতিমাত্র আনন্দ অনুভব করিতেছি। সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় মনুজ মাত্রে সমান। নৈসর্গিক প্রকৃতি ও সম্পত্তির অধিকারিত্বে তাবৎ লোক সমভাবাপন্ন। সভ্যতা বৃদ্ধি হইলে বৈষম্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অনিষ্ট দেখিলে বস্থাবস্থা প্রীতিপ্রদ বিবেচিত হইয়া থাকে। কখনও সাম্য, কদাচিৎ বৈষম্য উন্নতিজনক। সাম্যের অবস্থায় বৈষম্য, এবং বৈষম্যের অবস্থায় সাম্যের জন্য আন্দোলন হয়।

শ্রীদুর্গাচরণ ভুতি।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

রসলীলা। ভক্তিযোগ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায়, বি, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।/০। রচয়িতার নাম নাই ;— কেবল, "প্রকৃতি গায়িকা", এইমাত্র লেখা আছে।

এখানি গানের পুস্তক। মানবাত্মা নায়িকা, পরমাত্মা নায়ক, এই ভাব হইতে গানগুলি রচিত। তাহা ছাড়া "শিশিরকণা" ও তণ্ডুলকণা শীর্ষক দুইটি গদ্য রচনা আছে; এগুলি পরস্পর সম্পর্ক-বিরহিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (আকারে 'ক্ষুদ্র' বলিতেছি) ভাবের গ্রন্থন।

প্রকাশক ভূমিকায় বলিতেছেন—"গ্রন্থকার কবিতাগুলি রচনা ও গান করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন; কোন দিন যে নিজে উদ্যোগী হইয়া পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিবেন, এ বাসনা তাঁহার কখনও ছিল না। নিতান্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কবিতাগুলি ও তণ্ডুলকণাগুলি তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।" সাহিত্য সৃষ্টি করা আমাদের এই গীতকর্তার উদ্দেশ্য নহে; তিনি ভক্ত, সাধনার অবস্থায় স্বীয় মনোভাবগুলি গীতাকারে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং এই গ্রন্থে সাহিত্য হিসাবে যে অল্প সল্প দোষ বা ত্রুটি আছে, তাহার আলোচনা হইতে আমরা বিরত থাকিব।

আমাদের দেশে বৈষ্ণবকবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনার ছলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার বিরহমিলন বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী কবি শ্রীমতী গায়ন ঈশ্বরকে পতি সম্বোধন করিয়া অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন। পারসী সাহিত্যেও হাফিজ্ এবং আবু সৈয়দ (যিনি আবুল খায়েরের পুত্র; আরও 'আবু সৈয়দ' আছে) প্রভৃতি কবিগণ এই ভাবে অনুপ্রাণিত। কিন্তু ইহার মধ্যে কথা আছে। আমাদের বৈষ্ণবকবিতা ও হাফিজের কবিতা যে ভাবের, আবু সৈয়দ এবং শ্রীমতী গায়নের কবিতা সে ভাবের নহে। বৈষ্ণবকবিতায় আধ্যাত্মিক-ভাবটা আধিভৌতিক-ভাবের গাঢ়কৃষ্ণযবনিকায় এমন সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন, যে কাহারও সাধ্য নাই তাহার অন্তর্ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাব অনায়াসে প্রত্যক্ষ করে। এই বিরহমিলনলীলায় শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রাধা জীবাত্মা এটা যদি আমি স্বীকার করিলাম, তবেই ভাল; নচেৎ তর্ক করিয়া প্রমাণ করা সহজ নহে। হাফিজের কবিতাও তাহাই;—তাঁহার শত্রুপক্ষেরা আধ্যাত্মিক ভাব আদৌ স্বীকারই করে না; আবার, যাহারা তাঁহার ভক্ত, তাহারা তাঁহার শব্দাবলীর এক আধ্যাত্মিক অভিধান প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে, যথা 'মদ্য' অর্থে 'আত্মসমর্পণ,' 'নিদ্রা' অর্থে 'ভগবচ্চিন্তা' 'সুগন্ধ' অর্থে 'ঈশ্বরকৃপার আশা' 'চুম্বন' ও 'আলিঙ্গন' অর্থে 'ধার্ম্মিকের পুলকমত্ততা,' 'শৌণ্ডিকালয়' অর্থে 'নিভৃত বক্তৃতালয়' 'শৌণ্ডিক' অর্থে 'শিক্ষাগুরু,' 'পৌত্তলিক,' 'অবিশ্বাসী,' 'ব্যাভিচারী' অর্থে 'পরম ধার্ম্মিক

পুরুষ' ইত্যাদি*। শ্রীমতী গায়ন ও আবু সৈয়দের কাব্যে আধিভৌতিকের কোনও আবরণ নাই। তাঁহারা নিজেই বক্তা; ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই আপন আপন প্রেমসঙ্গীত গাহিয়াছেন। রসলীলার গানগুলিও এই শ্রেণীর। সুতরাং ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যে এই পুস্তকের মন্তব্যে লিখিয়াছেন (এই মন্তব্য পুস্তকের আবরণেই মুদ্রিত আছে) —"এ প্রকার গানের অপব্যবহার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এ প্রকার গানের অপব্যবহার হইতেই নেড়ানেড়ির দলের সৃষ্টি হইয়াছে।"—আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এ আশঙ্কার তত কারণ নাই। বৈষ্ণব-কবিতার অগ্নি মৃত্তিকা-গোলকে আবৃত আছে বলিয়াই নেড়ানেড়িরা তাহা লইয়া নিরাপদে ভাঁটা খেলাইয়াছে।

যে মহান্ প্রেমধর্ম্ম হইতে এই সকল কবিতার উৎপত্তি, তাহার কোন প্রকার আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে; এবং তাহার জন্য যে প্রচুর ক্ষমতার প্রয়োজন, তাহাও হয় ত আমাদের নাই। আমরা শুধু গান-গুলির আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।

এ পুস্তক আর কাহাকে উপহৃত হইবে? বাগীশ্বরী রাগিণীতে ভক্তকবি গাহিতেছেন:—

পাগলিনী-নাথ তুমি, পাগলিনী আমি তব।
তোমারি সোহাগে, নাথ ফুটেছে ফুল নব নব॥
গাঁথি বন ফুল মালা, সাজা'য়ে বরণ ডালা,
এসেছি তোমার কাছে—কেন—কেন—কি তা কব!

গ্রন্থারম্ভে কতকগুলি সুন্দর "উদ্বোধন"-সঙ্গীত আছে;—তাহার মধ্য হইতে দুইটি এখানে তুলিয়া দিতেছি।

(সারঙ্গ—ঝাঁপতাল)

মহিমা মন্দির মাঝে বিরাজেন বিশ্বপতি,
পুলকে নিখিল বিশ্ব সসম্ভ্রমে করে নতি;
মহান্ সমাধি মাঝে
মহা শূন্য সদা রাজে,
দক্ষে কোটি রবি চন্দ্র নির্ভয়ে করিছে রতি।
অসীম রহস্যধাম, ছুটে কাল অবিরাম,
জন্ম মৃত্যু সঙ্গে ধায়, সকলি নিগূঢ় অতি।
ঘন অবিদ্যার মাঝে,
মহাজ্ঞান সদা রাজে,
লীলাময় রসধাম স্বপ্রকাশ মহা জ্যোতিঃ।

(পরজ ঝাঁপতাল)

তোমারে বুঝিতে গেলে অবোধ হইয়ে যাই;
আপনি বুঝা'লে তুমি তখনই তোমারে পাই।

* এ নাম Asiatic Society of Bengal সম্পাদিত Thomas William Beale সাহেব কৃত Oriental Biographical Dictionary হইতে গৃহীত হইল।

তোমারে ছাড়িয়ে পথে আপনি চলিতে চাই—
যেতে না যেতেই পথে অমনি পথ হারাই।
তোমারে ছাড়িলে পাপ নিজে না দেখিতে পাই ;
বসিলে তোমার কাছে কাঁপে পাপ দেখি তাই।
মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, বনিতা, ভগিনী, ভাই,
তোমা ছাড়া হলে দেখি আজি আছে কালি নাই।
তোমারে পাইলে নাথ তোমাতে সকলি পাই ;
ভাবিলে ঝরে গো আঁখি তোমারই তুলনা নাই।

তাহার পর "পূর্ব্বরাগে"র বর্ণনা। অন্তরের নিভৃতকেন্দ্রে বসিয়া কে যেন বাঁশী বাজাইয়া প্রেমিকা মানবাত্মাকে আহ্বান করিতেছে। সেই বংশীধ্বনি তাহাকে মুগ্ধ করিল, পাগল করিল। সে পথ জানে না, কোথায় যাইলে তাহাকে পাইবে! ক্রমে সেই আহ্বানকারী

আসি দীনবেশে হৃদি দ্বারদেশে
আঘাত করে গো।

প্রেমধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের এইখানেই পার্থক্য। তিনি যেমন আমার প্রার্থনীয় ধন, আমিও সেইরূপ তাঁহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই আমি তাঁহাকে ভুলিলেও, তিনি আমাকে ভুলিতে দেন না।

(ওগো) শুনি যে [illegible] বিশ্ব— ভুবনের নাথ
লুটায় [illegible] নিখিল ;
(তবে) ভিখারীর দ্বারে ভিখারীর বেশে
কেন গো দাঁড়াইল ?

এ বড় সমস্যা! একেই ত আমিই ভিখারী ;—আমার অশেষ অভাব, অনন্ত দারিদ্র্য—আমাকেও তাঁহার এত প্রয়োজন!

প্রেমিক ধরা দিল—"সম্ভোগ" আরম্ভ হইল। তাঁহার মধুর করস্পর্শে প্রেমিকার শিরায় শিরায় রসের লহরী ছুটিল। প্রেমিকা তখন আত্মহারা হইয়া গাহিল :—

স্বরগের সুধারাশি মরতে কি নামিল !
বসন্ত কি নবসাজে বসুধা সাজাইল !
রূপ রস গন্ধ ভাষা গান, পুণ্য প্রেম ভাব প্রাণ
[illegible] কুহকে একেবারে সব ফুটে উঠিল।
এত আলো মাঝে কেন কিছু না দেখিতে পাই
আশা আনন্দে কিরে নয়নেতে জ্যোতি নাই !
আয় বঁধু আয় আয় বুকের মাঝারে আয় ;
হেরিতে ও মুখ কেন জলে আঁখি ভরিল॥

অন্যত্র, কেমন গভীর তন্ময়ত্ব—

ফুলময়! ফুলময় !! হেরি সব ফুলময় !!!
আবেশে অবশ অঙ্গ সহজে গলিয়া রয়,
আবেশে অবশ আঁখি সহজে মুদিয়া রয় ;
আয় মণি দূরে কেন, আয় কাছে, আয় আয়।

নয়নের নীর দিয়ে চরণ ধোয়াইব,
নিবিড় কুন্তলদামে যতনে মুছায়ে দিব ;
প্রেমেতে শ্রীমুখ, ঘন চুম্বনে চুমিয়ে নিব.
গভীর আঁখির কথা আঁখিতে শুষিয়ে নিব।
মরমের পুঁথি খানি খুলে দেখ সখা গো
পাতে পাতে আঁখিজলে কি আছে লেখা গো !
জীবন মরণ মাখা কত ব্যথা আছে আঁকা
চার চিকুরে গাঁথা সযতনে রাখা গো।

"সম্ভোগে"র অন্তর্গত এইরূপ অনেকগুলি গানে রসতরঙ্গ বহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হাফিজের কবিতায় মদ্যপান অর্থে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ; ইহার একটি গানেও সেই মদ্যপানের কথা বর্ণিত আছে :—

মন মদিরা পানে মাতোয়ারা
আলু থালু নিশিদিন !
লোকে যত বলে
ততই আরও ঢালে
একি পণ সুকঠিন।
লাজ ভয় গেল, পাগল ভেল
লোকের গঞ্জনা আর ত বাজে না,
পিয়ে পিয়ে দিশাহীন।

(ও তার) দিধি কিরা ;
রক্তিম বিভা,
ঢালে আর খায়
খায় আর ঢালে
তবু তৃষা নয় ক্ষীণ।

যাহার একবার নেশা চড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে আর কে ফিরাইবে ? লোকের গঞ্জনা, অন্য প্রকারে সহস্র বাধাবিঘ্ন, তাহাকে নিবৃত্ত করা দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর উত্তেজিতই করিবে।

এইবার "বিরহ"। প্রকাশক মহাশয় ভূমিকায় বলিয়াছেন—"ভগবান মানবাত্মায় প্রথম দর্শন দিয়া তাঁহার সঙ্গসুখরস আস্বাদনের সুবিধা দেন ; তাহার পর অদৃশ্য হইয়া যান। ইহাতেই অনুরাগ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠে।" একদিন সহসা প্রেমিকা অন্ধকার দেখিল—হৃদয়নাথ অদৃশ্য হইয়াছেন। তখন কাঁদিয়া গাহিল—

কোথা গেল রে,
আমায় এমন করে' পাগল করে' ?
যখন জান্‌তাম না চিন্‌তাম না তারে গো,
তখন সে কতই ব্যাকুল আমার তরে।
যখন চিন্‌লাম তারে আপন বলে' গো,
তখন ফাঁকি দিয়ে গেল চলে'।

আবু সৈয়দও কাঁদিয়াছেন—

In Thine own house Thou gavest me a p'ace,
And with sweet intercourse my soul didst grace ;

With all thy charms Thou didst excit my love,
Then turned, and to the desert set thy face.*

—তুমি স্বীয় গৃহে আমাকে স্থান দিয়াছিলে, মধুর সঙ্গসুখে আমার আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলে, অশেষ প্রকারে আমার প্রণয় উত্তেজিত করিয়া এখন অদর্শন হইয়াছ !

এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত দিন কাটিয়া গেল, তবু ভগবানের দর্শন নাই—

পথপানে চেয়ে জীবন গোঁয়ানু ;
বঁধু আমার কেন এল না ?
আশা প্রপাতে হৃদয় ক্ষরিল,
এ আশা কেন গেল না ?
প্রাণমাঝে কেন ফোটে এ ফুল,
কি মনোমদে পরাণ আকুল ;
যতনে সাজান হৃদয় কুটীর
ভাঙিল, তবু এল না।
পায়েরি শব্দ শুনিব বলিয়া,
থাকি গো নীরবে নিশ্বাস রোধিয়া
ঘুমাই স্বপনে দেখিব বলিয়া,
এ নেশা কেন ছুটিল না ?

যত দিন যায়, ততই সন্দেহ হয়, তাঁহার সে প্রেম ছলনা নহে ত ?

শঠতা মাথান আঁখি পীরিতির রঙে ঢাকি,
মরম ভেদিতে গেল রাখিয়া।

যেখানে প্রণয়, সেইখানেই সন্দেহ। শ্রীমতী গাইনও এইভাব প্রকাশ করিয়াছেন :—

Is this the joy so promised ? this the love,
The unchanging love, so sworn in better days* ?

* ইংরাজ-কবি Cowper কর্ত্তৃক অনূদিত।

—কত যে সুখের কথা বলিয়াছিলে, তাহা কি এই ? তোমার ভালবাসা কি এই ? তুমিই না সে সব দিনে বলিতে, তোমার প্রণয়ে কখনও অন্য ভাব হইবে না !

"বিরহ"-সঙ্গীতেই গানগুলি শেষ হইয়াছে। মিলনটা বাকী রাখা ভাল হয় নাই। একটা প্রবাদ আছে, যদি রামায়ণে "লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন" পড়া যায়, তবে সেদিন "প্রাণদান" পর্য্যন্ত পড়া চাই-ই ;—নহিলে পাপ হয়। প্রকাশক মহাশয় অনায়াসেই বহিখানি মিলনান্ত করিতে পারিতেন। "সম্ভোগে"র অন্তর্গত এমন কতকগুলি গান আছে, যাহা এই কাজে লাগান যাইতে পারিত ; যথা—"এঁকি আজ কিরে আইল ফিরে সখা আমারি," "আমার ঘরে আজ (ও) কি শোভারে, আমার সোণার সখা আজ এসেছে,"

* Mr. E. H. Whinfield কর্ত্তৃক অনূদিত।

"এতদিন পরে এলি ফিরে ঘরে," "প্রাণপতি আর ছেড় না, আর ছেড়ে যেওনা"। এগুলি সম্ভোগের মধ্যে অপবিন্যস্ত হইয়াছে। "পূর্ব্বরাগে"র পরই যখন "সম্ভোগ," তখন সেটা প্রথম মিলন বলিয়াই বুঝায়; সুতরাং তাহাতে ফিরিয়া আসিবার কথা, আর না ছাড়িয়া যাওয়ার প্রার্থনা, কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে?

সুরসংযোগ করিলে তবে গানের প্রাণসঞ্চার হয়। প্রকাশক মহাশয় পাদটীকায় গানগুলির সুর ও তাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আশা করি, সঙ্গীতজ্ঞ-পাঠকগণ এ বহিখানি অধিকতর মাত্রায় উপভোগ করিতে পারিবেন। শ্রীঃ—

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ভগবানকে সর্ব্বাগ্রে নমস্কার করিয়া, সাধারণের অবগতির জন্য আগষ্ট মাসের কার্য্যবিবরণ প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেবিয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। কুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণী, ১০। সরস্বতী, ১১। নিস্তারিণী, ১২। সখী, ১৩। রাজেশ্বরী, ১৪। ব্রহ্মময়ী, ১৫। রাজেশ্বরী ২য়, ১৬। ঈশ্বরী, ১৭। রামদাস, ১৮। শরৎ, ১৯। নিস্তার, ২০। মণি, ২১। জুলি, ২২। মহাবীর, ২৩। হরিচরণ, ২৪। আনন্দ।

এ মাসেও অনেকেই জ্বর ও কাশীতে বিশেষ ভুগিয়াছে।

রাজেশ্বরী আরোগ্যলাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

রাজেশ্বরী ২য়। বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। নিবাস ঘাঁটালের অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে। একটি ভদ্রলোক ইহাকে রাস্তায় পাইয়া এখানে দিয়া যান। ইহার রোগ বড়ই সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ঈশ্বরী। ইহার বিশেষ বিবরণ দাসীতে পূর্ব্বে প্রকাশিত হবয়াছিল। এই বৃদ্ধা আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে যায়, কিন্তু নিজের অত্যাচার বশতঃ আবার রোগাক্রান্ত হয়।

রামদাস। বয়স ২১ বৎসর। নিবাস বেনারস জেলাস্থ তাম্বাগড় গ্রামে। এই দরিদ্র আশ্রয়হীন অন্ধ বালক রাণিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় ভীক্ষা করিয়া খাইত। একদিন হঠাৎ গাড়ী চাপা পড়িয়া বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। তথাকার দয়ালু সেরেস্তাদার বাবু রজনী নাথ রায় তাহাকে বিশেষ অসহায় ও দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

শরৎ। বয়স ২২ বৎসর। এক যাত্রার দলে রাঁধুনী বামনের কার্য্য করিত। সে জ্বরে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে। এই সময়ে যাত্রার দলে বায়না হয় বলিয়া ইহাকে তাহারা রাস্তার ধারে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যায়, বলিয়া আমরা সংবাদ পাই এবং ভর্ত্তি করিয়া লই।

নিস্তার। বয়স ৩০ বৎসর। নিবাস হাওড়ার পেয়ারা বাগানে। এ নিতান্ত অসহায় ও মরণাপন্ন অবস্থায় ডুবলহাটীর রাজার হ্যারিসন রোডস্থ বাসার সম্মুখে পড়িয়াছিল। ঐ বাসায় কয়েকটি দয়ালু ভদ্রলোক উহাকে বাবু সোমনাথ রায়কে দিয়া আশ্রমে প্রেরণ করেন। পরে শুনা যায় যে, এই স্ত্রীলোকের ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতা প্রভৃতি আছে। তাহা-

দের সহিত ঝগড়া করিয়া ক্যাম্বেলে যাইবে বলিয়া পলাইয়া আসে। হাঁসপাতাল পর্য্যন্ত পৌঁছুবার পূর্ব্বেই নিতান্ত অশক্ত হইয়া রাস্তায় শুইয়া পড়ে। আমরা গাড়ী করিয়া লোক দিয়া তাহাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া আসিয়াছি।

মণি। বয়স ৩৫ বৎসর। নিবাস আজিমগঞ্জ জেলার সুধার গ্রামে। চাকর ছিল; জ্বর ও উদরাময় রোগে শয্যাগত হওয়াতে নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়ে। তখন দয়ালু হৃদয় বাবু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ইহাকে আশ্রমে দিয়া যান। অনেক আরোগ্য লাভ করাতে তাহার দেশের লোক আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়।

জুলি। বয়স ৮০ বৎসর। নিবাস ফরিদপুর জেলাস্থ লক্ষ্মীপুর গ্রামে। এই বৃদ্ধ অন্ধ এবং একান্ত অসহায়। জাতিতে মুসলমান। ফরিদপুরের রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া খাইত। ফরিদপুরের বাবু দিনেশচন্দ্র সেন উহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে আনিয়া দাসাশ্রমে দিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধা কেবল দিবারাত্রি চীৎকার করিতে থাকে "নাস্তা দাও, ভাত দাও, জল দাও, তামাক দাও।" তাহার চীৎকারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত। সে বরাবরই থাকিবে।

মহাবীর। বয়স ৪৫ বৎসর। নিবাস সুলতানপুর জেলাস্থ কোটিয়া গ্রামে। ইহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে হতভাগ্য দুইটি শিশু সন্তান লইয়া এমন ব্যতিব্যস্ত হয় যে সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া অবশেষে শিশু দুটিকে ঘাড়ে করিয়া ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। সে যখন তাহার বুকের উপর শিশু দুটি রাখিয়া নিদ্রা যাইত তখন তাহা দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হইত। মায়ের অবর্ত্তমানে শিশুর কি যন্ত্রণা, ইহা তাহার জ্বলন্ত চিত্র। কলিকাতা ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটি ইহাকে এখানে প্রেরণ করেন, ও অবশেষে টাকা দিয়া ইহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

হরিচরণ দে। বয়স ৫০ বৎসর। নিবাস যশহর জেলাস্থ পোলতানোয়াটা। এখানে কার্য্য করিত। হটাৎ হাঁপ কাশ রোগে শয্যাগত হওয়াতে একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হয় এবং সেবার অভাবে মরণাপন্ন অবস্থা হয়। তাহার বাসাস্থ কয়েক জন স্ত্রীলোক যত্ন করিয়া এখানে রাখিয়া যায়।

আনন্দ। বয়স ৬৫ বৎসর। নিবাস মেদিনীপুর জেলাস্থ কাশিয়ারী গ্রামে। বাবু চারুচন্দ্র সরকার ইহাকে দাসাশ্রমে দিয়া যান। ইহার এক সহোদরা আছে। সে লোকের বাড়ী চাকরাণীর কার্য্য করিয়া যাহা পায় তাহাতে ইহার খরচ চালাইতে পারিত না। সে অনেক লোককে অনুরোধ করে যে তাহাকে এক বেলা খাইতে দিয়া যদি কেহ তাহার ভগিনীকে একবেলা খাইতে দেয় ও একটু থাকিবার স্থান দেয়। কিন্তু কিছুতেই কোনও উপায় করিতে না পারিয়া অবশেষে চারুবাবুর পরামর্শানুসারে এখানে দিয়া গিয়াছে।

দান প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান গুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

S K. Lahiri Esq, ৯৬ সালের আগষ্ট হইতে ৯৭ সালের জুলাই ৬৲, বাবু প্রসাদ দত্ত আগষ্ট ৵০, R. N. Mukrjee Esqr. আগষ্ট ১৲, ৩৮।৫ সুকীয়া ষ্ট্রীট মেস্, জুলাই ॥০, ডাঃ প্রাণধন বসু, আগষ্ট ১৲, ডাঃ সতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আগষ্ট ।০, বাবু অভয়চরণ মল্লিক, আগষ্ট ১৲, বাবু শ্রীশ চক্রবর্ত্তী জুলাই ।০, বাবু অনাথনাথ দেব, জুলাই, আগষ্ট ২৲, বাবু কেদারনাথ দাস জুলাই ।০, বাবু কেদারনাথ ঘোষ, জুলাই ।০, বাবু যদুনাথ বরাট, আগষ্ট ১৲, বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জুলাই ।০, বাবু গৌরীসঙ্কর দে, জুলাই ॥০, বাবু পিয়ারীমোহন ভড়, জুলাই ।০, A lady C/o Babu Sreenath Das, জুলাই ১৲, বাবু নন্দকুমার দত্ত, জুলাই ১৲, বাবু পশুপতিনাথ বসু, জুলাই ১৲, বাবু বঙ্কবিহারী মিত্র,

জুলাই ।০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু, আগষ্ট ১৲, ডাঃ চুনিলাল বসু, আগষ্ট ১৲, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস, জুলাই ১৲, N. K. Bose Esqr., জুলাই ১৲, বাবু করুণাদাস বসু, আগষ্ট ।০, বাবু তেজচন্দ্র বসু, জুলাই ॥০, A Son C/o Babu Girindra Nath Ghose. ফেব্রুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর ২৲, বাবু খুদিরাম বসু, জুলাই ॥০. R C. Dutt Esqr, জুলাই হইতে ডিসেম্বর ৬৲, কলিকাতা ডিস্‌ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি, কলিকাতার ৬৪ জনের সাহায্য বাবৎ আগষ্ট ১৮৲, বাবু যোগেশচন্দ্র সিংহ, আগষ্ট ১৲, ২নং সরকার্স লেন মেস্, আগষ্ট ।০, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা, ভাদ্র ॥০, বাবু নীরোদনাথ মুখোপাধ্যায়, আগষ্ট ॥০, বাবু বেণী ভূষণ রায়, আগষ্ট ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, জুলাই ১৲, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, জুলাই ॥০ বাবু পৃথিশ্বর রায়চৌধুরী আগষ্ট ১।

এক কালীন দান।

কোনও বন্ধু. পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, একজন বন্ধু, শিবপুর ১৲, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ২৲, গরীব হিতকারিণী সভা ২৲, বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান ৵০, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, প্রচারক ৩৲, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ৵০, বাবু তারিণীমোহন দে কর্ত্তৃক কুচবিহার হইতে সংগৃহীত ১।০, বাবু হারাণচন্দ্র রায়, পুত্রের জাতকর্ম্মে ১৲, বাবু রামচন্দ্র রায় ।০, বাবু বিনোদবিহারী বন্দোপাধ্যায় ।০, বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু ॥০, ২৭।১ ঝামাপুকুর মেস্ ।০, A C. Sen Esqr, বৰ্দ্ধমান ৫৲. বাবু শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ১৲, বাবু শিবচন্দ্র চৌধুরী ১৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কাপড় খরিদের জন্য ১৲, ১৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট মেস্ ॥০, ৪৭।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট মেস্ ৴০, A friend. ।০, A friend, ।০, ১০৮ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ৵১০ ৫০ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ১৵০, বাবু হেমন্তকুমার পাল ॥০, বাবু কিরণচন্দ্র বসু ॥০, বাবু সত্যেন্দ্রনাথ আড্ডি ।৵০, বাবু শরৎকুমার বসু ৵০, বাবু শ্রীপতি দত্ত ।০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৵০, বাবু বনবিহারী বসু ।০, বাবু যুগলকীশোর ত্রিবেদী ॥০, বাবু শিশিরকুমার ঘোষাল ৵০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৵০, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৵০, বাবু শশিকুমার সেন ৵০, বাবু রমেশচন্দ্র হাতি ৵০, A friend ।০, A well wisher of Dasasram ২৲, ৬৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস ।০, ২১।১নং পটুয়াটোলা মেস্ ।০, বাবু বেণীমাধব বসু ৫৲, ১৭নং কানাইলাল ধর মেস্ ৴০, ১৩।১নং হ্যারিসন্‌রোড মেস্ ॥০, S. C. Mukerjee Esqr. ।০, রাণী হেমন্তকুমারী দেবী ৫৲, বাবু গঙ্গাধর বন্দোপাধ্যায় ॥০, বাবু কামিনীকুমার মজুমদার ।০, ১২৬ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ॥০, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত ১॥০, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ।০, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ১৲, A friend ১৲, বাবু চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র আইচ ১৲, বাবু উপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ২৲, বাবু হরিনাথ সেন ॥০, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ॥০, বাবু চন্দ্রনাথ মৈত্র ১৲, G. C. Ghose Esqr ৫৲, বাবু শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৲, বাবু হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ।০, Miss Bidhu Mukhi Bose M. B. ১৲, বাবু ব্রজদুর্ল্লভ হাজরা ২৲, বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়, বাঁকিপুর, স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, ৫৫ নং পঞ্চানন তলা মেশ ॥০, বাবু বীরেন্দ্রনাথ রায় ৴০, বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ১৲, A friend ৴০, বাবু ফণিভূষণ ঘোষ ।০, বাবু হেমচন্দ্র রায় ॥০, বাবু উপেন্দ্র নারায়ণ দে ১৲, শ্রীমতী চারুবালা দেবী ১৲, শ্রীমতী কান্তমোহিনী বসু, বাস্তের জন্য ১৲, শিবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ ১।৵১০, "জননী" ।০, রাণী হেমন্তকুমারী দেবী ২৲, বাবু রোহিনী কুমার দাস ১৲, বাবু কিশোরী মোহন বসু কর্ত্তৃক রংপুর হইতে সংগৃহীত ১॥৴০ ভুবন বাবুর পুত্র কন্যাগণ ।৫, বাবু শশীভূষণ সরকার ১৲, বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডেপুটি ৫৲, বাবু যোগেন্দ্রনাথ দে ১৲, বাবু বৈদ্যনাথ রায় ১৲, বাবু শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী ॥০, খোজা বকস খাঁ ১৲, বাবু দুর্গামোহন বসু ১৲, শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী রায় ২৲, বাবু ছত্রনাথ চৌধুরী ॥০, বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, জনৈক বন্ধু ৫১০, বাবু অপর্ণাচন্দ্র দত্ত ৩৲, বাসিবন নিবাসিনী শ্রীমতি কামিনী দেবীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲, শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী মিত্র, মাতৃশ্রাদ্ধ

উপলক্ষে ১৲, অজ্ঞাতদাতা ⁄০, শ্রীমতী প্রিয়দা সুন্দরী দত্ত ১৲, বাবু প্রিয়নাথ দত্ত, মসীপুর ।০, বাবু প্রসন্নচন্দ্র মৌলীক ২৲, বাবু চন্দ্রভূষণ মৌলিক ১৲, বাবু সীতানাথ মৌলীক ১৲, বাবু আশুতোষ মৌলীককর্ত্তৃক পূর্ব্ব সংগৃহীত ২৶০, বাবু মহিমাচন্দ্র রায় ।০, বাবু চুনিলাল সীল ২৲, পড়িয়া পাওয়া মাঃ রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ ℓ০, বাবু চারুচন্দ্র বসু ৫৲, বাবু সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৲, বাবু নিবারণচন্দ্র দে ১৲, বাবু যদুনাথ সরকার ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, বাবু নন্দলাল ঘোষ ৫৲, বাবু অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় ২৲, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৲, বাবু প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত ৫৲, Excise office, পুরুলিয়া ২॥০, বাবু কৃষ্ণদত্ত ।০, বাবু বেচারাম নন্দী ১৲, বাবু অঘোরনাথ সিংহ ৫৲, বাবু শশধর ভট্টাচার্য্য ১৲, বাবু রাখাল দাস সরকার ১৲, English office পুরুলিয়া ১৲, বাবু লালবিহারী সরকার ।০, বাবু অযোধ্যা নাথ সেন ।০, বালাচাঁদ সিংহ ১৲, মুন্সিখানা, পুরুলিয়া ২৲, বাবু রামতারক রায় ২৲, বাবু রামগোপাল বক্সি ৯৫ সালের বার্ষিক চাঁদা ১৲, বাবু বিপিনবিহারী সিংহ ১৲, বাবু জগবন্ধু রায় ।০, বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজরা ।০, বাবু অধরচন্দ্র বসু ॥০, বাবু রামবিষ্ণু অধিকারী ॥০, বাবু অক্ষয়কুমার সরকার ॥০, বাবু মহানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীমতী শরৎকুমারী সরকার ৫. R. Chatterjee Esqr. ॥০, বাবু ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় ॥০, বাবু সুঘর সিংহ ৫ বাবু গঙ্গানারায়ণ ঘোষাল ২, বাবু মোগলচাঁদ মাড়োয়ারী ৫, বাবু জগন্নাথ মাড়োয়ারী ৫, বাবু বরদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১, বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ১. বাবু শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী ১, বাবু লোকচাঁদ মাড়োয়ারী ১, বাবু যজ্ঞেশ্বর ঘোষ ১, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥০, অযাচিত দান ℓ০ বাবু রণছোড় ১ পোষ্ট মাষ্টার ১ বাবু ভুপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ॥০ বাবু রজনীনাথ রায় ১ শ্রীমতী গিরিবালা মল্লিক ॥০ District Charitable Society একজন প্রেরিত আতুরের খোরাক বাবৎ ১ ২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন মেস ॥০ ১০ নং পটলডাঙ্গা মেস ॥০ ৬৭ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট মেস ℓ০ প্রসন্ন কমল সিংহ পুত্রের আরোগ্যার্থে ১।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

ফেরৎ জমা মাঃ দাসাশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ গত মাসের জের হইতে ৫৸৴১২॥০ তাপসবালা বিক্রয় মাঃ জগৎচন্দ্র দাস ৩৶০ রূপার চুড়ি বিক্রয় ২।৴১০ মাণিক দহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাগণ ৮৸৴৫ বাক্সের দান ।৴১০ বস্ত্রাদি বিক্রয় ॥৫।

স্থানাভাববশতঃ বস্ত্রাদির দানপ্রাপ্তি স্বীকার এবারে হইল না

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়—মাসিক চাঁদা ৫৫৶০, এককালীন দান ১৯৫৶১০, অন্যান্য প্রকারে আয় ২১।২॥, পূর্ব্বমাসের হস্তেস্থিত ৫৴০, মোট আয় ২৭৬॥৴১২॥।

ব্যয়—খাই খরচ ৭৭॥৴১২॥, রাঁধুনী ৪॥৴১০, চাকর ৬।৴০, মেহতর ৭।৴১০, বাটীভাড়া ৫০৲, কর্ম্মচারীর বেতন ৩৪, রোগীর ও ডাক্তারের গাড়ী ভাড়া ১৪৴১০, দুগ্ধ ৮, ধোপা ১৸০, আদায় খরচ ৩২৲১৫, ঔষধ ৫।৶০, কাপড় ৯॥০, বাক্স ১, সুদ ২, মিস্ত্রী ৸৶০, অন্যান্য ২৸১৫। মোট ব্যয় ২৫৭।৶১২॥।

আয় ব্যয়—মোট আয় ২৭৬॥৴১২॥০, মোট ব্যয় ২৫৭।৶১২॥০, হস্তেস্থিত ১৯।৴০।

দাসী

স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সংসারের কোলাহল ছাড়িয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতর ডুবিয়া থাকিতে ভাল বাসেন। জীবন সংগ্রামের কঠোরতা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। সংসারের চিন্তা, লৌকিক উন্নতি ও উচ্চাভিলাষ তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহারা সব ছাড়িয়া নীরবে নির্জ্জনে নিসর্গের কোলে বিশ্রাম করিতে ভাল বাসেন। প্রকৃতি তাঁহাদের প্রাণে অনন্ত শান্তি ঢালিয়া দেয়। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় প্রকৃতি তাঁহাদের হৃদয় মন গঠন করিয়া তুলে। সংসারের আবিলতা ও সমাজের কালিমা তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। নিসর্গের মহীয়সী শক্তি তাঁহাদের হৃদয় অনুপ্রাণিত করে। প্রবন্ধের শীর্ষদেশে আমরা যে মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একজন এই শ্রেণীর কবি। প্রকৃতিই তাঁহার শিক্ষাগুরু। তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকৃতির ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার কবিতার ভিতর গভীর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এই মহাপুরুষের কবিতার সমালোচনা করিব।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির সুসন্তান। আজীবন প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত হইয়া প্রকৃতির প্রাণে তাঁহার প্রাণ মিশিয়া গিয়াছিল। ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ বলিয়াছেন—"The child is father of the man" বাল্যই মানবের ভবিষ্যৎ সূচনা করে। তাঁহার এই গভীর সত্যটি তাঁহার জীবনেই সম্যক্ প্রতিফলিত হইয়াছিল। সুদূর শৈশবেই তিনি প্রকৃতির কোলে ডুবিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। সুদূর শৈশবে, বিদ্যালয়ে যাইবার কালে পার্ব্বত্য পথের উভয় পার্শ্বস্থ দৃশ্যগুলি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কেমন নাচিয়া উঠিত। উন্নত পর্ব্বত-চূড়া, গভীর অরণ্যানী, হরিৎ বৃক্ষপত্র, সুনীল আকাশ, চঞ্চলা নির্ঝরিণী, বিহঙ্গের মনোহর কূজন, শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শব্দ— তাঁহার প্রাণে আনন্দের ফোয়ারা প্রবাহিত করিত। নিসর্গের সৌন্দর্য্য

তাঁহার প্রাণে কি এক মত্ততা আনিত। আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া শিশু কেবলই সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য পান করিত। বালক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মত্ত হরিণের ন্যায় পর্ব্বতের উপর নাচিয়া বেড়াইতেন। গভীর নদী বা বিজন নির্ঝরিণীর পার্শ্বে, প্রকৃতি যেখানেই তাঁহাকে লইয়া যাইত, বালক উন্মত্ত হইয়া সেইখানে ছুটিত। জলপ্রপাতের সুমিষ্ট শব্দ তাঁহার হৃদয়ে আবেগময়ী প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দিত। প্রকৃতি তাঁহার কতই না প্রিয় ছিল। কবির নিজের লেখনী হইতে আমরা কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিব।

"Like a roe
I bounded over the mountains, by the sides
Of the deep rivers, and the lonely streams,
Wherever Nature led. * * *
* * * For Nature then
(The coarser pleasurers of my boyish days,
And their glad animal movements all gone by ;)
To me was all in all., I cannot paint
What then I was. The sounding cataract
Haunted me like a passion ; the tall rock,
The mountain, and the deep and gloomy wood,
Their colours and their forms, were then to me
An appetite : a feeling and a love,
That had no need of a remoter charm,
By thoughts supplied, or any interest
Unborrowed from the eye."

Tintern Abbey.

শুধু ইহাই নহে, প্রকৃতির মধ্যে তিনি বাল্যকালেই মহত্ত্বের সত্তা ও শক্তি অনুভব করিতেন।

"While yet a child, and long before his time,
Had he perceived the presence and power
Of greatness." *Excursions, Book I.*

আমরা দেখাইব প্রকৃতির প্রতি তাঁহার ভালবাসা ক্রমশঃ কেমন গভীর হইতে গভীরতর হইয়া সমস্ত মানবজাতির উপর, সমস্ত সৃষ্টির উপর ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি-উপাসনার মধ্যে তিনটী স্তর আছে। প্রকৃতি বাল্যে তাঁহার আনন্দদায়িনী ছিল। নিসর্গের প্রত্যেক দৃশ্য তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিত। তিনি ভাবিতেন প্রকৃতি সজীব। আমরা যেমন হাসি আমোদ করি, প্রকৃতিও তেমনি হাসে। আমরা যেমন কাঁদি, শোকে অভিভূত হই, অনন্তময়ী প্রকৃতিরও তেমনি একটা শোকের ছবি আছে। আমরা যেমন রাগদ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা বিচলিত হই, আমাদের হৃদয় যেমন স্নেহ দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, প্রকৃতির মধ্যেও তেমনি একটা ভীষণত্ব ও কমনীয়ত্ব আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এ সকল বুঝিতেন এবং

প্রকৃতির প্রত্যেক বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন। উষার স্নিগ্ধ চঞ্চলতা, সন্ধ্যার গম্ভীর ভাব, রজনীর স্তব্ধতা ও নক্ষত্রখচিত নীলিমাময় আকাশের অনন্ত প্রসার, তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয় কি এক অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা টানিয়া লইত। আবার ঝটিকার ভীষণ খেলা, বাত্যাতাড়িত নীলাম্বুর সংক্ষুব্ধ বারিরাশি, জলপ্লাবনের ভীষণ দৃশ্য তাঁহার প্রাণ কোথায় কোন্‌ দেশে লইয়া যাইত। ইংলণ্ডের দারুণ শীতে, রজনীতে যখন ঝটিকা বহিত, আকাশ পৃথিবী জুড়িয়া যখন তুমুল সংগ্রামের কোলাহল উঠিত, ওয়ার্ড্‌স্‌-ওয়ার্থ জানেলা খুলিয়া সেই ভীষণ ছবি দেখিতেন ও সেই মহীয়সী শক্তির নিকট প্রণত হইতেন। তাঁহার প্রকৃতি-পূজার ইহাই প্রথম স্তর।

ধীরে ধীরে শৈশব, বাল্য ও কৈশোর চলিয়া গেল। সংসারের সুখ দুঃখ তাঁহার জীবনে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই সংসারে, কে কবে অক্ষত শরীরে, অক্ষত হৃদয়ে কাটাইতে পারিয়াছেন? নিরবচ্ছিন্ন জ্যোৎস্না এ সংসারে কাহার ভাগ্যে কবে ঘটিয়াছে? ওয়ার্ডসওয়ার্থের শান্ত জীবন-স্রোত মাঝে মাঝে একটু প্রতিহত হইতে লাগিল। সংসারের শোক, প্রিয়জনের বিয়োগজনিত মর্ম্মন্তুদ যাতনা এবং সংসারের সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখগুলি তাঁহার হৃদয়ের উপর নূতন আধিপত্য বিস্তার করিল। প্রকৃতি আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চক্ষুতে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভাত হইল না। প্রকৃতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হৃদয়ের দেবতা। আজ নূতন সাজে নূতন বেশে প্রকৃতি কবির সম্মুখে দেখা দিল। বাল্যের মত্ততা চলিয়া গেল। সেই মোহ, সেই চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে কেমন গাম্ভীর্য্য আসিয়া কবির হৃদয় অধিকার করিল। চঞ্চলা প্রকৃতি এখন গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। জীবনের গভীর শোকের ছায়া পড়িয়া প্রকৃতির বেশ পরিবর্ত্তিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কবির আধ্যাত্মিক জীবনে নূতন আলোক ফুটিয়া উঠিল। পূর্ব্বে প্রকৃতির মধ্যে তিনি যে মহত্তের আবির্ভাব দেখিতে পাইতেন, এখন তাহা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল এবং নৈতিক জীবনের অবলম্বন হইয়া উঠিল। কবি লিখিয়াছেন :—

For I have learn'd
To look on Nature, not as in the hour
Of thoughtless youth ; but hearing often times
The still sad music of humanity,
Not harsh, nor grating, though of ample power
To chasten and subdue. And I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime

Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man :
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things. Therefore am I still
A lover of the meadows and the woods,
And mountains ; and of all that we behold
From this green earth ; of the mighty world
Of eye and ear, both what they half create,
And what perceive ; well pleased to recognize
In Nature and the language of the sense,
The anchor of my purest thoughts, the nurse,
The guide, the guardian of my heart, and soul
Of all my moral being." *Tintern Abbey.*

"'Tis so no more ;
I have submitted to a new control :
A power is gone, which nothing can restore ;
A deep distress hath humanized my soul.
Not for a moment could I now behold
A smiling sea, and be what I have been :
The feeling of my loss will never be old ;
This, which I know, I speak with mind serene."
Peele Castle.

তৃতীয় স্তরে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতিকে ভাল বাসিয়া, প্রকৃতির শক্তি দ্বারা অজ্ঞাতসারে অনুপ্রাণিত হইয়া, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সমগ্র জগৎকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। জগতের অতি ক্ষুদ্রতম জিনিসও এখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভালবাসার জিনিস।

"To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears"
Intimation of Immortality.

এই ভালবাসায় মোহ নাই, চাঞ্চল্য নাই, আবিলতা নাই, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হৃদয় এখন "নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।" আমাদের মনে হয়, নিসর্গের প্রতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভালবাসা একটী নদীর মত। প্রথমাবস্থায় নদী নির্ঝরের সমষ্টি, চঞ্চলা, লীলাময়ী ও হাস্যযুক্তা। দ্বিতীয়াবস্থায় অনন্ত বক্ষঃ বিস্তার করিয়া অনন্ত দেশ ভাসাইয়া চলে। ইহাতে কেমন গাম্ভীর্য্য ও কেমন মহাপ্রাণতা। তৃতীয় অবস্থায় অসীম অনন্ত মহাসমুদ্রের ভিতর নিজের ক্ষুদ্রত্ব ডুবাইয়া দেয়। তাহাতে কি শান্তি! কি গভীর আত্মবিসর্জ্জন।

আমরা এই প্রবন্ধে প্রকৃতির উপর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভালবাসা ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উপর প্রকৃতির প্রভাব বর্ণনা করিয়াছি। বারান্তরে তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

আধুনিক সূতা-কাতন।

(MODERN COTTON SPINNING)

(২)

সচরাচর ইংরাজীতে Cotton Spinning যে শুদ্ধ কাতন কার্য্যকেই বুঝায় তাহা নহে, ইহা তুলা ধোনা হইতে কাতন পর্য্যন্ত প্রায়ই সমস্ত কার্য্যকেই বুঝায়। আমরাও সেই অর্থে সূতা-কাতা শব্দদ্বয় ব্যবহার করিব, তাহাতে অনেক গোল মিটিয়া যাইবে।

সূতা-কাতন প্রক্রিয়া-সমূহ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা :—

১ম—Ginning এবং baling জিনিং ও বেলিং।

২য়—Mixing বা মিশ্রন।

৩য়—Opening and scutching ধোনা এবং সাফ্ করা।

৪র্থ—Carding বা পেঁজা।

৫ম—Drawing বা সমান্তরাল করণ।

৬ষ্ঠ—Slubbing—স্লাবিং।

৭ম—Intermediate or Second Slubbing—পুনর্ব্বার স্লাবিং

৮ম—Roving—রোভিং।

৯ম—Spinning—সূতা-কাতা।

যখন কার্পাস উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়, তখন ইহাকে হাত দিয়া গাছ হইতে তোলা হয়। তাহার পর ইহাকে বস্তাবন্দি করিয়া জিনিংএর কারখানায় পাঠান হয়। জিন্ মানে—কার্পাস হইতে তুলা আলাদা করা; এবং সেই প্রক্রিয়াকে জিনিং বলে। অতি প্রাচীনকালে ভারতে কার্পাস হইতে বীজ হাত দিয়া আলাদা করা হইত ; তাহার পর বীজকে চাপ দিয়া চূর্ণ করিয়া আলাদা করা হইত। কিন্তু এই উভয় উপায়ে অতি বিলম্বে কার্য্য হইত, সেজন্য ক্রমে দুইটি কাঠের রোলর-যুক্ত একপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ইহা ভারতে অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং এখনও ভারতবর্ষ ব্যপিয়া ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু প্রতিযোগিতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে ও বিলাতী জিনের

ব্যবহার বাড়িতেছে। ইহা বাষ্পীয় বল (steam-power) দ্বারা চালিত হয় এবং সকল বিষয়েই আদিম চরখা* হইতে শ্রেষ্ঠ।

হস্ত দ্বারা কার্পাস হইতে বীজ পৃথক করিতে হইলে, প্রথমে এক হাতে তারগুলিকে ধরিতে হয়, তাহার পর অন্য হাতে বীজগুলিকে টানিয়া আলাদা করিতে হয়। যন্ত্রের সাহায্যে ইহা করিতে হইলে, অতি সাবধানে ইহা করিতে হয়, নচেৎ তুলার তারগুলি ছিঁড়িয়া গুড়াইয়া যাইতে পারে।

একটি জিনিং মেষীন্ নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহে বিভক্ত :—জিনের সামনেই একটি লম্বা চামড়ার রোলর, তাহার পার্শ্বেই একটি ইস্পাতের ফলক; ইহা লম্বাভাবে চামড়ার রোলরের গায়ে গায়ে বসান; ইহা এরূপ নিকটে বসান যে, তাহাদের মধ্য দিয়া কার্পাসের তার যাইতে পারে কিন্তু বীজ আটকাইয়া যায়। এই ফলকের নীচেই আর একটি ইস্পাতের ফলক; ইহা পূর্ব্বোক্ত ফলকের গায়ে গায়ে লাগান ও একটি ক্রাঙ্ক রডের (crank rod) সাহায্যে একবার উপরে ও একবার নীচে আসা যাওয়া করে। এই দ্বিতীয় ফলকটির নিকটে একটি হস্তের ন্যায় কাষ্ঠফলক একবার অগ্রে, একবার পশ্চাতে আসা যাওয়া করে। এই কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে একটি রন্ধ্রযুক্ত লৌহফলক থাকে, ইহাকে সচরাচর "জালি" বলিয়া থাকে। এই সমস্ত অঙ্গসমূহের উপর একটি কাষ্ঠের ঢাকনা থাকে; ইহার সামনের ভাগ ঢালু (sloping) এবং ইহা চামড়ার রোলর ও ইস্পাতের ছুরির কিছু নিকটে আসিয়াই শেষ হয়।

এই সকল অঙ্গকে চালাইবার জন্য একটি রড (rod) থাকে; এই রডের এক প্রান্তে একটি পুলি (pully) ও অপর প্রান্তে দুইটি পুলি। প্রথম পুলির দ্বারা রড নিজে চালিত হয়, ও অন্য দুইটি পুলির দ্বারা জিনিং মেষীনের অন্যান্য অঙ্গসমূহকে চালায় ও ইহা নিজে উপরোক্ত ঊর্দ্ধ ও অধোগমনশীল ইস্পাতের ফলকটিকে চালাইয়া থাকে।

একটু চিন্তা করিলেই এই যন্ত্রের কার্য্য অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঢাকনার ঢালুভাগের উপর কার্পাস নিক্ষেপ করিলে, তাহা ঘূর্ণ্যমান চামড়ার রোলরের উপর দিয়া পড়ে; কার্পাসের তারগুলি চামড়ার আঁশের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত যাইতে থাকে, কিন্তু বীজগুলি রোলরের

---

* পশ্চিমে সচরাচর এই যন্ত্রগুলি চরখা নামে বিখ্যাত; ইহার প্রধান অঙ্গ দুইটি রোলর, তাহা ঘুরাইলে কার্পাসের তার তাহাদের ভিতর দিয়া চলিয়া যায় কিন্তু বীজগুলি তাহাদের ভিতর দিয়া না যাওয়া হেতু তার হইতে পৃথক হইয়া যায়। [বঙ্গদেশে এই যন্ত্রটিকে কোথাও কোথাও "খাওয়াই" বলে। সর্ব্বত্র বলে কিনা জানি না। সূতা কাটিবার যন্ত্রের বাঙ্গলা নাম চর্‌খা। সম্পাদক]

পার্শস্থ ইস্পাতের ফলকে লাগিয়া আটকাইয়া যায়, এমন সময়ে উর্দ্ধ-অধ-গমনশীল ফলকটি আসিয়া বীজগুলিকে তার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়; বীজগুলি তার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পর, পূর্ব্বোল্লিখিত জালিতে পড়ে ও তাহার রন্ধ্র দিয়া ভূমিতে পতিত হয়। চামড়ার রোলরের সাম্‌নে একটি কাষ্ঠের ফলি থাকে, যে সকল তুলা বীজ হইতে পৃথক্ হইয়া রোলরের সহিত চলিয়া আসে, তাহা এই ফলিতে লাগিয়া ভূমে পতিত হয়। এই সকল কার্য্য অনবরত চলিতে থাকে ও জিনিং মেষীনের একদিক দিয়া তুলা ও অপর দিক দিয়া বীজ অনবরত পড়িতে থাকে। যে ফলকটি রোলরের গায়ে গায়ে বসান তাহাকে fixed blade বলে, আর যে ফলকটি উর্দ্ধ-অধো-গমনশীল তাহাকে knocking off blade বলে, কারণ ইহাই বীজকে নক্ অফ্ করে। সচরাচর নকিং অফ্ ব্লেড্ দুইটি করিয়া থাকে, কারণ তাহাতে আদপে সময় নষ্ট হয় না। যখন একটি নামে, তখন আর একটী উঠে, ইহাতে কার্য্য অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে থাকে।

আজকাল জিনিং ভারতের একটি প্রধান ব্যবসায় হইয়াছে; ইহা মধ্য-প্রদেশ, বেরার, হায়দ্রাবাদ, মান্দ্রাজ ও পশ্চিম ভারতের অনেক স্থান ছাইয়া ফেলিয়াছে; ইহা একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায়, ইহার সহিত সূতা-কাতন কার-খানার অধিক সম্বন্ধ নাই। কারণ যেখানে কার্পাস জন্মায়, প্রায় সেই থানেই ইহা প্রচলিত। আর সূতা-কাতন যেখানে বাজার ভাল, সেই থানেই হইয়া থাকে। তবে ইহা না হইলে, সূতা কাতনের কার্য্য চলে না, সেই জন্য ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

কার্পাস জিন হইলে পর, তাহাকে গাঁট বাঁধা হয়; গাঁট বাঁধাও আজ কাল জল-যন্ত্রের (Hydraulic press) দ্বারা হইয়া থাকে। জিনিং ও গাঁটের ব্যবসায় প্রায়ই এক সঙ্গে চলিয়া থাকে, কারণ তুলা চাপিয়া না গাঁট বাঁধিলে, গাঁটের আকার বড় থাকে ও তাহাতে অন্যত্র পাঠাইবার সময় ভাড়া বেশী দিতে হয়।

তুলা জিনিং ও গাঁটবন্দী কাজে বিলক্ষণ আয় আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, ও ভারতের অন্যান্য কার্পাসোৎ-পাদক প্রদেশ সমূহে জিনিং একটি প্রধান ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূলধন অধিকাংশ দেশীয়দিগের অর্থাৎ মাড়ওয়ারী, ভাটিয়া, খোজা কিম্বা পার্শিদিগের, বাঙ্গালিদের নহে। অনেক ইংরাজ সওদাগরেরও এই সকল

অঞ্চলে অনেক জিনিং কারখানা আছে, ভারতে বাঙ্গালি অধিকৃত ও পরিচালিত কোন জিনিং ফ্যাক্টরি আছে কিনা, জানি না। যদি থাকে সুখের বিষয়,নচেৎ বঙ্গবাসী ধনবানগণের এ বিষয়ে নজর করিলে তাঁহাদেরও লাভ এবং অপরেরও লাভ। এই ব্যবসায়ে এত লাভ যে ৭০ কিম্বা ৮০ হাজার টাকা দিয়া একটি জিনিং ফ্যাক্টরি খুলিলে, প্রথম বৎসরেই ২৫ হাজার টাকা আয় হইতে পারে, দ্বিতীয় বৎসর আরো বেশি (৩০ হাজারের উপর) হইয়া থাকে; তবে চালাইবার উপায় জানা চাই। ইহার জন্য অনেক শিক্ষা * ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, এই জিনিং ও বেলিং কার্য্যে মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী খাটিয়া খাইতেছে। শত শত মধ্যশ্রেণীর লোক জিনিং-ফিটর বা মিস্ত্রিরূপে নিযুক্ত আছে এবং অনেক ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও পার্শি ভদ্রলোক † ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত আছেন। ইহাঁদের অবস্থা আমাদের দেশীয় অনেক সরকারি চাকুরে হইতে ভাল। তবে ইহাতে দশটা চারিটা নাই। বৎসরের মধ্যে নয় মাস জিনের কার্য্য প্রায় দিন রাত চলিয়া থাকে; ভাল সিজন্ (season) হইলে এঞ্জিন, বয়লার সাফ করিবার সময় পাওয়া যায় না, কেবল হাটের দিন সপ্তাহে একবার ৪।৫ ঘণ্টা বন্ধ হয়। কাজেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নাইতে খাইতে বসিতে শুইতে অন্ ডিইটি (on duty) থাকিতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্কিমচন্দ্র।

দেবী-চৌধুরাণী—আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গুলিকে যেরূপ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি, তাহাতে দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম এক স্বতন্ত্র ভাগান্তর্গত। এই গ্রন্থ দুইখানি ধর্ম্মভাববিষয়ক। ধর্ম্মচিন্তার জন্য জাগতিক সর্ব্বচিন্তা বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত হিন্দুজাতির মত অন্য কোন জাতিই দেখাইতে পারিবেন না। আমাদিগের বর্ত্তমান জাতীয় অবনতির কারণও কতকটা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সাংসারিক সকল বিষয়ে উপেক্ষার ফল। হিন্দুর নিকট ইহকাল কেবল পরকালের জন্য সুখ সঞ্চয়েই ব্যয়িত হইবে। বৈষয়িক ব্যাপারের তরঙ্গাভিঘাতভাড়িত হইয়া আজও সেই আধ্যাত্মিকতা-প্রবলতা শেষ সংগ্রাম করিতেছে—তাহার

* এ শিক্ষা মানে পরীক্ষা পাস করা নয়।

† যদি পাঠকের মেকানিকদের ভদ্রলোক বলিতে বাধা না থাকে।

ক্ল হিন্দুপুনরুত্থান। পুনরুত্থান সম্বন্ধে তাঁহার মত বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; এখানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মভাববিষয়ক গ্রন্থদ্বয় আশানুরূপ সুন্দর হয় নাই।

বসন্তকুসুমসুরভিসমাকুল পবনসেবিত কৌমুদীস্নাত রজনীতে বর্ষা-বারিরাশিপ্রমথিতা ত্রিস্রোতার বক্ষে তরণীর ছাদে বসিয়া বহুরত্ন মণ্ডিতা, রূপবতী দেবী যখন বীণাবাদনে নিযুক্তা, তখনকার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, দেবীর বীণায় কত মিঠে রাগিণী, কত গম্ভীর রাগিণী, কত জাঁকাল রাগিণী বাজিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বীণাতেও সেইরূপ কত মিঠে রাগিণী, কত গম্ভীর রাগিণী, কত জাঁকাল রাগিণী বাজিয়াছে, কিন্তু সব সুরের আলাপ সমান মিষ্ট হয় না—এখানেও হয় নাই। গিরিচূড়া যেমন ক্রমে উঠিয়া সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে যাইয়া আবার নিম্নগামী হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভাও তেমনই দুর্গেশনন্দিনী হইতে কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহার সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে যাইয়া, আবার নিম্নগামী হইয়াছে। দেবীচৌধুরাণীর রাগিণী জাঁকাল; কিন্তু প্রাণস্পর্শী নহে।

গ্রন্থমধ্যে বিশ্লেষণোপযোগী চরিত্র—দেবী। আর সেই চরিত্রে প্রমাণিত হইয়াছে—Home is the woman's proper sphere. প্রচারে "নিষ্কামকর্ম্ম" লেখক বলিয়াছেন, "এই দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থ বাহির হইবার পর হইতেই একটি বাক্য আমাদের সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। কথাটি পুরাতন * * * * কথাটি নিষ্কামকর্ম্ম।"* কর্ম্মযোগী বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে "সর্ব্বগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ" বলিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:—

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যত্রাপি চতেন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥" ৩।৮।

আবার

"সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তু মযোগতঃ।
যোগযুক্তোমুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥" ৩।৬।

কিন্তু

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তেসঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি॥" ২।৪৭।

---

* প্রচার (তৃতীয় খণ্ড)।

কারণ

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন সপাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" ৫।১০।

এই যে পরমেশ্বরে কর্ম্ম সকল সমর্পণ, ইহারই কথায় দেবী বলিয়াছে "আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।" পরমেশ্বর হইতে এই যে শ্রীকৃষ্ণে পরিণতি, ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।" শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তর্ক ছাড়িয়া এখন আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। কিন্তু গীতার এই উপদেশ কাহাকে দিতে হইয়াছিল? যে অর্জ্জুন উর্ব্বশীঘটিত ব্যাপারে ইন্দ্রিয়জয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, দেবগণকেও মোহিত করিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন অনবদ্যাঙ্গী উত্তরাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, পরন্তু স্নুষাত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সেই অর্জ্জুনকে নিষ্কামধর্ম্ম বুঝাইতে ও নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে কৃষ্ণের বহুক্ষণ লাগিয়াছিল। নাইনটিন্থ সেনচুরী পত্রে ম্যাথু আর্ণল্ডের পত্র সমালোচনা করিতে যাইয়া, জন মর্লি বলিয়াছেন যে, মেকলের সকল পত্র এরূপ সাহিত্যপ্রিয়তাপূর্ণ ও এরূপ মানবজীবনসঙ্গী সাহিত্যের মহিমাপূর্ণ যে সে সকল পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ লেখনী লইয়া সেইরূপ কিছু লিখিতে পাঠকের ইচ্ছা হয়; সেইরূপ একজন রমণীকে এত সহজে নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণা দেখিলে কার্য্যটা এত সহজ বলিয়া বোধ হয় যে, পাঠকের মনে হয় যে পুস্তকখানা রাখিবার পূর্ব্বেই আমি নিষ্কামধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করি। অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশঃ—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বনিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥" ২।৪৫।

ইহা কি বড় সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয়? দেবীও ইহা সর্ব্বাংশে পালন করিতে পারে নাই। তবে—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥" ২।৪০।

গীতা হইতে এই নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বুঝাইয়া আমরা এক্ষণে দেবী-চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গীতার উপদেশ পাঠ না করিলে দেবী

চৌধুরাণীর সম্যক্ মর্ম্ম গ্রহণ সম্ভব নহে; কারণ ইহাতে গীতার উপদেশই বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসে তাহা হয় নাই, হইতে পারেও না।

প্রফুল্ল ধনীর পত্নী, দরিদ্রের কন্যা। পাপ সমাজের ষড়যন্ত্রে সে পতিগৃহে স্থান পায় নাই। প্রথম পরিচ্ছেদেই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, প্রফুল্ল যে ঋণ শোধ করিবার সম্ভাবনা নাই বুঝে, সে ঋণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিতা—সে তদপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে। আবার সে আপনার অধিকার পাইবার জন্য সকল অপমান সহ্য করিতে পারে। "ভিক্ষা করিও না, যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না, সেরূপ ঋণে বদ্ধ হইও না এবং আপনার ধন যদি পরের নিকট থাকে, তবে সেই ধন চাহিয়া লইয়া ভোগ করিতে লজ্জিত হইও না—নিষ্কামকর্ম্ম যিনি অভ্যাস করিতে চান, তাঁহাকে এই কয়টি কথানুসারে কার্য্য করিতে প্রথম শিখিতে হইবে। নিজের ধন অর্থাৎ নিজের কর্ম্মফল ভোগ করিতে কথনও সঙ্কুচিত হইও না, কেননা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় করাই নিষ্কাম. ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। পরের ধন অর্থাৎ পরের কর্ম্মের ফল উপভোগ করিতে যেন কথনও প্রবৃত্তি না হয়, কেননা, তাহা হইলে তোমাকে নূতন ঋণে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যতদিন সেই ঋণমুক্ত না হও, ততদিন তোমার মুক্তি হইবে না।" ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদের "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যা।—প্রফুল্ল শ্বশুরালয়ে গেল, যে প্রফুল্ল অন্ন গ্রহণ করিতে এত অপমান বোধ করে, সেই প্রফুল্ল শাশুড়ীকে বলিল, "মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?" আবার "হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কি?" প্রফুল্লের সম্মানজ্ঞানও অসীম; বিনয়ও অসীম। কিন্তু সে বিনয়ের নিকট আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহে।

তাহার পর পিতার আজ্ঞায় ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে তাড়াইতে আসিয়া তাহার অশ্রুপ্লাবিত বিকশিত-সরসিজ ললিত মুখ চুম্বন করিল। সেই "Humid seal of soft affections" চুম্বনে তাহার হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইল। সেই যে

"গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটী ভালবাসা,
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে!"

প্রফুল্ল ভাবিল "বুঝি এই মুখচুম্বনের মত পবিত্র পুণ্যময় কর্ম্ম ইহজগতে কখনও কেহ করে নাই।" সে আসিয়াছিল অন্নের ভিখারিণী, গেল ব্রজেশ্বরকে তাহার প্রেমের ভিখারী করিয়া; তাহার হৃদয় তখন প্রেমের লীলাক্ষেত্র। তাহার পর তাহার জননীর মৃত্যু হইলে কোন জমীদারের লোক সেই জমীদারের পাশব লালসা তৃপ্তির জন্য প্রফুল্লকে ধরিয়া লইয়া গেল। বনমধ্যে তাহারা দস্যুভয়ে পলাইল, বনপথের অস্পষ্ট রেখানুসরণ করিয়া সে একটি জীর্ণ অট্টালিকায় উপস্থিত হইল। সে দুর্দ্দিনে বৈষ্ণবী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এক বৈষ্ণব মরিতেছিল; সে প্রফুল্লকে অর্থের সন্ধান বলিয়া দিয়া মরিল। ঘটনা-স্রোত প্রফুল্লকে তাহার অদ্ভুত জীবনপথে উপনীত করিল। প্রফুল্ল একাকী তাহার সৎকার করিল! তাহার পর সে ঘড়া ঘড়া ধন পাইল; সত্বভোগী না হইয়া প্রফুল্ল যক্ষের ধন রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অর্থ আহার করা যায় না, যাইলেও পরিপাক হয় না, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না; কাজেই আহারীয় সন্ধানে প্রফুল্ল হাট খুঁজিতে চলিল। পথে ভবানী পাঠকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ঠাকুর জহুরীলোক, বুঝিলেন "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্ত।" তিনি তাহাকে দলের রাণী করিবেন বলিয়া শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভবানী পাঠক তাহার নিকট "বামনশূদ্রা বামনী" নিশি ঠাকুরাণীকে পাঠাইলেন। নিশির সহিত প্রফুল্লের মিল হইতে পারে না; কেন না একের "সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে" অপরের সর্ব্বস্ব হৃদয়দেবতা পতিতে; নারী জীবনের কোন আদর্শ অধিক বাঞ্ছনীয় পাঠক তাহা বিচার করিবেন। এদিকে প্রফুল্লের শিক্ষা চলিতে লাগিল—প্রথম অধ্যয়ন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত কিনা; আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত।" নানা পুস্তকের পর প্রফুল্ল "সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কামধর্ম্মোপযোগী অন্যান্য শিক্ষাও চলিতে লাগিল। অশন, বসন, ভূষণ, শয়ন সম্বন্ধে প্রফুল্ল সকল প্রকারই ভোগ করিল। এ সকলের মন্দেও তাহার কষ্ট ছিল না, কারণ মাতৃগৃহে সকল সময় সে মন্দ ত জুটিত না। এতক্ষণে বুঝা গেল কেন প্রথমে সে দারিদ্রের কশাঘাতপ্রপীড়িতা হইয়াছিল; সে কেবল তাহাকে এই সকল সহ্য করিতে শিক্ষা দিবার জন্য। শেষ প্রফুল্লকে মল্ল-

যুদ্ধ (!!) শিখিতে হইল; কারণ "ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে টেকচাঁদ "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসে ব্যায়ামের উপযোগিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তবে সে পুরুষে, এ রমণীতে। ব্যায়াম অবশ্যই উপকারী; কিন্তু রমণীর পক্ষে পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধই কি উপযোগী? "চতুর্থ বৎসরে, ভবানী নিজ অনুচরদিগের মধ্যে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন; প্রফুল্লকে তাহাদিগের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বলিতেন। প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত।" একথাটা বড়ই কেমন ঠেকে, কেন ঠেকে তাহার উত্তর আমরা আনন্দমঠে শান্তি চরিত্র সমালোচনায় দিয়াছি। রমণীগণকে পুরুষ বহু ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে—তাঁহাদিগকে কোন ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তবে যাঁহারা মনে করেন যে, সংসারে সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীপুরুষের অধিকার সমান, তাঁহাদিগের নিকট এ দীন লেখক মতভেদ ভিক্ষা করে। স্ত্রীপুরুষে স্বাভাবিক বৈষম্য বিদূরিত হইবার নহে। সভ্যতার বিস্তার বশতঃ জীবনসংগ্রাম দিন দিন কঠোর হইতে কঠোর তর হইয়া দাঁড়াইতেছে; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ক্রমে রমণীগণকেও বোধ হয় সে সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া রমণীর বিশেষত্ব বিলোপ করিবার প্রয়োজন কি? পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া যদি রমণীগণকে ইন্দ্রিয়জয় শিক্ষা করিতে হয়, তবে তাহাতে তাঁহাদিগের স্বভাবসুলভ শালীনত্যের যে হানি হয়, তাহা কি সামান্য? কঠোর সংসার-সংগ্রামক্লান্ত মানব স্বভাবতই গৃহে যে সুখ, যে শান্তি, পত্নীর নিকট যে স্নেহ, যে কোমলতা প্রত্যাশা করে, রমণীকে পুরুষভাবাপন্ন করিয়া তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া কাজ নাই। জগৎ কঠোরতাময়,—জীবন মরুময় করিয়া কাজ নাই। রমণী, তুমি

"সরস শ্যামল
কর সংসার অন্তর।"

রমণী

"When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel thou!"

প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, কোমলতাময়ী রমণীকে পুরুষভাবাপন্ন করিতে কে চাহিবে? সংসার-সঙ্গিনীর নিকট কোন্ কর্ম্ম-ক্লান্ত পুরুষ না কোমলতা প্রত্যাশা করে? (তবে বঙ্গাঙ্গনাগণ দেবীর মত হইলে সুবিধা এই হইবে

যে, পত্নীকে সংসার-সংগ্রামে পুরোবর্ত্তী করিয়া দিয়া স্বামী তাঁহার অঞ্চলের অন্তরালে মূর্চ্ছা যাইবার অবসর পাইবেন।) বঙ্কিমচন্দ্র নব্যাদিগকে লজ্জা-হীনা বলিয়াছেন, কেননা তাঁহারা দিবাভাগে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু কোন নবীনাই যে পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে স্বীকৃতা হইতেন না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। লজ্জাহীনতা কিসে অধিক প্রকাশিত হয়—পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধে, না দিবাভাগে স্বামী সন্দর্শনে? এ নিষ্কামধর্ম্ম কি পুরুষকে দিয়া পালন করাইলে হইত না? অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই পুরুষ অপেক্ষা নারী-চরিত্রের আদর্শ সৃজনে অধিক চেষ্টিত হয়েন। গর্ব্বান্ধ পুরুষ আপনাকে রমণীর অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্থাপিত মনে করে, তাই সে পদে পদে আপনার প্রভুত্বের চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চাহে; যেন পুরুষের আদর্শের প্রয়োজন নাই, আর রমণীর জন্য যত উপদেশ, যত বিধান, যত নিষ্ঠুর আদেশ। ইহারই ফল সকল-প্রাচীন-আচার-বিরোধী, নবনারীর (New woman) আবির্ভাব। গর্ব্বান্ধ পুরুষ সম্বন্ধে সেই প্রাচীন প্রবাদ "Physician heal thyself" প্রযুজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী-চরিত্র সৃজন না করিয়া, আর একটি অমরনাথ বা প্রতাপ সৃজন করিলে উপকার হইত।—তাহার পর শিক্ষা সমাপ্ত হইলে প্রফুল্ল দেবী নাম গ্রহণ করিয়া ভবানী ঠাকুরের দস্যুদলের নেত্রী হইয়া, কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া পরোপকারব্রত সাধনে প্রবৃত্তা হইল। গ্রন্থকার বলিলেন, "এখন আমরা প্রফুল্লকে জীবন-তরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া আরও পাঁচ বৎসর ঘুমাই। * * (প্রফুল্লের) কর্ম্ম শিক্ষা হউক।" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড শেষ হইল।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রার মত দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রান্তে যখন আমরা চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, তখন দেনার দায়ে ব্রজেশ্বর সাগরের পিতার কাছে টাকা ধার করিতে আসিয়াছে। টাকা না পাইয়া, শ্বশুরের সহিত বাদানুবাদে ক্রুদ্ধ জামাতা পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা কাতরা পত্নীর বাহুবন্ধন হইতে আপনার পদ মুক্ত করিতে এতটা বলপ্রয়োগ করিল যে, বঙ্গাঙ্গনা সাগর স্বীয় স্বামীর সে ক্রিয়াটাকে পদাঘাত জ্ঞান করিল। উচ্ছ্বসিত অভিমানে সাগর স্বামীর সহিত বাদানুবাদ করিল; শেষ ব্রজেশ্বর যখন বলিল, "পাল্‌টে লাথি মারিবে নাকি?" তখন সাগর বলিল, "আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—" পশ্চাৎ হইতে দেবী বলিয়া দিল, "আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।" এ শিক্ষা

প্রফুল্ল দিতে পারিত না, কারণ বঙ্গগৃহের গৃহিণীর মুখে এ কথা স্বাভাবিক নহে—ইহা দেবীরই উপযুক্ত। আবার দেবীর নাম শুনিয়া দাসী ভয় পাইয়া শব্দ করিলে দেবী তাহাকে তাড়া দিল, "চুপ্ রহো, হারামজাদি, খাড়া রহো।" প্রফুল্ল এখন আর দুর্গাপুরের অন্নের কাঙ্গাল প্রফুল্ল নহে; দস্যুদলের দেবী হইয়া সে এখন দস্যুসেনা চালনা করে—সে তাহার কোমলতা হারাইয়াছে। ইহা দেবীমূর্ত্তি না রাক্ষসী মূর্ত্তি! ব্রজেশ্বরের নিকট হইতে পা টেপার ঋণ সুদ শুদ্ধ আদায় করিয়া দিতে দেবী সাগরকে সঙ্গে লইয়া গেল। তাহার পর ব্রজেশ্বরকে ধরিবার দিন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশীথে বজরার ছাদে বীণাবাদন-ব্যাপৃতাদেবী; ত্রিস্রোতার কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের মত সেই ফেনিলোচ্ছল যৌবনময়ী গম্ভীর; সেই তটিনীসলিলে তরঙ্গে তরঙ্গে চন্দ্রকর জ্বলিতেছে, আর সেই রূপলাবণ্যসম্পন্না মোহিনীর রত্নাভরণ হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে। মূর্ত্তিমতী বীণাপাণিবৎ দেবী বীণাবাদনে ব্যাপৃতা। তাহার কুঞ্চিত কুন্তল হইতে কুসুম সুরভি পবনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে—তাহার বীণা হইতে মধুর সুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া তারায় তারায় এক স্বপ্নকুহক ব্যাপ্ত করিতেছে।

"A lady so richly clad as she
Beautiful exceedingly."

কিন্তু ব্রজেশ্বরকে ধরিতে পাঠাইয়া দেবীর বীণা বেসুরা বাজিল; আবার ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে দেবীর গলা ধরিয়া আসিল—ইহাই দেবীর নারীসুলভ কোমলতার অবশেষ। ব্রজেশ্বরের সহিত দেখা করিবার সময় দেবী ভাবিল, "ছি! ছি! ছি! কি করিয়াছি, ঐশ্বর্য্যের ফাঁদ পাতিয়াছি!" আরও একদিন সে এমনই ভাবিয়াছিল। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় মা চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলে, মেয়ে ভাবিয়াছিল, "থাক্! সেজে গুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!" তাহাই ভাবিয়া সে বেশভূষার পারিপাট্য ত্যাগ করিল। তাহার পর দেবী ব্রজেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিল, ব্রজেশ্বর আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাকে চুম্বন করিল; সেই চুম্বন "left her woman" ব্রজেশ্বরকে বিদায় দিয়া তক্তার উপর লুটাইয়া দেবী কাঁদিল; দেখিয়া নিশি বলিল, "তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।" দেবী উত্তর দিল, "সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এপথে আসিতাম না।" প্রেম আছে বলিয়াই এখনও দেবীর রমণীর ধন কোমলতা একেবারে যায় নাই। দেবীর প্রেমস্রোতে তাহার সন্ন্যাস ভাসিয়া গিয়াছে। এই স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে আর

একটা কথার উল্লেখ করিব। শ্বশুরালয়ে গমনকালে প্রফুল্লের বয়স আঠার বৎসর; কিন্তু তাহার দশ বৎসর পরে বজরার ছাদে দেবীর বর্ণনায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, "পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না।" যাহা "কোথাও" পাওয়া যায় না, তাহা দেবীতে পাওয়া গেল; দেবী কি সৃষ্টি ছাড়া কিছু? দেবীর কি "সকলি বিচিত্র?" ব্রজেশ্বরের সহিত সাক্ষাতের পর দেবী ভবানী ঠাকুরকে বলিল, "আমাকে অব্যাহতি দিন—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।" সে তাহার ধন দান করিতে চাহিল। দেবী অখ্যাতির ভয় কাটাইতে পারিল না, সে নিষ্কাম ধর্ম্ম ভুলিল। এতদিন দেবীর অখ্যাতির ভয় ছিল না—ব্রজেশ্বর তাহাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানিল বলিয়াই আজ এ লজ্জা—এ লজ্জার মূল, সকল মাধুরীর সার প্রেম। দরবারে যাইবার কথায় দেবী বলিল, "এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।" কিন্তু হয় ত বা বহুদিনের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করা যায় না বলিয়া, হয় ত বা

"The love of praise, howe'er concealed by art,
Reigns more or less and glows in ev'ry heart"

বলিয়া দেবী আবার দরবার করিয়া ঘড়া ঘড়া টাকা বিলাইল। বজরার যে বর্ণনা পাইয়াছি, এ দরবার সেই বজরাবাসিনীর উপযুক্ত বটে; তাই আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবীচৌধুরাণীর রাগিণী জাঁকাল বটে। এইখানে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইল।

তৃতীয় খণ্ডে দেবী কোথাও আসিবে জানিয়া যে পিতার সম্বন্ধে ব্রজেশ্বর সর্ব্বদা ভাবিয়াছে;—

"পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্ম-পিতাহি পরমস্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

সেই ব্রজেশ্বরের পিতা ঋণশোধার্থ তাহাকে ধরাইয়া দিতে আসিলেন। তাহা জানিয়াও দেবী ব্রজেশ্বরের দর্শনাশায় অভিসারিকা হইয়া আসিল; কেন না—

"Love rules the court, the camp, the grove,
And men below and saints above.

দিবা ও নিশির সহিত দেবীর ঈশ্বরসম্বন্ধীয় তর্কের সহিত লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞান শীর্ষক প্রবন্ধ তুলনা করিয়া দেখিবেন। তাহার কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বর যখন তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে চাহিল, তখন দেবী বলিল "হায়!

এ কথা কাল শুনি নাই কেন?" শিক্ষার প্রভাব দেবীকে ভোগ করিতে হইয়াছিল; তাই দেবী ভাবিল "আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই।" এ কথায় শিক্ষা ভিন্ন আরও কিছুর প্রভাব দৃষ্ট হয়—তাহা দেবীর নবপ্রত্যাবর্ত্তিত রমণীত্ব; নহিলে ত;

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্রনমুহ্যতি ॥ (গীতা ১২।১৩)

সংযম শিক্ষাবশতঃই দেবী শ্বশুরের চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইবার আজ্ঞার কথা বলিল না।

ইহার পর একটা অদ্ভুত কথা আছে—গগন প্রান্তে একখানা মেঘ দেখিয়া দেবী বুঝিল আর ভয় নাই। তাহার পর দেবী যখন দিবাকে দেবী বলিয়া দেখাইল, তখন সেই মিথ্যা কথাটার সমর্থনার্থে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য কর্ম্ম-প্রণালীকে গালি দিয়া বলিলেন, "দেবীর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, আর সত্য-বাদের ভান নাই। ভানই ভয়ানক মিথ্যাবাদিতা। সরল নীতিশাস্ত্র ও জটিল কর্ম্মকৌশলের একত্র সমাবেশ হইতে জগদীশ্বর মানব জাতিকে রক্ষা করুন।" এ যেন তাড়া দিয়া বিশ্বাস করান। একথা বলায় দেবীর পুরা স্বার্থ ছিল—হরবল্লভকে বজরায় আনাই প্রয়োজন। তথাপি কি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিষ্কামকর্ম্মরতার এ মিথ্যাকথা বলাও দোষের নহে! তাড়া খাইয়া যদি শ্বেতকে কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তবে আমরা নাচার। মিথ্যা চিরদিনই মিথ্যা।

তাহার পর দেবী স্বামীগৃহে গেল। দেবীর বিসর্জ্জন, প্রফুল্লের পুনরুত্থান। যখন দেবী নিশিকে বলিল যে, স্ত্রীলোকের স্বামীই সকল আভরণের ভাল, যখন সে সাগরকে বলিল "এই ধর্ম্মই (সংসার-ধর্ম্মই) স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম।" তখন দেবী প্রকৃত রমণী, তখন সে মাধুরীময়ী। যখন সে বলিল "দেবী মরিয়া গিয়াছে।" তখন সংসারাশ্রমে সে

"পুরান্ পত্রাপগমাদনন্তরম্
লতেব সন্নধ্ব মনোজ্ঞ পল্লবা"

শোভা পাইতে লাগিল। মানব যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র গ্রহণ করে, দেবী তেমনই নব জীবন গ্রহণ করিল। যাও প্রফুল্ল "Grow

green again, tender little parasite round, the rugged old oak to which you cling." রামায়ণ ও মহাভারতে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে, যে আশ্রম সকলের মধ্যে সংসারাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। যদি রমণী-গণকে নিতান্তই গীতার উপদেশের মত করিয়া গঠিত করিতে হয়, তবে সংসারে থাকিয়া কেমন করিয়া তাহা সম্ভব, তাহা দেখাইলেই প্রকৃত উপকার হয়। পুরুষের সহিত মল্লযুদ্ধ ও ডাকাইতি করিয়া ইন্দ্রিয় জয়ান্তে সংসার প্রবেশ সম্ভবের সীমা অতিক্রম করে। রমণীগণ দেবীর আদর্শে গঠিতা না হইয়া ভ্রমরের আদর্শে গঠিতা হইলেই জাতীয় মঙ্গল। ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়াই এ জাতির অধঃপতন; এখন আবার পুনরুত্থানের প্রভাবে যেন মনে হইতেছে রাতারাতি সত্য-যুগের কুশাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া পথিকের অনভ্যস্ত পদতল পীড়িত করিতেছে। জাতীয় উন্নতিকল্পে আমাদের বাস্তবের দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কর্ম্ম বা পরকাল চিন্তা অবজ্ঞার উপযুক্ত, এমন কথা বলি না, তবে ইহ-কালেও কিছু কর্ত্তব্য আছে। জাতীয় জীবনে, সাংসারিক জীবনে ভ্রমর ও কমলমণিরই আদর অধিক।

ব্রজেশ্বরের চরিত্রে বিশেষ কিছু নাই। সে প্রথমে লোকনিন্দা ভয়ে পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিল, শেষে পিতার আজ্ঞায় তাহাকে তাড়াইতেও গিয়াছিল। সেক্স্পীয়ার পত্নীর নিকট পতির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন:—

"One that cares for thee,
And for thy mainteıance ; commits his body
To painful labour, both by sea and land ;
To watch the night in storms, the day in cold,
While thou liest warm at home, secure and safe."

পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য আছে সত্য; কিন্তু পত্নীর প্রতিও পতির কর্ত্তব্য আছে; সে কর্ত্তব্যপথে ব্রজেশ্বর স্খলিত-পদ। পত্নীকে তাড়াইতে আসিয়া ব্রজেশ্বর তাহার মুখচুম্বন করিল, তাহার পর সে তাহার ভরণ-পোষণের ভার লইতে চাহিল; কারণ তখন ব্রজেশ্বর কেবল পতি নহে, পরন্তু পতি এবং প্রেমিক। অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "প্রণয় এইরূপ! প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।" এই চকিতে প্রেমোদয়ের কথায় ফ্রায়ার লরেন্স বলিয়াছেন:—

"Young men's love then lies
Not truly in their hearts, but in their eyes."

ইহার পর শ্বশুরালয় হইতে ফিরিবার পথে দেবীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ইতিপূর্ব্বে ব্রজেশ্বরের হৃদয়ে প্রেমোদ্রেকের পর প্রফুল্লের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ব্রজেশ্বর দুর্ব্বল হইয়াছে, "শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না বাঁচে।" তথাপি তাহার পিতৃভক্তি অচলা ছিল। ডাকাইতের হাতে তাহার একটা গুণ প্রকাশ পাইল—সেটা সাহস; কিন্তু ডাকাইতের হাতে পড়িয়া বুঝি অতটা রসিকতা করিবার মত মনের অবস্থা থাকে না। দেবীর সহিত সাক্ষাতের সময়, সে কেবল সাগরের রাঙ্গা পা দুখানি টিপিয়া আসিয়াছে, ব্রজেশ্বর সেকালের ছেলে, তিনটার উপর আর একটা বিবাহ, তাহার পক্ষে বোঝার উপর শাকের আঁটি; সে দেখিল দেবী সুন্দরী, তাহার কণ্ঠস্বর কুসুমকুলান্দোলনকারী মধুর পবনাপেক্ষাও মধুর; রসপিপাসু জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর তাহার মুখচুম্বন করিল। তাহার প্রফুল্লের প্রতি প্রেমের মূলেও রূপজমোহ ছিল। দেবী যে প্রফুল্ল একথা শুনিয়া সে ব্যথিত হইল। শেষে দেবীর বিপদকালে তাহার মুখে সকল কথা শুনিয়া সে বলিয়াছিল "আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপদ্‌কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?" প্রেমের বলে মানব সবই করিতে পারে—তাই প্রাচীর লঙ্ঘনের কথায় রোমিয়ো বলিয়াছিলেন "With love's light wings did I o'er-perch these walls." আর ব্রজেশ্বর যে সাহসী, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহার পর নিশি ঠাকুরাণীর দেবতায় অসমর্পিত দুষ্টামির বলে সে প্রফুল্লকে ঘরে লইয়া গেল। দেবীর পার্শ্বে ব্রজেশ্বর ছায়া মাত্র। ব্রজেশ্বর যেন গ্রন্থকারের একালের উপর রাগজনিত সৃষ্টি—সে গোটাতিন বিবাহ করিতে অসম্মত নহে, পিতার আজ্ঞায় কর্ত্তব্য পথ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। আবার তাহার নীতিশাস্ত্রে লেখে যে, স্থানবিশেষে বাপের কাছে ভাঁড়াভাঁড়িতে দোষ নাই। তাহার কথায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "ব্রজেশ্বর সেকেলে ছেলে—একটা "Lie direct" সম্বন্ধে অবস্থা বিশেষে তাহার আপত্তি ছিল না।" এটাও যেন একটা গৌরবের কথা! এও যেন এ কালের উপর একটা আঘাত!! বৃদ্ধ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র এ কালের উপর বড় চটা। সেকাল ভাল ছিল, এ কাল মন্দ; আর এ কালের লোকেরা অর্থাৎ তাঁহার পাঠক সম্প্রদায়ও মন্দ। এ কালের মেয়েরা বেহায়া,

প্রমাণ তাঁহারা দিবাভাগে স্বামী সন্দর্শন করেন!! এ কালের ছেলেরা খারাপ, প্রমাণ তাহারা যে যত বড় মূর্খ, পিতৃসমক্ষে সে তত বড় লম্বা প্যাঁচ ঝাড়ে!!! কি সর্ব্বনাশ!!! দাম্পত্য সম্বন্ধটাকে আমরা নিতান্তই নিন্দনীয় মনে করি—নিশীথে নিতান্ত গোপনে ভিন্ন স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্তই নিন্দনীয় ভাবি, স্বামীর গৃহকর্ম্ম করা ও জননী হওয়া ভিন্ন স্ত্রীর যে অন্য কার্য্য থাকিতে পারে, তাহা আমাদের কল্পনার মধ্যেই আইসে না। পিতা পুত্রে সম্বন্ধটার মধ্যে যে একটু ভালবাসা থাকিতে পারে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। কাজেই আমাদের গৃহ, সুখ ও আরামহীন কারাতুল্য। বৈরাগ্য সম্বন্ধে মত ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু মানব যে স্বভাবতঃই একটু আরামের প্রত্যাশা করে ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। যেখানে গৃহে পিতা এমন কি জ্যেষ্ঠও যমতুল্য, মৃত্যুকালেও স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ নিন্দনীয়, সেখানে মানব যে সময় সময় তাহার স্বাভাবিক আরামপ্রিয়তাবশতঃ গৃহের বাহিরে আরাম অন্বেষণ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারে এ সম্ভাবনা কি অসম্ভব?

থ্যাকারে স্থানে স্থানে পাঠকদিগের প্রতি একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কারণ ছিল। তাঁহার মত হতাশ গ্রন্থকারের সংখ্যা অল্প। অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের অধীশ্বর হইলেও তখন ডিকেন্সের যশের নিকট তাঁহার যশ ম্লান ছিল। আর আজ মিষ্টার লিলি বলেন যে, শিক্ষিত সমাজে ডিকেন্সের প্রভাব কমিতেছে, আর প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক আইয়ান ম্যাকল্যারেন বলেন যে, থ্যাকারের প্রভাব কখনও কমিতে পারে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সে কারণ ছিল না। সৌভাগ্যই হউক আর দুর্ভাগ্যই হউক, আমরা এ কালের লোক; আর দায়িত্বহীন কবিকুলকল্পিত Golden age অপেক্ষাও আমরা আমাদের কালকে ভালবাসি। জগৎ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে; সে কাল অপেক্ষা একালে চরিত্র, জ্ঞান, সভ্যতা সকলই উন্নত। তাই কমলমণি চরিত্র স্রষ্টার মুখে একালের এ নিন্দা বড়ই কেমন ঠেকে। টেনিসন বলিয়াছেন:—

"The past will always win
A glory from its being far;"

"Regrets are the natural property of gray hairs." বুঝিবা বার্দ্ধক্যসুলভ বাক্যাধিক্য প্রিয়তা হইতে গালিও উৎপন্ন হয়; তাই যে বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতগণকে গালি দেওয়ায় প্রথম বয়সে বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগরকে

এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলে যে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে সে প্রবন্ধের তীব্রাংশ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই বৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণচরিত্রের মত এক খানা সারবান পুস্তক গালিতে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

নিশিঠাকুরাণীর "সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে"। তিনি বলিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে, কেন না তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।" কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম-সোপান।" এই গ্রন্থমধ্যেও তিনি বলিয়াছেন "অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী, ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।" পুরুষ রমণীর পরকালের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, তাঁহাকে দিয়া আপনার পদপূজা করাইয়াছে কিনা, সে তর্ক এখানে তুলিয়া কাজ নাই। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বাবু পূর্ণচন্দ্র বসুর কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। "সতী পতিভক্তিতে যে আত্মোৎসর্গ অভ্যাস করেন, তাহাই ভগবদ্ভক্তির নিদান। ভগবানে ততই আত্মোৎসর্গ না করিলে ভগবৎ প্রেম লাভ করা যায় না। * * * সীতা ও রাধিকা এই দ্বিবিধ প্রেমের আদর্শ, অথচ দুইজনেই পরস্পরের প্রতিবিম্ব। প্রভেদ এই, সীতার পতিপ্রেম অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত—এত উজ্জ্বল বর্ণে যে, তাহাতে দেব ভক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রাধিকায় ভগবৎপ্রেম এত উজ্জ্বল যে, তাহাতে পার্থিব পতিপ্রেম প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পতিপ্রেম ভগবৎপ্রেমে আরোহণ করিয়া রাধিকাসুন্দরীর প্রেম ভক্তি। প্রেমের এই ক্রম আর্য্যসাহিত্যে, আর্য্যসমাজেও এই ক্রম।" পতিপ্রেম নহিলে ভগবৎপ্রেম হয় না, আমাদের এ বিশ্বাস নাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সহিত নিশি চরিত্র খাপ খায় না। নিশি সিঁড়ি না ভাঙ্গিয়াই স্বর্গে গিয়াছে।

ভবানীঠাকুর পণ্ডিত, কার্য্যোদ্ধারপর। ত্রাসনদিগের সহিত তাঁহার তুলনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তাঁহার এক হস্তে গীতা, অপর হস্তে সেকালের পীনালকোড-লাঠি। আইনানুযায়ী কার্য্য না করিয়া, ডাকাইতি

করিয়া পরোপকার সমাজের পক্ষে হিতজনক নহে। তাঁহার সপক্ষে এইটুকুমাত্র বক্তব্য, যে তাঁহার উদ্দেশ্য মন্দ নহে।

জমীদারবিদ্বেষীগণ বলিবেন যে হরবল্লভ "জমীদারি মিণ্টে ঢালা আদৎ মডেল।" আমরা বলি হরবল্লভ অতি নীচহৃদয়, পাপাত্মা। যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নাই, তাহার মত নীচ আর কে?

নয়ানতারার কথা অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে যাহারা এই-রূপ এককালে একাধিক বিবাহ করিয়া থাকে, তাহাদের সবগুলি পত্নীই নয়নের মত হইলে বোধ করি ভাল হয়।

গ্রন্থমধ্যে সাগরের চরিত্রই সর্ব্বোপেক্ষা মধুর। দেবীর পার্শ্বে সাগর—অদ্ভুতের পার্শ্বে, মাধুরীময় বাস্তব; কুহেলিকাচ্ছন্ন সাগরের পার্শ্বে, চলমলয়-বনপবনান্দোলিত বীচিময়ী, রবিকরসমুজ্জ্বলা নিকুঞ্জপ্রহ্লাদিনী স্রোতস্বিনী। সাগরের প্রণয়ে "সোহাগ হিল্লোল, স্নেহ নিরমল নীর।" কিছুরই অভাব নাই। সাগরের হৃদয় বড় স্নেহে ভরা। তাহার যেটুকু অদ্ভুত সে কেবল দেবীর স্পর্শে—ব্রজেশ্বরের নিকট পণ, দেবীর সহিত পলায়ন ইত্যাদি। অসম্ভবের পার্শ্বে সম্ভবের মত দেবীর পার্শ্বে এই চঞ্চলামূর্ত্তি বড় ফুটিয়াছে।

দেবী চৌধুরাণীতে যত হাসাইবার চেষ্টা আছে, তত হাসি নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য ঘটনারই প্রাচুর্য্য। ঘাড়ের উপর দিয়া নৌকা গেল—কেহ মরিল না; নৌকা টলিলে মানুষগুলা গড়াগড়ি গেল—কেহ কাহারও পায় পড়িল, কেহ কাহারও নাগরায় আটকাইল—তবুও আলোকাদি ঠিক রহিল। তাহার পর দেবীর নৌকা ঝড়বাহন; দানবের মৎস্যাহরণ বর্ণনা করিতে হইলে যদি বলিতে হয়:—

> "His angle-rod made of a sturdy ook;
> His line a cable which in storms ne'er broke;
> His hook he baited with a dragon's tail,
> And sat upon a rock and bobbed for whale.

তবে দেবীর নৌকা ঝড়বাহন হইবে না কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য পুস্তকের সহিত তুলনায় দেবী চৌধুরাণী তেমন উৎরায় নাই। গীতার উপদেশ উপন্যাসে দিতে যাইয়া উপদেশও মনে বসে না, উপন্যাসও তেমন ভাল লাগে না।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের যে ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে ধূলিমুষ্টি স্বর্ণ মুষ্টিতে পরিণত হইত, সে স্পর্শ দেবী চৌধুরাণীর অনেকস্থলেই অনুভূত হয়। দেবী

চৌধুরাণীতে বর্ণনাগুলি অতীব সুন্দর। আর যেখানে যেখানে দেবীর অভ্যাসের কঠোর আবরণ মধ্য হইতে তাহার রমণী প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেখানে সেখানেই মাধুরী উছলিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মৃদ্‌ভোজী জাতি।

আমেরিকার 'বরো অব এথনোলজী' নামক সভার নবম বার্ষিক রিপোর্টে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মনুষ্যজাতি কত রকম অদ্ভুত পদার্থ ভক্ষণ করে, তাহার এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল ভোজ্য পদার্থের মধ্যে মৃত্তিকা অথবা কর্দ্দমই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র। রিপোর্টে প্রকাশ—এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীতেই মৃত্তিকা ভক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর অনেক অসভ্য দেশে এখনো ইহা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। কোন কোন দেশে ইহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রথারূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি প্রদেশের নিগ্রোগণ পীতবর্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করে; তাহারা এই মৃত্তিকাকে 'কাউয়াক' বলে। 'কাউয়াকের' গন্ধ এবং আস্বাদন তাহাদের নিকট যৎপরোনাস্তি প্রীতিকর। এই মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া কখন তাহাদিগকে পাক-যন্ত্র-সম্বন্ধীয় পীড়া ভোগ করিতে হয় না; অনেকে ইহাতে এরূপ অভ্যস্ত যে এই মৃত্তিকা খাইতে না পাইলে তাহারা এক দিনও থাকিতে পারে না। ইহার ব্যবহার নিষেধ করা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার গুরুতর দণ্ড।

কালিফর্ণিয়ার অধিবাসিগণ রুটী সুমিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ময়দার সঙ্গে লোহিত বর্ণের এক প্রকার মৃত্তিকা ব্যবহার করে। ম্যাকেঞ্জী নদীর উভয় তীরে যে সকল অসভ্য আমেরিকানের বাস, তাহারা দুর্ভিক্ষের সময় তৈলাক্ত মৃত্তিকা আহার করিয়াই জীবন ধারণ করে, অন্যান্য সময় ইহারা পানের ন্যায় তাহা চর্ব্বণ করিয়া, বিশেষ আরাম বোধ করে। এই মৃত্তিকার আস্বাদন অনেক পরিমাণে দুগ্ধের ন্যায় এবং তাঁহাদিগের নিকট তৃপ্তিকর।

উত্তর আমেরিকার আপেস্‌ নামক অসভ্যজাতি বন্য আলুর কটুরস দূর করিবার জন্য রন্ধনকালে তাহার সহিত মৃত্তিকা সংমিশ্রিত করে।

জুনি এবং তাসিয়ান জাতিও মৃত্তিকা ভক্ষণে অভ্যস্ত। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে অরিনকো নদীর তীরবর্ত্তী এবং বলিভিয়া ও পেরুর পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে মৃদ্‌ভক্ষণের প্রচলন দেখা যায়।

আফ্রিকার গিনি প্রদেশের নিগ্রোজাতি যখন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসরূপে নীত হইত, তখন তাহারা পথের মধ্যে সমারোহ পূর্ব্বক মৃত্তিকা ভোজন করিত। এই দ্বীপপুঞ্জে আসিয়াও তাহাদের মৃত্তিকা ভক্ষণের লোভ নিবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু এই স্থানের মৃত্তিকা তাহাদের স্বদেশীয় মৃত্তিকার ন্যায় সহজে পরিপাক হইত না; সুতরাং সকলেই কঠিন অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাই অবশেষে তাহারা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে মার্টিনিক প্রদেশের বাজারে এক প্রকার লোহিত মৃত্তিকা বিক্রয় হইত, কিন্তু করাসী ঔপনিবেশিকগণের প্রাদুর্ভাবে এ প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। এসিয়ার পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমান কালেও এই প্রথা প্রচলিত দেখা যায়।

যাভা দ্বীপের পল্লীসমূহে লাল চতুষ্কোণ মৃৎপিষ্টক সমূহ বিক্রয় হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইরেনবর্গ এই সকল মৃৎপিণ্ড বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখিয়াছিলেন যে স্বচ্ছ জলে যে সকল অণুপ্রমাণ কীট এবং উদ্ভিজ্জ দেখা যায়, তাহা বহুল পরিমাণে এই মৃত্তিকায় বর্ত্তমান ছিল। সুসভ্য জাপানেও কোন কোন স্থানে মৃদ্‌ভক্ষণের প্রথা প্রচলিত আছে। ডাক্তার লভ নামক জনৈক পণ্ডিত কিছুদিন পূর্ব্বে আইনোদিগের ব্যবহৃত কর্দ্দম বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সাধারণ্যে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন; যেশোর উত্তর উপকূলে সিটোনিয়া পর্ব্বতের অধিত্যকায় এই কর্দ্দমস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার বর্ণ পাতলা ধূসর। স্থানীয় অধিবাসিগণ এই কর্দ্দমের সহিত একপ্রকার সুগন্ধি পত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করে। ইহারা কর্দ্দম সেবনের বিশেষ কোন আবশ্যকতা অনুভব করে না। তাহাদের বিশ্বাস ইহা যথেষ্ট উপকারী। এই কর্দ্দম গুলিয়া ইহারা ঝোলের ন্যায় পান করে। অনেক সময় কর্দ্দমের সহিত পদ্মমূল মিশাইয়া অগ্নিতে জ্বাল দেওয়া হয়। সেই মূল সিদ্ধ হইলে তাহা কর্দ্দমের মধ্যে চটকাইয়া লয়, আইনোগণের মতে এই পানীয় অতি মুখরোচক।

হিমালয় পর্ব্বতের প্রান্তবর্ত্তী শিকিম প্রদেশে 'রঞ্জিৎ ভ্যালি' নামক উপত্যকার অধিবাসিগণ গলগণ্ড রোগের প্রতিষেধস্বরূপ এক প্রকার

লোহিত মৃত্তিকা তাম্বুলের সহিত চর্ব্বণ করে। "Smith's aborigines of Victoria" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ মৃত্তিকার সহিত 'মেন' নামক বৃক্ষমূল চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে। উত্তর য়ুরোপের বিশেষতঃ সুইডেন দেশের উত্তরাংশে গাড়োয়ানেরা প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকা চর্ব্বণ করিয়া থাকে, ফিনল্যাণ্ডে রুটীর সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত হয়।

সাইবিরিয়ার কোন কোন জাতি পর্য্যটনকালে মৃত্তিকাপূর্ণ থলিয়া সঙ্গে লয়; তাহাদের বিশ্বাস এই মৃত্তিকার আস্বাদ গ্রহণ করিলে বৈদেশিক উপদেবতাদিগের মন্দ দৃষ্টির দ্বারা অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। য়ুরাল পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসিগণ রুটীর সহিত চা-খড়ি মিশাইয়া ভক্ষণ করে। তাহারা মনে করে, ইহাতে খাদ্যদ্রব্য মুখপ্রিয় এবং স্বাস্থ্যকর হয়। জর্ম্মণীরাজ্যের উত্তর ভাগেও অনেক সময়—বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে কিম্বা কোন নগরের দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের সময়,—মৃত্তিকা ভক্ষণ পূর্ব্বক জঠরানল নিবৃত্ত করিবার প্রথা দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

পোষ্টমাষ্টার।

(১)

ভাই বিনয়,

তুমি পূজার ছুটীতে যখন বাড়ী আসিয়াছিলে, তখন আমার দুঃখের কথা সমস্তই তোমাকে বলিয়াছিলাম। তুমি নানা কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক, বোধ হয় সে সকল কথা তোমার মনে নাই। আমার দুঃখ অপার; সে দুঃখকাহিনী কাহারো কাছে প্রকাশ করিয়াও কোন ফল নাই। তুমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার দুঃখ কষ্ট তুমি হৃদয় দিয়া অনুভব কর, তাই মনে হইতেছে, তোমার কাছে আমার কষ্টের কথা কতক কতক প্রকাশ করিয়া একটু শান্তি লাভ করিব। তোমার মত বন্ধু আমার আর কে আছে? তুমি ত ভাই জান, তোমাদের গ্রামে পোষ্টমাষ্টারি করিয়া আমি মাসে কুড়ি টাকার বেশী বেতন পাইনা; টিকিট বিক্রয়ের কমিশন আর কত হইবে?— দু টাকার বেশী হয় না। আর এই বাইশ টাকা। পরিবারে তিনটি মেয়ে একটি ছেলে আর আমরা স্ত্রীপুরুষ; বাইশ টাকা আয়ে আজ কাল এতগুলি

পরিবার প্রতিপালন করা যে কি কঠিন তা আমিই জানি। না হয়, ছেলে মেয়ে কটিকে দুবেলা দুমুটো খাইতে দিয়া আমরা স্ত্রী পুরুষে এক বেলা খাইয়াই থাকিলাম ; ঘরের মধ্যে কি করি না করি তার খোঁজ কে লইবে ? আর আমরা অর্দ্ধাসনে দিনপাত করিতেছি, তাহা অন্যে জানিলেই বা কি ক্ষতি ? দুবেলা যাহার আহার যোটে না, তাহার সে চক্ষুলজ্জা নিষ্প্রয়োজন। সে যাহাই হউক, এখন ঘোর বিপদে পড়িয়াছি তাহা হইতে কিরূপে উদ্ধার হই ? বড় মেয়েটি তের বৎসর পার হইয়া চোদ্দয় পড়িয়াছে ; মেজ মেয়েটিও বার বৎসরে পা দিয়াছে ; মেয়ে যে আর ঘরে রাখিতে পারি না। তুমি ত ভাই জান, আমার হাতে একটি পয়সাও নাই, এমন আত্মীয় নাই যাহার কাছে এ দুঃসময়ে সাহায্য চাহিয়া কিছু পাইবার আশা করিতে পারি ; স্ত্রীর গায়ে এমন একখানিও গহনা নাই যাহা বিক্রয় করিয়া দু পয়সা সংগ্রহ করি। এখন উপায় কি ? আমার যে জাতি যায় ! কলিকাতায় অনেকের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় আছে, বিনা পয়সায় কি আমার মেয়ে দুটিকে কেহ গ্রহণ করিবে না ? তুমি একটু বিশেষ চেষ্টা দেখিও ; আমি বড় কষ্টে পড়িয়াছি। এমন কেহ আপনার লোক নাই যাহার উপর পাত্র খুঁজিবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি ; কাজ ছাড়িয়া নিজেরও নড়িবার যো নাই। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, তোমার উপর উষা ও নিশার বিবাহভার দিতেছি, তাহারা তোমাকে নিজের কাকা বলিয়াই মনে করে, কাকার যাহা কর্ত্তব্য, করিও, ভাই। আমরা শারীরিক ভাল আছি, তুমি কেমন আছ লিখিও।

হতভাগ্য রজনী।

(২)

মাষ্টার মহাশয়,

আপনার পত্র পাইলাম। কলিকাতায় নানা রকম বিষয় কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি সত্য, কিন্তু সে জন্য আপনার কথা ভুলি নাই ; আপনার উষা ও নিশার কথা যখন তখনই মনে হয়। আমি অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, কিন্তু উষার মত মেয়ে আমার চক্ষে কম পড়িয়াছে। তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং স্বভাব দুই অতি সুন্দর ; আপনাকে কষ্ট দিবার জন্যই বুঝি ভগবান্ এমন কন্যারত্ন আপনার ঘরে পাঠাইয়াছেন। এমন লক্ষ্মীর মত সুন্দরী, ধীর শান্ত মেয়ে কি যার তার হাতে সঁপিয়া দেওয়া যায় ?

আমি যদিও আজ তিন বৎসর হইল কালেজ ছাড়িয়াছি, তথাপি আমার সমপাঠী অনেকে আজও কালেজে পড়িতেছেন। দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য, বালিকা-বিবাহ রহিত করিবার নিমিত্ত, সামাজিক কুরীতি এবং কুসংস্কার নিবারণের জন্য যাঁহাদের সঙ্গে একত্রে সভাসমিতি করিতাম, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতাম, প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতাম, তাঁহাদের অনেকেই এখনও কালেজে পড়িতেছেন। সে দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাদের দেশোদ্ধার দলের চাঁই একটি বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম; তিনি এম্. এ পাশ করিয়া এখন আইন পড়িতেছেন; এখন পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই; আমাদেরই জাতি, উপাধি ঘোষ, বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর, ঊষার সঙ্গে বেশ মানায়। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হইল, কথায় কথায় দেশোদ্ধার, জাতীয় মহাসমিতি, ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি লইয়া অনেক আন্দোলন চলিল। তাহার পর আসল কথা পাড়িলাম। বিবাহের কথা উঠিলে, তিনি যে রকম মেয়ে চান ঊষা ঠিক সেই রকম মেয়ে, তাহা বলিলাম, এবং রূপ গুণ, লেখা পড়া প্রভৃতিতে ঊষা তাঁহাকে বেশ সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহাও তাঁহাকে জ্ঞাত করিলাম। পরে মনে হইল এই সঙ্গে আপনার পরিচয়টাও দেওয়া ভাল। কাজেই তাঁহাকে বলিলাম আপনি কুড়ি টাকা মাহিয়ানায় পাড়াগাঁয়ে পোষ্টমাষ্টারি করেন। শুনিয়া তিনি অনায়াসে বলিয়া বসিলেন "তাইত, তেমন respectable লোক নন। আমার বিশেষ আপত্তি না থাক্‌লেও বাবা যে এ কাজে স্বীকার হবেন তা বোধ হয় না।"—ইচ্ছা হইল আমাদের 'ছাত্রসমিতি'তে পঠিত প্রবন্ধের তাড়া হইতে তাঁহারই লিখিত 'পাশ করা বরের অত্যাচার' শীর্ষক প্রবন্ধটি বাহির করিয়া এখন একবার তাঁহাকে পড়িতে দিই। আপনি সামান্য পোষ্টমাষ্টার, তাই আপনাকে শ্বশুর বলিতে তাঁহার আপত্তি। তাঁহার পিতার কাছে এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তিনি যে ফর্দ্দ বাহির করিতেন তাহাতে অনেক রাজা মহারাজকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইত, অথবা পাগলের প্রলাপ বলিয়া কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন।

যাহা হউক এই এম্. এ পাশগ্রস্ত ভদ্রলোকটির কাছ হইতে বিদায় লইয়া, আমি অপেক্ষাকৃত অল্প পাশওয়ালা একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করিলাম। এ ছেলেটি আমার বড়ই বাধ্য ছিল, গত বৎসরে এল্. এ পাশ করিয়া, এখন মেডিকেল কালেজে ডাক্তারি পড়িতেছে; অবস্থা মন্দ নয়।

শুনিয়াছিলাম এ ছেলেটির বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে, একটি ভাল মেয়ে হইলেই হয়, টাকা কড়ির দিকে দৃষ্টি নাই, তাই তাহার কাছে গিয়াছিলাম; তাহাকেও সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সে সম্মত হইল; কিন্তু টাকা কড়ি কিছু পাইবার আশা নাই শুনিয়া বলিল, "আমার কোন আপত্তি নাই বটে, কিন্তু মা বাপের অমতে ত কিছু করিতে পারি না, আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই ত আছে, "পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ", পিতার অসম্মতিতে আমার কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই।" বুঝিলাম ইনিও সেই দলের। মাষ্টার মহাশয়, কলিকাতার ছাত্রদলের মধ্যে আপনার কন্যার বিবাহের আশা ত ছাড়িয়া দিয়াছি; নগদ পাঁচ হাজার, অভাব পক্ষে তিন চারি হাজার টাকার কমে কালেজের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া অসম্ভব। আমি কি করিব কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না, অথচ শীঘ্র বিবাহ দেওয়া চাই। আপনি বড় দাদাকে এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া বলিবেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মধ্যে তাঁহার অনুগত অনেক লোক আছে। তিনি যদি চেষ্টা করেন ত কৃতকার্য্য হইবার যথেষ্ট আশা আছে। আমি ভাল আছি। আপনারা কেমন আছেন? ঊষা ও নিশাকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। ইতি।

আপনার স্নেহের বিনয়।

(৩)

ভাই বিনয়,

আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, পাশ করা ছেলেদের দিকে যাইও না। তুমি আমাকে কতবার বলিয়াছ, পাশ করা ছেলেরা কি এতই নিষ্ঠুর? তুমি নিজের মত সকলকেই দেখ; তুমি বিবাহ করিয়া এক পয়সাও লও নাই, তাই মনে করিয়াছিলে, তোমার সঙ্গে মিশিয়া যাহারা স্বার্থপরতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হৈচৈ করিত, সকলেই সেই রকম করিবে; তাই ঊষা ও নিশার জন্য পাত্র খুঁজিতে গিয়া তোমাকে ভগ্নপ্রয়াস হইতে হইয়াছে। সংসারের বাহিরে যেমন দেখা যায়, ভিতরটাও যদি সে রকম হইত, তবে আর দুঃখ ছিল কি? লোকে মুখে যাহা বলে, কাজেও যদি তাহা করিত, তাহা হইলে কি আর ভাবিতে হইত? কলিকাতা সহর খুঁজিয়া দেখিও, কালেজের পাশের খাতা লইয়া বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিও; দেখিবে, ধন মানের দিকে না চাহিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত, এমন ছেলে শতকরা একটি মেলা কঠিন। আমার মত কুড়ি টাকা বেতনের পোষ্ট-

মাষ্টারকে শ্বশুর বলিয়া পরিচয় দিতে একজন এম, এ, পাশ করা বাবুর লজ্জা হওয়াই উচিত; বরং তাহা না হওয়াই আজকালের দিনে আশ্চর্য্য। উদরান্ন জুটাইতে পারি না, চার পাঁচ হাজার টাকা কোথায় পাইব ভাই? তোমার দাদা অনুগ্রহ করিয়া এই বিপদে আমাকে তিন শত টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাই আমার সম্বল। তিন শত টাকায় যে রকম বর পাওয়া যায়, তাহারই সন্ধান করিও। তোমার দাদাও চারিদিকে অনুসন্ধান করিতেছেন। কি বলিয়া তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিব? ভগবান্ তোমাদের চিরসুখী করুন,—তোমরা বিপন্নের বান্ধব।

হতভাগ্য রজনী।

(৪)

প্রিয়তম বিনয়,

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, রজনীবাবুর দুই মেয়ের বিবাহের জন্য আমি পাত্র ঠিক করিয়াছি; মেয়ে যেমন, ছেলে দুটি তেমন হইল না; কি করিব বল, চেষ্টার ক্রটি করি নাই। রজনী বাবুর মেয়ে দুটি সত্য সত্যই রাজার পুত্রবধূ হইবার যোগ্য; যদি আমার আর ছোট ভাই থাকিত, তবে উষাকে আমাদের ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিতাম। আমাদের হরিপুরের তহবিলদার রাজকৃষ্ণ মিত্রকে তুমি চিনিতে। গতবৎসর তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার বড় ছেলে হরেকৃষ্ণকে আমি সেই কাজ দিয়াছি; ছেলেটি বেশ শান্ত শিষ্ট, বেশ বুদ্ধিমানও বটে, তবে লেখাপড়া ভাল জানে না। এ এক বৎসর কাজ কর্ম্মও বেশ করিতেছে। খুব বিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস, তাহার সঙ্গে বিবাহ দিলে উষা কখনও খাওয়া পরার কষ্ট পাইবে না। হরেকৃষ্ণের ছোট ভাই মাইনর স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছে, বয়স সতের বৎসর; মাইনরটা পাশ করিলে, আমি মনে করিতেছি, তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া ক্যাম্বেলস্কুলে ডাক্তারি পড়াইব, নিশার সঙ্গে তাহার এক রকম মানাইবে। ইহারা আমার বিশেষ বাধ্য বলিয়াই আমার কথায় সম্মত হইয়াছে। সেদিন পোষ্টমাষ্টারকে ডাকাইয়া সকল কথা বলিয়াছি। তিনি ছেলে দুটিকেও দেখিয়াছেন, এ বিবাহে তাঁহার অমত নাই। খরচ পত্রের একটা ফর্দ্দ ধরিয়া দেখা গেল, মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে ন শ টাকার কমে কিছুতেই দুই মেয়ে পার করা যায় না। আমি তিনশ টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম, মা বলেন, স্বজাতির ছেলে কন্যাদায়ে

পড়িয়াছে, বিশেষ আমাদের বড় অনুগত লোক, আরো কিছু বেশী সাহায্য করা উচিত, ইহা অপেক্ষা পুণ্যের কাজ আর কিছুই নাই। মার বড় দয়া। আমি মনে করিতেছি, চার শ টাকা দেব। তুমি কি বল ? তুমি বিবাহের সময়ে বাড়ী আসিও, তাহা হইলে রজনীবাবু বড়ই সুখী হইবে।

এইমাত্র তোমাদের বড় বৌ আসিয়া বলিলেন, যে ছোট বৌমার ইচ্ছা দানের জিনিষগুলিও আমরা দিই; তোমাকে সে কথা লিখিতে বলিলেন। দয়াময়ী ছোট বৌমার কথা আমি অমান্য করিতে পারিব না, তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি বলিয়া দিয়াছি দান সামগ্রী যাহা যাহা দেওয়া প্রয়োজন তিনি তোমাকে লিখিবেন, তিনি যেমন যেমন জিনিষের ফরমাইস দিবেন তাহাই আনিবে, আমার মতামতের অপেক্ষা করিও না। এখানকার সব মঙ্গল; বিনোদ বিপিন, খোকা ভাল আছে। তোমার শরীর কেমন ? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবিজয়কুমার মিত্র।

(৫)

ভাই বিনয়,

তোমাদের দয়ায় এবার আমি কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে চলিলাম। শনিবারে ঊষা নিশার বিবাহ সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তুমি অন্ততঃ শুক্রবারে অবশ্য অবশ্য এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। নানা কারণে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করা নিতান্ত দরকার। তোমরা যাহা সাহায্য করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর যে তিন চারি শত টাকা লাগিবে, তাহা আমি অন্যস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তোমার সঙ্গে দেখা হইলে সমস্ত বলিব, অবশ্য অবশ্য আসিও।

হতভাগ্য রজনী।

(৬)

শ্রীচরণকমলেষু,

দাদা, আজ বুধবার; শনিবারে রজনীবাবুর মেয়েদের বিবাহ। আপনি যাইতে লিখিয়াছিলেন, রজনীবাবুও যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, বাড়ী হইতেও পত্র পাইয়াছি, কিন্তু আমার যাওয়ার বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত। শনিবারে Oriental Tea Companyর মীটিং; কোম্পানির কাজ কর্ম্মের বিশৃঙ্খলতার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই মীটিং'এ

হিসাব পত্র পরীক্ষা ও ভবিষ্যতের কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত স্থির হইবে। আমার সে সভায় উপস্থিত থাকা নিতান্ত দরকার। যদি আপনি এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে আমি যাইতে পারিতাম। এই পত্রপাঠ আপনি চলিয়া আসিয়া শনিবারের মীটিংএ উপস্থিত থাকিলে চলিতে পারে বটে, কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম আমি বাড়ী গিয়া রজনীবাবুর মেয়ের বিবাহের কিছুই বন্দোবস্ত করিতে পারিব না, আপনি ত জানেন, ও সকল কাজে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং আমার এখানকার কাজ লইয়াই থাকা ভাল। বিবাহে আপনি যাহা সাহায্য করিতেছেন, তাহা বেশ হইয়াছে। বাড়ীর মেয়েরা যেন বিবাহের দিন রজনী বাবুর বাড়ীতে যান, নতুবা তিনি মনে করিবেন, গরীব বলিয়া উপেক্ষা করিয়া বাড়ীর বৌ ঝিরা তাঁহার বাড়ীতে গেলেন না। দানের জিনিষ পত্রগুলি আমি নিজে দেখিয়া কিনিয়াছি, আজ রাত্রে সেগুলি রেলোয়ে পার্শেলে রওনা করিব। ইতি—

সেবক শ্রীবিনয়কুমার মিত্র।

পুঃ—পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে আর পৃথক পত্র লিখিলাম না, আপনিই তাঁহাকে সকল কথা বলিবেন। আর একটা কথা—তিনি অবশিষ্ট তিন চারি শত টাকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?

বিনয়।

(৭)

প্রিয়তমে,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার চিঠি, তাহার উপর দাদার হুকুম! এক হুকুমেই রক্ষা নেই, তা আবার ডবল; নিজে বাজারে বাজারে ঘুরিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তোমার বরাতি দানের জিনিষগুলি কিনিয়াছি, এখন তোমার পছন্দ হইলেই সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। তবে কিনা তোমার মন জিনিষটি বড়ই দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু তাই বলিয়া ভরসা করি, এ পক্ষের সাধনার ত্রুটি নাই।

রহস্য পরিহাসের কথা এখন থাক্। পোষ্টমাষ্টারের পরিবারের প্রতি তোমার দয়া দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছি; পোষ্ট মাষ্টারের ন্যায় দরিদ্র পরিবার যথার্থই করুণার পাত্র। দুঃখী দরিদ্রের প্রতি তোমার যেমন দয়া আমি যেন তাহার অনুকরণ করিতে পারি। উষা ও নিশার জন্য কেমন সুন্দর কাপড় কিনিয়াছি দেখিও, দেখিয়া তোমার মুখ আনন্দে

ভরিয়া উঠিবে। বড় দুঃখ যে তোমার মুখের সেই ভাবখানা দেখিতে পাই-লাম না। কি করিব বল? হঠাৎ এমন কাজ পড়িয়া গেল যে বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও কিছুতে বাড়ী যাইবার যো নাই। মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর দুঃখ ছিল কি?

উষা ও নিশার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে গিয়া যে কষ্ট পাইয়াছি তাহা বলিবার নহে। ছেলে পাশ করিলে আর রক্ষা নাই, ছেলের মা বাপ অর্দ্ধ-রাজ্য ও এক রাজকন্যা চাহিয়া বসে, ছেলে খোজ করে মেয়েটি ডানাকাটা পরী কিনা এবং সে লেখাপড়াতে কি রকম পরিপক্ক। তোমারও ত একটি ছেলে হইয়াছে, তাহার বিবাহের সময় যেন তুমি সোনার ঘড়া, রূপার খাট চাহিয়া বসিও না। গরীবের ঘর হইতে উষার মত একটি পরমা সুন্দরী ক'নে আনিয়া তোমার পুত্রবধূ করিয়া দিব, তখন যেন তত্ত্বের জন্য বেয়ানকে গা'ল পাড়িও না। পোষ্টমাষ্টারের অবস্থা দেখিয়া মনে যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা যেন মনে থাকে।

আমি যাইতে পারিলাম না, তোমাকে একটা কাজের ভার দিতেছি। তোমাকে আমার একটিনি করিতে হইবে; পারিবে ত? আমি জানি তুমি অতি সুন্দররূপে সকল কাজ করিতে পারিবে; কেবল আমার মত মুখে চুরট গুঁজিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে আর বাজে ইয়ারকি দিতে পারিবে না। যাহা হউক আসল কাজের তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। তুমি সেদিন একা দশজনের কাজ করিও, সকলে যেন দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায় যে, বড় মানুষের মেয়েতেও সংসারের সকল কাজ করিতে পারে। তাহাদের বুঝিতে দিও যে অহঙ্কার করিয়া বসিয়া থাকা, কি নাক তুলিয়া পরের নিন্দা করা পৃথিবীর সকল বড় মানুষের মেয়ের স্বভাব নয়। বিবাহ শেষ হইয়া গেলে আমাকে সংবাদ লিখিও, আর তুমি কেমন কাজ কর্ম্ম করি-য়াছ তাহা লিখিয়া জানাইও। সত্য বলিতেছি, তোমার প্রশংসা শুনিতে পাইলে আমার মনে বড় আনন্দ হয়। খোকাকে সেখানে লইয়া যাইও না, কতকগুলো মিষ্টি খাইয়া অসুখ করিতে পারে। আমি ভাল আছি।

তোমার বিনয়।

(৮)

প্রিয়তম বিনয়,

সর্ব্বনাশ হইয়াছে! পোষ্টমাষ্টার গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে! গত কল্য

বেলা দুই প্রহরের সময় বর কনে বিদায় হইয়া [illegible]য়াছে, রাত্রে এই ঘটনা। এখনো পুলিস আসিয়া উপস্থিত হয় নাই; ব্যাপার [illegible] কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। সবিশেষ পরে লিখিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক বিজয়।

(৯)

ভাই বিনয়,

কাল যখন তুমি এই পত্র পাইবে তখন আর আমি এ জগতে থাকিব না; দরিদ্রের জীবন ধারণে ফল কি ভাই?

তোমাকে অনেক কথা বলিবার ছিল, সেই জন্যই তোমাকে অবশ্য অবশ্য আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতি বিধাতা বিমুখ, তুমি ইচ্ছা সত্বেও আসিতে পারিলে না। আমার সময় অতি অল্প, মন ঠিক অবস্থায় নাই, যে সকল কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম তাহা আর বলা হইল না, সকল কথা গুছাইয়া লিখিতে পারিব সে আশাও নাই। কন্যার বিবাহ দিতে বসিয়া যে অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, রাজদণ্ডে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কিনা, জানি না। কিন্তু আমি আপনাকে ক্ষমা করিবারও যোগ্য নহি; যে মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি, তাহার আর ইহকাল পরকালে প্রায়শ্চিত্ত নাই। চিরজীবন দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিয়াছি, পরলোকেও অনন্ত নরক যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, ইহাই আমার অদৃষ্টে ছিল, ইহাই বিধিলিপি।

তোমরা আমার জন্য যাহা করিয়াছ, নিতান্ত প্রিয়তম আত্মীয়েও তাহা অপেক্ষা অধিক করিতে পারে না। তোমাদের সে ঋণ পরিশোধ করা আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত; প্রত্যুপকারের আশাতেও তোমরা এ হতভাগ্যের উপকার কর নাই। তোমাদের দেবহৃদয়, দরিদ্রের দুঃখে দয়ার্দ্র হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল তাই আমার জন্য এতটা করিয়াছ; আমার কন্যার বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ শত টাকা সাহায্য করিয়াছ, কিন্তু নয় শত টাকার কমে এ বিবাহ-কার্য্য সমাধা হয় না। গরীব কুড়ি টাকার কেরাণী বাকি চারিশত টাকা কোথায় পাইব, নিরুপায়! অবশেষে যে উপায় ছিল তাহাই অবলম্বন করিলাম। আমার হাতে যে সরকারী ক্যাষ ছিল, তাহা হইতেই চারিশত টাকা লইয়া কোন প্রকারে কাজ শেষ করিলাম, আজ আমি স্বাধীন, আজ কতকটা নিশ্চিন্ত মনে মরিতে

পারিব। আর যাহারা রহিল, যাহাদের মায়ার বাঁধন এ অন্তিম মুহূর্ত্তেও ছিঁড়িতে পারিতেছি না, তাহাদের ভার তোমাদের দুই ভাইয়ের হাতেই দিয়া যাইতেছি, জানি তোমরা তাহাদের ভার গ্রহণে কাতরতা প্রকাশ করিবে না, তাই মরিতে আমার দুঃখ নাই। তুমি হয়ত বলিবে কেন মরিতেছি? তহবিল ভাঙ্গিয়া ত কাহাকেও চিরজীবন রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয় না, দুই চারি বৎসর পরে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিব, আবার স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখিয়া শান্তিলাভ করিব। কিন্তু ভাই এ হীন কলঙ্কিত জীবন লইয়া কে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে চায়? জীবনের প্রলোভন কি এতই বেশী? যদি সুনাম হারাইলাম, রাজদ্বারে বিশ্বাসঘাতক, চোর বলিয়া দণ্ডিত হইলাম, সমস্ত সাধু লোকের সহানুভূতি হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম, তবে আর জীবনে কাজ কি? ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।

সেই জন্যই আজ মরিব স্থির করিয়াছি। চিরজীবন চোর বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিতে হয় করিও, কিন্তু ভাই, আমার অপরাধের জন্য আমার স্ত্রী পুত্রকে পথে বসাইও না। আমি আর তোমাদের একবিন্দুও অনুগ্রহের পাত্র নই, কিন্তু তোমাদের করুণা ভিন্ন আমার স্ত্রী পুত্র অনাহারে মরিবে। তাহাদের তুমি যে স্নেহ করিয়া আসিতেছ, এই হতভাগ্যের অপরাধে তাহাদিগকে সে স্থান হইতে বঞ্চিত করিও না।

ইহার পূর্ব্বে আমি একদিনও একটি পয়সা সরকারী তহবিল হইতে লইয়া খরচ করি নাই, কতদিন পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই, তথাপি সরকারী তহবিলে হাত দিই নাই, স্বামী স্ত্রীতে দারিদ্রের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া উপবাসে দিন কাটাইয়াছি; কিন্তু কন্যাদায় উদ্ধারের আর উপায় দেখিলাম না, নিজ হস্তে নিজের বুকে ছুরি দিলাম, সরকারী ক্যাঁষ ভাঙ্গিলাম। মনে মনে এই দুঃসঙ্কল্প স্থির করিয়াইত সরকারী তহবিল ভাঙ্গিয়াছি, এ কয়-দিন এই বিষ আমার হৃদয় মন জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি আমি প্রকাশ্যভাবে হাসিয়াছি। কেহ কি বুঝিয়াছে বুকের মধ্যে কি সমুদ্র লুকাইয়া আমি এ কয়দিন কি ভাবে কাটাইয়াছি?

আবার বলিতেছি ভাই, রসিক বিমলা রহিল, দুঃখিনী স্ত্রী রহিল, হায়, আমার মৃত্যুতে কি সে আর বাঁচিবে? তথাপি যে কদিন বাঁচে, সে কয়দিন তাহাদের মুখের দিকে চাহিও, তোমার হাতেই তাহাদের সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছ,

তোমার মা, দাদা, স্ত্রী এতদিন ধরিয়া, আমাদের প্রতি যে দয়া করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে আমার বিশ্বাস, আমার স্ত্রী তোমাদের দাসীবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইতে পারিবে। আমি চলিলাম, যে দেশে মেয়ের বিবাহ দিতে টাকা লাগে না, সেই দেশে চলিলাম। নরক হইলেও সে স্থান এই নরমাংস বিক্রয়ের স্থান হইতে অনেক ভাল, সেই স্থানই আমার প্রার্থনীয়। নরকে যমরাজের কাছে আমি ছেলে বিক্রয়কারীদের নামে নালিস করিব; পৃথিবীতে গরীবের বিচার হইল না।

বিনয়, আমার আর একটা অনুরোধ; ছেলের বিবাহ দিয়া টাকা লইও না। গরীব লোক, যে পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে না, সে যখন বিবাহ করিতে যাইবে, তখন তাহার হাতে ধরিয়া নিষেধ করিও। আমার পরিণাম দেখাইও।

মা উষা, নিশা, বাবা রসিক, স্নেহের পুতলি রাণি, প্রিয়তমে জনম-দুঃখিনী, কি বলিয়া আজ তোমাদের কাছে বিদায় লইব? একদিনও তোমাদের সুখী করিতে পারি নাই। সে আমার দুরদৃষ্ট, এ অক্ষমের সকল অপরাধ ক্ষমা করিও; জন্মের মত আজ চলিলাম, বিদায় দেও।

ভাই বিনয়, একটি অপদার্থ, অকিঞ্চিৎকর জীবন পৃথিবী হইতে অপসৃত হইল; আজ বিদায়, চির বিদায়।

তোমার হতভাগ্য রজনী।

শ্রীজলধর সেন।

জাতীয় জীবন ও নাট্যশালা

আমাদের দেশে আজ কাল নাট্যশালার অভাব নাই। অনেক স্থলে ইহা একটা পয়সা উপার্জ্জনের পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত নরনারী আমোদ উপভোগ করিবার জন্য নাট্যশালার অভিনয় দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। নাট্যশালার অভিনয় দর্শন করিয়া, আমরা যে আমোদ উপভোগ করি তাহা বিশুদ্ধ আমোদ কি না, সে আমোদ জাতীয় জীবনে কোন স্থায়ী ভাব বিস্তার করে বা করিতে পারে কি না, এবং এই আমোদ বিতরণ ছাড়া জাতীয় জীবনের সহিত নাট্যশালার অন্য কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

নাট্যশালা অর্থে আধুনিক থিয়েটরই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে আমাদের

দেশে এরূপ নাট্যশালা ছিল না—আধুনিক নাট্যশালা ইংরাজ অনুকরণে নির্ম্মিত। আমাদের দেশে এখনও পূর্ব্ব প্রচলিত যাত্রার দল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বের মত যাত্রা শুনিতে যাইবার জন্য লোকের তত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না; এখন সে আগ্রহটুকু থিয়েটরের দিকে গিয়াছে। বাহ্যিক আড়ম্বরই থিয়েটরের এই আকর্ষণী শক্তির কারণ।

বিশুদ্ধ আমোদ যে শরীর ও মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিয়া দেয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অশ্লীলতাবর্জ্জিত নাটক যদি সুচারুরূপে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ আমোদ প্রদান করিতে পারে। আধুনিক থিয়েটরের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে, ইহাই প্রতীতি হয় যে, ইহা হইতে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ হয় না। বেশ্যাভিনীত নাটক হইতে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের আশা কোথায়? অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত হইলে যত সুন্দর হয়, পুরুষের দ্বারা হইলে তত হয় না। অবশ্য স্বীকার্য্য যে পুরুষ স্ত্রীলোকের অংশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনয় করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলি একেবারে পারিবে না তাহাও ত নয়। যাত্রার দলে অনেক সময় দেখা গিয়াছে, চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষের বালকেরা সীতা প্রভৃতি চরিত্র এমন সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছে, যে তাহাদের অভিনয় দর্শনে এবং শ্রবণে লোকে এত অভিভূত হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা যে পুরুষ একথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই—তাহারা যে চরিত্র অভিনয় করিতেছে, তাহারা যেন সত্য সত্যই নিজে সেই চরিত্র; লোকের মনে বরং এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে। আধুনিক থিয়েটরকে বিশুদ্ধ আমোদের স্থান করিতে হইলে ইহাকে স্ত্রীলোক অভিনেত্রী বর্জ্জিত করিতে হইবে। শুধু ইহাই নহে, যে সকল বিষয় অভিনীত হইবে, তাহাও বিশুদ্ধ আমোদের উপযোগী হওয়া চাই। অভিনেয় নাটক অশ্লীলতা বা কুরুচি শূন্য হইবে। নিমাই সন্ন্যাস, হরিশ্চন্দ্র নাটক প্রভৃতি বিশুদ্ধ আমোদের উপযোগী।

নাট্যশালা যদি এইরূপভাবে পরিচালিত হয়, যদি বিশুদ্ধ আমোদ দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য হয়, যদি কতকগুলি লোকের নীচপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এবং তদ্দ্বারা পয়সা উপার্জ্জনের আশায় কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ বিষয় সকল বারবনিতাগণ দ্বারা অভিনীত না হয়, তাহা হইলে ইহা জাতীয় জীবনে একটা স্থায়ীভাব সঞ্চার করিতে পারে। সাংসারিক কার্য্য, অর্থ

চিন্তায় পীড়িত মানব যদি মধ্যে মধ্যে একটু আমোদ উপভোগ করিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া যায়। একঘেয়ে কোন জিনিষ কাহারও ভাল লাগে না। প্রতিদিন আলুভাতে ভাত খাইয়া কয়জন থাকিতে পারে? বেশী তরকারি করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, একদিন আলুভাতের পরিবর্ত্তে ডালভাতে খাইবার তাহার ইচ্ছা হয়। যাহারা চিরকাল একঘেয়ে ভাবে জীবন কাটায় তাহাদের মনে বা শরীরে স্ফূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে এবং শরীরে স্ফূর্ত্তি না থাকিলে কর্ত্তব্য কার্য্যে আলস্য আসিয়া পড়ে এবং মানুষ জড়ের মত অবস্থান করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ আমোদ মানবজীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত" নামক পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—"ইংরাজ অধিকারে আমরা প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত লুপ্তরত্ন পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতেছি, জাতীয় নাট্যশালা তাহার মধ্যে অন্যতর। যাঁহারা মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষের সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, যে তাহাতে জাতীয় গৌরবের উপযুক্ত একখানিও নাটক নাই। কিন্তু মুসলমানদিগের আগমনের বহুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাটক রচনার এবং নাটকাভিনয়ের এরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, যে বোধ হয় এক গ্রীকজাতি ভিন্ন অপর কোনও প্রাচীন জাতির মধ্যে সেরূপ হয় নাই। জাতীয় গৌরব এবং জাতীয় নাট্যশালা এক সময়েই ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজার অনুরাগ এবং উৎসাহ প্রাপ্ত না হইলে কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের মুসলমান সম্রাটগণ সুশিক্ষার অভাবে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ বশতঃ নাট্যামোদের অনুরাগী ছিলেন না। ইহার উপর দীর্ঘকালের পরাধীনতায় এবং নির্যাতনে হিন্দু সন্তানগণ ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। জাতীয় রঙ্গভূমি জাতীয় সজীবতার নিদর্শন স্বরূপ; জাতীয় জীবনে এই সজীবতার অভাব ঘটিলে যদিও অন্যান্য বিষয়ে চিন্তাশীলতার উন্মেষ হইতে পারে, কিন্তু যাহা আমোদানুসঙ্গী, সেরূপ কোন বিষয়ে স্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক, উৎকৃষ্ট দার্শনিক এবং উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা-লেখক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কোনও উৎকৃষ্ট নাটককার জন্ম গ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা

জাতীয় জীবনে আবার নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিতেছে; হয়ত আবার শকুন্তলা এবং উত্তর রামচরিত রচিত হইবার দিন আসিতে পারে।"

এই নাট্যশালাই জগতে মহাকবিগণের অক্ষয় কীর্ত্তির কারণ হইয়াছে। যদি নাট্যশালা না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, সেক্সপিয়রের ন্যায় মহাকবির কথা আমরা শুনিতে পাইতাম না, তাঁহার অমৃতময় লেখনীপ্রসূত অমূল্য নাটক রত্ন সকল জগতের সাহিত্য-ভাণ্ডার আলোকিত করিত না। যদি নাট্যশালার ন্যায় একটা কিছু না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, জর্ম্মাণ কবি গেটে ভারতের অমর কবির অক্ষয় কীর্ত্তি শকুন্তলার গুণগান করিতে অবসর পাইতেন না। যদি নাট্যশালার ন্যায় একটা কিছু না থাকিত, তাহা হইলে প্রাচীন পণ্ডিতগণ "উত্তর রামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে" এই কথা বলিয়া গভীরপাণ্ডিত্যশালী নাটককার ভবভূতিকে নাটক-লেখা বিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবেশন করাইবার সুযোগ পাইতেন না। যদি নাট্যশালা না থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গীয় অমর কবি মধুসূদন বোধ হয় আজ লোকের নিকট এত পরিচিত হইতেন না—আজ গৌড়জন তাঁহার রচিত মধুচক্রের সুধাপানে বঞ্চিত হইত। বঙ্গদেশে যখন প্রথম ইংরাজ অনুকরণে নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তখন মধুসূদন বাঙ্গালায় কোন গ্রন্থই লেখেন নাই। বঙ্গদেশে প্রথম স্থাপিত বেলগাছিয়া থিয়েটার নামক বাঙ্গালা নাট্যশালার সংস্রবে আসিয়া মধুসূদনের জীবনের লক্ষ্য ফিরিয়া গেল। স্বর্গীয় রামনারায়ণ তর্করত্ন শ্রীহর্ষ প্রণীত রত্নাবলী নাটিকা অবলম্বন করিয়া বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য একখানি নাটক রচনা করেন। সাহেবদিগের বোধার্থে মধুসূদনকে সেই নাটকখানির ইংরাজি অনুবাদ করিতে হয়—এই ঘটনাই মধুসূদনের ভাবী অমর কীর্ত্তির সূত্রপাত করিয়া দেয়। "একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বলিলেন, "দেখ কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য রাজারা (রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর) এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন।" গৌরদাস বাবু শুনিয়া বলিলেন, "নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে আমরা রত্নাবলী অভিনয় করিতাম না; কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় কোথায়?" মধুসূদন

বলিলেন, "ভাল নাটক? আচ্ছা আমি রচনা করিব।" এই কথোপকথনের পরদিন হইতেই মধুসূদন তাৎকালিক কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক এবং সংস্কৃত নাটক পাঠ করিতে লাগিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক রচনা করিয়া ফেলিলেন। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় পত্র লিখিতে হইলে যে মধুসূদনের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইত, যে মধুসূদন পৃথিবী লিখিতে "প্র—থি—বী" লিখিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় নাটক রচনা করিয়া ফেলিলেন এবং এমন নাটক রচনা করিলেন যে, তাহা তৎকালপ্রসিদ্ধ সমুদয়-নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইল। এখন হইতে মধুসূদনের পথ পরিষ্কৃত হইল—ক্রমে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিলেন, তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি "মেঘনাদ বধ" রচিত হইল। তাই বলিতেছিলাম, যদি নাট্যশালা না থাকিত তাহা হইলে শুধু মানবের মন ও শরীর কেন, কবির কল্পনাও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত না, বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারও আজ এত অমূল্য রত্নপরিপূর্ণ হইতে পারিত না। যদি নাট্যশালা না থাকিত, তাহা হইলে গিরীশচন্দ্রের নাটক রচনার অদ্ভুত ক্ষমতা অঙ্কুরেই বিলয় প্রাপ্ত হইত। তিনি ম্যাক্‌বেথের যে অতি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন, যে অনুবাদ তাঁহার বঙ্গভাষায় অদ্ভুত অধিকারের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা আজ বঙ্গ-সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিত না। আজ কাল যে সকল রাশি রাশি নাটক নাটিকা রচিত হইতেছে, নাট্যশালাই তাহার কারণ। তাহাদের মধ্যে যদিও অনেকগুলি কদর্য্য এবং কুরুচির পরিপোষক,তথাপি মোটের উপর ধরিতে গেলে বঙ্গ-সাহিত্য যে তাহাদের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎও পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

কেবল ইহাই নহে। নাট্যশালা আমাদের একপ্রকার শিক্ষক। ইহা সমাজের জ্বলন্ত ছবি, আমাদের নেত্রপথে উপস্থাপিত করে। সমাজের দোষ দেখাইয়া দেয় এবং গুণের প্রশংসা করে। তবে অনেক সময় দেখা যায়, আমাদের আধুনিক নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ, বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য এবং তাঁহাদের বিকৃত রুচির পুষ্টিসাধনার্থ সমাজের দোষ গুণকে অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলেন এবং অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর অবতারণা করেন। ইহার দৃষ্টান্ত অমৃতবাবুর "তাজ্জব ব্যাপার।" দু এক স্থল ছাড়া "বিবাহ-বিভ্রাটে" সমাজের জ্বলন্ত চিত্র স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিশেষ অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। "বিবাহ-বিভ্রাটে"র ন্যায় নাটক সমাজকে শিক্ষা দিতে পারে। এমন অনেক সুন্দর নাটক আছে,

যাহার অভিনয় দেখিয়া সাধুজনেরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা মনোমোহনবাবু প্রণীত "হরিশ্চন্দ্র" নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন আছেন, যাঁহাদিগকে অশ্রুপাত করিতে হয় নাই ?

গত ফাল্গুন মাসের "ভারতী"তে ইংরাজি ও বাঙ্গালা নাট্যশালা শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহাতে লেখক একস্থলে বলিয়াছেন,—"ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নাটক যদি দস্তুরমত ও উপাদেয়রূপে অভিনীত হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। থিয়েটরে কেহ ধর্ম্ম আলোচনা করিতে যায় না, আমোদ করিতে যায়; থিয়েটর ধর্ম্ম-মন্দির নহে, এ কথা সত্য। এবং থিয়েটরে গিয়া যে কেহ পারমার্থিক-তত্ত্ব বা মূল্যবান ধর্ম্মোপদেশ সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাও আমার বিশ্বাস নহে। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সৌন্দর্য্যগুলিতে আকৃষ্ট সকলকেই হইতে হয়; এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য, চৈতন্যের স্বার্থত্যাগ ও মধুর ধর্ম্মভাব, সাবিত্রীর অতুল পতিভক্তির বিষয় পড়িয়া যদি চিত্ত উদ্বেলিত ও মুগ্ধ হয়, তাহা সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলে, তাহা আরও প্রকৃত বোধ হয়। অতএব চিত্ত তাঁহাতে আরও উদ্বেলিত ও মুগ্ধ হইবার কথা।" থিয়েটর যে ধর্ম্ম-মন্দির নহে, তাহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া বলিতে পারি না যে, থিয়েটর-গৃহ হইতে কোন শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না। যদি আধুনিক থিয়েটর কুরুচির পোষকতা করে, তাহা হইলে তাহা থিয়েটরের দোষ নহে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষদিগের, নাটককারের এবং শ্রোতৃবর্গের দোষ, বলিতে হইবে। যখন লেখক বলিতেছেন যে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় সকল অভিনীত হইতে দেখিলে, তাহাদের সৌন্দর্য্যে সকলকেই আকৃষ্ট হইতে হয়, এবং চিত্ত উদ্বেলিত ও মুগ্ধ হয়, তখন তাঁহাকে আরও এক পদ অগ্রসর হইতে হইবে এবং বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলেই লোকের মনে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইবে। ইহা কি শিক্ষা নহে? যে ধর্ম্মানু-রাগ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল, তাহা আমাকে ধর্ম্মকার্য্যে প্রণোদিত করিতে পারে। হয় ত কোন অধার্ম্মিক ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ধার্ম্মিক হইয়া যাইতে পারে।

অনেকে থিয়েটরের নাম শুনিলে চটিয়া যান। থিয়েটরকে তাঁহারা একটা জঘন্য স্থান বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এরূপ মনে করিবার অবশ্য অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, থিয়েটরে বারবনিতাগণ অভিনেত্রীর কার্য্য করে; দ্বিতীয়তঃ, উহাতে অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ বিষয় সকল অভি-

নীচ হয়। কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে, এ সকল থিয়েটারের দোষ নহে—এ সকল, থিয়েটার যাঁহারা চালান, তাঁহাদের দোষ। অত্যন্ত অর্থলোভে তাঁহারা থিয়েটারকে সজ্জনের চক্ষে একটা জঘন্য পদার্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। এ প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা মনোযোগ করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে বস্তুতঃ থিয়েটার খুব ভাল জিনিস, তবে চালাইবার দোষে ইহা বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। এডিসন তাঁহার সময়ের ইংরাজি নাট্যশালার অধঃপতনের বিষয় লিখিতে গিয়া এক স্থলে বলিয়াছেন, "যদি ইংরাজি নাট্যশালা এথিনীয় নাট্যশালার ন্যায় পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তাহার ন্যায় উহা লোকের মনে স্বদেশীয় ধর্ম্ম, রাজা এবং সাধারণ-উপাসনার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার করিয়া দিতে পারিত। যদি আমাদের অভিনয় সকল উপযুক্ত তত্ত্বাবধান এবং নিয়মের বশীভূত হইত তাহা হইলে আমরা শুধু যে আমাদের বিশ্রামকালের কতক সময় বিশিষ্ট আমোদে অতিবাহিত করিতে পারিতাম, তাহা নহে, আমরা অভিনয় দেখিয়া উঠিবার সময় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্ এবং অধিক ভাল লোক হইতে পারিতাম।" * এডিসনের এ কথাগুলি আমাদের আধুনিক নাট্যশালা সম্বন্ধেও বেশ খাটে।

শ্রীঅমরচন্দ্র মিত্র।

নানা কথা।

(বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ—তুলার ইতিহাস—সর্ব্বোচ্চ আরোহণ—
সংক্রামক পীড়ার নিদান-স্বরূপ অণুজীবের উৎপত্তি স্থল—
বিবর্ত্তনবাদ।)

গত মাসের দাসীতে প্রকাশিত "বরফ" নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া একটা প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। বরফ খাইতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু যে আকারে সম্মুখে ধরা হইয়াছে, তাহাতে ইচ্ছা যেন ইচ্ছাতেই শেষ হইতেছে। লেখক মহাশয় ক্ষমা করিবেন। ইংরাজি বরং বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে ভলেটাইল, ভ্যাকুয়াম, ফ্রিজিং পয়েন্ট, রিফ্রিজিরেটর ইত্যাদি গলাধঃ করিতে বাষ্পোদ্গমন ঘটিতেছে।

---

* "If the *English* stage were under the same Regulations the *Athenian* was formerly, it would have the same effect that had in recommending the Religion, the Government, and public worship of its country. Were our plays subject to proper Inspections and Limitations, we might not only pass away several of our vacant Hours in the highest entertainments : but should always rise from them wiser and better than we sat down to them."—*Addison.*

বাঙ্গালা ভাষা অসম্পূর্ণ, একথা ঐ মাসের দাসীতেই তিন জন লেখক বলিতেছেন। "আমাদের উন্নতির" লেখক বলিতেছেন, "শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাব-রাজ্যের উপর এত দখল জন্মিয়াছে যে, তার সমান ভাব প্রকাশ করিতে গরিব বাঙ্গালা ভাষা অক্ষম। কাজে কাজেই তাঁহাকে ইংরাজী ভাষার আশ্রয় লইতে হয়, এবং বাঙ্গালা বলিবার সময় তাহার সঙ্গে ইংরাজী বুকনি মিশাইতে হয়।" "বরফ" লেখক বলেন যে "বরফসেবীদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী জানেন, অতএব এই প্রবন্ধে যদি ইংরাজী technical expressions ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।" "আধুনিক সূত্র-কাতন" প্রবন্ধ লেখক বলেন যে, "বঙ্গভাষার অসম্পূর্ণতা হেতু মিশ্রিত ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।"

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাটা আমাদের ; সম্পূর্ণই হউক, অসম্পূর্ণই হউক, সেই ভাষা লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সাহেবেরা আসিয়া তাহার অসম্পূর্ণতা দূর করিবেন না। সম্পূর্ণ করিতে হইলে আমাদিগকেই করিতে হইবে। অসম্পূর্ণতার জন্য দুঃখ প্রকাশ দেখিলাম, কিন্তু দুঃখ মোচনের চেষ্টা দেখিলাম না। কালে বরফ প্রবন্ধের ন্যায় মিশ্রিত ভাষা দেখিতে লেখক মহাশয় ইচ্ছা করেন কি না, বলিতে পারি না। একে, আমাদের মধ্যে বৃত্তিশাস্ত্রজ্ঞ লোকের অত্যন্ত অভাব। তার উপর যাঁহারা আছেন, তাঁহারা বৃত্তিশাস্ত্র বাঙ্গালার শিক্ষিত (বা অশিক্ষিত) দিগের জন্য না লিখিলে, আশা কোথায় ?

কোন বিদেশীয় ব্যবসায়ের পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় রচনা করা দুরূহ, সন্দেহ নাই। এবং এরূপ বাঙ্গালা শব্দ রচনা সম্ভব হইলেও, তাহা কার্য্যকালে বৃথা হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু একথা কেবল সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যতীত অপর শব্দ সম্বন্ধে বলা চলে না। "ভলেটাইল", আর "ভ্যাকুয়াম" যদি পারিভাষিক শব্দ হয়, তাহা হইলে সমুদয় ইংরাজি শব্দই পারিভাষিক।

বস্তুতঃ "আধুনিক সূত্রকাতন" লেখক ঠিক বলিয়াছেন। অনেক সময় ভাব যুটিলেও ভাষা যোটে না। এই জন্যই ত ভাষা একটা শিক্ষার বিষয় হইয়াছে। আবার একটা না একটা কথা যুটিলেও হয় না, ঠিক কথাটি বলা চাই। নতুবা আমার মনে ভাবটা যেরূপ লাগিয়াছে, অপরের মনে ঠিক সেই রকম লাগে না। এই জন্যই ত লেখক বা বক্তা বা কবি কিছুই হইতে পারা গেল না।

কিন্তু লেখক মহাশয় সোজাসুজি সূতা কাটা ছাড়িয়া কেন যে সূত্রকাতন শব্দ আনিয়াছেন, বুঝা গেল না। হিন্দিতে বা অপর ভাষায় "কাতন" শব্দ চলিত কি না, জানি না। কিন্তু চলিত ভাষায় চরকা ও টেকোর সাহায্যে সূতা কাটা, নলীতে সূতা জড়ান, তুলা পাট করা, পেঁজা, খাওয়াইতে কাপাস খাওয়ান, তুলার আঁশের টান ইত্যাদি বলিয়া থাকি।

সে যাহা হউক, লেখক মহাশয় বলেন যে, "অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তুলার আঁশ ফাঁপা বাঁশের মত দেখায়, তাহার ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে।"———কিন্তু বাস্তবিক তাই কি? তুলার আঁশ ফাঁপা বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকোষ্ঠ কই? বস্তুতঃ আঁশের সমুদয়টা একটা দীর্ঘ-কোষ মাত্র। ঐ কোষের নীচের দিক্‌টা মোটা হইয়া উপর দিক্‌টা ক্রমশঃ সরু। ভিতরে ফাঁক অল্প, এমন কি চেপটা বলিয়া ফাঁক আছে বুঝাই কঠিন। যাহা হউক, এটা অবান্তর কথা।

প্রবন্ধের শেষ ভাগে পড়িলাম, ভারতীয় তুলা, সকল তুলার অধম। হায়, ভারতীয় তুলার এ দুর্দ্দশা কেন হইল। কার্পাস বস্ত্রের সঙ্গে সভ্য জগতের ইতিহাস জড়িত। যখন কোন দেশের সভ্য লোকেরা কার্পাস গাছ দেখে নাই, তখন এদেশে ইহার চাষ, ইহার তুলা হইতে বস্ত্র বয়ন প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ঋগ্‌বেদে তন্তুবয়নের উল্লেখ আছে। যেমন মূষিক তন্তুবায়ের সূতা কাটিয়া ফেলে। কাপড় বুনিবার পূর্ব্বে সূতায় মণ্ড মাখাইতে হয়। সেই মণ্ডের লোভে মূষিকের দৌরাত্ম্য। সে আজ অন্ততঃ চারি হাজার বৎসরের পুরাতন কথা।

মনুর সময়ের ত কথাই নাই। মনু কার্পাসসূত্র অপহরণকারীর সূতার দ্বিগুণ মূল্য দণ্ড করিয়াছেন। মসৃণ শাল্মলী ফলকে রজক ধীরে ধীরে বস্ত্র ধৌত করিবে; একের বস্ত্র অন্যের বস্ত্রসঙ্গে মিশাইবে না, কিম্বা কাহাকেও পরিধান করিতে দিবে না। তন্তুবায় দশ পল সূত্র লইলে বস্ত্র বয়ন করিয়া এগার পল দিতে হইবে। অর্থাৎ যখন মনু মণ্ডের জন্য দশ পল সূত্রের এগার পল বস্ত্র দিবার বিধান করিয়াছিলেন, তখন মাঞ্চেষ্টার কোথায়? যখন গ্রীকেরা ভারতে প্রথমে আসিয়াছিল, তাহারা কার্পাস গাছ দেখিয়াই অবাক্। ভেড়ার লোমে তুলা হয়, ভারত এমন দেশ সেখানে গাছে তুলা হয়। আশ্চর্য্যের কথা, ভারতের সঙ্গে চীনের কত পূর্ব্বকালের পরিচয়। তথনি চীনেরা ৭ম। ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার জানিত না।

চীনের সম্রাট সখ করিয়া আদরের সহিত একটা কার্পাস গাছ নিজের প্রমোদ কাননে রোপণ করিয়াছিলেন।

ভারত হইতে পশ্চিম দেশে তুলার ব্যবহার যায়। ১২শ শতাব্দীতে দেখা যায়, ইটালী ও স্পেন দেশে প্রথমে সূতা কাটা ও কাপড় বোনা আরম্ভ হয়। ১৭শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড তুলার সংবাদ পায়। ঐ সময়ে এ দেশের ছিট ইংলণ্ডের চোখে ধাঁধা জন্মাইয়া দেয়। উহার এত আদর হইল যে, তথাকার লোমজ বস্ত্রের কাটতি কম পড়ে। দেশ মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিমেণ্ট একটা আইন জারী করিলেন। বলিলেন, যে ব্যক্তি ছিট বিক্রয় বা পরিধান করিবে, তাহার ২০০ পৌণ্ড দণ্ড হইবে। ইতিমধ্যে ভারতীয় ছিটে ইংলণ্ডের লোকেরা এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, স্বদেশে ছিট তৈয়ার করিবার কারখানা হইল। দেশ মধ্যে হাহাকার উপস্থিত। লোমবস্ত্র ব্যবসায়ীর অন্ন হওয়া ভার। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিমেণ্ট আবার আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হয়েন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বকালে আমেরিকার অসভ্য লোকেরা তুলার ব্যবহার জানিত।' কলম্বস্ আমেরিকায় তুলার কাপড় পরিতে দেখিয়াছিলেন।

এদেশে প্রথমে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বম্বেতে সূতার কল স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশেও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে একটা কল বসে। প্রথম সূত্রপাত হইতে এক্ষণে ৪৫ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তদবধি এ বিষয়ে কত দূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা আপনার পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। স্বায়ত্ত শাসনও চাই, আর শিক্ষিত তন্তুবায়ও চাই।

* * * * *

গত মাসের দাসীতে প্রকাশিত দুই একটা প্রসঙ্গ সম্বন্ধেও একটু প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি। "বেলুনে ছয় মাইল ঊর্দ্ধে" প্রসঙ্গ পড়িয়া দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আজ কাল, এদেশে নাই হউক, পশ্চিম দেশে বেলুন-যাত্রীর অভাব নাই। কিন্তু বেলুনে চড়িয়া উচ্চ আকাশে মেঘনাদের ন্যায় বিচরণ করিতে বড় একটা শুনা যায় না। তাই ছয় মাইল উচ্চে উঠিতে শুনিয়া প্রথমে লোকটাকে, জানিবার ইচ্ছা হয়। খ্রীঃ ১৮৬২ অব্দের ৫ সেপ্টেম্বর গ্লেশার এবং কক্সবেল (Messrs. Glaisher and coxwell) আকাশে উঠিয়া যে নাম রাখিয়াছেন, তাহা সকলেই

শুনিয়াছেন। তাঁহারা ন্যূনাধিক সাত মাইল উচ্চে উঠিয়াছিলেন। ব্যাপার বড় সহজ নহে। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গেরও প্রায় ১॥০ মাইল উপরে উঠা, যার তার কর্ম্ম নহে।

তার পর গত ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর দিবসে জর্ম্মাণ ডাক্তার বার্সন (Dr. A. Berson) উচ্চ আকাশে উঠিয়াছিলেন। তিনি যত উচ্চে উঠিয়াছিলেন,তত আর কেহ উঠিতে পারে নাই বলিয়া বার্সন সাহেব প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কি জানি কেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে গ্লেশার সাহেব ২৭, ৯০,০ ফুট উচ্চে মাত্র উঠিয়াছিলেন। বার্সন সাহেব কিন্তু ৩০,০০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৫৸০ মাইলের বেশী উপরে উঠেন নাই। ইংলণ্ডের লোক স্বদেশীয়ের পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? অবশ্য কোন কোন লোক বার্সন সাহেবের উক্তির প্রতিবাদ করিতে ছাড়ে নাই।

আপনার প্রসঙ্গ লেখকের ডাঃ পারসন এবং এই ডাঃ বার্সন এক ব্যক্তি কি না, তদ্বিষয়ে প্রথমে একটু সন্দেহ হয়। নামের প্রভেদ, তার উপর বেলুনে উঠিবার সময়ের উল্লেখ নাই। কিন্তু কয়েকটি বিবরণ মিলাইতে গিয়া সে সন্দেহ গিয়াছে। প ব এর অভেদ ঘটে কি না, বলিতে পারি না। যাহা হউক, আমি যে কাগজে উক্ত বেলুন-যাত্রার কথা পড়িয়াছিলাম, তাহাতে বেলুন-যাত্রী পারসন পরিবর্ত্তে বার্সণ দেখাইয়াছিলাম। ডাঃ বার্সণের বেলুনের নামও "ফিনিক্স'। কিন্তু তিনি চারি হাজার ঘন হাত "জলজান বাষ্পে" বেলুন পূর্ণ না করিয়া, অত খানি জলের গ্যাসে * পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, প্রসঙ্গ লেখক লিখিয়াছেন যে, সাহেব ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চে উঠিয়াছিলেন, অর্থাৎ "হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চন-জঙ্ঘারও প্রায় হাজার ফিট উর্দ্ধে।" কিন্তু হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি, কাঞ্চনজঙ্ঘা?

প্রমত্ত মুদ্রাকরের নিকট সকলই সম্ভব। যদি ১৬ হাজার ফুট উচ্চে বায়ুর উষ্ণতা—১৮°শ হয়, তাহা হইলে ২৬ হাজার ফুট উচ্চে উহা কখনও ৩৯°শ হইতে পারে না। ৩৯°শ এবং—৩৯°শ উষ্ণতার মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, তাহা না বুঝিয়া প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছে।

* Water gas এর বাঙ্গালা করা গেল। উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর দিয়া জলীয় বাষ্প চালিত করিলে এই গ্যাস জন্মে। উহা কেবল "জলজান" অর্থাৎ Hydrogen নহে। ✓

বোধ হয়, এইরূপে সমশীতোষ্ণ শব্দের সমটুকু কাটিয়া শীতোষ্ণমণ্ডল করিয়াছে। বার্স্ণ এইরূপে পারসনে পরিণত হইয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না। /

*　　　*　　　*

"সংক্রামক পীড়ার নিদান" প্রসঙ্গটি পড়িয়া মনে হইল, ডাক্তার সাহেব নিজের দিকে একটু বেশী টানিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে বলিয়া রাখি যে, যে ডাক্তারি কাগজে ডাক্তার সাহেব নিজের মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমি দেখি নাই। এ সম্বন্ধে নীচে যাহা কিছু বলা গেল, তাহা দাসীতে প্রকাশিত প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়াই বলা গেল। একে ডাক্তারের মত, তার উপর ডাক্তারি কাগজ হইতে অনুদিত হইয়াছে। এস্থলে হয়ত আমার আলোচনা ধৃষ্টতা বোধ হইবে। তথাপি সামান্য বুদ্ধিতে মত সম্বন্ধে কেমন খট্‌কা বোধ হইতেছে।

ইনি বলেন যে, সংক্রামক পীড়ার কারণ, "প্রবল কীটাণুর আধিক্য।" সেই সকল কীটাণুর "উৎপত্তি অর্থাৎ স্থান" এই পাঞ্চভৌতিক পৃথিবীতে নহে, সুদূর "নক্ষত্রলোকে।" কিন্তু সেখান হইতে মর্ত্তধামে আসে কিরূপে? "হাজার হাজার টন উল্কাপিণ্ড এবং ধূলি বৎসর বৎসর পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে পৃথিবীর উপর আসিয়া সঞ্চিত হয়। * * কেহ কেহ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল পদার্থ বহুল পরিমাণে জীবাণুর (life germ) সহিত সংহত হয়।"

অনুবাদক কীটাণু ও জীবাণু শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন কিনা, জানি না। পরে দেখিলাম, কীটাণু বলিতে বাক্‌টিরিয়া বা উদ্ভিজ্জাণুর উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজি animalcule বাঙ্গালায় কীটাণু হইয়াছে। জীবাণু দ্বারা ইংরাজি Protista বুঝা যায়। বাক্‌টিরিয়া নামক উদ্ভিদবর্গকে আজ কাল microbes বা অনুজীব বলা যায়। ডাক্তার সাহেব ঐ তিন প্রকার ইংরাজী নাম ব্যবহার করিয়াছেন কিনা, বলিতে পারি না।

যে নামই হউক, প্রবল এবং অপ্রবল কীটাণুর অর্থ বুঝিলাম না। অধিকাংশ ডাক্তারের মতে কয়েকটি সংক্রামক পীড়ার কারণ, বিভিন্ন জাতীয় অনুজীব বটে। কিন্তু ঐ সকল অণুজীব যে নক্ষত্র লোক হইতে আমদানি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কই? কোন নক্ষত্রে এরূপ অণুজীবের অবশ্য সম্ভাবনা নাই। কেন না, জ্যোতির্বিদেরা নক্ষত্র গুলাকে এক একটা

জ্বলন্ত সূর্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। "নক্ষত্র লোক" অর্থে নক্ষত্র সমূহের অন্তর্গত দেশ বুঝিলেও গোলযোগ মিটে না। কেন না, সে দেশে জীবাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ কই ?

যদি বলেন, উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে জীবাণু আসিয়া থাকে। কিন্তু যে কারণে সূর্য্যে বা নক্ষত্রে আমাদের জ্ঞাত কোন জীব বা জীবাণু থাকিতে পারে না, সেই কারণে ভূপতিত উল্কাপিণ্ডেও আসিতে পারে না। শতাংশিক উষ্ণতামানের ১০০ অংশের অধিক উষ্ণতায় কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে, একথা জীব বিজ্ঞানবিদগণ স্বীকার করেন না *। না করিবার কারণ এই যে, যাবতীয় জীব-দেহের প্রধান উপকরণ protoplasm বা জীবনাধার। ঐ পদার্থটা ঐ উষ্ণতার পূর্ব্বেই ডিম্ব-শ্বেতাংশের ন্যায় জমিয়া কঠিন হয়। উল্কাপিণ্ড সমূহ পৃথিবীর দিকে আসিবার সময় ভূবায়ুর ঘর্ষণে এত উত্তপ্ত হইয়া পড়ে যে, তৎসমুদয় হইতে আলোক নির্গত হইতে থাকে। বস্তুতঃ উল্কাপিণ্ডের উষ্ণতায় আমাদের জ্ঞাত জীবাণুসমূহ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

ধূলির আকারে পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে জীবাণু আসিতে পারে বটে। কিন্তু একটা পদার্থ শূন্য হইতে পড়িলেই যে, তাহা পৃথিবীর বাহিরের নক্ষত্র লোক হইতে আসিয়াছে, এমন বলিতে পারা যায় না। ভূ-বায়ুর ঊর্দ্ধ সীমা কোথায়, তাহা জানা নাই কিম্বা জানিবার উপায়ও নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় বলবান্ বোধ হইল না। দারবিন সাহেবের প্রমাণ বড় একটা কাজে আসিল না। কেন না, তিনি "এক আশ্চর্য্য ভৌতিক পদার্থের বর্ষণ" বর্ণন করিয়াছেন। ভৌতিক পদার্থের সঙ্গে ভৌমিক জীব থাকিবে না কেন ?

সেইরূপ, আকাশ হইতে পতিত পীতবর্ণ তুষারে কিম্বা রঙ্গীন বরফে জীবাণু থাকা বিচিত্র নহে। ভূ-বায়ুতে জীবাণু প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কে বলিল যে, তুষারে বা বরফে পরিদৃষ্ট জীবাণু এই পৃথিবীর নহে।

ভূ-বায়ুর উর্দ্ধেস্থিত আকাশে কিম্বা সেই আকাশস্থিত কোন জড় পদার্থে অনুজীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা অভিনব মত বলা হইয়াছে। "যাহাদের সহিত অগ্নির কোন সম্বন্ধ আছে, সেই সকল ভিন্ন অন্য সমস্ত পার্থিব পদার্থই জীবাণুতে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই জড় পদার্থের স্বরূপ অভিন্ন,

---

* দুই একটা ১৫০শ উষ্ণতাতেও বাচিয়া থাকিতে শুনা গিয়াছে। কিন্তু সে গুলা সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র।

অতএব বাক্টেরিয়া বা উদ্ভিজ্জাণু যে অন্যান্য গ্রহ এবং গগন বিলম্বী মেঘসমূহ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, এ কথা অতি সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে।”

দুঃখের বিষয়, প্রত্যেক কথাই বিশ্বাস করা সহজ হইল না। জীব সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জ্ঞান, তাহা এই পৃথিবীরূপ গ্রহস্থিত জীব লইয়াই। এই সকল জীবের জীবন ক্রিয়ার বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীব সকল কতকগুলি নিয়মের অধীনে থাকিয়া জীবিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাদ্য, বায়ু উষ্ণতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। জীব বিশেষের নিমিত্ত খাদ্য বায়ু উষ্ণতার তারতম্য লক্ষিত হইলেও জীবন ক্রিয়ার নিমিত্ত কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। সেই নিয়ম বা অবস্থার বাহিরে পড়িলেই জীবন বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই জড় পদার্থের স্বরূপ অভিন্ন, একথা স্বীকার করিলেই সর্ব্বত্রই উদ্ভিজ্জাণুর অস্তিত্ব মানিতে হইবে কেন? এই পৃথিবীতেই উহার কত দৃষ্টান্ত আছে। কোন দুই দূরবর্ত্তী দেশের জল বায়ুর অবস্থা এক হইলেই উভয় দেশে এক প্রকার জীব দেখা যায় না। যাটি সত্তরটা মূল পদার্থ লইয়া এই পৃথিবীতে অসঙ্খ্য পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবী ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র যে সেই প্রকার অসংখ্য বিভিন্ন পদার্থ নাই, এ কথা বলিবার ক্ষমতা মানুষের হয় নাই।

* * * * *

আপনার কোন কোন পাঠক হয়ত আপত্তিটার গুরুত্ব সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। পৃথিবীর বহির্দ্দেশ হইতে কোন জীবাণু আসিয়াছে বা আসিতে পারে, স্বীকার করিলে পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি বুঝিবার কতকটা সাহায্য পাওয়া যায়। পৃথিবীটা নিত্য অনাদি নহে; অসঙ্খ্য সৃষ্ট জীব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা হইতে বাস করিয়া আসিতেছে না। অতি পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে কোন জীব ছিল না। উহা তখন প্রচণ্ড উত্তাপের আধার ছিল। ক্রমে শীতল হইয়া জীবের বাসোপযোগী হইলে ইহাতে বহুবিধ জীবের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে। এক সময়ে না এক সময়ে, পৃথিবীতে কোন জীব ছিল না, ইহা সকলকেই মানিতে হইবে। যদি ছিল না, আসে কোথা হইতে! শূন্য আকাশ হইতে আসিয়াছে, না, এই খানেই সৃষ্ট হইয়াছে? যদি সৌরজগতের বা কোন নক্ষত্র জগতের গ্রহ হইতে প্রথমে আসিয়া থাকে, সেখানেই বা আসিল কি প্রকারে? প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লর্ড

কেলবিন মনে করিয়াছিলেন যে, অন্য জগৎ হইতে প্রথম জীব আনিতে পারিলেই কথাগুলা সহজ হইয়া পড়িবে*। কিন্তু যদি অপর জগতে জীব সৃষ্টি হইতে পারে, তবে এ জগতে, এ পৃথিবীতে না পারিবে কেন? পৃথিবী যে কারণে জীবশূন্য ছিল, অন্য জগৎও ত সেই কারণে প্রথমে জীবশূন্য ছিল।

এ প্রশ্নের উত্তর কেহ জানে না। তবে অনুমানের ত্রুটি নাই। কিন্তু অনুমান করিতে পারিলেই সত্যের আবিষ্কার হয় না। পরে ইহার দুই একটা অনুমানের কথা বলা যাইবে। এখন এ প্রশ্ন ছাড়িয়া অপর প্রশ্ন করা যাক। এখন যে সমুদয় জীব পৃথিবীতে দেখা যাইতেছে কিম্বা পূর্ব্বে ছিল বলিয়া তাহাদের নষ্টাবশেষ স্বরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে? ইহার উত্তর সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। (১) যত প্রকার জীব দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটির পুং স্ত্রী, কিরূপে জানি না, সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার জীব পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইয়াছে। (২) যত প্রকার জীব দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয় কয়েকটি অপরিস্ফুট জীব-দেহের বিবর্ত্তনে জাত হইয়াছে। অর্থাৎ অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্ট না হইয়া দুই একটি মাত্র ক্ষুদ্র জীব হইতে এক্ষণে দৃশ্য বহুবিধ জীবের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

প্রথম মতকে পৃথক্ সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় মতকে বিবর্ত্তন সৃষ্টি বলা যাইবে। প্রথম মতাবলম্বীকে জীবস্রষ্টা স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ এক মনে জীব আসে। দ্বিতীয় মতাবলম্বী জীবস্রষ্টা প্রত্যক্ষতঃ স্বীকার না করিলেও পারেন। স্রষ্টার অপ্রয়োজন, একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। কিন্তু স্পষ্টতঃ না বলিলেও এবং বিশ্বস্রষ্টার প্রয়োজন থাকিলেও, ইহাঁদের মতে পৃথিবীর জীবস্রষ্টা কেহ না থাকিলেও চলে। কোন কোন মনুষ্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থের ইহা বিরোধী মত। সুতরাং ধর্ম্মগ্রন্থের কথা বড় না বিবর্ত্তবাদীর অনুমান বড়, এই তর্কে পড়িয়া অনেকে শেষোক্ত মতকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

তাঁহারা নাই পারুন, বিবর্ত্তনবাদ না মানিলে জীবসৃষ্টির কিছুই বুঝা যায় না। মানিলেই যে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া যায়, এমন নহে। তবে, পৃথক্ সৃষ্টি কল্পনা করিতে যতটা গোলযোগ ঠেকে, ইহাতে ততটা ঠেকে না।

* বোধ হয়, প্রসঙ্গ লেখক ডাক্তার কেলবিনের প্রাচীন মতের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াছেন।

অনেক লোকে, বানর হইতে মানুষ হইয়াছে, এই কথাটাকে বিবর্ত্তনবাদের সার মনে করেন। তাঁহারা অন্ততঃ এরূপে মানুষ হন নাই, এই ভাবিয়া সহজে আত্মপ্রসাদ ভোগ করেন। কিন্তু এক কথায় বলিতে গেলে, ইঁহারা বিবর্ত্তনবাদের কিছুই জানেন না। আধুনিক বিবর্ত্তনবাদ একথা বলে না যে, বানর হইতেই মানুষের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকে জীবের আবির্ভাবের প্রকার বিষয়ে তোমার আমার মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে এবং এই প্রকার মতভেদ বিবর্ত্তনবাদিগণের মধ্যে আছে। কিন্তু সে মতভেদ এক কথা, আর বিবর্ত্তনের মূল উপহাস দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া আর এক কথা।

পৃথক্ সৃষ্টি যতটা কল্পনা করা, যাঁহারা সহজ মনে করেন, তাঁহারা ব্যাপারটা ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহাদের নিমিত্ত একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। ইহা আমার নিজের কথা নহে। "ফ্রি রিভিউ" নামক কাগজে "নোয়ার জাহাজের" একটা বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেই বিবরণের কিয়দংশ পাঠকগণকে শুনাইতেছি। ইহা হইতে পৃথক্‌সৃষ্টির অযোগ্যতা কতকটা বুঝা যাইবে।

"পুরা কালের মেষপালক নোয়া কি প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। সহস্র সহস্র প্রকার জীব সংগ্রহ করিয়া কি অসামান্য অধ্যবসার প্রদর্শন করিয়াছেন। সুমেরু পরিদর্শন করিতে লোক কেন এত গণ্ডগোল করে? চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মেরু প্রদেশে গিয়া নিশ্চিত নোয়া তথাকার ভল্লুক এবং বলরস্ (walrus) আনিয়া তাঁহার জাহাজে পূরিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত প্রাচীন প্রাণিবিদ্ উত্তর আমেরিকার অরণ্য হইতে মহিষ, কালিফর্ণিয়ার উত্তরাংশ হইতে ঈষৎ ধূষর ভল্লুক, মাটাবিলি প্রদেশ হইতে আফ্রিকার হস্তী সংগ্রহ করিয়া এবং মরুভূমি ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া একমাত্র নিরাপদ স্থান আরারাট পর্ব্বতে নির্ব্বিঘ্নে আনিয়াছিলেন। * * * সর্ব্বসমেত জাহাজে নিম্নলিখিত সংখ্যক প্রাণী ছিল। কীটাদি ৭৫৫০০০, পক্ষী ৮৭৭২৪, শম্বুকাদি ৯২০০, পশু ৬১২৮, সরীসৃপ ৯১৪। সমুদায় ৮৫৩৯৬৬ প্রাণী। এতদ্ভিন্ন, অবশ্য নোয়া এবং তাহার পুত্রাদি পরিবার ছিলেন। এই সকল প্রাণীর জন্য উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জাহাজে সঞ্চয় করিতে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল।" ইত্যাদি

এই বিবরণ হইতে পৃথিবীর প্রাণিসংখ্যা সম্বন্ধে ক-

করিতে পারা যাইবে! নোয়া জোড়া জোড়া প্রাণী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব প্রায় কুড়ি লক্ষ প্রকার প্রাণী আছে বলা যাইতে পারে। ইহাদের সঙ্গে উদ্ভিদবর্গ ধরিলে তাহাতে অন্ততঃ তিন লক্ষ হইবে *। অতএব ২৩। ২৪ লক্ষ প্রকার জীবের পৃথক্ সৃষ্টি মানিতে হইবে। বিবর্ত্তনবাদ লক্ষের কয়টা শূন্য কমাইয়া দিতে চায়।

বিবর্ত্তন ক্রমে যেন অসংখ্য জীবের উদ্ভব ঘটিয়াছে। কিন্তু আদি জীব কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তর কেহ দিতে পারেন না। লর্ড কেলবিনের অনুমান পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। টিণ্ডাল প্রমুখ কয়েকজন বলেন যে, অত গণ্ডগোলে কাজ কি? যদি কেলবিনের অনুমান অনুসারে অপর গ্রহ বা নক্ষত্রে জীব সঞ্চার সম্ভবিতে পারে, তবে এই পৃথিবীতেই না পারিবে কেন? বস্তুতঃ অজৈব পদার্থের রূপান্তরে জৈব পদার্থের উদ্ভব, স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই। এক সময়ে না এক সময়ে, কোথাও না কোথাও, অজীব জড় হইতে জীব জাত হইয়াছে। তাহা না হইলে জীব আসিল কোথা হইতে?

তবে, অজৈব পদার্থ হইতে জীব হইতে পারিলে, আমরা এখন হইতে দেখি না কেন? পরীক্ষা দ্বারা কেবল এই প্রমাণ হইতেছে যে, জীব হইতেই জীবের জন্ম, অজীব হইতে নহে। ইহার উত্তর এই যে, যে প্রাকৃতিক অবস্থায় অজীব পদার্থের রূপান্তরে জীব জন্মিয়াছিল, সে অবস্থা এখন বর্ত্তমান নাই। কেবল বর্ত্তমান নাই নহে, সে অবস্থা আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে বিজ্ঞানমন্দিরে কৃত্রিম উপায়ে জীবনাধার পদার্থটা প্রস্তুত করিতে পারা যাইত এবং একবার জীবনাধার করিতে পারিলেই তাহা হইতে প্রাকৃতিক নিয়ম ক্রমে ক্রমশঃ উন্নততর জীব সৃষ্টির সম্ভাবনা হইত।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এই আকার দেখিয়া অনেকে ম্রিয়মাণ হন। তাঁহারা ভাবেন, তবেই ত ঈশ্বরের স্রষ্টা নাম থাকে কই? স্রষ্টাই বা থাকেন কোথায়? প্রত্যেক কাজে ঈশ্বরের হাত দেখিয়া মনে যে শান্তি ও আশার সঞ্চার হয়, তাহার বিলোপ করিতে চাও? যখন বিলোপ সহ্য করিতে পারি না, তখন নিশ্চিত তিনি জীবন্তরূপে বিদ্যমান। তোমার বিবর্ত্তনবাদ কখন সত্য নহে, কেননা তাহাতে জীব স্রষ্টা ও পাতা থাকেন না। বানর

* প্রাণী বা উদ্ভিদ্ কত প্রকার আছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। উপরে যে সংখ্যা দেওয়া গেল তাহা নিতান্ত স্থূল অনুমান বুঝিতে হইবে।

হইতে মানুষ হয় নাই, কেন না তাহা হইলে মানুষের মানুষত্ব বিশেষত্ব থাকে কই। ইত্যাদি।

আশা করি আপনার পাঠকগণের মধ্যে এমন অপরিণামদর্শী কেহ নাই। বিবর্ত্তনবাদ বিশ্ব-স্রষ্টার মহিমা কতগুণে বাড়াইয়াছে, তাঁহারা যেন চিন্তা করেন। বরং আমার মনে হয় যে, যাঁহারা পৃথক্ সৃষ্টিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে যান, তাঁহারা ভগবানের অসীম ক্ষমতা, অসীম জ্ঞান, অসীম মহিমার লাঘব করেন। বিবর্ত্তনবাদে প্রত্যেক জড়কণার, প্রত্যেক জীবাণুতে প্রত্যেক জীবদেহে ও জীবনে ভগবানের হস্ত প্রত্যক্ষ করায়। প্রত্যক্ষ করায় বলিয়াই বিবর্ত্তনবাদ সত্য, একথা বলিলে বেশী দোষ হইবে কি ?

শ্রীসত্যকাম।

কামনা।

সারাদিন শুধু তাহারে ভাবিয়া
কাটিয়া যায়।
রাত্রি আসিয়া সে সুখ আমার
রাখে না হায়।
চেতনা, নিদ্রা ; আলোক, আঁধার ;
দিবস, যামিনী ;—সম অধিকার ;
তবে কি আমার অর্দ্ধ জীবন
যাবে বৃথায় ?
তারে না ভাবিয়া নিশ্বাস লওয়া
—সে ত মিছায়।
চেতনা আমার আছেই তাহার
অনুক্ষণ
সুপ্তিও চাহি করিতে মাত্র
তার স্বপন।
কোন্ দেবতার কোন্ প্রকরণে
কতকাল ধরি নিরত-পূজনে

আমার আকুল মনের বাসনা
হবে পূরণ ?
—জীবন হবে কিছু—না—কেবল—
তার—স্মরণ !

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত ভগবানকে বার বার নমস্কার করিয়া, সাধারণের জ্ঞাতার্থ সেপ্টেম্বর মাসের কার্য্যবিবরণ প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী ও আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেবিয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নব-দুর্গা. ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণী, ১০। সরস্বতী, ১১। নিস্তারিণী, ১২। সখী, ১৩। ব্রহ্মময়ী, ১৪। ঈশ্বরী, ১৫। রামদাস, ১৬। শরৎ, ১৭। জুলী, ১৮। হরি-চরণ, ১৯। আনন্দ, ২০। দয়া, ২১। মাণিক, ২২। নিফিকির, ২৩। বৈরাগী।

সরস্বতী—এই পক্ষাঘাতাক্রান্তা হতভাগিনী পক্ষাঘাত রোগে ভুগিয়া অবশেষে আস্তে আস্তে শান্তিধামে গমন করিয়াছে। ভগবান তাহাকে তাঁহার অনন্ত শান্তি ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

ব্রহ্মময়ী—তাহার হাতের ঘা পচিতে আরম্ভ হওয়ায় ও এখানে উহার নিয়ম মত চিকিৎসার সুবিধা না হওয়ায় তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। আমাদের লোক দুই তিন বার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। অবস্থা শোচনীয়, এ যাত্রা রক্ষা নাই।

ঈশ্বরী—আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

রামদাস—"ভিক্সা কর্‌কে কাশিজি চলা যায়ে গা, আর হঁয়া বহৎ ভিক্সা মিলে গা" এই কথা বলিয়া রামদাস মহানন্দে হাবড়ার দিকে চলিয়া গিয়াছে।

শরৎ—আরোগ্যলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।

হরিচরণ—হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে, কারণ তাহার রোগ দুরারোগ্য।

দয়া—বয়স ৬০ বৎসর, হিন্দু কন্যা। ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করিত। বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ইহার দুর্দ্দশা দেখিয়া ইহাকে দাসাশ্রমে দিয়া যান। গলায় গলগণ্ড, দুই চক্ষু অন্ধ, এবং কর্ণেও ভাল শুনিতে পায় না; তবে সে যে কর্ণে শুনিতে পায় না এ কথা সে বিশ্বাস করে না, এবং বলিলে রাগ করে। স্থায়ী ভাবেই থাকিবে।

মানিক—বয়স প্রায় ৫০ বৎসর, অন্ধ ও অনাথ। ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিত। বারসাই গ্রামের বাবু তারানাথ রায় প্রভৃতি ইহাকে প্রায় দুই বৎসর কাল প্রতিপালন করেন; অবশেষে তাঁহাদেরই যত্নে এখানে প্রেরিত হইয়াছে। তাহার এখনও বিশ্বাস তাহার বাবু শীঘ্র আসিয়া তাহাকে দেশে লইয়া যাইবে।

নিকিকির—জরাক্রান্তা হইয়া বিশেষ অসহায়ভাবে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় পড়িয়াছিল। আমাদের মাসিক চাঁদা দাতা বাবু ক্ষুদিরাম বসু ও বাবু গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন সহকারে লোক দিয়া গাড়ী করিয়া এখানে প্রেরণ করেন।

বৈরাগী—বয়স ৩৫ বৎসর, রোগী পক্ষাঘাতে পঙ্গু। অতি অসহায় অবস্থায় বগুড়াতে এক স্থানে পড়িয়াছিল। সেখানকার কতিপয় স্কুলের ছাত্র বিশেষ যত্ন সহকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইহাকে আমাদের কার্য্যকারক বাবু বনমালী বসুর সহিত এখানে প্রেরণ করেন।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ভগবান দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাসিক চাঁদা।

শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, আষাঢ়,শ্রাবণ ২৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, আগষ্ট ১৲, A lady C/o Babu Sreenath Das, আগষ্ট ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আগষ্ট ১৲ বাবু তেজচন্দ্র বসু আগষ্ট ॥০. ডাঃ চুনিলাল বসু, সেপ্টেম্বর ১৲, N. K. Basu Esqr আগষ্ট ১৲, বাবু গৌরীশঙ্কর দে, আগষ্ট ॥০, বাবু নন্দকুমার দত্ত, আগষ্ট ১৲, বাবু যদুনাথ বরাট, সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার, আগষ্ট ২৲, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত, আগষ্ট ১॥০, বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেট, আগষ্ট ১৲, R. N. Mukerjee Esqr, সেপ্টেম্বর ১৲, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, আগষ্ট ॥০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু, সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র, আগষ্ট।০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু, জুন ও জুলাই ॥০, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সেপ্টেম্বর ৵০, বাবু বনবিহারী বসু, জুলাই, আগষ্ট ॥০, ৬৮।১ নং বেচুচাটুর্জ্জির ষ্ট্রীট মেস, আগষ্ট।০, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায, জৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ ৩৲, District Charitable Society ৬ জন আতুরের মাসিক সাহায্য, সেপ্টেম্বর, ১৮৲, বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আগষ্ট ।০, বাবু কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ভাদ্র ।৵০, ৩৮।৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট মেস, আগষ্ট ॥০, বাবু করুণাদাস বসু, সেপ্টেম্বর ।০, বাবু বিপিনবিহারী রায়-চৌধুরী, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ২৲, নবাব সৈয়দ আবদুল্ শোভান চৌধুরী, আগষ্ট ১৲, বাবু হরিপদ ঘোষাল, আগষ্ট ।০, বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, সেপ্টেম্বর ১৲, ৪২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট মেস, সেপ্টেম্বর ।০, বাবু প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, সেপ্টেম্বর ৵০, বাবু বিহারী লাল ঘোষ, ভাদ্র, আশ্বিন ১৲, বাবু মনমোহন বসু চৌধুরী, ভাদ্র, আশ্বিন ২৲, বাগডোঙ্গা ষ্ট্রেট, ৩ তরফের দঃ, ভাদ্র ও আশ্বিন ৬৲, বাবু যুগলকিশোর ত্রিপাটি, সেপ্টেম্বর ৵০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, আগষ্ট সেপ্টেম্বর।০, বাবু শরৎকুমার বসু, সেপ্টেম্বর ৵০ বাবু হেমন্তকুমার পাল, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ॥০, ১২৬নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস, সেপ্টেম্বর ॥০, বাবু জ্ঞানদা প্রসাদ দত্ত, জুলাই ৵০, বাবু পিয়ারীমোহন ভড়, আগষ্ট ।০, বাবু অভয়চরণ মল্লিক, সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু কীরণচন্দ্র বসু, সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৲, রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী চৌধুরাণী সেপ্টেম্বর ২৲, রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুর, আগষ্ট ১৲, শ্রীমতী

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়, ভাদ্র ১৲, N. C. Baral E-qr জুলাই, আগষ্ট ২৲, ২নং সরকার্স লেন মেস্ সেপ্টেম্বর।০, বাবু কামিনীকুমার গুহ, জুলাই, আগষ্ট ২৲, অনারেবল্ মোহিনীমোহন রায়, শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন ৩৲, বাবু কেদারনাথ ঘোষ, আগষ্ট।০, P. D. Basu E-qr সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু ক্ষুদিরাম বসু, আগষ্ট ॥০, বাবু মহেন্দ্রলাল দাস, আগষ্ট ১৲ কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ, সেপ্টেম্বর ॥০।

এককালীন দান।

বাবু সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিতৃশ্রাদ্ধে ১৲, ৬৭ নং ওলড বৈঠকখানা মুসলমান মেস।৫, বাবু সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৲, ময়মানসিংহ সিটি ইস্কুলের ছাত্রগণ, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদিন উপলক্ষে ১॥৵০, A Hindu Lady, কন্যার বিবাহে ৪৲, বাবু জগৎচন্দ্র দাস ৬৲, ২১।১ পটুয়াটোলা মেস্ ৵০, বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু ।৵০, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, হুগলী ৫৲, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট মেস্ ।০, A friend ১৲, ৪৯ বেচুচাটুর্য্যির ষ্ট্রীট মেস।০, R ।০, বাবু শশিভূষণ সেন ১৲, বাবু গৌরলাল রায়, কাকিনিয়া ৩৲, বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ১৲, বাবু বিনোদবিহারী ঘোষ ৴০, বাবু মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মাঃ বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ১।০, বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী, সিলং কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ১৲, বাবু কালিপ্রসন্ন দাস ৵০, বাবু যোগজীবন গোস্বামী ৫৲, শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবী ২৲, অজ্ঞাতদাতা ৷১০, বাবু কীশোরী মোহন বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১॥০, ভবানীপুরের জনৈক বন্ধু, থালার জন্য ৫৲, রায় রাধা-গোবিন্দ রায় সাহেব, দিনাজপুর ৫৲, বাবু মানিকচন্দ্র কবিরাজ ॥০, বাবু লক্ষণচন্দ্র নিয়োগী।০, বাবু গিরিজাকান্ত বাগ্‌চী।০, বাবু যোগেশচন্দ্র কবিরাজ ॥০, বাবু কেশবচন্দ্র ঘটক ১৲, বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায় ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র রায় ॥০, বাবু পুলিনচন্দ্র সাহা ॥০, বাবু গোপীনাথ সাহা ॥০, বাবু অঘোরনাথ ঘোষ ১৲, শ্রীমতী রোহিনীমণি দাসী ১॥০, শ্রীমতী আতরমণি দাসী ১॥০, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ৵০, বাবু হেমচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত।০, ২১ নং রাধানাথ মল্লিক্ লেন মেস ॥০, ৮৯নং হ্যারিসন রোড মেস ১৲, ৫০নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস ৵১০, বাবু নীলকণ্ঠ দে।০, বাবু নিমাই চরণ ঘোষ ১৲, Well wishr ১৲, বাবু কালিচরণ দাস, মুর্শিদাবাদ ১৲, ময়ুরভঞ্জের সার্ভে আফিসের আমলাগণ, মাঃ বাবু কৈলাশচন্দ্র প্রধান ৬।০, A friend।০, বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।০, দার্নিয়া অনামিক ১৲, বাবু দুর্গানাথ মজুমদার।০, বাবু বেনীমাধব ঘোষ ॥০, বাবু গিরিশচন্দ্র সরকার ৵০, বাবু গোপালচন্দ্র সিংহ।০, বাবু রজনীকান্ত দাস ১৲, বাবু টঙ্কনাথ চৌধুরী ॥০, বাবু জানকী নাথ মজুমদার ১৲, বাবু গৌরাঙ্গসুন্দর মজুমদার ১৲, বাবু বলরাম দাস ১৲, জনৈক হিতৈষী ১৲, বাবু কার্ত্তিক প্রসাদ কর ॥০, বাবু সারদাচরণ সেন ১৲, বাবু যাদবচন্দ্র মিত্র।০, জনৈক হিতৈষী ৵০, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুই ১৲, বাবু শশিভূষণ স্থানপতি ॥০, বাবু হরি-মোহন চক্রবর্ত্তী।০, বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ ॥০, বাবু বামনচন্দ্র সেন ১৲, বাবু বেণীমাধব চাকী ॥০, বাবু বরদাকান্ত তালুকদার ॥০, বাবু যোগেশচন্দ্র মজুমদার ১৲, বগুড়া জেলা ইস্কুলের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক আতুর আনার জন্য সংগৃহীত ৯৵১০, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।০, ৪৭।২ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট মেস ।৵০, ৩৭নং শিবনারায়ণ দাস মেস ১৲, সেবালয় দর্শক, ২রা সেপ্টেম্বর ৫৲।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

দাসীর সাহায্য ৩৮৲, সম্পাদকের নিকট হইতে গচ্ছিত ফেরত গ্রহণ ফেব্রুয়ারী ৭০৲, এপ্রেল ২০৲ ও কর্জ্জবাবৎ আদায় ফেব্রুয়ারী ১০৲ মোট আদায় ১০০৲, পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ১৲। মোট ১৩৯৲।

বস্ত্রাদি দান।

বাবু নীরোদ নাথ মুখোপাধ্যায়, গরমকোট ১, গরম প্যাণ্ট ১, গরম চাপকান ২। বাবু পার্ব্বতীচরণ দত্ত, তোয়ালে ১, কোট ২, বালিসের ওয়াড় ১, ছেঁড়া সার্ট ১, প্যাণ্ট ১, ওয়েষ্টকোট ১, ছেঁড়া মোজা ৬॥০ জোড়া।

জমা।

মাসিকচাঁদা ৭২৸৵০, এক কালীন দান ৯৯৷৵১৫ অন্যান্য প্রকারে আয় ১৩৯৲, পূর্ব্ব মাসের অন্তে হস্তেস্থিত ১৯৷/০, মোট জমা ৩৩০৸৶১৫।

খরচ।

ডাক্তারের গাড়ী ৫৲, মেহতর ১২॥৵১০, বাঁধুনী ৩৷৴১৫, ঔষধ ১৸৴০, দুগ্ধ ১০৲, রোগী আনার খরচ ১১৷৵১০, দাহ খরচ ৫।৵০, আদীয় খরচ ৩৬॥১৫, সংসার খরচ ৮১৷/১০, ধোপা ৩॥১০, ডাকখরচ ১৸০, কর্ম্মচারীর বেতন ১০৲, পূর্ব্ব বৎসরের হ্যাণ্ডনোর্টের বাবৎ দেনা শোধ ১০০৲ ঐ দেনার সুদ শোধ ১০৲, বাটিভাড়া ২০৲ জিনিস খরিদ ।৴১৫, অন্যান্য ৩৲ ছাপা খরচ ১৲, ট্রাম ৵১০। মোট খরচ ৩১৮৶১৫।

আয় ব্যয়।

মোট জমা ৩৩০৸৶১৫, মোট খরচ ৩১৮৶১৫, মোট হস্তেস্থিত ১২৸০।

দাসী

আমাদের দরিদ্রতা।

বিষয়টা নূতন না হইলেও বার বার আলোচনার উপযুক্ত বটে। কারণ, ইহার সহিত আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ। জাতীয় অর্থই জাতীয় উন্নতির বিশেষ উপাদান। যে জাতি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সভ্যসমাজে পরিচিত হইবার নিতান্তই অনুপযুক্ত ছিল, সেই জাতি যে আজ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে, বিশেষ চিন্তা করিলে, দেখা যায়, অর্থই তাহার মূলীভূত কারণ। একবার কাণপুরে আমার সহিত একজন আয়র্লণ্ডবাসীর পরিচয় হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "যে জাতি অর্থে পৃথিবীর অর্দ্ধেক ক্রয় করিতে পারে, সে জাতির সহিত আমরা বিবাদ করিয়া কি করিব।" কথাটা শুনিবামাত্র আমারও মনে হইল, টাকা না হইলে কোনও জাতি দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের উন্নতির আশা কোথায়? দরিদ্রতায় আমাদের দেশ জর্জ্জরিত। সুতরাং কোনও কথা লিখিতে কি বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই আমার দরিদ্রতার কথা মনে পড়ে। দরিদ্রতায় মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, দারিদ্র্য মানুষের মধ্যে সহস্র প্রকার নীচতা আনয়ন করে। সুতরাং দরিদ্রতা আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় হওয়া আবশ্যক বোধে, এই প্রস্তাবের অবতারণা করা গেল। একটী প্রচলিত উদ্‌ভট শ্লোকে আছে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

কথাটা বড় খাঁটি। বাণিজ্য ভিন্ন কখনও কোনও জাতি ধনলাভে সমর্থ হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে যে জাতির উন্নতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, দেখা যায়, ঐ জাতি বাণিজ্য-পথে বিচরণ করিয়াই তাহা লাভ করিতে

সমর্থ হইয়াছে। বাণিজ্যের উপাদান মূলধন ও পরিশ্রম। এই দুই উপাদানের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যাউক। মূলধন দ্বিবিধ, যথা—ব্যক্তিগত এবং একত্রিত। কোনও এক ধনবান লোক সমস্ত মূলধন নিজে দিয়া কোনও কারবার চালাইতে পারেন, অথবা দশ জনের অর্থ বলেও এক বা একাধিক লোকের কার্য্য সম্পাদনে কোনও কারবার চলিতে পারে। এই উভয়বিধ মূলধনের মধ্যে শেষোক্ত প্রকারের মূলধনই জাতির পক্ষে সহজ-প্রাপ্য এবং জাতির অন্তর্গত অনেক ব্যক্তির পক্ষে লাভজনক। লক্ষ লক্ষ টাকা একজন কারবারে দিতে পারেন, এমন লোক এক জাতির মধ্যে কয়জন থাকা সম্ভব? আর এক জনের কারবারে এক জনই লাভবান হইতে পারেন, তাহাতে জন সাধারণের লাভবান হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং উহাতে জাতীয় ধন বৃদ্ধি পায় না। অপর পক্ষে একজনের কারবারে লোকসান হইলে সে একবারে অধঃপাতে যায়। এই প্রকারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত কোনও জাতির ভিতরে ঘটিলে সেই জাতির অপর ধনী ব্যক্তিগণ কোনও কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে ভীত হন। সুতরাং ব্যক্তিগত মূলধন কোনও জাতির উন্নতি বিষয়ে বিশেষ ফলপ্রদ নহে। এখন দেখা যাউক, আমাদের দেশের ব্যক্তিগত মূলধনের অবস্থা কি প্রকার? আমাদের দেশে ধনীর সংখ্যা খুব অধিক নহে। তবে যাঁহারা ধনী আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের ব্যবসায়-বুদ্ধি অতি অল্প। ধনীর সন্তান বিলাস-পুত্তলিকা। তিনি চাটুকারপরিবৃত হইয়া অনায়াসলব্ধ টাকায় অনায়াসলব্ধ সুখ-ভোগকেই একমাত্র স্পৃহনীয় মনে করেন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে টাকাগুলি একস্থান হইতে সহস্র স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। কতক শুণ্ডিকালয়ে, কতক বারাঙ্গনাগৃহে, কতক হার্ট বা কুকের আড়গড়ায়, কতক গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলে, কতক এসেন্স ওয়ালার ঘরে, কতক কাপড়ের দোকানে। এই ভাবে, যে লক্ষ টাকায় একটা প্রকাণ্ড কারবার চলিতে পারিত, বিদেশের অর্থ দেশে আসিতে পারিত, দেশের অর্থ দেশে রক্ষিত হইতে পারিত, দশজন গরিবের চাকুরীর সংস্থান হইতে পারিত, সেই লক্ষ টাকা কয়েক বৎসর, মাস, এমন কি কয়েক দিনের মধ্যে সহস্র স্থানে বিভক্ত হইয়া পড়িল। হয়ত উহার বার আনা অংশ ইংরাজ বণিক আত্মসাৎ করিল। এই প্রকারে ধনবানের ধন এ দেশে দিবানিশি অপব্যয়িত হইয়া, দেশের ধনসমষ্টি হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

আর এক প্রকারের ধনী আছেন, যাঁহারা গণ্ডগোলের মধ্যে যাইতে প্রস্তুত নহেন। কারবার জিনিসটাই কিন্তু গণ্ডগোলের। তাহাতে যেমন আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইবার আশা আছে, তেমনই আবার পথের ফকির হইবারও ভয় আছে। সুতরাং এই শ্রেণীর ধনিগণ কারবারের ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার অপেক্ষা কোম্পানির কাগজের সুদ গণিতে ভাল বাসেন। সুবিধা বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট ৪॥০ হইতে ৪, পরে ৩॥০, এখন আবার ৩৲ টাকায় নামিয়াছেন। তাহাতেই বা কোম্পানির কাগজের দর নামিতেছে কৈ? বাজারে কাগজের ডিম্যাণ্ড কত? এই কোম্পানির কাগজে আমাদের দেশের কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। আর এক শ্রেণীর ধনী লোক আছেন, যাঁহারা কোনও ব্যবসার গণ্ডগোলে যাওয়ার অপেক্ষা ঘরে বসিয়া ঋণ দিয়া সুদ গণিতে ভাল বাসেন। যদি দেখা যাইত এই টাকাগুলি ব্যবসাদারের হাতে যাইতেছে, তাহা হইলেও ঐ মূল ধনের সদ্ব্যবহার হইত। কিন্তু এই সকল সুদ-ভোগী ধনিগণ ব্যবসাদারদিগকে সহজে টাকা ধার দিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ তাঁহারা মনে করেন, দোকানী যদি ফেল হইয়া যায়, তবে আর টাকা আদায় হইবে না। ইঁহারা প্রায় জমি-জমা-ওয়ালা কাপ্তেন খুঁজিয়া বেড়ান। সুতরাং টাকা ধার করে কাহারা? সেই পূর্ব্বোক্ত ওড়ন্বা ধনীর সন্তানগণ। সুতরাং তাহাদের পূর্ব্বোক্ত পিতৃধনেরও যে দশা, এই ধনিগণের ধনেরও সেই দশা। এ টাকাগুলিও একটি একটি করিয়া সেই সুঁড়ি, বারাঙ্গানা, ইংরাজ দোকানদারের ঘরে যাইতেছে। মহাজন অবশেষে ধনীর সন্তানের ঘরবাড়ী, বিষয়-আশয় বেচিয়া বড় মানুষ হইতেছেন, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বংশের আবার পূর্ব্বোক্ত ধনি-সন্তানের ন্যায় উৎসন্ন যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতেছেন। আর এক দল লোক অনবরত টাকা কর্জ্জ করেন। ইহাদিগকে মকদ্দামা-বাজ বলিয়া সকলে জানেন। ইহাদের কিছু কিছু সম্পত্তি আছে। মহাজনগণ ইহাদিগকে টাকা ধার দেন বটে, কিন্তু তাহাতেও দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না। যে টাকায় টাকা না আনে, সে টাকা ছড়াইয়া পড়ায় দেশের কোনও লাভ নাই। এখানেও ঐ টাকা ধনীর বাক্স হইতে বাহির হইয়া টাকা আনিতে সমর্থ হয় না। মকদ্দমাবাজ ঐ টাকা জলের মত খরচ করেন বটে, কিন্তু টাকাগুলি ষ্ট্যাম্প আকারে সরকারের ঘরে যায়, ফিস্ ও উপঢৌকনের আকারে উকিল, ব্যারিষ্টার,

মোক্তারের ঘরে যায়, ঘুসের আকারে সেরেস্তাদার, নাজির, পেস্কার, মহাফেজ, ও পিয়ন সাহেবদের ঘরে যায়, এবং মনরক্ষার জন্য কতকগুলি ব্যবসায়ী সাক্ষীর ঘরে যায়। এখন দেখা যাউক, এই যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ঘরে টাকাগুলি গিয়া প্রবেশ করিল, সেখানে গিয়াও কি সে টাকাগুলি দেশের ধনবৃদ্ধির সাহায্য করেতেছে? বারিষ্টার যদি বিলাতি হন, তবে টাকা ত সোজা বিলাতে গেল; যদি দেশীয় হন, তবেও নানা আকারে উঁহার অধিকাংশ টাকা বিলাত চলিয়া যাইতেছে, কারণ ইহাঁদের চাল-চলন বিলাতি, ইহাঁদের ব্যবহার্য্য জিনিস বিলাতী, ইহাঁদের ভ্রমণ স্থান বিলাত, ইহাঁদের বন্ধু বান্ধব বিলাতী, ইহাঁদের আয়াসের সামগ্রী, বিলাসিতার উপকরণ বিলাতী; সুতরাং ইহাদের উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই নানা আকারে বিলাতে যায়। উকিল মহাশয়দেরও টাকার কিয়দংশ বিলাতি দ্রব্য, বিলাতি মদিরা, বিলাতি সাজ গোজ ক্রয়ে ব্যয়িত হয়; কিয়দংশ কতকগুলি অপোগণ্ড অলস আত্মীয়ের ভরণপোষণে ব্যয়িত হয়; কতকগুলি কোম্পানির কাগজ ক্রয়ে ব্যয়িত হয়, আর কতকগুলি বারাঙ্গনার ঘরে যায়, অথবা স্বর্ণকারের গৃহে প্রবেশ করে। আর যে আমলা ফয়লাদের টাকা, সেতো তাহাদিগের পেট ভরিতেই ব্যয়িত হয়, তাহাতে দেশের ধনসমষ্টির উন্নতি কি প্রকারে সম্ভব? আর এক শ্রেণীর লোক কন্যার বিবাহ কিম্বা পিতামাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঋণ করে। কত শত লোক এই প্রকারে আপনারা উড়িয়া যাইতেছে এবং দেশকে দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছে, কে তাহার গণনা করে? বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার গলাটিপিয়া পণ আদায় করেন। তাই যদি সেই পণের টাকা গুলি একটা কারবারে খাটিত তাহা হইলেও বুঝিতাম টাকাটার সদ্ব্যবহার হইল। কিন্তু তাতো নহে। উহাও ভাগ ভাগ হইয়া কতকগুলি লোকের ঘরে গেল। কিয়দংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ঘরে গেল, তাঁহারা এই টাকার সদ্ ব্যবহার করিলেন না; কেবল উহা উদর পোষণে ব্যয় পূর্ব্বক অলস ভাবে জীবন যাপন করিয়া, দেশকে নিজের পরিশ্রম হইতে বঞ্চিত করিলেন। কিয়দংশ মহা কোলাহল করিয়া কাঙ্গালীগণ ভাগ করিয়া লইল এবং সহজ লভ্য অর্থে উদর পূরণ করিয়া অলস ভাবে জীবন যাপন করিল। কতক টাকা ময়রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাদারদের ঘরে গিয়া, যাহা হউক কিছু কিছু উপকার সাধনে সমর্থ হইল। এই প্রকারে দেখা যায় ধনী মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত নির্ধন, হইতেছে।

তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যবসাদারদের ঘরে কিছু কিছু অর্থ জমিতেছে। কিন্তু তাহাতেই বা এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির কি উপকার? ময়রার পয়সা হইলেই তাহার পুত্রটিকে পড়িতে দিতেছে,অথবা বলা উচিত—আলস্য মন্দিরে প্রেরণ করিতেছে। ময়রার ছেলে দুপাত ইংরাজি পড়িয়া আর ময়রার কাজ করিতে চায় না। চাকুরী চাকুরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বুড়ো ময়রা অনেক কষ্টে যে কয়টা টাকা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিল, চাকুরীর উমেদারী করিতে গিয়া কৃতিমান্ পুত্র তাহা উড়াইল। সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবার গুলিও ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়িতেছে। এক কথায়, দেশে কোনও গতিকে টাকা জমিতেছে না।

যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এখন ব্যক্তিগত মূলধন। বোধ হয়, আমাদের দেশের ব্যক্তি গত মূলধন যে বাণিজ্যে লাগিতেছে না তাহা দেখান হইয়াছে। এখন একত্রিত মূলধনের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইহাকে ইংরাজিতে Joint Stock বলে। মনে করুন একটা রেলওয়ে খোলা হইবে, উহার জন্য এক কোটি টাকা আবশ্যক। এখন বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল, ১০০ টাকা করিয়া এক লক্ষ সেয়ার অর্থাৎ অংশ বিক্রয় হইবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানুসারে এক বা ততোধিক অংশ গ্রহণ করিল। এই প্রকারে এক কোটি টাকা একত্রিত হইল। রেলওয়েতে লাভ হইলে সেই লাভের অংশ শত শত লোক পাইল। আর লোকসান হইলে সকলের উপর দিয়া গেল বলিয়া, কাহারও বড় গায় লাগিল না। সকল দেশের সকল বণিক্ জাতির মধ্যে এই প্রকারের যৌথ কারবার প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। এই প্রথাতেই একটা জাতি ক্রমে ক্রমে ধনী হইতে পারে। এই প্রকারের বড় কারবারে যে শুধু অংশিগণ লাভবান্ হইতে পারেন তাহা নহে, ইহাতে অনেক নিরন্ন লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হয়। এই যে কলিকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ী চলিতেছে, ইহা ইংরাজের কীর্ত্তি না হইয়া যদি বাঙ্গালীর কীর্ত্তি হইত, তাহা হইলে অপেক্ষা কৃত উচ্চবেতনের পদগুলি আর ইংরাজ অধিকার করিয়া টাকা গুলি বিদেশে লইয়া যাইত না। আমাদের দেশে মাড়োয়ারী পার্শি প্রভৃতির মধ্যে এই প্রকারের কতক কতক যৌথ কারবার প্রচলিত আছে বলিয়া, তাহারা বাঙ্গালীর অপেক্ষা ধনী। বঙ্গদেশেও কয়েক বৎসর হইতে যৌথ কারবারের চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। ইহাতে অংশীদেরও দোষ আছে, কর্ম্মকর্ত্তাদেরও

দোষ আছে। লাভ হইল না, লাভ হইল না বলিয়া অংশিগণ চীৎকার করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। তাঁহাদের জানা উচিত ব্যবসায়ে কখনও এক দিনে লাভ হয় না। বিশেষতঃ কর্ম্মকর্ত্তারা বড় বড় কার্য্যে এই প্রথম ব্রতী, সুতরাং প্রথম প্রথম তাঁহাদের ভুল ত্রুটিত হইবেই। অংশিগণ ধীরভাবে অপেক্ষা করুন, দেখিবেন, কারবার ক্রমে ক্রমে উপযুক্ত পথে চালিত হইবে। আর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকেও বলি, তাঁহারা অনেক সময়ে নিজেও দায়িত্ব বিস্মৃত হন। এ দেশের একটী যৌথ কারবারের কর্ম্মকর্ত্তা যদি কারবার নষ্ট করেন, তাহা হইলে যে কেবল অংশিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা নহে; উহাতে দেশের অসাধারণ অমঙ্গল সংসাধিত হয়; এ কথা যেন তাঁহারা কখনও বিস্মৃত না হন। বাঙ্গালির প্রতিষ্ঠিত একটা ব্যাঙ্ক, একটা ম্যাচ্‌ফ্যাক্‌টারী ফেল্‌ হইয়া লোকের মন ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। আমার আর একটা কথা মনে হয়, ঠিক উপযুক্ত লোকের হস্তে কর্ত্তৃত্ব ভার প্রদত্ত হইতেছে না। লোক বাছিবার সময় আমাদিগকে সম্বন্ধজ্ঞান, সম্ভ্রমজ্ঞান, প্রভৃতি ভুলিতে হইবে। একজন সংবাদ পত্রে উত্তম যৌথ কারবারের প্রবন্ধ লেখেন বলিয়া যে তিনি রেলওয়ে কোম্পানির ম্যানেজার হইবার উপযুক্ত তাহার কোনও অর্থ নাই। একজন পুস্তক ব্যবসায়ী যে কল কারখানার বন্দোবস্তের উত্তম ম্যানেজার হইবেন, তাহার কোনও অর্থ নাই। যদি দেখা যায় যে, এক জন পুরাতন কার্য্যক্ষম লোক ও কার্য্যের উপযুক্ত লোক না লইয়া কেবল আপনার আত্মীয়, জামাই, ভাগিনেয় দিয়া আফিস্‌ পূর্ণ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি কার্য্যে বিজ্ঞ হইলে কি হইবে, তাঁহার স্বার্থপরতা সকল দিক নষ্ট করিবে। সুতরাং যৌথ কারবারের নেতৃত্ব যাহার তাহার হাতে দিলে, পরিণামে বিভ্রাট উপস্থিত হইবেই হইবে। বোর্ড অব ডিরেক্টার নেতা বাছিবার সময় খুব সাবধান হইবেন, কিন্তু নেতা এক বার নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহা না হইলে কারবারের কখনও উন্নতি হইতে পারে না। প্রত্যেক কথায় কথায় যদি তাঁহার কমিটির মত লইয়া কার্য্য করিতে হয়, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনায় কমিটি যদি তাঁহার কার্য্যে বাধা দান করেন, তাহা হইলে কার্য্য কখনও সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে না। বাঙ্গালির কমিটির এই একটা প্রধান দোষ যে সভ্যগণ মনে করেন, তাঁহারা খুব বোঝেন। কিন্তু একবার বিবেচনা করা উচিত, যে লোকটা কাজের মধ্যে পড়িয়া কাজের সুবিধা অসুবিধা বুঝি

দেখিয়াছি, তাহার অপেক্ষা তোমার আমার অধিক বুঝিবার কোনও সুবিধা নাই। বাঙ্গালী সভ্য সকল বিষয়ে আপনার মত চালাইতে চান, এবং আপনার মতানুসারে কার্য্য না হইলে ভয়ানক চটিয়া যান এবং তখনই সভ্য পদ ত্যাগ করেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া কতক গুলি মসল্লাবাঁধা সংবাদ পত্রের সাহায্যে যৌথ কারবারের মিথ্যা বদ্নাম রটনা করিয়া অংশি গণকে বৃথা ভীত করেন। তখন অংশিগণ বৃথা ভয়ে ভীত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা গণকে উত্যক্ত করেন, অবশেষে সকলে মিলিয়া কারবারটির আদ্য শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করেন। যাঁহারা আমাদের দেশের নব প্রতিষ্ঠিত শিশু যৌথ কারবার গুলির পরিণাম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। এখন বঙ্গ দেশের অবস্থা এমন হইয়াছে যে কোনও যৌথ কারবারের কথা উত্থাপন করিলে লোক আর বিশ্বাস করিতে চায় না। এ বড় ভাল লক্ষণ নহে। একথা মনে হইলেই আমার মনে হয়, এ দেশের উন্নতি ক্রমে দূরে যাইয়া পড়িতেছে। সভায় কি হইবে, সংবাদ পত্রে কি হইবে, কংগ্রেসে কি হইবে,দেশের অর্থ না বাড়িলে কিছুতেই কিছু হইবে না, দেশের লোকের স্বচ্ছল অবস্থা না হইলে কংগ্রেস্ চালাইবার টাকা কে দিবে, সংবাদ পত্র কে ক্রয় করিবে, খালি পেটে সভায় কে বক্তৃতা শুনিতে যাইবে? আমরা দেশেরমধ্যে যৌথকারবারে লক্ষ লক্ষ লোকের টাকা একত্রিত হইতে দেখিতে চাই।

এখন উভয়বিধ মূলধনের বিষয় আলোচনা করা হইল। আগামী বারে বাণিজ্যের অপর উপাদান পরিশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচিত হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র।

সীতারাম।—দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম গ্রন্থদ্বয়ে একটা সম্বন্ধ আছে। উভয় গ্রন্থই ধর্ম্মভাব বিষয়ক,; উভয় গ্রন্থেই গীতার উপদেশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থেই নৈতিক উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। সে দিনও বিখ্যাত উপন্যাসকার মিষ্টার গ্রাণ্ট অ্যালেন উদ্দেশ্যযুক্ত উপন্যাসের (Novels with a purpose) কত প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম গ্রন্থদ্বয়ে উদ্দেশ্যে মাধুরী বিসর্জ্জিত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনায় আমরা

বলিয়াছি, তাহা সম্ভবের রাজ্যে সংস্থাপিত; দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম সম্ভবের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। প্রচারে সীতারাম যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়; তাহার পর সংস্করণে আরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, শতাধিক পৃষ্ঠা বর্জ্জিত হইয়াছে। বোধ হয় দুইবার পরিবর্ত্তনে গ্রন্থকার সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে গ্রন্থের মূলাংশের কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই।

গ্রন্থান্তর্গত প্রধান চরিত্র সীতারাম; সে চরিত্র বুঝিতে হইলে আমাদিগকে গীতার সেই কথা মনে রাখিতে হইবে :—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুং সঃ সঙ্গস্তে ষূপজায়তে।
সঙ্গৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধো হভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

২। ৬২ ও ৬৪।

প্রথমেই সীতারাম স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে স্খলিত-পদ। তপ্ত কাঞ্চন শ্যামাঙ্গী নন্দাকে ও হিমরাশি-প্রতিফলিত-কৌমুদীরূপিণী রমাকে বিবাহ করিয়া সীতারাম শ্রীকে ভুলিলেন। হায় "out of mind as soon as out of sight !" ভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে শ্রী তাঁহার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন "তুমি শ্রী এত সুন্দরী!" দীর্ঘকাল পরে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতের সময় কর্ত্তব্য-পালন-বিমুখ স্বামীর এই উক্তি। সীতারাম শ্রীকে দেখিলেন, ভাবিলেন :—

"Whence that completed form of all completeness ?
Whence come that high perfection of all sweetness ?"

কিন্তু তখনও কর্ত্তব্য জ্ঞানাপেক্ষা যেন রূপমোহটাই প্রবল বলিয়া বোধ হয়। প্রায় সেই সময় সীতারামের মনে আর একটা বাসনা উঠিল,—হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন বাসনা। সীতারাম শ্রীর ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিলেন; কিন্তু শ্রীকে পাইলেন না। আপনার কোষ্ঠীফল শুনিয়া শ্রী যখন বিতত-বহুবল্লিনবপল্লবঘন উদ্যানের অন্ধকার মধ্যে অন্তর্হিত হইল, তখন সীতারামের মনে হইল :—

"Apart we miss our nature's goal,
Why strive to cheat our destinies ?
Was not my love made for thy soul
Thy beauty for mine eyes ?"

ইহার পর সীতারামের মনে দুই বাসনা জাগিতে লাগিল—এক শ্রীলাভ, অপর রাজ্য সংস্থাপন। রাজ্য সংস্থাপন হইল; কিন্তু শ্রীকে পাইলেন না। রাজ্য সংস্থাপন ও মুসলমানের পুর আক্রমণ, ইহার মধ্যে কেবল একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—তাহা রমার প্রতি সীতারামের বিরক্তি। রমা বড় ভীতা, কাজেই বীর সীতারামের উপযুক্ত পত্নী নহে; রমার উপর বিরক্তিতে সীতারামের শ্রীর প্রতি আসক্তি আরও বাড়িল। শ্রী ত তখনও দূরে—তাই তাহাকে সকল সুখ, সকল আশার আদর্শ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রী স্বামীর নিকট স্বভাবতঃই আপনার সকল সদনুষ্ঠানে সাহায্য প্রত্যাশা করেন; কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর মনোভাব বিপরীত হইলে হয় "স্বামী যেখানে ঝাঁঝাল সোডাওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।"

মুসলমান নগর আক্রমণ করিল। জয়ন্তী কর্ত্তৃক অদ্ভুত উপায়ে সংগৃহীত গোলাবারুদ প্রভৃতি লইয়া সীতারাম অব্যর্থ সন্ধানে শত্রুপক্ষ পরাজিত করিলেন। তাহার পর দুইটি ঘটনা ঘটিল—এক রমার বিচার, আর শ্রী-লাভ। সীতারামের অবনতি আরম্ভ হইল। সীতারাম যখন গঙ্গারামের কথা শুনিলেন, তখন "From his eye-balls flash'd the living fire." রাজ্য বাড়াইয়া, গঙ্গারামের শাস্তি বিধান করিয়া, সীতারাম শ্রীকে লইয়া সকল ভুলিলেন। সীতারাম যখন চিত্তবিশ্রামে আড্ডা গাড়িলেন, তখন তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকে পাইয়া তিনি যে কেবল নন্দা ও রমার প্রতি কর্ত্তব্যই বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এমন নহে; অপত্যনির্ব্বিশেষে পালনীয় প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সংসারে সকলেরই কর্ত্তব্য আছে, কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি হইলে, তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। সীতারামের অদৃষ্টাকাশে মেঘ সমাগম হইতে লাগিল। যে সীতারাম পত্নী শ্রীর নিকট এত প্রেম, এত সহানুভূতি আশা করিতেছিলেন, সেই সীতারামই মৃত্যুশয্যা শায়িতা অপরাপত্নী রমাকে দেখিতে না যাইয়া নন্দাকে বলিলেন—"আমি এত রাত্রে তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, বড় ক্লান্ত আছি; তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া যাও। তাহাকে আমি যেমন যত্ন করিতাম, তেমনই করিও।" এ ক্লান্তির প্রধান কারণ শ্রীর দর্শনলাভ প্রত্যাশা। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সীতারামের চিত্তবিকার বড় সহজ নহে—তাহার সম্মুখে আর

সব কর্ত্তব্য ভাসিয়া যাইতেছে। তখন হইতেই তিনি কর্ত্তব্য ভুলিতেছেন। স্বামীর যত্ন আর অপরের যত্ন রমণীর পক্ষে সমানই বটে !!! শ্রীকে পাইলেন ; কিন্তু শ্রী তখন পাষাণী। যে প্রেম, যে সহানুভূতি সীতারাম তাহার নিকট প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, মনোমন্দিরে তাহার মহিমামণ্ডিত যে মনোরম মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন,সীতারাম শ্রীর নিকট সে প্রেম, সে সহানুভূতি পাইলেন না। তাহাতে আবার সীতারামের প্রেমাপেক্ষা লালসাই প্রবল। গল্প আছে, কোন ভাস্কর নাকি পাষাণে মূর্ত্তি খোদিত করিয়া, সেই পাষাণ-প্রতিমার প্রেমস্বপ্নে জীবন কাটাইয়াছিল। সীতারামের প্রেম সেরূপ নহে। তাহাতে ইন্দ্রিয় কুহক প্রবল। চিত্তবিশ্রামে* চিত্তবিকারগ্রস্ত সীতারামের চিত্তবৃত্তি দমিত না হইয়া, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রী একদিন বলিল—"মহারাজ! তুমি ত সর্ব্বদাই চিত্তবিশ্রামে। রাজ্য করে কে?" সীতারাম বলিলেন—"তুমিই আমার রাজ্য। তোমাতে যত সুখ, রাজ্যে কি তত সুখ!" শ্রী তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিল; শেষ সীতারাম বলিলেন—"আমি রাজ্য ছাড়িব, তোমায় ছাড়িব না।" মৈশরীয় মোহমুগ্ধ বীরবর অ্যাণ্টনিও একদিন এমনই বলিয়াছিলেন :—

> "Let Rome in Tyber melt! and the wide arch
> Of ranged empire fall! Here is my space."

সীতারামের আর রাজকার্য্যে সময় "অপব্যয়ের" ইচ্ছা বা অবসর রহিল না। তবুও শ্রী কাছে আসিল না, তবুও পাষাণে হৃদয় সঞ্চার হইল না। রাজ্য নষ্ট হইতে লাগিল।

এই সময় সংসারাতপতাপে ক্লিষ্ট কুসুম রমা শুকাইয়া গেল। সীতারামের হৃদয় বোধ হয়, তখনও পাষাণে পরিণত হয় নাই। নন্দা ও চন্দ্রচূড় যখন তাঁহাকে রমার মৃত্যুর কারণ বলিলেন, তখন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; সেই সঙ্গে তাঁহার বড় রাগ হইল। সে রাগ বজ্ররূপে কর্ম্মচারীদিগের উপর পড়িল। সীতারাম দেখিলেন "His word the law, and he the lord of all" তাই অ্যাগামেমননেরই মত তিনি ভাবিলেন—"Kings are subject to the gods alone." সীতারাম পূর্ব্বে ছিলেন :—

> "The hope of all who suffer,
> The dread of all who wrong."

এখন তিনি স্পেন্সারের ভাষায় "a bold bad man."

ইহার পর শ্রী চলিয়া গেল—জয়ন্তীকে সাজা দিয়া তিনি মনের রাগ মিটাইতে চাহিলেন। তাহাও হইল না, তখন রঘুর ঊনবিংশতি সর্গের অভিনয় আরম্ভ হইল—অগ্নিবর্ণের পাপ ইন্দ্রিয়বৃত্তিচরিতার্থকরণাভিনয় হইতে লাগিল।

> "O, it is excellent
> To have a giant's strength; but it is tyrannous
> To use it like a giant."

তাহার পর মুসলমান নগর আক্রমণ করিল। এতদিনে সীতারামের ঘুম ভাঙ্গিল—সুপ্তবীর্য্য জাগরিত হইল; কিন্তু এ যেন কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ—কেবল মৃত্যুর জন্য। সীতারামের তেজ জাগিল; কিন্তু তখন নগরে আর আছে কে? নগর তখন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে—বেতন না পাইয়া সেনাগণ কর্ম্মত্যাগ করিয়া গিয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে, "অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং সেই কারণেই তাঁহার নানা অনিষ্ট উপস্থিত হয়।" (অযোধ্যাকাণ্ড)। মহাভারতেও নারদ সভাপর্ব্বে, লোকপাল সভাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে সেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি" নামক প্রবন্ধে সে কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শেষকালে অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া, সীতারাম এক অদ্ভুত ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক সপরিবারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেনাসাগর পার হইয়া চলিয়া গেলেন। জয়ন্তী ও শ্রী পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। জানি না— "—Like another Helen, fired another Troy." কিনা।

অনেকে বলেন, সীতারাম ঐতিহাসিক পুরুষ। বীরত্বে বাহুবলে সীতারাম বাঙ্গালীর গর্ব্ব, "সীতারামের ইতিহাস আমাদিগের গৌরবের ইতিহাস।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে সেই বীরচরিত্রে কলঙ্কের যে গাঢ় কালিমা লেপিত হইয়াছে, তাহাতে হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়। সীতারামের ঐতিহাসিক পরিচয় পাইলে, আমাদের এ আক্ষেপ মিটিত। সীতারাম যদি সত্য সত্যই অত্যাচারী থাকিয়া থাকেন, তবে কেহ সত্যের অপলাপ করিয়া, তাঁহার চরিত্র মধুর উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে বলিত না; আর যদি তিনি বীরোচিত গুণশালী থাকিয়া থাকেন, তবে সে তাঁহার স্বদেশীয়দিগের বড় আনন্দের, বড় গর্ব্বের কথা। কিন্তু সে আক্ষেপ মিটাইবার উপায় বোধ হয় নাই। আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র সীতারামের ইতিহাস উদ্ধা-

রের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন; * কিন্তু তাঁহাকেও অনেক স্থানে কিম্বদন্তির ভিত্তির উপর অট্টালিকা স্থাপন করিতে হইয়াছে। তবে যেখানে ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের উপায় নাই, সেখানে একজন ঐতিহাসিক বীরপুরুষের চিত্র নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত না করিলে, বোধ করি, কোন হানি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের সর্ব্বনাশের প্রধান হেতু কর্ত্তব্যাবহেলা; তাহা ইন্দ্রিয়কুহক হইতে উৎপন্ন না হইয়া, প্রেমাতিশয্য হইতেও উৎপন্ন হইতে পারিত। এই প্রেমাতিশয্যহেতু কর্ত্তব্য হেলা হইতেই রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী"র বিক্রমদেবের রাজ্যে সর্ব্বনাশের প্রলয় বহ্নি শিখা উথিত হইতেছিল। প্রেমে যে পবিত্রতা আছে, পাশব ইন্দ্রিয় কুহকে তাহা নাই, বলিয়াই সীতারামের চিত্রের কালিমা সম্বন্ধে ইহা বলিতে হইয়াছে। সীতারামের মহতী চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, তাহা তাঁহার স্বদোষে কি না সন্দেহ। একেই "The evil, that men do, lives after them." তাই প্রমাণাভাবে কোন মৃত ব্যক্তির প্রতি কোন দোষারোপ দেখিলে বলিতে ইচ্ছা করে:—

> "No farther seek his merits to disclose,
> Or draw his frailties from their dread abode."

যে প্রেম "কর্কশকে মধুর করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে" সে প্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের দোষই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তাই মনে পড়ে:—

> "Errors like straws upon the surface flow;
> He who would search for pearls must dive below."

সেই জন্যই দূরদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন "সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই।"

প্রফুল্ল ও শ্রী, প্রথমেই উভয়ের মধ্যে একটা বড় সাদৃশ্য লক্ষিত হয়; উভয়েই পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, অথচ উভয়েই পতির প্রেমলাভাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। বহুদিন পরে ভ্রাতার বিপদের সময় শ্রী স্বামীর নিকটে গেল—সফল কাম হইয়া ফিরিয়া আসিল, তাহার কারণ চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।" পর দিবস যেখানে ভ্রাতার কবর হইবে, শ্রী সেখানে গেল। এইখানে শ্রীর চরিত্র সমাজের

সহিত খাপ খায় নাই। কয়জন হিন্দুমহিলা শোকসম্বরণ করিয়া, লজ্জা ত্যাগ করিয়া, অপরিচিত পরপুরুষের সহিত এক পাদপে উঠিয়া শত সহস্র অপরিচিত চক্ষুর কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে পারেন? তাহার পর হইতে পারে "Sweet is revenge—especially to women" তাই বলিয়া বঙ্গমহিলার অঞ্চলান্দোলনে সেনা চালনা সম্ভব বা শোভন কিছুই বলিতে পারি না। ইহার পর সীতারাম যখন পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, শ্রীকে গৃহে লইতে চাহিলেন; তখন শ্রী আপনার কোষ্ঠীফল শুনিয়া বলিল, "স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাসে থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আমার উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"—'For you in my respect are all the world" মৃণালিনী চরিত্র সমালোচনায় আমরা বলিয়াছি "প্রেমের জন্য রমণী কতদূর করিতে পারে, এই চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন।" মৃণালিনী প্রেমিকের সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, আর শ্রী আপনা হইতে স্বামীর অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া, আপনার সুখাশায় জলাঞ্জলি দিয়া, চিরবাঞ্ছিত পতির আলিঙ্গনোদ্যত বাহুপাশ হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া, স্বেচ্ছায় দুঃখ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। এ আদর্শ আরও উচ্চ, আরও মহৎ; কিন্তু মৃণালিণীর পার্শ্বে শ্রী দিবাকরের পার্শ্বে ক্ষীণ-জ্যোতিঃ খদ্যোত। তাই আনন্দমঠ সমালোচনা কালে আমরা বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকান্তের উইলের পরবর্ত্তী উপন্যাস সকলে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার ম্লানতা অনুভূত হয়। যখন শ্রী সীতারামের নিকট হইতে চলিয়া গেল, তখনও সে ভাবিতেছে "I hunger for the kisses of your lips—the clasp of your arms." তাই যখন সে জয়ন্তীকে বলিল 'স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামি-সেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?" আবার বলিল, "স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না।" শেষ বলিল "যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন; সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।" তাহার পর মনের আবেগে স্বামীতে সর্ব্ব বাসনা, সর্ব্ব কামনা সংস্থাপনের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল, তখন সংসারবিরাগিণী জয়ন্তীরও আঁখি ছল ছল করিতে লাগিল। ইহার পর কোমলতা হারাইয়া, কঠোরতা লইয়া, শ্রী হারাইয়া শ্রী স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিল। তখন মানবী পাষাণীকে

স্থান দিয়াছে। শ্রীত সীতারামকে স্পষ্টই বলিল, "যে দিন তোমার মহিষী হইতে পারিলে আমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও হইতে চাহিতাম না, আমার সে দিন গিয়াছে।" শ্রী রমণীসুলভ কোমলতা পরিহার করিয়াছে; সে ভাবিল যে গঙ্গারামের জীবনরক্ষা করিয়া ও স্বামীকে দর্শন দিয়া সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে !! কিন্তু এখনও অনেক রমণী মনে করেন :—

"রমণীর
ধর্ম্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্র রূপে।"

গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সপ্তম পরিচ্ছেদে শ্রীর হৃদয়হীনতাই পরিস্ফুট। শ্রী কিছুতেই সীতারামের হৃদয়ের কাছে আসিতে চাহিল না। সীতারামের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, সে একদিন বলিল—তোমরা পুরুষ, রমণীকে সকল সমর্পণ করিলে "কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার।" যখন শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখনও বুঝি তাহার হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে পূর্ব্ব প্রেমের এতটুকু অবশেষ ছিল; এখন আর তাহার কিছুই নাই। শ্রী বুঝিতে পারিল, সে স্ত্রীর মত ব্যবহার করিলে সীতারামের সর্ব্বনাশ হয় না, তবুও সে পত্নীর কর্ত্তব্য সাধনে স্বীকৃতা হইল না। সীতারামের সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল। জয়ন্তীকে শ্রী আপনার গমনেচ্ছার কথা জানাইয়া বলিল, "আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব!" স্বামীর ভালবাসাটা নিতান্তই পাপ !!! জয়ন্তীর শিক্ষায় শ্রীর এমনই বিকৃতি ঘটিয়াছে! তাহার পর শ্রী চলিয়া গেল; আর সীতারামের যখন সর্ব্বনাশ হইল, তখন আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আসিল। সেই শ্মশানোপম স্থানে মুহূর্ত্তের জন্য পাষাণে প্রাণ সঞ্চারিত হইল; সীতারামকে শ্রী বলিল "এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?" কিন্তু তাহার পরই আবার সেই শ্রী সন্ন্যাসিনী বলিয়া, আপনার পরিচয় দিল। তাহার পর জয়ন্তী ও শ্রী ত্রিশূল হস্তে সেই সেনা সাগরের মধ্য দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ যেন "সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড! গোড়া নাই আগা!" শ্রী চরিত্রের শেষাংশে মাধুরীর লেশ মাত্র নাই।

জয়ন্তী-চরিত্র বড়ই কুহেলিকাচ্ছন্ন—কেবল কয়বার মাত্র অপহৃত কুহেলিকান্ধকার মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে। জয়ন্তী চরিত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে

হইলে আমাদিগকে সীতারামের প্রথম সংস্করণে শেষ কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতে হইবে:—"এখন যাও জয়ন্তী! প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী, দুইজনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ কর।" জয়ন্তীর জীবনের আদি বা অন্ত গ্রন্থে পাই না; তবে বোধ হয় সে সুখে সংসার ত্যাগ করিয়া যায় নাই। সংসারের সুখ দুঃখ স্বেচ্ছায় পদদলিত করিয়া যাইলে, শ্রী যখন খরবাহিনী নিম্নগা তীরে তাহার কেশরাশি তৈল দিয়া আঁচড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিল, তখন জয়ন্তী বলিত না "জন্মান্তরে হইবে—যদি মানবদেহ পাই।" এই কথায় যেন অপূর্ণ বাসনার কাতরধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে। নিশি ঠাকুরাণীর মত জয়ন্তীর সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে। অদ্ভুতভাবে গোলা বারুদ সংগ্রহ করিয়া জয়ন্তী সীতারামকে দিয়া, তঁহার নগর রক্ষা করাইল—তাহার পর সীতারামকে শ্রী দিয়া সে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার শিক্ষাগুণে এ শ্রী আর সীতারামের প্রেমময়ী শ্রী নহে—তাহার পাষাণহৃদয়শিষ্যা শ্রী। শেষ যখন প্রেমের ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে পাষাণে জীবন সঞ্চারের সম্ভাবনা হইতেছিল, যখন শ্রীর রমণীত্ব—কোমলত্ব পুনর্বিকশিত হইবার উপক্রম হইতেছিল, তখন জয়ন্তী আসিয়া, তাহাকে বলিল "রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা? এই কি সন্ন্যাস?" আশ্চর্য্য কথা—স্বামী মরিল আর বাঁচিল তাতে স্ত্রীর কি? জয়ন্তী নারী চরিত্রের কি বিকৃত আদর্শ!! কেন জয়ন্তী ত মনে করিতে পারিত "Love indeed is light from heaven" তাহার উদ্দেশ্য "To lift from earth our low desire" জয়ন্তীচরিত্রে যেটুকু মাধুরী সে কেবল যখন জয়ন্তী বেত্রাঘাতের সময় "খুব উঁচু সুরে বাঁধা" মন লইয়াও আপনার রমণীস্বভাবের বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না।

গঙ্গারাম মূর্ত্তিমান পাপ। তাহার সাহস ও উৎসাহ ছিল; তাই সৎপথে চালিত হইয়া, সে সীতারামের রাজ্যসংস্থাপনে অত সাহায্য করিতে পারিয়াছিল। সীতারাম আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া, তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আর সে একবারও ভাবিল না:—

> যেই তরু-ছায়া-তলে জুড়াই জীবন
> কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার?"

ভীতা রমা ভয়ে বুদ্ধি হারাইয়া, অবরোধের নিয়ম ভগ্ন করিয়া তাহাকে

নগর রক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করিতে ডাকিয়া পাঠাইল, বলিল "আপনি আমার দাদা হন্—জ্যেষ্ঠ ভাই, আপনার পক্ষে শ্রীও যেমন, আমিও তাই।" গঙ্গারাম পাপচিত্তে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইল—তাহার ভীতির সুযোগ লইয়া, সে বার বার অবরোধে যাইতে লাগিল; শেষ তাহাকে পাইবার আশায়, প্রাণদাতার সর্ব্বনাশ করিতে সম্মত হইল। তাই মনে হয় "yea, many there be that have run out of their wits for women, and become servants for their sakes. Many also have perished, have erred, and sinned, for women...O ye men, how can it be but women should be strong, seeing they do thus?" গঙ্গারামের এই মনোভাব প্রেম নহে—প্রেমের অবমাননা। তাহার পর প্রাণ পাইয়া, সে আবার মুসলমান সেনাসহ সীতারামের সর্ব্বনাশ সাধনোদ্দেশে আসিল। তাই বলিয়াছি গঙ্গারাম মূর্ত্তিমান পাপ।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, রমা "বড় কোমল প্রকৃতি"—সে সীতারামের "সুখ"। কিন্তু রাজ্য সংস্থাপনের পর রমা সীতারামের অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সে কেবল তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া। সীতারাম তাহাকে সকল বুঝাইয়া বলিলে বোধ হয়, তাহা হইত না; কিন্তু সীতারাম তখন সলিলবিধৌত-শতদলোপম একখানি মুখের চিন্তায় বড় চঞ্চল। সীতারাম বড় বিরক্ত হইলেন। রমা যে তাঁহারই অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ সীতারাম দিল্লী যাইলে মুসলমানের আগমনাশঙ্কা করিয়া রমা ভাবিল "এ সময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন।" কিন্তু রমা-জননী; কবি সত্যই বলিয়াছেন:—

"হায়রে, মায়ের প্রাণ; প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
ভক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!"

—সন্তান-স্নেহাধিক্য বশতঃই সে গঙ্গারামকে ডাকিয়া পাঠাইল—ভ্রম করিল। পাপিষ্ঠ গঙ্গারাম তাহাকে পাইবার আশায় প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতে গেল। সব প্রকাশ পাইল—রমার বিচার হইল। সেই বিচার সভায় সমবেত প্রজামণ্ডলীর সমক্ষেও সীতারামের কথায় সে বলিল,

"যিনি গুরুর অপেক্ষাও আমার পূজ্য, যিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতা অপেক্ষা আমার পূজ্য, সেই পতিদেবতা" বলিল "পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই" আবার "নারী জন্মে স্বামি-সন্দর্শনের তুল্য পুণ্যও নাই সুখও নাই।"

"Good name, in man and woman * *
Is the immediate jewel of their Souls"

সেই সুনাম রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়া সে সেই জনতা সমক্ষে আপনার কথা আদ্যন্ত বিবৃত করিল; কিন্তু রমার কোমল হৃদয়ে তত চাড় সহিল না—রমা শয্যাশায়িনী হইল। সীতারাম বোধ হয়, তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন; তবুও তিনি শ্রীকে লইয়া এতই ব্যস্ত যে, তাহার সংবাদ লইতেও আর তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তখন রাজ্য, নন্দা, রমা, সব গিয়াছে—আছে কেবল শ্রী। সীতারাম একটু যত্ন করিলে হয়ত রমা বাঁচিত। তাহা হইল না। মৃত্যু শয্যায় স্বামীর পদধূলি মস্তকে দিয়া সে বলিল, "এ জন্মের মত বিদায় লইলাম। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।" রমা প্রাণত্যাগ করিল—সীতারামের বিষবৃক্ষে ফুল ফুটিল। রমার পতিপ্রেম ক্ষুণ্ণ নহে। রমার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য সুখ সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর সত্য প্রকটিত করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, স্ত্রীপুরুষে পরস্পরে ভালবাসাই দাম্পত্যসুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা ইহাই দাম্পত্য সুখ।"

মধ্যাহ্ন তপনতাপতপ্ত মরু মধ্যে ওয়েসিসের মত, এই গ্রন্থ মধ্যে নন্দা। নন্দার প্রধান গুণ তাহার গৃহিণীপনা। সীতারাম দিল্লী যাইলে রমা যখন জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?" নন্দা তখন বলিল, "রাজার কাজ রাজাই বুঝেন—আমরা কি বুঝিব বহিন!" তার পর রমার কলঙ্কের কথা শুনিয়া, সে রমাকে বলিল, "এখন আমাকে সতীন্ ভাবিস্ না—কালি চুন তোর গালে পড়ুক না পড়ুক, রাজারই মাথা হেট হয়েছে। তিনি তোরও প্রভু—আমাও প্রভু; এ লজ্জা আমার চেয়ে তোর যে বেশী তা মনে করিস্ না।" সে ভাবিল :—

"স্বামীর কলঙ্ক যায়,　　　নারীর কলঙ্ক তায়,
ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘুচাব কেমনে।"

পাঠক একবার নন্দার সহিত শেষ জীবনে শ্রীর তুলনা করিয়া দেখিবেন হৃদয়বতীতে ও হৃদয়হীনায় কি প্রভেদ। প্রথমা রমণী, দ্বিতীয়া পাষাণী।

তাহার পর রমার হইয়া নন্দা সীতারামকে বুঝাইয়া রমার কলঙ্ক-ক্ষালনের চেষ্টা করিল। রমাকে বাঁচাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। শেষ রমার মৃত্যুকালে উদ্যোগী হইয়া সপত্নীর সহিত স্বামীর দেখা করাইয়া দিল। নন্দার সহিত যাহা কিছু সাদৃশ্য সে কেবল লবঙ্গলতার। দুই জনেরই গৃহিণীপনা ছিল; গৃহিণীর গৃহিণীপনা না থাকিলে সংসারে সুখ থাকে না। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মত অন্যত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। সামান্য কয়টি মাত্র রেখা পাতে নন্দার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ সে চরিত্র অতি মধুর। সামান্য কয়টি মাত্র রেখাপাতে চিত্র ফুটাইবার বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনন্য-সাধারণ ক্ষমতার বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বুঝাইবার ইচ্ছা রহিল।

চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কথা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। "আমরা আজিকার দিনেও এমন দুই একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি যে, টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশাসিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত। চন্দ্রচূড়, সেই শ্রেণীর লোক।"

আর একটা কথা বলিলেই বর্ত্তমান গ্রন্থ সমালোচনা শেষ হয়। সৌন্দর্য্য-তত্ত্বজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্পের কথায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রিয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমার সম্ভব ছাড়িয়া স্বইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প ছাড়িয়া, সাহেবের চিনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।" সত্যই কপালে আরও কি আছে বলিতে পারি না; কারণ এখনও আমরা কেবল অতীতের কথা স্মরণ করি, আর দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করি, এবং গর্ব্বও করি; সংশোধনের—উন্নতির কোন উপায় করিয়া, সমাজ শরীরে—জাতীয় শরীরে নবজীবন সঞ্চারের জন্য কখনও ব্যগ্র হই না। তাহার উপর এখনও যদি আমাদের কবি ও উপন্যাসকারগণ সংসারাসক্তি-শূন্যা জয়ন্তী ও শ্রীর মত আদর্শ সৃজন করিয়া আধ্যাত্মিক বাষ্পভরা বেলুনে তুলিয়া এ অলস জাতির স্বপ্ন কুহকাবিষ্ট হৃদয় মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তবে উন্নতির আশা আরও সুদূরপরাহত, সন্দেহ নাই।

"অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ননীতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন!"

এখন আমাদিগকে কেবল স্মরণ করিতে হইবে :—

"আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মোরে কিবা ফল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই!"

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিদ্যার কিরূপ বিবর্ত্তন হইয়াছিল; সে বিবর্ত্তনের ক্রম কি; এবং কোন্ স্থানে আসিয়া সে বিবর্ত্তন চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; ব্রহ্মবিদ্যাকে জাতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে,—জাতীয় ভাবে তাহার উত্তরোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, আমাদিগকে সে বিবর্ত্তনের কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; এ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, বিবর্ত্তনের নিয়ম অথবা প্রণালী কি সাধারণ ভাবে তাহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

বিবর্ত্তনের প্রণালী—স্পেন্সার ও হিগেল

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই সৌরজগতের মূল উপকরণ Nebula, অর্থাৎ এক প্রকার উত্তপ্ত সুতরাং গতিশীল বাস্পাকার পদার্থ। ঐ বাস্পাকার বস্তুরাশির মধ্যে কোনও প্রকার বৈচিত্র্য ছিল না—সমস্তটাই সমভাবাপন্ন ছিল। ক্রমে উহার এক এক অংশ ঘূর্ণিত হইতে হইতে সমষ্টি-দেহ হইতে বিযুক্ত হইল, এবং যতই উহার অভ্যন্তরস্থ তেজ বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ততই উহা ঘনীভূত হইয়া মণ্ডলাকার ধারণ করিল। এইরূপে যাহা এক সমভাবাপন্ন বস্তুরাশি মাত্র ছিল, তাহা হইতে বিচিত্র গ্রহ-নক্ষত্রাদি-সমন্বিত এই সৌরজগতের উৎপত্তি হইল,—এক হইতে বহুর অভিব্যক্তি হইল। কিন্তু Nebula রাশির মধ্যে যে একটী মৌলিক একত্ব ছিল,—যে আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ প্রভাবে Nebula এক অখণ্ড বস্তুরাশি হইয়াছিল, বহুত্ব প্রাপ্তির সময় সে একত্ব—সে আকর্ষণ কি

চলিয়া গেল? তাহা নহে। সৌরজগতের দিকে চাহিয়া দেখ, গ্রহ-নক্ষত্রাদির মধ্যে একটী অপরটীর সঙ্গে কেমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ,—সকলেরই অস্তিত্ব সকলের সঙ্গে বান্ধা। বাম্পাকার Nebulaর দিকে চাহিলে আমরা কেবল একটা প্রকাণ্ড বস্তুরাশি মাত্র দেখিতে পাইতাম; সকলের মধ্যে এই যে অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ যোগ—এই যে নিগূঢ় একত্ব রহিয়াছে, তাহা কখনও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইত না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, এক যেমন বহু হইল, বহুত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একত্বও পরিস্ফুট আকার ধারণ করিল। জড়জগৎ ছাড়িয়া জীবজগতে প্রবেশ করিলেও আমরা বিবর্ত্তনের ঠিক এই প্রণালীই দেখিতে পাই। একটী জীবকোষ দেখ, উহা সর্ব্বত্রই কেমন সমভাবাপন্ন। ক্রমে একটী জীব-কোষ খণ্ডিত হইয়া দুইটী দশটীতে পরিণত হইল। তখনও কেবল সংখ্যাগত বৈষম্য। ক্রমে ঐ কোষ-রাশির মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির রেখা পাত হইল; তাহার পর অঙ্গ বৈচিত্র্য দেখা দিল; ক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল বিকশিত হইল। তখন জীবের সম্পূর্ণ দেহটী পাইলাম। ঐ দেহের অঙ্গসমূহের মধ্যে—যন্ত্রসমূহের মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ যোগ—কি নিগূঢ় একত্ব বর্ত্তমান। ফুস্ফুস্ কিম্বা পাকস্থলীতে সামান্য একটু বিকৃতি ঘটুক, সমস্ত দৈহিক যন্ত্রে তাহা গিয়া বর্ত্তিবে। কোন একটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বাহ্য বস্তুর একটু সামান্য সংঘাত হউক, সমস্ত দেহ তাহার সংবাদ লইবে। জীবকোষরাশির মধ্যে কখনও কি আমরা এই ঘনিষ্ঠ যোগ—এই নিগূঢ় একত্ব দেখিতে পাইতাম? এখানেও এক বহু হইবার সময়, বহুত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একত্ব স্ফুটতর আকার ধারণ করিল। চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্, প্রকৃতির যে কোন বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সর্ব্বত্রই বিবর্ত্তনের এই একই নিয়ম—একই প্রণালী। স্পেন্সারের ভাষায় বলিতে গেলে, Homogeneity, Differentiation, Integration—সাম্য, বৈষম্য ও সংহতি। বৈষম্য ও একত্বের সমস্ত উপকরণই সাম্যাবস্থায় অব্যক্তরূপে বর্ত্তমান। সাম্যাবস্থার সেই অব্যক্ত বৈষম্য ও অপরিস্ফুট একত্বই, বিবর্ত্তন মুখে ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয়। তত্ত্বের দিক হইতে হিগেল বিবর্ত্তনের এই প্রণালীকে Thesis, Antithesis, Synthesis বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা ভিন্ন হইলেও হিগেল ও স্পেন্সারের মূল ভাব এক। হিগেলের Thesis

Antithesis, Synthesisএর পরিবর্ত্তে আমরা সাম্য, বৈষম্য ও সমন্বয় এই তিনটী কথা ব্যবহার করিব।

ব্রহ্মবিদ্যার বিবর্ত্তনেও আমরা ঠিক এই সাম্য, বৈষম্য ও সমন্বয়ের প্রণালী দেখিতে পাই। ব্রহ্মবিদ্যার আলোচ্য তত্ত্ব প্রধানতঃ তিনটী—আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর; দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, অহং, ইদং ও ব্রহ্ম। সাম্যাবস্থায় এই তিনটী তত্ত্বের মধ্যে একটী অভঙ্গ একত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তখন অহং ইদং হইতে অবিভক্ত—উভয়ই উভয়ের সহিত গ্রথিত ও জড়িত; এবং এই সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন অস্ফুট জ্ঞানের অন্তরালে ব্রহ্মতত্ত্ব লুক্কায়িত। কিন্তু অহং ও ইদংএর অবিরাম সংঘর্ষে এ সাম্যভাব অধিক কাল তিষ্ঠিতে পারে না। কালক্রমে সেই অভঙ্গ সমতার মধ্যে বৈষম্যের রেখা দেখা দেয়। অবশেষে অহংতত্ত্ব, ইদংতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া জ্ঞানের সমক্ষে নিজ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে। তখন এক ঘোর দ্বন্দ্ব—ঘোর বৈষম্য উপস্থিত হয়; যাহা অহং তাহা ইদং নহে এবং যাহা ইদং তাহা অহং নহে। অহং জ্ঞাতা, ইদং জ্ঞেয়; অহং ভোক্তা, ইদং ভোগ্য; অহং কর্ত্তা, ইদং কার্য্য—উভয়ই উভয়ের ঠিক বিপরীত। অন্য দিকে অহং ও ইদং উভয়ই সসীম সোপাধিক, সাকার ও সগুণ, বিশিষ্ট সত্তা; কিন্তু ব্রহ্ম অসীম, নিরুপাধিক, নিরাকার ও নির্গুণ, অদ্বৈত তত্ত্ব। অথচ এই অদ্বৈত (Universal) এবং এই বিশিষ্ট (Particular) উভয়ই জ্ঞানে প্রতিভাসিত —উভয় তত্ত্ব লইয়াই জ্ঞান। এজন্যই জ্ঞান এই তত্ত্ব-বিরোধ লইয়া থাকিতে পারে না। যেরূপেই হউক, অদ্বৈত ও বিশিষ্ট এতদুভয়ের মধ্যে জ্ঞান একটী মিলন—একটী সমন্বয় স্থাপন করিতে চাহে।

ব্রহ্মবিদ্যার আলোচ্য তত্ত্ব

তত্ত্বের সাম্যাবস্থা

তত্ত্বের সংঘর্ষ ও বৈষম্যাবস্থা

তত্ত্বের সমন্বয়

অদ্বৈত ও বিশিষ্টের মধ্যে এই সমন্বয় (তবেই অদ্বৈতের মধ্যে বিশিষ্টের পরস্পর সমন্বয়) স্থাপনের চেষ্টা হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি। যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে এই সমন্বয় সাধিত হইতেছে। এ জন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্রহ্মবিদ্যা। এই সমন্বয় সাধন চেষ্টার কখনও বিরাম হইতে পারে না। জ্ঞান যদি এক সময়ে জগতের সমস্ত বিশিষ্ট তত্ত্ব

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয়—ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা

চিরকালের জন্য একটী চূড়ান্ত সমন্বয় হইতে পারেনা

আয়ত্ত করিতে পারিত,—অহং ও ইদংএর সমস্ত স্বরূপ একবারে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিতে পারিত ; এবং বিশিষ্টের এই পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতের পূর্ণ জ্ঞানও যদি তাহার করতলস্থ হইত, তাহা হইলে চিরকালের জন্য একটী সমন্বয় স্থাপন সম্ভবপর হইত। কিন্তু এই বিশ্বের তত্ত্বও অশেষ, এবং জ্ঞানও চিরবর্দ্ধনশীল। এজন্যই কোন যুগে একটী সমন্বয় সাধিত হইলে,—বিরোধ ও বৈষম্যের পর জ্ঞানের মধ্যে আবার মিলন, সমতা ও শান্তি সংস্থাপিত হইলে, জ্ঞান সেখানে বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারে না। বিশিষ্টের স্ফুটতর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আবার নব দ্বন্দ্ব—নব বৈষম্যের উদয় হয় ; এবং আবার একটী নব সমন্বয়ের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এইরূপে এক যুগের সমন্বয় পরযুগের ঠিক সাম্যের স্থানীয় হইয়া, বৈষম্যের মধ্য দিয়া আবার একটী নব সমন্বয়ের পথ খুলিয়া দেয়। এইরূপ সাম্য, বৈষম্য ও সমন্বয় পরম্পরা হইতেই আমাদের বিশিষ্ট ও অদ্বৈতের জ্ঞান গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে।

এখন অদ্বৈত ও বিশিষ্টের সমন্বয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

অদ্বৈত ও বিশিষ্টের সমন্বয় —নির্গুণ ব্রহ্ম—

কোন কোন পণ্ডিত অদ্বৈতকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, বিশিষ্ট আর তাহার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তাঁহারা বলেন, যাহা কিছু বিশিষ্ট, অদ্বৈত তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশিষ্ট নয় বলিয়াই, অদ্বৈত অদ্বৈত। সুতরাং অদ্বৈতের মধ্যে আর বিশিষ্টের স্থান কোথায়? অদ্বৈত সর্ব্বতোভাবে বিশিষ্টের অতীত। বিশিষ্ট সসীম, সোপাধিক, সাকার ও সগুণ। অদ্বৈত অসীম, নিরুপাধিক, নিরাকার ও নির্গুণ। এই বিশিষ্টবর্জ্জিত অদ্বৈত, নির্গুণ ব্রহ্ম (Abstract Universal)। কিন্তু আর এক শ্রেণীর

অদ্বৈত ও বিশিষ্টের সমন্বয় —সগুণব্রহ্ম—

পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা অদ্বৈতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া, বিশিষ্টকে বর্জ্জন করেন না। তাঁহারা বলেন, অদ্বৈতকে ছাড়িয়া বিশিষ্ট আবার কোথায় দাঁড়াইবে? বিশিষ্টের কি স্বতন্ত্র সত্তা আছে? সমস্ত বিশিষ্টই অদ্বৈতের আশ্রিত ; অদ্বৈতই বিশিষ্টের আশ্রয়—অদ্বৈতই বিশিষ্টের আধার। অদ্বৈত দেহী, বিশিষ্ট দেহ ; অদ্বৈত চিৎ, বিশিষ্ট তাহার সত্তা ; অদ্বৈত শক্তিমান, বিশিষ্ট তাহার শক্তি। সুতরাং বিশিষ্টকে ছাড়িয়াও অদ্বৈতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বিশিষ্ট ও অদ্বৈত অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধে অচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ—

বিশিষ্টেই অদ্বৈতের অভিব্যক্তি—বিশিষ্টই অদ্বৈতের লীলাক্ষেত্র। বিশিষ্ট-ধারী এই অদ্বৈতই সগুণ ব্রহ্ম (Concrete Universal.)।

ধর্ম্ম জগতে আমরা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও সগুণ ব্রহ্মবাদ উভয়ই দেখিতে পাই। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সহজেই বুঝা যাইবে যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ কখনই ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না। অদ্বৈত বিশিষ্টের অতীত; আমরা বিশিষ্ট, সুতরাং অদ্বৈত আমাদের জ্ঞানাতীত। যাহা জ্ঞানাতীত তাহার সত্তা সম্বন্ধে কাহার চিত্তে সন্দেহের উদয় না হয়? অনেকে তো জ্ঞানাতীত বলিয়া অদ্বৈতের সত্তা একেবারে অস্বীকার করিয়াই বসেন। আবার অনেক পণ্ডিতের মতে, জ্ঞানাতীত বিষয়ের অনুসন্ধান পণ্ডশ্রম মাত্র—জ্ঞানাতীত বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদের স্বাভাবিক গতি, অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism), সন্দেহবাদ (Scepticism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism), এবং ঔদাসীন্যবাদের (Indifferentism) দিকে অনেক স্থলে এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদই আবার পৌত্তলিকতা, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদের প্রসূতি। ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত, সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব; উপাসনার্থে সাকার মূর্ত্তি আবশ্যক। আবার ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত, সুতরাং ব্রহ্মের একটী বিশেষ Revelation—বিশেষ প্রকাশ আবশ্যক, নতুবা ধর্ম্মের আর ভিত্তি কোথায়?—ভক্তিবৃত্তিরই বা চরিতার্থতা কি রূপে সম্ভবে? একবার ব্রহ্মের এই বিশেষ Revelation—বিশেষ প্রকাশ স্বীকার করিলেই অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরুবাদ ও মধ্যবর্ত্তিবাদে গিয়া পঁহুছিতে হইবে। ব্রহ্ম বিদ্যার ইতিহাসে আমারা ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ইউরোপ দেশে Doctrine of Relativity—শুদ্ধ বিশিষ্টবাদের পশ্চাতে যে নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব লুকায়িত ছিল—অথবা যে নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব হইতে শুদ্ধ বিশিষ্টবাদেরই জন্ম হইয়াছিল; সেই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব হইতেই কালক্রমে একদিকে জড়বাদিগণের সন্দেহবাদ ও নাস্তিক্যবাদ, কোমতের ঔদাসীন্যবাদ, স্পেন্সার ও হক্সলীর অজ্ঞেয়তাবাদ; এবং অন্যদিকে ম্যান্সেল্ প্রভৃতি খৃষ্টান ধর্ম্ম সমর্থকগণের (Apologetics) বিশেষ Revelation.

নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না

নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে নাস্তিক্যবাদাদির উৎপত্তি

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—ইউরোপ—

বাদ, মধ্যবর্ত্তিবাদ ও অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ ; এবং প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান মণ্ডলীর মধ্যে Tractarian, Ritualistic ও High Church Movementএর উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল Movementএর এক মাত্র উদ্দেশ্য প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসমাজকে বাহ্য ক্রিয়া কলাপ, আচার অনুষ্ঠানে রোমান কাথলিক ধর্ম্মসমাজের অনুরূপ করা। কিন্তু কার্ডিন্যাল নিউম্যান্ অবশেষে ইহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়া এই উনবিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য ইউরোপ দেশে রোমান কাথলিক ধর্ম্মসমাজের প্রাধান্য—পোপের একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য কার্ডিন্যাল্ নিউম্যান্ একজন নির্গুণ ব্রহ্মবাদী।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—
—ভারতবর্ষ—

প্রাচীন ভারতেও দেখ, আদি উপনিষদ সমূহের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে এক দিকে যেমন বৌদ্ধগণের নাস্তিক্যবাদ, ক্ষণিক-চৈতন্যবাদ ও শূন্যবাদ এবং সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদের সৃষ্টি হইল ; তেমনি অন্যদিকে প্রথমে বৌদ্ধগণের মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা—মহাপুরুষ পূজা, এবং অবশেষে হিন্দুগণের মধ্যে দেব দেবী পূজা, অসার ক্রিয়াকলাপপূর্ণ বাহ্য পূজার উৎপত্তি হইল। এপর্য্যন্ত নির্গুণ ব্রহ্মবাদের যে কয়েকটী সন্তান সন্ততির উল্লেখ করা গেল, তাহারা সকলেই জ্ঞান বিঘাতক। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবাদে ধর্ম্মের অপর দুইটী অঙ্গ—ভক্তি ও কর্ম্মেরও কি চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে? তাহাও নহে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নাই—পূজা নাই, সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মবাদে ভক্তির দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? ভক্তি সর্ব্বদাই সগুণ ও সাকারমুখী ; সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মে ভক্তির চরিতার্থতা একেবারেই অসম্ভব। নির্গুণ ব্রহ্মবাদ কর্ম্মেরও চিরবিরোধী। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বযুগেই নির্গুণ ব্রহ্মবাদী কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী। সেবাধর্ম্ম—গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্ম তাহার পক্ষে বন্ধন স্বরূপ। শঙ্করের দশ নামী সন্ন্যাসী এবং মধ্য যুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীগণ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তবেই দেখা যাইতেছে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ জ্ঞানবিঘাতক, ভক্তি-বিঘাতক, কর্ম্ম-বিঘাতক—উহা কখনও ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না।

নির্গুণ ব্রহ্মবাদ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম বিঘাতক

সর্ব্বদেশে নির্গুণব্রহ্ম হইতে গতি সগুণ ব্রহ্মের দিকে

এ জন্যই সর্ব্বদেশের ব্রহ্মবিদ্যার ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে যেমন এক দিকে নাস্তিক্যবাদাদি এবং পৌত্তলিকতাদির স্রোত প্রবাহিত

হইতে থাকে, তেমনি সেখান হইতে আর একটী প্রবলতর বিপরীত স্রোত বাহির হয়, যাহার গতি সগুণ ব্রহ্মের দিকে। ইহুদাজাতির মধ্যে ফ্যারিসী-গণের বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ডের সহিত যেমন স্যাডুসীগণের সন্দেহবাদ ও ইসিনীস্গণের জ্ঞান-মূলক সন্ন্যাস ধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন যীশুখৃষ্ট সর্ব্বপ্রথমে ইহুদা জাতির মধ্যে সগুণব্রহ্মমূলক ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন। খৃষ্টের ভক্তিধর্ম্ম আসিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া ইউরোপ খণ্ডে প্রবেশ করিলে গ্রীস ও আলেক্জাণ্ড্রিয়ার দার্শনিক চিন্তার সহিত উহার সাক্ষাৎ হয়। গ্রীসদেশে তৎকালে ইপিকিউরিয়ান্দের ভোগবাদের প্রতিকূলে ষ্টোইক ও স্কেপ্টিক্-গণের শুদ্ধ-অন্তর-চৈতন্যবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং আলেকজাণ্ড্রি-য়ার নিওপ্লেটনিষ্ট্গণ নির্গুণব্রহ্মবাদ প্রচার করিতেছিলেন। যীশু অনুচর যোহন Logos অর্থাৎ শব্দব্রহ্মবাদে আলেক্জাণ্ড্রিয়ার দার্শনিক চিন্তার সহিত খৃষ্টের ভক্তিধর্ম্মের একটী সমন্বয় স্থাপন করেন। যোহনের এই Logos—শব্দব্রহ্মই সগুণব্রহ্ম। ইউরোপের এই সগুণব্রহ্মবাদ মধ্যযুগে সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাধান্যের সময়েও অবতারবাদের আকারে বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে প্রোটেষ্টাণ্ট্ খৃষ্টানগণের মধ্যে গার্হস্থ্য ও সমাজ ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইতে বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করে। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্দেহবাদ,নাস্তিক্যবাদও শূন্যবাদের প্রতিকূলে ক্যাণ্ট্,হার্ডার,সেলিঙ্গ্ প্রভৃতি জর্ম্মান্ দার্শনিক পণ্ডিতগণের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যাত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আমরা হিগেলের দর্শনে তাহারই চরমোৎকর্ষ দেখিতেছি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—পেলেষ্টাইন ও ইউরোপ

প্রাচীন ভারতেও বেদের কর্ম্মকাণ্ড, চার্ব্বাকগণের জড়বাদ ও নাস্তিক্য-বাদ, আদি উপনিষদসমূহের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, ইহা-দের মধ্যে যখন ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখনই পরবর্ত্তী উপনিষদসমূহে সগুণব্রহ্মবাদ দেখা দিল। উপনিষদের এই সগুণব্রহ্মবাদ বাদরায়ণ ব্যাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বৃত্তিকার বোধায়নের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া, পাতঞ্জলের ঈশ্বরবাদ, মহাভারত ও রামায়ণের অবতার-বাদের মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, অবশেষে গীতার সগুণব্রহ্মে, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের মহাসমন্বয়ে পরিণত হয়। তৎপরে মধ্যযুগে শঙ্কর শুদ্ধা-দ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচার করিলে, রামানুজ, বল্লভ প্রভৃতি ভক্তিবাদী বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শঙ্করের প্রতিকূলে সগুণব্রহ্মবাদের পুনরুদ্ধার সাধন

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—ভারতবর্ষ

করেন। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের এই সগুণব্রহ্মবাদই ভাগবতের ভক্তিবাদের মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া, পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে আসিয়া, সগুণব্রহ্মবাদমূলক অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতার আকার ধারণ করে। সগুণব্রহ্মবাদকে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখন কেবল উহাকে পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদ হইতে মুক্ত ও পরিষ্কৃত করা অবশিষ্ট ছিল। আমাদের এই নবযুগের রাজা, রামমোহন ঠিক সেই কার্য্যটাই নিজ হস্তে লইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া, সগুণ ব্রহ্মবাদকে এক অক্ষয় ভিত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেও আমরা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ হইতে সগুণব্রহ্মবাদে গিয়া উপনীত হই। যাহার অভাব দেখিয়া ধর্ম্ম নির্গুণব্রহ্ম হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, সগুণব্রহ্মে আসিয়া সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। সগুণ ব্রহ্মে ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে; এজন্যই ধর্ম্ম চিরকাল সগুণব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে চাহে। সগুণব্রহ্মবাদের বিশিষ্ট ও অদ্বৈতের,

যুক্তিতেও নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে গতি সগুণব্রহ্মে

সাকার ও নিরাকারের, সগুণ ও নির্গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে জ্ঞানের সমস্ত বিরোধ ভঞ্জন হয়—সমস্ত সন্দেহ ছেদ হয়। সগুণব্রহ্মবাদ জ্ঞানের সমক্ষে এক অনন্ত রাজ্য খুলিয়া দেয়। বিশিষ্ট যতই জ্ঞাত ও আয়ত্তীকৃত হইতে থাকে, অদ্বৈতের ধারণা ততই গভীর হইতে গভীরতর হয়; আবার অদ্বৈতের স্ফুটতর জ্ঞান হইতে বিশিষ্টের জ্ঞান আরও পরিপুষ্টি লাভ করে। এইরূপে সগুণ ব্রহ্মবাদে জ্ঞান পরম তৃপ্তি, পরম শান্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।

সগুণব্রহ্মে জ্ঞানের তৃপ্তি

ভক্তি ও সগুণব্রহ্মে অনন্ত সম্ভোগের বস্তু প্রাপ্ত হয়। যিনি পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, সগুণব্রহ্মবাদী সৃষ্টির সর্ব্বত্রই সেই প্রিয়তম ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতে পান। "সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ" তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে,— তিনি উত্তরে। সৃষ্টি যতদূর প্রসারিত, সগুণব্রহ্মবাদীর প্রেম ভক্তিও ততদূর প্রসারিত। ঐ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় জড়প্রকৃতিতে, ঐ জ্ঞান-প্রেম ও পুণ্যমণ্ডিত মানবপ্রকৃতিতে যাহা কিছু মাহাত্ম্য, যাহা কিছু সৌন্দর্য্য

সগুণ ব্রহ্মে ভক্তির তৃপ্তি

ও মাধুর্য্য আছে সে সমস্তই সগুণব্রহ্মবাদীর সম্ভোগের বিষয়—ভক্তির বিষয়—প্রেমের বিষয়। সগুণ ব্রহ্মবাদীর, "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা, কৃষ্ণ স্ফুরে"; সুতরাং সকল দেহই তাঁহার দেবমন্দির এবং সকল আত্মাই তাঁহার বিগ্রহ।

সগুণ ব্রহ্মে কর্ম্মের তৃপ্তি

কর্ম্মের পূর্ণ সাফল্যও সগুণব্রহ্মে। সগুণব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম জীবন্ত ও জাগ্রত। তিনি অনন্ত ক্রিয়াশীল, অনন্ত লীলাময় ভগবান্। এই জড়জগতের বিবর্ত্তন, এই চেতন জগতের—মানবসমাজের বিবর্ত্তন এ সমস্তই সেই লীলাময়ের লীলা। এই বিচিত্র বিবর্ত্তনের মধ্যে সগুণ ব্রহ্মবাদী এক মহতী জীবলীলা দেখিতে পান। সেই মহতী জীবলীলা এক পরমমাহাত্ম্যময় অত্যুজ্জ্বল মহাপরিণামের দিকে ছুটিয়াছে—"One great event towards which all creation tends". যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সুকৃতিবলে স্বীয় আত্মায় সেই মহাপরিণামের পূর্ব্বাভাস পাইয়াছে, সে কি আর নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? ঐ দেখ সে তাহার সুখ দুঃখকে পদদলিত করিয়া, ফলাফলচিন্তাবর্জ্জিত হইয়া, সিদ্ধি অসিদ্ধির ভার সেই লীলাময়ের হস্তে রাখিয়া, নিষ্কাম পরাক্রমে বুক বান্ধিয়া, লীলাক্ষেত্রে নামিয়াছে; জীবলীলার চরম সাফল্য লাভের জন্য সে তাহার শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু পাত করিবে। কিন্তু কেবল জ্ঞানও

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সগুণ ব্রহ্মে—সগুণ ব্রহ্ম ধর্ম্মের চির অবলম্বন

ধর্ম্ম নহে, আবার কেবল ভক্তি কিম্বা কর্ম্মও ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম এ তিনের সমন্বয়—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়। এখন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিলে, আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যে সগুণ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোথায়ও এ সমন্বয় সম্ভব নহে; এ জন্যই সগুণব্রহ্ম ধর্ম্মের চির আশ্রয়—চির অবলম্বন।

জ্ঞানের স্বরূপ—

জ্ঞানের স্বরূপ কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জ্ঞান তত্ত্বার্থী। এই অনিত্যের মধ্যে যাহা নিত্য, এই জড়ের মধ্যে যাহা চেতন, এই ব্যষ্টির মধ্যে যাহা সমষ্টি, এই বিশিষ্টের মধ্যে যাহা অদ্বৈত, এই বাহিরের যাহা অন্তর, তাহাই জ্ঞানের বিষয়—তাহাই জ্ঞানের লক্ষ্য। সুতরাং জ্ঞান অন্তর্মুখি—নিরাকার ও নির্গুণমুখী। কিন্তু কর্ম্ম বহির্মুখি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের

কর্ম্মের স্বরূপ—

অশেষ ও নিয়তবর্দ্ধনশীল অভাব পূরণই কর্ম্ম। ব্যক্তিগত জীবনই হউক, আর সামাজিক জীবনই

হউক ; বাহিরের সহিত সংঘর্ষ হইতেই তাহার সমস্ত অভাবের উৎপত্তি হয়। আবার বাহির হইতে উপকরণ আহরণ করিয়াই সমস্ত অভাব পূরণ করিতে হয়। কর্ম্মের ক্রম এই :—প্রথমে অভাব বোধ, তারপর অভাব পূরণের সঙ্কল্প, তারপর বহির্জ্জগতে সেই সঙ্কল্পের প্রকাশ। তবেই দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম সর্ব্বদাই বহির্মুখি—সাকার ও সগুণমুখি। এখন এই অন্তর্মুখি,—

জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় সগুণব্রহ্মে

নিরাকার ও নির্গুণমুখি জ্ঞানের সহিত, এই বহির্মুখি,—সাকার ও সগুণমুখি কর্ম্মের সমন্বয় কোথায় হইবে? যেখানে অন্তর ও বাহির—সাকার ও নিরাকার—সগুণ ও নির্গুণ এক হইয়া গিয়াছে সেই সগুণ ব্রহ্মে।

ভক্তি আবার দেখ ভজনার্থিনী—পূজার্থিনী। এ পূজা বাহ্য পূজা নহে—

ভক্তির স্বরূপ—

হৃদয়ের পূজা। হৃদয়ে যত ভাব আছে, ভক্তি তত ভাবে পূজা করিতে চাহে,—দাস্যভাবে, সখ্য-ভাবে, বাৎসল্যভাবে ও মধুরভাবে পূজা করিতে চাহে। কিন্তু জন্ম-মরণ-শীল এই আমার প্রভু, সখা, পুত্র, কন্যা, পতি বা পত্নীতে সেই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ প্রকাশিত না হইলে, এই সকল মূর্ত্তিতে তিনি মূর্ত্তিমান না হইলে, কিরূপে ইহারা ভক্তির বিগ্রহ হইবেন? তবেই দেখ,

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সগুণব্রহ্মে

ভক্তিও চায় সগুণব্রহ্ম,—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় সগুণব্রহ্মে। এ অতি আশ্চর্য্য সমন্বয়। এ সমন্বয়ে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, তিনই তিনের সহায় হয়,—

আশ্চর্য্য সমন্বয়—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম তিনই তিনের সহায়

তিনই তিনকে তৃপ্ত করে, উজ্জ্বল করে, গভীর করে। বিশিষ্টের মধ্যে জ্ঞান যে অদ্বৈতকে দেখিতে পায়, ভক্তি গিয়া প্রিয়তম বলিয়া তাঁহাকেই গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে; এবং এই নিগূঢ় ভক্তিযোগ হইতে জ্ঞানচক্ষু আরও উজ্জ্বল হয়। এদিকে সেই বিশ্বেশ্বরের দর্শনে কর্ম্মেরও সমস্ত অন্ধতা, সমস্ত মলিনতা ঘুচিয়া যায়। এতদিন কর্ম্ম ছিল অর্থহীন মলিন সকাম কর্ম্ম; এখন সে তাহার স্বরূপ দেখিতে পাইল। এখন দেখিল, জীব সেই লীলাময় বিশ্বেশ্বরের দাসরূপে তাঁহারই লীলাক্ষেত্রে নিরন্তর খাটিতেছে। তাহার সুখ নাই, দুঃখ নাই; জয় নাই, পরাজয় নাই; সিদ্ধি নাই, অসিদ্ধি নাই; সকল কর্ম্মই সেই মহাপ্রভুর দাসত্ব। ভক্তি আসিয়া এ দাসত্বকে মধুময় করিয়া তুলিল। সে বলিল,

"একি আবার দাসত্ব? এ যে আমার প্রিয়তমের সেবা।" কি অপূর্ব্ব সমন্বয়!

ব্রহ্মবিদ্যার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে যুগে যুগে এই সমন্বয় সাধিত হইতেছে। মুসার কর্ম্ম কাণ্ড, গ্রীস ও আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার দার্শনিক-গণের জ্ঞানকাণ্ড, এবং যিশুখৃষ্টের ভক্তিকাণ্ড, এ তিনের সমন্বয় হইল যোহনের Logos,—অর্থাৎ শব্দব্রহ্মে। যোহনের এই Logosবাদ কাল-ক্রমে অবতারবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রাধান্যের পর ইউরোপ দেশে হিগেল দর্শনের সগুণ ব্রহ্মবাদে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের এক শ্রেষ্ঠতর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। এ সমন্বয়ে সগুণব্রহ্ম অবতারবাদাদি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছেন এবং ইহাতে সংসারা-শ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—ইউরোপ

ভারতবর্ষেও আমরা ঠিক এইরূপ বিবর্ত্তন দেখিতে পাই। বেদের কর্ম্মকাণ্ড, বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াই গীতার সগুণ ব্রহ্মবাদ-মূলক মহা-সমন্বয়ে পরিণত হইল। তাহার পর ভারতবর্ষেও মধ্যযুগে সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে; এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের একটী নব সমন্বয় আবশ্যক হইয়া উঠে। রামানুজ, বল্লভ প্রভৃতি ভক্তিবাদী বৈষ্ণব আচার্য্যগণের বেদান্তভাষ্যে এই সমন্বয় আরম্ভ হয়; এবং পুরাণ, তন্ত্র ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে আসিয়া উহা পূর্ণতা লাভ করে। পৌরাণিক যুগের এই সমন্বয়েও সগুণব্রহ্ম ও সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত সগুণব্রহ্ম অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতাদি দোষে জড়িত। এজন্যই রাজা রামমোহন ঐ সকল শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শঙ্ক-রের বেদান্তভাষ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; এবং শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া চিরকালের জন্য নিরাকার ও সাকার, জ্ঞান ও কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও সংসারের বিরোধ ভঞ্জন করেন। সত্য বটে, পুরাণ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের অবতারবাদ, এবং বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণলীলার ব্যভিচারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া রাজা পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রতি, বিশেষতঃ বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত ভক্তিধর্ম্মের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই; তথাপি একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, রাজা ভারতীয় সগুণ ব্রহ্মবাদকে অবতারবাদ ও

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত—ভারতবর্ষ

পৌত্তলিকতা হইতে মুক্ত করিয়া, উহার শেষ নির্ম্মলতা সাধন করিয়াছেন; এবং জ্ঞান,ভক্তি ও কর্ম্মের এক উজ্জ্বলতর সমন্বয়ের পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাজা ও হিগেল

রাজা একজন মহাকর্ম্মী ও সংস্কারক ছিলেন। এজন্য তিনি হিগেলের ন্যায় কোন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রণালীবদ্ধ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া যান নাই; তথাপি ইউরোপের জন্য হিগেল যাহা করিয়াছেন, ভারতের জন্য রাজা ঠিক তাহাই করিয়াছেন। হিগেল ও রাজা উভয়েরই সমন্বয়ে সগুণ ব্রহ্মবাদ অবতারবাদ হইতে চিরমুক্ত হইয়াছে এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম চিরকালের জন্য নিরাকৃত ও সংসারাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মানবজাতির আদিম অবস্থা—প্রাকৃতিক

মানবচিত্তে ঈশ্বরের ভাব কিরূপে প্রথমে উদিত ও বিকশিত হইল তাহা বুঝিতে হইলে, মনুষ্যকে তাহার আদিম অবস্থার মধ্যে গিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে একটী সর্ব্ববাদী সম্মত মত এই যে, মনুষ্য সামাজিক জীব। দলবদ্ধ—গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া জীবন ধারণ করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। বর্ত্তমান কালে আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা খণ্ডে যে সকল অসভ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই ক্ষুদ্র বৃহৎ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করে। পুরাকালে মানব জাতিও এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তখন আমাদের এই পৃথিবী এমন "সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা" ছিল না। তখন উহা কণ্টকময় ঘোরারণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত উত্তাপ, দাবাগ্নি ও বজ্র, ঝঞ্ঝাবাত ও শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বর্ব্বরগোষ্ঠী সকলকে বনে বনে বিচরণ করিতে হইত। কিন্তু বর্ব্বর মনুষ্যের এই সকল প্রাণঘাতিনী প্রাকৃতিক শক্তি অপেক্ষাও প্রবলতর ও ভীষণতর শত্রু ছিল। বনের অগণ্য হিংস্রজন্তু এবং স্বজাতীয় অসংখ্য বর্ব্বরের সহিত তাহাকে নিরন্তর প্রাণান্তকর সংগ্রাম করিতে হইত। বাহ্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম, হিংস্র জন্তুর সহিত সংগ্রাম, স্বজাতীয় শত্রুর সহিত সংগ্রাম, বর্ব্বর মনুষ্য কি নিঃসহায়! এই ঘোরতর জীবন সংগ্রামে যে তাহার সহায় হয়,—যে

বর্ব্বর কর্ত্তৃক হিতকর, ভয়ঙ্কর ও সুন্দর বস্তুর পূজা

তাহার জীবন রক্ষা করে,বর্ব্বর সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাহাকে আশ্রয় করে,—তাহারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহারই তুষ্টিসাধনে যত্নবান হয়;—

তাহাকেই পূজা করিতে আরম্ভ করে। বর্ব্বর যেমন নিঃসহায়. তেমনি সে ভীরু। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ন্যায় দুর্দ্দান্ত বর্ব্বরও অত্যন্ত ভীরু। এজন্য পৃথিবীতে যাহা কিছু ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়োদ্দীপক বর্ব্বর তাহারই নিকট জানু অবনত করে,—পূজাদি দ্বারা তাহারই তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বর্ব্বর প্রকৃতিও সম্পূর্ণরূপে সৌন্দর্য্য-বোধ-বিরহিত নহে। এজন্য সুন্দর বস্তু সকলও তাহার চিত্তকে মুগ্ধ করে এবং তাহার নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু, মেঘ ও সূর্য্যের ন্যায় মনুষ্যজীবনের পক্ষে হিতকর বস্তু আর কি আছে? দাবাগ্নি ও মেঘগর্জ্জন, বজ্রপাত ও ঝঞ্ঝাবাত কাহার হৃদয়কে কম্পিত না করে? বিচিত্রবর্ণ মুক্তাকাশ ও নির্ম্মল-কান্তি উষার শোভায় কাহার চিত্ত মুগ্ধ না হয়? বর্ব্বরের চিত্তে অহং ও ইদংএর

বাহ্যপ্রকৃতিতে বর্ব্বরের দেবলীলা দর্শন—

স্বরূপ-জ্ঞান আবার এত অস্ফুট যে প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুকেই সে ঠিক আপনার ন্যায় জীবন্ত ও শক্তিমন্ত বলিয়া মনে করে,—তাহার সামাজিক জীবনের সমস্ত অভিনয় সে বাহ্য প্রকৃতিতে দর্শন করে। অগ্নি যেন এই তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার শিকারলব্ধ মাংসখণ্ডকে দগ্ধ ও আহারোপযোগী করিয়া দিল, অথবা তাহার শত্রুর বিনাশ সাধন করিয়া, তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার যেন ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ দাবাগ্নিরূপে তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল। মেঘ যেন এই বারি বর্ষণ করিয়া পরম বন্ধুর ন্যায় তাহার শস্যক্ষেত্র সিক্ত করিয়া দিল, কিন্তু এই আবার যেন ঘোর গর্জ্জন করিয়া তাহার মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। বাহ্য প্রকৃতিতে বর্ব্বর নিরন্তর এই দেবলীলা দর্শন করে; এবং ভয়ে কম্পিত ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া করযোড়ে দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করে। কিন্তু বাহ্যপ্রকৃতি অপেক্ষা

মানবজাতির আদিম অবস্থা—সামাজিক

স্বীয় গোষ্ঠীর সহিত বর্ব্বরের জীবন অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। গোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামের সহিত তাহার জীবন-সংগ্রাম একীভূত,—গোষ্ঠীর জয়ে তাহার জয়, গোষ্ঠীর পরাজয়ে তাহার মৃত্যু,—গোষ্ঠীর বৃহত্তর জীবনের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র জীবন নিমজ্জিত। এজন্য গোষ্ঠীজীবনে নিরন্তর যে ভীষণ অভিনয় হয়, বর্ব্বরের চিত্তের উপর তাহার প্রভাব অতুল। এ অভিনয়ের প্রধান নায়ক গোষ্ঠীপতি। তাহারই ইঙ্গিতে বর্ব্বরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হয়; তাহারই দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে শত্রুদল ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহারা স্ত্রী ও ধনাদি লাভ করে। কত

সময় তাহারই বাহুবলে গোষ্ঠীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে। কিন্তু গোষ্ঠীপতি যে কেবল বাহিরের শত্রু বিনাশ করেন তাহা নহে; নানাপ্রকার বিধি ব্যবস্থাদি স্থাপন করিয়া তিনি গোষ্ঠীকে আভ্যন্তরীণ বিপদ হইতেও মুক্ত রাখেন। এজন্যই বর্ব্বর রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা ও নিয়ন্তা জানিয়া গোষ্ঠীপতির চরণাশ্রয় করে,—সর্ব্ব বিষয়ে তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে, সর্ব্ববিষয়ে তাহার তুষ্টিসাধন করিতে সচেষ্ট হয়। জীবনে যিনি এমন সহায়, আশ্রয় ও অবলম্বন, মৃত্যু হইলে তাহার প্রেতাত্মার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা,—পূজাদি দ্বারা তাহার প্রেতাত্মার প্রীতিবর্দ্ধন করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এইরূপে বর্ব্বরগণের মধ্যে পিতৃপুরুষগণের—বীর ও ব্যবস্থাপকগণের প্রেতাত্মারা দেবত্বলাভ করে।

বর্ব্বর কর্ত্তৃক বীর ও ব্যবস্থাপকগণের প্রেতাত্মার পূজা

কিন্তু বর্ব্বরতার অতি আদিম অবস্থায় এমন অনেক বর্ব্বরগোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মধ্যে গোষ্ঠীপতি নাই,—দেবতারূপে গোষ্ঠীপতি কিম্বা গোষ্ঠীপতির প্রেতাত্মার পূজাও নাই। ঐ সকল গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও প্রকার উচ্চ নীচ ভেদ আরম্ভ হয় নাই; উহাদের মধ্যে সকলেই সমান। রং বিশেষের দ্বারা শরীর চিত্রিত করা, কিম্বা শরীরে অন্য কোন প্রকার বাহ্যচিহ্ন ধারণ করা, এইরূপ দুই একটী অতি সামান্য নিয়ম পালনই ঐ সকল গোষ্ঠীর একমাত্র বন্ধন। কিন্তু নিয়মগুলি অতি সামান্য হইলেও ঐ সকল গোষ্ঠীর বর্ব্বরেরা ধর্ম্মবুদ্ধিতে উহাদিগকে পালন করে, এবং এই সকল নিয়মের অথবা অনেকজন স্থাপয়িতা ছিলেন এইরূপ বিশ্বাস করে। এই অনির্দ্দেশ্য নিয়ন্তাই ঐ সকল গোষ্ঠীর ঈশ্বর স্থানীয়।

মানবজাতির অতি আদিম অবস্থা ও অনির্দ্দেশ্য নিয়ন্তায় ঈশ্বরবোধ—

তবেই দেখ, প্রাকৃতিক শক্তিতে, কোন অনির্দ্দেশ্য নিয়ন্তাতে কিম্বা বীর ও ব্যবস্থাপকগণের প্রেতাত্মাতেই মনুষ্যের প্রথম ঈশ্বরবোধ জন্মে।

মনুষ্যের প্রথম ঈশ্বরবোধ—প্রাকৃতিক শক্তিতে, অনির্দ্দেশ্য নিয়ন্তাতে, বীর ও ব্যবস্থাপকগণের প্রেতাত্মাতে

প্রাচীন হিন্দুগণের ন্যায় যে সকল জাতিশান্তিপ্রিয়,—যাহারা রাজ্যচিন্তার অপেক্ষা সৃষ্টি বিষয়ক চিন্তায় ও সমাজ-বন্ধনের চেষ্টায় অধিক মনোভিনিবেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে

মোক্ষমূলর ও স্পেন্সারের একদেশদর্শিতা

প্রকৃতি পূজার প্রাধান্য লক্ষিত হইলেও, প্রেতাত্মার পূজা বিরল নহে। আবার ইউরোপের প্রাচীন সমরপ্রিয় জাতিগণের ধর্ম্মে বীরপুরুষদের প্রেতাত্মার পূজা প্রধান অঙ্গ হইলেও, তাহাতে প্রকৃতি পূজার অভাব নাই। সুতরাং মোক্ষমুলরের ন্যায় যে সকল পণ্ডিত কেবলমাত্র প্রকৃতি পূজা হইতে, এবং স্পেন্সারের ন্যায় যে সকল পণ্ডিত কেবলমাত্র প্রেতাত্মার পূজা হইতেই ঈশ্বর-জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ কল্পনা করেন, তাঁহাদের উভয় দলের মতই একদেশদর্শি ও ভ্রান্ত। মানব-চিত্তের উপর প্রকৃতি (Natural medium) অপেক্ষা সমাজের (Social medium) প্রভাব অধিক। মোক্ষমুলর সমাজের (Social medium) এই প্রভাব অস্বীকার করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। স্পেন্সার আবার সমাজের প্রভাবের উপর জোর দিতে গিয়া প্রকৃতির প্রভাব এক প্রকার অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের প্রভাব স্বীকার করিয়াও স্পেন্সার আর একটী বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। স্পেন্সার বলেন, এক-মাত্র গোষ্ঠীপতির প্রেতাত্মার পূজা হইতেই মনুষ্যের ঈশ্বরজ্ঞান বিকশিত হয়। তাঁহার এই সঙ্কীর্ণ মত স্বীকার করিলে, গোষ্ঠীপতি-বিহীন, গোষ্ঠী পতির প্রেতাত্মার পূজা-বিহীন বর্ব্বরগোষ্ঠী সকলের ধর্ম্মজ্ঞানের কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

মোক্ষমুলরের একদেশ-দর্শিতাজনিত একটী ভ্রম

স্পেন্সারের একদেশ-দর্শিতাজনিত দুইটী ভ্রম

সভ্যতায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বর্ব্বরদিগকে কয়েকটী অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতে হয়ঃ—(১) বনকর্ত্তন ও পশুহননের অবস্থা, (২) পশুপালন ও পশুচারণের অবস্থা, (৩) ভূমিকর্ষণ ও শস্যোৎপাদনের অবস্থা। ঋগ্বেদ-সংহিতায় আর্য্যজাতির সহিত যখন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন আর্য্যেরা বনকর্ত্তন ও পশুচারণের অবস্থা অতিক্রম করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অবশ্য তখনও আর্য্যদের মধ্যে বনকর্ত্তন ও পশুচারণ বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ভূমিকর্ষণই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইতেছিল। এজন্য জল, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টি এবং সূর্য্য প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক বস্তু কৃষিকার্য্যের সহায় তাহাদের এবং তাহাদের আশ্রয়ীভূত আকাশের স্তুতিতে ঋগ্বেদ-

সভ্যতায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যকে যে কয়েকটী অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়

ঋগ্বেদের সময় আর্য্যদের প্রধান বৃত্তি ভূমিকর্ষণ

এজন্য মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতির স্তুতিতে ঋগ্বেদ-সংহিতা পরিপূর্ণ

সংহিতা পরিপূর্ণ। দাবাগ্নি, কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তরজাত অগ্নির পূজা বহুকাল পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। ঋগ্বেদ-সংহিতার সর্ব্বপ্রথম স্তোত্রেই বলা হইতেছে—"অগ্নি পূর্ব্বে ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন।" কোন কোন মন্ত্রে বনকর্ত্তনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এক স্থানে বলা হইতেছে—"হে পৃথিবী! বিস্তীর্ণা, কণ্টকরহিতা ও নিবাসভূতা হও।" অনেক স্থলে এইরূপ গোচারণেরও উল্লেখ আছে।

অগ্নিপূজা অনেক পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল

বনকর্ত্তনের নিদর্শন

কিন্তু কৃষিকার্য্যের সহায় বলিয়াই অধিকাংশ দেবতার পূজা। কোন ঋষি ইন্দ্রের (মেঘদেবতার) মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিতেছেন—"ইন্দ্র অহি (মেঘকে) হনন করেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বহনশীল পার্ব্বতীয় নদীর পথ খুলিয়া দেন।" সরস্বতীর (নদীদেবতার) সম্বন্ধে বলিতেছেন—"সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন," "গাভীরা জলপান করে," "আমরা জলে প্রবেশ করিতেছি।" অগ্নির সম্বন্ধে বলিতেছেন—"মনুষ্যের উপকারার্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ত্তমান অগ্নি কঠিন অন্নাদি নিজ শিখাদ্বারা পাক করেন, এবং তেজোদ্বারা স্থির দ্রব্য বিনষ্ট করেন।" মরুৎগণের (ঝড় দেবতার) সম্বন্ধে বলিতেছেন—"মরুৎগণ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মেঘ সঞ্চালন করেন।" বরুণের (আকাশদেবতার) সম্বন্ধে বলিতেছেন—"তিনি সূর্য্যের গমনের পথ খুলিয়া দিতেছেন, তিনি বায়ুর পথও দেখিতেছেন, বরুণের আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়।" দ্যুলোক ও ভূলোক সম্বন্ধে বলিতেছেন—"দ্যাবাপৃথিবী জলের দ্বারা আবৃতা, জলকে আশ্রয় করেন, তাহারা জল সংপৃক্তা, জলবর্ষয়িত্রী, বিস্তীর্ণা।" "মধুক্ষারয়িত্রী, মধুদুঘা, মধুব্রতা, দেবতাভূতা, এবং আমাদিগের যজ্ঞ, ধন, মহৎ যশ, অন্ন ও সুবীর্য্য দানকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে মধু দ্বারা সিক্ত করুন।" "পিতা দ্যুলোক ও মাতা পৃথিবী আমাদিগকে অন্নদান করুন।"

কৃষিকার্য্যের সহায় বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা

কিন্তু আর্য্যেরা এই সকল পদার্থকে কেবল যে হিতকর বলিয়াই পূজা করিতেন তাহা নহে। সূর্য্য উদিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ঘোর অন্ধকার বিনাশ করিতেছে; প্রচণ্ড দাবাগ্নি ও ভীষণ বাত্যা

ভয়ঙ্কর বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা ও তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা

পৃথিবীতে ধ্বংস বিস্তার করিতেছে; মহাভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি ভূলোক ও দ্যুলোককে কম্পিত করিতেছে; বাহ্য জগতে নিরন্তর এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখিয়া আর্য্যেরা ভীত ও স্তম্ভিত হইতেন, এবং অনার্য্যদের সহিত সংগ্রামে অগ্নি, মরুৎ, ইন্দ্র প্রভৃতি রুদ্রতেজা দেবতাগণের অনুগ্রহ ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতেন। অগ্নিকে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—"অগ্নির দীপ্তি সকলের নাশ নাই, সুদর্শন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সকল সর্ব্বতঃ দ্যোতমান ও বিলক্ষণ বলশালী। নৈশ অন্ধকার নষ্ট করিয়া সর্ব্বদা জাগরূক ও জরারহিত অগ্নি-শিখাগণ কখনও কম্পিত হয় না"। "যেমন বায়ুর শব্দ, প্রবল রাজার সেনা, এবং দ্যুলোকোৎপন্ন অশনি কেহ নিবারণ করিতে পারে না; সেইরূপ যে অগ্নিকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না, সেই অগ্নি যোধদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণীভূত দন্তদ্বারা শত্রুদিগকে ভক্ষণ করেন ও বিনাশ করেন এবং বন সকলকে দহন করেন।" "হে অগ্নি! আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহে বিরত না হইয়া সর্ব্বদা অবহিত মঙ্গলকর ও সুখকর আশ্রয় প্রদান দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।" ইন্দ্রকে বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুক্ষয়কারক বৃষ্টিপূর্ণ ত্বকরূপ মেঘকে ভেদ করিয়া জল সেচন কর; এবং সর্পের ন্যায় গমনশীল মেঘকে ধরিয়া বৃষ্টিশূন্য করিয়া ছাড়িয়া দাও।" "আমাদিগের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি; ইন্দ্র আমাদিগের সখা, সর্ব্বযজ্ঞগামী, শত্রুদিগের অবিভবকারী, এবং আমাদিগের সহায়ভূত; তিনি যজ্ঞ-বিঘ্নকারীদিগের পরাভব করেন; এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত হন। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পালনার্থ (কর্ম্ম) রক্ষা কর। সংগ্রামে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না; তুমিই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ কর।" "ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে দৃঢ়রূপে বজ্রধারণ করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য, উহা তীক্ষ্ণ হইলেও, (মন্ত্র-সংস্কার দ্বারা) জলকে যেমন তীক্ষ্ণ করে, সেইরূপ আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন, বৃত্রকে নাশ করিবার জন্য আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন। হে ইন্দ্র! বৃক্ষচ্ছেদক যেরূপ বনবৃক্ষকে (ছেদন করে) সেইরূপ তুমি আপন শক্তি, তেজ ও শরীর বলে বর্দ্ধিত হইয়া (আমাদের শত্রুদিগকে) ছেদন করিতেছ, যেন পরশু দ্বারা ছেদন করিতেছ।" • "হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! (বিরোধী) মনুষ্যেরা যেন আমাদের শরীরে আঘাত না করে; তুমি ক্ষমতাশালী, আমাদের বধ নিবারণ কর।" ঋগ্বেদের ঋষিরা যে সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, সমস্ত ঋগ্বেদই তাহার সাক্ষী। ঋগ্বেদের কবিত্ব মনকে মুগ্ধ ও হৃদয়কে উন্মত্ত করে। উষা-দেবী কবিকল্পনার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। (ক্রমশঃ)

ঋগ্বেদের ঋষিরা সৌন্দর্য্যের উপাসক, সুন্দর বলিয়া উষাদির পূজা

আয়ুর্ব্বেদ—ব্রধ্ন ও বিউবনিক প্লেগ্। (১)

চলতী মারী, মৃদুমারী ও মহামারী এই তিন আকারে মারী আত্ম প্রকাশ করে। কলিকাতা মেডিক্যালবোর্ড চল্‌তীমারীর মারীত্ব স্বীকার করিতে তত রাজি নহেন। ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। বাহ্য লক্ষণ পদে পদে আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে চাহে। একটু উর্দ্ধে উঠিয়া বঙ্গীয়সমালোচক, মৃদু বম্বেমারীর অল্প আক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যা দর্শনে বিস্মিতচিত্তে বলিলেন—"একি তোমার মারী!" ইহাতেও আমরা বিস্মিত হই না। কোন নবাগত মধ্যপ্রদেশবাসী আলিপুর প্রাণিশালার ভীমকায় শার্দ্দূলের সম্মুখস্থ লৌহশলাকাসংরক্ষিত জানালার অনেক দূরে সুদৃঢ়রেইলিংএ আবেশে অঙ্গ রাখিয়া হত ও আহতের সংখ্যা শুনিয়া লঘুদৃষ্টি প্রসারিত করিতে করিতে বলিতে পারেন, "একি তোমার বাঘ!" কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন আরও একগ্রাম উপরে উঠিয়া শাসন-কর্ত্তাদিগকে জানাইলেন ও জনসাধারণের নিকটে ঘোষণা করিলেন—এখন যাহাকে লোকে বলিতেছে বিউবনিক প্লেগ্, খ্রীষ্টীয় শকের শত শত বৎসর পূর্ব্বে কোন না কোন আকারে প্রাচীন আর্য্যদিগের নিকটে, সে ব্রধ্ন নামে পরিচিত ছিল; এ ব্যাধি বিশেষ বিপজ্জনক নহে। বিজয় বাবু চিকিৎসা ব্যবসায়ে খ্যাতিমান্, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার "বাগ্‌ভট্ট" সংস্করণে, মুদ্রণে ও দর্শনে ভারতে অতুল। তিনি সর্ব্ব প্রকার মারী—চল্‌তী মারী, মৃদুমারী, মহামারী—উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন,

(১) এটি দাসীর জন্য লিখিত মারী নামক প্রবন্ধের মধ্যভাগ। নানা কারণে মধ্য ভাগই প্রথমে প্রকাশ করিতে হইল। সুতরাং অস্পষ্টতা দোষ কিছু অধিক পরিমাণে ঘটিবার সম্ভাবনা; আশা করি পাঠকগণ সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মারীর আলোচনায় জন সাধারণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দাসী শুশ্রূষাকারিণী; তিনি উদাসীন থাকিতে পারেন না।

যাঁহারা সংস্কৃত বচন চাহেন, পাদটীকা তাঁহাদিগের জন্য। সেজন্য সংস্কৃত বাক্যের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল না। প্রবন্ধের সঙ্গে পাদটীকা পড়িবার প্রয়োজন নাই।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলের রচনা কাল এখন পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। তদ্বিষয়ক আলোচনায় পাঠক মহাশয়দিগকে সত্যানুসন্ধানের অনুরোধে একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমান লেখক বিগত ৩ই নবেম্বর কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের মত আলোচনা করিয়া, রিস্‌লি সাহেবকে যে পত্র লিখেন উপস্থিত প্রবন্ধাংশ তাহারই রূপান্তর মাত্র।

বিস্ময়ের কথা বটে। সুতরাং মারী বিষয়ক প্রবন্ধে বিজয় বাবুর মতের সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক।

বিজয় বাবু তিনটী সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন :—(১) বিউবনিক প্লেগ্ ব্রধ্ন ; (২) ব্রধ্ন নামে এই প্লেগ খ্রীষ্টীয় শকের শত শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বর্ত্তমান ছিল ; (৩) বিউবনিক প্লেগ বিশেষ বিপজ্জনক নহে। বিজয় বাবু তাঁহার সিদ্ধান্ত তিনটি প্রতিপাদন করিবার জন্য একটী মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে বচন কোন্ গ্রন্থের, তাহার রচয়িতা কে—মূলই বা কি, বলেন নাই। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিজয় বাবুর সিদ্ধান্তত্রয় কতদূর সমর্থন করে, আমরা অনুসন্ধান করিব। অনুসন্ধানপথে বিজয় বাবুর প্রামাণ্য-বচন গোপনবাস হইতে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারে।

অনুসন্ধানের সুবিধার্থে আমরা প্রথমে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটী গ্রহণ করিব—"বিউবনিক প্লেগ খ্রীষ্টের শত শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রধ্ন নামে এদেশে বর্ত্তমান ছিল।" বিউবনিকপ্লেগ্ থাকুক্, ব্রধ্নব্যাধিটাও থাকুক, প্রথমে দেখিতে হইবে সেই প্রাচীনকালে লোকে ব্রধ্নশব্দে রোগই বুঝিত কি না। দেখিবার উপায় কি? উপায় প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয়গ্রন্থ সকল।

প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলের মধ্যে চরক প্রাচীনতম। আর সকল গ্রন্থ তাহার পরবর্ত্তী। চরকে আয়ুর্ব্বেদ উৎপত্তির যে ইতিহাস আছে তাহাতে দেখি, শুধু প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে নহে, প্রচলিত অপ্রচলিত সকল গ্রন্থের মধ্যে চরক প্রথম। কেন না চরকসংহিতাপ্রণেতা অগ্নিবেশই প্রথম আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থপ্রণেতা। (২) অগ্নিবেশের সতীর্থ ভেলাদি অগ্নিবেশের পরে গ্রন্থ রচনা করেন। (৩) বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রমাণে স্থিরীকৃত হয়, এই আদিগ্রন্থ খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন চারি শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে, হারূণ ও মান-সুরের সময়ে, আরবগণ চরক, সুশ্রুত ও নিদান আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করেন। নিদান সংগ্রহ গ্রন্থ। বাগ্ভটের অনেক শ্লোক ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। (৪)

---

(২) "তন্ত্রপ্রণেতা প্রথমমগ্নিবেশো যতোঽভবৎ"। চরক ১।১।৩০.

এই শাস্ত্র যে চরকসংহিতা তাহারও প্রমাণ আছে—"ইতি অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরক প্রতিসংস্কৃতে বিমান স্থানে ত্রিবিধ কুক্ষীয়ং বিমানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।" চরক, ৩।২

(৩) "অথ ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বতন্ত্রং।" চরক, ১।১।৩১

(৪) বৃদ্ধাধিকার প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

বাগ্‌ভট, চরক ও সুশ্রুতের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন; এই অঙ্গীকারে, প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতায় চরকের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। (৫) সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে, খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর অনেকশতাব্দী পূর্ব্বে চরক-সংহিতা লিখিত ও প্রতিসংস্কৃত হয়। এদিকে দেখি, চরক ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধচৈত্য সম্মান করিতে বলিতেছেন। (৬) গ্রন্থখানি ঋষিসভার ফল এই সভার সভ্য ছিলেন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। (৭) কিন্তু পৌরাণিক যুগে যে আধুনিক দেবোপাখ্যানরূপমহাবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এই গ্রন্থে তাহার বীজ প্রাপ্ত হই। (৮) গ্রন্থকার প্রাচীন যাগযজ্ঞের ধর্ম্ম জাগাইতে চাহেন এবং দেবগণ দেশত্যাগ করিয়াছেন ভাবিয়া ক্ষোভে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। (৯) সংহিতাখানি পাঠ করিতে বসিলে এই ভাব লইয়া উঠিতে হয় যে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের সর্ব্বত্র প্রবেশ করিয়াছে, হিন্দু ইহাঁকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেছেন, কিন্তু নানা শক্তি নির্জ্জনে অতিসঙ্গোপনে পৌরাণিকধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছে। হিন্দু তপস্বিগণ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সহিত সদ্ভাবে মিশিয়া লোকহিতার্থে সৎকার্য্যে রত থাকিয়াও স্বধর্ম্মপুনরুত্থানের আয়োজন করিতেছেন। অশোকাদি সার্ব্বভৌম বৌদ্ধরাজগণ এত অধিককাল হইল সংসার-লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের প্রতিবিম্ব কাল-স্রোতে ক্রমে লয় পাইয়াছে, চরকাদির সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পহুঁছিতে পারে নাই। একথাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চরক সংহিতা নামে

---

(৫) "যদি চরকমধীতে তদ্ধ্রুবং সুশ্রুতাদি" ইত্যাদি ও "ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। বাগভট্ ২।৩।৪৭।৪৯,৫৩

(৬) চরকসংহিতা ১।৮

(৭) চরকসংহিতা ১।১।১—৩১

"পারিক্ষির্ভিক্ষু রাত্রেয়ো ভরদ্বাজো কপিষ্ঠলঃ।" চরক ১।১।৭

(৮) "ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণামমরেশ্বরম্।" চরক ১।১।১ "বুবুধেয়ং পিতামহঃ।" চরক ১।১।২২ "ততস্তাঃ প্রজাঃ গুর্ব্বাদিভিরভিশপ্তা ভস্মতা মুপযান্তি, প্রাগপ্যভূদনেক-পুরুষকুলবিনাশায়।" চরক ৩।৩।৪৮। আদিকালেঽদিতিসুতসমৌজসঃ পুরুষাঃ বভুবুরমিতায়ুষঃ।" চরক ৩।৩।৫১ "ভ্রশ্যতি তু কৃতযুগে" চরক ৩।৩।৫৩ "ততস্ত্রেতায়াস্ত × × " চরক ।৩।৩।৫৫ "ততস্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদোঽন্তর্দ্ধানমগমৎ।" চরক ৩।৩।৫৬

" যুগে যুগে ধর্ম্মপাদঃ ক্রমেণানেন হীয়তে।
গুণপাদশ্চ ভূতানামেবং লোকঃ প্রলীয়তে।" চরক, ৩.৩।৫৯

(৯) আদিকালে প্রত্যক্ষদেবদেবর্ষিধর্ম্মযজ্ঞবিধিবিধানাঃ * * পুরুষা বভূবুরমিতায়ুষঃ। চরক ৩।৩।৫১

"ততস্তেঽন্তর্হিতধর্ম্মাণো দেবতাভিরভিত্যজ্যন্তে।" চরক, ৩।৩।৩৮

এখন যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহা চরক-কৃত প্রতি সংস্করণ মাত্র; মূল গ্রন্থের প্রণেতা অগ্নিবেশ (১০)। অগ্নিবেশ ঋষিসভার সভ্য আত্রেয়ের নিকটে ইহার তত্ত্বাবলি অবগত হয়েন (১১)। ভরদ্বাজ ঋষিসভার নিয়োগে ইন্দ্রের নিকটে এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া পুনরধিবেশনে সেগুলি আত্রেয়াদির নিকটে বিবৃত করেন (১২)। এই সকল একত্র করিয়া চিন্তা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, চরকসংহিতা খ্রীষ্টীয় শকের গণ্য-কালপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে পারে না। এদিকে আবার অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে কয়েক শতাব্দীর পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া চাই। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে যে গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় প্রথম ২।৩ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয় এবং রচনার অল্প পরেই চরকের হস্তে ইহার বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য সকল গ্রন্থ চরকের পরে লিখিত।

সুতরাং বিউবনিক প্লেগ্ বা ব্রধ্ন রোগ তো দূরের কথা, খ্রীষ্টের শত শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রধ্নশব্দ যেকোনএকটা রোগও বুঝাইত কিনা তাহাও জানিবার উপায় নাই। কবিরাজ মহাশয়ের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অমূলক প্রতিপন্ন হইল।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলে ব্রধ্ন শব্দের যে ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদনুসারে দেখা যাউক, তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্ত—"ব্রধ্নই বিউবনিক প্লেগ্" কতদূর যুক্তিসঙ্গত।

আদি গ্রন্থ বলিতেছেন "যাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া শোথ জন্মায় ও

---

(১০) ২ সংখ্যক ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

(১১) অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্ব্বসুঃ।
শিষ্যেভ্যো দত্তবান্ ষড়্ভ্যঃ সর্ব্বভূতানুকম্পয়া॥
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্বচঃ॥" চরক, ১।১।২৮,২৯

আত্রেয়ঃ = কৃষ্ণাত্রিপুত্রঃ পুনর্ব্বসুঃ। (গঙ্গাধর)

(১২) ভরদ্বাজঃ......ঋষিভিঃ স নিয়োজিতঃ। স শক্রভবনং গত্বা * * দদর্শ বলহন্তারং॥ তস্মৈ প্রোবাচ * * আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। ভরদ্বাজঃ ঋষিভ্যোঽনধিকন্তঞ্চ শশাসানব শেষয়ন্।" চরক, ১।১।১৭—২৪

আত্রেয় যে এই ঋষি সমিতির অন্তর্ভূত তাহা সভ্যগণের নামের লিষ্ট দেখিলেই জানা যায়, যথা:—

* * * *

"আত্রেয়ো গৌতমঃ সাংখ্যঃ পুলস্ত্যো নারদোঽসিতঃ।" চরক, ১।১।৬

* * * *

আত্রেয়ঃ = কৃষ্ণাত্রিপুত্রঃ পুনর্ব্বসুঃ। (গঙ্গাধর)

চলিতে চলিতে কুচ্‌কি হইতে ফল-কোষে যায়, তাহার ব্রধ্ন জন্মে।" (১৩) এস্থলে বলা হইল, ব্রধ্ন জন্মিলে প্রথমে কুচ্‌কিতে তৎপরে ফলকোষে শোথ ও বেদনা জন্মে। কিন্তু শোথযুক্ত অংশের অভ্যন্তরে কি থাকে বলা হইল না।

চরকের পরেই সুশ্রুত। চরকের অপেক্ষা সুশ্রুতে রোগ সকলের লক্ষণ, বিভেদ ও চিকিৎসা পূর্ণতার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। (ইহাও শোষোক্ত গ্রন্থের পরবর্ত্তিতার এক প্রমাণ)। সুশ্রুত অন্ত্রবৃদ্ধি নামে উরুগত ও ফলকোষগত ক্ষুদ্রান্ত্র বৃদ্ধির কারণ, লক্ষণ ও অবস্থা পরিষ্কার ও নির্ভুল বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু চরকের প্রভাবে এই বর্ণনে কল্পিত হইয়াছে যে, উরুগত অন্ত্রবৃদ্ধি চিকিৎসাভাবে ফলকোষ-গত অন্ত্রবৃদ্ধিতে পরিণত হয়। (১৪) সুশ্রুতে ব্রধ্ন শব্দ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সুশ্রুতের এই গদ্য বিবরণ প্রায় অবিকল পদ্যাকারে বাগভট সঙ্কলিত অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক পরবর্ত্তী গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। (১৫) টীকাকার অরুণদত্ত অষ্টাঙ্গহৃদয়স্থ অন্ত্রবৃদ্ধি বিবরণের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া ঐ অন্ত্রবৃদ্ধি ব্রধ্নশব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১৬) উরুগত ক্ষুদ্রান্ত্র বৃদ্ধিই সুশ্রুত ও

(১৩) "যস্ত বায়ুঃপ্রকুপিতঃ শোফশূলকরশ্চরন্।
বঙ্ক্ষণাৎ বৃষণৌ যাতি ব্রধ্নস্তস্যোপ জায়তে॥" চরকসংহিতা, ১।১৮

ভিষগাচার্য্য ভাষ্যকার গঙ্গাধরের সংস্করণে ব্রধ্ন স্থানে বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভাষ্যকার সর্ব্বত্র মূলে ধৃত পাঠ ভাষ্যে স্বীকার করেন নাই। বিমান স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে অনেক স্থলে মূলে অন্য সংস্করণের পাঠাপেক্ষা ভিন্ন পাঠ প্রদান করিয়াও ভাষ্য শেষে অন্য সংস্করণের পাঠই স্বীকার করিয়াছেন, নিজধৃত পাঠ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং ভাষ্যকারের পাঠ এতদূর নির্ভর যোগ্য নহে যে তদনুরোধে বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে অন্য সংস্করণের পাঠ অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

(১৪) "ভারহরণ * * আয়াসবিশেষৈর্ব্বায়ুরতিপ্রবৃদ্ধঃ প্রকুপিতশ্চ স্থূলান্ত্র স্যেতরস্য চৈকদেশং দ্বিগুণ মাদায়াধো গত্বা বঙ্ক্ষণ সন্ধিমুপেত্য গ্রন্থিরূপেণ স্থিত্বা হপ্রতিক্রিয়মাণেচ কালান্তরেণ ফলকোশং প্রবিশ্য মুষ্কশোফমাপাদয়ত্যাধ্মাতোবস্তিরিবাততঃ প্রদীর্ঘঃ শোফোভবতি। সশব্দ মবপীড়িত শ্চোর্দ্ধমুপৈতি। বিমুক্তশ্চ পুনরাধমতি।" সুশ্রুত, ২।১২।২

(১৫) বাত কোপিভিরাহারৈঃ শীততোয়াবগাহনৈঃ।
ধারণেরণভারাধ্ববিষমাঙ্গপ্রবর্ত্তনৈঃ॥ ২৭॥
ক্ষোভনৈঃ ক্ষুভিতোহন্যৈশ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রাবয়বং যদা
পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধোনয়েৎ।
কুর্য্যাদ্ বংক্ষণ সন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভংশ্বযথুং তদা॥ ২৮॥
উপেক্ষ্যমাণস্য চ মুষ্কবৃদ্ধিমাধ্মান রুক্‌স্তম্ভবতীং স বায়ুঃ।
প্রপীড়িতোহন্তঃ স্বনবান্ প্রযাতি প্রধ্মাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মুক্তঃ॥ ২৯॥
* * * অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ১।৩।১১।২৭—২৯

(১৬) "ব্রধ্নাখ্যব্যাধেরনন্তরং শোফ-সারাজ্ঞাদ্ শুষ্কস্তাবসর ইতি তং লক্ষয়িতু মাহ রুক্ষেতি।" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর টীকা,১।অ১১।৩১

বাগ্‌ভটের মতে মূল অন্ত্রবৃদ্ধি নামক ব্যাধি। ফল-কোষ-গত কুদ্রান্ত্রবৃদ্ধি তাহার পরিণতি মাত্র। সুতরাং অরুণ-দত্ত প্রকারান্তরে বলিতেছেন; সুশ্রুত-ও-বাগ্‌ভটপ্রোক্ত উরুগত কুদ্রান্ত্র বৃদ্ধিই ব্রধ্ন। অরুণদত্তের ব্যাখ্যা যে ঠিক্, ব্রধ্ন যে মূলে বঙ্ক্ষণস্থ শোথবিশেষ, বাগ্‌ভটপ্রোক্ত ব্রধ্ন-চিকিৎসা দেখিলেই তাহা সুন্দর বুঝিতে পারা যায় (১৭)।

মাধবকর নিদানে বাগ্‌ভটের শ্লোকময়অন্ত্রবৃদ্ধিবিবরণ অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে বিবরণে নিজের বা অন্যের কোন মন্তব্য যোগ করেন নাই—বোধ হয় করা আবশ্যক মনে করেন নাই। নিদানে ব্রধ্ন রোগের বর্ণন নাই, উল্লেখ আছে। যে শ্লোকে আছে, তাহা অবিকল চরক হইতে গৃহীত (১৮)। বাগ্‌ভটেও ঐ বচনের প্রতিরূপ আছে। নিদানের অন্যত্র ব্রধ্নশব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে রোগার্থে নহে (১৯)।

চক্রপাণি দত্তকৃত চিকিৎসা সংগ্রহে ব্রধ্ন-চিকিৎসা আছে। বৈদ্যকুলের স্মৃতি ও চক্রদত্তের প্রণালী, এই উভয়ের সাহায্যে জানা যায় চক্রদত্ত মাধবের পরবর্ত্তী। চক্রপাণির পিতা, গৌড়াধিপতি নয়পাল দেবের অমাত্য ও রন্ধনশালাধ্যক্ষ ছিলেন (২০)। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে পালবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য যায়; সুতরাং চক্রদত্ত তৎপরবর্ত্তী লোক হইতে পারেন না। চক্রদত্তের ২য় টীকাকার শিবদাসের পিতাও পালরাজার চিকিৎসক ছিলেন; সুতরাং চক্রদত্ত দশম শতাব্দীর দুইএকশতাব্দীপূর্ব্ববর্ত্তী লোক হওয়াই সম্ভব। ইনি, বৃদ্ধ্যধিকারের যে অংশে অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে,

(১৭) বায়াদ্‌ব্রধ্নঃ নচেচ্ছান্তিং স্নেহরেকাস্থ বাসনৈঃ।
বস্তিকর্ম্ম পুরঃকৃত্বা বঙ্ক্ষণস্থং ততোদহেৎ॥
অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ২।১।১৩।২৮

(১৮) "তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহোমূত্রবর্চ্চসোঃ।
ব্রধ্নহৃদ্রোগ গুল্মার্শঃ পার্শ্বশূলঞ্চ জায়তে॥"
নিদান, বাতব্যাধি। চরক, ৬।২৮

(১৯) পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্‌ গণ্ডূপদোপমাঃ।
ক্রিমি নিদান॥ ৫॥

(২০) গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্র-
নারায়ণস্তনয়ঃ সুনয়োহন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনুপ্রথিতলোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী॥
চক্রদত্ত, উপসংহার-শ্লোক, ১।

গৌড়াধিনাথঃ—নয়পাল দেবঃ। (শিবদাস সেন)।

তাহার শেষাংশে ব্রধ্নের চিকিৎসা ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোথাও অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা, কোথাও বা উভয়ের একই চিকিৎসা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। (২১) ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে চক্রদত্তের মতে অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্ন মূলে একই পীড়া, কিন্তু ব্রধ্নে এমন বিশেষ কিছু আছে যাহা সাধারণ অন্ত্রবৃদ্ধিতে নাই। ব্রধ্নশব্দের এই বিশিষ্টতর ব্যবহার দেখিয়া বুঝা যায় যে চক্রদত্তের সময়ে চিকিৎসকেরা রোগ সকলের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, পরস্পর প্রভেদ ও শ্রেণীবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝিয়া ছিলেন।

চক্রদত্তের দ্বিতীয় গণ্য টীকাকার (২২) শিবদাস সেনও দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক নহেন। তাঁহার পিতা, গৌড়েশ্বর ও অবনীপালনামে খ্যাত কোন রাজার চিকিৎসক ছিলেন (২৩)। পাল রাজারাই তাম্রফলকে আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের কেহ কেহ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীর পদও পাইয়াছিলেন। শিবদাস বলেন, ব্রধ্নের লক্ষণ রুগ্‌বিনিশ্চয় অর্থাৎ নিদানে নাই, এই জন্য তিনি অন্য গ্রন্থ হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। (২৪) এই অন্য গ্রন্থ খানা কি, তিনি তাহা বলেন নাই। তাঁহার মন্তব্যের অর্থ এই যে সে সময়ে বিজয় রক্ষিতকৃতনিদানের টীকা ছিল না। রক্ষিতের টীকায় শিবদাসধৃতব্রধ্ন লক্ষণই দৃষ্ট হয়। শিবদাসের সময়ে ভাষায় সাধারণ লোকে ব্রধ্নকে বাউসী বলিত। (২৫)

(২১) চক্রদত্ত, ৩৭।১০—১২

(২২) অসদ্ব্যাখ্যানতমসা সুচ্ছন্নং চক্রসংগ্রহং।
প্রকাশয়িতু মস্মাভি র্নির্ম্মিতা তত্ত্বচন্দ্রিকা ॥"
তত্ত্বচন্দ্রিকা, উপসংহার, ।১।
টীকা রত্নপ্রভা চক্রদত্তনির্ম্মিতসংগ্রহে।
যদ্যপ্যাস্তে তথাপ্যেষ সংক্ষেপায় মমোদ্যমঃ" ॥
ঐ, উপক্রমণিকা ।৩।

(২৩) মালঞ্চিকাগ্রামনিবাসভূমে
গৌড়াবনীপালভিষগ্বরস্য।
অনন্ত সেনস্য সুতো ব্যধত্তে
টীকামিমাং শ্রীশিবদাসসেনঃ ॥
ঐ, উপসংহার ।৪।

(২৪) ব্রধ্নলক্ষণন্তু যদ্যপি রুগ্‌বিনিশ্চয়ে নাস্তি তথাপি তন্ত্রান্তরমনু সর্ত্তব্যম্। যথা, "অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বন্ন— × × নির্দ্দিশেদিতি।' ত,চ, ৮।৩৭।১০।

(২৫) '× × × × × লোকে বাউসীতিখ্যাতঃ।' ত-চ ২৭।১০।

বিজয় রক্ষিত টীকার প্রারম্ভেই চক্রপাণিকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়াছেন। ব্রধ্নের লক্ষণ এ গ্রন্থে নাই ও গ্রন্থে নাই, বিজয় এরূপ কিছু বলেন নাই। তিনি অন্ত্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যার উপসংহারে শিবদাসধৃত ব্রধ্ন লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, বলিয়াছেন ঐ লক্ষণ গ্রন্থান্তরে আছে; কোন্ গ্রন্থে আছে, কেই বা বচনটির রচয়িতা, উহার প্রামাণ্যই বা কি. কিছুই বলেন নাই (২৬)। ভাবমিশ্র, গোবিন্দদাস, বিনোদলাল সেন প্রভৃতি পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতারা বিজয় রক্ষিতের নিকট হইতে এই বচন গ্রহণ করিয়াছেন। কেহই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন নাই, কেহই বচনটির বীজ, উৎপত্তি, প্রামাণ্য ও প্রণেতার অনুসন্ধান করেন নাই। শেষ ঋণকর্ত্তা কবিরাজবিজয়রত্ন সেন। কিন্তু ইনি বচনটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বপ্নেও প্রাচীন বা আধুনিক কোন চিকিৎসকের চিন্তায় উদিত হয় নাই। উহার (২৭) প্রকৃত অনুবাদ এই—

"অতিশ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক অন্ন সেবনহেতু দোষ জমিয়া বঙ্ক্ষণ সন্ধিগুলিতে (কুচ্‌কিতে) গ্রন্থির মত শোথ জন্মায়। জ্বর, শূল ও অঙ্গাবসাদ বিশিষ্ট তাহাকে, ব্রধ্ন এই নামে নির্দ্দেশ করিবে।"

এই বচনটীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি ও পরবর্ত্তি বচনগুলি পাওয়া যায় না। সুতরাং উহার প্রকরণগত অর্থ কি, নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। এজন্য কেবল ব্রধ্নশব্দের অতীত ইতিহাস এবং যে বিষয় ও যে যে বচনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলে এই বচন উদ্ধৃত দেখা যায় সেই বিষয় ও সেই সেই বচন অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে উদ্ধৃত বচন ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

(২৬) 'ব্রধ্ননিদানন্ত তন্ত্রান্তরে পঠ্যতে, তদ্‌যথা অত্যভিষ্যন্দি......নির্দ্দিশেদিতি।'
বৃদ্ধিনিদান।২।

(২৭) অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বন্নসেবনান্নিচয়ং গতঃ।
করোতি গ্রন্থিবচ্ছোথং দোষো বঙ্ক্ষণসন্ধিষু।
জ্বরশূলাঙ্গসাদাঢ্য তং ব্রধ্নমিতি নির্দ্দিশেৎ।২।

নিচয় = Accumulation, not generation গ্রন্থিবৎ = গ্রন্থি বা tumour এর মত।

ডাক্তার উদয় চাঁদের মতে various kinds of cystic tumourই আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থি। গ্রন্থিবৎ শব্দের অর্থ glandular = of glands = 'গ্রন্থির' হইতে পারে না।

জ্বর = সাধারণ জ্বর, কেননা অঙ্গপীড়াকৃত। এ জ্বর সন্নিপাত জ্বর হইতে পারে না।

বঙ্ক্ষণ সন্ধি—বঙ্ক্ষণস্থ সন্ধি বুঝাইতেছে, বঙ্ক্ষণ ও সন্ধি নহে। আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বত্র এ শব্দ কেবল বঙ্ক্ষণস্থ সন্ধির অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, সুশ্রুত, ২।১২।২, বাগ্‌ভট, ১।৩ ২৮, অরুণদত্ত, ১।৩।২৮ বিজয় রক্ষিত, বৃদ্ধি নিদান ২, বাত ব্যাধি ৪। ইত্যাদি।

শ্লোকটির প্রথম ছত্রে রোগের কারণ বর্ণিত আছে। নিদানটীকার পরবর্ত্তী নানা গ্রন্থে এই ছত্রের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে চিকিৎসকগণ ব্রধ্নের কারণ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। আর, কোন পাঠেই কারণবর্ণন সুশ্রুতকৃত কারণবর্ণনের সহিত এক—এমন কি তৎসদৃশও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু লক্ষণবর্ণন সকল পাঠেই এক এবং প্রত্যেক গ্রন্থেই সমস্ত বচনটি অন্ত্রবৃদ্ধিপ্রসঙ্গে এবং অন্ত্র বৃদ্ধির সাধারণবিবরণের পরে উদ্ধৃত দেখা যায়। পূর্ব্বে ব্রধ্নের যে যে লক্ষণ পরিজ্ঞাত ছিল, এই বচন প্রণেতা তাহাতে জ্বর যোগ করিয়াছেন। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে বচনটির রচনাকালে ব্রধ্নশব্দ অধিকতর বিশিষ্ট অর্থে—আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যায় যাহাকে বলে প্রদগ্ধ, অসংযম্য,উরুগত অন্ত্রবৃদ্ধি তদর্থে—প্রযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্বর স্বরূপলক্ষণ, মনে করিলে, তর্কতঃ বঙ্ক্ষণস্থ অন্য কোন ব্যাধির সহিত ইহার গোলমাল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কারণবর্ণনা নিতান্ত সাধারণও অস্পষ্ট; আর, পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অন্ত্রবৃদ্ধির কারণ বর্ণনে সুশ্রুতকে অনুসরণ করিয়াছেন, সুতরাং এস্থলে সুশ্রুতোক্ত কারণগুলির অনুল্লেখ নিতান্ত বিস্ময়কর—ইদানীন্তন ইয়ুরোপীয় অস্ত্রচিকিৎসকগণ সুশ্রুতের সহিত প্রায় একমত। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে যে লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ব্রধ্ন আনুষঙ্গিকজ্বরযুক্ত অন্যবিধ বঙ্ক্ষণশোথ হইতে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে, বচন প্রণেতা ও তাঁহার শিষ্যবর্গ সেগুলি জানিতেন না। সুতরাং কার্য্যতঃ ব্রধ্নপদটি সর্ব্ববিধ উরুগত অন্ত্রবৃদ্ধি, বঙ্ক্ষণগণ্ড, ক্রুরাল কেনালে সঞ্চিত স্বল্পবসা, সোয়াসস্ফোটক, স্যাফেনা ধমনীর শোথ—এই সকল বিভিন্ন রোগের সাধারণনামরূপে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে।

বচনটি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়, সুতরাং বাগীর সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। বাগী ফিরঙ্গ রোগজাত। ফিরঙ্গ রোগ ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাচীন মহাদ্বীপে প্রবেশ পথ পায় নাই। ভাবপ্রকাশ ফিরঙ্গরোগ বর্ণন করিয়াছেন; ইনিও অন্ত্র বৃদ্ধির প্রসঙ্গেই ব্রধ্নঘটিত উল্লিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ফিরঙ্গরোগপ্রসঙ্গে করেন নাই। অফিরঙ্গ গণ্ড বা গণ্ডমালার সহিত ও ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। গণ্ডমালা চরকের অপরিজ্ঞাত ছিল না। পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকলে

গণ্ডমালার উত্তম বর্ণনা আছে; কিন্তু সর্ব্বত্র অন্ত্র বৃদ্ধির—কেবল অন্ত্রবৃদ্ধির প্রসঙ্গেই বচনটি উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়, কোন স্থলেই সহস্র চেষ্টা করিয়াও গণ্ডমালার সহিত ব্রধ্নের বা ব্রধ্ন বর্ণনার সম্বন্ধ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিদারিকা, বিসর্প অগ্নিরোহিণী প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই যুক্তি সম্পূর্ণ খাটে।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত নিদানের বঙ্গানুবাদে টীকাচ্ছলে ব্রধ্ন শব্দের বাঙ্গালা বাগী লিখিয়াছেন। এই ভ্রমের অনুকরণে নিদানের নব সংস্করণে ব্রধ্নের ইংরাজি করা হইয়াছে বিউবো। পণ্ডিত বিজয়রত্ন বিউবো দর্শনে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ডাক্তার উদয়চাঁদের ভ্রম ভাবপ্রকাশ, ভৈষজ্যরত্নাবলি ও আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান প্রভৃতির বঙ্গানুবাদে নকল করা হইয়াছে। পূর্ব্বতন গ্রন্থ সকলের ন্যায় এই সকল গ্রন্থেও ব্রধ্নবর্ণন অন্ত্রবৃদ্ধি বর্ণনের পরিশিষ্টরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

অতএব কবিরাজ মহাশয়ের প্রথম সিদ্ধান্তও অমূলক। প্রাচীন বা আধুনিক, কোন অর্থেই ব্রধ্নের সহিত বিউবনিক প্লেগের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না।

প্রথম সিদ্ধান্ত অমূলক প্রমাণ হইলেই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তও মিথ্যা প্রমাণ হয় এবং এই উভয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় সিদ্ধান্ত—"বিউবনিক্ প্লেগ বিশেষ বিপজ্জনক নহে"—সঙ্গে সঙ্গে লয় পায়। কিন্তু প্রথম দুইটি আমরা স্বতন্ত্র পরীক্ষা করিয়াছি, তৃতীয়টিও করিব।

চরক প্রকৃতির ঋতুবিপরীত ভাব লক্ষ্য করিয়া পঞ্চালদেশে জনপদোদ্ধ্বংসন ব্যাধির আবির্ভাব আশঙ্কা করিতেছেন (২৮) এবং বলিতেছেন বায়ু, জল, দেশ ও কালের বৈগুণ্য বা বিকৃতি এই রোগের কারণ। (২৯) ইহার আক্রমণে, একই রোগে বিভিন্ন প্রকৃতি, আহার, দেহবল, সাত্ম্য, অন্তঃকরণ ও বয়সের দেশ শুদ্ধ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। (৩০)

(২৮) চরক ৩। ৩ ১-৮। "জনপদ মণ্ডলে × × প্রতীকারে গৌরবং ভবতি।"

(২৯) "প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈ র্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাঃ, তদ্বৈগুণ্যাৎ সমান কালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তি। তেতু খল্বিমে ভাবাঃ সামান্যাঃ জনপদেষু ভবন্তি; তদ্যথা, বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি × × ।" চরক, ৩। ৩। ১১—১৩

(৩০) "অপিচ খলু জনপদোদ্ধ্বংসনমেকেন ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহার-দেহবল-সাত্ম্য-সত্ত্ব-বয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্ভবতীতি।" চরক, ৩।৩।১০

এ রোগটি সংক্রামক সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী ভিষগাচার্য্য সুশ্রুত তাঁহার সময়ে জানা সংক্রামক রোগ সকলের তালিকা দিয়াছেন এবং কিরূপে উহারা দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয় তাহাও লিখিয়াছেন (৩১)। সে রোগগুলি এই—কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ ও ঔপসর্গিক রোগ (পাপজ ও ভূতোপসর্গজ রোগ)। এই ফর্দ্দে ওলাউঠা ও বসন্তের নাম পাওয়া যাইতেছে না। সুশ্রুত বর্ণিত মসূরিকা ক্ষুদ্ররোগ মাত্র (৫৫), এখনকার মারাত্মক বসন্ত নহে। এসিয়াটিক কলেরা তো আধুনিক ব্যাধি। বিশেষতঃ চরকের গ্রন্থে এই দুই পীড়ার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইটিকে ফর্দ্দ হইতে বাদ দিতে হইবে। কুষ্ঠ ও নেত্রাভিষ্যন্দ জনপদীয় হইলেও বিশেষ অর্থে প্রাণহন্তা নহে। শোষ সংক্রামক হইলেও জনপদীয় নয়। আয়ুর্ব্বেদে ঔপসর্গিকব্যাধির যে আভাস পাওয়া যায় তাহাতে তাহার স্কন্ধে জনপদ বিনাশরূপ বৃহৎ ব্যাপারের আরোপ কোন প্রকারেই সম্ভবে না। সুতরাং বোধ হইতেছে যে এই ব্যাধি এক প্রকার জ্বর। চরক নিজেই এই মত সমর্থন করিতেছেন। জনপদোদ্ধংসনপ্রসঙ্গে তিনি ভ্রমপ্রলাপময় দাহজ্বর চিকিৎসায় বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং উহাতে যে অন্ত্র হইতে রক্ত নির্গম বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহাও ইঙ্গিত করিতে ভুলেন নাই। (৩২)

গ্যালেন প্রভৃতি প্রাচীন প্রতীচ্যপণ্ডিতগণ জনপদোদ্ধংসন ব্যাধিমাত্রকেই মারী বলিয়াছেন। তদনুসারে চরক-নির্দ্দিষ্ট এই ব্যাধিমারী। কি প্রকার মারী, তাহাই বিবেচ্য। গণ্ডীয়মারীর দুইটি লক্ষণ—দাহজ্বর ও রক্ত-পিত্ত—ইহাতে পাইতেছি। বাকি একটি লক্ষণ—গণ্ডমালা অনুমান করিবার কোন হেতু আছে কি? আছে। যে সময়ে চরকসংহিতা রচিত হইতেছিল, তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতে লিবিয়া, ইজিপ্ট ও সিরিয়া গণ্ডীয়মারীর আক্রমণে উচ্ছন্ন যাইতেছিল। সেইপ্রাচীনকালহইতে গণ্ডীয়মারী প্রাচীন মহাদ্বীপে মনুষ্য বধ করিয়া ফিরিতেছে। এ যে ঐতিহাসিক সময়েই

---

(৩১) "প্রসঙ্গাদ্ গাত্র সংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহ শয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানু লেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥
সুশ্রুত, ২।৫।২৯, ৩০।

(৩২) "উক্তেণ হি দাহজ্বর প্রলাপাতিসারা ভূয়োভিবর্দ্ধন্তে, শীতেনচোপশাম্যন্তীতি।"
চরক, ৩।৩।১৪-১০৪।

কত শত বার পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া গেল, বলা যায় না। কিন্তু অন্য-বিধ মারীর কেবল তিনটি উল্লেখযোগ্য আক্রমণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (সে কথা পরে বলিব)। বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর হইতে কোথাও উহার বিশেষ সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। আবার ইহাও দেখা যায়, সেই প্রাচীনকালেই গণ্ডীরমারী অন্যমারীঅপেক্ষা পঞ্চালের অধিকতর নিকটে আসিয়াছিল। সুতরাং চরকের মারী যে গণ্ডীর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মারীতত্ত্ব ও ইতিহাস এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে, ১৮২৩ হইতে ৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন উত্তর পঞ্চালের আধুনিক নগর কেদারনাথে মারী রাজত্ব করিতেছিল। ১৮৪৯-৫২ খ্রীষ্টাব্দে মারী অত্যন্ত প্রবল হইয়া দক্ষিণদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার ফ্রান্সিস্ ও পিয়ার্সন কমিশনের সভ্যরূপে রোগের তথ্যানুসন্ধানার্থে তথায় প্রেরিত হন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ঐ রোগ গণ্ডীরমারী ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে রক্ত-পিত্ত বর্ত্তমান ছিল। অনেক অনুসন্ধানের পর ডাক্তারদ্বয় বলিয়াছেন, ব্যাধি অন্য স্থান হইতে আসে নাই, আক্রান্তস্থানের ভূমিতেই উহার বীজ ছিল। এই বীজ —এই জীবাণু কোথা হইতে আসিল? পৃথিবীর বর্ত্তমানঅবস্থায় অজীব হইতে জীব উৎপন্ন হইতে পারে না এবং অল্প সময়ের মধ্যে একবিধ জীব হইতে অন্যবিধ জীবের উৎপত্তি ও সম্ভব নহে। সুতরাং রোগ বীজ পঞ্চাল-দেশেই ছিল, অথবা অন্যদেশ হইতে আসিয়াছিল। ইদানীন্তনকালে বায়ুযোগে দেশান্তর হইতে বীজ আসিয়া পঞ্চালে গজাইয়া থাকিতে পারে, অথবা এ ঘটনা ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিতে পারে। আমাদিগের নিকটে এই দ্বিতীয় পক্ষই যুক্ততর। চরকের ভাবি-আক্রমণ-শঙ্কা অতীতস্মৃতির ফল। ভিন্নদেশীয়মারী-স্মৃতির ফল হইলে, তাঁহার আশঙ্কা পঞ্চালে আবদ্ধ থাকিবে কেন? সুতরাং তাঁহার আশঙ্কা স্থানীয় অতীতআক্রমণস্মৃতির ফল। এই ব্যাখ্যার সহিত উনবিংশশতাব্দীর মারীবিবরণ ও চরকের কথা, উভয়ই সুসঙ্গতি প্রাপ্ত হইতেছে। অন্য ব্যাখ্যায় তাহা হয় না—সমস্ত প্রাচীন ও ইদানীন্তন ঘটনা অসমঞ্জস থাকিয়া যায়। একমাত্র আপত্তি—যদি অত পূর্ব্বে বীজ আসিয়াছিল, শতাব্দীরপর শতাব্দী চলিয়া গেল, সময়ে সময়ে মারী দেখা দিল না

কেন? সঞ্চিত বীজে যুগযুগান্তরে মারীর আবির্ভাব সম্ভবে না। ইহার উত্তর এই, এ আপত্তি উভয় পক্ষেই খাটে। প্রথম পক্ষ গ্রহণ করিলেও স্মরণাতীতকালে পঞ্চালে রোগবীজ আনাইতে হয়। আপত্তিটি কিন্তু কোন কাজেরই নহে। সময়ে সময়ে যে সুদূর সমতলবাসী লোকদিগের অজ্ঞাতসারে মারী পঞ্চালে উৎপন্ন ও লীন হয় নাই, কে বলিল? সে বিজনপ্রায় উচ্চ ভূমির মারীকাহিনী এই উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমাগত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত সদাউৎকর্ণ ব্রিটিশসিংহেরও কর্ণগোচর হয় নাই। পূর্ব্বেতো যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত সে স্থান কেবল দাঙ্গা হাঙ্গামার স্থান ছিল, কে কাহার সংবাদ লইত?

ইদানীন্তন পঞ্চালমারীর বিবরণে একটি অদ্ভুত কথা জানিতে পাই—চুয়ান্ন বৎসরের মধ্যে সেমারী উত্তর পঞ্চালের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারত-বিহারে বহির্গত হইতে পারে নাই। আরও অদ্ভুত কথা এই যে মারীর প্রকোপ-কালে, কতলোক কেদারনাথ তীর্থে গিয়াছেন, কিন্তু যাত্রি-মধ্যে কেহ এই পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই বা কোন প্রকারে বীজ স্থানান্তরে লইয়া যান নাই। এখন যাতায়াতের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রিযোগে মারী বিস্তারের সুবিধা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক। তথাপি আধুনিক পঞ্চাল-মারী উত্তর পঞ্চালের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পঞ্চাল-মারীও জন্মভূমির একাংশেই আবদ্ধ থাকিত, অন্য প্রদেশ বাসীরা—বিশেষতঃ চরকের পরবর্ত্তী আর্য্য বৈদ্যগণ তাহার সংবাদ পাইতেন না, এজন্যই চরকের পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকলে ইহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

আত্রেয়, অগ্নিবেশ, চরক বা অন্য কোন গণ্য হিন্দু বৈদ্য পঞ্চালের সে মারী প্রত্যক্ষ করেন নাই; করিলে, যে সকল গ্রন্থে জ্ঞাত রোগসমূহের লক্ষণাবলি যথাসাধ্য নিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেসকলে উক্ত মারীর লক্ষণা-বলি সবিস্তর লিখিত থাকিত। পঞ্চালের আধুনিক মারীতে সন্নিপাত জ্বর গণ্ডমালা ও রক্তপিত্ত, এই তিনটী একত্র হইয়াছিল। প্রাচীন ও আধুনিক সকল লেখকই এই তিনটী গভীর মারীর অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরকে সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ সবিস্তর লিখিত আছে, ইহাও আছে যে সন্নি-পাত জ্বরান্তে কর্ণমূলে শোথ হইলে রোগী কালপ্রাপ্ত হয়। (৩৩) গণ্ডমালার

(৩৩) চরক; ৩।৯, ১০।

কথাও চরক জানিতেন, কিন্তু সে কেবল গলগত ছিল। পরবর্ত্তী ভোজাদির গ্রন্থে গণ্ডমালার সবিস্তর বিবরণ আছে; তাঁহাদিগের মতে এই রোগের লক্ষণ বাহুমূলে,গলদেশে মন্যাস্থলে ও কুঁচকিতে গণ্ড বা লসীকীয়গুটিকাবৃদ্ধি; কোন কোন গণ্ড পাকেও স্রাবিত হয়;—কিন্তু সঙ্গে পীনস,কাস,পার্শ্ব শূল, বমন ও জ্বর থাকিলে এই রোগ অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। (৩৪) চরকাদির গ্রন্থে রক্তপিত্তের বিবরণও সবিস্তর লিখিত আছে। কি অবস্থায় রক্তপিত্ত অসাধ্য হয় তাহাও এই সকল গ্রন্থকার লিখিতে ভুলেন নাই। (৩৫) কিন্তু প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলের মধ্যে কোথাও এমন কোন রোগের লক্ষণসমূহ লিখিত হয় নাই, যাহাতে এই তিন রোগের লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হয়।

অতএব জানপদস্মৃতির উপরে নির্ভর করিয়া চরক যে ব্যাধি জনপদধ্বংসকারী বলিতেছেন, কবিরাজ বিজয়রত্ন তাহাই বিশেষ বিপজ্জনক নয় প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় সিদ্ধান্তও অমূলক।

এই মীমাংসা যদি ঠিক হয়, চরক মারীর হস্ত এড়াইবার যে সকল উপায় ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করিয়াছেন, সে সকল অবলম্বন করা আমাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন, বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই চারিটীর বৈগুণ্য বা বিকৃতি মারীর অব্যবহিত পূর্ব্ব কারণ, ইহারা বিগুণ না হইলে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। (৩৬) এই চারি কারণের কোনটীই প্রাচীনদিগের শাসনাধীন ছিল না। পূর্ব্বকালের বিচ্ছিন্নশাসনক্ষমতা এখন কেন্দ্রগত হইয়াছে, বহুলোকের একত্র মিলিয়া সমবেতভাবে একমতে যথেষ্টকাল কার্য্যকরিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইদানীন্তন বিদ্যা ও সাধন স্বাস্থ্যবিধান, বায়ু, জল ও ভূমির উপরে মানবীয়শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে ঋতুর বৈগুণ্য অনেক পরিমাণে অতিক্রম করিবার অনেক প্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে পীড়িত লোকদিগকে জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার কোন বন্দোবস্ত বা সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং নির্জ্জন বাস বা দেশত্যাগ দ্বারা আত্ম-গোপন এবং স্বাস্থ্যকর দেশের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন মারীর হস্ত নিশ্চিত অতিক্রমের

(৩৪) মাধব ও বিজয়, গণ্ডমালা।

(৩৫) চরক, ২।৬। মাধব ও বিজয়।

(৩৬) "ইমানেবংদোষযুক্তাংশ্চতুরোভাবান্ জনপদোদ্ধ্বংসকরান্ বদন্তি কুশলাঃ,অতোঽন্যথা ভূতাংস্তু হিতানাচক্ষতে।" চরক, ৩,৩,২০

উপায়ও ছিল না। (৩৭) এখন স্বাস্থ্যবিধান সঙ্গত প্রণালী মতে রোগীদিগকে সুস্থ ব্যক্তিগণ হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে চরকাদির উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হইবার সম্ভাবনা। বৈদ্যকুলপতি চরক যদি আজ বর্ত্তমান থাকিতেন, মারীর আগমন, স্থিতিলাভও বিস্তার নিবারণের জন্য শাসনকর্ত্তৃগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সে সকল সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেন, মারীর বৎসামান্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া জনপদ রক্ষাকর নিয়মগুলি রহিত করিতে অনুরোধ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, হিতোপচারের উপরেই জীবন নির্ভর করে, অহিতোপচার মৃত্যুর কারণ, মনুষ্য স্বদোষে অকালে দেহ ত্যাগ করে। ইহাও বিশ্বাস করিতেন, মারীর সমস্ত কারণ—বায়ু, জল, দেশ ও কালের বৈগুণ্য—বর্ত্তমান থাকিলেও উপযুক্ত প্রতীকারবলে লোকে রোগের আক্রমণ এড়াইতে পারে। (৩৮) অবশ্য এ অনুরোধ আমরাও করিয়াছি, কুলপতি চরকও করিতেন, যে, বিপদেরবিশের সম্ভাবনা না থাকিলে 'সম্ভব স্থলে যেন রোগীদিগকে নিজ নিজ পারিবারিক বাসগৃহেই স্বতন্ত্র রাখিবার সুবন্দোবস্ত করা হয়।

মাধবিকা। *

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের প্রবাসের পত্র সমালোচনা করিতে যাইয়া সাধনার কোন সমালোচক বলিয়াছিলেন, "পড়িয়া মনে হয়, যেন গোপন পত্র ভ্রমক্রমে প্রকাশ হইয়া গেছে।" বলেন্দ্র বাবুর মাধবিকার কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয়, যেন লেখকের হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুর হইতে গুটিকতক অসূর্য্যম্পশ্যভাব ভাষার সূক্ষ্মআবরণমাত্রমণ্ডিতা হইয়া ভ্রমক্রমে রাজপথে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে যেন বিদ্যাসুন্দর ও বাসবদত্তার ছাপ বড় স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়। কবিতাগুলিতে নূতন বড় কিছুই নাই। "উপমা" প্রভৃতি কবিতা কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ।

---

(৩৭) " × × × গুপ্তিরাত্মনঃ।
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্ " চরক, ৩।৩।২২, ২৩

(৩৮) "তস্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতমতো বিপর্য্যয়া মৃ ·ঃ।" চরক, ৩।৩,৮৪ "তথায়ুরপি × × স মৃত্যুরকালে।" চরক, ৩,৩।৯২, ৯৩ "বিগুণেষ্বপিতু খলু জনপদোদ্ধংসনকরেষু ভাবেষু ভেষজেনৈ বোপপাদ্যমানানামভযং ভবতি রোগেভ্যঃ।" চরক, ৩।৩।২১

* মাধবী—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আদি ব্রাহ্মসমাজযন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বলেন্দ্র বাবু তাঁহার কবি ও সেণ্টিমেণ্ট্যাল্ নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "কবির অভিনয়ই সেণ্টিমেণ্টালের প্রধান লক্ষণ। সকলে কিছু আর কবির প্রতিভা লইয়া জন্মে নাই, অথচ কবি হইবার সাধ অনেকেরই আছে; সুতরাং আর কিছুতে হউক না হউক, কবির ভাব ভঙ্গীর এক প্রকার অসঙ্গত অনুকরণ করিয়াই তাঁহাদিগকে সাধ মিটাইতে হয়।" বলেন্দ্র বাবুর সংজ্ঞানুসারে তিনি স্বয়ং যেন সেণ্টিমেণ্ট্যালের দলে পড়েন। রবীন্দ্র বাবু প্রাচীন কবিদিগের মধুররসমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, বলেন্দ্র বাবু সে রস গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কেবল গ্রহণের অযোগ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার কবিতায় যাহা আসা উচিত ছিল না, তাহা আসিয়াছে। তাঁহার রচিত ও আদিব্রাহ্মসমাজকর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে যাহাকে একটু অশ্লীলতা বলে তাহার ছায়া লোকে প্রত্যাশা করে নাই। এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত "কলবেদনা" নামক কবিতাটি গদ্যাকারে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। "কলবেদনা" লালসাপূর্ণ অন্তরের করুণগান। দেহের সঙ্গেই তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, শারীরিকললিতলাবণ্যেই তাহার অত্যন্ত অনুরাগ। আমরা একে 'সেণ্টিমেণ্ট'রসেবঞ্চিত, তাহাতে আবার বাঙ্গালা সাহিত্য বিরহ-বিকারে, নিরাশার হাহাকারে ইতিপূর্ব্বেই কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং বলেন্দ্র বাবু তাঁহার এই 'দিব্য' ভাষা 'তামসী' কামনারবিলাস মন্দিরে ডালি দিতেছেন দেখিয়া, আমরা দুঃখিত হইয়াছি।' বাস্তবিক বলেন্দ্র বাবু তাঁহার শিল্প-কুসুম-কুন্তলা, লাবণ্যময়ী মোহিনী ভাষা তামসী কামনার *বিলাস-মন্দিরে ডালি দিলে সাহিত্যের* যথেষ্ট ক্ষতি হয়। মাধবিকার কবিতাগুলিতে লেখক প্রেমের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, তাহা না রাখিয়া দেহের সহিতই তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর করিয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে যে কবিতাটি সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিত, বলেন্দ্র বাবুর "বৃথা গর্ব্বই" তাহার সমান। তাহার পর "মান", "কলবেদনা" প্রভৃতিতে সুর আরও একটু উঠিয়াছে, "বিষামৃত" ও "কুম্ভমেলা"য় তাহা উচ্চতম গ্রামস্পর্শী। প্রতিভার ইচ্ছাকৃত এই সকল ছেলেমি প্রকাশিত করিয়া বলেন্দ্রবাবু কেন যে তাঁহার নবীন যশ কলঙ্কিত করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। মাধবিকার এই সকল কবিতায় রস বিশেষ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব আছে কি না আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। ছন্দোবদ্ধ রচনা মাত্রই কবিতা কি না

তাহা সন্দেহ স্থল। কবির সম্বন্ধে বলেন্দ্র বাবু আপনি বলিয়াছেন তিনি "আপন দুর্দ্দম্য ক্ষমতায় বিশ্ব রহস্য মন্থন করিয়া মানবের হৃদয়ে আনন্দ বিতরণ করেন।" কবি স্বভাবতঃই কবি, কবিত্বের জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হয় না।

মাধবিকা বলেন্দ্র বাবুর রচনা বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম, কেন না তাঁহার নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক ভরসা করে। তাঁহার ক্ষমতার অভাব নাই।

"যার যত উচ্চশক্তি তত গুরুতর কর্ম্ম তার।"

বাঙ্গালা কবিতায় "নূপুর গুঞ্জন" আর "বলয় নিক্কন" মহিমাগীতির অভাব নাই।

"চুম্বন গুঞ্জন আর সরস বসন্ত
হয়েছে বিস্তর, হোক্ অন্ত
এবে সে সবের।"

বলেন্দ্র বাবু তাঁহার উড়িষ্যাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির মত প্রবন্ধ, সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনাগুলির মত সমালোচনা রচনায় মনোনিবেশ করিলে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার যশের অভাব হইবে না। তাঁহার ভাষা মধুর, তাঁহার গদ্য রচনা প্রাণস্পর্শী। তাঁহার পদ্য রচনায় আমরা যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার গদ্য রচনায় সে সকলের ছায়া পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। বলেন্দ্র বাবুর গদ্য রচনাপ্রণালী তাঁহার আপনার বিশেষত্ব। সাধনা উঠিয়া যাইবার পর এতদিনে বলেন্দ্রবাবু কই আর তেমন গদ্য রচনা প্রকাশিত করেন নাই। কবিতা ছাড়িয়া বলেন্দ্র বাবু তাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর মধুময়ী ভাষায় গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করিয়া প্রতিভা ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করুন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বাগ্রে ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য অক্টোবর মাসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী এবং আতুর সংখ্যা।

১। বাবুরাম, ২। দেবীয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গা-তারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণী, ১০

নিস্তারিণী, ১১। সখী, ১২। প্রবময়ী, ১৩। জুলী, ১৪। আনন্দ, ১৫। দয়া, ১৬। মাণিক, ১৭। নিফিকির, ১৮। বৈরাগী, ১৯। মোহনলাল, ২০। নফর নন্দী, ২১। কালীচরণ, ২২। বিনয়নাথ নাগ, ২৩। ফণিভূষণ মিত্র।

প্রবময়ী, এই হতভাগিনী সেই হাতের পচা ঘায়ে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অবশেষে চিরশান্তিধামে গমন করিয়াছে। ভগবান্ তাহার আত্মার কল্যাণসাধন করুন।

জুলী। এই হতভাগিনী বৃদ্ধার এই এক রোগ ছিল যে সে সমস্ত দিন রাত্রি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। হঠাৎ একদিন মস্তকে আঘাত লাগিয়া অচেতন হইয়া পড়ে, এবং বহু যত্নের পর জীবনের আশা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সেই "ভাত দাও, পানি দাও, নাস্তা দাও" চীৎকার রব বোধ হয় চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল। সেই দিন হইতে হঠাৎ তাহার বাক্শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন আহারাদি বেশ করিতেছে, তবে আমাদের খাওয়াইয়া দিতে হয়।

বৈরাগী। অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

নিফিকির। আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার ভ্রাতার নিকট ফিরিয়া গিয়াছে।

মোহনলাল। বয়স ২৫ বৎসর। নিবাস জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত ভোমারা গ্রামে। ইহাকে কুলি করিয়া চা বাগানে চালান দিয়াছিল, কিন্তু অসুস্থ হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসে। অনাহারে মরণাপন্ন অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়াছিল, এবং আমাদের বন্ধু বাবু উমাপদ রায় ইহাকে দাসাশ্রমে দিয়া যান। কয়েক দিন আহারের পর বিশেষ বল লাভের পূর্ব্বেই দেশে যাই বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পর তাহাকে আমরা অতি শোচনীয় অবস্থায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। একদল লোক আছে তাহারা ভিক্ষার প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না।

নফর নন্দী। বয়স ৪৫ বৎসর। জাতিতে তাঁতী, নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত রাজবলহাট। রোগ পক্ষাঘাত। মেডিকেল কলেজ হইতে বিদায় প্রাপ্ত হয় এবং নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। রিলিফ্ ফ্রেটারনিটির একজন ভ্রাতা ইহাকে তদবস্থায় দাসাশ্রমে দিয়া যান। রোগী দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে।

কালিচরণ তেওয়ারি। বয়স ৫০ বৎসর। নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত ঠিকডাঙ্গা। রোগ বাত। শেয়ালদহ হাঁসপাতালে ছিল। সেখানে বিশেষ কোনও উপকার না হওয়ায় চলিয়া আসে এবং মরণাপন্ন অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকে। রিলিফ্ ফ্রেটারনিটির একজন ভ্রাতা দেখিতে পাইয়া তাহাকে দাসাশ্রমে দিয়া যান। এখন সে লাঠি ধরিয়া উপর নিচু করিতে পারে।

বিনয়নাথ সেন। বয়স ৪০ বৎসর। নিবাস কলিকাতা আলমবাজার। রোগ হাঁপকাস। একটু সুস্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

ফণিভূষণ মিত্র। বয়স ১২ বৎসর। নিবাস যশোহর জেলার বাল-কাট। ম্যালেরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি। তাহার ভ্রাতা নিতান্ত অক্ষম বলিয়া এখানে রাখিয়া যায়। অবস্থা বড় শোচনীয়। বাঁচিবার কোনও আশা নাই।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

মাসিক চাঁদা।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেপ্টেম্বর ১৲, R. N. Mukerjee Esqr. অক্টোবর ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু সেপ্টেম্বর ১৲, N. K. Bose Esqr. সেপ্টেম্বর ১৲, বাবু হরিপদ ঘোষাল সেপ্টেম্বর ।৹, বাবু গৌরীশঙ্কর দে সেপ্টেম্বর ॥৹, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত সেপ্টেম্বর ১॥৹, বাবু বিহারীলাল দে ভাদ্র ॥৹, ডাঃ চুনিলাল বসু অক্টোবর ১৲, বাবু বঙ্কুবিহারী মিত্র সেপ্টেম্বর ।৹, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু অক্টোবর ১৲, বাবু করুণাদাস বসু সেপ্টেম্বর ।৹, ১২৬ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস অক্টোবর ॥৹, বাবু তেজচন্দ্র বসু সেপ্টেম্বর ॥৹, বাবু নন্দকুমার দত্ত সেপ্টেম্বর ১৲, ১৭ নং শঙ্কর ঘোষের লেন অক্টোবর ১৲, বাবু রামচন্দ্র মিত্র সেপ্টেম্বর, ১৲ ২১।১ পটুয়াটোলা মেস্ অক্টোবর ।৹, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার সেপ্‌টেম্বর ২৲, বাবু নীরোদনাথ মুখোপাধ্যায় সেপ্টেম্বর অক্টোবর ৫৲, বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর ১৲ Mrs. P. C. Sen জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর ২৪৲, A lady, C/o Babu Sreenath Das সেপ্টেম্বর ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, ভাদ্র আশ্বিন ২৲, বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বিন কার্ত্তিক ১০৲ B. S. Matheson Esqr. জুন হইতে আগষ্ট ৩৲, বাবু শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী, আগষ্ট ।৹।

এককালীন দান।

ছাত্রীনিবাসের জন্মদিন উপলক্ষে ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডিংএর ছাত্রীগণ ৬৲, ছোট কা ১৲, বাবু শীতলদাস রায়, নিশ্চিন্তপুর ১৲, Mrs. M. M. Bose ২৲, বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় খাওয়াইবার জন্য ১৭।৹, বাবু রাধিকানারায়ণ ঘোষ ৬৲, শ্রীমতী সরোজিনী রায় ।৹, ২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন ।৹, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲, ৬৭নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট মেস ।৹, বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পড়িয়া পাওয়া ।৹, A Miss ৵৹, বাবু কামিনীকুমার চন্দ, শিলচর ৬৲, বাবু হরচন্দ্র মজুমদার ১৲, বাবু হরকুমার সরকার ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র বারিক ২৲, শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেব ১৲, বাবু চারুচন্দ্র রায়ের মাতা ১৲, শ্রীমতী সৌরভিনী ঘোষ ১৲, একজন দাসাশ্রমের পুরাতন বন্ধু পূজার খাওয়াইবার জন্য ২০৲, ময়মনসিং ভক্তিসঞ্চারিণী সভা ১৲, বাবু গৌরলাল রায় কাকিনিয়া ২৲, একজন দাসাশ্রমের পুরাতন বন্ধু দাসাশ্রমের আতুরগণের পূজায় নব বস্ত্রের জন্য ২০৲, বাবু জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ৩৲, বাবু ভূতনাথ ঘোষ, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে খাওয়াইবার জন্য ৫৲, বাবু জ্ঞানেন্দ্র-

নাথ বসু, লাহোর ৫৲, একজন পরিদর্শক ১৲, মিঃ দত্তের সন্তানগণ, বর্দ্ধমান ২৲, বাবু কীশোরীমোহন বসু, ধাপা ১৲, বাবু শরচ্চন্দ্র সেন, পুরুলিয়া ৫৲, A frend of Azimgunj ১৲, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৲, বাবু হেমেন্দ্রলাল খাস্তগির ৫৲, বাবু মতিন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক ডিব্রুগড় হইতে সংগৃহীত ইন্‌জিনিয়ারিং আফিস ১৲, ঐ ঐ রেলওয়ে আফিস ১৸০, Surgeon Major H. C. Bannurjee, সিলেট ৩৲, বাবু গিরিশচন্দ্র সোম, শ্রীমঙ্গল ॥০, বাবু ঈশানচন্দ্র নন্দী, কুলছড়া ॥০

বস্ত্রাদি দান।

বাবু হরচন্দ্র মজুমদার কাপড় ১। বেথুন কলেজ হইতে ছোট প্যাণ্ট ১০, জ্যাকেট ২, বালিসের ওয়াড় ৩, ফ্রক ৩, ইজার বড়ি ৪, কোট ৩, ষ্টকিং পুরাতন ৮॥ জোড়া, পরদা ১। একজন ভদ্রলোক কাপড় ১, পিরাণ ১, কোট ১, গরম কোট ১।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ৩৸৶৫, পুস্তক বিক্রয় ২৲, সুরাজমোহিনী ফণ্ডের সুদ ১০৲, বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট হইতে ১১ই জুনের গচ্ছিত আদায় ৫০৲। মোট ৬৫৸৶৫

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়—মাসিক চাঁদা ৬১৸০, এককালীন দান ১৩২৵০, অন্যান্য প্রকারে আয় ৬৫৸৶৫, পূর্ব্ব মাসের হস্তেস্থিত ১২৸০। মোট ২৭২॥/৫

ব্যয়—বাজার খরচ ৮৫।১০, পূজাদি উপলক্ষে খাওয়ান খরচ ৩৩॥৶১৫, রোগীর গাড়ী ভাড়া ১৸৶১০, কর্ম্মচারীর একজনের দুই মাসের ও একজনের এক মাসের বেতন ৩৫৲, চাকর দুই মাসের ৭৲, ব্রাহ্মণ ৬৲, আদায়কারীর খরচ ১৸৶১০, মেহতর শোধ দুই মাস ১২৸৶১০, ক্ষুদ্র জিনিস খরিদ ১/৫, ধোপা ২৲, পূজা উপলক্ষে নব বস্ত্র খরিদ ১৯৵০, বাটিভাড়া পূর্ব্ব মাসের ৩০৲, ও বর্ত্তমান মাসের ২০৲, দুগ্ধ ৬৲, অন্যান্য ১৲। মোট খরচ ২৬৩/০

আয় ব্যয়—মোট আয় ২৭২॥/৫, মোট ব্যয় ২৬৩/০, মোট হস্তেস্থিত ৯॥৫

বিশেষ ধন্যবাদ।

দাসাশ্রমের একজন পুরাতন বন্ধু গত পূজার সময়—যখন বঙ্গদেশের সকল লোক আনন্দে বিভোর; তখনি—সহস্র গোলমালের মধ্যে এখানকার নিরাশ্রয় অন্ধ আতুরগণকে বিস্মৃত না হইয়া ৪০৲ ব্যয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে নববস্ত্র ও বিবিধ উপাদেয় আহারীয় দানে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এ জন্য অনাথ অনাথাগণ তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছে। আমাদের ধন্যবাদ অপেক্ষা এই আশীর্ব্বাদের মূল্য অধিক।

বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, হাইকোর্টের এটর্ণি মহাশয় দাসাশ্রম দেখিতে আসিলে তাঁহার সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া এখানকার অনাথা-

গণ পিতার নিকট কন্যাগণ যেমন আবদার করে, তদ্রূপ তাঁহার নিকট আবদার করিয়া থাইতে চায়। তিনি স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া ১৭৷৹ খরচ করিয়া তাহাদিগকে দুইদিন নানাবিধ আহারীয় দানে তৃপ্ত করেন এবং মাসিক ৫৲ চাঁদা স্বাক্ষর করেন। এখনও মাঝে মাঝে তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলেন "চলুন, ছেলে মেয়েগুলো কেমন আছে দেখে আসা যাক্।" বড়লোকের মুখে এমন আদরের কথা যে কি মধুর তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই মোহিত হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং দীর্ঘায়ু করুন।

আমাদের বিশেষ অভাব।

এবার চারিদিকে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে মফঃস্বলস্থ দাসাশ্রমের অনুগ্রাহকগণের অনেকে বাধ্য হইয়া দান বন্ধ করিয়াছেন। এখন আমরা আর কাহাকে কি বলিব? সকলেই এই দুর্ব্বৎসরে আপনা লইয়া বিব্রত। আমাদের অনুগ্রাহকদলে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং তাঁহারা যে আজকাল কত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আমরাও ২০। ২৫টি অন্ধ আতুর লইয়া এখানে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা পূর্ব্বে যে চাউল ৩৷৹ করিয়া খরিদ করিতাম, তাহাই এক্ষণে ৫৵৹ করিয়া খরিদ করিতেছি। এমন করিয়া দিন যাপন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দানশীল ধনাঢ্য মহোদয়গণ দাসাশ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে এবার আর রক্ষা নাই।

শীত পড়িয়াছে। এবার প্রচুর পরিমাণে গাত্রবস্ত্র, কম্বল ও মোটা চাদর আবশ্যক। আমাদের অনুগ্রাহক ও অনুগ্রাহিকাগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এ অভাবের সময়ে আমাদিগকে বিস্মৃত না হন।

দাসীর কথা।

ভগবানের কৃপায় দাসীর ৫ম বর্ষ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এখনও মফঃস্বলে প্রায় ৩০০৲ টাকা এবং সহরে প্রায় ৫০৲ পাওনা আছে। এই টাকা পাইলে আর দাসীর ঋণ হইবে না সুতরাং দাসীর গ্রাহকগণ ত্বরায় স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া "দাসী"র জীবন রক্ষা করিবেন। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহকগণকে বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা যেন সকলেই ৬ষ্ঠ বর্ষের দেয় ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অগ্রিম পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।

এজেণ্ট—বাবু কুমুদবিহারী রায় আমাদের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া টাকা আদায়ের জন্ত বীরভূম, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন।

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী
দাসীর কার্য্যাধ্যক্ষ।

দাসী

আধুনিক সূত্র কাতন।

(Modern cotton spinning)

(৩)

মিশ্রণ (Mixing)।

নানা জাতীয় তুলা একত্র মিশ্রণ করাকে Mixing বলে। ইহাই সূতার কারখানায় প্রথম ও প্রধান কার্য্য; ইহা হস্তদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সস্তায় কাতনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই মিশ্রণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, একই বৃক্ষের একই ফল হইতে এক রকমের তুলা পাওয়া কঠিন; তারগুলি প্রায়ই ছোট বড় হইয়া থাকে। এই সকল তার একত্র না মিশাইলে কাতনকার্য্য কঠিন হইয়া পড়ে, এবং একত্র মিশ্রণ ব্যতীত নানা জাতীয় তুলা হইতে সূতা কাটা এক রকম অসম্ভব। এই সকল কারণে মিশ্রণ সূতারকারখানায় একটি প্রধান কার্য্য।

নানা জাতীয় তুলা একত্র মিশাইলে আরো একটি লাভ এই হয় যে, ইহাতে উত্তম জাতীয় তুলার দর কমান হইয়া থাকে ও অধম জাতীয় তুলার উৎকর্ষ সাধন করা হয়। মনে করুন, খাণ্ডোয়া (Khundwa) তুলা হইতে ২০ নম্বরের সূতা অপেক্ষা মিহি সূতা কাটা কঠিন কিন্তু ইহা অপেক্ষা উত্তম হিঙ্গনঘাটের তুলা হইতে ২২ কিম্বা ২৪ নম্বরের সূতা কাটিলে তাহা কিছু মহার্ঘ হইয়া পড়ে; সে জন্য দশ কিম্বা বার গাঁঠ খাণ্ডোয়াতে চারি পাঁচ গাঁঠ হিঙ্গনঘাট মিশাইলে, উক্ত নম্বরের সূতা অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে ও সুচারুরূপে কাটা যাইতে পারে।

চারি পাঁচ জাতীয় তুলা একত্র মিশাইতে হইলে, এক জাতীয় তুলার কতকগুলি গাঁঠ খুলিয়া তাহাদের তুলা হস্তের দ্বারা পাতলা করিয়া মাটিতে বিছাইতে হয়। এক জাতীয় কতক তুলা বিছান হইলে, অপর জাতীয়

কতকগুলি গাঁট খুলিয়া তাহার তুলা পূর্ব্ব তুলার উপরে বিছাইতে হয়; তাহার উপর অন্যান্য জাতীয় তুলা পর্য্যায়ক্রমে বিছাইতে হয়। এইরূপ যে যে তুলা মিশ্রণে দেওয়া হইবে, তাহা দেওয়া হইলে মিশ্রণের এক Layer বা স্তর (চলিত কথায় "থর") প্রস্তুত হয়। এইরূপে এক স্তরের পর আর এক স্তর, তাহার উপর আর এক স্তর করিয়া যত বড় মিশ্রণ করা দরকার, তত বড় করা হয়।

নিম্নলিখিত মিশ্রণের তালিকা হইতে পাঠকবর্গ মিশ্রণ কিরূপে করা হয় তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন—

মাহা	তারিখ	তুলা	টাংরা*	গাঁঠ	স্তর
জুলাই	২০	হিঙ্গনঘাট		১০	২-২-২-২-২
		গাড়ারবারা (Gadarwara)	৩০		৬-৬-৬-৬-৬
		মল্কাপুর		১৫	৩-৩-৩-৩-৩
		খাণ্ডোয়া (Khundwa)		২০	৪-৪-৪-৪-৪

এই মিশ্রণ চারি জাতীয় তুলার, ৫ স্তরে পূর্ণ করিতে হইবে। প্রথমে হিঙ্গনঘাট তুলার দুইটি গাঁট খুলিয়া, উত্তমরূপে তুলার চাঙ্গড় † ভাঙ্গিয়া মিক্সিং ঘরের ফ্লোরেতে পাৎলা করিয়া বিছাইতে হইবে; তাহার উপর গাড়রবারা ৬ টাংরা খুলিয়া পাৎলা করিয়া বিছাইতে হইবে; তাহার উপর মাল্কাপুরের গাঁঠ খুলিয়া চাঙ্গড় ভাঙ্গিয়া পাতলা করিয়া বিছাইতে হইবে; তাহার উপর খাণ্ডোয়ার ৪ গাঁঠ সেইরূপে বিছাইলে এক স্তর মিশ্রণ পুরা হইবে। এই প্রথম স্তরের উপর পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতীয়, দ্বিতীয়ের উপর

* Unpressed bags of cotton are colloquially known as Tongras in the Western Presidencies.

† তুলা প্রেস করিয়া গাঁট বাঁধিবার সময় তাহা প্রায়ই চাঙ্গড় বা জমাট বাঁধিয়া যায়। সচরাচর হস্ত দ্বারাই চাঙ্গড় ভাঙ্গা হইয়া থাকে। কিন্তু বড় বড় মিলে Bale-breaking machine ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

তৃতীয়, তৃতীয়ের উপর চতুর্থ, চতুর্থের উপর পঞ্চম স্তর করিতে হইবে। এইরূপে পাঁচ স্তর পূর্ণ হইলে মিশ্রণটি সম্পূর্ণ হইবে। মিশ্রণ পূর্ণ হইলে তাঁহার এক পার্শ্ব হইতে (in vertical sections) কাটিয়া কাটিয়া তুলা ব্যবহার করা উচিত, কারণ তাহাতে সকল জাতীয় তুলা সমভাবে আসিবে, উপর হইতে লইলে একই জাতীয় তুলা আসিবে।

অনেক জাতীয় তুলা একত্র মিশ্রণ করিতে হইলে তুলা বাছাই সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত; যতদূর সম্ভব, নানা জাতীয় তুলার তার দীর্ঘতায় এক রকম হওয়া উচিত। ছোট তারের তুলা বড় তারের তুলার সহিত একত্র মিশান হইলে কাতন কার্য্যে তুলার অত্যন্ত অপচয় হয়। কারণ, যে সকল যন্ত্র দীর্ঘ তুলা ব্যবহারের নিমিত্ত সেট (set) করা, তাহাতে ছোট তারের তুলা উত্তমরূপে চলে না, অনেক পড়িয়া যায়; কাজেই তাহার অপচয় ও অপব্যবহার হইয়া থাকে। আর যে সকল যন্ত্র ছোট তারের তুলা ব্যবহারের জন্য সেট করা, তাঁহাতে দীর্ঘ তারের তুলা চালাইলে উহা রোলারে (roller) জড়াইয়া যায়, কাজেই অনেক তুলা নষ্ট হইয়া থাকে। কাতন কার্য্য উত্তমরূপে চালাইতে হইলে ছোট, বড় ও মাঝারি রকমের তুলা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ব্যবহার করা উচিত। মোটা সূতা কাটিবার জন্য অনেকেই কাচ্‌রা * (waste) তুলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিশ্রণের জন্য তুলা বাছাই করিতে যেরূপ সাবধান হওয়া দরকার, সেইরূপ কাচ্‌রা বাছাই করিবার সময়েও সাবধান হওয়া উচিত।

মিশ্রণ একেবারে যত বড় করা যায়, ততই ভাল। কারণ, মিশ্রণ অনেক দিন ধরিয়া ব্যবহৃত হইলে তাহার গুণাগুণ কাতকগণ উত্তমরূপে বুঝিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদের কাজে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। ইহাতে সূতা রঙ্গে ও বলে একই রকম হইয়া থাকে, সে জন্য বাজারে কারখানাধিকারীদের বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হইয়া থাকে। এই হেতু সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে মিশ্রণ বদল না করিয়া একেবারে তিনমাস কিম্বা ছয় মাসের জন্য মিশ্রণ প্রস্তুত করা উচিত; তাহাতে সূতার সমতাহেতু বাজারে তাহার বিশেষ আদর হইয়া থাকে, এবং গ্রাহকগণ নিঃসন্দেহে তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। সপ্তাহে সপ্তাহে কিম্বা মাসে মাসে মিশ্রণ বদল করিলে সূত্র কাতনে সমতা আদৌ থাকে না; প্রত্যেক মিশ্রণ হইতে প্রস্তুত সূতার রঙ্গে কিম্বা

* যে সকল তুলা ধোনাই ও সাফাই করিবার সময় আবর্জনার সহিত পড়িয়া যায়।

বলে কিম্বা অন্য কোন না কোন বিষয়ে প্রভেদ হইয়া থাকে। তাহাতে গ্রাহকগণের মনে সহজেই সন্দেহ জন্মে, কাজেই তাহারা সেইরূপ মাল ক্রয় করিতে পশ্চাৎপদ হয়। তাহাতে কারখানার অধিস্বামীদিগের লাভের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। ছোট ছোট মিশ্রণ, যতদূর সম্ভব, না করাই ভাল। তবে নেহাত দরকার হইলে করিতেই হয়। কিন্তু যখন বাধ্য হইয়া এরূপ করিতে হইবে, তখন, যতদূর সম্ভব মিশ্রণটি পূর্ব্বকৃত মিশ্রণের ঠিক অনুরূপ হওয়া উচিত। ইহাতে সূতার কতকটা সামঞ্জস্য থাকিবার সম্ভাবনা থাকে।

মিশ্রণের উপর কারখানার লাভালাভ নির্ভর করে বলিয়া এই কার্য্যের ভার উপযুক্তলোকের হাতে রাখা উচিত। কারণ, মিশ্রণে ভুল হইলে, পরে তাহা সংশোধন করা যায় না; তাহাতে কারখানার অত্যন্ত লোকসান হয়। লোক জন দ্বারা উত্তমরূপে স্তর প্রস্তুত করাইয়া মিশ্রণ করান কিছু শক্ত নহে; তবে তুলা বাছাই করাই কঠিন। কোন্ কোন্ জাতীয় তুলা একত্র মিশাইলে আবশ্যকীয় প্রকারের সূতা সস্তায় সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা জানাই কঠিন। এ বিষয়ে অনেকদিন ধরিয়া মনোযোগ না দিলে ইহা শিক্ষা করা যায় না, আর অনেকে এ বিষয় শিক্ষা করিতেও পারে না। মিল ম্যানেজারদিগের ভিতরে অনেকে এ কার্য্যে সম্পূর্ণ পটু নহেন। বিশেষতঃ যাঁহারা পূর্ব্বে মিকানিক ছিলেন,পরে ম্যানেজার হইয়াছেন তাঁহাদের ভিতর অনেকেরই পক্ষে প্রথম প্রথম এ কার্য্য বোঝা কঠিন। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, কল কারখানা সকলই সুন্দররূপে চলিতেছে, জল, কয়লা, তেল বা পরিশ্রম প্রভৃতির কিছুরই অন্যায় খরচ নাই, অথচ কারখানার লাভ হইতেছে না। সে স্থলে মিশ্রণের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই লোকসানের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রথম হইতে কার্ডিং কিম্বা স্পিনিং কার্য্যে ঢুকিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এ বিষয় শিক্ষার অনেকটা সুবিধা থাকে; আর তাঁহারা চেষ্টা করিলেই সহজে ইহা বুঝিতে পারেন। অপরের পক্ষে এ বিষয়ে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করায় লাভ নাই, কারণ কাজ না করিলে বা না জানিলে এ চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। অনেক স্থলে দেখা যায়, যিনি মিশ্রণ কার্য্যে ক্লার্ক থাকেন তিনি এ কার্য্যের অনেক বোঝেন, বিশেষতঃ অভ্যাস হেতু তিনি কিসে মিশ্রণের দর কম বেশি হইবে তাহা সহজেই বলিতে পারেন। ইহার উপর কতকটা মিশ্রণের দায়িত্ব

থাকে বলিয়া এ কার্য্যে একজন বিচক্ষণ ও বিশ্বাসী লোক রাখা দরকার। ইহার তুলা বাছাই করিবার ক্ষমতা উত্তমরূপে থাকা প্রয়োজন; কোন্ কোন্ প্রকারের তুলা হইতে কি কি প্রকারের সূতা উত্তমরূপে কাটা যাইতে পারে সে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ সকল গুণ যাঁহার নাই, তাঁহাকে মিশ্রণ কার্য্যে রাখিয়া কোন লাভ নাই।

কারখানায় কিরূপ সূতা কাটা হইবে, তাহা স্থির করিয়া তুলা খরিদ করিবার পরে মিলের অধ্যক্ষদের প্রথম কার্য্য, সমস্ত ক্রীত তুলার গুণাগুণ পরীক্ষা করা। এরূপ করিলে মিশ্রণের সময় মন্দ গাঁট সকল ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং পুনরায় তুলা ক্রয় করিবার সময় এই প্রকারের মন্দ গাঁট সকলের মার্কানুরূপ মার্কাযুক্ত গাঁট না ক্রয় করিলেই মন্দ গাঁট ক্রয়ের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সচরাচর কোন গাঁটের কিম্বা বোরার তুলা পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার দুই তিন স্থান হইতে কিছু কিছু তুলা বাহির করিয়া লইয়া পরস্পর কিম্বা নমুনার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। এই সকল তুলার তার টানিয়া তাহার দীর্ঘতা ও অন্যান্য গুণ পরীক্ষা করিয়া তুলাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হয়। যে সকল তুলা অপক্ক অবস্থায় বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত হইয়া থাকে, তাহারা সুপক্ক তুলা হইতে নরম ও ক্ষীণ হয়, আর তাহাদিগের তারের জোড়েনে সমতা আদৌ থাকে না। যে সকল তুলা অতিপক্ক অবস্থায় বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত হয় তাহাদের তারগুলি প্রায়ই কোঁকড়ান কোঁকড়ান, এবং অধিক শুষ্কতা হেতু কড়া ও ভঙ্গপ্রবণ হইয়া থাকে; উত্তম তুলার সহিত সহজে মিশ খাইতে চাহে না, আর উত্তম তুলার সহিত মিশিলেও তাহার গুণ অনেক নষ্ট করিয়া থাকে। যে সকল লোক তুলা বাছাই করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের দর্শনশক্তি ও স্পর্শশক্তি (sensitiveness of touch) অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার; তুলা বাছাই কার্য্যে দর্শনশক্তি অপেক্ষা স্পর্শশক্তি অধিক কাজে লাগিয়া থাকে, এ জন্ত সতত অভ্যাস দ্বারা এই শক্তির বৃদ্ধি সাধন আবশ্যক। তুলার বাছাই করিতে ভুল হইলে মিশ্রণে নিশ্চয়ই ভুল হইবে এবং তাহাতে কারখানার বিশেষ লোকসান; সে জন্ত এই সকল কার্য্যে বিচক্ষণ ও বহুদর্শী লোকের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের অনেক মিলের অধিস্বামিগণ এই কার্য্যের দায়িত্ব না বুঝিয়া অল্প বেতনের লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন; তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ

লোকসান হইয়া থাকে। এই ঘোর বিজাতীয় প্রতিযোগিতার দিনে ভারতের সমস্ত মিলঅধিকারীর এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

মিশ্রণ পুরা হইলে তাহা একেবারে ব্যবহার না করিয়া কিয়দংশ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। মিশ্রণ পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার কিয়দংশ লইয়া প্রথমে ওজন করিতে হয় তাহার পর, তাহা নানাপ্রকার ধোনাই ও সাফাইয়ের কলে চালাইতে হয় এবং তাহাতে কত কাচ্‌রা নির্গমন ও অন্যান্যরূপ লোকসান হয় তাহা নোট্‌ করিতে হয়। তাহার পর তাহাকে কাতন যন্ত্রে চালাইয়া দেখিতে হয়। কিরূপ ফল হয়, তাহাও নোট্‌ করিতে হয়। এই সকল ফল সন্তোষজনক হইলে সমগ্র মিশ্রিত তুলা ব্যবহার করা যাইতে পারে; নচেৎ আবশ্যক মতে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহা পুনরায় পরীক্ষা ও ব্যবহার করা উচিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

সুন্দরীনন্দ চরিত।

তাঁরা এ ভুবনে ধন্য দয়ালুর অগ্রগণ্য
যাঁরা জীব উদ্ধার কারণ
বিশ্বপ্রেমে মগ্নহিয়া শুভ উপদেশ দিয়া
অনুগ্রহ করেন বর্ষণ॥

ভগবান্ বুদ্ধ, কপিলবাস্তু নগরীস্থ বটকাননে অবস্থান করিতেছেন। শাক্যরাজের পুত্র নন্দ, তাঁহার সন্দর্শনের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। নানা কথোপকথনের পর ভগবান্ বলিলেন, "বৎস নন্দ! তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।" নন্দ বলিলেন, "ভগবন্! প্রব্রজ্যায় পুণ্য লাভ হইলেও উহা আমার অভিমত নহে; আমি সমুদয় পরিব্রাজকের উপাসক হইয়া সর্ব্ববিধ উপকার দ্বারা তাঁহাদের ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্য করিব।" এই কথা বলিয়া রত্নময় মুকুটে ভগবানের চরণ স্পর্শ করতঃ নন্দ প্রিয়তমার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহে গমন করিলেন ও মনোহর উদ্যানে লাবণ্যবতী প্রেয়সীর সহবাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহারা পরস্পরের বিরহ সহিতে পারিতেন না। এক-দিন ভগবান্ গুণবানেরপ্রতি প্রীতি-নিবন্ধন ভিক্ষুগণের সহিত স্বয়ং নন্দের ভবনে আগমন করিলেন।

নন্দ ভগবানের আগমনে আহ্লাদিত হইয়া পাদ বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাকে মহামূল্য আসনে উপবেশন করাইলেন এবং পূজা করতঃ বলিলেন, "ভগবন্! এ কোন পুণ্যের পরিণাম; যেহেতু ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া স্বয়ং দর্শন দিলেন। মহাত্মাদের স্মরণ, দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ মহাফলজনক। আহা! এই বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মার দেহজ্যোতিঃ সন্দর্শনে কাহার না হৃদয় বিকসিত হয়! মহাত্মাদের দর্শন, দান অপেক্ষা প্রিয়, পুণ্য অপেক্ষা ফলজনক, সদাচার অপেক্ষা প্রশংসনীয়। ভগবান্ নন্দের তদ্রূপ ভক্তি ও প্রণয়ে চারুতর পূজালাভ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দ স্বর্ণপাত্রে নিজ হৃদয়ের ন্যায় মধুর কতকগুলি উপহার লইয়া ভগবানের পশ্চাৎ গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রিয়তমকে ভগবানের পশ্চাৎ গমন করিতে দেখিয়া, তাঁহার বিরহভয়ভীতা প্রেয়সী পত্নী সুন্দরী তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। সেই সময় গুরুজনের অগ্রে সরল ও তরল দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া ভয়প্রযুক্ত মুকুলিত নয়নে স্বামীর প্রতি ঈষৎ কটাক্ষপাত করতঃ সেই সুন্দরী যে ক্ষণকালের জন্য মৌনবদনা হইলেন, তাহাতেই "হে নাথ তুমি যেও না" এই কথা অধিকতর রূপে বলা হইয়াছিল। নন্দ, প্রণয়িনীকে চঞ্চলনয়না দেখিয়া, "এই আসিতেছি," বলিলেন। তৎপরে আশ্রমে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "ভগবন্! তবে গৃহ গমনের জন্য অনুমতি করুন!" কারণ, তখন নন্দ প্রিয়তমার বিরহে অধীর হইয়াছিলেন। "ভগবান্ আসন পরিগ্রহ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক নন্দকে বলিলেন, "বৎস নন্দ! গমনের জন্য এত ত্বরা কেন? হায় বিষয়ের আস্বাদে ও গৃহসুখে যাহারা মোহিত, তাহাদের মন কোন প্রকারেই বৈরাগ্যের প্রতি ধাবিত হয় না। গুণ জীবনের আভরণ, বিবেক গুণের আভরণ, শান্তি বিবেকের আভরণ, বৈরাগ্য শান্তির আভরণ। অতএব বৎস, রাজপুত্র নন্দ! তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রব্রজ্যা পরিগ্রহ কর, এই পার্থিবসম্পদ্ যৌবন বসন্তের ন্যায় কেবল ভোগকালে সুখপ্রদ। আত্মার কল্যাণের জন্য ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ কর, এই অসার গৃহ-সংসার পরিত্যাগ কর।" ভগবানের করুণাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া পত্নী প্রণয়ে অনুরক্ত নন্দ বলিলেন, "ভগবন্ প্রব্রজ্যা অপেক্ষা ভিক্ষুসঙ্ঘের উপকারের জন্য গৃহস্থ ধর্ম্মে আমার অধিক প্রীতি।" এই কথা বলিতে বলিতে ভগবানের কথা অতিক্রম করিতে অসমর্থ ও প্রিয়তমার প্রেমে আকৃষ্টচিত্ত

হইয়া নন্দ কিয়ৎকালের নিমিত্ত সংশয়াকুল হইলেন। কিন্তু ভগবান্ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ব্রত গ্রহণের জন্য আদেশ করিতে লাগিলেন। সাধুগণ পরোপকারে উদ্যত হইয়া প্রায়ই যোগ্যতার বিচার করেন না। যখন নন্দ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে প্রব্রজ্যা গ্রহণে বাঞ্ছা করিলেন না, তখন আপনা হইতেই তাঁহার দেহে প্রব্রজ্যার লক্ষণ লক্ষিত হইল। তখন তিনি গৈরিকবসনপরিধারী, কমণ্ডলুহস্ত ও সুবর্ণবৎকান্তিবিশিষ্ট হইয়া মহাপুরুষের লক্ষণে শোভিত হইলেন এবং ভগবানের আদেশে আরণ্য ফলমূলে তাঁহার জীবন যাপিত হইতে লাগিল। নন্দ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেও শশাঙ্ক যে প্রকার নিজদেহে সুস্পষ্ট মৃগলাঞ্ছন ধারণ করেন, তদ্রূপ তিনি প্রিয়তমার কমনীয়ছবি হৃদয়ে বহন করিতে লাগিলেন। মন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হইলেও অনুরাগ কোন্ পথে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, বলিতে পারি না, ক্ষালিত হইলেও উহা হৃদয় পরিত্যাগ করিতে চায় না। বিরহে অক্ষম নন্দ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কাননে বিচরণ করিতেন, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার প্রেয়সী সুন্দরীকে বিস্মৃত হইতেন না; ভাবিতেন, "হায় ভগবান্ নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্য এইরূপ যত্ন করিলেন কিন্তু আমার রাগাসক্ত চিত্ত কিছুতেই বিমল ভাব প্রাপ্ত হইতেছে না। সংসারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম, নিঃসঙ্গব্রত অবলম্বন করিলাম, তথাপি আমার মন সেই হরিণনয়নাকে ভুলিতে পারিতেছে না। হা প্রেয়সি! 'ক্ষণকাল মধ্যেই আমি আসিতেছি' এই কথা বলিয়া আগমন করতঃ তোমার দর্শনে একান্ত অন্তরায় এই কৃতঘ্ন ব্রত অবলম্বন করিলাম! আমার বিরহে সেই প্রিয়তমা সুন্দরী নদীপুলিনস্থিতা বিরহিণী চক্রবাকীর ন্যায় সৌধতলে একাকিনী শয়ন করিয়া শোকোচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। হা প্রিয়ে! আমি সত্যনিষ্ঠা হইতে পরিভ্রষ্ট ও বঞ্চকের ন্যায় তোমার চিত্তহারী হইয়া এই মিথ্যাব্রত অবলম্বন করিয়াছি। আমি ব্রত পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়ার নিকটে যাই। প্রণয়াসক্ত চিত্ত ব্যক্তিদের তপস্যা দুঃসহ সন্তাপ মাত্র। আহা! সেই রাজপুত্রী, আমার প্রিয়তমা সুন্দরী, বহু বিলম্বেও যাইতে না দেখিয়া আমাকে নিষ্ঠুর মনে করতঃ অভিনব বিরহে কি করিবেন জানি না। যে মুহূর্ত্তে ভগবান্ এই বনে থাকিবেন না সেই মুহূর্ত্তেই আমি গৃহে চলিয়া যাইব, ইহাই

নিশ্চয়। ,এই শিলাতলে গৈরিক ধাতু দ্বারা সেই চন্দ্রমুখীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করি, যদি ইহাদ্বারা কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য লাভ হয়। অথবা সেই প্রিয়তমাকে কি প্রকারে চিত্রিত করিব, সুধাকর ও সরসিজে যাঁহার সৌন্দর্য্যের লেশ মাত্র লক্ষিত হয়?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই সুন্দরীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার নয়ন হইতে বিগলিত বাষ্পবারিতে অঙ্গুলি ধৌত হইতে লাগিল। তাহার পর প্রিয়ার মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া বিরহযন্ত্রণায় নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিব্রাজকগণ নন্দের অবস্থাবলোকনে বিরক্ত হইয়া ভগবান্‌কে বলিলেন, "প্রভো! লোকে কুক্কুরের গলদেশে যেমন পুষ্পমালা প্রদান করে, তদ্রূপ আপনি বাৎসল্যপ্রযুক্ত এই দুর্বিনীতকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছেন। দেখুন, নন্দ শিলাতলে প্রিয়ার মুখ অঙ্কিত করিয়া তাহাকে কত কি বলিতেছে এবং তাহারই ধ্যানে মগ্ন আছে। ভগবান্ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস নন্দ! একি?"

নন্দ বলিলেন, "ভগবন্! সত্য সত্যই আমার চিত্ত কান্তার প্রতি অনুরক্ত, ভিক্ষুগণের অভিমত এই কাননবাসে আমার মন অভিলাষ করে না। ভগবান্ বুদ্ধ তাহা শুনিয়া তাঁহার মুখের প্রসন্নতাদ্বারা নন্দের সংসারানুরাগ ধৌত করিয়া বলিলেন, "হে সাধো! তোমার সংসারের প্রতি মতি করা যুক্তিযুক্ত নহে, বিজ্ঞ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। কোথায় পবিত্রতম যোগ, আর কোথায় ক্ষণিক সুখপ্রদ নিন্দনীয় বিষয়োপভোগ! দুরতিক্রম্য এই নিকৃষ্ট সুখাভিলাষ মানবের কল্যাণ অপহরণ করে। হায়! প্রেমান্ধ ব্যক্তিদের এই দশাই ঘটিয়া থাকে!" ভগবান্ এইরূপ বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া "এখানে থাক" এই কথা বলিতে বলিতে নিজ কার্য্যে প্রস্থান করিলেন। নন্দ গমনের উত্তম অবসর পাইয়া প্রিয়তমার দর্শন লালসায় প্রফুল্লচিত্তে স্বগৃহে গমন করিলেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেই নগরী দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধ সেই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি নন্দ! এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হইতেছে?" নন্দ বলিলেন, "ভগবন্! আমার বনবাসে ইচ্ছা নাই। অনুরাগাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদের কোন ক্রিয়াই সফল হয় না। যে প্রকার পঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গ উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালযাপন করে, তদ্রূপ আমি

অনুরাগাসক্তচিত্তে এই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি। আমি প্রব্রজ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আমার অনন্ত নরক হউক। মঞ্জিষ্ঠায় রক্ত-বর্ণ বসন কদাচ শুভ্রতা লাভ করে না"।

এই কথা বলিয়া গমনে উদ্যত হইলে, ভগবান্ বুদ্ধ নন্দকে নিবারণ করতঃ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিলেন, "হে নন্দ! বিপর্য্যয় ঘটাইও না, তত্ত্বজ্ঞানে অবহেলা করা বড়ই নিন্দনীয়। যাঁহারা বিবেকদ্বারা বিশদচিত্ত, চরিত্রবান্, জ্ঞানী, তাঁহাদের বুদ্ধি অসার সুখের নিমিত্ত অকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না। তুমি গৃহজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছ, পুনরায় কেন তাহাতে ধাবিত হইতেছ? সারঙ্গ একবার নির্গত হইলে কি পুনরায় জালে প্রবেশ করে?" এই সকল শ্রবণ পূর্ব্বক নন্দ ভগবানের শাসনে বদ্ধ হইয়া, নিজ প্রিয়তমা পত্নী সুন্দরীকে চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর একদিন নন্দকে আশ্রমের মার্জ্জনায় নিযুক্ত করিয়া ভগবান্ ধ্যান করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। নন্দ ভগবানের আদেশে আশ্রমের মার্জ্জনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তবৃত্তিস্থ রজঃ অর্থাৎ অনুরাগের ন্যায় সেই ভূতলের রজঃ অর্থাৎ ধূলি দূরীভূত হইল না। তিনি জলাহরণের নিমিত্ত কুম্ভ লইয়া গিয়া অন্যাসক্তিনিবন্ধন শূন্য কলস লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। সেই সকল ঘটনায় নন্দের চিত্ত নিতান্ত বিষণ্ণ হইল, তিনি সুন্দরীর দর্শনের আশায় আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানপ্রযুক্ত সেই বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, ঝটিতি নন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! রমণীর প্রতি অভিলাষ পরিত্যাগ কর, নীলীবর্ণের ন্যায় তোমার চিত্তে কি একপ্রকার অনুরাগ বদ্ধমূল হইয়াছে, যাহা বহু চেষ্টায়ও দূরীভূত হইতেছে না। অসৎ বন্ধুগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়বর্গ, জীবগণকে বিষয়ের আস্বাদ প্রদান করিয়া দুস্তর নরকে পাতিত করে।" এইরূপ নানা উপদেশান্তে ভগবান্ নন্দকে লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন, সেখানে বনাগ্নিতে দগ্ধা কদাকারা একটী দৃষ্টিহীনা মর্কটী দেখাইয়া বলিলেন, "নন্দ! এই যে কদাকারা মর্কটী দেখিতেছ, এও কোন ব্যক্তির প্রিয়দর্শনা যোগ্যপাত্রী, ইহার প্রতিও কাহারও অনুরাগ হয়। বস্তুতঃ পদার্থের কোন সৌন্দর্য্য কিংবা অসৌন্দর্য্য নাই, হৃদয়ের অনুরাগই বস্তুর রমণীয়তা অবলোকন করে। যে যাহার প্রিয়, সেই তাহার পক্ষে রমণীয়। বৎস নন্দ! তুমি পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সত্য

করিয়া বল দেখি, সেই তোমার পত্নী সুন্দরীর সহিত এই মর্কটীর লাবণ্যের কি পার্থক্য ? আমরা প্রার্থী নহি, সুতরাং আমাদের নিকট সৌন্দর্য্যের কি প্রভেদ হইবে ? প্রার্থী ব্যক্তিই প্রার্থিত বস্তুর চারুতা অনুভব করিতে পারে। আমি সেই সুন্দরী ও এই মর্কটীতে কোনই বিশেষ দেখিতেছি না ; মাংস, চর্ম্ম ও অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এই যন্ত্রে সময়ের গুণে রমণীয়তা বোধ হয়।"

ভগবান্ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে নন্দ বলিলেন, "ভগবন্ ! আপনার এই প্রশ্ন অত্যন্ত অনুচিত। ভগবান্ কি বলেন, 'যাঁহারা বিশ্বগুরু তাঁহাদের আর কে উপদেশ দিবে'.? অধিকসুন্দরীর প্রতি ঔৎকর্ষপ্রযুক্ত অধিক প্রণয় হইয়া থাকে। আমার সেই প্রেয়সী সুন্দরীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না, জ্যোৎস্নার সহিতও আমার প্রিয়ার কান্তির উপমা হয় না, হংস ও হরিণ যথাক্রমে তাঁহার বিলাসগতি ও নয়নশোভা অপহরণ করিয়া ভয়-প্রযুক্ত কানন আশ্রয় করিয়াছে।" ভগবান্ রাগাসক্তচিত্ত নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্যপ্রভাব নিবন্ধন তাঁহাকে সুরলোকে লইয়া গেলেন এবং সেখানে দেবরাজের নন্দনকাননে সমুদ্র মন্থন কালে সমুত্থিতা অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী দিব্যাঙ্গনা সকল দেখাইলেন। সেই সুরসুন্দরীগণের অরুণবৎ কান্তি, লোহিত পদ্মের ন্যায় চরণতল, অঙ্গুলি সকল পারিজাত পল্লবের ন্যায় মনোহর। পূর্ণযৌবনা অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী সেই সুরললনাগণকে সহসা নিরীক্ষণ করিয়া নন্দ স্তম্ভিত হইলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, "বৎস নন্দ ! এই দেবাঙ্গনারা দেখিতে কেমন ? ইহাদের সহিত তোমার পত্নী সুন্দরীর কোন রূপের পার্থক্য আছে কি ? তোমার সুন্দরী অপেক্ষা ইহারা যদি অধিক সুন্দরী হয়, তুমি অনন্যচিত্তে প্রসন্ন মনে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কর, এই অপ্সরা সকল তোমাকে প্রদান করিব।" ভগবানের এই বাক্যে নন্দ নিশ্চিন্তচিত্তে ব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্গীয় ললনাগণের সমাগম প্রত্যাশায় নিজ বনিতা সুন্দরীর প্রতি নন্দের অনুরাগ বিস্ময়প্রাপ্ত হইল। কেন হইবে না ? বাহিরের সৌন্দর্য্য লইয়া যাহাদের ক্রয় বিক্রয়, তাহাদের ভালবাসার স্থায়িত্ব কোথা হইতে হইবে ? হায় ! প্রবাসে বিস্মৃতি ও অন্যের সহবাস নিবন্ধন পুরুষগণের অভ্যাসগত ভালবাসা হঠাৎ লীন হয়। শরীরীদিগের যৌবনের রমণীয়তা ক্ষণিক,তজ্জন্য প্রণয়ও ক্ষণিক, ইহা সত্য কিংবা নিত্য অথবা সুখকর হইতে পারে না।

তাহার পর ভগবান্ নন্দকে আশ্রমে লইয়া গেলেন, নন্দ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। একদা নন্দ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে কুম্ভীনামক এক ঘোর নরক দেখিতে পাইলেন, সেখানে পাপিগণকে প্রতপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিমজ্জিত করিয়া যাতনা প্রদান করিতেছে। নন্দ পাতকীদিগের দারুণ যন্ত্রণা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নরকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্রত্য লোকেরা বলিল, "কামাসক্তচিত্ত নন্দের জন্য এই নরক সৃষ্ট হইয়াছে। অদ্যাপি তাহার হৃদয়হইতে বাসনা বিদূরিত হয় নাই। সে স্বর্গাঙ্গনাদের কামনায় মিথ্যা ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিতেছে। যাহারা কপট ব্রত আচরণ করে এবং লোভী, রাগদ্বেষহিংসায় যাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ, তাহাদের অনন্ত কালের জন্য এই কুম্ভীনামক নরকে বাস হয়।" নন্দ ইহা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল, কুম্ভী নামক নরকে পতিত হইয়া যেন তিনি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তিনি অনেকক্ষণ পশ্চাত্তাপ অনুভব করিলেন, তাঁহার সমস্ত বাসনা দূরীভূত হইল, তাহার পর একান্ত মনে ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহ এবং সংশয়বিমুক্ত হইয়া তাঁহার চিত্ত শরৎ-কালের সাগরবারির ন্যায় বিমল ভাব ধারণ করিল। তখন নন্দ কামনাশূন্য ও পবিত্র চিত্ত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিলেন এবং ভগবান্ জিনদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমার অপ্সরাগণে প্রয়োজন নাই, সুন্দরীকেও আর আমি চাহি না। ইহারা আপাত রমণীয়, পরিণামে অতি বিরস। যখন এই সকল বস্তু ভাবনা করা যায় তখনই হৃদয়বৃত্তি কলুষিত হয়, ঐ সকল মন হইতে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই হৃদয়ের ভার যায়, হৃদয় প্রসন্ন হয়।" নন্দের এই সকল কথা শ্রবণে ভগবান্ বুদ্ধদেব ভাবিলেন, নন্দ যথার্থই নির্ব্বাণোচিত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

অনন্তর পরিব্রাজকগণ ভগবান্ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! নন্দ কোন্ কুশল কর্ম্মের জন্য এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিলেন, আমাদিগকে বলুন।" ভগবান্ বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! নন্দ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারই পরিণামে এই সিদ্ধিলাভ হইল। পবিত্র বংশে জন্ম, সুন্দর দেহ, প্রণয়িনী ভার্য্যা, সুখপ্রদ সম্পৎ, সাধুগণের প্রিয়ব্যবহার, অবশেষে শান্তি সলিলে স্নান ও নির্ব্বাণ,—এ সকল কুশল কর্ম্মরূপ কুসুমের সৌরভ।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যেরা এমন অজ্ঞান ছিলেন না যে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও মেঘ প্রভৃতি বস্তুকে তাঁহারা এক একটা প্রকাণ্ড জীব বলিয়া মনে করিবেন। তথাপি তাঁহাদের চিত্তে অহং ও ইদংএর স্বরূপ জ্ঞান তখনও সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় নাই; এজন্য তাঁহারা এই সকল প্রাকৃতিক বস্তুকে আপনাদেরই ন্যায় শক্তিমন্ত—শক্তির আধার বলিয়া মনে করিতেন। প্রথমে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ অগ্নিতে, বিশেষ বিশেষ মেঘে, বিশেষ বিশেষ বাত্যায় শক্তির প্রকাশ দেখিতেন। আকাশকেও এক অখণ্ড বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। কালক্রমে তাঁহারা বহুত্ব ছাড়িয়া একত্বে পহুঁছিতে লাগিলেন। ভূলোক ও দ্যুলোকে যত অগ্নি আছে, সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন এক অগ্নি। যত মেঘ, বিদ্যুৎ ও বজ্র আছে, সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন এক ইন্দ্র; এবং এক অখণ্ড সর্ব্বাধার আকাশদেবতা হইলেন বরুণ। এইরূপে যেমন এক এক জাতীয় বস্তুতে এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইলেন, তেমনি অন্য দিকে দেবতাগণের ক্ষমতা ও অধিকার (function) নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল। বজ্রধারী, মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র জাতীয় সেনানায়ক হইয়া উঠিলেন। ঋষি বলিতেছেন—"হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধের নেতা, তুমি মরুৎগণের সহিত প্রধান প্রধান যুদ্ধে স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক শত্রু সংহারে সমর্থ· তুমি শূরগণের সহিত স্বয়ং (সংগ্রামসুখ) অনুভব কর।" "হে উগ্র ইন্দ্র! তোমার ভক্ত যজমানের বিরুদ্ধকারীকে উগ্ররক্ষণ-কার্য্যরূপ তেজোময় উপায় সমূহ দ্বারা অবনত করিয়া দাও। তুমি পূর্ব্বকালে যেরূপ (আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলে) আমাদিগকেও সেইরূপ লইয়া যাও।" অগ্নি পাবক। তৃণকাষ্ঠাদির ন্যায় তিনি

ঋগ্বেদের সময়ে আর্য্যদের চিত্তে অহং ও ইদংএর স্বরূপ জ্ঞান সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই।

প্রথমে বিশেষ বিশেষ বস্তুতে এবং পরে এক এক জাতীয় বস্তুতে শক্তির প্রকাশ দর্শন

দেবতাগণের ক্ষমতা ও অধিকার নির্দ্দেশ—ইন্দ্র জাতীয় সেনানায়ক

অপরাধ ও পাপ সকলকেও দগ্ধ করেন। সুতরাং তিনি দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে মধ্যবর্ত্তীর স্থান অধিকার করিলেন। যজ্ঞস্থলে দেবোদ্দেশে অন্ন, ঘৃত, ব্রীহি ও যবাদি যাহা কিছু উৎসর্গিত হয়, অগ্নি সে সমস্তকে দেবগণের সমক্ষে লইয়া যান। আবার দেবগণকেও তিনি প্রসন্ন করিয়া যজ্ঞস্থলে লইয়া আসেন। পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের পূজাতেও অগ্নিদেবতা মধ্যবর্ত্তী। আবার অগ্নিদেবতাকে সাক্ষী করিয়া বিবাহাদি সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করিতে হয়; সুতরাং পারিবারিক ও সামাজিক সমস্ত সম্বন্ধের পবিত্রতা বিধানও করেন অগ্নি। বৈদিক ঋষি বলিতেছেন—"অগ্নিকামনাকারী ঋত্বিকগণ মনুষ্য সমাজে অগ্নিকে প্রবর্ত্তিত করিয়া, মনুষ্যদিগের পবিত্র হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন; সে অগ্নি এক্ষণে সোম পানে মত্ত হয়েন, হোতা হয়েন, যজ্ঞ গ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানের পথ দেখাইয়া দেন, সর্ব্বত্র বিচরণ করেন এবং হোমের দ্রব্য দেবতাদের নিকট বহন করেন।" "যে সকল সাধুশীল পিতৃলোক দেবতাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া হোমের দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করেন এবং ইন্দ্রের সহিত এক রথে আরোহণ করেন, হে অগ্নি! সেই সমস্ত দেবারাধনাকারী যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী প্রাচীন ও আধুনিক পিতৃলোকদিগের সহিত এস!"

অগ্নি দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী এবং সমস্ত পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধের পবিত্রতা বিধায়ক

আকাশ অতি শুভ্র ও নির্ম্মল, প্রশান্ত ও বিশাল। আকাশ সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বসাক্ষী, সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল। এজন্য আকাশ-দেবতা বরুণ সমস্ত নৈতিক গুণের, সমস্ত পুণ্যের আধার বলিয়া কল্পিত হইলেন; এবং ঋত অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া আর্য্যসমাজে পূজিত হইতে লাগিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় বরুণের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিশেষণ গুলির প্রয়োগ দেখা যায়:—সর্ব্বদ্রষ্টা, শুদ্ধবল, সুকর্ম্মা, সত্যবান্, সত্যদর্শী, হিংসাবর্জ্জিত, ক্রোধবিহীন, দানশীল, সদাশয় ইত্যাদি। বরুণ সর্ব্বদ্রষ্টা,—তিনি পাপ পুণ্য সমস্ত দেখিতে পান; কিন্তু তিনি পাপীর প্রতিও কৃপাপরবশ। অনেক ঋকে এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—"অপরাধ করিলেও যে বরুণ দয়া করেন।" হৃদয়ে পাপের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইলে, আর্য্যগণ বরুণের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেন—"হে বরুণ, আমরা মনুষ্য; দেবগণের সম্বন্ধে আমরা যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ

বরুণ শুদ্ধচেতা, পাপ পুণ্যের সাক্ষী এবং পরিত্রাতা

করিয়াছি, সেই সকল পাপ প্রযুক্ত আমাদিগকে হিংসা করিও না।" "হে বরুণ! যদি আমরা কখনও কোন দাতা, মিত্র, বয়স্য, ভ্রাতা, নিকট প্রতিবেশী বা মূকের প্রতি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা নষ্ট কর।" "হে বরুণ দ্যুত-ক্রীড়ায় প্রবঞ্চনাকারী পাশক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানবশতঃ (অপরাধকরি); তাহা হইলে তুমি শিথিল (বন্ধনের) ন্যায় তৎসমুদায় হইতে মুক্ত কর।"

বরুণের ন্যায় শুদ্ধচেতা দেবতা কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইল

কিন্তু কেবল মাত্র অন্ধ জড়শক্তির সংস্রবে আসিয়াই কি আর্য্যেরা বরুণের ন্যায় শুদ্ধচেতা পুণ্যবান্ এক দেবতা কল্পনা করিতে সমর্থ হইলেন? এরূপ মনে করিলে মোক্ষমূলরের ন্যায় আমরাও বিষম ভ্রমে পতিত হইব। সর্ব্বদাই আমাদিগকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতি পূজার মধ্যে আমরা আর্য্যদের জীবনের একটী মাত্র দিক দেখিতে পাই। উহার অন্তরালে তাঁহাদের আর একটী বৃহত্তর ও মহত্তর জীবন আছে। এখানে আর্য্যদের সেই সামাজিক জীবন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধনের দিকে আর্য্যদের অধিক দৃষ্টি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আর্য্যজাতি শান্তিপ্রিয়। সত্য বটে, অনার্য্যদের সহিত তাঁহাদিগকে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল; তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে,আর্য্যেরা সমরপ্রিয় জাতি (military nation) ছিলেন না। ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধনের দিকেই তাঁহাদের অধিক দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল।

এজন্যই ঋগ্বেদে ঋত অর্থাৎ সমাজধর্ম্মরক্ষক পিতৃপুরুষগণের প্রেতাত্মার পূজা, বীরপুরুষগণের প্রেতাত্মার পূজা নহে

এজন্যই আমরা ঋগ্বেদে বীরপুরুষগণের প্রেতাত্মা-পূজার কোনও নিদর্শন পাই না। যে সকল পিতৃপুরুষ ঋগ্বেদে পূজিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যজ্ঞরক্ষক—ঋত অর্থাৎ সমাজধর্ম্মরক্ষক। এই সকল শুদ্ধচেতা, সৎকর্ম্মনিরত পুরুষগণ আর্য্যসমাজে প্রাদুর্ভূত হইয়া শুদ্ধ

আর্য্যসমাজে শুদ্ধচেতা ঋষিগণের আবির্ভাব এবং শুদ্ধচেতা বরুণ দেবতা কল্পনা

চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন এবং আর্য্যসমাজে ঋত অর্থাৎ ধর্ম্মনিয়মাদি সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই, যেমন একদিকে সাধুশীল পিতৃপুরুষগণের প্রেতাত্মার পূজা আরম্ভ হইল; তেমনি অন্যদিকে শুদ্ধবল, সুকর্ম্মা, ধর্ম্মরক্ষক এক বরুণ দেবতা কল্পনা করা সম্ভব হইয়া উঠিল। অগ্নির স্তব করিতে করিতে ঋষি পিতৃপুরুষগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন—"হে অগ্নি! যে

সকল পিতৃলোক হোম করিতে জানিতেন এবং বিবিধ ঋক্ রচনা পূর্ব্বক স্তব প্রস্তুত করিতেন, সুতরাং যাঁহারা নিজ সৎকর্ম্ম প্রভাবে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে লইয়া (যজ্ঞ স্থলে) আমাদের নিকট এস,......তাঁহাদিগের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট কব্য অর্থাৎ দ্রব্য রহিয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম অর্থাৎ শেষ মণ্ডলে আসিয়া আমরা এই পিতৃলোক-পূজা দেখিতে পাই। এই পূজা কালক্রমে বর্দ্ধিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কল্পান্তর্গত গৃহ্যসূত্রে বিবাহাদি দশ সংস্কার সম্বন্ধীয় নান্দী শ্রাদ্ধে পরিণত হয়। পিতৃপুরুষগণ গার্হস্থ্য ও সমাজধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা—সমস্ত কল্যাণকর বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তক ও রক্ষক; এ জন্যই আর্য্যগণ পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিয়া,—তাঁহাদের উদ্দেশে অন্নযবাদি উৎসর্গ করিয়া, এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, বিবাহাদি প্রত্যেক গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতেন। এইরূপে অগ্নি, বরুণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় পিতৃপুরুষগণেরও ক্ষমতা ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইল।

পিতৃপুরুষ পূজার শেষ পরিণাম বিবাহাদি দশ সংস্কার সম্বন্ধীয় নান্দীশ্রাদ্ধ

কিন্তু অন্যদিকে দেবতাদের মধ্যে কে প্রধান, আর্য্যগণের মনে এই এক প্রশ্ন উদিত হইল। এ সময় ভিন্ন ভিন্ন দেবোপাসকগণের মধ্যে কিছু কিছু বৈরিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ও লক্ষিত হয়। দেবোপাসকেরা একে অন্যকে আক্রমণ করিতেছেন—পরস্পরের নিন্দা করিতেছেন। কোন উপাসক অগ্নিকে, কেহ বা ইন্দ্র অথবা বরুণকে, অন্য কেহ বা অন্য কোন দেবতাকে দেবতাগণের সম্রাট্, প্রজাপতি অর্থাৎ সৃষ্টির সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া অর্চ্চনা করিতেছেন। যখন যে দেবতার পূজা হইতেছে, তখনই তিনি সর্ব্বময় প্রভু বলিয়া কল্পিত ও স্তুত হইতেছেন। এইরূপ অবস্থাকেই মোক্ষমুলর Henotheism নাম দিয়াছেন। আর্য্যেরা তখনও Theism অর্থাৎ একেশ্বরবাদে পঁহুছান নাই। কালক্রমে আর্য্য ঋষিগণের চিত্তে বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হইল। ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"সেই বনই বা কি? সেই বৃক্ষই বা কি? যাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ পূর্ব্বক এই দ্যুলোক ও ভূলোক নির্ম্মাণ করা হইয়াছে?"

দেবোপাসকগণের মধ্যে পরস্পর বৈরিতা এবং এক এক সময় এক এক দেবতার প্রাধান্য কীর্ত্তন

এই অবস্থা Henotheism, Theism নহে

আর্য্যগণের চিত্তে বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উদয়

বিদ্বান্‌গণ, তোমরা একবার আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন।" অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানের পর আর্য্য ঋষিরা এই প্রশ্নের এইরূপ মীমাংসা করিলেন—"দ্যুলোক ও ভূলোক, ইহারাই শেষ নহেন, ইহাদের উপর আরও একজন আছেন। তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। তিনি অন্নের প্রভু। যে কালে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সময় তিনি আপনার পবিত্র চর্ম্ম (শরীর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন।" "সেই এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ।" "বিশ্বকর্ম্মা যিনি তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নির্ম্মাণ করেন, ধারণ করেন, সপ্তর্ষির পরবর্ত্তী যে স্থান তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্‌গণ এইরূপ কহেন।" "যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।"

সৃষ্টিকর্ত্তৃভাবের প্রথম স্ফূর্ত্তি

ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম অর্থাৎ শেষ মণ্ডল হইতে উপরের, কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের শেষভাগে ঋষিরা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, ও পরমাত্মা নামে এক মহান্‌ সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল মন্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তার ভাব আরও প্রশস্ত ও উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এখানে আসিয়াই ঋষিরা বিরত হন নাই। জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঋষিরা ঈশ্বরজ্ঞানের মধ্য দিয়া ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণভাগে প্রবেশ করিয়াই, ইহার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে তৎ, স প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ঋষিরা এক সর্ব্বব্যাপী অনির্দ্দেশ্য মহাসত্তাকে লক্ষ্য করিতেছেন। সেই মহান্‌কে তাঁহারা চিত্তে ধারণ করিতে অক্ষম,—বাক্যে ব্যক্ত করিতেও অক্ষম। এজন্য ঋষিরা নানাবিধ রূপক ও উপমা অবলম্বন করিয়া, সেই অনির্দ্দেশ্য মহান্‌কে চিন্তায় আয়ত্ত ও বাক্যে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন; এবং

সৃষ্টিকর্ত্তৃভাবের চরমোৎকর্ষ

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম স্ফূর্ত্তি

তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টার ফলস্বরূপ অবশেষে তাঁহারা বহির্জ্জগতে এক অদ্বিতীয় মহাশক্তির প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। এই এক সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় মহাশক্তিই ব্রহ্ম। বহির্জ্জগদ্‌ব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ এই ব্রহ্মই ব্রাহ্মণ-ভাগে বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আর্য্যেরা যখন এই ব্রহ্মতত্ত্বে পহুঁছিলেন তখন ঈশ্বরতত্ত্বও তাহার অন্তর্ভূত হইয়া গেল। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এখন আর সৃষ্টির প্রভু নহেন, তিনি নিজেই সেই পরব্রহ্মের অধীন—সেই পরব্রহ্মের শক্তিমাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থাৎ পরব্রহ্মের সৃষ্টি-শক্তি এখন ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইলেন। প্রত্যেক মন্বন্তরে ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি অর্থাৎ সেই মন্বন্তরের আদি পুরুষ উদ্ভূত হন। সেই আদি পুরুষ প্রজাপতিই সৃষ্টি রচনা করেন এবং সেই মন্বন্তরের সমস্ত বেদ বিধি প্রকাশ করিয়া প্রজা অর্থাৎ জীবের কল্যাণ সাধন করেন। এই আদি পুরুষ প্রজা-পতির মধ্যেই আমরা পরবর্ত্তী অবতারবাদের বীজ দেখিতে পাই।

বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ—বহির্জ্জগদ্‌ব্যাপিনী এক অদ্বিতীয় মহাশক্তি

ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ—ঈশ্বর ব্রহ্মের শক্তি—ব্রহ্মের অধীন

ঈশ্বর—ব্রহ্মা

প্রত্যেক মন্বন্তরে ব্রহ্মা হইতে আদি পুরুষ প্রজাপতির উৎপত্তি। প্রজাপতি সৃষ্টির রচয়িতা ও বেদ বিধির প্রকাশক

আর্য্যেরা যখন ঈশ্বরতত্ত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্মতত্ত্বে উঠিলেন, তখন তাঁহাদের চিত্তে এক ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এ দ্বন্দ্ব ব্রহ্মতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্বের মধ্যে। আর্য্যদের তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, কিন্তু তাঁহা-দের উপাসনা এখনও সেই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পড়িয়া রহিল। তত্ত্বকাণ্ড ও সাধনকাণ্ডের মধ্যে এরূপ বৈষম্য উপস্থিত হইলে মানবচিত্ত কখনও স্থির থাকিতে পারে না। আর্য্যদের মনেও এ সময় নানা তর্ক, বিতর্ক ও সন্দেহের উদয় হইল। কোন্ মন্ত্রের কি শক্তি, কোন্ যজ্ঞের কি উদ্দেশ্য, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন চিন্তাশীল ঋষিদের চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। মন্ত্র ও যজ্ঞাদির রূপক ও কাল্পনিক অনেক প্রকার অর্থ করা হইল। কিন্তু কিছুতেই চিত্তের সন্দেহ ঘুচিল না। অবশেষে আরণ্যক অর্থাৎ অরণ্যবাসী কতিপয় ঋষি উপা-

তত্ত্বকাণ্ড ও সাধনকাণ্ডের মধ্যে বিরোধ—নানা তর্ক, বিতর্ক ও সন্দেহের উৎপত্তি

মন্ত্রাদির রূপক ও কাল্পনিক ব্যাখ্যা

সনাতত্ত্বের এক নূতন ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের চিন্তনই উপাসনা।"

আরণ্যক ঋষিগণ কর্তৃক উপাসনাতত্ত্বের নূতন ব্যাখ্যা

এইরূপে আরণ্যক ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখি হইল। পূর্ব্বে তাঁহারা বাহ্য প্রকৃতিতে পরব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতেছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহারা অন্তরের হিরণ্ময় কোষে এক অদ্বিতীয় চিদ্রূপি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাঁহার সত্তায় ডুবিয়া গেলেন। প্রতিক্রিয়া প্রভাবে তাঁহারা বাহির হইতে একেবারে অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং সকল বিষয়েই তাঁহারা বহির্বিমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। এই আরণ্যক ঋষিরাই আদি উপনিষদের নির্গুণব্রহ্মবাদের প্রবর্তক।

আরণ্যক ঋষিগণের অন্তরাত্মায় চিন্ময় পরব্রহ্মের প্রকাশ—প্রতিক্রিয়া প্রভাবে আরণ্যক ঋষিরা সর্ব্ববিষয়ে বহির্বিমুখ

বেদের ব্রাহ্মণভাগের ব্রহ্ম এক মহাশক্তি। অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ভূলোক ও দ্যুলোক সর্ব্বত্রই তিনি ব্যাপ্ত আছেন। তিনি ইহাতে আছেন, উহাতে আছেন, ব্রহ্মের এই মাত্র লক্ষণা করিলে প্রকৃতির অগণ্য বস্তুর মধ্যে ব্রহ্মের লুপ্ত হইয়া-যাওয়ার অত্যন্ত সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণযুগে ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপে লুপ্ত ও বিনষ্ট হওয়ার খুব আশঙ্কা ছিল। যাগযজ্ঞাদি জটিল কর্ম্মকাণ্ডজাল এবং উহাদের রূপক ও কাল্পনিক ব্যাখ্যারাশি মনুষ্যবুদ্ধিকে বিকৃত এবং ব্রহ্মজ্ঞানকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য তটস্থ লক্ষণ ছাড়িয়া ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণকে জাগ্রত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রাহ্মণযুগে ব্রহ্মজ্ঞান লোপের আশঙ্কা এবং ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের উপর জোর দেওয়ার আবশ্যকতা

স্বরূপলক্ষণের উপর জোর দিতে গিয়াই ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি আদি উপনিষৎকর্ত্তারা নির্গুণ ব্রহ্মবাদী* হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা বলিলেন, ব্রহ্ম বাহিরের সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্,—ইন্দ্র বরুণাদি দেবতা হইতে পৃথক্, "নেদং যদিদমুপাসতে", দেহ হইতে পৃথক্,

স্বরূপ লক্ষণের উপর জোর দিতে গিয়াই আদি উপনিষদ্‌কর্ত্তারা নির্গুণব্রহ্মবাদী

* আদি উপনিষদ্ সমূহে সগুণভাবাত্মক শ্লোক এবং পরবর্ত্তী উপনিষদ্ সমূহে নির্গুণ ভাবাত্মক শ্লোক থাকিলেও আদি উপনিষদ্ সমূহে নির্গুণ ভাবের এবং পরবর্ত্তী উপনিষদ সমূহে সগুণ ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্, মন হইতেও পৃথক্। তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, অনাদি ও অনন্ত। তিনি সর্ব্বাতীত, পরাৎপর, নিত্য, চিন্ময় পুরুষ। বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধ্যানযোগে অন্তরাত্মার হিরণ্ময় কোষেই কেবল তিনি প্রকাশিত হন। অন্তর্মুখ হইয়া অন্তরের অন্তরতম স্থানে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করেন। কিন্তু যাহারা বহির্মুখ—যাহারা কর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহারা অন্ধকার ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আদি উপনিষৎকর্ত্তারা বেদের বাহ্য ব্রহ্ম ও বাহ্য কর্ম্ম উভয়েরই ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহাদের তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে একেবারে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করাই তাঁহারা প্রশস্ত মনে করিতেন।

আদি উপনিষদ্‌কর্ত্তারা বেদের বাহ্য ব্রহ্ম ও বাহ্য কর্ম্ম উভয়েরই বিরোধী

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও তাহার কাল্পনিক ব্যাখ্যাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া আরণ্যক ঋষিদের ন্যায় চার্ব্বাকগণও তাহার প্রতিবাদ করেন। চার্ব্বাকগণের অন্য নাম লোকায়ত; লোকায়ত, অর্থাৎ যে মত পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত, কিম্বা লোক অর্থাৎ ইহলোক লইয়াই যে মত। তবেই চার্ব্বাকগণ প্রত্যক্ষবাদী (Positivist)। আধুনিক প্রত্যক্ষবাদীদের ন্যায় চার্ব্বাকগণও একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন; অনুমান ও শাব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন না। চার্ব্বাকেরা বলেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি স্বভাব ও স্বভাবের কার্য্য। সুতরাং ব্রহ্মনামে অপর কোনও শক্তি নাই। দেহাতিরিক্ত আত্মাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, সুতরাং আত্মাও নাই। চৈতন্য পঞ্চভূতাত্মক দেহের একটী ধর্ম্ম (function) মাত্র। দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং আত্মার পরকাল ও জন্মান্তরপ্রাপ্তি নাই। চার্ব্বাকেরা বেদ অর্থাৎ আপ্তবাক্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, বেদবাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখিতেছি। বেদে পুনরুক্তি ও মিথ্যাকথন দোষও লক্ষিত হয়। সুতরাং বেদ অপ্রমাণ্য। কতকগুলি প্রতারক, ধূর্ত্ত ও ভণ্ড অর্থ লাভের লালসায়, স্বর্গ নরকাদির ভয়,

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডাদি হইতে প্রতিক্রিয়া—চার্ব্বাকদর্শন

চার্ব্বাকগণ প্রত্যক্ষবাদী সুতরাং চার্ব্বাকমতে স্বভাবাতিরিক্ত ব্রহ্ম এবং দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই

চার্ব্বাকমতে বেদ স্ববিরোধিতাদি দোষে দূষিত ও অপ্রামাণ্য অর্থলোভী প্রতারকগণের দ্বারা যাগযজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিত

দেখাইয়া লোকদিগকে যাগযজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া উত্তরকালীন লোকেরা ঐ সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতে ঐ প্রথা বহুকাল হইতে জনসমাজে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ স্বর্গসুখ ও নরকদণ্ড উভয়ই মিথ্যা। আত্যন্তিক ঐহিক সুখই প্রত্যক্ষ স্বর্গ, দুঃখই প্রত্যক্ষ নরক এবং প্রত্যক্ষ রাজদণ্ডই একমাত্র দণ্ড। পারলৌকিক সুখের আশায় ধর্ম্মসাধন দ্বারা আত্মাকে ক্লেশ দেওয়া মূর্খতার কার্য্য। ঐহিক সুখভোগই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু সুখের অনুষঙ্গি অবশ্যম্ভাবি দুঃখ আছে ইহাও প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু দুঃখমিশ্রিত বলিয়া কি সুখকে দূরে নিক্ষেপ করিব? তাহা নহে। বরং সুখের ভাগ বৃদ্ধি করিতে (অর্থাৎ একটা Balance of pleasure over pain লাভ করিতে) চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। চার্ব্বাকগণ সকল বিষয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন-চিন্তাবাদিগণের (Freethinkers) অনুরূপ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন-চিন্তাবাদীরাও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এমন তীব্র যুক্তি প্রয়োগ এবং এমন নিঃশঙ্ক প্রতিবাদ করেন নাই।

সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম প্রথামূলক

স্বর্গ, নরক মিথ্যা—আত্যন্তিক ঐহিক সুখই স্বর্গ, দুঃখই নরক এবং রাজদণ্ডই একমাত্র দণ্ড

ঐহিক সুখভোগই পরম পুরুষার্থ। সুখের অনুষঙ্গি দুঃখ আছে বলিয়া সুখ কদাপি পরিত্যাজ্য নহে

চার্ব্বাকগণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বাধীন-চিন্তাবাদিগণ

উপনিষদের যুগেও বৌদ্ধ ও সাংখ্যাচার্য্যগণের দ্বারা নিরীশ্বরবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। উপনিষদে এক নিত্য চিন্ময় আত্মা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধেরা আসিয়া বলিলেন, এক নিত্য চিন্ময় আত্মা আবার কোথায়? আত্মা তো এই প্রকাশ পাইতেছে, এই আবার লুপ্ত হইতেছে,—আত্মা ক্ষণিক চৈতন্য মাত্র। আত্মার জ্ঞান ও চেষ্টা (Will) উভয়ই বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, দেখিবে জ্ঞানের মধ্যে একটা ক্ষণিক বোধপ্রবাহ মাত্র এবং চেষ্টার মধ্যে একটা ক্ষণিক বাসনাপ্রবাহ মাত্র আছে। এই ক্ষণিক বোধ ও ক্ষণিক বাসনাপ্রবাহই আত্মা। অন্তর বাহির দুই নাই,—বিষয় বিষয়ী দুই নাই, কেবল এক ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহ-মাত্র বর্ত্তমান। এই ক্ষণিক চৈতন্যপ্রবাহকে বৌদ্ধেরা আলয়বিজ্ঞান নাম দিয়াছেন। ইউরোপীয়

উপনিষদের যুগে প্রতিক্রিয়া—বৌদ্ধদর্শন ও সাংখ্যদর্শন

বৌদ্ধমতে নিত্য আত্মা নাই—আত্মা ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহমাত্র

দার্শনিক পণ্ডিত হিউম্* এবং মিলও বৌদ্ধদের ন্যায় ক্ষণিক-চৈতন্যবাদী (Subjective Idealist); কিন্তু দুইটী বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। (১) হিউম্ ও মিল শুদ্ধ জ্ঞানের দিক হইতে চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব দেখাইয়াছেন, এবং সম্প্রতি জর্ম্মানদেশীয় মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মুনেষ্টারবার্গ মিলের পন্থা অবলম্বন করিয়া চেষ্টার দিক হইতেও চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা জ্ঞান ও চেষ্টা উভয় দিক দিয়াই এই ক্ষণিকত্ব দেখাইয়া থাকেন; সুতরাং এবিষয়ে বৌদ্ধেরাই শ্রেষ্ঠ। (২) হিউম্ ও মিলের দর্শনে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তি একেবারে উড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু বৌদ্ধেরা কার্য্যকারণের মধ্যে এক নিত্য ও সত্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

হিউম্ এবং মিলও বৌদ্ধগণের ন্যায় ক্ষণিক-চৈতন্য-বাদী; কিন্তু দুইটী বিষয়ে বৌদ্ধগণের শ্রেষ্ঠত্ব—(১) জ্ঞান ও চেষ্টা উভয় দিক দিয়া আত্মার ক্ষণিকত্ব প্রতিপাদন, (২) কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সত্যতা স্বীকার

বৌদ্ধদের একটী বিশেষ মত বাসনা-সংক্রমণ। তাহার ভাব এই:—এই আমার চৈতন্য বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যে বাসনা করিল, পর মুহূর্ত্তে আমি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইব, তাহা সেই পূর্ব্ব বাসনার—পূর্ব্ব অবস্থার ফলমা। কিন্তু চৈতন্যের প্রত্যেক অব-স্থাই তো ক্ষণিক,—পর অবস্থা প্রাপ্তির সময় অবশ্য পূর্ব্বাবস্থা বিনষ্ট হইয়া যায়। তবে বাসনা পূর্ব্ব অবস্থা হইতে পর অবস্থায় কিরূপে সংক্রমণ করে? বৌদ্ধেরা বলেন কুর্ব্বতরূপত্ব দ্বারা,—অর্থাৎ পূর্ব্ব অবস্থা যখন বিনষ্ট হয়, তখন সে একটী কুর্ব্বতরূপত্ব (অর্থাৎ পর অবস্থা উৎপত্তির একটী Process) রাখিয়া যায়। তাহা হইতেই পর অবস্থার উৎপত্তি হয়। এই কুর্ব্বতরূপত্ব হেতু বাসনা অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে সংক্রমণ করে এবং এই কুর্ব্বতরূপত্ব হেতুই খণ্ড খণ্ড ক্ষণিক চৈতন্য এক ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহের আকার ধারণ করে। আবার এই কুর্ব্বতরূপত্ব হেতু বাসনা-সংক্রমণ জন্য জীব স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করে। বৈজিক গুণে যেমন পিতার ধর্ম্ম গিয়া পুত্রে বর্ত্তে—অথবা পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম গিয়া পরপুরুষে বর্ত্তে, সেইরূপ কুর্ব্বতরূপত্ব হেতু এই যে আমি তাহার ধর্ম্ম পরের আমিতে গিয়া বর্ত্তিবে। সুতরাং এখন আমি যে কর্ম্ম করিলাম, পরে আমি তাহার ফলভোগ করিব;—যেমন ইহজন্মে করিব, সেইরূপ

বৌদ্ধমতে কুর্ব্বতরূপত্ব হেতু বাসনা-সংক্রমণ এবং জন্মজন্মান্তরে কর্ম্মফলভোগ

জন্মজন্মান্তরেও করিব। কিন্তু যখন বাসনার নির্ব্বাণ হইবে, তখন কুর্ব্বত-রূপত্ব, বাসনা-সংক্রমণ ও ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহ, এ সমস্তের বিরাম হইবে,—কর্ম্ম ও কর্ম্মফলেরও বিরাম হইবে। নির্ব্বাণই পরামুক্তি—পরাশান্তি। বৌদ্ধমতে জীব যে কর্ম্মফল ভোগ করে তাহা সেই কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; কর্ম্মফলদাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। ইঁহাদের মধ্যে মাধ্যমিকেরা বলেন, বাহ্য বস্তুর কোনও সত্তা নাই—সবই শূন্য (Nihilism); যোগাচারেরা বলেন বাহ্য বস্তু মাত্রই অলীক (Subjective Idealism); সৌতান্ত্রিকেরা বলেন বাহ্য বস্তু অনুমানসিদ্ধ (Cosmothetic Dualism like that of Browne and Arnauld); বৈভাষিকেরা বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলেন (Natural Realism); কিন্তু এ প্রত্যক্ষও সেই ক্ষণিকচৈতন্যেরই প্রত্যক্ষ।

বৌদ্ধমতে মুক্তি—বাসনার নির্ব্বাণ

বৌদ্ধমতে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর নাই

বৌদ্ধদর্শনের চারিটী শাখা

বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের অনেক সাদৃশ্য আছে; একটী বিষয়ে খুব গুরুতর পার্থক্যও আছে। সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী তত্ত্ব বুঝিলেই সে সাদৃশ্য ও সে পার্থক্য আমাদের নয়নপথে উদিত হইবে। সাংখ্য বলেন, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পরিণাম হইতে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন, পরিণত না হইয়া ইনি ক্ষণকালও থাকেন না। কিন্তু চিন্ময় পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতির এই পরিণাম হয়। এই চিন্ময় পুরুষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু প্রকৃতি সগুণ, সক্রিয় ও পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং প্রকৃতি হইতে পুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক্। পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হয় মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি) বা বুদ্ধি (ব্যষ্টি); মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্বের পরিণাম একাদশ ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। একাদশ ইন্দ্রিয় যথা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মন। সূক্ষ্মপঞ্চভূতের পরিণাম স্থূল পঞ্চভূত, যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি। সাংখ্য এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন। এখন বৌদ্ধ দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের সাদৃশ্য দেখ।

বৌদ্ধদর্শন ও সাংখ্যদর্শন

প্রকৃতি ও পুরুষ

প্রকৃতি পুরুষাদি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্য-দর্শনের সাদৃশ্য

সাংখ্যের নিয়তপরিণামশীল প্রকৃতি অনেকটা বৌদ্ধদের ক্ষণিক-চৈতন্যপ্রবাহের ন্যায়। পার্থক্য এই, বাসনা-সংক্রমণের সময় পূর্ব্ব অবস্থা একটী কুর্ব্বতরূপত্ব রাখিয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু সাংখ্যের পর পর পরিণাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিণামকে বিনাশ করে না। বৌদ্ধদের সঙ্গে সাংখ্যের আরও একটী বিষয়ে ঐক্যমত দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধদের ন্যায় সাংখ্যও বলেন যে জীব বাসনাহেতু স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে। কর্ম্ম হইতেই কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়;—কর্ম্মফলদাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। সগুণ, সক্রিয়, পরি-

সাংখ্যমতে মুক্তি—প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান

ণামশীল প্রকৃতি হইতে পুরুষ সম্পূর্ণ পৃথক্ এইরূপ জ্ঞান লাভ করা, অর্থাৎ পুরুষকে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া জানা, এবং সেই জ্ঞানে অবস্থিত থাকাই সাংখ্যমতে মুক্তি। সাংখ্যের নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, চিন্ময় পুরুষে অবস্থান এবং বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি, এ দুইএর মধ্যেও বড় বেশী একটা পার্থক্য নাই। কিন্তু একটী বিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের ঘোর

বৌদ্ধদর্শনের সহিত সাংখ্য-দর্শনের পার্থক্য

পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা এক ক্ষণিক-চৈতন্য-প্রবাহাতিরিক্ত কোন নিত্য আত্মা স্বীকার করেন না; কিন্তু সাংখ্য নিয়তপরিণামশীল প্রকৃতিতে এক নিত্য চিন্ময় পুরুষের

সাংখ্যের পুরুষ উপনিষদের এক অদ্বিতীয় আত্মা নহে—সাংখ্য বহু পুরুষবাদী

অধিষ্ঠান দেখেন। তবুও সাংখ্যের পুরুষ উপনিষদের নিত্য চিন্ময় আত্মা নহে। কারণ উপনিষদপ্রতিপাদ্য চিন্ময় আত্মা নিত্য এবং অদ্বিতীয় কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ অদ্বিতীয় নহে। সাংখ্যমতে যত মনুষ্যদেহ তত পুরুষ।

সাংখ্য দ্বৈতবাদী

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই মহাতত্ত্ব স্বীকার করেন বলিয়া সাংখ্যকে পণ্ডিতেরা দ্বৈতবাদী বলেন। সাংখ্য বেদশাস্ত্রকে আপ্তবাক্য

সাংখ্য বেদ ও বৈদিক কর্ম্মাদি মান্য করেন

বলিয়া মান্য করেন। বৌদ্ধগণের ন্যায় তিনি বেদবিহিত কর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী নহেন।

আদি উপনিষদের নির্গুণব্রহ্মবাদ এবং বৌদ্ধ ও সাংখ্যাচার্য্যগণের নিরীশ্বরবাদাদির প্রতিকূলে পরবর্ত্তী উপনিষদে

পরবর্ত্তী উপনিষদের সগুণ-ব্রহ্মবাদ

সগুণব্রহ্মবাদ প্রচারিত হয়। কিন্তু এ সগুণব্রহ্মবাদ দার্শনিক যুক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই। নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণ অধ্যাত্মযোগে দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সহজভাবে

সগুণব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সুতরাং রূপক এখানে ঋষিদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সমস্ত রূপকের মধ্য দিয়া ঋষিরা এই একটী কথাই বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম যেমন সৃষ্টির অতীত, তেমনি তিনি সৃষ্টির অন্তর্ভূত। আদি উপনিষদে ব্রহ্ম সমস্ত বস্তু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু এখানে আবার সৃষ্টির সহিত তাঁহার গূঢ়যোগ সংস্থাপিত হইল। যিনি সর্ব্বাতীত, অরূপ, অব্যয়, অদ্বিতীয় পুরুষ, সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ; সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ; সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ; তিনি সমুদায় ব্যাপিয়া জগতে বাস করিতেছেন।" "তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই দীপ্তিমৎ নক্ষত্রাদি, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই প্রজাপতি।" "তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমি জরাগ্রস্ত (হইয়া) দণ্ড হস্তে গমন কর, তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" এই সগুণব্রহ্মবাদী ঋষিদের মতে চিত্তশুদ্ধির উপায় স্বরূপ বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। ইঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মও স্বীকার করিতেন। আদি উপনিষৎকর্ত্তাদের ন্যায় ইঁহারা গৃহস্থাশ্রমের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই।

পরবর্ত্তী উপনিষৎকর্ত্তারা বৈদিক কর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্

কিন্তু উপনিষদ্ ঋষিদিগের কতকগুলি সহজ উক্তি বলিয়া উপনিষদ্বাক্যের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি দোষ রহিয়া গেল। প্রথমতঃ, কতকগুলি শ্লোকে ব্রহ্মের নিরাকার, নির্গুণ ও বিশ্বাতীত যে দিক্, তাহা বিশদরূপে দেখান হইয়াছে; অন্যত্র আবার ব্রহ্মের সগুণ, সাকার ও বিশ্বান্তর্ভূত যে দিক্ তাহা উজ্জল করা হইয়াছে। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে, কোথাও ব্রহ্মের ব্রহ্মভাব দেখান হইয়াছে, কোথাও আবার তাঁহার ঈশ্বরভাব দেখান হইয়াছে;—কোথাও ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা তাঁহার তটস্থ লক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে; কোথাও বলা হইয়াছে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, আবার কোথাও বলা হইয়াছে স্বভাব, মহৎ, কাল অথবা অন্য কিছু হইতে জগতের উৎপত্তি। একস্থলে বলা হইল মায়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি সৎ, অন্যত্র বলা হইল অসৎ। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও চেষ্টা-বর্জ্জিত একটী

উপনিষদ্বাক্য সকলের মধ্যে অসঙ্গতি

শূন্যাকার অবস্থাকে কোথাও মুক্তি বলা হইয়াছে, আবার কোথাও ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলা হইয়াছে। সমস্ত উপনিষদ্ এইরূপ অসঙ্গতি দোষে দূষিত বলিয়া বোধ হয়; অথচ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই উপনিষদ্‌শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাদরায়ণ ব্যাস ইহা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এজন্যই তিনি সমস্ত উপনিষদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে এক অটল ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে সচেষ্ট হন। ব্যাসদেবের এই সমন্বয় গ্রন্থের নাম ব্রহ্মসূত্র।

বাদরায়ণ ব্যাস কর্ত্তৃক উপনিষদ্ সমূহের সমন্বয় —ব্রহ্মসূত্র

ব্রহ্ম কে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বলেন, "যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমৎ কারণ হইতে এই বিবিধ নাম ও রূপে প্রকাশমান অচিন্ত্য জগতের উৎপত্তি হয়, সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমৎ কারণই ব্রহ্ম। কিন্তু ব্যাসদেব ব্রহ্মকে কেবল প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া বিরত হন নাই। এই প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন, ব্যাসদেবের মতে তাহার কারণও ব্রহ্ম। ব্যাস বলিতেছেন, "সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর যে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র তাহাদেরও উদ্ভব স্থান ব্রহ্ম।" কিন্তু ব্রহ্ম যে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এ কথা কেন বলিতেছ? ব্যাস তাহার উত্তরে বলেন, "সমন্বয়াৎ"—সমন্বয় হইতে। ব্রহ্মতেই সমস্ত উপনিষদ্‌শাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়,—অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধি উপনিষদ্‌বাক্য সকলের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ বলিয়া নিষ্পন্ন হন। এ জন্যই ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা বলা হইল। কিন্তু ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তারূপে দেখিলে, তাঁহাকে কেবল তটস্থ লক্ষণে—ঈশ্বর-রূপে দেখা হয়। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ কি? তদুত্তরে ব্যাস এই বেদান্তবাক্য বলিতেছেন—"ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, বিজ্ঞানঘন ও আনন্দ-ঘন।" কিন্তু বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতি বিকারাদি দোষে দূষিত এই জগত দ্বারা তো ব্রহ্মের এই স্বরূপ নিষ্পন্ন হয় না। ব্রহ্মের এ স্বরূপ কোথায় পাইলে? ব্যাস বলিতেছেন, ধ্যানযোগে নির্ম্মল বুদ্ধিতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

ব্যাসের ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা—ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—ঈশ্বরভাব

ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ

তবে কি, যে ব্রহ্মকে পূর্ব্বে জগতের : সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া লক্ষণা করা হইয়াছে তাহা হইতে এই নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন ব্রহ্ম পৃথক্? ব্যাস বলেন, "না, তাহা নহে। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় বস্তু। এক অদ্বিতীয় বস্তুকেই ভিন্ন দুই দিক হইতে দেখিয়া স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম এবং তটস্থ লক্ষণে ঈশ্বর বলা হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক। কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্টির আধার, সুতরাং সমস্ত গুণের—সমস্ত নামরূপের আধার। কিন্তু নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন ব্রহ্ম নির্গুণ ও নামরূপাদিবর্জ্জিত। সুতরাং ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া ব্যাসদেব নির্গুণ ও সগুণ, নিরাকার ও সাকারের একত্ব স্বীকার করিলেন।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একত্ব

সুতরাং নির্গুণ ও সগুণের—নিরাকার ও সাকারের একত্ব

এখন ব্যাসের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ব্যাসের মতে ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফলবিধাতা। কর্ম্মফলাদি ভোগেরদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া জীবকে মুক্তিধামে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা মায়া-শক্তি দ্বারা জীবের ভোগের জন্য এই জগৎ উৎপন্ন করেন। জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ এই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। ঈশ্বর জীবের ভোগের জন্য এই জগৎ উৎপন্ন করেন বুঝিলাম; কিন্তু জীব উৎপন্ন হয় কিরূপে? তদুত্তরে ব্যাস বলেন যে, জীবের চিদংশ ঈশ্বর কিম্বা ব্রহ্মেরই চিদংশ; উহা সৃষ্ট নহে। জীবের দেহাদি সৃষ্ট ও মায়া-জাত। কিন্তু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যে জীবাত্মার উদ্ভব কিরূপে হইল?—এক কেন বহু হইল? ব্যাস বলেন, মায়াবশে। মায়া অনির্ব্বচনীয়া ও দুস্তরনীয়া।—অর্থাৎ একের বহু হইবার যেন একটা প্রবৃত্তি আছে, এইমাত্র বলা যায়, আর কিছুই বলা যায় না। জার্ম্মান দার্শনিকগণও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। ব্যাসদেবের মতে ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি মায়া এবং মায়াজাত এই জগৎ সত্য এবং জীবের উপাধিও সত্য। কিন্তু উহাদের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই।

ব্যাসের সৃষ্টিতত্ত্ব—জগৎ ও জীবের উৎপত্তি

ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি মায়া অনির্ব্বচনীয়া

ব্যাসের মতে মায়া, মায়া-জাত জগৎ ও জীবোপাধি সত্য কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত

উহারা ব্রহ্মাশ্রিত অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত সত্তা। সাংখ্যের

বহুপুরুষবাদী ; কিন্তু ব্যাস সাংখ্যাচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিয়া এক অদ্বিতীয় চিন্ময় পুরুষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিলেন এবং তিনি শক্তিমান্ ও শক্তির ন্যায়, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং তদীয় সৃষ্টিশক্তি মায়ার একত্ব স্বীকার করিলেন। এ জন্যই ব্যাসকে পণ্ডিতেরা অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন। সচরাচর আমাদের দেশের লোকেরা অদ্বৈতবাদ বলিলে অলীক-মায়াবাদ বুঝেন। যাঁহারা মায়াকে অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বলেন তাঁহারই অলীক-মায়াবাদী। কোন কোন অদ্বৈতবাদী অবশেষে অলীক-মায়াবাদে গিয়া উপনীত হন সত্য ; কিন্তু সকল অদ্বৈতবাদী অলীক-মায়াবাদী নহেন। ব্যাস মায়া ও মায়াজাত জগৎকে সত্য বলেন। যেখানে তিনি জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন—রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার ইহা বলাই অভিপ্রায় যে, জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই ; সুতরাং ব্যাস অদ্বৈতবাদী হইয়াও অলীক-মায়াবাদী নহেন। ব্যাসের মতে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি ; কিন্তু এ মুক্তিতে জীবের উপাধি অর্থাৎ জীবত্ব বিনষ্ট হইবে না।

ব্যাস অদ্বৈতবাদী, অলীক-মায়াবাদী নহেন

ব্যাসের মতে মুক্তি—সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান

ব্যাসের পরে বৌধায়ন নামক কোন পণ্ডিত ব্রহ্মসূত্রের এক বৃত্তি লিখেন। এ জন্য তিনি বৃত্তিকার বৌধায়ন নামে পরিচিত। বৌধায়নবৃত্তি এখন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থে বৌধায়নের মতের উল্লেখ আছে। তাহা হইতে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয়, বৌধায়ন ও ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করিতেন। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের উপর—সৃষ্টির উপর—বিশিষ্ট সত্তার উপর অধিক জোর দিয়াছিলেন ; এ জন্যই পরে রামানুজ বৌধায়নের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আখ্যা প্রদান করেন।

বৃত্তিকার বৌধায়নের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

ইহার পর পতঞ্জলি তদীয় যোগসূত্র প্রণয়ন করেন। ব্যাসভাষ্য নামে উহার এক ভাষ্য, এবং ভোজবৃত্তি নামে উহার এক বৃত্তি আছে। সাংখ্যের ন্যায় পাতঞ্জলও প্রকৃতি পুরুষ স্বীকার করেন ; কিন্তু পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি পুরুষের উপরে এক ঈশ্বর আছেন। এ জন্যই পাতঞ্জলদর্শন সেশ্বর সাংখ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাতঞ্জলের ঈশ্বর অনেকটা বেদের

পাতঞ্জলদর্শন বা সেশ্বর সাংখ্য

আদিপুরুষ প্রজাপতির ন্যায়। করুণায় তিনি অতুল। সংসারাবদ্ধ জীবের প্রতি তাঁহার এত অনুগ্রহ যে সর্ব্বদা তিনি জীবকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতেছেন। ঈশ্বর যেমন জীবের পরিত্রাতা, তেমনই তিনি আবার গুরু ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক। গুরুরূপে তিনি বেদাদি সমস্ত বিদ্যা প্রকাশ (reveal) করেন; এবং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে তিনি ধর্ম্মনিয়মাদি সংস্থাপন করিয়া জীবকে মুক্তির পথে লইয়া যান। পাতঞ্জল ঈশ্বরতত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মের সগুণদিক্ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিশদ ও উজ্জ্বল করিলেন। করুণাময় পরিত্রাতা, সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশক গুরু, এবং ধর্ম্মসংস্থাপক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকরূপে ঈশ্বর এখন জীবের অনেক নিকটে আসিলেন। জীবও ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিতে শিক্ষা করিল। এইরূপে পাতঞ্জল দর্শন পরবর্ত্তী ভক্তি ধর্ম্মের সূচনা করিল। বেদের আদিপুরুষ প্রজাপতির মধ্যে আমরা অবতারবাদের বীজ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। পাতঞ্জল দর্শনে সেই বীজ আমরা অঙ্কুরিত হইতে দেখিলাম। আর এক পদ অগ্রসর হইলেই রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা অবতারবাদের মহাবৃক্ষ দেখিতে পাইব।

পাতঞ্জলের ঈশ্বর করুণাময় পরিত্রাতা, সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশক গুরু এবং ধর্ম্মসংস্থাপক সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক

পাতঞ্জলের যোগসূত্রে ভক্তি ধর্ম্মের সূচনা

বেদের প্রজাপতিতে অবতারবাদের বীজ, পাতঞ্জলের ঈশ্বরে অবতারবাদের অঙ্কুর এবং মহাভারত ও রামায়ণে অবতারবাদের মহাবৃক্ষ

ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অথবা প্রকৃতির পালনী শক্তিই বিষ্ণু। সুতরাং বিষ্ণুরূপেই ঈশ্বর জীবের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সুতরাং মহাভারত ও রামায়ণে বিষ্ণু-অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের লীলাবর্ণনচ্ছলে ভগবানের জীবলীলার মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম উভয়েই পরম করুণাধার, উভয়েই ধর্ম্মের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের শাস্তিদাতা। নররূপে উভয়কেই আদর্শপুরুষ (Ideal man) বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নরোত্তম, পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। মহর্ষি বাল্মীকিও এক আদর্শ পুরুষ কল্পনা করিয়া তাঁহার মহাকাব্য আরম্ভ করিয়া-

মহাভারত ও রামায়ণে বিষ্ণুঅবতার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের লীলাবর্ণন—ভগবানের জীবলীলার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

মহাভারত ও রামায়ণের আদর্শ পুরুষ

ছেন—"(যিনি) গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে (ক্ষত্রতেজে) কালানলের ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায়।" জগতের অনেক জাতি আদর্শ পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন।

আদর্শ পুরুষরূপে যীশুখৃষ্ট ও রাম

খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুকে তদীয় শিষ্যেরা আদর্শ-পুরুষ বলিয়া জগতের সমক্ষে উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন, এমন দুঃখী পাপীর বন্ধু আর কে আছে? কিন্তু উচ্চতা ও বিশালতায় খৃষ্টানগণের এ আদর্শ বাল্মীকির আদর্শের নিকট পরাভব মানে। রাম কেবল দুঃখী ও পাপীর বন্ধু বলিয়াই আদর্শপুরুষ নহেন। বাল্মীকি রামকে পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, স্বামিরূপে, সখিরূপে, প্রভুরূপে, রাজরূপে—জীবনের সমস্ত সম্বন্ধে আদর্শ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; জীবনের একটী মাত্র সম্বন্ধে তাঁহাকে আদর্শরূপে দেখাইতে প্রয়াস পান নাই। বাল্মীকির বিশেষ বিশেষ আদর্শের মধ্যে অনেক দোষ ও অপূর্ণতা লক্ষিত হয় সত্য বটে; কিন্তু আদর্শপুরুষের যে মূর্ত্তি তিনি তাঁহার মহাকাব্যে রাখিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহা অতুলনীয়। লোকশিক্ষার জন্যই যদি আদর্শপুরুষের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জীবনের সকল সম্বন্ধেই আদর্শ পুরুষের আদর্শ স্থানীয় হওয়া আবশ্যক। জীবনের সকল সম্বন্ধে আদর্শ স্থানীয় না হইলে আদর্শপুরুষ কখনও লোক-শিক্ষক হইতে পারেন না।

ব্যাস মহাভারতে এবং বাল্মীকি রামায়ণে অবতার ও আদর্শপুরুষের

অবতার ও আদর্শপুরুষের আকারে মহাভারত ও রামায়ণের সগুণব্রহ্মবাদ

আকারে সগুণব্রহ্মবাদ প্রচার করিলেন। এখান হইতেই বিষ্ণুর অবতার বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিল। তাহার পরেই গীতার সগুণব্রহ্মবাদ এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের মহাসমন্বয়। * গীতাকার যখন প্রাদুর্ভূত হন

গীতার সময়ে ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্র

তখন ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে আমরা বিচিত্র মত ও পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংঘর্ষ দেখিতে পাই। একদিকে বেদোক্ত সকাম কর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদিক দেবতার পূজা, হঠ যোগীদের হঠযোগ; অন্যদিকে বৌদ্ধ-

* গীতাপর্ব্ব মহাভারতের মধ্যে পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এই মতানুবর্ত্তী হইয়া গীতাকে পৃথক্ স্থান প্রদান করা হইয়াছে।

গণের কর্ম্মসন্ন্যাস, সাংখ্য ও বেদান্তের জ্ঞানযোগ। অবতারবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিধর্ম্মও এ সময় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। গীতাকার এই পরস্পর বিরুদ্ধ মত ও বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি এমন এক দিব্য প্রতিভা লইয়া আসিয়াছিলেন যে তাহার বলে সমস্ত দ্বন্দ্ব—সমস্ত সংঘর্ষের উর্দ্ধে উঠিয়া তিনি এক মহা সমন্বয় দেখিতে পাইলেন।

বিশ্বরূপে গীতার মহা-সমন্বয়

প্রথমেই তিনি দেখিলেন, বিশ্বেশ্বরের সেই—"অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং" বিশ্বরূপ। সেই বিশ্বরূপের মধ্যে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নিগু‍র্ণ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম সমস্ত এক হইয়া গেল। তখন

জ্ঞানযোগ

তিনি জ্ঞানযোগীকে বলিলেন, দেখ, কেই বা জ্ঞাতা আর কেই বা জ্ঞেয়; কেই বা ভোক্তা আর কেই বা ভোগ্য; কেই বা কর্ত্তা, কেই বা কার্য্য; কেই বা হন্তা, কেই বা হত; ঐ চাহিয়া দেখ, সবই সেই বিশ্বরূপ। কর্ম্মযোগীকে বলিলেন, চাহিয়া দেখ,

কর্ম্মযোগ

এ জগৎ সেই বিশ্বরূপেরই লীলা। তোমার সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি; জয়ই বা কি আর পরাজয়ই বা কি; সিদ্ধিই বা কি, অসিদ্ধিই বা কি; সবই সেই লীলাময়ের হস্তে। অতএব তাঁহার হস্তে সমস্ত সিদ্ধি অসিদ্ধির ভার রাখিয়া নিষ্কাম চিত্তে কর্ম্মযোগ সাধন কর। বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরাগীকে বলিলেন, ভগবান্ তোমাদের যাহাকে যে স্থানে—যে আশ্রমে রাখিয়াছেন সেই আশ্রমে থাকিয়া, ফলাফল চিন্তাবিবর্জ্জিত হইয়া, সেই আশ্রমের সমস্ত কর্ত্তব্য প্রাণপণে সম্পন্ন কর।—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" ভক্তিযোগীকে

ভক্তিযোগ

বলিলেন, তুমি ঐ বিশ্বরূপের অতুল শোভা দেখ, তাঁহাকে তনুমনপ্রাণ সমর্পণ কর এবং তাঁহারই প্রীতিকাম হইয়া তাঁহারই সেবায় জীবন যাপন কর—তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর। এইরূপে গীতাকার জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের এমন এক মহা-সমন্বয় স্থাপন করিলেন যে তাহাতে সকল উপাসনা, সকল সাধন, সকল পন্থা স্থান প্রাপ্ত হইল। গীতার বিশ্বরূপ সগুণব্রহ্ম। অবতাররূপেও গীতা

গীতার সগুণব্রহ্মবাদ ও অবতারবাদ

সগুণব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু গীতার অবতারবাদ অজ্ঞানীদের স্থূল অবতারবাদ নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন যে তিনি যোগযুক্ত না হইলে অর্জ্জুনের নিকট

পরমার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গীতার প্রধান মাহাত্ম্য কর্ম্মসন্ন্যাস নিরসন ও নিষ্কাম কর্ম্মস্থাপন। গীতাকার বলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগও করিও না, আবার সকাম কর্ম্মও করিও না, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম্ম সাধন কর।

গীতার প্রধান মাহাত্ম্য— কর্ম্মসন্ন্যাস নিরসন ও নিষ্কাম কর্ম্ম স্থাপন

হিগেলের নীতি-বিজ্ঞানের (Ethics) চরম সিদ্ধান্ত এই যে, সমাজ-শরীরের যে যে স্থানে—যে পদে অবস্থিত, প্রাণপণে সেই স্থানের—সেই পদের কর্ত্তব্য পালন করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনীতি।

হিগেলের মতে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মনীতি—স্বীয় পদের কর্ত্তব্য সাধন

আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানও হিগেলের এই মত সমর্থন করে; কারণ সমাজবিজ্ঞানের মতে মনুষ্য সমাজ-শরীরের এক একটী যন্ত্র বিশেষ। কোন একটী যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ থাকিলে সমাজের জীবনীশক্তি হ্রাস হয় এবং সমস্ত সমাজ হীনবল হইয়া পড়ে।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানেরও সেই মত

গীতাকারও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আকারে হিগেলের সেই "স্বীয় পদের কর্ত্তব্যের" কথাই বলিয়াছেন। গুণ-কর্ম্ম হইতে জাতিভেদের উৎপত্তি হয়, এই উদার মত স্বীকার করিয়াও গীতাকার জাতির বন্ধন এবং তদানুষঙ্গিক আশ্রমের বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আকারে গীতাকারও সেই মহা-নীতি প্রচার করিয়াছেন

অন্যদিকে সকাম কর্ম্ম নিরসন করিয়া তিনি যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মবর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

গীতাকার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই

উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক জীবন প্রাপ্ত হইয়া আমরা অবশ্য প্রাচীন আশ্রমাদির এই সকল বন্ধনের মধ্যে কখনও থাকিব না, থাকিতে পারিব না;—কিন্তু তথাপি আমা দিগকেও প্রাণপণে স্বীয় স্বীয় পদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে।

প্রাচীন বর্ণাশ্রমবন্ধন টিকিতে পারে না

কিন্তু গীতাকার হিগেলকে ছাড়াইয়া আরও উর্দ্ধে উঠিয়া আমাদিগকে বলিতে-ছেন, নিষ্কামভাবে স্বীয় পদের কর্ত্তব্য সাধন কর। কিন্তু গীতাকারের এ নিষ্কাম কর্ম্ম ক্যাণ্টের ভাবশূন্য প্রেমশূন্য শুষ্ক নিষ্কাম কর্ম্ম নহে,—কারণ গীতাকার আরও উর্দ্ধে উঠিয়া বলিতেছেন, তোমার সমস্ত কর্ম্ম সেই লীলাময় ভগবানের চরণে প্রীতির

পদের কর্ত্তব্য :—গীতা ক্যাণ্ট ও হিগেল

সহিত সমর্পণ কর। ধন্য গীতাকার, যিনি এই মহাবাক্য প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন! ধন্য ভারত ভূমি, যেখানে এই মহাবাক্য প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল!

গীতারপরবর্ত্তী কালে কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের প্রাধান্য

গীতার পরবর্ত্তী কালে মীমাংসকগণের কর্ম্মবাদ ও ভক্তগণের ভক্তি-বাদের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ সময়ে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকরাদির ন্যায় জড়বাদী নাস্তিক মীমাংসকগণের হস্তে পড়িয়া একপ্রকার ঐন্দ্রজালিকবিদ্যা (Magic and Shamanism)-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্যদিকে নারদসূত্র, পঞ্চতন্ত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্রে অবতারবাদ ও চতুর্ব্যূহবাদের সঙ্গে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে ভক্তিধর্ম্মের সেবা ও আরাধনাঙ্গের বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এই সকল গ্রন্থের লেখকগণ আলেক্-জাণ্ড্রিয়া কিম্বা সিরিয়া হইতে খৃষ্টধর্ম্মের ভাব প্রাপ্ত হইয়া এই সেবাধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

জ্ঞানাভিমুখে প্রতিক্রিয়া—শঙ্কর

ইহার পরেই শঙ্কর আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু শঙ্কর প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞানের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইলে শঙ্করের সময় ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা দেখা একান্ত আবশ্যক। সচরাচর লোকের ধারণা এই যে বৌদ্ধ-গণের সঙ্গেই শঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

শঙ্করের সময়ে ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা

কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, শঙ্করকে তৎকালীন হিন্দু বৌদ্ধ উভয়েরই বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। সত্য বটে বৌদ্ধ-গণের ক্ষণিক-চৈতন্যবাদ, শূন্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদ, এবং পরে বৌদ্ধসম্প্র-দায়ের অবনতির সময়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে যে অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা দেখা দিয়াছিল, সেই অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানাঙ্গকে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছিল; কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে তৎকালীন হিন্দু-সমাজের স্থূল অবতারবাদ, তামসিক পৌত্তলিকতা এবং জটিল কর্ম্মকাণ্ডের জঞ্জালই ব্রহ্মজ্ঞানকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতবর্ষে তখন ঘোর অজ্ঞানতার রাজত্ব। মহাভারত ও রামায়ণের অবতারবাদ অতি স্থূল আকারে তখন হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়

সকল মূর্ত্তিপূজা ও বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডকেই সারধর্ম্ম বলিয়া আশ্রয় করিয়াছিল। শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতির শব্দে তখন লোকের কর্ণ বধির হইয়া যাইত। শিখা ও তিলকাদি ধারণই মুক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্বমীমাংসার কর্ম্মকাণ্ড কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির হস্তে পড়িয়া এক প্রকার ঐন্দ্রজালিক-বিদ্যার আকার ধারণ করিয়াছিল। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক তখন একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন সময় শঙ্কর ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানকে আবার প্রজ্বলিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। শূন্যবাদ, ক্ষণিক-চৈতন্যবাদ, অবতার-

শঙ্করের সংগ্রাম ভ্রান্তমতি বৌদ্ধএবং অজ্ঞানান্ধ হিন্দুগণের সহিত

বাদ, পৌত্তলিকতা ও বাহ্য ক্রিয়া কলাপ, ইহাদেরই সঙ্গে শঙ্করের সংগ্রাম; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণকে উজ্জ্বল করা ভিন্ন তাঁহার আর উপায়ান্তর ছিল না। ক্ষণিক-চৈতন্যবাদ ও শূন্যবাদে যাহাদের চিত্ত ভ্রান্ত; অবতারবাদ, পৌত্তলিকতা ও অসার ক্রিয়া কলাপে যাহাদের চক্ষু অন্ধ; স্বরূপলক্ষণের সমস্ত মহিমার সহিত ব্রহ্মকে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত না করিলে কিরূপে তাহারা তাঁহাকে চিনিবে? (ক্রমশঃ)

মিলনানন্দ।

বল দেখি, সখি, কোন্ সুলগনে
মিলেছিনু তব সাথে?
কোথা ছিলে তুমি, আমি ছিনু কোথা,
কে জানিত কার প্রেমের বারতা,
আঁখির মিলন,—কবেকার কথা?
কোন্ ফুল্ল বাসন্তী রা'তে
ভেঙ্গে গেল ঘুম, দেখিনু চকিতে
তব হাত মম হাতে?

চারিদিকে হাসি, হরষের বাঁশি,
হুলু ধ্বনি, কত গান,
উৎসব ভবনে রাশি রাশি আলো,
কৌতুক ভরা আঁখি কালো কালো,

সে মধু নিশিতে লেগেছিল ভালো
তব, লাজ নত মুখ খান
নিখিলের সুখ অপরূপ সাজে
করেছিল অর্ঘ্য দান।

বহুদিন গত, এতকাল পরে
পড়ে কি সে কথা মনে?
মুখোমুখী মোরা চন্দ্রাতপ তলে;
মুক্ত চন্দ্রালোক কৌতুকে উছলে;
ফুল্ল ফুলহার সসঙ্কোচে গলে
তুমি পরাইলে যেই ক্ষণে,
আঁখিতে আঁখিতে মিলিল, অমনি
হাসিল রমণীগণে।

ফুলমালা ঘেরা আলোক সজ্জিত
উজল বাসর ঘরে,
প্রবেশিনু মোরা বিবাহের শেষে
লাল চেলী পরা বরবধূবেশে,
কৌতুকময়ী নারীদল এসে
হেসে, বড়ই বিদ্রূপ করে;
অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া মু'খানি
তুমি, বসিলে অদূরে স'রে।

পরদিন প্রাতে লাগিল বাজিতে
সানাইএ বিরহ গাথা,
সাজায়ে চৌপাল পুরাঙ্গনা দলে
বিদায় করিল নয়নের জলে,
ম্লান আঁখি মুছি বসন অঞ্চলে
বক্ষে লইয়া ব্যথা
এসেছিলে হেথা; সে কাহিনী আজও
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা।

মনে পড়ে সেই ফুল শয্যা নিশি
শেজ খানি ঢাকা ফুলে,
আধঘুমে পিক উঠে কুহরিয়া,
সমীরণ ছোটে সুরভি বহিয়া ,
নারী দল হাসে রহিয়া রহিয়া ;
গোপনে গবাক্ষ খুলে
মৃদু হাসি আমি পরাইয়া দিনু
ফুলহার তব চুলে।

ধীরে ধীরে তুমি তুলিয়া মু'খানি
চাহিলে একটি বার,
ছলছল আঁখি মলিন বয়ান,
নয়নের জলে ভাসে উপাধান ;
কি দুঃখ বিষাদে ব্যথিত পরাণ,
সুধানু কারণ তার।
বলিলে কাতরে, "মন বড় পোড়ে,
কথা মনে প'ড়ে মার।"

"তোমার দুখানি পায়ে ধরি বলি,
পাঠাও মায়ের কাছে ;
ভাই বোনে ছেড়ে এসেছি কোথায়,
কত লোকে আসে কত লোকে যায়,
করুণ নয়নে কেহ নাহি চায়,
(আমার) পরাণ নাহিক বাঁচে ;
মা বাপের মুখ দেখিবার তরে
(সদা) তৃষিত হৃদয় যাচে।"

অতিথির মত থাকি দুটি দিন
পিতৃগৃহে গেলে ফিরে।
ফেলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস,
চলে গেনু আমি সুদূর প্রবাস ;

আবার তোমারে দেখিবার আশা
রহিল হৃদয় ঘিরে।
কত ব্যাকুল দিবস, অশান্ত যামিনী,
কাটানু নয়ন নীরে।

কত বর্ষ পরে ফিরে এসে ঘরে
(তোমা) দেখিনু দ্বিতীয় বার,—
নব রূপ রাশি, যৌবন নব,
ঢাকিয়া ফেলেছে দেহ মন তব ;
কোথা হ'তে বহি বিশ্ব সৌরভ
—অনন্ত গৌরব তার,—
হৃদয়ের মাঝে ফুটায়ে রেখেছো
প্রেমের মাধুরী কার ?

সীমন্ত মাঝারে সিন্দুর রেখা
তরুণ অরুণ লেখা,
নয়নের কোণে কৌতুক রাশি,
স্ফুরিত অধরে প্রীতি মাখা হাসি,
তাপদগ্ধ হৃদি-অন্ধকার নাশি
কোথা হতে দিল দেখা,
হেন চঞ্চল মন-মন্থন গান
কোথায় তোমার শেখা ?

ভুলে গিয়ে তুমি আত্মপর সব
এসেছ আবার ঘু'রে;
এবার তোমারে ছাড়িব না আর,
বাঁধিয়া রাখিব বক্ষ মাঝার,
শ্রান্ত হৃদয়ে ঢাল শান্তি ধার,
ভ্রান্তি যাউক দূরে ;
প্রেমের বিজয় গাহ সখি আজি,
হরষ সরস সুরে।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়।

বিনিময়।

প্রেমের কুসুম-ডোরে
দু'টী প্রাণ আছে বাঁধা,
সংসারের শোক, তাপ,
ঘুচিয়া গিয়াছে, কাঁদা।

মাঝে অমৃতের নদী,
বহিতেছে ধীরে ধীরে,
দাঁড়াইয়া আছি আজ,
দুইজন দুই তীরে।

সুধাময়ী তরঙ্গিনী,
দুটী ছায়া ধরি বুকে,
ছুটিছে অনন্ত পানে,
আনন্দ-প্রবাহে সুখে।

সংসার-তপন-তাপে
তাপিত তৃষিত প্রাণ,
জুড়ায় পবিত্র সেই
সুধা-ধারে করি স্নান।

স্বার্থ-সুখ—অভিমান,
ভাসাইয়া পূত-ধারে,
সুখ, শান্তি নিয়া আছি
প্রেম প্রবাহিনী তীরে।

তোমার অনন্ত প্রেম,—
তোমার অনন্ত ঋণ,—
অনন্ত প্রীতির উৎস
সিদ্ধ করে চিরদিন।

হৃদয় ঢালিয়া দিয়া,
অতৃপ্ত রয়েছে প্রাণ,
অসম্ভব অভাগার
তব প্রেম প্রতিদান!

জানি আমি;—ত্রিদিবের
পঞ্চ উপাদান নিয়ে,
গড়েছে তোমায় বিধি
দেবতার হিয়া দিয়ে!

এ দগ্ধ হৃদয় সনে
করি চিত্ত বিনিময়,
সত্যই দিয়াছ তুমি
দেবত্বের পরিচয়!

কাঁকরের বিনিময়ে
দিয়াছ সে কহিনূর,
রাখিব হৃদয়ে সদা,—
রবে হিয়া ভর-পূর।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

স্বভাব কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ।

(২)

প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক ম্যাথিউ আরনল্ড বলিয়াছেন, যাঁহার কাব্যে মানবজীবনের গভীর সমস্যাগুলি সম্যক বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গূঢ় সমস্যাগুলি ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কবিপদবাচ্য। সৌন্দর্য্য কাব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। কিন্তু সত্যই ইহার প্রাণ। যাঁহার কাব্যে যত অধিক পরিমাণে সত্য অন্তর্নিহিত থাকে, তাঁহার কাব্য ততই স্থায়ী হয়। যিনি সৌন্দর্য্যের ছটায় চারিদিক আলোকিত করিয়া, সত্যের মহামন্ত্রে স্বীয় কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন

তিনিই অমর কবি। এহেন কবিই মানব সমাজের শিক্ষা গুরু। ইহা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই হোমর (Homer), ভার্জ্জিল (Virgil), দান্তে (Dante), মিল্টন (Milton), কাব্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; ইহা করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই, সেক্ষপিয়র (Shakespear), ইউরিপাইডিস্ (Euripidis) ও সফক্লিস্ (Sophocles) প্রভৃতির আসন এত উচ্চ। ম্যাথিউ আরনল্ড কাব্যের এই লক্ষণ অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডের কবিদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা বলিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে নানা কারণে চসার (Chaucer), স্পেন্সার (Spenser), সেক্ষপিয়র ও মিল্টন, ইংলণ্ডের এই প্রথম শ্রেণীর কবি চতুষ্টয়ের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। বায়রণের কথা বলিতে যাইয়া, আরনল্ড একটু গোলে পড়িয়াছেন। কিন্তু আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকেই তিনি জয়মাল্য প্রদান করিয়াছেন। বায়রণ (Byron), শেলি (Shelly), কীটস (Keats), কাউপার (Cowper), বারণ্‌স্ (Burns), স্কট (Scott), ক্যাম্পবেল (Campbell), টম্‌সন্ (Thomson) প্রভৃতি কেহই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে আসন পাইতে পারেন না। এ বিষয়ে সকলে আরনল্ডের সহিত একমত হইতে পারিবেন কি না জানি না; কিন্তু আমরা মনে করি, যদিও এরূপ তুলনা অনেক সময় নিরপেক্ষ হয় না, তথাপি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কাব্যজগতে অতীব উচ্চ আসনের অধিকারী। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত কবিদিগের কাহারও অপেক্ষা তিনি ন্যূন নহেন।

সৃষ্টির প্রথম অবধি আজ পর্য্যন্ত একটী প্রশ্ন মানবের চিন্তার রাজ্য অধিকার করিয়াছে; জীবনের পরিণাম কি, এবং এই রহস্যপূর্ণ প্রহেলিকাময় জীবনের সমাধান কি। আজ পর্য্যন্ত এই গভীর সমস্যা মানবের মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছে। যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহারা সকলেই এই গভীর রহস্যের উদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার প্রভাবে প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কবিগণ সৃষ্টির প্রধান দুইটী জিনিস লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছেন। "মানব" ও "প্রকৃতি" কাব্যের সর্ব্ব প্রধান উপাদান। ইংলণ্ডের কবি পোপের (Alexander Pope) সময় পর্য্যন্ত কাব্যজগতে কেবল মানব সঙ্গীতই গীত হইত; কিন্তু কাউপারের সময় হইতে ইংরেজী কবিতায় এক নূতন স্রোত প্রবাহিত হইল, "মানব" ছাড়িয়া কাউপার "প্রকৃতির"

সঙ্গীত গাইলেন। কাব্য জগতে এক অসাধারণ পরিবর্ত্তন সজ্ঘটিত হইল। পূর্ব্বে মানবের মধ্য দিয়া প্রকৃতির ছবি প্রতিভাত হইত, কাউপার দৃশ্যমান প্রকৃতি, আকাশ, সমুদ্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানবকে দেখিতে লাগিলেন। কবির সম্মুখে এক নূতন জগতের দ্বার খুলিয়া গেল এবং প্রকৃতির সহিত মানবের সম্বন্ধ নূতন ভাবে নূতন সুরে গীত হইতে লাগিল। কাউপার ইংরেজী কাব্যে যে নূতন শক্তির প্রবাহ আনিয়াছেন, ওয়াড´স্‌ওয়ার্থের কাব্যে সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। ওয়াড´স্‌ওয়ার্থের কাব্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিব, প্রকৃতি ওয়াড´স্‌ওয়ার্থের কাব্যে কেমন ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে।

Excursion ওয়াড´স্‌ওয়ার্থের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কাব্য। ইহা নয় সর্গে বিভক্ত। ওয়াড´স্‌ওয়ার্থ "Recluse" নামক মহা কাব্য ৩ খণ্ডে রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া Excursionকে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড করিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত "Recluse" শেষ করিতে পারেন নাই। 'মানব' 'প্রকৃতি' 'সমাজ' এই কাব্যের আলোচ্য বিষয়। Excursionএর ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—

"On man, on Nature and on Human Life,
Musing in solitude, I oft perceive
Fair trains of imagery before me rise,
Accompanied by feelings of delight
Pure, or with no unpleasing sadness mixed." •

এবং মানব প্রকৃতি ও মানব জীবনের গীতই কবি এই কাব্যে গাহিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জানিতেন, তাঁহার সমসাময়িক সকল লোকে তাঁহার কাব্যের মর্ম্ম বুঝিবে না এবং সার্ব্বজনিক যশঃ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না। তাই তিনিও বৃদ্ধ কবি মিল্টনের সুরে গাহিয়াছিলেন—"Fit audience let me find 'though few'." তিনি জানিতেন, যদি তাঁহার কাব্যে সত্য থাকে এবং ঐ কাব্য প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে কখন উচ্চে আরোহণ ও কখন নিম্নে অবতরণ করে, তাহা হইলে মহীয়সী, কোমলা বাগ্‌দেবী হাসিতে হাসিতে প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার কাব্য গ্রহণ করিবেন, এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ, যখন মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার কাব্য পাঠ করিবে, তখন পবিত্র যশোরাশিদ্বারা তাঁহার পুরস্কার করিবে :—

"Which, if with truth correspond and sink,
Or rise, as venerable Nature leads,
The nigh and tender Muse shall accept
With gracious smile, deliberately pleased,
And listening Time reward with sacred praise."

Excersion, Boak I.

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তিগণ তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু Excursion কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হয় নাই। তাঁহার Recluse শেষ হয় নাই বলিয়া তাঁহার পরবর্ত্তিগণ দুঃখিত নহেন। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার মধুময় ঘ্রাণে কাব্য কানন আমোদিত হইয়াছে। তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতা-গুলির (Sonnets) গম্ভীর ঝঙ্কারে বনস্থলী পূর্ণ হইয়াছে। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের যশ Excursionএ নহে—তাঁহার যশ তাঁহার রাশি রাশি ক্ষুদ্র কবিতায়।

ম্যাথিউ আরনল্ড ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ক্ষুদ্র কবিতাগুলির এক সুন্দর শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন ; যথাঃ—Narrative Poems, Ballad Songs, Lyrics, Sonnets এবং Reflective and Elegiac Poems. আমরা এ প্রবন্ধে এই শ্রেণী বিভাগেরই অনুসরণ করিব।

উপাখ্যান ঘটিত কবিতাগুলির (Narrative Poems) মধ্যে মাইকেল (*Michael*), রুথ (Ruth) ও "*দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও স্বাতন্ত্র্য*" "(Resolution and Independence)" নামক কবিতাগুলি অতীব সুন্দর। শেষোক্ত কবিতাটী কবির একটী সুন্দর চিন্তাস্রোত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করে। রজনীর ভীষণ ঝটিকার পর একদিন প্রভাতে কবি প্রান্তরে বেড়াইতে গিয়াছেন। সূর্য্য উজ্জল হইয়া পূর্ব্বাকাশে দীপ্তি পাইতেছে, দূর বনানীতে পক্ষীর মনোহর কূজন শোনা যাইতেছে। বৃষ্টির ফোটা পড়িয়া ঘাসগুলি উজ্জল হইয়াছে। আনন্দে শশকেরা প্রান্তরে ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। কবির হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ তাঁহার হৃদয়ে গভীর বিষাদের ছায়া পড়িল :—

"And Tears and Fancies thick upon me came ;
Dim sadness and blind thoughts I knew not,—
nor could name."

কবি ভাবিতে লাগিলেন—এ সুন্দর সংসারে মানবজীবন একটা হাসিয়া খেলিয়া কাটাইবার জিনিস। কবি এ যাবৎ হাসিয়া খেলিয়াই কাটাইয়াছেন—জীবন মনোরম নিদাঘের মত তাহার পক্ষে কাটিয়াছে। কি জানি যদি হঠাৎ তাঁহার শান্ত জীবনের স্রোত ফিরিয়া যায়—কি জানি অভাব ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাঁহার হৃদয় প্রহত হয়—কি জানি লোকের তাচ্ছিল্যে তাহার হৃদয় প্রসূন ম্লান হইয়া পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদিগের কথা তাঁহার মনে পড়িল। কবিরা ত হাসিতে হাসিতেই জীবনের লীলা আরম্ভ করেন: কিন্তু অবশেষে নৈরাশ্য ও মত্ততা আসিয়া কোথা হইতে উপস্থিত হয় :—

"I thought of Chatterton, the marvellous boy,
The sleepless soul that perished in his pride ;
Of him who walked in glory and in joy
Behind his plough upon the mountain side,
By our own spirits are deified ;
We poets in our youth begin in gladness ;
But there of comes in the end Despondency and
madness."

কবি চিন্তা করিতেছেন—দেখিলেন সম্মুখে একজন বৃদ্ধ, তাহার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে ; তাহার বৃহৎ শরীর ধনুকের মত বক্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহার হস্তে সুদীর্ঘ যষ্টি। বৃদ্ধ স্থির ভাবে পল্বলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। কবি আশ্চর্য্য হইয়া তাহার নিকট গেলেন। কবির সহিত বৃদ্ধের কথোপকথন হইল—বৃদ্ধের অতীত জীবনের ইতিহাস কবি শুনিলেন। জীবনে বৃদ্ধ কত ক্লেশ সহিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের বল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এখনও বৃদ্ধ এক পল্বল হইতে অপর পল্বলে যাইয়া জলৌকা অন্বেষণ করে—বৃদ্ধ আর কোন কাজ করিতে পারে না, ইহাতেই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হয়। কিন্তু জলৌকা-আহরণই কি সহজ? কত ডোবা পার হয়, তবে বৃদ্ধ জলৌকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। বৃদ্ধের স্বাধীন জীবনের কাহিনী শুনিয়া কবি বিস্মিত হইলেন। তাহার লোকোত্তর ধৈর্য্য ও স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বৃদ্ধ অতীত জীবনের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কথা বলিল। বৃদ্ধের কথাগুলি কি সুমিষ্ট ও কেমন

প্রীতির উচ্ছ্বাস পূর্ণ! তাহার কি সদয় ভাব! বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে কবির হৃদয়ে এক শান্তির ছায়া পড়িল। এ বৃদ্ধ কি তাঁহার কল্পনার সৃষ্টি না সত্য সত্যই তাঁহার বিষণ্ণ হৃদয়ে বল দিবার জন্য আসিয়াছে? যখন বৃদ্ধের কথা শেষ হইয়াছে, তখন কবির নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ হইল:—

"and when he ended,
I could have laughed myself to scorn, to find
In that decrepit man so firm a mind.
"God" said I, "be my help and stay secure:
I'll think of the leech-gatherer on the lonely moor."

কবির নৈরাশ্য চলিয়া গেল।

ব্যালাড্ গীতি (Ballad Songs) গুলির মধ্যে Lucy grey, We are seven, The Pet Lamb, Alice Fell প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত কবিতাটী হৃদয়স্পর্শী। এই কবিতাটীর ভিতর কি মাধুর্য্য ও সরলতা ও কেমন গভীর অপার্থিব ভাব নিহিত। বালিকা "লুসি" (Lucy) এক জনহীন প্রান্তরে বাস করিত। তাহার খেলিবার সাথী কেহ ছিল না। একাকিনী সেই প্রশান্ত প্রান্তরে খেলা করিত। একদিন অপরাহ্নে বালিকার পিতা রজনীতে ঝটিকার আশঙ্কা করিয়া বালিকার মাতাকে বরফের উপর পথ দেখাইয়া আনিবার জন্য বালিকাকে লণ্ঠন হস্তে নগরে পাঠাইল। বালিকা হাসিতে হাসিতে চলিল। একটী একটী করিয়া বালিকা কত ক্ষুদ্র পাহাড় অতিক্রম করিল। তাহার পদতলে কত বরফরাশি বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু বালিকা নগরে পৌঁছিল না। সেই অন্ধকার রজনীতে ভীষণ ঝটিকায় বরফ রাশির ভিতর বালিকা কোথায় লুকাইল, কেহ জানিল না। বুঝি চির দিনের জন্য বালিকা বরফের শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল। অথবা বুঝি "লুসি" (Lucy) এখনও জীবিত আছে। এখনও বুঝি নির্জ্জন প্রান্তরে তুমি "লুসি"কে দেখিতে পাইবে। এখনও তাহার বিজনসঙ্গীত তোমার কাণে পশিবে। Lucy Grayর শেষ কয়টী পংক্তি কি সুন্দর!

Yet some maintain that to this day
She is a living child;
That you may see sweet Lucy Gray
Upon the lonesome wild.

O'er rough and smooth, she trips along
And never looks behind;
And sings a solitary song
That whistles in the wind.

এমন ভাবে অনন্ত জীবনের সঙ্গীত আর কোথাও শুনিয়াছ কি ?

"লুসি" (Lucy) নামটী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বড় প্রিয়। "লুসি"'র উল্লেখ করিয়া ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ আরও তিনটী কবিতা লিখিয়াছেন। আমরা একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

She dwelt among the untrodden ways
Besides the springs of dove,
A maid whom there were none to praise,
And very few to love.
A violet by a mossy stone
Half hidden from the eye,
Fair as a star when only one
Is shining in the sky.
She lived unknown, and few could know
When Lucy ceased to be;
But she is in her grave, and, oh,
The difference to me!

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

আমাদের দরিদ্রতা—পরিশ্রম।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, * জাতীয় ধনের উন্নতিকল্পে বাণিজ্যই প্রধান উপায়, এবং মূলধন ও পরিশ্রমই বাণিজ্যের প্রধান উপাদান। গত বারে মূলধন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে, এবার পরিশ্রম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

* গত নবেম্বরের "দাসী"......৫৫৯—৬৫ পৃষ্ঠা।

পরিশ্রমকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; ১ম, শারীরিক, ২য়, মানসিক। এই দ্বিবিধ শ্রমের সাহায্যেই জাতীয় ধন বৃদ্ধি পায়। নিজের শারীরিক শক্তিসামর্থ্য দিয়া কার্য্য করাকে শারীরিক শ্রম বলে। এখানে শরীরই বিশেষ ভাবে কার্য্য করে বলিয়া শরীরের প্রাধান্য। এখন দেখা যাউক আমাদের দেশে সেই শরীরের সাধারণ অবস্থা কি প্রকার।

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই পাঠকগণ বর্ত্তমান শ্রমজীবিশ্রেণীর দুরবস্থা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশে এমন কৃষক কয়জন আছে, যাহারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সম্বৎসরের খোরাকী ধান্যের সংস্থান করিতে পারে। এই সম্বন্ধে সার চার্লস্ ইলিয়েট এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে "আমাদের কৃষকগণের প্রায় অর্দ্ধেক লোক জানে না, বর্ষের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কি দিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণ করিবে।" ইহাদেরই দুরবস্থার জলন্ত চিত্র মহাত্মা হিউম্ চিত্রিত করিতে গিয়া অশ্রুগদগদ স্বরে বলিলেন, "খাটুনি, খাটুনি, খাটুনি; ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা (যদিচ অনাহার নহে, অথবা অনাহার হইলে তাহাদের কষ্টকর জীবনের শেষ হইত)! ব্যাধি, যন্ত্রণা, দুঃখ। হায়! হায়! ইহাই তাহাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনের চিত্র। কে অস্বীকার করিবে যে এই পঞ্চাশ লক্ষ, বা তদধিক লোকের জন্মগ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র; এখনও গলদেশে প্রস্তর বন্ধন করিয়া ইহাদিগকে সলিল-গর্ভে ডুবাইয়া মারিলে, তাহাদের পরমোপকার হয়।" বঙ্গদেশের কৃষকের গৃহে যিনি একবার পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি উহাদের অস্থি কঙ্কালসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্র কন্যাগণের অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

এই হতভাগ্য শ্রমজীবীদের কেন এমন দুরবস্থা? বঙ্গদেশের কি উর্ব্বরা শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে? আমাদের দেশের কতকগুলি কুরীতি ও কুনিয়ম এবং গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি ব্যবস্থার দোষে ইহাদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। ইহার সম্পূর্ণ বিচার এই সামান্য প্রবন্ধে অসম্ভব। বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত "ভারতের দারিদ্র্য সমস্যা" নামক গ্রন্থে এই বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের শ্রমজীবিগণ অনেক সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্য পায় না বলিয়া তাহাদের উপার্জ্জন অল্প হয়। তাহাদের দরিদ্রতা দূর করিতে

হইলে নূতন নূতন কার্য্যক্ষেত্র খোলা আবশ্যক। বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যের কার্য্য আরম্ভ করিলে অনেক লোক কর্ম্ম পাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিলাতী দ্রব্য আমাদের দেশের অনেক টাকা বিদেশে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এখন আমাদের দেশে পরিশ্রম শস্তা, সুতরাং এদেশে যে সকল বিলাতী বস্তুর ব্যবহার অধিক, সেই সকল বস্তু তদ্রূপ সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই সেগুলি শস্তা দিতে পারিব, এবং আমাদের দেশের অনেক টাকা এখানে রক্ষিত হইতে পারিবে। কিন্তু, আমাদের রাজা বিলাতী, সুতরাং তিনি বিলাতের মহাজনেরই সহায়। আমরা যদি উঠিয়া পড়িয়া একটা বড় রকমের কারবার করিতে উদ্যত হই, যাহাতে বিলাতী মহাজনের হয়ত কিছু ক্ষতি হইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের রাজা আমাদের সহায়তা অনেক সময়ে না করিয়া বিলাতী মহাজনেরই পক্ষ অবলম্বন করেন। আমরা আর কাঁদিব কাহার নিকট? আমাদিগকে এ সমস্ত অসুবিধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। যাহাতে শ্রমজীবিগণ অধিক কার্য্য পায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে অনেক পতিত জমি ও জঙ্গল আছে। সংগৃহীত মূলধন লইয়া ঐ সকল আবাদ করিবার দিকে আমরা যতই অগ্রসর হইতে পারিব, আমাদের শ্রমজীবিগণ ততই অধিক পরিমাণে কার্য্যলাভে সমর্থ হইবে।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের দুরবস্থার আর একটা কারণ, তাহাদের শ্রমলব্ধ শস্য অনেক পরিমাণে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে দেশে কেবল বিলাসিতার বস্তু জমিতেছে। পৃথ্বীশ বাবু তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকের একস্থানে প্রশ্ন করিয়াছেন,"কে কোথায় শুনিয়াছে যে, আহারীয় বস্তুর বিনিময়ে বিলাসিতার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া কোন জাতি ধনী অথবা উন্নত হইয়াছে?" আমাদের শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থার কারণ এই প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, অথচ বিলাস-সামগ্রীর অভাববোধ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইংরাজ জাতি নানা প্রকার শস্তা বিলাসিতার দ্রব্য প্রত্যহ প্রেরণ করিয়া আমাদের রক্ত শোষণ করিতেছেন, আর আমরা স্রোতে গা ঢালিয়া দিন দিন নিরন্ন, দুর্ব্বল ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। বঙ্গদেশের কৃষক চিরদিন খোলা মাথায় লাঙ্গলের মুঠ ধারণ করিয়া, হল

চালন করিত, ধন্য বিলাতী শিক্ষা! ঐ দেখ, সেও এখন আট আনা মূল্যের একটা ছাতা মাথায় দিয়াছে! ইহাতে হইল এই, ছাতার আট আনা তো সোজা বিদেশে চলিয়া গেল, আবার বেচারার রৌদ্রে পুড়িয়া যে শ্রম করিবার শক্তি ছিল তাহাও চলিয়া গেল। সহসা দুরবস্থা হইলেও ঐ কৃষককে একটা ছাতা ভাঙ্গিলে, কর্জ্জ করিয়াও আর একটা ছাতা কিনিতে হইবে। যাহার পূর্ব্বপুরুষেরা কখনও এক জোড়া চটি জুতার মুখ দেখে নাই, এক্ষণে বৎসরে দুই তিন জোড়া জুতা মোজা না হইলে তাহার চলে না।

পূর্ব্বে গৃহস্থ কন্যার বিবাহে মোটামুটি কয়েক খানা রূপার গহনা দিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহার উপর যদি এক খানা সোণার গহনা হইত, তবে বিবাহটা বড় জাঁকাল বলিয়া চারিদিকে প্রচারিত হইত। আর এখন কন্যাকে সোণা দিয়া মুড়িয়া দিলেও, বরের মা বলেন, "এমন কি দিয়াছে?" শুধু কি তাই, এখন আবার কন্যাকে এক জোড়া সেমিজ, দুটা সাটিনের জ্যাকেট্ না দিলে ভাল দেখায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মফঃস্বলের জমিদার বাবুদের ছেলেরাই পিরাণ ব্যবহার করিতেন, জুতা পায় দিতেন; এখন দেখি অতি সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত একটা জামা গায় দিয়া হাটে লাউ বেগুন বিক্রয় করিতে যায়। আমরা যখন প্রথম পুরীতে যাই তখন দেখিয়াছিলাম সেখানকার বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রেরই শরীর ও পদ সম্পূর্ণ খোলা, কেবল দুই চারিটী বাঙ্গালির ছেলে পিরান ও জুতা পরিত। এই সময়ে আমার একজন আত্মীয় সেখানে দোকান খুলিলেন, এবং কলিকাতা হইতে খুব শস্তা জুতা ও পিরাণ আমদানি করিলেন। কয়েক মাস পরে দেখা গেল, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের পায় জুতা, গায় জামা। এখন সেখানে দস্তুর মত সেলাইয়ের কল বসিয়াছে, জুতার দোকান হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিলাম! অবশ্য ইহাতে কতকগুলি শ্রমজীবীর অন্নসংস্থান হইতেছে বটে, কিন্তু দেশের নিরন্ন লোকের অভাব বাড়াইয়া কয়েক জন মাত্র শ্রমজীবীর অন্ন সংস্থান হওয়ায় দেশের অপকার ভিন্ন উপকার নাই। শুধু কি তাই? ইহাতে ও দেখা যাউক কত টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। লংক্লথ, সিট্, সূঁচ, সুতা, সেলাইয়ের কল, বোতাম, এ সকলই বিদেশীয়—একটা পিরাণের মূল্যে কতটুকু অংশ দেশে থাকিল?

ফল কথা, দেশের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হইতেছে না।

অথচ বৃথা অভাব দিন দিন বাড়িতেছে। ইহাতে যে আমাদের দেশ কি পরিমাণে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহা বলা যায় না। প্রকৃত দেশ হিতৈষীর উচিত, এক্ষণে দেশের খাদ্য দেশে রক্ষা করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এই যে চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে, ইহাতে কি চিন্তার বিষয় কিছুই নাই? আমাদের সংবাদ পত্রগুলি কেবল চীৎকার তুলিয়াছেন,—অমুক স্থানে রিলিফওয়ার্ক খোল, অমুক স্থানে অন্নক্ষেত্র খোল। কিন্তু কয়খানি সংবাদ পত্র ঝগড়া, পরনিন্দা, পরগ্লানি ত্যাগ করিয়া দেশের শস্য দেশে রাখিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন? আমাদের গবর্ণমেণ্টের রিলিফওয়ার্ক কেবল গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা। আজ গবর্ণমেণ্ট বিদেশে শস্য প্রেরণ আইন দ্বারা বন্ধ করুন, কাল দেখিবেন এই অজন্মার বৎসরেও চাউলের দর কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে। আমরা ভাতের কাঙ্গাল ও দুঃখী, আমরা ফ্রিট্রেড্ লইয়া কি করিব? এ দুর্দ্দিনে, এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে সংবাদ পত্র বল, কংগ্রেস বল, ধনী বল, নির্ধন বল, এস সকলে মিলিয়া শাসয়িতাকে বলি, "হে প্রভু! তোমা হ'তে আমরা অনেক সুখের মুখ দেখিয়াছি, তুমি দয়া করিয়া আমাদের ধন মান অনেক নিরাপদ করিয়াছ। তুমি বিদ্যা ও জ্ঞান দান করিয়া আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছ। সেই সাহসে ভর করিয়া আজ তোমার দ্বারে প্রার্থনা করি, আমাদের মুখের গ্রাসকে কাড়িয়া লইয়া বিদেশে পাঠাইও না। প্রভু! এই দুর্দ্দিনে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

(ক্রমশঃ)

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বাগ্রে ভগবানকে নমস্কার করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য গত নবেম্বর মাসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

বর্ত্তমান মাসের রোগী ও আতুর সংখ্যা। ১। বাবুরাম, ২। দেবীয়া, ৩। স্বর্ণ, ৪। ফুলমণি, ৫। দুর্গাতারিণী, ৬। নবদুর্গা, ৭। সুমিত্রা, ৮। অম্বিকা, ৯। রুক্মিণী, ১০। নিস্তারিণী, ১১। সখী, ১২। জুলী, ১৩। আনন্দ, ১৪। দয়া, ১৫। মাণিক, ১৬। নফর নন্দী, ১৭। কালীচরণ, ১৮। রামলাল, ১৯। রামজীবন, ২০। চন্দ্রদেবী, ২১। তপেশ্বরী, ২২। নলিনী, ২৩। ভগবতী, ২৪। রাধালক্ষ্মী, ২৫। লক্ষ্মী, ২৬। কালীদাসী।

জুলী এখনও পূর্ব্বের অবস্থায় আছে। বাক্‌শক্তিরহিত। এখনও খাওয়াইয়া দিতে হইতেছে, বোধ হয় নিজ হস্তে আর কখনও আহার করিতে সমর্থ হইবে না।

রামলাল। বয়স ২২ বৎসর। নিবাস জলপাইগুড়ী। দুই চক্ষু অন্ধ। চক্ষুর চিকিৎসার জন্ত শান্তি-সম্প্রদায়ের একজন ভ্রাতা এখানে আনয়ন করেন। হাঁসপাতালে গ্রহণ না করাতে এখন এখানে থাকিয়াই চিকিৎসা চলিতেছে। আরোগ্য লাভের আশা অল্প।

রামজীবন। বয়স ৪০ বৎসর। জাতিতে গোয়ালা। ময়মনসিংহে

দুগ্ধের ব্যবসায় করিত। পক্ষাঘাত রোগে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া সেখানকার টাউন হলের বারাণ্ডায় বিশেষ অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছিল। বাবু অশ্বিনীকুমার বসু ও বাবু চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার বিশেষ যত্ন-সহকারে এখানে আনয়ন করেন। অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে।

চন্দ্রদেবী। ব্রাহ্মণ কন্যা, বয়স আন্দাজ ৭০ বৎসর। রোগ পক্ষাঘাত। ইহার কোনও আত্মীয়ের গৃহে এতদিন ছিলেন। হঠাৎ সেই আত্মীয় রাখিতে অসমর্থ হওয়ায়, ইহাকে শিয়ালদহ হাঁসপাতালে প্রেরণ করেন। বাবু হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংবাদে দয়ার্দ্র হইয়া ইহাকে সেখান হইতে এখানে আনয়ন করেন। তাঁহার আত্মীয়গণ সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন। অবশেষে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাত বিস্তৃত হইয়া আহার বন্ধ হয়, এবং আস্তে আস্তে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদেবী পরলোক যাত্রা করেন।

তপেশ্বরী। পুরুষ, ব্রাহ্মণ, বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। রোগ উদরী। শান্তি-সম্প্রদায়ের একজন ভ্রাতা ইহাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পাইয়া দাসাশ্রমে দিয়া যান। রোগীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে দেখিয়া ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

নলিনী। বয়স আন্দাজ ১৮ বৎসর। জাতিতে তাঁতী, রোগ পুরাতন জ্বর প্রভৃতি। এই পাড়ার বাবু ললিতমোহন শীলের বাসার চাকরাণী ইহার একমাত্র আত্মীয়া। সে ললিত বাবুর সাহায্যে ইহাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে। বালকের অবস্থা একটু ভাল।

ভগবতী। বয়স আন্দাজ ৮০ বৎসর। জাতিতে আগুরী, নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়। নিতান্ত অসহায় অবস্থা দেখিয়া বাবু আশুতোষ রায় ইহাকে আশ্রমে দিয়া যান। ভগবতী মাঝে মাঝে হঠাৎ লাফাইয়া উঠে ও কি জানি কাহার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়, এবং এ অবস্থায় দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়া যায় ও বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহার জীবন রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া অবশেষে তাহাকে রেলিংএর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে।

রাধালক্ষ্মী। বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। পণ্ডিত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ইহাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া দাসাশ্রমে প্রেরণ করেন। রোগ বাত। অবস্থা পূর্ব্ববৎ।

লক্ষ্মী। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। রোগ পক্ষাঘাত। উল্টাডিঙ্গির কোনও দয়ালু ভদ্রলোক ইহাকে নিতান্ত অসহায় দেখিয়া দাসাশ্রমে রাখিয়া যান।

কালীদাসী। এই অর্দ্ধক্ষিপ্তা অন্ধ স্ত্রীলোককে কলিকাতার অনেকেই তাহাদের বাটীর নিকটে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছেন। এ যাহা কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিত, মঙ্গলা নামক আর একটা স্ত্রীলোক সে সমস্ত আত্মসাৎ করিত, এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক মুঠা খাইতে দিত। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবিল সোসাইটি হইতে ইহাকে ২৲ করিয়া দেওয়া হইত। সে টাকাও ঐ

স্ত্রীলোক আত্মসাৎ করিত। ইহা জানিতে পারিয়া উহার টাকা বন্ধ করার কথা হয়। তাহাতে কালীদাসী বলে যে সে টাকা চায় না, কোথাও তাহাকে রাখিয়া দেওয়া হউক। তদনুসারে উক্ত সভা তাহাকে এই আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। এখানে থাকিয়া সে মনের সুখে দিবারাত্রি গান করে। মঙ্গলা দুই একবার তাহাকে পরামর্শ দিয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল। মঙ্গলার প্রবেশ নিষেধ করা হইয়াছে।

দান প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার স হত নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

মাসিক চাঁদা।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ সেট সেপ্টেম্বর ১৲, কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ অক্টোবর ॥৹, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা আশ্বিন কার্ত্তিক ১৲, A Lady C/o Babu Sreenath Das অক্টোবর ১৲, N. K. Bose Esqr. অক্টোবর ১৲, ২নং সরকার্স লেন মেস্ অক্টোবর ।৹, বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্টোবর ১৲, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু অক্টোবর ১৲, বাবু করুণাদাস বসু নবেম্বর ॥৹, বাবু নন্দকুমার দত্ত অক্টোবর ১৲, ডাঃ চুনিলাল বসু নবেম্বর ১৲, বাবু তেজচন্দ্র বসু অক্টোবর ॥৹, বাবু গৌরীশঙ্কর দে অক্টোবর ॥৹ বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় চৌধুরী অক্টোবর ১৲, শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় কার্ত্তিক ১৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী কার্ত্তিক ১৲, District Charitable Society দুই জনের ৩৲ হিসাবে সাহায্য অক্টোবর নবেম্বর ৩৬৲, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার অক্টোবর ২৲, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু নবেম্বর ১৲, R. N. Mukerjee Esqr নবেম্বর ১৲, বাবু কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী আশ্বিন।/৹, ২১।১ নং পটুয়াটোলা মেস্ নবেম্বর ।৹, বাবু ত্রিপুরাকান্ত গুপ্ত অক্টোবর ১॥৹, বাবু রাধাগোবিন্দ সাহা অগ্রহায়ন ॥৹, রায় পশুপতি নাথ বসু সেপ্টেম্বর অক্টোবর ২৲, বাবু যদুনাথ বরাট অক্টোবর নবেম্বর ২৲, বাবু ক্ষুদিরাম বসু সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৲, বাবু কেদারনাথ দাস আগষ্ট হইতে নবেম্বর ১৲, বাবু মহেশচন্দ্র বারিক নবেম্বর ১৲, N. C. Baral Esqr. সেপ্টেম্বর অক্টোবর ২৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ধর আগষ্ট সেপ্টেম্বর ১৲, রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী চৌধুরাণী অক্টোবর ২৲, বাবু অভয়চরণ মল্লিক অক্টোবর ১৲, বাবু বিহারীলাল দে আশ্বিন ॥৹, বাবু বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী অক্টোবর নবেম্বর ২৲, ১২৬ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ নবেম্বর ॥৹, বাবু হরিপদ ঘোষাল অক্টোবর ।৹, ২নং সরকার্স লেন মেস নবেম্বর ।৹, বাবু রামচন্দ্র মিত্র অক্টোবর নবেম্বর ২৲,

এককালীন দান।

শ্রীমতী সৌরভিনী ঘোষ ১৲, বাবু পরেশনাথ সেন ১৲, বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু ॥৹ বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ ।৹, বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ।৹, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র

পাল।০, বাবু প্রমথনাথ বসু।০, বাবু বরদাকান্ত বসু।০, বাবু শ্রীনাথ চন্দ ১৲, বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু।০, বাবু ব্রজগোপাল ঘোষ।০, বাবু শ্যামাচরণ রায় ॥০, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৵০, বাবু অখিলচন্দ্র গুহ ॥০, বাবু অন্নদাচরণ গুহ ॥০, বাবু দুর্গানাথ চৌধুরী ॥০, বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্রের স্ত্রীর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲, বাবু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৲, বাবু ফটিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।০, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫৲, একজন ভদ্রলোক ৫৲, ঢাকা অনাথার ঝুলি ফণ্ড মাঃ সুধীরচন্দ্র হালদার ১২৫৲, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী দীক্ষার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৲, বাবু নিবারণচন্দ্র ঘোষাল।০, বাবু ক্ষেত্রনাথ সিংহের স্ত্রী স্বর্গগত মনোরমা সিংহের প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধে ২৲, কটকের একজন বন্ধু ৫৲, বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী ৵০, বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।০, ৪নং ছকুখানসামার লেন মেস ॥০, বাবু অশ্বিণীকুমার বসু ৵১০ বাবু মুক্তিনাথ দাস ৵০, বাবু শিশিরকুমার ঘোষাল।৵০, বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।০, বাবু শশীকুমার সেন।৵০, বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।০, ৮৯ নং হ্যারিসন্ রোড মেস্ ॥৵০, ৫০ নং ওল্ড বৈঠকখানা মেস্ ৵১৫, বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ ৵০, বাবু অমরেন্দ্রনাথ বসু।০।

বস্ত্রাদি দান।

বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী গরম কোট ১, পড়িয়া পাওয়া মাঃ বাবু ফকিরচাঁদ সাধুখাঁ ঘটি ১, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, দীক্ষার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, রোগীর জন্য নূতন গামছা ১৪, বাবু বিনোদবিহারী সেন, কাপড় ১, সার্ট ৪।

অন্যান্য প্রকারে আয়।

মানিকদহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায়ের প্রজাদের নিকট হইতে সংগৃহীত ১৪॥৶০, কয়লার গুঁড়া বিক্রয় ৶১০, পড়িয়া পাওয়া ॥০, তাপসবালা বিক্রয় মাঃ বাবু বরদাকান্ত বসু ১॥০, বাক্সের দান ১৲, রোগীর জমা প্রাপ্ত ॥/৫, নানাবিধ পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ৶১৫ দাসীর সাহায্য।৵০।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

মাসিক চাঁদা ৭৪।/০, এককালীন দান ১৮১।/৫, অন্যান্য প্রকারে আয় ১৯/১০, পূর্ব্ব মাসের হস্তে স্থিত ৯॥৫, মোট জমা ২৮৪।০।

ব্যয়।

বাজার খরচ ১০৩৸৶১০, মেহতর ১৲, আদায়কারীর খরচ ২৬॥৶১০, জিনিসাদি খরিদ ১॥৵০, ধোপা ২৵০, দুগ্ধ ১২৸১০, রাঁধুনী ৬৲, বাটি ভাড়া (সেপ্টেম্বরের বাকী ৩০৲ ও অক্টোবরের শোধ ৫০৲) মোট ৮০৲, রোগীর গাড়ী ভাড়া ৬৹৫, কর্ম্মচারীর বেতন ২৫৲, কর্জ্জ দেওয়া যায় ৫॥০, মোট খরচ ২৭০॥৶১৫।

আয় ব্যয়।

মোট আয় ২৮৪।০, মোট ব্যয় ২৭০॥৶১৫, মোট হস্তেস্থিত ১৩॥৫।

বিশেষ ধন্যবাদ।

সিমলার ডাক্তার বাবু দেবেন্দ্রনাথ আইচ এল, এম, এস, কয়েক মাস হইতে দাসাশ্রমের রোগীদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। দাসাশ্রমের রোগীদের জন্য যখনই তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া যায় তখনই তিনি আসিয়া উপস্থিত হন। এই নিঃস্বার্থ চেষ্টা যত্নের জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

আমাদের মাসিক চাঁদাদাতা কবিরাজ শ্যামাদাস কবিভূষণ দাসাশ্রমের পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত উত্থানশক্তি রহিত আতুর রুক্মিণীকান্ত সরকারকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। ইহাকে বিশেষ মূল্যবান ঔষধ, তৈল ও ঘৃতাদি ইনি বিনা মূল্যে দিতেছেন। এই রোগী নানা প্রকার হাঁসপাতালে অনেক দিন চিকিৎসিত হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোনও ফল লাভ হয় নাই; কিন্তু ইহার এই অল্প কালের চিকিৎসাতেই রোগী লাঠির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। এই জন্য কবিরাজ মহাশয়কে আমরা অন্তরের সহিত বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

নবেম্বর মাসে এক সময়ে আমাদের এমন দুরবস্থা উপস্থিত হয়, যে সে সময়ে এক মুষ্টি চাউল পর্য্যন্ত আমাদের ছিল না। পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহোদয়কে জানান মাত্র তিনি ২৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়া আমা-দিগের আতুরগণের বিশেষ অভাব মোচন করেন। এজন্য তাঁহার নিকট আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ঢাকায় এক সময়ে অনাথার ঝুলি নামক একটী সাহায্যসমিতি স্থাপিত হয়। তাহাতে ১২৫৲ উদ্বৃত্ত ছিল। ধনের রক্ষকগণ ঐ টাকা অবশেষে দাসাশ্রমের অনাথ আতুরগণের সেবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

আমাদের বিশেষ অভাব।

এবার চারিদিকে অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে মফঃস্বলস্থ দাসাশ্রমের অনুগ্রাহকগণের অনেকে বাধ্য হইয়া দান বন্ধ করিয়াছেন। এখন আমরা আর কাহাকে কি বলিব? সকলেই এই দুর্ব্বৎসরে আপনা লইয়া বিব্রত।

আমাদের অনুগ্রাহকদলে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক, সুতরাং তাঁহারা যে আজকাল কত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। আমরাও ২০। ২৫টি অন্ধ আতুর লইয়া এখানে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা পূর্ব্বে যে চাউল ৩৸৹ করিয়া খরিদ করিতাম, তাহাই এক্ষণে ৫।৹ করিয়া খরিদ করিতেছি। এমন করিয়া দিন যাপন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দানশীল ধনাঢ্য মহোদয়গণ দাসাশ্রমের প্রতি
ত না করিলে এবার আর রক্ষা নাই।

দাসীর কথা।

ভগবানের কৃপায় দাসীর ৫ম বর্ষ শেষ হইল। এখনও মফঃস্বলে প্রায় ৩০০৲ টাকা এবং সহরে প্রায় ৫০৲ পাওনা আছে। এই টাকা পাইলে আর দাসীর ঋণ হইবে না, সুতরাং দাসীর গ্রাহকগণ স্বরায় স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া "দাসী"র জীবন রক্ষা করিবেন। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহকগণকে বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন সকলেই ৬ষ্ঠ বর্ষের দেয় দুই এক মাসের মধ্যে অগ্রিম পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।

এজেণ্ট—বাবু কুমুদবিহারী রায় আমাদের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়া টাকা আদায়ের জন্য বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন। বাবু পরেশনাথ রায় কলিকাতার এজেণ্ট থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দাসাশ্রম ও দাসীর টাকা আদায় করিতেছেন।

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী
দাসীর ক্যার্য্যাধ্যক্ষ।

সীতা লেখক বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস, এম, এ, বি, এল প্রণীত "পলাশ-বন" বাহির হইযাছে। দাসী কার্য্যালয় হইতে ঐ পুস্তক ক্রয় করিলে দাসাশ্রমের কিছু লাভ হইবে। ১৮৯৬ সালের দাসীর গ্রাহকগণ ঐ পুস্তক আমাদের নিকট হইতে লইলে ১৲ টাকায় পাইবেন।

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী
দাসী কার্য্যাধ্যক্ষ।